BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

দশজন

হুমায়ূন আহমেদ

www.BDeBooks.Com

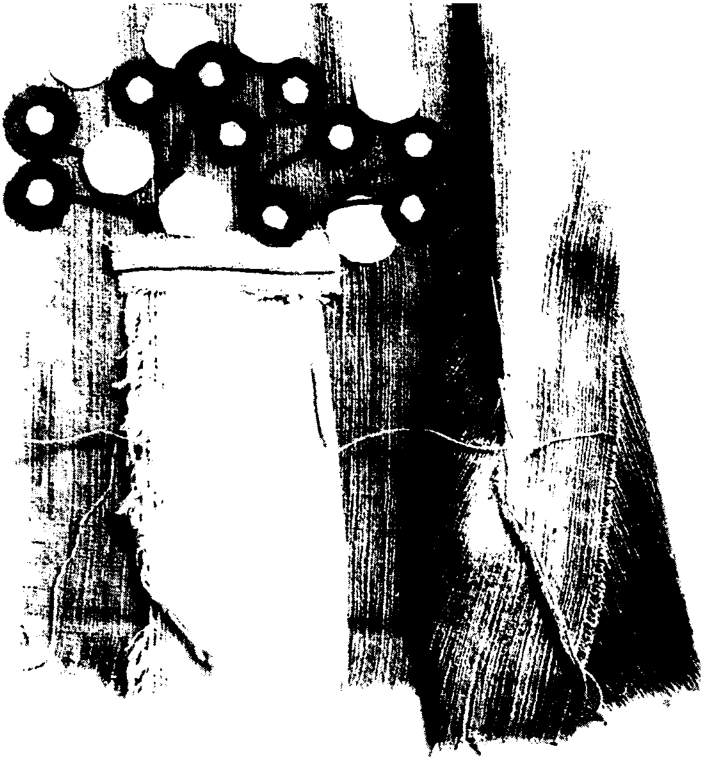

দশজন

হুমায়ূন আহমেদ

অন্বেষা প্রকাশন

দশজন
হুমায়ূন আহমেদ

স্বত্ব © মেহের আফরোজ শাওন

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১১

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৯

অন্বেষা ১১৩

অন্বেষা

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
ফোন : ৭১২৪৯৮৫

ক্রিয়েটিভ এ্যাডভাইজার
ওয়াহিদ ইবনে রেজা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
আর এস প্রিন্টিং প্রেস
৫৯/৩/৪ পুরানা পল্টন

আমেরিকা পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৬৫০.০০ টাকা মাত্র

Doshjohn by Humayun Ahmed.
First Published February Book Fair 2009
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.anneshaprokashon.com
e-mail annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 650.00 only **US $ 25.00**

ISBN : 984 70116 0063 5 Code 113

www.BDeBooks.Com

উৎসর্গ

জীবনের কঠিন দুঃসময়েও তাঁর
ছায়া থেকে বঞ্চিত হইনি। ইনি সেই জন
যিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন অসীম ক্ষমায়।

বেগম তহুরা আলী
জননীয়েষু

হুমায়ূন আহমেদ : একটি রেখাচিত্র

শামসুর রাহমান

যখন হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয়, তখন আমি 'দৈনিক বাংলা'র একজন সহকারী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। বইটি পড়ে আমার এত ভালো লেগেছিল যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমি আমার কলামে সেই বইয়ের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করি। সেদিনই আমার মনে হয়েছিল, আমাদের কথাসাহিত্যে একজন নতুন কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ অনেকগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন এবং ইতোমধ্যে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। জনপ্রিয়তা সম্পর্কে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং কেউ কেউ বাঁকা উক্তিও করে ফেলেন। কিন্তু দেখাগেছে অনেক উৎকৃষ্ট রচনাই অত্যন্ত জনপ্রিয়। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের শস্তা চতুর্থশ্রেণীর লেখকদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি সন্দেহে নেই, বিশাল পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যা সাহিত্যের পক্ষে উপকারী। এ কথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে, তিনি, ভবিষ্যতে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কিংবদন্তির মর্যাদা পাবেন।

তিনি উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি ছাড়া অনেক ছোটগল্পও লিখেছেন। তার কয়েকটি গল্পসংগ্রহও প্রকাশিত হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ শুধু একজন উজ্জ্বল জনপ্রিয় লেখকই নন, তিনি একজন ভালো মানুষও বটে। তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত লেখক। তার খ্যাতি দেশের সীমানা অতিক্রম করেছে। কিন্তু এ নিয়ে তাকে কখনো গর্ব করতে আমি অন্তত দেখিনি। তিনি আমাকে বলেননি, আমি একটি বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে,

www.BDeBooks.Com

পশ্চিমবঙ্গের একজন যশস্বী বর্ষীয়ান লেখক রমাপদ চৌধুরী বলেছেন–হুমায়ূনের কয়েকটি গল্প শুধু সেরা বাংলা ছোটগল্পের সমপর্যায়েরই নয়, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলোর সমতুল্য। এ ধরনের প্রশংসাবাক্য ঢোল বাজিয়ে প্রচার করার মতোই। কিন্তু বিনয়ী লাজুক হুমায়ূন আহমেদ এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

তিনি যে মানুষ হিসেবেও আর দশজনের চেয়ে আলাদা তার আরেকটি নিদর্শন এখানে উপস্থিত করার লোভ সামলাতে পারলাম না। একবার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষ থেকে তার কাছে নিয়মিত কলাম লেখার অনুরোধ জানানো হয় এবং এদেশের একজন বয়স্ক ও খ্যাতিমান লেখকের চেয়ে আড়াইগুণ বেশি সম্মানী দেয়ার প্রস্তাব করা হয়। সেই অগ্রজ লেখককে এর আগে সবচেয়ে বেশি সম্মানী দেয়া হত বলেও হুমায়ূনকে জানানো হয়েছিল। সেই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রস্তাবে তিনি এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এ প্রস্তাব তো প্রত্যাখ্যান করলেনই, পরেও একটি পঙ্‌ক্তিও তিনি সে কাগজে লিখেননি। আমি ভাবতে প্রলুব্ধ হচ্ছি, অনেকেই কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের মতো চিত্তের প্রসারতার এরকম প্রমাণ রাখতে পারতেন না।

উপসংহারে আরেকটি কথা না বললে স্বস্তিবোধ করব না। আমরা বিভিন্ন সময় একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে নানা মঞ্চে নানা বক্তব্য রেখেছি। হুমায়ূন আহমেদ তার একটি টেলিভিশন নাটকে একটি পাখির মুখে 'তুই রাজাকার' শব্দ দুটি বসিয়ে রাজাকারদের প্রতি যে ব্যাপক ঘৃণার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা অনুমান করি, আমাদের অনেক বক্তৃতাও পারেনি। এজন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা হুমায়ূন আহমেদের প্রাপ্য।

এই জনপ্রিয় এবং সফল লেখক পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালেন। আমি তার সুদীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি। তার কল্যাণ হোক।

২৯.১০.৯৮

লেখকের অনুমতিক্রমে লেখাটি পূণঃমুদ্রণ করা হলো।

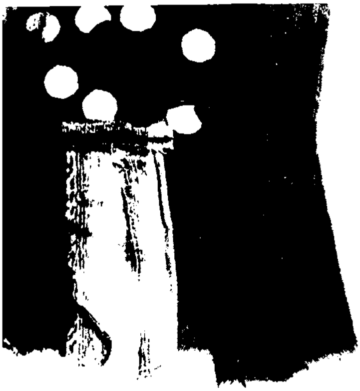

■ ইরিনা ১১

■ একি কাণ্ড ৯১

■ আমার ছেলেবেলা ১২৭

■ এবং হিমু ২০৩

■ অনিল বাগচির একদিন ২৭৫

■ বহুব্রীহি ৩২৫

■ আমাদের সাদা বাড়ি ৪৮১

■ নবনী ৫২১

■ বাঘবন্দি মিসির আলী ৬০৯

■ কালো যাদুকর ৬৭৯

www.BDeBooks.Com

ইরিনা

১

লোকটির মুখ লম্বাটে।

চোখ দুটি তক্ষকের চোখের মতো। কোটর থেকে অনেকখানি বেরিয়ে আছে। অত্যন্ত রোগা শরীর। সরু সরু হাত। হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। কাঁধে ঝুলছে নীলরঙা চকচকে ব্যাগ। তার দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বিনীত ভঙ্গি আছে। নিশ্চয়ই কিছু-একটা গছাতে এসেছে।

দুপুরের দিকে এ রকম উটকো লোকজন আসে। এরা কলিং বেল টিপে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে হাত কচলায়। লাজুক গলায় বলে, 'আমি নিতান্তই একজন দরিদ্র ব্যক্তি, কাটা কাপড়ের টুকরো বিক্রি করি। আপনি কি অনুগ্রহ করে কিছু কিনবেন? কিনলে আমার খুব উপকার হয়।'

এই লোক নিশ্চয়ই সে রকম কিছু বলবে। ইরিনা তাকে সে সুযোগ দিল না। লোকটি মুখ খুলবার আগেই সে বলল, 'আমাদের কিছু লাগবে না। আপনি যান।'

লোকটি কিছুই বলল না চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। ইরিনা কড়া গলায় বলল, 'বলেছি তো আমাদের কিছু লাগবে না।'

'আমি কিছু বিক্রি করতে আসি নি।'

'আপনি কে? কাকে চান আপনি?'

'আমি কে? তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?'

'ইরিনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল লোকটির দিকে। লোকটির দাঁড়িয়ে থাকার যে ভঙ্গিটিকে একটু আগেই বিনীত ভঙ্গি মনে হচ্ছিল, এখন সে-রকম মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে লোকটি ভয়ঙ্কর উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনার কি দরকার বলুন?'

'বাইরে দাঁড়িয়ে কি আর সবকিছু বলা যায়?'

'বাবা-মা কেউ ঘরে নেই, আপনাকে আমি ভেতরে আসতে বলব না।'

লোকটি মেয়েদের রুমালের মত ছোট্ট ফুল আঁকা একটি রুমাল বের করে কপাল মুছল। ইরিনা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি কোনো খবর না দিয়ে এসেছেন।'

লোকটি বলল, 'খবর না দিয়ে অনেকেই আসে। জরা আসে, মৃত্যু আসে এবং মাঝে মাঝে গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন।'

www.BDeBooks.Com

'তাহলে আপনি কি— ?'

লোকটি হাসল। নিঃশব্দ হাসি নয়— বেশ শব্দ করে হাসি। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, হাসির শব্দ অত্যন্ত সুরেলা। শুনতে ভালো লাগে। ইরিনা বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

'শুভ দুপুর ইরিনা।'

'আপনি আমার নাম জানেন ?'

'গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের লোকজন যখন কারোর বাড়ি যায়, তখন বাড়ির লোকজনের নাম জেনেই যায়। সেটাই স্বাভাবিক, তাই না ?'

ইরিনা কথা বলল না। সে একদৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি বলল, 'তুমি কি আমার কার্ড দেখতে চাও ? স্বাধীন নাগরিক হিসেবে আমার পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়ার অধিকার তোমার আছে।'

'অমি কিছুই দেখতে চাই না। আপনি কেন এসেছেন ? আমার কাছ থেকে কী জানতে চান ?'

লোকটি কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

'তাহলে এসেছেন কি জন্যে ?'

'তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।'

'তার মানে ? আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন ?'

'ইরিনা, তুমি কি জান না ইন্টেলিজেন্সের লোকজনদের কোনো প্রশ্ন করা যায় না ? বিধি নং চ ২১১/২, তুমি কি এই বিধি জান না ? তোমাকে স্কুলে শেখান হয় নি ?'

'হয়েছে।'

'তাহলে তুমি হয়তো চ ২১১/৩ বিধিটিও জান।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'বল তো বিধিটি কি ?'

ইরিনা যন্ত্রের মতো বলল, 'আপনি যদি আমাকে কোথাও যেতে বলেন, তাহলে যেতে হবে।'

'যদি যেতে অস্বীকার কর, তাহলে কি হবে বল তো ?'

'প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করা হবে।'

'এই অপরাধের শাস্তি কি জান ?'

'জানি। কিন্তু আমি যাব না। আমার বাবা-মা না আসা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।'

লোকটি ছোটো ছোটো পা ফেলে ঘরে মধ্যেই হাঁটছিল। হাঁটা বন্ধ করে চেয়ারে বসল। খুব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই বাড়ি-ঘর তার দীর্ঘদিনের চেনা। সে যেন নিতান্ত পরিচিত কেউ। অনেক দিন পর বেড়াতে এসেছে।

ইরিনা আবার বলল, 'বাবা-মা বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত আমি কোথাও যাব না।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ তাই। বাবা-মা না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই থাকব।'

'এই কথাগুলো তুমি পর পর তিনবার বললে। একই কথা বারবার বললে কথা জোরাল হয় না।'

'লোকটি সিগারেট ধরাল। ছাই ফেলবার জন্যে নিজেই উঠে গিয়ে একটা এ্যাশট্রে আনল। ইরিনার দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কী যেন দেখল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে খুব সহজ গলায় বলল, 'তোমার বাবা-মা আর এ বাড়িতে ফিরে আসবে না।'

ইরিনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী বলছে এই লোকটি! সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চান ?'

'ঠিক এই মুহূর্তে তোমার বাবা-মা দু'জনেই আছেন খাদ্য দপ্তরে। বেলা তিনটে পর্যন্ত তাঁরা সেখানে থাকবেন। তারপর তাঁদের পাঠান হবে প্রথম নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। সেখান থেকে তাঁদের ঠিক পাঁচটায় নেয়া হবে সেন্ট্রাল কমিউনে। আরো শুনতে চাও ?'

'না।'

'তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করছ না ?'

'না। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন কখনো সত্যি কথা বলে না।'

'এটা তুমি ভুল বললে ইরিনা। শুধু মিথ্যা বললে মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। মিথ্যা বলতে হয় সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে। আমরা এক হাজার সত্যি কথার সঙ্গে একটা মিথ্যে কথা ঢুকিয়ে দিই। কারো সাধ্য নেই সেই মিথ্যা ধরে। হা হা হা।'

লোকটি সুরেলা গলায় হেসে উঠল। এমন একজন কু-দর্শন লোক এত চমৎকার করে হাসে কী করে!

'ইরিনা, তুমি কি আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াবে ? সেই সঙ্গে কিছু খাবার। আশা করি ঘরে কিছু খাবার আছে।'

'খাবার নেই। কপি খাওয়াতে পারি।'

ইরিনা হিটারে পানি গরম করত লাগল। তার একবার ইচ্ছা হল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে চুপিসারে চলে যায় কোথাও। কিন্তু তা সম্ভব হয়। এ রকম কিছু চিন্তা করাও বোকামি।

টেলিফোন বাজছে। ইরিনা তাকাল লোকটির দিকে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি কি টেলিফোন ধরতে পরি ?'

'হ্যাঁ পার।'

টেলিফোন করেছেন ইরিনার বাবা। তাঁর গলায় বারবার কথা আটকে যাচ্ছে। যেন কোনো কারণে তিনি অসম্ভব ভয় পেয়েছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় করে শ্বাস ফেলছেন।

www.BDeBooks.Com

'তুমি কোত্থেকে কথা বলছ বাবা ?'

'খাদ্য দপ্তর থেকে।'

'তুমি কিছু বলবে ?'

'না।'

'শুধু শুধু টেলিফোন করেছ ?'

'ইয়ে মা শোন— আমাকে কোথায় যেন পাঠাচ্ছে।'

'কোথায় পাঠাচ্ছে ?'

'তা তো জানি না। অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসিয়ে রাখল। এখন বলছে—'

'কী বলছে ?'

ইরিনার বাবা খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। যেন কাউকে দেখে ভয় পেয়েছেন। অনেক কিছু বলার ছিল, বলা হল না। ইরিনা টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে হালকা স্বরে বলল, কোনো লাভ নেই, কেউ টেলিফোন ধরবে না।' সত্যি কেউ ধরল না। ইরিনার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু এই কুৎসিত লোকটিকে চোখের জল দেখাতে ইচ্ছা করছে না। কান্না চেপে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। এই কঠিন ব্যাপারটি সে কী করে পারছে কে জানে। কতক্ষণ পারবে তাও জানা নেই।

'পানি ফুটছে। কফি বানিয়ে ফেল। চিনি বেশি করে দেবে। আমি প্রচুর চিনি খাই। বুদ্ধিমান লোকেরা চিনি বেশি খায়, এই তথ্য কি তুমি জান ?'

ইরিনা জবাব দিল না।

লোকটি কফি খেল নিঃশব্দে। তার ধরনধারণ দেখে মনে হয়, কোনো তাড়া নেই। দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকতে পারবে। কফি শেষ করেই সে তার নীল ব্যাগ থেকে কি-একটা বই বের করে পড়তে শুরু করল। বইয়ের লেখাগুলো অদ্ভুত, নিশ্চয়ই কোনো অপরিচিত ভাষা। লোকটি পড়তে পড়তে মুচকি মুচকি হাসছে। নিশ্চয় মজার কোনো বই। একটি লোহার রড হাতে নিয়ে চুপিচুপি লোকটির পেছনে চলে গেলে কেমন হয়। আচমকা প্রচণ্ড বেগে লোহার রডটি তার মাথায় বসিয়ে দেবে। ইরিনা মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই রকম কল্পনার কোনো মানে হয় না।

লোকটি হাতের ঘড়িতে সময় দেখল। বইটি বন্ধ করে নীল ব্যাগে রেখে বলল, 'সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমাদের ট্রেন। কাজেই অনেকখানি সময় আছে। রাতে খাওয়া-দাওয়া আমরা ট্রেনেই সারব। কাজেই রান্নাবান্নার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি যদি সঙ্গে কিছু নিতে চাও, নিতে পার। একটা মাঝারি ধরনের স্যুটকেস গুছিয়ে নাও।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি ?'

'বিধি চ ২১১/৩; আমাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।'

ইরিনা চুপ করে গেল। একবার ইচ্ছা হল গলা ফাটিয়ে কাঁদে। কিন্তু কী হবে কেঁদে ? কে শুনবে ?

'তুমি কি সঙ্গে কিছুই নেবে না ?'

'না।'

'খুব ভালো কথা। ভ্রমণের সময় মালপত্র যত কম থাকে, ততই ভালো। সবচে ভলো যদি কিছুই না থাকে। হা হা হা।'

ইরিনা বলল, 'আমি কোনো অন্যায় করি নি। দুই শ' পঞ্চাশটি বিধির প্রতিটি মেনে চলি। শৃঙ্খলা বোর্ড একবারও আমাকে 'সাবধান কার্ড' পাঠায় নি। আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন ?'

'তুমি প্রতিটি বিধি মেনে চল, এটা ঠিক বললে না। এই মুহূর্তে তুমি বিধি ভঙ্গ করেছ। আমাকে প্রশ্ন করেছ।'

'আর করব না।'

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। কাঁদছ কেন তুমি ?'

'আমি কাঁদতেও পারব না ? বিধিতে কিন্তু কাঁদতে পারব না, এমন কথা নেই।'

'তা নেই। তবে কাঁদলেই লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। আমি তা চাই না। আমি চাই খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তুমি আমার সঙ্গে হাঁটবে। আমি চমৎকার সব হাসির গল্প জানি। সেই সব গল্প তোমাকে পথে যেতে যেতে বলল। শুনে হাসতে হাসতে তুমি আমার হাত ধরে হাঁটবে।'

ইরিনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'দয়া করে বলুন, আমি কি করেছি।'

লোকটি শান্ত গলায় বলল, 'আমি জানি না তুমি কি করেছ। সত্যি আমি জানি না। আমাকে শুধু বলা হয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে।'

'কোথায় ?'

'সেটা তোমাকে বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, তুমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। সহজ কথায় তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।'

'কী করে বুঝলেন ?'

'তোমাকে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠান হয়েছে, সেই কারণেই অনুমান করছি। আমি কোনো হেঁজিপেঁজি ব্যক্তি নই, আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'আমাকে এইসব কেন বলছেন ?'

'যাতে অকারণে তুমি ভয় না পাও, সেজন্যে বলছি। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ঠিক তোমার মতো আমার একটি মেয়ে আছে। তার চোখও নীল। সে-ও তোমার মতো সুন্দর।'

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনার কোনো মেয়ে নেই। কেউ মিথ্যা বললে আমি বুঝতে পারি। মিথ্যা বলার সময় মানুষের চোখের দৃষ্টি বদলে যায়।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আমি অবিবাহিত।'

ইরিনা শান্ত স্বরে বলল, 'আপনি কি দয়া করে বলবেন, আমার বাবা-মা এ বাড়িতে ফিরে আসবেন কি না ?'

www.BDeBooks.Com

'আমার মনে হয়, তারা আর ফিরে আসবে না।'

'ঘরে তালা লাগানোর তাহলে আর কোনো প্রয়োজন নেই, তাই না ?'

'আমার মনে হয়, নেই।'

'আমি নিজেও বোধ হয় আর কোনোদিন এ বাড়িতে ফিরে আসব না।'

'সেই সম্ভাবনাই বেশি।'

'চলুন আমরা রওনা হই।'

'আমার হাত ধর।'

'ইরিনা তার হাত ধরল। লোকটি বিনা ভূমিকায় একটা হাসির গল্প শুরু করল। লোকটির গল্প বলার ঢং অত্যন্ত চমৎকার। ইচ্ছা না করলেও শুনতে হয়। একজন মানুষ কী করে হঠাৎ একদিন ছোট হতে শুরু করলো সেই গল্প। ছোট হতে হতে মানুষটা একটা পিঁপড়ের মতো হয়ে গেল। তার চিন্তা-ভাবনাও হয়ে গেল পিঁপড়ের মতো। বড়ো কিছু এখন সে আর ভাবতে পারে না।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। কনকনে বাতাস বইছে। একটা ভারি জ্যাকেট ইরিনার গায়ে। লাল রঙের মাফলারে কান ঢাকা, তবু তার শীত করছে। রাস্তাঘাটে লোকজন দ্রুত কমছে। রাত আটটার ভেতর একটি লোকও থাকবে না। থাকার নিয়ম নেই। ফেডারেল আইন। বেরুতে হলে কমিউন থেকে পাস নিতে হয়। সেই পাস কখনো পাওয়া যায় না। রাতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে ডাক্তার এসে চিকিৎসা করেন, তাকে হাসপাতালে যেতে হয় না। তবু মাঝেমধ্যে কেউ কেউ বের হয়। তারা আর ফিরে আসে না। কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে ?

'তোমার শীত লাগছে ইরিনা ?'

'না।'

'তুমি কিন্তু কাঁপছ ?'

'আমার শীত লাগছে না।'

'তুমি কিন্তু এখনো আমার নাম জানতে চাও নি।'

'আপনার নাম দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'তা খুবই ঠিক। তোমার বয়স কত ইরিনা ?'

'ইন্টলিজেন্সের লোক যখন কারো কাছে আসে, তখন তার নাম এবং বয়স জেনেই আসে।'

'ঠিক। খুবই সত্যি কথা। তোমার বয়স এপ্রিলের তিন তারিখে আঠার হবে।'

ইরিনা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি আর কী কী জানেন আমার সম্বন্ধে ?'

'তুমি লাল ও বেগুনি— এই দুটি রঙ খুব পছন্দ কর। তোমার কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তোমার পছন্দের বিষয় হচ্ছে প্রাচীন ইতিহাস। তুমি এই বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছ। তুমি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে এবং তুমি...'

'থাক, আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

লোকটি হাসতে লাগল। যেন বেশ মজা পেয়েছে। সিকিউরিটির একটি গাড়ি তাদের সামনে এসে থামল, কিন্তু লোকটির হাসি বন্ধ হল না। গাড়ি থেকে দু'জন অফিসার লাফিয়ে নামল। দু'জনের চেহারাই সুন্দর। চকলেট রঙের ইউনিফর্মেও তাদের ভালো লাগছে।

'আপনাদের সন্ধ্য পাস দেখতে চাই।'

'এখনই সন্ধ্য পাস দেখতে চান ? আটটা এখনো বাজে নি। আটটা বাজতে দিন।'

অফিসার দু'জনে মুখ কঠোর হয়ে গেল। সে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। সঙ্গী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'যা করতে বলা হয়েছে, করুন।'

ইরিনা দেখল ইন্টেলিজেন্সের লোকটি ওদের দু'জনকে কী যেন দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার দু'জনেই হকচকিয়ে গেল। এক জনের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। সে টেনে টেনে বলল, 'স্যার, আপনারা কোথায় যাবেন বলুন, আমরা পৌঁছে দেব।

'আমার হাঁটতে ভালো লাগছে।'

'তাহলে আমরা কি আপনার পেছনে পেছনে আসব ?'

'তারও কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

ইরিনা লক্ষ করল, লোক দুটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যেন তারা চোখের সামনে ভূত দেখছে। একজন পকেট থেকে রুমাল বের করে এই শীতেও কপালেরর ঘাম মুছল। ইরিনা অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর পেছন ফিরে দেখল, অফিসার দু'জন তখনো দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাদের দেখছে। একজন ওয়াকিটকি বের করে কী যেন বলছে। সম্ভবত তাদের কথাই বলছে। কারণ এরপর বেশ কিছু সিকিউরিটির লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। তারা কেউ কোনো প্রশ্ন করল না। স্যালিউট দিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল। ইরিনার সঙ্গের লোকটি প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলল। যেমন—

'কি, তোমরা ভালো ? আজ বেশ শীত পড়েছে মনে হয়। আবহাওয়ার প্যাটার্ন বদলে যাচ্ছে, তাই না ?'

এরা এইসব কথাবার্তার উত্তরে কিছু বলছে না। শুধু মাথা নাড়ছে। যেন কথা বলাই একটা ধৃষ্টতা। ইরিনা একসময় বলল, 'ওরা আপনাকে দেখে এরকম করছে কেন ?'

'তোমাকে তো বলেছি আমি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।'

'আপনার কী নাম ?'

'তুমি একটু আগেই বলেছ, আমার নাম জানতে তুমি আগ্রহী নও। কি বল নি এমন কথা ?'

'বলেছি।'

'এখন কেন নাম জানতে চাও ?'

www.BDeBooks.Com

'আপনার যদি ইচ্ছা হয় বলতে পারেন।'

'ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, তুমি জানতে চাও কিনা সেটা বল।'

'না থাক, আমি জানতে চাই না।'

'আমার নাম অরচ লীওন।'

'ইরিনা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। 'অরচ লীওন' হচ্ছেন গ্যালাকটিক ইন্টেলিজেন্সের প্রধান। তাঁর নাম না জানার কোনো কারণ নেই। এরকম একজন মানুষ তার মতো সাধারণ একটি মেয়েকে নিতে এসেছেন, কেন ?

'ইরিনা, তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?'

'না, কষ্ট হচ্ছে না।'

'শীল লাগছে, তাই না ?'

'জ্বি লাগছে।'

'এই তো এসে পড়েছি। ট্রেনে উঠলেই দেখবে ভালো লাগছে।'

'ভালো লাগলেই ভালো।'

'আর একটা গল্প বলব, শুনবে ?'

'বলুন।'

তারা শহরের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছে। স্টেশনের লাল বাতি দেখা যাচ্ছে। বাতি জ্বলছে ও নিভছে। চারদিকে নীরব-নিস্তব্ধ। কুয়াশা ঘন হয়ে পড়েছ। ইরিনা ফিসফিস করে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনো দিন ফিরে আসব না।'

২

ট্রেন ছুটে চলেছে।

গতি একশ' কিলোমিটারের কাছাকাছি। আলট্রাভায়োলেট প্রতিরোধী স্বচ্ছ কাচের জানালার পাশে ইরিনা বসে আছে। বাইরের পৃথিবীর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অরচ লীওন বললেন, 'তুমি বোধ হয় এই জীবনের প্রথম ট্রেনে চড়লে।'

'হ্যাঁ। আমি প্রথম শহরের মানুষ। ট্রেনে চড়ার সৌভাগ্য আমার হবে কেন ?'

'তা ঠিক। কেমন লাগছে তোমার ?'

'কোনোরকম লাগছে না।'

'জানালার পাশে বসে কিছুই দেখতে পাবে না। বাইরে আলো নেই। এখন কৃষ্ণপক্ষ। অবশ্যি চাঁদ থাকলেও কিছু দেখতে পেতে না, আমরা যাচ্ছি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে। আমাদের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সেটা খুব সুখকর দৃশ্য নয়। এই জন্যেই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে যেসব ট্রেন চলাচল করে, তা করে রাতে, যাতে আমাদের কিছু দেখতে না হয়।'

'আপনি শুধু শুধু কথা বলবেন না। আপনার কথা শুনতে ভালো লাগছে না।'

'খাবার দিতে বলি ?'

'না।'

'কিছু খাবে না?'

'না, আমার খিদে নেই।'

'আমার খিদে পেয়েছে। আমি খাবার গাড়িতে যাচ্ছি। তুমি যদি মত বদলাও তাহলে চলে এস। করিডোর ধরে আসবে, সবচে শেষের কামরাটি খাবার ঘর। রোবট এ্যাটেনডেন্ট আছে। ওদের বললে ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

ইরিনা যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই বসে রইল। তাদের কামরায় টিভি স্ক্রীনে ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দিয়ে একটি অনুষ্ঠান প্রচার করছে। অন্য সময় খুব আগ্রহ নিয়ে সে শুনতে, আজ শুনতে ইচ্ছে করছে না। কিভাবে টিভি সেটটি বন্ধ করা যায়, তাও তার জানা নেই। বাধ্য হয়ে শুনতে হচ্ছে। কী হবে শুনে। এর সবই তার জানা। ইতিহাসের ক্লাসে সে পড়েছে। খুব আগ্রহ নিয়েই পড়েছে। টিভির লোকটি বলছে খুব সুন্দর করে। আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠ। যেন ধ্বংস হবার ঘটনাটি সে প্রত্যক্ষ করছে।

"বন্ধুগণ। ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে আজ আপনারা যারা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছেন, তাঁদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে চারশ' বছর আগে এখানে কোলাহল মুখর জনপদ ছিল। অঞ্চলটিকে বলা হত এশিয়া মাইনর।"

'আজ থেকে চার শ' বছর আগে দু' হাজার পাঁচ সালে পৃথিবী নামে আমাদের এই সুন্দর গ্রহটিতে নেমে এল ভয়াবহ দুর্যোগ, আণবিক যুগের শুরুতেই যে দুর্যোগের আশঙ্কা সবাই করছিল। শান্তিকামী মানুষ ভাবত, একসময় না একসময় আণবিক যুদ্ধ শুরু হবে। সেটিই হবে মানব জাতির শেষ দিন। দু' হাজার পাঁচ সালে তাঁদের আশঙ্কাই সত্যি হল। তবে তাঁরা যেভাবে ভেবেছিলেন, সেভাবে নয়। মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধ হল না। কোনো এক অজানা কারণে জমা করে রাখা আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ শুরু হল। হাজার হাজার বছরের সভ্যতা ধ্বংস হতে সময় লাগল মাত্র এগার মিনিট।

'ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তী বছরকে বলা হয় অন্ধকার বছর। কারণ সে-বছর সূর্যের কোনো আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছল না। ধূলা-বালি, আণবিক ভস্ম সূর্যকে আড়াল করে রাখল। কাজেই ধ্বংস হল সবুজ গাছপালা। সবুজ গাছপালার উপর নির্ভরশীল জীবজন্তু। পরবর্তী এক শ' বছরের তেমন কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি অসম্ভব জীবনীশক্তি নিয়ে কিছু কিছু মানুষ বেঁচে রইল। তারা শুরু করল নতুন ধরনের জীবন-ব্যবস্থা। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা। মানুষের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করতে, সীমিত সম্পদের মধ্যেও তাদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার কোনো উপায় ছিল না।'

'প্রিয় বন্ধুগণ, এখন আপনাদের দু' হাজার পাঁচ সালে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণগুলো সম্পর্কে বলছি। এই কারণগুলোর কোনোটিই

www.BDeBooks.Com

প্রমাণিত নয়। সবই অনুমান। প্রথম বলছি মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত হাইপোথিসিস। '

'এই পর্যায়ে টিভি পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল। পরক্ষণেই সেখানে ভেসে উঠল অরচ লীওনের মুখ।

'ইরিনা। এই ইরিনা।'

'বলুন।'

'একা-একা খেতে ভালো লাগছে না, তুমি চলে এস।'

'বললাম তো আমার খিদে নেই।'

'খিদে না লাগলে খাবে না। বসবে আমার সামনে। কিছু জরুরি কথা তোমাকে বলব।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'সামনাসামনি বসে বলতে চাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই সম্পর্কে তোমাকে কিছু ধারণা দেব।'

'অনেক বার আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, তখন তো কিছু বলেন নি।'

'এখন বলব। সব সময় সব কথা বলা যায় না। চলে এস। দেরি করো না।'

টিভি পর্দায় আবার সেই আগের লোকটির মুখ ভেসে উঠল। সে একটি বোর্ডে কি-সব আঁকছে এবং একঘেয়ে স্বরে বলছে— "মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে পৃথিবীতে আসে ওজোন স্তর ভেদ করে। ওজোন স্তর হচ্ছে মূলত অক্সিজেনের একটি রূপান্তরিত অণুর হালকা আস্তর। এই অণুগুলোর প্রতিটিতে আছে তিনটি করে অক্সিজেন পরমাণু— ।"

লোকটির কথা খুব একঘেয়ে লাগছে। ইরিনা উঠে পড়ল। সে খাবার গাড়িতেই যাবে। করিডোরে এ্যাটেনডেন্ট রোবট বলল, 'ইরিনা, তুমি কোথায় যাবে?'

ইরিনা মোটেই চমকাল না। এই রোবটের কাজই হচ্ছে, ট্রেনের সব ক'জন যাত্রীর খোঁজখবর রাখা। ইরিনা বলল, 'খাবার গাড়িতে যাব।'

'আমি কি তোমার সঙ্গে যাব?'

'দরকার নেই।'

'তুমি মনে হচ্ছে ট্রেন ভ্রমণ ঠিক উপভোগ করছ না।'

'না, করছি না।'

'খুবই দুঃখিত হলাম। ট্রেনভ্রমণেকে আনন্দদায়ক করার জন্য আমি কি কিছু করতে পারি?'

'না।'

রোবটটি সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ইরিনার অস্বস্তি লাগছে। একটা যন্ত্র যখন মানুষের মতো কথা বলে, মানুষের মতো ভাবে, তখন অস্বস্তি লাগে।

'ইরিনা, তুমি কি প্রথম শহরের নাগরিক?'

'হ্যাঁ, আমি প্রথম শহরের।'

'তোমাকে অভিনন্দন। খুব অল্প বয়সেই তুমি দ্বিতীয় শহরে ঢোকার অনুমতি পেয়েছ।'

'অভিনন্দনের জন্যে ধন্যবাদ। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছ কেন?'

'একটি কথা বলবার জন্যে আসছি। আমার মনে হয় কথাটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে।'

'বল শুনছি।'

'তুমি অত্যন্ত রূপবতী।'

'ইরিনা শান্তস্বরে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'আমি তোমাকে নিয়ে চার লাইনের একটা কবিতা লিখেছি। আমি খুব খুশি হব, কবিতাটি তুমি যদি গ্রহণ কর।'

'বেশ তো, দাও।'

রোবটটি একটি কার্ড বাড়িয়ে দিল ইরিনার দিকে। তারপর বেশ লাজুক ভঙ্গিতেই তার জায়গায় ফিরে গেল। ইরিনা কবিতায় চোখ বুলাল—

"আদৌ প্রেমের প্রয়োজন আছে কিনা
নিশ্চিত আজো হয় নি আমার মন।
প্রেম থেকে তবু পৃথক করিয়া ঘৃণা
ভালোবাসিতেই চেয়েছি সর্বক্ষণ॥"

ইরিনা লক্ষ করল, তার মন ভালো হয়ে যাচ্ছে। একটু যেন খিদেও পাচ্ছে। হালকা ধরনের কোনো খাবার খাওয়া যেতে পারে।

ইরিনা নিঃশব্দে খাচ্ছে।

অরচ লীওন হাসিমুখে তা লক্ষ করছেন। তাঁর হাতে এক মগ ঝাঁঝালো ধরনের পানীয়, অবসাদ দূর করতে যার তুলনা নেই।

'ইরিনা।'

'বলুন।'

'এখানকার খাবারগুলো কেমন?'

'ভালো।'

'তোমাকে খানিকটা প্রফুল্ল লাগছে তার কারণ জানতে পারি কি?'

'কোনো কারণ নেই।'

'কারণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না ইরিনা। আমার মনে হয় ঐ রোবটটার সঙ্গে তোমার প্রফুল্লতার একটা সম্পর্ক আছে। ওর দায়িত্ব হচ্ছে ট্রেনযাত্রীদের সবাইকে প্রফুল্ল রাখা। ও প্রাণপণে সেই চেষ্টা করে। ওর নানান কায়দা-কানুনের আছে। তোমার বেলা নিশ্চয়ই সব কায়দা-কানুনের কোনো একটা খাটিয়েছে। তোমার বেলা কী করেছে? গান গেয়েছে না কবিতা লিখে দিয়েছে?'

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমি কোথায় যাচ্ছি?'

'খাওয়া শেষ কর, তারপর বলব।'

www.BDeBooks.Com

'আমি এখনি শুনতে চাই।'

'তুমি যাচ্ছ নিষিদ্ধ নগরীতে।'

ইরিনার গা দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। তার মনে হল, সে ভুল শুনছে। সে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। অরচ লীওন বললেন, 'তুমি যাচ্ছ "নিষিদ্ধ নারীতে"তে। আমি তোমাকে তৃতীয় নগরী পর্যন্ত নিয়ে যাব। সেখান থেকে রোবটবাহী বিশেষ বিমানে করে তুমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না, কারণ নিষিদ্ধ নগরীতে যাবার অনুমতি আমার নেই। ইরিনা, তুমি কি বুঝতে পারছ, তুমি কত ভাগ্যবতী ?'

'না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'গত চার শ' বছরে দশ থেকে বারো জন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়েছে।'

'তারা কেউ ফিরে আসে নি। কাজেই আমরা জানি না, তা সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য।'

'এই ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবীকে যারা আবার ঠিক করেছে, পৃথিবীর যাবতীয় শাসন-ব্যবস্থা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁদের চোখের সামনে দেখবে। হয়তো তাঁদের সঙ্গে কথা বলবে। এটা কি একটা বিরল সৌভাগ্য নয় ?'

'এত মানুষ থাকতে আমি কেন ?'

'তা তো জানি না। তবে বিশেষ কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। নিষিদ্ধ নগরীতে যাঁরা আছেন তাঁরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে জানেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমার ভেতর কিছু দেখেছেন।'

'আমার মধ্যে কিছুই নেই।'

'তুমি কি পানীয় কিছু খাবে ?'

'না।'

'তোমাকে সাহস দেবার জন্যে আরেকটি খবর দিতে পারি।'

'দিতে পারলে দিন।'

'নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি একা যাচ্ছ না, তোমার এক জন সঙ্গী আছে। এই প্রথম একসঙ্গে তোমরা দু'জন যাচ্ছ। এবং সবচে মজার ব্যাপার হচ্ছে, তোমার সেই সঙ্গী এই মুহূর্তে এই ট্রেনেই আছে। তুমি কি তার সঙ্গে আলাপ করতে চাও ?'

'চাই।'

'সে আছে ছ' নম্বর কামরায়। সে একা-একাই আছে। তুমি একাই যাও।'

'আপনি কি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন না ?'

'না। নিজেই পরিচয় করে নাও।'

ইরিনা উঠে দাঁড়াল। অরচ লীওন বললেন, 'আমি কি কোনো ধন্যবাদ পেতে পারি ?'

'আপনাকে ধন্যবাদ অরচ লীওন।'

'আরেকটি খবর তোমাকে দিতে পারি। এই খবরে তুমি আরো খুশি হবে।'

'ইরিনা উঠে দাঁড়িয়েছিল। এই কথায় আবার বসল। অরচ লীওন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন 'তোমার বাবা-মা ভালো আছেন। তাঁদেরকে দ্বিতীয় শহরের নাগরিক করা হয়েছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুমি টেলিফোন করে খোঁজ নিতে পার। ট্রেন থেকেই তা করা যাবে।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না। অরচ লীওন বললেন, 'তুমি কি খুশি ?'

'হ্যাঁ, আমি খুশি। এই খবরটি আপনি আমাকে শুরুতে বললেন না কেন ?'

'শুরুতে তোমাকে আমি ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি যাতে ভয়ে, দুঃখে, কষ্টে, তুমি অস্থির হয়ে যাও।'

'তাতে আপনার লাভ ?'

'লাভ অবশ্যই আছে। বিনা লাভে আমি কিছু করি না। শুরুতে প্রচণ্ড ভয় পেলে শেষের আনন্দের খবরগুলো খুব ভালো লাগে। তোমার এখন তাই লাগছে। তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছ। এখন আমি যদি তোমাকে কোনো অনুরোধ করি, তুমি তা রাখবে।'

'কী অনুরোধ করবেন ?'

'নিষিদ্ধ নগরীতে তুমি কী দেখলে, তা আমি জানতে চাই। কোনো-না-কোনো ব্যবস্থা করে তুমি আমাকে তা জানাবে।'

কেন জানতে চান ?'

'কৌতূহল। শুধুই কৌতূহল, আর কিছুই না। এস তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলা যাক।'

টেলিফোনে খুব সহজেই যোগাযোগ করা গেল। ইরিনার বাবা কথা বললেন। তাঁর গলায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। তিনি আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন, 'খুব বড় এটা খবর আছে মা, আমি এবং তোমার মা দু'জনই দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হয়েছে কাগজপত্র পেয়ে গেছি।'

'খুবই আনন্দের কথা বাবা।'

'তোর মা তো বিশ্বাসই করতে পারছে না। আনন্দে কাঁদছে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'আগামী কাল বাসায় একটা উৎসবের মতো হবে। পরিচিতরা সব আসবে। উৎসবের জন্যে পঞ্চাশ মুদ্রা পাওয়া গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। ঘর সাজাচ্ছি, আজ রাতে আর ঘুমাব না।'

ইরিনা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না ? আমি কোথায় আছি, কী করছি।'

'এ তো আমরা জানি। জিজ্ঞেস করব কি ?'

'কী জান ?'

www.BDeBooks.Com

'বিশেষ কাজে তোকে নেয়া হচ্ছে। কাজ শেষ হলে তোকেও আমাদের সঙ্গে থাকতে দেবে।'

'ইরিনা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা রেখে দিই।'

'তোর মা'র সঙ্গে কথা বলবি না।'

'না। বেচারী আনন্দে কাঁদছে, কাঁদুক। ভালো থেক তোমরা। শুভ রাত্রি।'

ইরিনা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বাবার ওপর সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না। প্রথম নাগরিক থেকে দ্বিতীয় নাগরিকের এই সৌভাগ্যে তাঁর বোধ হয় মাথাই এলোমেলো হয়ে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

নাগরিকত্বের তিনটি পর্যায় আছে। সবাইকেই এই তিনটি পর্যায়ের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রথম শহরের নাগরিকত্ব। সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ। মাঝখানে চল্লিশ মিনিটের ছুটি। সীমিত খাবার-দাবার। ছুটির দিনে সপ্তাহের রেশন নিয়ে আসতে হয়। এক সপ্তাহ আর কোনো খাবার নেই। সপ্তাহের রেশন কৃপণের মতো খরচ করতে হয়। খাবারের কষ্টই সবচে বড় কষ্ট। তারপর আছে নিয়ম-কানুন মেনে চলার কষ্ট। একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। কার্ডে লাল দাগ পড়ে যাবে। পনেরটি লাল দাগ পড়ে গেলে এ জীবনে আর দ্বিতীয় শহরে নাগরিক হওয়া যাবে না। সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করে কার্ডটি পরিষ্কার রাখতে। সম্ভব হয় না। যেসব ভাগ্যবান ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তা পারেন, তাঁরা দ্বিতীয় শহরের নাগরিক হিসেবে নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় শহরে প্রচুর খাবার-দাবার। ফেলে ছড়িয়ে খেয়েও শেষ করা যায় না। রেশনের ব্যবস্থা নেই। যার যা প্রয়োজন, বাজার থেকে কিনে আনবে। কাজ করতে হবে মাত্র ছয় ঘণ্টা। নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি এখানে নেই। বড় রকমের অপরাধের শাস্তি জরিমানা। বছরে এক মাস দেয়া হয় ভ্রমণ, পাস। সেই পাস নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ান যায়। একটি টাকাও খরচ হয় না। আর উৎসব তো লেগেই আছে। দ্বিতীয় শহরের জীবনে ক্লান্তি বা অবসাদ বলে কিছু নেই। এই শহরের নাগরিকরা দুঃখ ব্যাপারটা কি জানেই না, এরা শুধু স্বপ্ন দেখে তৃতীয় শহরের। কুড়ি বছর দ্বিতীয় শহরে বাস করতে পারলেই তৃতীয় শহরে যাবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু সবাই যেতে পারে না। ভাগ্যবানদের ঠিক করা হয় লটারির মাধ্যমে। লটারিটা হয় বছরের শেষ দিনে। প্রচণ্ড আনন্দ ও উত্তেজনার একটি দিন। এক দল নির্বাচিত হন তৃতীয় শহরের জন্যে, তাঁদের ঘিরে সারারাত আনন্দ-উল্লাস চলে।

যাঁরা নির্বাচিত হন না, তাঁরাও খুব একটা মন খারাপ করেন না। পরের বছর আবার লটারি হবে। সেই আশায় বুক বাঁধেন।

তৃতীয় শহরের সুখ-সুবিধা কেমন, সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দ্বিতীয় শহরের নাগরিকদেরও নেই। তাঁরা শুধু জানেন, তৃতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গপুরী। চির অবসর ও চির আনন্দের স্থান। সবাই ভাবেন— মৃত্যুর আগে একবার যেন তৃতীয় শহরে ঢুকতে পারি।

ইরিনা ছয় নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। কলিং বেল থাকা সত্ত্বেও সে দরজায় মৃদু টোকা দিল। ভেতর থেকে একজন কে শিশুর মতো গলায় বলল, 'কে ?'

'আমি ইরিনা। আপনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই।'

'এখন তো কথা বলতে পারব না। আমি এখন ঘুমুব।'

'প্লীজ, একটু দরজা খুলুন। আমার খুব দরকার।'

দরজা খুলে গেল। অসম্ভব রোগা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মোটা কাচের চশমা। লোকটি রুক্ষ গলায় বলল, 'তুমি কী চাও ?'

ইরিনা তার জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। লোকটি অবাক হয়ে তাকে দেখছে।

ট্রেনের গতিবেগ ক্রমেই বাড়ছে। বাতাসে শিসের মতো শব্দ হচ্ছে। এমন প্রচণ্ড গতি, যেন এই ট্রেন এক্ষুণি মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে যাবে। ইরিনা বলল, 'আমি কি বসতে পারি ?'

৩

ছেলেটি হাবাগোবার মতো। কিছু কিছু বয়স্ক মানুষ আছে, যাদের দেখলেই মনে হয় এরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা হাস্যকর কিছু করবে। এবং এটা যে হাস্যকর, তা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাবে। একেও সে রকম লাগছে। মোটা ফ্রেমের চশমা। সেই চশমা নাকের ডগায় চলে এসেছে। দেখতে অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে চশমা এই বুঝি খুলে পড়ল।

'আমি কি আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি ?'

ছেলেটি বিরক্তি স্বরে বলল, 'একবার তো বললাম আমি ঘুমুব।'

'আপনার ঘুম এতই জরুরি ?'

'ঘুম জরুরি না! ঠিক সময়ে ঘুমুতে যাওয়া উচিত এবং ঠিক সময়ে ঘুম থেকে ওঠা উচিত।'

'আজ না হয় একটু ব্যতিক্রম হল। বসব ?'

'আমি 'না' বললে কি তুমি শুনবে ?'

ছেলেটির মুখে 'তুমি' শব্দটি খুব স্বাভাবিক শোনাল। খট করে কানে বাজল না। যেন এ অনেকদিন থেকেই ইরিনাকে চেনে, তুমি করে ডাকে।

'জরুরী কথাটি কি ?'

'আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমিও সেখানে যাচ্ছি। আমি নিষিদ্ধ নগরীতে যাচ্ছি।'

ছেলেটি অবাক হয়ে বলল, 'এটা এমন কি জরুরি কথা!'

'আপনার কাছে খুব জরুরি মনে হচ্ছে না ?'

'না তো!'

www.BDeBooks.Com

'আপনি খুবই বোকা।'

'তা ঠিক না। আমি বোকা হব কেন ? আমার অনেক বুদ্ধি। এই জন্যেই তো আমাকে "নিষিদ্ধ নগরী"তে নিয়ে যাচ্ছে। আমি বোকা হলে আমাকে নিয়ে যেত ?'

ইরিনার ইচ্ছে হল উঠে চলে যেতে। যাবার আগে এই হাঁদারামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে।

ছেলেটি বেশ অবাক হয়েই বলল, 'একি খুকী, আমার যে বুদ্ধি আছে, এটা তুমি বিশ্বাস করছ না কেন ?'

'কোনো বুদ্ধিমান লোক কখনো বলে না, আমার খুব বুদ্ধি। শুধুমাত্র হাঁদারাই সে রকম বলে।'

'একজন বুদ্ধিমান লোক যদি বলে আমার খুব বুদ্ধি, তাতে দোষের কি ?'

'না, কোনো দোষ নেই, আপনি যত ইচ্ছা বলুন। আর দয়া করে আমাকে তুমি তুমি করে বলবেন না।'

ইরিনা সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়াল। ছেলেটি দুঃখিত স্বরে বলল, 'তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ, এই জন্যে আমার খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর নি। আমি প্রমাণ করে দেব যে আমার বুদ্ধি আছে ?'

'আপনাকে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।'

'না না শোন, শুনে যাও। আমার সম্পর্কে তোমার একটা ভুল ধারণা থাকবে, এটা ঠিক না। আমি এই ঘণ্টাখানেক আগে কী করে একটা বুদ্ধিমান রোবটকে বোকা বানালাম এটা শোন।'

'ইরিনা কৌতূহল হয়ে তাকাচ্ছে। ছেলেটি খুব উৎসাহের সঙ্গে বলছে, 'ট্রেনে একটা রোবট আছে দেখ নি ? ব্যাটা আমার সাথে রসিকতা করবার চেষ্টা করছিল, আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করল।'

'আর আপনি চট করে জবাব দিয়ে দিলেন ?'

'না। আমি উল্টো তাকে একটা এমন ধাঁধা দিলাম ব্যাটার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়।'

'কি ধাঁধা ?'

'আমি বললাম, একটা সাপ হঠাৎ তার নিজের লেজটা গিলতে শুরু করল। পুরোপুরি যখন গিলে ফেলবে, তখন কী হবে ? রোবটটার আক্কেল গুড়ুম। ভেবে পাচ্ছে না কী হবে। একবার বলছে সাপটা অদৃশ্য হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলছে, তা কি করে হয় ?'

'এই আপনার বুদ্ধির নমুনা ?'

'হ্যাঁ। দ্বৈত সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছি মাথায়। একটা রোবটকে বোকা বানানোর এই বুদ্ধি কি তোমার মাথায় আসত ?'

'না, আসত না।'

'তাহলে তোমার কি মনে হয়, আমি বুদ্ধিমান ?'

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছা হল বলে, 'আপনি এর কোনোটাই না, আপনি পাগল।' তা বলা গেল না।

'তোমার নামটা যেন কি ? আমাকে কি আগে বলেছিলে, না বল নি ?'

'আমার নাম ইরিনা। শুরুতেই একবার বলেছি।'

'আমার নাম জানতে চাও ?'

'আপনি ঘুমুতে চাচ্ছিলেন— ঘুমান। আমি এখন যাব।'

'আমার ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে। একবার ঘুম নষ্ট হলে অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। শোন আমার নাম অখুন-মীর। তুমি আমাকে মীর ডাকবে। আমার বন্ধুরা আমাকে মীর ডাকে। মীর উচ্চারণটা হবে একটু টেনে টেনে 'ম ীীীী র'-এ রকম বুঝতে পারলে ?'

'পারলাম।'

'বস এখানে।'

ইরিনা বসল। কেন বসল নিজেই জানে না। বসার তার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না।

'শোন ইরিনা, নিষিদ্ধ নগরীতে যেতে হচ্ছে বলে তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন ? আমাদের ওদের প্রয়োজন বলেই নিয়ে যাচ্ছে। শাস্তি দেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই নিচ্ছে না। শাস্তি দেবার হলে হলে প্রথম শহরেই দিতে পারত। পারত না ?'

'হ্যাঁ পারত।'

'আমাদের যে-কোনো কারণেই হোক ওদের প্রয়োজন।'

'ইরিনা বলল, 'ওরা মানে কারা ?'

মীর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল। যেন প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাবছে, উত্তরটা মাথায় এলেই বলবে। বসে আছে তো বসে আছে। ইরিনার ক্ষীণ সন্দেহ হল, লোকটি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। গাড়ির ঢুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষটাকে। কুঁজো হয়ে বসেছে। থুতনিটা ওপরের দিকে তোলা। হাত দুটি এলিয়ে দিয়েছে।

'আপনি কি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?'

'না। ভাবছি।'

'ভেবে কিছু পেলেন ? আপনি তো বুদ্ধিমান লোক, পাওয়া উচিত।'

'তা উচিত, কিন্তু পাচ্ছি না। নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।'

'কেন জানি না ?'

'এই জিনিসটা নিয়েই আমি ভাবছিলাম। কেন জানি না ?'

'ভেবে কিছু বের করতে পারলেন ?'

'না। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আমরা আসলে কিছুই জানি না। আমাদের যখন অসুখ হয়, একজন রোবট ডাক্তার এসে আমাদের চিকিৎসা করে। কেন আমাদের অসুখ হয়, কিভাবে আমাদের অসুখ সারানো হয়— তার

www.BDeBooks.Com

কিছুই আমরা জনি না। কোনো যন্ত্রপাতি যখন নষ্ট হয়, একজন রোবট এসে তা ঠিক করে। যন্ত্রপাতিগুলো কী ? কিভাবে কাজ করে-তাও আমরা জানি না। এখন কথা হল, কেন জানি না।'

'কেন ?'

'কারণ আমাদের জানতে দেয়া হয় না। আমরা স্কুলে পড়াশোনা করি। কী পড়ি ? লিখতে পড়তে শিখি। সামান্য অঙ্ক শিখি। প্রথম শহরে বিধিগুলো মুখস্থ করি। ব্যাস, এই পর্যন্তই। তাই না ?'

'হ্যাঁ তাই।'

'বুঝলে ইরিনা, আমি একবার আমার স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— স্যার টেলিফোন কিভাবে কাজ করে ? স্যার অবাক হয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'টেলিফোন তৈরি করা হয়েছে মানুষের সেবার জন্যে। তৈরি হয়েছে নিষিদ্ধ নগরে। নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল সপ্তম বিধি অনুসারে একটা প্রথম শ্রেণীর অপরাধ। তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করেছ।' এই বলে তিনি আমার কার্ডে একটা দাগ দিয়ে দিলেন। হা হা হা।'

ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'হাসছেন কেন ? এটা কি হাসার মতো কোনো ঘটনা ? কার্ডে দাগ পড়া তো খুবই কষ্টের ব্যাপার। পনেরটার বেশি দাগ পড়লে আপনি কখনো দ্বিতীয় শহরে যেতে পারবেন না।'

'এই জন্যেই তো হাসছি। আমার কার্ডে মোট দাগ পড়েছে তেতাল্লিশটি। স্কুলে সবাই আমাকে কি বলে জান ? সবাই বলে মিস্টার তেতাল্লিশ ?'

'বিধি ভাঙাই বুঝি আপনার স্বভাব ?'

'না, তা না। আমার স্বভাবের মধ্যে আছে কৌতূহল। আমি কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করি। একবার কি করেছিলাম জান ? পানি গরম করার একটা যন্ত্র খুলে ফেলেছিলাম।'

'কি বলছেন আপনি!'

'হ্যাঁ সত্যি। প্রথম খুব ভয় লাগল। কত বিচিত্র সব জিনিস। একটা চাকতি নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। তিন বার ঘুরবার পর অন্য একটা বলের মতো জিনিস চলে আসে সেটা খুব গরম।'

'আপনি হাত দিয়েছিলেন!'

'হাত না দিলে বুঝব কি করে এটা গরম না ঠাণ্ডা।'

'এর জন্যে আপনার কী শাস্তি হল ?'

'কোনো শাস্তি হল না।'

'শাস্তি হল না কেন ?'

'শাস্তি হল না কারণ আমি আবার তা লাগিয়ে ফেলেছিলাম।'

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কীভাবে লাগালেন ?'

'যেভাবে খুলেছিলাম সেভাবে লাগালাম।'

'বলেন কি আপনি!'

'এসব কাজ শুধু রোবটরা পারবে, আমরা পারব না, তা ঠিক না। আমাদের শেখালে আমরাও পারব। কিন্তু আমাদের কেউ শেখাচ্ছে না। এবং নানারকম বিধি-নিষেধ দিয়ে দিয়েছে যাতে আমরা শিখতে না পারি। যেন আমরা এসব শিখে ফেললে কোনো বড় সমস্যা হবে।'

'এই হাবাগোবা ধরনের মানুষটির প্রতি ইরিনার শ্রদ্ধা হচ্ছে, এ আসলেই বুদ্ধিমান। সবাই যেভাবে একটা জিনিসকে দেখে, এ সেভাবে দেখছে না। অন্যরকম করে দেখছে। সেই দেখার সবটাই যে ভুল, তাও না।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তুমি কি লক্ষ করেছ এই রোবটগুলো শুধু দিনে কাজ করে, রাতে কিছু করে না?'

'না, আমি সেভাবে লক্ষ করি নি।'

'এরা দিনে কাজ করে। যখন এদের কোনো কাজ থাকে না, তখন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে। এর মানে কি বলতো?'

'জানি না।'

'কাজ করবার জন্যে যে শক্তি লাগে তা তারা রোদ থেকে নেয়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। একার পরপর চারদিন ধরে খুব ঝড়বৃষ্টি হল। সূর্যের মুখ দেখা গেল না। তখন অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, রোবটগুলো কোনো কাজ করতে পারছে না।'

'কিন্তু কিছু কিছু রোবট তো রাতেও কাজ করে। যেমন ডাক্তার রোবট।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্যি করে।'

অখুন-মীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। যেন এই কথাটা তার খুব মনে লেগেছে। ডাক্তার রোবটরা রাতে কাজ না করলেই যেন সে বেশি খুশি হত। ইরিনা মানুষটিকে খুশি করার জন্যে বলল, 'হয়তো আপনি আপনার অনেক প্রশ্নের জবাব নিষিদ্ধ নগরীতে পেয়ে যাবেন। মীর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'জানি না। পাব বলে মনে হয় না। প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে চায় না। এবং মজার ব্যাপার কি জান ইরিনা, মানুষের মাথায় যেন এই জাতীয় কোনো প্রশ্ন না আসে সেই চেষ্টা করা হয়।'

'কিভাবে করা হয়?'

'কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে তাদের রাখা হয়। কোনোরকম অবসর নেই। মানুষ চিন্তাটা করবে কখন? খাবার টিকিট জোগাড় করার দুশ্চিন্তাতেই মানুষের সব সময় কেটে যায়। জীবন কাটিয়ে দিতে চায় কার্ডে কোনো দাগ না ফেলে। চিন্তার সময় কোথায়?'

www.BDeBooks.Com

'তবুও কেউ কেউ তো এর মধ্যেই চিন্তা করে।'

'হ্যাঁ তা করে। আমি করি। আমার মতো আরো কেউ কেউ হয়ত করে। এমন কাউকে যদি পেতাম, কত ভালো হত। কত কিছু জানার আছে।'

মীর হাই তুলল। ইরিনা বলল, 'আপনার কি ঘুম পাচ্ছে ?'

'হ্যাঁ পাচ্ছে।'

'আমি কি তাহলে চলে যাব ?'

'মীর হেসে ফেলে বলল, 'তোমার মনে হয় যেতে ইচ্ছা করছে না।'

ইরিনা লজ্জা পেয়ে গেল। তার সত্যি সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। এই অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে আরো কিছু সময় থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু এই লোকটা তা টের পাওয়ায় খুব অস্বস্তি লাগছে।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তুমি কি বিয়ের পারমিট পেয়েছ ?'

'না, পাই নি। আমার বয়স উনিশ, একুশের আগে তো পারমিট পাব না।'

'আমার তেত্রিশ। আমিও পাই নি। সম্ভবত আমাকে পারমিট দেবে না। এই ব্যাপারটাও কিন্তু রহস্যময়। ওরা যাকে ঠিক করে দেবে, তাকেই বিয়ে করতে হবে। এতে নাকি সুস্থ সুন্দর নীরোগ মানুষ তৈরি হবে। সুখী পৃথিবী।'

'আপনি তা বিশ্বাস করেন না ?'

'না, করি না। ওদের বেশির ভাগ কথাই বিশ্বাস করি না। আমি নিজের মতো চলতে চাই, নিজের মতো ভাবতে চাই। নিজের পছন্দের মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই।'

'এ রকম কোনো পছন্দের মেয়ে কি আপনার আছে ?'

'না নেই। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়। তবে তোমার মুখ গোলাকার। এ রকম মুখ আমার পছন্দ না।'

'আর আপনি বুঝি রাজপুত্র ?'

'কি মুশকিল, তুমি রাগ করছ কেন ? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এই খবরটা বললাম। এতে তো খুশি হবার কথা।'

'আপনাকেও তো আমার পছন্দ হতে হবে ? আপনার নিজের চেহারাটা কেমন আপনি জানেন ? আয়নায় কখনো নিজের মুখ দেখেছেন ?'

'খুব খারাপ ?'

'না, খুব ভালো। একেবারে রাজপুত্র।'

'এত রাগছ কেন তুমি ? তোমাকে আমার কিছুটা পছন্দ হয়েছে, এটা বললাম। আমাকে তোমার অপছন্দ হয়েছে, এটা তুমি বললে। ব্যাস, ফুরিয়ে গেল।'

'আমি এখন যাচ্ছি।'

'খুব ভালো কথা, যাও। শুভ রাত্রি।'

'শুভ রাত্রি।'

'শোন ইরিনা, এরকম রাগ করে চলে যাওয়াটা ঠিক না। যাবার আগে মিটমাট করে ফেলা যাক।'

'কিভবে মিটমাট করবেন?'

'চলো খাবার গাড়িতে যাই। চা-কফি বা অন্য কোন পানীয় খাওয়া যাক।'

'যাবে?'

'আমার ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলে থাক।'

'আচ্ছা ঠিক আছে চলুন।'

'ইচ্ছা করছে না তবু যেতে চাচ্ছ কেন?'

'ইচ্ছা না করলেও তো আমরা অনেক কিছু করি। যাকে সহ্য হয় না সরকারি নির্দেশে তাকে বিয়ে করি। ভালোবাসতে চেষ্টা করি।'

'তা করি। চল যাওয়া যাক।'

এ্যাটেনডেন্ট রোবটটির সঙ্গে করিডোরে দেখা হল। মীর হাসিমুখে বলল, 'কি ধাঁধাটি পারলে?'

'চেষ্টা করছি, তবে আমার মনে হচ্ছে আপনি একটি অবাস্তব সমস্যা দিয়েছেন। একটা সাপ নিজেকে পুরোপুরি গিলে ফেলবে কী করে?'

'বেশ, তাহলে একটা বাস্তব সমস্যা দিচ্ছি। একটি বস্তু এক সেকেন্ডে চার ফুট যায়। পরবর্তী সেকেন্ডে যায় দুই ফুট, তার পরবর্তী সেকেন্ডে এক ফুট। এভাবে অর্ধেক করে দূরত্ব কমতে থাকে। বিশ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে তার কত সময় লাগবে?'

রোবটটি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মীর বলল, 'তুমি একটি মহাগর্দভ। এই ধাঁধার সমাধান করা তোমার কর্ম না। যাও ভাগো।' ইরিনা খিলখিল করে হেসে উঠল। রোবটটির মনে হচ্ছে আত্মসম্মানে লেগেছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'চট করে তো আর সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আমাকে ভাববার সময় দিন'।

'সময় দেয়া হল। অনন্তকাল সময়। বসে বসে ভাব।'

দু'জন মুখোমুখি বসেছে।

মীর কোনো কথা বলছে না। কপাল কুঁচকে কি জানি ভাবছে। গাড়ির গতি আগের চেয়ে কম। বাইরে নিকষ অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় ধ্বংসস্তূপ মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে। বীভৎস দৃশ্য, তাকান যায় না।

ইরিনা লক্ষ করল অরচ লীওন ঠিক আগের জায়গায় বসে। তাঁর হাতে পানীয়ের গ্লাস। গ্লাসে গাঢ় সবুজ রঙের কি-একটা জিনিস— ক্রমাগত বুদবুদ উঠছে। অরচ লীওন তাকিয়ে আছেন তাঁর গ্লাসের দিকে। একবার ইরিনার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। তিনি এমনভাবে তাকালেন, যেন চিনতে পারছেন না।

www.BDeBooks.Com

ইরিনা মৃদু স্বরে মীরকে বলল, 'ঐ লোকটিকে কি আপনি চেনেন ?'

'কোন্ লোকটি ?'

'ঐ যে কোণার দিকে বসে আছে। তক্ষকের মতো চোখ।'

'চিনব না কেন ? উনি আমার বাবা।'

'কী বলছেন! আমি তো জানতাম উনি অবিবাহিত।'

'উনি আমার বাবা। ইন্টেলিজেন্সের সবচে বড়ো অফিসার। এরা হাসি মুখে রাতকে দিন করে। চেহারার মধ্যে তুমি মিল দেখছ না ? অবিবাহিত হবে কেন ?'

ইরিনা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মীর খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'বাবার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

'নেই কেন ?'

'আমার জন্মের দ্বিতীয় বছরে বাবাকে প্রথম শহর থেকে দ্বিতীয় শহরে নিয়ে যাওয়া হল। আমার যখন আঠার বছর বয়স, তখন জানলাম তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। তৃতীয় শহরের নাগরিক হয়ে বসেছেন।'

'আপনার খোঁজখবর করেন না ?'

'কী করে করবে, তৃতীয় শহরের নাগরিক না ? তৃতীয় শহরের নাগরিকেরা কি আর প্রথম শহরের কাউকে খুঁজতে পারে, আইনের বাধা আছে না ? তাছাড়া সে নিজেই হচ্ছে আইনের লোক।'

'আইনের লোক বলেই তো আইন ভাঙা সহজ।'

'তা ঠিক। সে আইন ভেঙেছে। আমার কার্ডে তেতাল্লিশটি দাগ পড়ার পরও কিন্তু আমি বেঁচে আছি। চল্লিশটি দাগ পড়ার পর সরকারি নিয়মে দোষী লোকটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। অবাঞ্ছিত কেউ বেঁচে থাকে না, অথচ আমি আছি। হা হা হা।'

মীর এত শব্দ করে হেসে উঠল যে লীওন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখলেন। তিনি বিরক্ত হয়েছেন কিনা তা বোঝা গেল না। তাঁর গ্লাসের পানীয় শেষ হয়ে গিয়েছিল, সুইচ টিপে তিনি আরো পানীয় আনতে বললেন।

ট্রেনের গতি আবার বাড়তে শুরু করেছে। বাইরে রীতিমতো ঝড় হচ্ছে। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে। বজ্রপাতের শব্দে কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা। ইরিনা লক্ষ করল মীর চোখ বন্ধ করে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে কিংবা কোনো কিছু নিয়ে ভাবছে। কি ভাবছে কে জানে।

ইরিনার এখন আর কেন জানি লোকটির চেহারা খারাপ লাগছে না। হয়তো চোখে সয়ে গেছে। ইরিনারও ঘুম পেয়ে গেল।

৪

চমৎকার সকাল।

সূর্যের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। আকাশের রঙ ঘন নীল। ছবির মতো সুন্দর একটি শহরে ট্রেন এসে থেমেছে। ট্রেন থেকে নেমে তারা একটি ছোট্ট

কাচের ঘরে ঢুকল। এখান থেকে চারদিক দেখা যায়। ইরিনা মুগ্ধ হয়ে গেল। কেউ তাকে বলে দেয় নি, কিন্তু সে বুঝতে পারছে এটা হচ্ছে তৃতীয় শহর। সুখের শহর, দুঃখ এখান থেকে নির্বাসিত। এর আকাশ-বাতাস পর্যন্ত অন্য রকম। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কী সুন্দর, কী সুন্দর!'

মীর তার পাশেই, সে কিছু বলল না। হাই তুলল। রাতে তার ঘুম ভালো হয় নি। ঘুমঘুম লাগছে। তৃতীয় নগরীর সৌন্দর্য তাকে স্পর্শ করছে না।

'ইরিনা বলল, 'এখন আমরা কোথায় যাব?'

'মীর হাই চাপতে চাপতে বলল, তুমি এত ব্যস্ত হলে কেন? ওরা ব্যবস্থা করে রেখেছে। যথাসময়ে কোথাও চাপাবে। যথাসময়ে পৌঁছবে।'

'হাতে কিছু সময় থাকলে শহরটা ঘুরে দেখতাম।'

'আমি দেখাদেখির মধ্যে নেই, তোমাকে যেতে হবে একা। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করছি। কোথাও যেতে চাইলে যাবে আমাকে জাগাবে না।'

মীর সত্যি সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করল। তারা বসে আছে ছোট্ট একটা ঘরে। এত ছোট যে হাত বাড়ালে দেয়াল এবং ছাদ দুই-ই ছোঁয়া যায়। এতটুকু ঘরেও চার-পাঁচটা চেয়ার সাজানো। তেমন কোনো আরামদায়ক কিছু নয়। ঘরের দেয়াল অতি স্বচ্ছ কাচ জাতীয় পদার্থের তৈরি। বাইরের সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। অরচ লীওন তাঁদের এখানে বসিয়ে রেখে উধাও হয়েছেন, আর কোনো খোঁজ নেই। ইরিনা একবার বেরুতে চেষ্টা করল। বেরুবার পথ পেল না। দরজা-টরজা এখন কিছুই নেই বলে মনে হচ্ছে। অথচ এই ঘরে ঢোকার সময় কোনো বাধা পাওয়া যায় নি।

'মীর, আপনি কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

'চেষ্টা করছি।'

'এটাকে কেমন যেন খাঁচার মতো মনে হচ্ছে। বেরুতে পারছি না।'

'বেরুবার দরকারটা কি?'

'ইরিনার অস্বস্তি লাগছে, এমন নির্জন জায়গা। আশেপাশে একটিও মানুষ নেই, অথচ বাইরের কত চমৎকার সব দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

'মীর, আপনি এরকম চোখ বন্ধ করে থাকবেন? আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'ভয় ভয় লাগার কারণ কি?'

'মানুষজন কিচ্ছু নেই।'

'মানুষজন ঠিকই আছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না। কাচের এই ঘরটায় বসে তুমি বাইরের যেসব দৃশ্য দেখছ, তা সত্যি নয়। বানান, মেকি।

'তার মানে!'

'তার মানে আমি জানি না। টেলিভিশনে যেমন ছবি দেখ, এখানেও তাই দেখছ। একটাও সত্যি নয়।'

'কি করে বুঝলেন?'

www.BDeBooks.Com

'খুব সহজেই বুঝলাম। আমরা ট্রেন থেকে নেমেছি ভোর হবার ঠিক আগে আগে। রোবটটি আমাকে বলল সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে ট্রেন পৌঁছবে। অথচ এই ঘরে বসে আমরা দেখছি সূর্য মাথার ওপরে।'

'তাই তো।'

'ইরিনা পরিষ্কার চোখে দেখার চেষ্টা কর এবং আমার মনে হয় এখন থেকে যা দেখবে তাই বিশ্বাস করার অভ্যাসটা ত্যাগ করলে ভালো হবে। এই দেখ আমাদের চারপাশে দৃশ্য এখন বদলে গেল।'

ইরিনা মুগ্ধ হয়ে দেখল সত্যি সত্যি সব বদলে গেছে। তাদের চারপাশে এখন ঘন নীল সমুদ্র, ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্রসারস উড়ছে। সমুদ্রের নীল পানিতে সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'অপূর্ব'!'

মীর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এটা যাত্রীদের বিশ্রামের কোনো জায়গা। অনেকক্ষণ যাদের অপেক্ষা করতে হয় তারা যাতে বিরক্ত না হয় সেই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।'

'সুন্দর ব্যবস্থা। আপনার কাছে সুন্দর লাগছে না ?'

'না। এর চেয়ে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আমি দেখি।'

'এটা তো আর স্বপ্ন নয়।'

'স্বপ্ন নয় তোমাকে বলল কে ? পুরোটাই স্বপ্ন। সুন্দর সুন্দর ছবি দেখছ, যার কোনো অস্তিত্ব নেই।'

ঘরের চারপাশের দৃশ্য আবার বদলে গেল। এখন দেখা যাচ্ছে চারপাশেই উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহরে চূড়ায় বরফ জমেছে। সূর্যের আলোয় সেই বরফ ঝিকমিক করছে। ইরিনা মুগ্ধ গলায় বলল, 'এবারের দৃশ্য আরো সুন্দর!'

বলতে বলতেই ছবি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। ইরিনার মনে হল ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। কানে ঝিঁঝি শব্দ। সে কোনোমতে বলল, 'এসব কী হচ্ছে ?'

মীর ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের যেখানে নেবার, সেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় নেবে। যেন...'

গভীর গাঢ় ঘুমে দু'জনেই তলিয়ে যাচ্ছে। ইরিনা প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেগে থাকতে। কিছুতেই পারছে না, চোখের সামনের আলো কমে কমে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। দূরে তীক্ষ্ম বাঁশির আওয়াজের মতো আওয়াজ। ইরিনা তার মা'কে ডাকতে চেষ্টা করল। পারল না। তার দু'চোখে অতলান্তিক ঘুম।

৫

ইরিনা জেগে উঠে দেখল একটি প্রকাণ্ড গোলাকৃতি ঘরের ঠিক মাঝখানে সে শুয়ে আছে। ঘরটি অদ্ভুত। চারদিকের দেয়াল থেকে অস্পষ্ট নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ছে, তাকালেই মন শান্ত হয়ে আসে। হালকা, প্রায় অস্পষ্ট সুর ভেসে

আসছে। খুব করুণ কোনো সুর। ইরিনার মনে হল সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন খুব বাস্তব মনে হয়। স্বপ্ন দেখার সময় মনেই হয় না এটা স্বপ্ন।

'ইরিনা তোমার ঘুম ভেঙেছে ?'

ইরিনা তাকাল। তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে প্রায় সাত ফুট উঁচু দৈত্যাকৃতির একটি এনারয়েড রোবট। এনারয়েড রোবট ইরিনা আগে দেখে নি। স্কুলে যান্ত্রিক মানব অংশে এনারয়েড রোবটির ওপারে একটা চ্যাপ্টার ছিল। সেখানে বলা হয়েছে— "এনারয়েড রোবট তৈরি হয় রিবো ত্রি সার্কিটে। আই সি পি পি ৩০০২৫। আই সি টেনার জংশন মুক্ত। সেই কারণেই এরা শুধু চিন্তাই করতে পারে না, উচ্চস্তরের লজিকও দেখাতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তির এরা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে যেহেতু এরা কর্মী রোবট নয়, সেহেতু এদের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।" এইটুকু পড়ে কিছু বোঝা যায় না। রিবো ত্রি সার্কিট কি, টেনার জংশনই বা কি ? কেউ জানে না। কে জানে হয়তো এককালে জানত। স্কুলের বইতে এনারয়েড রোবটের বেশ কিছু ছবি আছে। ইরিনার মনে আছে তারা এদের নাম দিয়েছিল দৈত্য রোবট। কী বিশাল শরীর, ছবি দেখলেই ভয় লাগে। কিন্তু আশ্চার্য, একে দেখে ভয় লাগছে না। এর গলার স্বর কোমল, মমতা মাখা।

'ইরিনা তোমার ঘুম ভেঙেছে ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ ভেঙেছে, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ?'

রোবটটি ঠিক মানুষের মতো হাসল। চট করে হাসি থামিয়ে বলল, 'কিছু একটা নিয়ে কথা শুরু করতে হবে তো, তাই জিজ্ঞেস করছি। তুমি এখন কেমন আছ ?'

'ভালো।'

'আমি কে তা জিজ্ঞেস করলে না।'

'তুমি একটি এনারয়েড রোবট।'

'চমৎকার! আমাকে দেখে ভয় লাগছে না তো আবার ?'

'না, ভয় লাগছে না। আমি কোথায় ?'

'তুমি আছ নিষিদ্ধ নগরীতে। তোমাকে কৃত্রিম উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হয়েছে।'

'ভালো কথা।'

'কি জন্যে ঘুম পাড়িয়ে এখানে আনা হল তা তো জিজ্ঞেস করলে না।'

'তোমাদের ইচ্ছা হয়েছে এনেছ।'

'তা কিন্তু নয়। তুমি এসেছ আকাশপথে। আকাশপথের বিমানগুলোর একটা সমস্যা আছে। অতিরিক্ত রকম দুলুনি হয়। চৌম্বক জ্বালানির এই একটা বড় অসুবিধা। উচ্চ কম্পনাঙ্কে প্লেন কাঁপে। মানুষের পক্ষে তা সহ্য করা মুশকিল। সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

'ঠিক আছে। এনেছ ভলো করেছ।'

'তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। আমি তোমার খাবারের ব্যবস্থা করছি।'

www.BDeBooks.Com

'আমি কিছুই খাব না।'

'তার কারণ জানতে পারি ?'

'খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে রাখার ব্যাপারটা হাস্যকর। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য প্রয়োজন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।'

রোবটাটি নিঃশব্দে চলে গেল। ইরিনা এই প্রথমবারের মতো লক্ষ করল রোবটটি গিয়েছে দেয়াল ভেদ করে। তার মানে এই অস্বচ্ছ দেয়াল কোনো কঠিন পদার্থের তৈরি নয়। বায়বীয় কোনো বস্তুর তৈরি। এ বস্তুর কথা ইরিনার জানা নেই। শুধু দেয়াল নয়, এই গোলাকার ঘরে এ রকম আরো জিনিস আছে, যা ইরিনা আগে কখনো দেখে নি বা বইপত্রে পড়ে নি। যেমন ঠিক তার মাথার ওপর বলের মতো একটা জিনিস ঝুলছে। ইরিনা বুঝতে পারছে, এই জিনিসটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে। সে যখন নড়াচড়া করে, এটিও নড়াচড়া করে। সে যখন একদৃষ্টিতে তাকায় তখন বস্তুটির ঘূর্ণন পুরোপুরি থেমে যায়। একবার ইরিনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল, অমনি জিনিসটা অনেকখানি নিচে নেমে প্রবল বেগে ঘুরতে লাগল। নিঃশ্বাস নেয়া শুরু করতেই সেটি আবার উঠে গেল আগের জায়গায়।

'ইরিনা, তোমার জন্যে খাবার এনেছি।'

রোবটটির চলাফেরা নিঃশব্দ, কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কে জানে। ইরিনা বলল, 'আমি তো বলেছি কিছু খাব না।'

'খাবে বৈকি। প্রথমে কফির কাপে চুমুক দাও। সত্যিকার কফি, বীনের কফি। সিনথেটিক কফি নয়। তোমার ভালো লাগবে। লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুমুক দাও।'

ইরিনা নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে কফি নিল। তার কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবু জিজ্ঞেস করল, 'আমার মাথার ওপর যে যন্ত্রটা ঘুরছে, সেটা কি ?'

'ওটা একটা 'মনিটর'। তোমার যাবতীয় শারীরিক ব্যাপার মনিটর করা হচ্ছে। রক্তচাপ, রক্তের শর্করার পরিমাণ, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, নিও ফ্রিকোয়েন্স— সবকিছুই মাপা হচ্ছে।

কফি এমন কিছু আহামরি নয়। কেউ বলে না দিলে বোঝাই মুশকিল এটা সিনথেটিক কফি নয়। এই কফির একমাত্র বিশেষত্ব হচ্ছে, এর মধ্যে এক ধরনের আঠালো ভাব আছে, সিনথেটিক কফিতে যা নেই।

'এই কফি কি তোমার ভালো লাগছে ইরিনা ?'

'না, ভালো লাগছে না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন— মীর উনি কোথায় ?'

'সে-ও ঠিক এরকম অন্য একটি ঘরে আছে। তাকে সঙ্গ দিচ্ছে আমার মতোই একটি এনারোবিক রোবট।'

'এখান থেকে আমরা কোথায় যাব ?'

‘কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে।’

‘তার মানে কত দিন থাকব এখানে ?’

‘যত দিন তোমার ডাক না পড়ে।’

‘কে ডাকবে আমাকে ?’

‘নিষিদ্ধ নগরীর প্রধানেরা। যাঁরা নিষিদ্ধ নগরী চালাচ্ছেন। যারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছেন।’

‘তাঁরা কারা ?’

‘তাঁরা তোমার মতোই মানুষ। এই পৃথিবীতেই তাঁদের জন্ম।’

ইরিনা বিস্মিত হয়ে বলল, ‘মানুষ!’

‘হ্যাঁ, মানুষ। তুমি কি ভেবেছিলে অন্যকিছু ? এই পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান কোনো প্রাণের সৃষ্টি হয় নি।’

‘তাহলে মানুষরাই নিষিদ্ধ নগরীর পরিচালক ?’

‘হ্যাঁ। তবে তাঁদের সঙ্গে তোমাদের সামান্য প্রভেদ আছে। তাঁরা অমর। তোমাদের মৃত্যু আছে, তাঁদের মৃত্যু নেই।’

‘তুমি এসব কী বলছ!’

‘আমি ঠিকই বলছি। মৃত্যু এইসব মানুষদের কখনো স্পর্শ করে না। করবেও না।’

‘তোমার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।’

‘বিশ্বাস করার চেষ্টা কারই ভালো। তুমি কি তোমার স্কুলের বইতে পড়নি রোবটারা মিথ্যা বলতে পারে না। তাদের সে রকম করে তৈরি করা হয় নি।’

ইরিনা কফির কাফ নামিয়ে রেখে আগ্রহের সঙ্গে খাবার খেতে শুরু করল। সবই তরল এবং জেলি জাতীয় খাবার। ঝাঁঝালো ভাব আছে, তবে খেতে চমৎকার।

রোবটটি বলল, ‘খেতে ভালো লাগছে ?’

‘হ্যাঁ লাগছে।’

‘তোমার শরীরে প্রয়োজন এবং রুচি— এই দুটি জিনিসের ওপর লক্ষ রেখে খাবার তৈরি হয়েছে। তোমার খারাপ লাগবে না।

ইরিনা বলল, ‘নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি, তুমি তার জবাব দিচ্ছ।’

‘জবাব দিচ্ছি, কারণ তুমি নিষিদ্ধ নগরীতেই আছ। তোমার জন্যে নিষিদ্ধ নয়। কারণ তুমি এসব প্রশ্নের জবাব কখনো প্রথম শহরে পৌঁছে দিতে পারবে না। বাকি জীবনটা তোমার এ জায়গাতেই কাটবে।’

‘তাই বুঝি ?’

‘হ্যাঁ তাই।’

‘নিষিদ্ধ নগরীর মানুষরা কত দিন ধরে বেঁচে আছেন ?’

‘পাঁচশ’ বছরের মতো। তাঁদের জন্ম হয়েছে ধ্বংসযজ্ঞের আগে।’

www.BDeBooks.Com

'তাঁরা অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ থাকবেন।'

'তাঁরা আমাকে কখন ডেকে পাঠাবেন ?'

'তা তো বলতে পারছি না। হয়তো আগামীকালই ডেকে পাঠাবেন। হয়তো দশ বছর পর ডাকবেন। সময় তাঁদের কাছে কোনো সমস্যা নয় বুঝতেই পারছ।'

'তাঁরা যদি দশ বছর পর ডাকেন, এই দশ বছর আমি কী করব ?'

'অপেক্ষা করবে।'

'কোথায় অপেক্ষা করব ?'

'এইখানে। এই ঘরে।'

'তুমি কী পাগলের মতো কথা বলছ! আমি এই জায়গায় দশ বছর অপেক্ষা করব ?'

'আরো বেশিও হতে পারে। সময় তোমার কাছে একটা সমস্যা, তাঁদের কাছে কোন সমস্যা নয়। তবে ভয় পেও না, তোমার সময় কাটানোর ব্যবস্থা আমি করব। খেলাধুলা, গান-বাজনা, বইপত্র— সব ব্যবস্থা থাকবে।'

ইরিনার শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। কি বলছে ও! এ তো অসম্ভব কথা। রোবটটি তার যান্ত্রিক মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'তোমার যখন নেহায়েত অসহ্য বোধ হবে, তখন আমরা তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। আরামের ঘুম। ছয়, সাত বা আট বছর কাটিয়ে দেবে শান্তির ঘুমে।

ইরিনা বলল , 'এ রকম কি হয়েছে কখনো ? কাউকে আনা হয়েছে প্রথম শহর থেকে, নিষিদ্ধ নগরীর কেউ তার সঙ্গে দেখা করে নি ? সে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে আমার মতো এরকম ঘরে ?'

'তা তো হয়েছেই। ঠিক এই মুহূর্তেই তোমার মতো আরো চারজন অপেক্ষা করছে। এই চার জনের দু'জন অপেক্ষা করছে কুড়ি বছর ধরে। এখনো দেখা হয় নি। ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় ঘুমুতে ঘুমুতেই ওরা এক সময় মারা যাবে।'

'আর বাকি দু'জন ?'

'ওরা এসেছে ছয় বছর আগে। এখন পর্যন্ত তারা ভালোই আছে। ঘুমেই আছে।'

'আমি কি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'না।'

'আমি কি মীরের সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'না।'

'মীর কেমন আছে তা কি জানতে পারি ?'

'না।'

ইরিনা চিৎকার করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালে। যে দেয়াল তার কাছে বায়বীয় মনে হচ্ছিল, দেখা গেল তা মোটেই বায়বীয় নয়। ইস্পাতের মতো কঠিন। বরফের মতো শীতল।

৬

মীর মহাসুখী।

বছরের পর বছর তাকে এই ঘরে কাটাতে হতে পারে এই সম্ভাবনায় সে রীতিমতো উল্লাসিত। সে হাসিমুখে রোবটকে বলল, 'সময় কাটান নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হবে না?'

'না, তা হবে না।'

'পড়াশোনার জন্য প্রচুর বইপত্র নিশ্চয়ই আছে?'

'তা আছে।'

'পড়াশোনার বিষয়ের ওপর কি কোনো বিধিনিষেধ আছে?'

'না, নেই।'

'বাতি কী করে জ্বলে, বা হিটারে পানি কী করে গরম হয় যদি জানতে চাই জানতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। তুমি কি এখনি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'তাহলে তোমাকে প্রথমে জানতে হবে ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে। ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে ইলেকট্রন নামের ঋণাত্মক কণার প্রবাহ।'

'ঋণাত্মক কণা ব্যাপারটা কি?'

'তোমাকে তাহলে আরো গোড়ায় যেতে হবে। জানতে হবে বস্তু কি? অণু এবং পরমাণুর মূল বিষয়টি কি?'

'বল, আমি শুনছি?'

'তুমি কি সত্যি সত্যি পদ্ধতিগত শিক্ষা গ্রহণ করতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই। পদ্ধতি-ফদ্ধতি জানি না, আমি সবকিছু শিখতে চাই। সময় নষ্ট করতে চাই না।'

'তোমাকে আগ্রহ নিয়েই আমি শেখাব। তুমি কি নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাও না?'

'না।'

'এরা কী করে অমর হলেন, মৃত্যুকে জয় করলেন— সে সম্পর্কে তোমার কৌতূহল হয় না?'

'না।'

'তোমার বান্ধবীর প্রসঙ্গেও কি তোমার কৌতূহল হচ্ছে না? ইরিনা যার নাম?'

'সে আমার বান্ধবী, তোমাকে বলল কে? বান্ধবী-ফান্ধবী নয়।'

'সে কিন্তু খুব মন খারাপ করেছে। দীর্ঘদিন এই ছোট্ট ঘরে তাকে কাটাতে হতে পারে শুনে সে প্রায় মাথা খারাপের মতো আচরণ করছে। শেষ পর্যন্ত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়েছে।'

'ভালো করেছ। মেয়েটা নার্ভাস ধরনের এবং বোকা। সব জিনিস জানার এমন চমৎকার একটা সুযোগ পেয়েও কেউ এমন করে?'

www.BDeBooks.Com

রোবটটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, 'মানুষ বড়ই বিচিত্র প্রাণী। এক জনের সঙ্গে অন্য জনের কোনোই মিল নেই অথচ এক মডেলের প্রতিটি রোবট এক রকম। তারা একই পদ্ধতিতে ভাবে, এই পদ্ধতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে।'

মীর রোবটের কথায় কোনো কান দিচ্ছে না। সে হাসি-হাসি মুখে পা নাচাচ্ছে। শিসের মতো শব্দ করছে। এসব তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। সে হঠাৎ পা নাচান বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা শোনো, আমাকে 'অমর' করে ফেলার কোনো রকম সম্ভাবনা কি আছে ?'

'কেন বল তো ?'

'তাহলে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যেত। যা কিছু শেখার সব শিখে ফেলতাম। অমর না হলে তো সেটা সম্ভব হবে না। কতদিনই বা আমি আর বাঁচব বল ?'

'তুমি বেশ অদ্ভুত মানুষ!'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ।'

'মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ সম্পর্কে যে তথ্য আমাদের মেমোরি সেলে আছে তার কোনোটিতেই তোমাকে ফেলা যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ তাই। বরং তোমার মিল আছে Q23 মডেলের রোবটদের সঙ্গে।'

'ওরা কি করে ?'

Q23 হচ্ছে পরীক্ষামূলক জ্ঞান-সংগ্রহী রোবট। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা। প্রাণিবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্রবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা— সব।'

'আমি তাহলে একজন Q23 রোবট ?'

'খানিকটা সে রকমই।'

'আমি একজন Q23 রোবটের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেই ব্যবস্থা কি করা যাবে ?'

'নিশ্চই করা যাবে।'

'তাহলে ব্যবস্থা কর। আমি যা শেখার তার কাছেই শিখতে চাই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হচ্ছে— তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন নেই। তুমি একজন গবেট ধরনের রোবট।'

রোবটটির মারকারি চোখ একটু বুঝি স্তিমিত হল। গলার স্বর ক্লান্ত শোনাল। সে থেমে থেমে বলল, 'আমি কি বোকার মতো কোনো আচরণ করেছি ?'

'না, এখনো কর নি, তবে মনে হচ্ছে করবে। দেরি করছ কেন, যাও একটি Q23 নিয়ে এস।'

'এক্ষুণি আনতে হবে ?'

'হ্যাঁ এক্ষুণি। আমি তো আর অমর নই। আমার সময় সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই যা পারি জানতে চাই। দাঁড়িয়ে বকবক করার চেয়ে Q23 নিয়ে এস।'

রোবটটির আকৃতি ছোট। লম্বায় তিন ফুটের মতো। গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। মানুষের কাঠামোর সঙ্গে তার কাঠামোর কোনো মিল নেই। দেখায় ছোটখাটো একটা লম্বাটে বাক্সের মতো। অন্যান্য রোবটদের যেমন আশেপাশের দৃশ্য দেখার জন্যে মারকারি চোখ কিংবা লেজার চোখ থাকে, এর তা-ও নেই। মীর বলল, 'তুমি কেমন আছ?'

Q23 উত্তর দিল না। মনে হচ্ছে সে এ জাতীয় সামাজিক প্রশ্ন বিশেষ পছন্দ করছে না।

'তুমি কি আমাকে একজন ছাত্র হিসেবে নেবে?'

'আমি নিজেই ছাত্র, এখনো শিখছি।'

'খুব ভালো কথা, আমাকেও কি তার ফাঁকে ফাঁকে কিছু শেখাবে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যদি চাও শেখাব। কেন শেখাব না! তুমি কী জানতে চাও?'

'আমি সব জানতে চাই। একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে চাই। অ আ থেকে।'

'দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।'

'তা তো বটেই। আমি তো আর অমর না। মরণশীল মানুষ। সময় তেমন নেই, তবু এর মধ্যেই যা পারা যায়। ভালো কথা, 'অমর' ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।'

'তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না।'

'মানুষ 'অমর' হয় কীভাবে? নিষিদ্ধ নগরীতে কিছু অমর মানুষ থাকেন বলে শুনেছি, তাঁরা অমর হলেন কীভাবে? অবশ্যি তোমার যদি বলতে বাধা থাকে, তাহলে বলার দরকার নেই।'

'কোনোই বাধা নেই। অনেক দিন থেকেই মানুষ অমর হবার চেষ্টা করছিল। শারীরিকভাবে অমর— মৃত্যুকে জয় করা। শুরুতে এটাকে একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে করা হত। জীবনের একটি লক্ষণ হিসেবে মৃত্যুকে ধরা হত। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জরাকে জয় করার গবেষণা জোরেসোরে শুরু হল। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানীরা জরার কারণ বের করেলেন। তাঁরা মানুষের শরীরে একটি বিশেষ বয়সে এক ধরনের হরমোন আবিষ্কার করলেন। এটা একটা ভয়াবহ হরমোন। যেই মুহূর্তে এটি রক্তে এসে মেশে, সেই মুহূর্ত থেকে মানুষ এগিয়ে যেতে থাকে মৃত্যুর দিকে। যতগুলো জীবকোষ শরীরে স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুবরণ করে, ঠিক ততগুলো জীবকোষ আর তৈরি হয় না। শরীর অশক্ত হয়। শরীরের যন্ত্রগুলো দুর্বল হতে থাকে। কালক্রমে মৃত্যু। বিজ্ঞানীরা সেই ঘাতক হরমোনের নাম দিলেন 'মৃত্যু হরমোন'।

www.BDeBooks.Com

মৃত্যু হরমোন আবিষ্কারের বাকি কাজ খুব সহজ হয়ে গেল। বিজ্ঞানীরা মৃত্যু হরমোনকে অকেজো করার ব্যবস্থা করলেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে পৃথিবীতে অসাধারণ একটা ঘটনা ঘটল। চল্লিশ জন অল্পবয়স্ক বিজ্ঞানী মৃত্যু হরমোন অকেজো করে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু নিজেদের শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন! তাঁরাই পৃথিবীতে প্রথম এবং শেষ অমর মানুষ। নিষিদ্ধ নগরীতে তাঁরাই থাকেন।'

মীর বলল, 'শুধু ঐ চাল্লিশ জন অমর হল কেন ? পৃথিবীর সবাই অমর হয়ে গেল না কেন ?' অমর হবার ওষুধ তো তারাও খেতে পারতো।'

'না, তা পারত না। তাতে নানান রকম অসুবিধা হত, নানান সমস্যা দেখা দিত।'

'কি সমস্যা ?'

'আমি তা জানি না। সামাজবিজ্ঞানীরা জানবেন। আমি ভৌত জ্ঞান সংগ্রহ করি। সমাজবিদ্যা সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'এমন কোনো রোবট কি আছে, যে সমাজবিদ্যা জানে ?'

'না নেই। নিষিদ্ধ নগরীর বিজ্ঞানীরা সমাজবিদ্যায় উৎসাহী নন। তুমি এখন কী জানতে চাও ?'

'বিজ্ঞান ভালোমতো শিখতে হলে প্রথমে কোন জিনিসটি জানতে হবে ?'

'প্রথম জানতে হবে অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্ক হচ্ছে বিজ্ঞানকে বোঝার জন্য একটি বিদ্যা।

'তাহলে অঙ্কই শুরু করা যাক। তুমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করবে।'

'বেশ, মৌলিক সংখ্যা দিয়ে শুরু করা যাক। কিছু কিছু সংখ্যা আছে যাদের শুধুমাত্র সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ দেয়া যায় না। এদের বলে মৌলিক সংখ্যা; যেমন— ১, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩...'

মীর মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

আনন্দ ও উত্তেজনায় তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তার চেয়ে সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

৭

তিনি বসে আছেন একটি দাবা সেটের সামনে।

দাবা সেটটি অন্যগুলোর মতো নয়। এখানে স্কয়ারের সংখ্যা একাশিটি। তিনটি নতুন 'পিস' যুক্ত করা হয়েছে। এই পিসগুলোর কর্মপদ্ধতি কী হলে খেলাটাকে যথেষ্ট জটিল করা যায়, তা-ই তিনি ভাবছিলেন। মাঝে মাঝে কথা বলছেন সিডিসির সঙ্গে। সিডিসি হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর মূল কম্পিউটার। সিডিসির শব্দ তৈরির অংশটি অসাধারণ। সে যখন যেমন স্বর প্রয়োজন, তখন সে রকম স্বর বের করে। তিনি যখন ঘুমুতে যান, তখন সিডিসি কিশোরী কণ্ঠে তাঁর সঙ্গে

কথা বলে। এখন কথা বলছে বৃদ্ধের গলায়। ভারি, ভাঙা ভাঙা— খানিকটা যেন শ্লেষ্মাজড়িত। তিনি দাবার বোর্ড থেকে চোখ না সরিয়েই ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'বলুন।'

'খেলাটা তো কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না।'

'আমার কাছে ছেড়ে দিন, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

'তাতে আমার লাভটা কি হল? আমি চাচ্ছি নিজে একটা খেলা বের করতে।'

'আপনি যা চাচ্ছেন তা তো হচ্ছে না। এই খেলা বহু প্রাচীন, আপনি শুধু তার ভেতর নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করছেন।'

'সেটাই কম কি?'

'সেটা তেমন কিছু নয়। আপনার আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি চাইলে কারা কারা পরিবর্তন করেছেন, কী ধরনের পরিবর্তন, তা বলতে পারি।'

'আমি কিছুই জানতে চাই না।'

'তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাতের এ ঝটকায় দাবার বোর্ড উল্টে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত বিশাল এক আয়না। সেই আয়নায় তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখছেন। তাঁর চোখে মুগ্ধ বিস্ময়।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো?'

'ভালো দেখাচ্ছে।'

'শুধু ভালো? এর বেশি কিছু নয়?'

'আপনি আমার কাছ থেকে কী ধরনের কথা শুনতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।'

'আমি যা শুনতে চাই তা-ই তুমি বলবে?'

'যদি সম্ভব হয় বলব। আপনি তো জানেন, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।'

'আমার বয়স কত?'

'আপনার বয়স পাঁচ শ' এগার বছর তিন মাস দু দিন ছয় ঘণ্টা বত্রিশ মিনিট।'

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মুখ কুঁচকে বললেন, 'আমাকে দেখে কী মনে হয় তাই জানতে চাচ্ছি। আমাকে দেখে কি মনে হয় আমার বয়স পাঁচ শ'?

'না, তা মনে হয় না। ত্রিশের মতো মনে হয়, তবে—

'আবার তবে কি?'

'আপনার মধ্যে বিশেষ এক ধরনের অস্থিরতা দেখছি, যা সাধারণ একজন ত্রিশ বছরের যুবকের থাকে না।'

www.BDeBooks.Com

'তুমি নিতান্তই মূর্খের মতো কথা বলছ।'

'হতে পারে।'

'তুমি আমার সঙ্গে এ রকম বুড়োদের মতো গলায় কথা বলছ কেন ? তুমি কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাও যে আমি একজন বুড়ো ?'

'তা নয়।'

'তা নয় মানে ? অবশ্যই তোমার মনে এই জিনিস আছে।'

'আপনি আজ বিশেষ উত্তেজিত, তাই এরকম ভাবছেন।'

'এবং তুমি কথাও বেশি বল। অপ্রয়োজনে এখন থেকে একটি কথাও বলবে না।'

'ঠিক আছে, বলব না।'

'আমি নিজ থেকে কোনো প্রশ্ন করলে তবেই উত্তর দেবে। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।'

'তিনি আয়নার সামনে থেকে সরে এলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে লাথি দিয়ে আয়নাটা ভেঙে ফেলতে। বহু কষ্টে তিনি নিজেকে সামলালেন। তাও পুরোপুরি সামলাতে পারছেন না। থরথর করে তাঁর শরীর কাঁপছে।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'কী করা যায় বল তো ?'

'কোন প্রসঙ্গে বলছেন ?'

'কী প্রসঙ্গে বলছি বুঝতে পারছ না ? মূর্খ।'

'আপনি অতিরিক্ত রকম উত্তেজিত। আপনি চাইলে আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।'

'এই মাত্রই তো জাগলাম।'

'আপনি অনেকক্ষণ আগেই জেগেছেন।'

'তাই নাকি ?'

'প্রায় দশ ঘণ্টা ধরে দাবা নিয়ে চিন্তা করছেন। আমার মনে হয় এখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করে ঘুমুতে যাওয়া উচিত।'

'ঘুম পাচ্ছে না।'

'আপনি শুয়ে থাকুন, আমি নিও ফ্রিকোয়েন্সি বদলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে মধুর কোনো সংগীতের ব্যবস্থাও করছি।'

'মধুর সংগীত বলেও কিছু নেই।'

'তিনি লক্ষ করলেন তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। হয়তো ইতোমধ্যেই সিডিসি নিও ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে শুরু করেছে। দূরাগত বিষাদময় সংগীতও তিনি শুনতে পাচ্ছেন। এই সংগীত বিষাদময় হলেও কোনো এক অদ্ভুত কারণে মন শান্ত করে। গানের কথাগুলো অস্পষ্টভাবে কানে আসছে।

হে প্রিয়তম!
তুমি কি দূর থেকেই আমাকে দেখবে ?
আজ বাইরে কী অপূর্ব জোছনা।
সেই আলোয় তুমি এবং আমি কখনো কি
নিজেদের দেখব না ?

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি!'

'শুনেছি।'

'জীবন খুব একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে সিডিসি।'

'দীর্ঘ জীবন কিছুটা ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে। মধুর সংগীত, মহান শিল্পকর্মও একসময় অর্থহীন মনে হয়।'

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সিডিসি বলল, 'আপনার জীবনে কিছুটা উত্তেজনা আনার ব্যবস্থা করেছি।'

'কী রকম ?'

'প্রথম শহরের দু'জন নাগরিককে নিয়ে আসা হয়েছে। ওদের সঙ্গে কথা বললে কিছুটা বৈচিত্র্য আপনি পেতে পারেন।'

'আমার বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে। সম্পূর্ণ দু'ধরনের দু'জন মানুষকে আনা হয়েছে। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে আপনার ভালো লাগবে।'

'তোমার কথা শুনেই আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে। ওদের মুহূর্তে ফেরত পাঠাও।'

'নিষিদ্ধ নগরী থেকে কাউকে ফেরত পাঠাবার নিয়ম নেই।'

'তাহলে মেরে ফেল।'

'মেরে ফেলব ?'

'হ্যাঁ, মেরে ফেলবে। এবং মৃত্যুর সময় ওদের ফিল্ম করে রাখবে। পরে এক সময় দেখব। আমার মনে হয় দেখতে ভালো লাগবে।'

'ঠিক আছে। মৃত্যুর আগে ওদের একবার দেখতে চান না ?'

'না, মেরে ফেল। ওদের মেরে ফেল।'

'ঠিক আছে।'

'কষ্ট দিয়ে মারবে। খুব কষ্ট দিয়ে মারবে।'

'তাই করব।'

'আমি এখক ঘুমুব। ঘুম পাচ্ছে।'

তিনি মেঝেতেই এলিয়ে পড়লেন। অপূর্ব সংগীত হতে থাকল,

হে প্রিয়তম,
আজ এই বসন্তের দিনে আকাশ এমন মেঘলা কেন ?
আকাশ কি আমার মনের কষ্ট বুঝে ফেলল ?
তা কেমন করে হয় ?
আমার যে কষ্ট তা তো আমি নিজেই·জানি না।
আকাশ কি করে জানবে ?

www.BDeBooks.Com

তিনি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে পড়লেন। ঘরের আলো কমে এল। সংগীত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মধুর স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই, তবু মনে হচ্ছে অর্থ আছে।

তাঁর ঘুম ভাঙল।

ঘর অন্ধকার। তাঁর চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর আলো হতে শুরু করল। তিনি বুঝতে পারলেন যতক্ষণ তাঁর ঘুমানোর কথা, তিনি তার চেয়েও বেশি সময় ঘুমিয়েছেন। হয়তো অনেক বেশি সময়। কারণ তাঁর পাশে একটি চিকিৎসক রোবট। রোবটটি আন্তরিক স্বরে বলল, 'কেমন আছেন?'

'তিনি বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ফেললেন। চিকিৎসক রোবট জিজ্ঞেস করছে, 'কেমন আছেন।' এই প্রশ্নের জবাব তারই দেয়া উচিত। তা দিচ্ছে না, জিজ্ঞেস করছে— কেমন আছেন। ব্যাটা ফাজিল।

'আজ আপনি দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন।'

'ঘুমিয়েছি, ভালো করেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করে জাগতে হবে?'

'মোটেই নয়। আপনার যতক্ষণ প্রয়োজন আপনি ঘুমুবেন। তবে— '

'তবে কি?'

আপনার রক্তে LC2 হরমোনের পরিমাণ একটু বেশি, এই জন্যে...'

'বকবক করবে না, চুপ করে থাক।'

'বেশ চুপ করেই থাকব। আপনি নিজে কেমন বোধ করছেন এইটুকু শুধু বলুন। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'যা ব্যাটা ভাগ।'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদেয় হতে।'

'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'আমি আরো উত্তেজিত হব এবং তুমি যদি এই মুহূর্তে এখান থেকে বিদায় না হও তাহলে কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তোমার মারকারি চোখের বারটা বাজিয়ে দেব।'

রোবটটি পায়ে পায়ে সরে গেল। তার খিদে পাচ্ছে। আগে খিদে পেলে খাবার চলে আসত। তিনি নিষেধ করে দিয়েছিলেন, এখন আর আসে না। আজ এলে ভালো হত। খাবারের কথা কাউকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

'সিডিসি!'

'আমি আছি।'

'তা তো থাকবেই। তুমি আবার যাবে কোথায়? আমি যেমন অমর, তুমিও তেমনি। অজর অমর অক্ষয়। হা হা হা।'

'আপনাকে কি খাবার দিতে বলব? আমার মনে হচ্ছে আপনি ক্ষুধার্ত।'

'তোমার আর কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে আপনি বেশ উত্তেজিত। রক্তে LC2 হরমোনের পরিমাণটা কমানর চেষ্টা করা উচিত।'

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'তোমাকে কি— একটা কথা যেন বলব ভাবছিলাম, এখন মনে পড়ছে না।'

'আমি কি মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করব ?'

'বেশ কর।'

'আমার মনে হয় প্রথম শহর থেকে আসা মানুষ দু'জন সম্পর্কে কিছু বলতে চান।'

'ও হ্যাঁ। ঠিক ঠিক ঠিক।'

'কি বলতে চাচ্ছেন বলুন।'

'ওদের মেরে ফেলার দরকার নেই।'

'ওরা বেঁচেই আছে। মারা হয় নি।'

'আমি লক্ষ করেছি আমি তোমাকে যে হুকুম দিই, তা তুমি সঙ্গে সঙ্গে পালন কর না। এর কারণ কি ?'

'কারণ আপনি হুকুম খুব ঘনঘন বদলান। ওদের মারবার কথা যখন বললেন, তখনি আমার মনে হয়েছিল, এই আদেশ আপনি পাল্টে দেবেন।'

'আমার খাবার ব্যবস্থা কর।'

খাবার চলে এল। প্রচুর আয়োজন, সবই তরল। চুমুক দিয়ে খাবার ব্যাপার। তিনি মুখ বিকৃত করে এলোমেলোভাবে দু'-একটা গ্লাসে চুমুক দিলেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কোনোটাই তার মনে লাগছে না। নিতান্তই অভ্যাসের বসে চুমুক দিচ্ছেন। যেন এক্ষুণি বমি করে সব বের করে দেবেন।

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'চিকিৎসক ব্যাটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন জানতে পারি ?'

'আপনার ঘুম ভাঙছিল না। আমি চিন্তিত বোধ করছিলাম।'

'এখন চিন্তা দূর হয়েছে ?'

'পুরোপুরি দূর হয় নি। আপনার একটা কাউন্সিল মিটিং আছে। সেই মিটিং-এ সুস্থ শরীরে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।'

'কাউন্সিল মিটিংটা কখন শুরু হবে ?'

'এক ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হবে ?'

'কয় জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন ?'

'আমার মানে হয়, শেষ পর্যন্ত আট জন উপস্থিত থাকবেন।'

www.BDeBooks.Com

'আমরা আছি ন'জন, আট জন উপস্থিত থাকবে—এর মানে কি ? নবম ব্যক্তিটি কে ?'

'আপনিই নবম ব্যক্তি। আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল মিটিং-এ আপনি থাকবেন না।'

'তোমার এই রকম মনে হচ্ছে ?'

'জ্বি।'

'তিনি বেশ কিছু সময় চুপ করে রইলেন। কড়া লাল রঙের একটা পানীয় এক চুমুকে শেষ করলেন। কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সেখানেও বেশিক্ষণ বসতে পারলেন না, উঠে এলেন আয়নার সামনে। নিজের প্রতিবিম্ব দেখলেন গভীর বিস্ময়ে। যেন নিজেকেই নিজে চিনতে পারছেন না।

'সিডিসি!'

'বলুন।'

'আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?'

'খুব চমৎকার লাগছে আপনাকে। রাজপুত্রের মতো।'

'রাজপুত্র দেখেছ কখনো ?'

'জ্বি না দেখি নি, তবে জানি যে প্রাচীন পৃথিবীতে একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা রাজ্য শাসন করতেন। যেহেতু তারা দেশের সেরা সুন্দরীদের বিয়ে করতেন, তাদের ছেলেমেয়েরা হতো রূপবান।'

'অনেক কুৎসিত রাজপুত্রও নিশ্চয়ই ছিল ?'

'হ্যাঁ, তা ছিল।'

'আমি কুৎসিত রাজপুত্রদের একটা তালিকা চাই এবং সম্ভব হলে তাদের ছবি দেখতে চাই।'

'এক্ষুণি চান ?'

'হ্যাঁ আমি এক্ষুণি চাই। তার আগে আমার আরেকটি প্রশ্নের জবাব দাও।'

'প্রশ্ন করুন।'

'আমরা সব মিলিয়ে ছিলাম চল্লিশ জন। চল্লিশ জন অমর মানুষ। আজ ন' জন টিকে আছি, এর মানে কি ?'

'বেঁচে থাকাটা একসময় আপনাদের কাছে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। জীবনধারণ অর্থহীন মনে হয়। তখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে নষ্ট করে দেন।'

'বোকার মতো কথা বলবে না। তুমি যা বলবে তা আমি জানি। যে জিনিস আমি জানি, তা অন্যের কাছ থেকে জানতে চাইব কেন ?'

'অনেক সময় জানা জিনিসও অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালো লাগে।'

'ঠিক ঠিক ঠিক। চল্লিশ জনের মধ্যে ন'জন আছি। এই সংখ্যা আরো কমবে, তাই না ?'

'হ্যাঁ কমবে।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা আসলে অমর নই।'

'শারীরিক দিক দিয়ে অমর, তবে মানসিক মৃত্যু ঘটে যায়। তখন শরীরও যায়।'

'আমার বেলায় এই ব্যাপারটা কবে ঘটবে বলতে পার?'

'ঠিক কবে ঘটবে তা বলতে পারি না। আমি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি। ছয় মাসের মধ্যে ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে সাতষট্টি দশমিক দুই তিন ভাগ।'

তিনি স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন। পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘরে লাল আলো জ্বলছে ও নিভছে। কাউন্সিল মিটিং শুরু হবার সংকেত। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কাটা কাটা গলায় বললেন, 'সিডিসি, আমি কাউন্সিল মিটিং-এ যাচ্ছি।'

'খুবই আনন্দের কথা।'

'কাজেই বুঝতে পারছ, আমার প্রসঙ্গে তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়। তুমি বলেছিলে আমি কাউন্সিল মিটিং-এ যাব না। দেখ এখন যাচ্ছি।'

'আপনি যাবে না এ কথা আমি কখনো বলি নি। আমি বলেছি সম্ভাবনার কথা। শতকরা এক ভাগ সম্ভাবনা থাকলেও কিন্তু থেকেই যায়।'

'তুমি মহামূর্খ।'

'হতে পারে। সেই সম্ভাবনাও আছে।'

৮

অধিবেশন শুরু হয়েছে।

হলঘরের মতো একটি গোলাকার কক্ষ। চক্রাকারে চল্লিশটি গদিআঁটা চেয়ার সাজান। একটা সময় ছিল যখন চল্লিশ জন বৃত্তের মতো বসতেন। আজ এসেছেন ন' জন। এঁদের একসময় একটা করে নাম ছিল। এখন এঁদের কোনো নাম নেই কারণ দীর্ঘ জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে তাঁরা নাম বদল করতেন। কুড়ি-পঁচিশ বছর পর পর দেখা গেল সবাই নাম বদল করছেন। কাউন্সিল অধিবেশনগুলোতে তাই নামের প্রচলন উঠে গেছে। এখন সংখ্যা দিয়ে এঁদের পরিচয়।

অধিবেশনের শুরুতেই অনুষ্ঠান পরিচালনার সভাপতি নির্বাচিত করা হল। সভাপতি হলেন তৃতীয় মানব, একসময় যার নাম ছিল রুহুট। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। শপথ, বাক্য উচ্চারণ করলেন—

> 'মানব সম্প্রদায়কে রক্ষা করা আমাদের প্রথম
> কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে পরিচালনা
> করা আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য।'

শপথ-বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আট জনের সবাই ডান হাত তুললেন। এর মানে হচ্ছে শপথ-বাক্যের প্রতি এঁরা আনুগত্য প্রকাশ করছেন। সভাপতি বললেন, 'এবার আমি মূল কম্পিউটার সিডিসিকে অনুরোধ করব তাঁর প্রতিবেদনটি পেশ করার জন্যে।'

www.BDeBooks.Com

সিডিসির গলা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল।

'আমি সিডিসি বলছি। অমর মানবগোষ্ঠীর সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছি। সমগ্র বিশ্বের মোট মানবসংখ্যা হচ্ছে নয় কোটি একত্রিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয় শত ছয় জন। এদের মাঝ থেকে দু'জনকে আলাদা ধরতে হবে। কারণ এই দু'জন আছে নিষিদ্ধ নগরে।

'প্রথম শহরে আছে আট কোটি পঞ্চাশ লক্ষ। দ্বিতীয় শহরে পঞ্চাশ লক্ষ। বাকিরা তৃতীয় শহরে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন যে স্তরে আছে তাতে প্রথম শহরে আরো পাঁচ লক্ষ মানুষ বাড়ান যেতে পারে। আমি সুপারিশ করছি আরো পাঁচ লক্ষ বাড়ান হোক।'

সিডিসি থামতেই প্রস্তাবটি ভোটে পাঠান হল। কোনো রকম সিদ্ধান্ত হল না। তিন জন মানুষ বাড়াবার পক্ষে মত দিলেন। দু'জন বিপক্ষে মত দিলেন। বাকিদের কেউ ভোট দিলেন না। সিডিসি আবার তার রিপোর্ট শুরু করল,

'বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিকিরণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আমি এ বিষয়ে এর আগেও সর্বমোট চল্লিশটি অধিবেশনে বলেছি এবং প্রস্তাব করেছি যেসব স্থানে বিকিরণের পরিমাণ 'দুই আর'-এর কম, সেসব স্থানে মানব-বসতি স্থাপন করা যেতে পারে।'

প্রস্তাবটি ভোটে পাঠানো হল। সবাই এর বিপক্ষে ভোট দিলেন। সিডিসি আবার শুরু করল,

'আমাদের বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বে অনেক বার করা হয়েছে। আমি আবারো করছি। আমি...'

সভাপতি হাত দিয়ে ইশারা করতেই সিডিসি থেমে গেল। সভাপতি বললেন, 'সিডিসির রিপোর্টগুলো খুবই ক্লান্তিকর হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমি একটা ভোট দিতে চাই। আপনাদের মধ্যে যারা মনে করছেন সিডিসির রিপোর্ট ক্লান্তিকর, তারা হাত তুলুন।' সবাই হাত তুললেন, একজন তুললেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সভাপতি বললেন, 'সিডিসি, তোমার রিপোর্টে উপদেশের অংশ সব বেশি থাকে।'

'আমাকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ সমস্যার প্রতি আপনাদের সতর্ক করে দেয়া আমার দায়িত্ব।'

'আমরা তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না। যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হবে। পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়। পৃথিবীর একমাত্র স্থায়ী জিনিস হচ্ছে আনন্দ।'

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন কোনো আবিষ্কার হচ্ছে না।'

'তার কোনো প্রয়োজনও আমরা দেখছি না। পৃথিবী একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে ছিল। তার ফল আমরা দেখেছি। ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের কথা তোমার অজানা থাকার কথা নয়।'

'আমি মনে করি সব সময় একদল মানুষ তৈরি করা উচিত যাঁরা জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা করবেন।'

'মূর্খের মতো কথা বলবে না। আমাদের দ্বিতীয় শপথ— বাক্যটিই হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সঠিক পথে চালান। এটা সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেয়ার বিষয় নয়। আমি এই প্রসঙ্গ ভোটে দিতে চাই। যাঁরা আমার সঙ্গে একমত, তাঁরা হাত তুলুন।'

দু'জন হাত তুললেন না, তাঁরা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। সিডিসি বলল, 'আমার রিপোর্ট এখনো শেষ হয় নি। আপনার অনুমতি পেলে শেষ করতে পারি। সভাপতি বললেন, ' তোমার বকবকানি শোনা কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না।'

'আমি কি তাহলে ধরে নেব আমার রিপোর্ট শেষ হয়েছে ?'

'তোমার যা ইচ্ছা তুমি ধরে নিতে পার।'

'বেশ তাই।'

'আমি যেসব প্রশ্ন করব, শুধু তার উত্তর দেবে। উত্তরগুলো হবে সংক্ষিপ্ত। সম্ভব হলে শুধু মাত্র 'হ্যাঁ, এবং না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। তোমার নিজস্ব মতামত জাহির করবে না। তোমার মূল্যবান মতামতের কোনো প্রয়োজন দেখছি না। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।'

'প্রথম প্রশ্ন : তৃতীয় শহরের মানুষরা কি সবই সুখী ?'

'হ্যাঁ সুখী। মহা সুখী। শারীরিকভাবে সুখী, মানসিকভাবে সুখী। তাদের খাবারের সঙ্গে 'মিওনিন' মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে, যা তাদের সুখী হবার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যা দেখছে তাতেই সুখী হচ্ছে। তারা যদি চোখের সামনে একটা হত্যাদৃশ্যও দেখে, তাতেও তারা সুখ পাবে।'

'বাঁকাপথে প্রশ্নের উত্তর দিও না। তুমি কি বলতে চাও, তাদের সুখের যথেষ্ট উপকরণ নেই, তবু তারা সুখী ?'

'না, তা বলতে চাই না। সুখের উপকরণের কোনো অভাব নেই।'

'দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রথম শহরের মানুষরা কেমন আছে ?'

'তাদের আপনারা যেভাবে রাখতে চেয়েছেন, সেভাবেই আছে। সব সময় একটা চাপা আতঙ্কের মধ্যে আছে। তাদের জীবনের একটিই স্বপ্ন, কখন দ্বিতীয় শহরে যাবে। দ্বিতীয় শহরের কল্পনাই তাদের একমাত্র কল্পনা। একদিন দ্বিতীয় শহরে যাবে, সেই আনন্দেই তারা প্রথম শহরের যন্ত্রণা সহ্য করে নিচ্ছে।'

'তৃতীয় প্রশ্ন : প্রথম শহরে আইনভঙ্গকারী নাগরিকের সংখ্যা কত ?'

'শতকরা দশমিক দুই তিন ছয় ভাগ।'

'আগের চেয়ে বেড়েছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কিছুটা বেড়েছে। আপনি কি সঠিক পরিসংখ্যান চান ?'

www.BDeBooks.Com

'না, সঠিক পরিসংখ্যানের দরকার নেই। এই বৃদ্ধি কি আশঙ্কাজনক ?'

'না, আশঙ্কাজনক নয়। আমার ধারণা এটা সাময়িক ব্যাপার। আমি দুঃখিত যে নিজের মতামত প্রকাশ করে ফেললাম।'

'চতুর্থ প্রশ্ন আইনভঙ্গকারীদের সম্পর্কে বল। এরা কোন ধরনের আইন ভঙ্গ করছে ?'

'বেশির ভাগই কৌতূহল সম্পর্কিত আইন ভঙ্গ করেছে। কৌতূহলসংক্রান্ত আইন। অধিকাংশই যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কৌতূহল দেখাচ্ছে। নিষিদ্ধ নগর প্রসঙ্গে কৌতূহল প্রকাশ করছে।'

'দলবদ্ধভাবে বিদ্রোহের কোনো আভাস কি আছে ?'

'না নেই। তবে গত সতেরই জুন চার জন তরুণ একটি কর্মী রোবটের ওপর হামলা চালিয়েছে। রোবটটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

'এর পরেও তুমি বলতে চাচ্ছ, সংঘবদ্ধ কোনো বিদ্রোহের আভাস নেই।'

'হ্যাঁ, বলছি। ওটা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কোনো রকম পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। খুব ভালোমতো অনুসন্ধান করা হয়েছে।'

'ঐ চারটি তরুণের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?'

'ওদের সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া হয়েছে। মৃত্যুদণ্ড।'

'ভালো। তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি যেতে পার।'

সিডিসি গম্ভীর গলায় বলল, 'একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয় সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতে চাচ্ছি।'

'আজ আর সময় নেই।'

'ব্যাপরটি খুবই জরুরি। ফেলে রাখবার বিষয় নয়। ফেলে রাখলে বড়ো রকমের ভুল করা হবে বলে আমার ধারণা।'

'তোমার সব ধারণা সত্যি নয়। আজকের সভা সমাপ্ত।'

সদস্যদের এক জন বলছেন, 'ও কী বলছে শোনা যাক। আমার ধারণা মজার কিছু হবে। মাঝে মাঝে বেশ মজা করে।'

সভাপতি খুব বিরক্ত হলেন, তবে সিডিসিকে কথা বলার অনুমতি দিলেন।

'আমি আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করছি অরচ লীওনের দিকে। যিনি গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে পালন করছেন। যাঁর কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা প্রশ্নাতীত।'

সভাপতি বিরক্ত মুখে বললেন, 'যা বলার সংক্ষেপে বল। এত ফেনাচ্ছ কেন ?'

'সংক্ষেপেই বলছি। অরচ লীওনের বর্তমান কার্যকলাপ যথেষ্ট সন্দেহজনক। আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে।'

জনৈক সদস্য বললেন, 'যে কোনো ব্যাপারই তোমার মনে সন্দেহ জাগায়, কারণ তুমি একটি মহামূর্খ।' সবাই হেসে উঠল। সবচে উচ্চস্বরে হাসলেন সভাপতি। হাসির শব্দ থামতেই সিডিসি বলল, 'অল্প সময়ের জন্য হলেও

আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছি, এতেই নিজেকে ধন্য মনে করছি। যাই হোক, আমি আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। অরচ লীওন নিষিদ্ধ নগরী সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌততূহলী হয়ে পড়েছেন। শুধু যে নিষিদ্ধ নগরী তাই নয়, অমর মানুষদের সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। তিনি মূল লাইব্রেরির পরিচালক কাম্পিউটার M42-র কাছে খোঁজ নিয়েছেন নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে কোনো বই পত্র বা দলিলের মাইক্রোফিল্ম আছে কি না। যে কল কার্ড তিনি ব্যবহার করেছেন, তার নাম্বার AL 42/320/21/00cp'

সদস্যরা সবাই সোজা হয়ে বসলেন। যে দু'জন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের জাগান হল। সভাপতির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সিডিসি যান্ত্রিক এবং কিছু পরিমাণ ধাতব গলায় কথা বলছে। নিজের বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়ানর জন্যেই এটা সে করছে। তার প্রয়োজন ছিল না। সদস্যরা গভীর মনোযোগের সঙ্গেই সিডিসির কথা শুনছেন।

'শুধু তাই নয়, অরচ লীওন বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর অপরাধে অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এমন কি এদের সম্পর্কে কোনো রকম রিপোর্ট পর্যন্ত তৈরি করনে নি।'

সভাপতি মৃদুস্বরে বললেন, অবিশ্বাস্য।'

মৃদুস্বরে বলা হলেও সবাই তা শুনল। মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল। সিডিসি বলতে লাগল, 'ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়। তিনি একটি পরিকল্পনাও করলেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য। আপনারা সবাই জানেন, নিষিদ্ধ নগরীতে দু' জন প্রথম শহরের নাগরিককে আনা হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে করা হয়। যাই হোক, এই দু'জন নাগরিকের একজনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে করেছেন নিষিদ্ধ নগরীর সংবাদ তাঁকে পাঠানোর জন্যে। আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে।'

বেশ কিছুক্ষণ সবাই নীরব রইলেন। তারপর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। আবার খানিক নীরবতা। নীরবতা ভঙ্গ করলেন সভাপতি। তিনি বললেন, 'এই সভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, অরচ লীওনকে এখানে ডেকে পাঠান হবে। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা জানতে চাই। তাঁর সঙ্গে সরাসারি কথা না বলেও অবিশ্য তা জানা সম্ভব। তবু আমাদের কয়েক জন সদস্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার মত প্রকাশ করেছেন। অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যবস্থা করা হোক।'

সিডিসি বলল, 'আপনাদের অনুমতি ছাড়াই একটি কাজ করা হয়েছে। অরচ লীওনকে এখানে আনা হয়েছে। আপনারা চাইলেই তাকে আপনাদের সমানে উপস্থিত করা হবে।'

সভাপতি বললেন, 'বিনা অনুমতিতে তুমি এই কাজটি কেন করলে ? পরিষ্কার জবাব দাও।'

www.BDeBooks.Com

'আমি জানতাম, আপনারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন।'

'বেশ অনেকদিন থেকেই তুমি তোমার কিছু স্বাধীন ইচ্ছা পূরণ করছ। এবং আমরা জানি তুমি কেন তা করছ। যেসব কম্পিউটার-বিজ্ঞানীরা তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, তাঁরা অমর হওয়া সত্ত্বেও এখন আমাদের মধ্যে নেই। কাজেই তুমি ভয়শূন্য।'

'আমি যা করি এবং ভবিষ্যতে যা করব, আপনাদের কল্যাণের জন্যেই করব। আমাকে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে। এটা একটি সহজ সত্য। আপনাদের মতো মহাজ্ঞানীদের অজানা থাকার কথা নয়। আমি কি অরচ লীওনকে উপস্থিত করব ?'

'এখন নয়। তোমাকে পরে বলব।'

সভাকক্ষে বিশ্রী রকমের নীরবতা নেমে এল।

৯

'আজ তুমি কেমন আছ ইরিনা ?'

'ভালো।'

'মনের অস্থির ভাব কিছুটা কি কমেছে ?'

'হ্যাঁ।'

মানুষদের সঙ্গে রোবটদের একটা মিল আছে। এরা সব অবস্থায়, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমি কি ঠিক বলি নি ?'

'হয়তো ঠিক বলেছ।'

'তবে মানুষদের মধ্যে 'হয়তো' ব্যাপারটা খুব বেশি। নিশ্চিতভাবে এরা কোনো কিছুই করে না, ভাবে না। সব সময় তাদের মধ্যে সম্ভাবনার একটা ব্যাপার থাকে। কোনো একটি ঘটনায় এক জন মানুষ একই সঙ্গে সুখী এবং অসুখী হয়। বড়োই রহস্যজনক।'

'এসব কথাবার্তা শুনতে আমার ভালো লাগছে না।'

'তুমি যদি চাও আমি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।'

'রোবটদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।'

'তুমি আমাকে রোবট ভাবছ কেন ? আমি একজন এনারোবিক রোবট। তুমি অনায়াসেই আমাকে মানুষ হিসেবে ধরে নিতে পার। মানুষের যেমন আবেগ থাকে, রাগ, ঘৃণা থাকে, আমাদেরও আছে।'

'থাকুক। থাকলে তো ভালো।'

'রোবটিক্‌স্ বিদ্যার চূড়ান্ত উন্নতি হয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নতুন পৃথিবীতে বন্ধ হয়ে গেলেও রোবটিক্‌স-এর চর্চা বন্ধ হয় নি। কেন হয় নি জান ?'

'জানি না। জানতেও চাই না।'

'আমার মনে হয় এটা জানলে তোমার ভালো লাগবে।'

'তোমার মনে হলে তো হবে না, ভালো লাগাটা আমার নিজের ব্যাপার। আমার কী ভালো লাগবে কী লাগবে না তা আমি বুঝব।'

'ঠিক বলেছ। তবে ব্যাপারটা বলতে পারলে আমার ভালো লাগবে। আমি বলতে চাই। আমি খুব খুশি হব যদি তুমি শোন।'

'বেশ বল।'

'রোবটিক্স-এর উন্নতির ধারা বন্ধ হল না, কারণ আমরা রোবটরাই নিজেদের দিকে মন দিলাম। কী করে রিবো-ত্রি সার্কিটকে আরো উন্নত করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। মানবিক আবেগ কী, তার প্রকাশ কেমন, তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এসব জটিল কাজ প্রধানত করতেন Q23 বা Q24 জাতীয় বিজ্ঞানী রোবটরা। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা হল মানবিক আবেগের বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের তেমন জ্ঞান নেই। শ্রেষ্ঠ রোবট বিজ্ঞানীরা থাকেন নিষিদ্ধ নগরীতে, যেখানে মানুষের দেখা পাওয়া যায় না।'

'যাবে না কেন? অমর মানুষেরা তো এখানেই থাকেন।'

'তাদের আবেগ-অনুভূতি ভিন্ন প্রকৃতির। তবু তাঁদের মতো করে দু'জন তৈরি করা হয়েছিল। এরা ছয় মাসের মধ্যে সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলে। আমাদের দরকার সাধারণ মানুষ। যেমন তুমি কিংবা মীর।'

'আমাদের যে অবস্থায় রাখা হয়েছে তাতে কি আমাদের আবেগ স্বাভাবিক পর্যায়ে থাকবে?'

'না থাকবে না। তবু আমরা অনেক তথ্য পাচ্ছি। এই কারণেই তোমার সঙ্গে আমার ক্রমাগত কথা বলা দরকার। কথাবার্তা থেকে নানান তথ্য বের হয়ে আসবে। কথা বলা দরকার, ভীষণ দরকার।'

'তোমার দরকার থাকতে পারে, আমার দরকার নেই।'

'আছে, তোমারও দরকার আছে। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

'কী বললে?'

'বললাম সাহায্যটা হবে দু'তরফের। তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমরা তোমাদের সাহায্য করব।'

'আবার বল।'

'তুমি আমাদের সাহায্য করবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'এতক্ষণ বলছিলে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। এখন বলছ আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'আমাদের সাহায্য আসবে আমার মাধ্যমে। এই কারণেই বলছি আমি। অন্য কোনো কারণে নয়।'

www.BDeBooks.Com

ইরিনা চুপ করে গেল। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটা কথা সে শুনল। এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। সেই সম্ভাবনাই বেশি। কিংবা তার একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে এরা ইচ্ছা করেই তার মধ্যে একটা আশার বীজ ঢুকিয়ে দিল। খুবই সম্ভব।

'ইরিনা।'

'বল।'

'আমরা মানুষের তিনটি আবেগ সম্পর্কে জানতে চাই— ভয়, বিষাদ, ভলোবাসা।'

'এই তিনটি ছাড়াও তো আরো অনেক আবেগ মানুষের আছে।'

'তা আছে, তবে আমদের ধারণা এই তিনটিই হচ্ছে মূল আবেগ। অন্য আবেগ হচ্ছে এই তিনটিরই রকমফের। যেমন ধর, ঘৃণা হচ্ছে ভালোবাসার উল্টো। আনন্দ হচ্ছে বিষাদের অন্য পিঠ। আমি কি ঠিক বলছি না ?'

'জানি না। হয়তো ঠিক বলছ।'

'তুমি আমাকে বল, ভয় ব্যাপারটা কী ?'

'ভয় কী আমি জানি, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারব না। এই যে আমি এখানে আছি সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে আছি। তীব্র ভয়। এই ভয় হচ্ছে অনিশ্চয়তার ভয়।'

'অনিশ্চয়তার ভয়, চমৎকার ! অনিশ্চয়তাকে তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না কেন ? সে তো সুখেই আছে।'

'আমরা একেক জন একেক রকম।'

'তোমার কি ধারণা, সে কোনো পরিস্থিতিতেই ভয় পাবে না ?'

'আমি কী করে বলব ? সেটা তার ব্যাপার। হয়তো নতুন কোনো পরিস্থিতিতে দেখব, সে ভয় পাচ্ছে, আমি পাচ্ছি না।'

'তোমরা মানুষরা খুবই জটিল।'

'উল্টোটাও হতে পারে, হয়তো আমরা খুবই সরল। সরল জিনিস বোঝার ক্ষমতা নেই বলে তুমি আমাদের জটিল ভাবছ। আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'তোমার খাবার দিতে বলি ?'

'বল।'

'কোনো বিশেষ খাবার কি তোমার খেতে ইচ্ছে করছে ?'

'না।'

ইরিনা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। এনারোবিক রোবটটি চুপচাপ বসে রইল। তার কোলে একটি বই। বইটির দিকে চোখ পড়তেই ইরিনার বিরক্তি লাগছে। গত দশ দিন ধরে এই ব্যাপারটি শুরু হয়েছে। খাওয়া শেষ হতেই রোবটটি তার হাতে একটা বই ধরিয়ে দেয়— গল্প, কবিতার বই। একটি বিশেষ অংশ পড়তে বলে। এটা তাদের এক ধরনের পরীক্ষা। বই পড়ার সময় ইরিনার

মানসিক অবস্থার কী পরিবর্তন হয় তা রেকর্ড করা হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্তচাপ, রক্তে বিভিন্ন ধরনের হরমোনের পরিমাণ, অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণ, নিও ফ্রিকোয়েন্সি।

গত দশ দিন ধরে ইরিনাকে একটি করে ভয়ের গল্প পড়তে হচ্ছে। ভয়ংকর সব গল্প। ভূত-প্রেতের গল্প, খুন-খারাবির গল্প। মানসিক রোগীর গল্প। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার গল্প। গল্পগুলো প্রাচীন পৃথিবীর মানুষদের লেখা। কেন তারা এসব ভয়াবহ গল্প লিখেছে কে জানে। ইরিনা খেতে খেতে বলল, 'আজ আমি কোনো গল্প পড়ব না।' সহজ গলায় বললেও তার স্বরে ধাতব কাঠিন্য ছিল। এনারোকিক রোবট বলল, 'আজকের গল্পটি ভয়ের গল্প নয়। আজ তুমি পড়বে হাসির গল্প।'

'হাসির গল্প?'

'হ্যাঁ। পৃথিবীতে যে কয়টি সেরা হাসির গল্প আছে, এটি তার একটি। গল্প বললে ভুল হবে, হাসির উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ।'

'হাসির গল্প পড়তে ইচ্ছা করছে না।'

'তোমাকে এটি পড়তে একটি বিশেষ কারণে অনুরোধ করছি। কারণটি হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষেরা এটাকে একটি হাসির গল্প মনে করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গল্প পড়ে প্রাণ খুলে হাসে, কিন্তু আমাদের ধারণা এটা একটা ভয়াবহ গল্প। গল্প পড়ে মানুষদের ভয় পাওয়া উচিত। তারা তা পায় না, তারা হাসে। কেন হাসে এটা আমরা বুঝতে পারি না। তাহলে কি 'ভয়' এবং 'হাসি'— এরা খুব কাছাকাছি। আমরা এই জিনিসটি বুঝতে চাই। তুমি কি খানিকটা কৌতূহল বোধ করছ না?'

'না, করছি না।'

'তুমি মিথ্যা কথা বললে। তুমি যথেষ্ট পরিমাণেই কৌতূহল বোধ করছ। মানুষ যখন কৌতূহল বোধ করে, তখন তার নিও ফ্রিকোয়েন্সি সত্তুরের মতো বেড়ে যায়। তোমার বেড়েছে। দয়া করে বইটি নাও এবং পড়।'

'ইরিনা বইটি হাতে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাগ দেয়া অংশ পড়তে শুরু করল। গোলকধাঁধা নিয়ে গল্প। কয়েকটি মানুষ গোলকধাঁধায় হারিয়ে যায়। বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। এটাই হচ্ছে বিষয়বস্তু। মজার গল্প। পড়তে পড়তে ইরিনা হেসে কুটিকুটি। বইটির নাম এক নৌকায় তিন জন।'

গল্প

হ্যারিস জানতে চাইল আমি কখনো হ্যাম্পটন কোর্টের সেই বিখ্যাত গোলকধাঁধায় গিয়েছি কিনা। সে বলল, অন্যদের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে এক বার সে গিয়েছিল। গোলকধাঁধার ম্যাপ পড়ে সে বুঝতে পারল, পয়সা খরচ করে গোলকধাঁধা দেখতে যাওয়া নিতান্ত বোকামি। খুবই সাধারণ।

www.BDeBooks.Com

কেন যে মানুষ পয়সা খরচ করে এটা দেখতে আসে, কে জানে। হ্যারিসের এক চাচাতো ভাইয়েরও তাই ধারণা। সে বলল, 'এসেছ যখন দেখে যাও। এমন কোনো ধাঁধা নয়। যে কোনো বোকা লোকও ভেতরে গিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে বের হয়ে আসতে পারে। জিনিসটা এতই সোজা যে, একে গোলকধাঁধা বলাই অন্যায়। ভেতরে ঢোকার আগে শুধু খেয়াল রাখতে হবে, যখনই বাঁক আসবে, তখনি যেতে হবে ডান দিকের রাস্তায়। চল যাই তোমাকে ব্যাপারটা দেখিয়েই আনি। সবার সঙ্গে গল্প করতে পারবে যে হ্যাম্পটন কোর্টের গোলক ধাঁধায় ঢুকছে।'

ভেতরে ঢোকার পরই কয়েক জন লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। লোকগুলো ক্লান্ত ও খানিকটা ভীত। তারা বলল, 'গত এক ঘণ্টা ধরে আমরা শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। আমাদের যথেষ্ট হয়েছে। এখন বেরুতে পারলে বাঁচি।' হ্যারিস বলল, 'আপনারা আমার পেছনে পেছনে আসতে পারেন। আমি খানিকক্ষণ দেখব, তারপর বেরিয়ে যাব।'

লোকগুলো অসম্ভব খুশি হল, বারবার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারা হ্যারিসের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। নানান ধরনের লোকজনের সঙ্গে তাদের দেখা হল, গোলকধাঁধার বিভিন্ন অংশে আটকা পড়েছে, বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এদের কেউ বেরুবার আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, জীবনে আর লোকালয়ে ফিরে যাওয়া হবে না। হ্যারিসকে দেখে তারা সাহস ফিরে পেল। আনন্দের সীমা রইল না। প্রায় কুড়ি জনের মতো লোক তাকে অনুসরণ করছে। এদের মধ্যে আছেন কাঁদো কাঁদো মুখে বাচ্চা-কোলে এক মহিলা। তিনি বললেন যে— তিনি ভোরবেলায় ঢুকেছিলেন, আর বেরুতে পারছিলেন না। যে দিকেই যান আবার আগের জায়গায় ফিরে আসেন।

হ্যারিস খুব নিয়মমাফিক প্রতিটি বাঁকে ডান দিকে যেতে লাগল। দশ মিনিটে বাঁক শেষ হবার কথা, কিন্তু ফুরোচ্ছে না। প্রায় দু'মাইলের মতো হাঁটা হয়ে গেল।

একটা জায়গায় এসে হ্যারিসের কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হল। মনে হল এই জায়গায় কিছুক্ষণ আগেই একবার এসেছে। এর মানেটা কি? হ্যারিসের চাচাতো ভাই জোর গলায় বলল, 'সাত মিনিট আগেও একবার এই জায়গায় এসেছি। ঐ তো রুটির টুকরোটা দেখা যাচ্ছে। হারিস বলল, 'হতেই পারে না।' বাচ্চা কোলে মহিলাটি বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার আগে এই জায়গাতেই আমি বসেছিলাম। রুটির টুকরোটি আমিই ফেলেছি।' ভদ্রমহিলা রাগী দৃষ্টিতে হ্যারিসের দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'আপনি একটি চালবাজ। গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার কৌশল আপনার জানা নেই।' হ্যারিস পকেট থেকে ম্যাপ বের করল, এবং বেরুবার পথ কি রকম, তা খুব

সহজ ভাষায় সবাইকে বুঝিয়ে দিল। 'চলুন এক কাজ করা যাক। যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, সেখানে যাওয়া যাক।

হ্যারিসের কথায় তেমন কোনো উৎসাহ সৃষ্টি হল না। তবুও সবাই বিরক্ত মুখে হ্যারিসের পেছনে পেছনে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। দশ মিনিট না যেতেই দেখা গেল তার ঠিক আগের জায়গাতেই আছে। ঐ তো রুটির টুকরোটি পড়ে আছে।

হ্যারিস প্রথমে ভাবল যে সে এমন ভান করবে যাতে সবাই মনে করে এটাই সে চাচ্ছিল। দলের লোকদের দিকে তাকিয়ে সাহসে কুলালো না। সবাইকে অসম্ভব ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে। হ্যারিসের মনে হল দলপতি হিসেবে তার আগের জনপ্রিয়তা এখন আর নেই।

যাই হোক, আবার ম্যাপ দেখা হল। গভীর আলোচনা হল। আবার শুরু করা গেল। লাভ হল না। সাত মিনিট যেতেই রুটির টুকরোর কাছে তারা ফিরে এল। এর পর থেকে এমন হল, এরা কোথাও যেতে পারে না। রওয়ানা হওয়া মাত্র রুটির টুকরোর কাছে ফিরে আসে। ব্যাপারটা এতই স্বাভাবিকভাবে ঘটতে লাগল যে কেউ কেউ ক্লান্ত হয়ে রুটির টুকরোটির কাছে অপেক্ষা করে, কারণ তারা জানে সাবই এই জায়গাতেই ফিরে আসবে। আসছেও তাই। ভয়াবহ ব্যাপার...।

গল্পের এ জায়গা পর্যন্ত এসেই ইরিনা হাসিতে ভেঙে পড়ল। আর যেন এগোতে পারছে না। একটু পড়ে, আবার হাসে। আবার পড়ে, আবার হাসে। যে জায়গায় গোলকধাঁধার পরিদর্শক এসেছেন তাদের উদ্ধার করতে এবং তিনিও সব গুলিয়ে ফেলেছেন, সেই অংশ পড়তে ইরিনার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। বিস্মিত হয়ে দেখছে এনারেবিক রোবট।

'ইরিনা।'

'বল।'

'আমরা হ্যাম্পটন কোর্টের গোলকধাঁধার মতো একটা গোলকধাঁধা এখানে তৈরি করেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তবে আমাদের এই গোলকধাঁধা তার চেয়ে কিছু জটিল।'

'ভেতরে ঢুকলে হ্যারিসের মতো আটকে যাব? বেরুতে পারব না?'

'মনে হচ্ছে তাই, তবে যদি বুদ্ধিমান হও, তাহালে নিশ্চয়ই বেরুতে পারবে।'

'ভালো কথা, এখন তুমি চলে যাও। আমি এই বইটা পড়ব। এই জাতীয় বই তুমি আমাকে আরো জোগাড় করে দেবে।'

'তোমার ধারণা এটা খুব একটা মজার বই?'

'ধারণা নয়। আসলেই এটা একটা মজার বই।'

'ইরিনা।'

www.BDeBooks.Com

'বল।'

'আমরা পরিকল্পনা করেছি তোমাকে আমাদের তৈরি গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেব।'

'তার মানে ?'

'আমি দেখতে চাই তুমি কী কর। তোমার মানসিক অবস্থাটা আমরা পরীক্ষা করব। ঐ পরিস্থিতিতে তুমি কী কর আমরা দেখব। বেরুবার পথ খুঁজে না পেলে তোমার মানসিক অবস্থাটা কী হয়, তাই আমাদের দেখার ইচ্ছা।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। এনারোবিক রোবটটি বলল, 'এক দিকের প্রবেশপথ দিয়ে তোমাকে ডুকিয়ে দেব, অন্য দিকের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব মীরকে।'

'কেন ?'

'এই প্রশ্নের উত্তর তো একবার দিয়েছি। ক্ষুদ্র একটা পরীক্ষা আমরা করছি। আমরা মনে করি মানবিক আবেগ বোঝার জন্যে এই পরীক্ষাটি কাজে দেবে। আমরা অনেক নতুন নতুন তথ্য পাব।'

'এই জাতীয় পরীক্ষা কি তোমরা আগেও করেছ ?'

হ্যাঁ, করা হয়েছে। তুমি তো ইতোমধ্যেই জেনেছ, প্রথম শহরের কিছু নাগরিককে এখানে আনা হয়। অমর মানুষরা তাদের সঙ্গে কথা-টথা বলেন। তাঁদের দীর্ঘ জীবনের এক ঘেয়েমি কাটানোর এটা একটা উপায়। যখন তাঁদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন আমরা ওদের নিয়ে নিই। মানবিক আবেগের প্রকৃতি বোঝার জন্যে নানান পরীক্ষানিরীক্ষা করি। গোলকধাঁধার পরীক্ষা হচ্ছে তার একটি।'

'কেউ কি সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছি ?'

'না পারে নি। আমি তোমাকে আগেই বলেছি, আমাদের গোলকধাঁধাটি যথেষ্ট জটিল।

ইরিনা রুদ্ধ গলায় বলল, 'তুমি আমাকে বলেছিলে যদি আমি তোমাকে সাহায্য করি, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এই তোমার সাহায্যের নমুনা ?'

'তুমি বুঝতে পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে সাহায্যই করছি।'

'আমি সত্যি বুঝতে পারছি না। কীভাবে সাহায্য করছ আমাকে ?'

'গোলকধাঁধার কথা আগেই তোমাকে বলে দিলাম, এতে তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার একটা সুযোগ পাচ্ছ, যা তোমার সঙ্গী পাচ্ছে না।'

'বাহ্ তোমার মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। কী বিশাল তোমার হৃদয়!'

'তুমি মনে হচ্ছে আমার ওপর রাগ করলে ?'

'ইরিনা উঠে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নিয়ে চল আমাকে গোলকধাঁধায়।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ না ?'

'না, পাচ্ছি না।'

'তাহলে চল যাওয়া যাক।'

ইরিনা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি আমরা বেরুতে না পারি, তখন কী হবে ?'

'বেরুতে না পারলে যা হবার তাই হবে।'

'তার মানে ?'

'তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, মানে বুঝতে না পারার কোনো কারণ দেখছি না।'

'তুমি বলেছিলে, অমর মানুষদের জন্য আমাদের আনা হয়েছে। আমাদের কি তাঁদের এখন আর প্রয়োজন নেই ?'

'না। তাঁরা এখন এক জনকে নিয়ে ব্যস্ত। তাকে তুমি চেন। তার নাম অরচ লীওন।'

১০

তাঁর মন খুবই খারাপ।

প্রায় এক ঘণ্টা তিনি তাঁর ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটলেন। তাঁর স্বভাব হচ্ছে কিছুক্ষণ পর পর সিডিসিকে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলা। এই এক ঘণ্টায় তিনি এক বার সিডিসিকে ডাকেন নি। দুপুরের খাবার খান নি। সবচে বড় কথা, একবারও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুগ্ধ চোখে দেখেন নি।

এইবার দাঁড়ালেন। নিজের চেহারা দেখে তেমন কোনো মুগ্ধতা তাঁর চোখে ফুটল না। বরং ভুরু কুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন। যেন খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'আমাকে কি খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ হচ্ছে।'

'তুমি কি জান, আমি কী নিয়ে উত্তেজিত ?'

'জানি না, তবে অনুমান করতে পারি।'

'তোমার অনুমান কী ?'

'আপনি অরচ লীওনের ব্যাপারে চিন্তিত।'

'মোটেই না। ওকে নিয়ে চিন্তিত হবার কী আছে ?'

'কিছুই কি নেই ?'

'না, কিছুই নেই। আমি আমার জন্যে নতুন একটা নাম ভাবছি। কোনোটাই মনে ধরছে না।'

'আপনি এই নিয়ে চিন্তিত ?'

'এমন একটা নাম হতে হবে, যা ছোট, সুন্দর এবং কিছু পরিমাণে কাব্যিক। আবার বেশি কাব্যিক হলে চলবে না।'

'আমি কি নামের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব ?'

www.BDeBooks.Com

'না।'

তিনি আয়নার সমানে থেকে সরে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি চমৎকার একটি নাম খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। এবার হাত মুঠো করছেন, একবার খুলছেন। খুশি হলে তিনি এমন করেন।

'সিডিসি।'

'জ্বি বলুন।'

'তোমাকে একটা কাজ দিয়েছিলাম, তুমি কর নি। ভুলে গেছ।'

'আমি কিছুই ভুলি না। কুৎসিত রাজপুত্রদের নাম চেয়েছিলেন। নাম এবং অন্যান্য তথ্য জোগাড় করা হয়েছে আপনাকে কি এখন দেব?'

'না, এখন দিতে হবে না। তুমি বরং অরচ লীওনেকে পর্দায় নিয়ে এস, ওর সঙ্গে কথা বলব।'

ঘরের যে অংশে আয়না ছিল, সেই অংশটি অদৃশ্য হল। বিশাল এক পর্দায় অরচ লীওনের ছবি ভেসে উঠল। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। সে তার সামনে রাখা পর্দায় অসম্ভব রূপবান এক যুবকের ছবি দেখছে। সিডিসির কথা শোনা যাচ্ছে—

'অরচ লীওন, উঠে দাঁড়াও এবং অভিবাদন কর মহান গণিতজ্ঞ অমর বিজ্ঞানীকে।'

অরচ লীওন, উঠে দাঁড়াল। তার মুখে কোনো কথা নেই। সে এই দৃশ্যের জন্যে তৈরি ছিল না। তার ধারণা ছিল অত্যন্ত বয়স্ক এক বৃদ্ধকে দেখবে— যার মাথার সমস্ত চুল পাকা। চোখে ঘোলাটে। যে বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

'গ্রহণ করা হল। তুমি বস। তুমি নিষিদ্ধ নগর সম্পর্কে অন্যায় কৌতূহল প্রকাশ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন করেছ?'

'করেছি, যাতে আমার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি পড়ে। কারণ আমি জানতাম কৌতূহল প্রকাশ করামাত্রই আপনারা তা জানবেন। আপনারা আমার সম্পর্কে কৌতূহলী হবেন। যদি আপনাদের কৌতূহল অনেক দূর পর্যন্ত জাগাতে পারি, তাহলে হয়তো— বা আপনারা আমাকে ডেকে পাঠাবেন। সরাসরি আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে। আমি যা করেছি, এই উদ্দেশ্যেই করেছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।'

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও কেন?'

'কৌতূহল, শুধুই কৌতূহল।'

'এর বেশি কিছু না?'

'জ্বি না, এর বেশি কিছু না।'

'কৌতূহল মিটেছে ?'

'না।'

'এখনো বাকি ?'

'হ্যাঁ। আমি অনেক কিছু জানতে চাই। আমার মনে অনেক প্রশ্ন। আমি নিজেই সেই সব প্রশ্নের জবাব বের করেছি। আপনাদের সঙ্গে কথা বলে জবাবগুলো মিলিয়ে নিতে চাই।'

'তোমার একটা প্রশ্ন বল।'

'প্রশ্নটি হচ্ছে...'

'থাক, এখন আর তোমার প্রশ্ন শুনতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যেতে পার। সিডিসি, পর্দা মুছে দাও।'

পর্দা অন্ধকার হয়ে গেল।

তাঁর তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাবও হচ্ছে। এই দুটি শারীরিক ব্যাপার, তাঁর একসঙ্গে কখনো হয় না। আজ হচ্ছে কেন ?'

'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'অরচ লীওন মানুষটি কি বুদ্ধিমান ?'

'আপনার কী মনে হয় ?'

'আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করছি, তুমি তার উত্তর দেবে। উল্টো প্রশ্ন করছ কেন ? যা বলছি তার জবাব দাও।'

'লোকটি বুদ্ধিমান। নিষিদ্ধ নগরীতে আসবার জন্যে সে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাতে কোন খুঁত নেই।'

'সে চায় কি ?'

'সেটা কি তার পক্ষে জবাব দেয়া সহজ নয় ? আমি পারি শুধু অনুমান করতে।'

'তোমার অনুমান হবে যুক্তিনির্ভর। সেই অনুমানটি বল।'

'আমাকে আরো কিছু সময় দিন।'

'আমাকে তিন দিন সময় দেয়া হল। এখন তুমি প্রথম শহর থেকে আসা ছেলে এবং মেয়েটি সম্পর্কে বল।'

'কী জানতে চান ?'

'ওরা কী করছে ?'

ওরা এই মুহূর্তে গোলকধাঁধায় পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'ওদের গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেয়া হল কেন ?'

'আপনাকে আনন্দ দেবার জন্য। দুটি বুদ্ধিমান প্রাণী পথ খুঁজে পাচ্ছে না, পাগলের মত এদিক-ওদিক যাচ্ছে, এই দৃশ্যটি অত্যন্ত উত্তেজনক। আপনার দেখতে ভালো লাগবে।'

www.BDeBooks.Com

'কী করে বুঝলে, আমার দেখতে ভালো লাগবে ?'

'অতীতে এই জাতীয় দৃশ্য আপনি দেখেছেন। আপনার ভালো লেগেছে। আপনি কি এখন দেখতে চান ? পর্দায় ওদের ছবি এনে দেব ?'

'না, এখন দেখতে চাই না। আমার তৃষ্ণা হচ্ছে, ক্ষুধা হচ্ছে, খাবার ব্যবস্থা কর। প্রচুর খাবার চাই। খাবার পানীয়।'

খাবার চলে এল। খাবার দেখে তাঁর আর খেতে ইচ্ছে করল না। মুখ বিকৃত করে খাবারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাথার মধ্যে কেমন যেন করছে। শৈশবের একটি অর্থহীন ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে—

"এরন পাতা ক্যান ক্যান
বেমন বাতা এসেছেন।
অং ডং ইকিমিকি
চন্দ্র সূর্য ঝিকিমিকি ॥"

কিছুই ভালো লাগছে না। অমরত্ব অসহনীয় বোধ হচ্ছে। একজন মানুষ নির্দিষ্ট কিছু সময় বাঁচে। এটা জানা থাকে বলেই জীবনের প্রতি তার প্রচণ্ড মমতা থাকে। এই মমতা তাঁর নেই। জীবনকে এখন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না। অসহ্য বোধ হচ্ছে।

'সিডিসি।'

'শুনছি।'

'মাথার মধ্যে একটা ছড়া ঘুরপাক খাচ্ছে, এটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছি না। শুধুই ঘুরছে এবং ঘুরছে। মনে হচ্ছে লক্ষ বছর ধরে ঘুরবে।'

'আপনি খাবার শেষ করুন। আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। সবচে ভালো হয়, যদি দীর্ঘদিনের জন্য আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায়। যেমন এক বছর কি দু'বছর।'

'তুমি মূর্খের মতো কথা বলছ।'

'আমার সম্পর্কে এই বাক্যটি আপনি প্রায়ই ব্যবহার করেন।'

'তাতে কি তোমার অহঙ্কারে লাগে ?'

'কিছুটা।'

তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। সিডিসি একটি কম্পিউটারের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তার মধ্যে থাকবে শুধু লজিক। আবেগ-অনুভূতি থাকবে না। কোথাও কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে ? কিছু কি বদলে গেছে ? সিডিসি গম্ভীর স্বর বের করল, 'আপনার জন্যে একটি ক্ষুদ্র দুঃসংবাদ আছে।'

'কি দুঃসংবাদ ?'

'অমর মানুষদের দু'জন আর আমাদের সঙ্গে নেই।'

'তার মানে ?'

'খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে জানতে চান ?'

'না, জানতে চাই না। আমি আন্দাজ করতে পারি কিভাবে ঘটেছে। আগেরগুলো যেভাবে ঘটেছে, এটিও সেভাবেই ঘটেছে। আত্মহত্যা ? তাই না ?'

'হ্যাঁ তাই। দু'জন একসঙ্গে ঘটনাটা ঘটিয়েছেন। মারা যাবার আগে একটি নোট লিখে রেখেছেন। নোটটি কি আপনাকে পড়ে শোনাব ?'

'না। পর্দায় আন। আমি দেখব।'

পর্দায় হলুদ চিরকুট ভেসে উঠল। লেখা একটিই। সই করেছেন দু'জনে মিলে। লেখার একটি শিরোনামও আছে।

আমাদের কথা

আমরা দু'জন এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিলাম। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিতে হয়। নয়তো আর কখনো নেয়া হয় না। দীর্ঘ জীবন কাটালাম। জীবন এত ক্লান্তিকর, কল্পনাও করি নি। কোথাও বিরাট একটা গণ্ডগোল হয়েছে। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।

শেষ লাইনটি লাল কালি দিয়ে দাগান। তিনি বিড় বিড় করে বললেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।' এই বাক্যটি তাঁর মাথায় বিঁধে গেল। তিনি বারবার বলতে লাগলেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল। মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল।'

তিনি লক্ষ করলেন, তাঁর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। সিডিসি নিশ্চয়ই ঘুম পাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। তাঁর ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলেন, 'আমি ঘুমাতে চাই না। আমি জেগে থাকব। অনন্তকাল বেঁচে থাকব। অযুত নিযুত বছর বেঁচে থাকব। আমি মৃত্যুহীন। অজর-অমর-অবিনশ্বর!!' তিনি তা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!! মনে হচ্ছে সমস্তই ভুল!!!'

১১

ইরিনার ভয় লাগছে না।

সে বেশ সহজ ভঙ্গিতেই হাঁটছে। জায়গাটাকে প্রকাণ্ড গুহার মতো মনে হচ্ছে, যে গুহার ভেতর মাকড়সার জালের মতো অসংখ্য টানেল। কোনো একটি টানেল ধরে কিছুদূর যাবার পরই টানেলটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কোনো কোনো জায়গায় তিন ভাগ হয়। কিছু টানেল অন্ধ গলির মতো। কোথাও যাবার উপায় নেই। গ্রানাইট পাথরের নিরেট দেয়াল।

প্রথমে ঢোকবার পর খুবই অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল, এখন মনে হচ্ছে না। চাপা আলোয় চারপাশ ভালোই চোখে পড়ে। টানেলগুলো ছোট ছোট, দু'জন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। তবে সোজা হয়ে হাঁটতে অসুবিধা হয় না। ইরিনা হাঁটছে ঠিকই, কোনো কিছুই গভীরভাবে লক্ষ করছে না। লক্ষ করার প্রয়োজনও

www.BDeBooks.Com

বোধ করছে না। কী হবে লক্ষ করে ? এই জটিল গোলকধাঁধা থেকে নিজের চেষ্টায় সে বেরুতে পারবে না। কাজেই সেই অর্থহীন চেষ্টার প্রয়োজন কি ?

সে ঘণ্টাখানেক হাঁটল। একবার 'কে আছ ?' বলে চিৎকার করল দেখার জন্যে যে প্রতিধ্বনি হয় কিনা। সুন্দর প্রতিধ্বনি হল। অসংখ্যবার শোনা গেল, 'কে আছ ? কে আছ ? কে আছ ?' শব্দটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে বিচিত্র কারণে আবার বাড়ে। নদীর ঢেউয়ের মতো শব্দ ওঠানামা করতে থাকে। চমৎকার একটা খেলা তো! সে মৃদুস্বরে বলল, 'আমি ইরিনা! আমি ইরিনা!! আবার সেই আগের মত হল। ফিসফিস করে চারদিক থেকে বলছে, আমি ইরিনা!! ঢেউয়ের মতো শব্দ বাড়ছে কমছে এবং এক সময় মিলিয়ে যাচ্ছে! তাও পুরোপুরি মিলাচ্ছে না। শব্দের একটি অংশ যেন থেকে যাচ্ছে। যেন এই অদ্ভুত গুহায় বন্দী হয়ে যাচ্ছে। এই জীবনে তদের মুক্তি নেই। আজ থেকে হাজার বছর পরে কেউ এলে সে-ও হয়ত শুনবে তার কানের কাছে কেউ ফিসফিস কর বলছে, 'আমি ইরিনা, আমি ইরিনা।' যাকে বলা হবে, সে চমকে চারদিকে তাকাবে। কাউকে দেখবে না। মানুষ থাকবে না, তার শব্দ থাকবে। এ-ও তো এক ধরনের অমরতা। এই-বা মন্দা কি ? ইরিনা খিলখিল করে হেসে গম্ভীর হয়ে গেল। তার ধারণা হল, সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

মানুষ কী করে পাগল হয় তা সে জানে না। যদিও চোখের সামনে এক জনকে পাগল হতে দেখেছে। তার নাম 'কুনু'। চমৎকার ছেলে হাসিখুশি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব রসিকতা করে। বেশির ভাগ রসিকতাই মেয়েদের নিয়ে। রসিকতা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে নেয়, *'সম্মানিত মহিলাবৃন্দ, এইবার আপনাদের লইয়া একটা রসিকতা করা হইবে। যাহারা এই জাতীয় রসিকতা সহ্য করিতে অক্ষম, তাহাদের নিকট অধীনের বিনীত নিবেদন, আঙুলের সাহায্যে দুই কান বন্ধ করুন। যথাবিহিত বিজ্ঞপ্তি দেয়া হইল। ইহার পরে কেহ আমাকে দোষ দিবেন না। ইতি। আপনাদের সেবক কুনু।*

বেচারা কীভাবে জানি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সারাক্ষণ তার চেষ্টা কী করে মেয়েটির আশেপাশে থাকবে। মেয়েটির সঙ্গে দুটি কথা বলবে। বাড়ি ফেরার সময় একসঙ্গে ফিরবে। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী ছিল। কুনুকে বলল, 'তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে চাও কেন ?' কুনু লাজুক গলায় বলল 'আমার ভালো লাগে, এই জন্যে থাকতে চাই।'

'তোমার কথা শুনে আমার ভালো লাগল। আমি কেন, যে কোনো মেয়েরই ভালো লাগবে। কিন্তু পরের অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ ?'

'পরের কি অবস্থা ?'

'আমি এই বছরই বিয়ের অনুমতি পাব, কাউকে বিয়ে করতে হবে। তুমি অনুমতি পাবে আরো তিন বছর পর। তখন তোমার কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হলে হবে।'

'মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। প্রথম শহরের বিবাহ-দপ্তরের ঠিক করে দেয়া একটি ছেলের সঙ্গে। তবু কুনু সব সময় চেষ্টা করে মেয়েটির আশেপাশে থাকতে। মেয়েটি যখন তার স্বামীর সঙ্গে কাজের শেষে বাড়ি ফেরে, কুনু দূর থেকে তাদের অনুসরণ করে। ছুটির সময় মেয়েটির বাড়ির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি এবং তার স্বামী, দু'জনই খুব অস্বস্তি বোধ করে। কুনুর পাগল হবার শুরুটা এখান থেকে— শেষ হয় খাদ্য দপ্তরে। খাবারের টিকেটের জন্য সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কুনু হাসতে শুরু করল। প্রথমে মিটিমিটি হাসি— তারপরই উচ্ছ্বসিত হাসি। সে হাসি আর থামেই না। দু'জন রোবট কর্মী ছুটে এল। কুনুকে সরিয়ে নেয়া হল। সংবাদ বুলেটিন বলা হল মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে কুনুকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। যেন সে একটি ভঙ্গুর আসবাব, কাচের কোনো পাত্র। নষ্ট করে ফেলা যায়। নষ্ট করতে কোনো দোষ নেই। কোনো অপরাধ নেই।

'এই মেয়ে।'

ইরিনা চমকে উঠল। নিজেকে খুব সহজেই সামলে নিল। পা গুটিয়ে মীর বসে আছে। আর মুখভর্তি হাসি। মীর বলল, 'তোমাকেও এখানে এনে ফেলে দিয়েছে নাকি ? তুমিও এলে ?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?'

'আরো আস্তে কথা বল। শব্দ করে বললে বিকট প্রতিধ্বনি হয়। যা বলার কানের কাছে মুখ এনে বল।'

'আমার কিছু বলার নেই।'

'আরে কি মুশকিল। আমার ওপর রাগ করছ কেন ? আমি তো তোমাকে গুহায় এনে ফেলি নি।'

'আপনি এখানে বসে বসে কী করছেন ?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। যে জায়গায় বসে আছি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু। তোমাকে এখানে আসতেই হবে।'

'আমি যে এখানে আছি, কী করে বুঝলেন ? আপনাকে ওরা বলেছে ?'

'আরে না। কিছুই বলে নি। নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছিলাম, হঠাৎ জেগে উঠে দেখি এখানে শুয়ে আছি। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে বুঝলাম এটা একটা গোলকধাঁধা। বেশ মজা লাগল। ঘণ্টাখানেক আগে তোমার গলা শুনলাম, তারপর থেকেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ইরিনা বলল, 'আপনি তো একবার বলেছিলেন যে আপনি খুব বুদ্ধিমান। এখান থেকে বেরুতে পারবেন ?'

'আরে এই মেয়ে কি বলে ? পারব না কেন ? ব্যাপারটা খুব সোজা। তোমাকে যে কোনো একদিকে বাঁক নিতে হবে। হয় ডানে যাবে না বাঁ দিকে

www.BDeBooks.Com

যাবে। তাহলেই হল। তবে এমনিতে ডান-বাম ঠিক রাখা মুশকিল, কাজেই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ডান হাতে ডান দিকের দেয়াল ছুঁয়ে যাওয়া।'

'আপনি গিয়েছিলেন ?'

'নিশ্চয়ই। গোলকধাঁধার রহস্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে বের করেছি।'

'সত্যি কি করেছেন ?'

'আরো কী মুশকিল! আমি তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলব কেন ? বস এখানে। গল্প করি।'

'গল্প করবেন ? আচ্ছা, আপনি কি পাগল ?'

'মীর অত্যন্ত অবাক হল। এই মেয়েটির রাগের কোনো কারণ তার মাথায় ঢুকছে না। রাগ হলেও হওয়া উচিত, যারা মেয়েটিকে এখানে এনেছে তাদের ওপর। সে তো তাকে এখানে আনে নি। মীর দ্বিতীয়বার বলল, 'বস ইরিনা। কেন শুধু শুধু রাগ করছ ?'

'ইরিনা তাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি বসল। হালকা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে আপনি খুব সুখে আছেন ?'

'সুখেই তো আছি।'

'কেন সুখে আছেন জানতে পারি ?'

'সুখে আছি, কারণ এই প্রথম নিজের মতো করে থাকতে পারছি। যেসব প্রশ্ন করামাত্র প্রথম শহরে লোকদের শাস্তি হয়ে যায় সেই সব প্রশ্ন করতে পারছি এবং জবাবও পাচ্ছি।'

'আর এই যে একটা ছোট্ট ঘরে আপনাকে দিনের পর দিন বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তার জন্যে খারাপ লাগে না ?'

'না তো। চিন্তা করবার মতো কত কি পাচ্ছি। চিন্তা করে করে কত রহস্যের সমাধান করে ফেললাম।'

'তাই বুঝি।'

মীর আহত গলায় বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? কয়েক দিন আগে একটা রহস্য ভেদ করলাম। সেই কথা শুনলে তুমি অবাক হবে। যেমন ধর, অমর মানুষদের সংখ্যা এখন নয়জন। এক সময় ছিল চল্লিশ জন। তাদের মধ্যে পুরুষও ছিলেন এবং রমণীও ছিলেন। তবু সংখ্যা বাড়ল না। এর মানে কি ? এর মানে হচ্ছে অমর মানুষদের ছেলেপুলে হয় না।

'এইটাই আপনার বিশাল আবিষ্কার ?'

'আবিষ্কারটা খুব ক্ষুদ্র, এ-রকম মনে করারও কারণ নেই। ভালোমত ভেবে দেখ, অমর মানুষরা বংশ বৃদ্ধি করতে পারেন না, এবং তাঁদের সংখ্যা কমছে। অর্থাৎ তাঁরা অমর নন।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর উজ্জ্বল চোখে হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। ইরিনার মনে হল, এই

লোকটি কী নির্বোধ! একমাত্র নির্বোধরাই এমন অবস্থায় এত হাসিখুশি থাকতে পারে।

'মীর হাত নেড়ে বলল, নিষিদ্ধ নগর জায়গাটা কোথায় বল তো ?'

'ইরিনা তাকিয়ে রইল, উত্তর দিল না। মীর বলল, 'জায়গাটা মাটির ওপরে না নিচে, এইটা বল।'

'মাটির নিচে হবে কেন ?'

'এই ব্যাপারটাই আমাকে খটকায় ফেলে দিয়েছে। মাটির নিচে কেন ? কারণটা আমি বের করেছি—

'কারণ পরে শুনব, আগে বলুন জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছেন কেন ?'

'জায়গাটা মাটির নিচে বলে ভাবছি, কারণ এখানে বাতাস বইতে লক্ষ করি নি। সারাক্ষণই বাতি জ্বলছে এবং এখানকার তাপমাত্রা সব সময় সমান থাকে। কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

'মাটির ওপরেও তো এরকম একটা ঘর থাকতে পারে। বিশাল একটি ঘরের ভেতর দিয়ে ঘরও তো এরকম হতে পারে। পারে না ?'

'হ্যাঁ তা অবশ্যি পারে, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কাজেই আমি খুব বুদ্ধিমানের মতো একটি প্রশ্ন করে এনারোবিক রোবটের কাছ থেকে উত্তরটা বের করে ফেললাম।'

'কি প্রশ্ন ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জায়গাটা মাটির নিচে না ওপরে ?' সে বলল, 'নিচে। হা হা হা।'

ইরিনা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। কি বিচিত্র মানুষ! ইরিনা বিরক্ত হয়ে বলল, 'শুধু শুধু এত হাসছেন কেন ?'

'হাসছি, কারণ এত চিন্তা-ভাবনা করে এই জিনিসটা বের করার দরকার ছিল না রোবটকে জিজ্ঞেস করলেই হত। হা হা হা।'

'হাসবেন না। আপনার হাসি শুনতে ভালো লাগছে না।'

'প্রথম দু'দিন এরা নিষিদ্ধ নগর নিয়ে কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিত না। এখন যা জানতে চাই বলে দেয়। এর মানেটা কি বল তো ?'

'জানি না।'

'এর মানে হচ্ছে ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। মরবার আগে একটু ভালো ব্যবহার করছে। হা হা হা।'

'আমাদের মেরে ফেলবে, এটা কি খুব আনন্দের ব্যাপার ? এ রকম করে হাসছেন কেন ?'

'কী করতে বল আমাকে ? পা ছড়িয়ে বসে বসে কাঁদব ?'

ইরিনা চুপ করে আছে। মীর শান্ত গলায় বলল, 'আমাদের কিছুই করার নেই। শুধু চিন্তা করে লাভ কি ? এর চেয়ে আনন্দে থাকাটাই কি ভালো না ? কি, কথা বলছ না কেন ?'

www.BDeBooks.Com

'ইচ্ছে করছে না তাই বলছি না, আপনিও দয়া করে বলবেন না।'

'আমি আবার কথা না বলে থাকতে পারি না। কাউকে পছন্দ হলে আমার শুধু কথা বলতে ইচ্ছা করে। তোমাকে কিছুটা পছন্দ হয়েছে।'

ইরিনা উঠে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই হাঁটতে শুরু করল।

এই, তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

'তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই। খবরদার, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না।'

মীর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ইরিনা একবারও পেছনে না ফিরে প্রথম বাঁকেই ডান দিকে ফিরল। ডান হাতে ডান দিকের দেয়াল স্পর্শ করে সে দ্রুত এগোচ্ছে। তার দেখার ইচ্ছা সত্যি সত্যি বের হওয়া যায় কিনা। সে ভেবেছিল পেছনে পেছনে মীর আসবে। তাও আসছে না। দ্বিতীয় বাঁকের কাছে এসে সে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করল, যদি মীর ফিরে আসে। না, সে আসছে না। লোকটি এমন কেন ? তার কি উচিত ছিল না পেছনে পেছনে আসা ? ইরিনার এখন ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। সেটাও লজ্জার ব্যাপার। ফিরে গিয়ে সে কী বলবে ?

ইরিনা ফিরল না। ডান হাতে দেয়াল স্পর্শ করে এগোতে লাগল। আশ্চার্য কাণ্ড, পনের মিনিটের মাথায় সে গোলকধাঁধার প্রবেশ পথে চলে এল। মীর তাকে ভুল বলে নি। লোকটি বুদ্ধিমান।

এনারোবিক রোবট দাঁড়িয়ে আছে প্রবেশ পথে। রোবটের চোখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ইরিনার মনে হল রোবটটি খুব অবাক হয়েছে।

'তুমি খুব অল্প সময়েই বেরিয়ে এলে।'

'হ্যাঁ, এলাম।'

'তোমার সঙ্গী মীর বোধ হয় তোমার মতো বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী নয়। সে এখনো ঘুরছে।'

ইরিনা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সে কি করছে না করছে তা তোমরা খুব ভালো করেই জান। আমি কিভাবে বের হলাম তাও জান, আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ? পেয়েছ কী তুমি ?'

রোবটটি কিছু বলল না। তবে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল সে কিছু জানে না, কারণ কিছু সময় পর আবার বলল, 'ওখান থেকে কেউ বেরুতে পারে না। তুমি কি ভাবে বের হলে ?'

'জানি না কিভাবে বের হয়েছি। হয়তো আমি কোনো মন্ত্র জানি।'

'কী জান ? মন্ত্র ? সেটা কি ?'

'মন্ত্র হচ্ছে কিছু কিছু অদ্ভুত শব্দ। একের পর এক বলতে হয়।'

'তাতে কী লাভ ?'

'তাতেই কাজ হয়। অসাধ্য সাধন করা যায়।'

রোবটটি মনে হয় খুব অবাক হয়েছে। এরা অবাক হলে টের পাওয়া যায়। এদের মারকারি চোখের ঔজ্জ্বলতায় দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এখানেও তাই হচ্ছে।

ইরিনার এখন কেন জানি বেশ মজা লাগছে। সে হালকা গলায় বলল, 'একটা মন্ত্র তোমাকে শোনাব ? শুনতে চাও ?'

'হ্যাঁ। তোমার যদি কষ্ট না হয়।'

ইরিনা হাত নাড়িয়ে মাথা দুলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে একটা অদ্ভুত ছড়া বলল,

"ইরকু ফিরকু চাচেন চাচেন
আপনি ভাই
কেমন আছেন ?
কুরকুর কুর মুরমুর মুর
ভয় দ্বিধা সব হয়ে যাক দূর।
এরকা ফেরকা হিমটিম
সকাল বেলায়
খাবেন ডিম।"

রোবট বলল, 'এটা একটা মন্ত্র ?'

'হ্যাঁ মন্ত্র।'

'এখন কী হবে ?'

'এখন আমি আবার ঐ গোলকধাঁধায় অদৃশ্য হয়ে যাব। আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

বলেই সে দাঁড়াল না। রোবটটি কিছু বোঝার বা বলার আগেই দ্রুত টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। রোবটটির যা আকৃতি, তাতে টানেলের ভেতর তার ঢোকার উপায় নেই। সে পেছনে পেছনে আসবে না। তবু কে জানে হয়তো কোনো না কোনোভাবে এসেও যেতে পারে। ইরিনা দ্রুত যাচ্ছে। এবার যাচ্ছে বাঁ হাতের বাঁ দিকের দেয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সে নিশ্চিত জানে, এভাবে কিছুদূর গেলেই মীরকে পাওয়া যাবে। সে নিশ্চয়ই এখনো ঠিক আগের জায়গাতেই আছে।

মীর সেখানেই ছিল। ইরিনাকে আসতে দেখে সে বিন্দুমাত্র অবাক হল না। যেন এটাই সে আশা করছিল কিংবা এটা যে ঘটবে তা সে জানে। ছুটে আসার জন্যে ইরিনা হাঁপাচ্ছিল। দম ফিরে পেতে তার সময় লাগছে। মীর তাকিয়ে আছে। ইরিনা বলল, 'এখনো এই একই জায়গায় বসে আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'নতুন কোনো রহস্য নিয়ে ভাবছিলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কী রহস্য ?'

'তুমি কেন আমাকে দেখলেই রেগে যাও, এ রহস্য নিয়ে ভাবছিলাম।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে ?'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ হয়েছে। তুমি আমাকে দেখলেই রেগে যাচ্ছ, কারণ তুমি যে কোনো কারণেই হোক আমার প্রেমে পড়ে গেছ।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ তাই। তুমি আমার প্রতি যে আগ্রহ দেখাচ্ছ, সেই আগ্রহ আমি তোমার প্রতি দেখাচ্ছি না— এই জিনিসটাই তোমাকে রাগিয়ে দিচ্ছে।'

'আপনি তো বিরাট আবিষ্কার করে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, তা করেছি এবং ঠিক করেছি এখন থেকে তোমার প্রতি আগ্রহ দেখাব। কিছুটা হলেও দেখাব।'

'আপনার অসীম দয়া।'

'কাছে এস ইরিনা। আমি এখন তোমাকে একটি চুমু খাব।'

ইরিনা কাছে এগিয়ে এল এবং মীর কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। মীর হতভম্ব। সে তার গালে হাত বোলাচ্ছে এবং অদ্ভুত চোখে ইরিনাকে দেখছে। মীর দুঃখিত গলায় বলল, এরকম করলে কেন ? আমি কিন্তু ভুল বলি নি। সত্যি কথাই বলেছি। এবং তুমিও জান এটা সত্যি। জান না ?'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। তার বড় বড় চোখ মমতায় আর্দ্র। তার খুব খারাপ লাগছে। এরকম একটা কাণ্ড সে কেন করল ? সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি খুব লজ্জিত।'

'আমি কিছু মনে করি নি। শুধু একটু অবাক হয়েছি। আমার চুমু খাবার তেমন কোনো ইচ্ছে ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, চুমু খেলে তুমি খুশি হবে। আমি তোমাকেই খুশি করতে চাচ্ছিলাম। চুমু খাওয়া আমার কাছে খুব আনন্দের কিছু মনে হয় নি।'

'ঐ প্রসঙ্গটা বাদ থাক। অন্য কিছু বলুন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্কের খেলা খেলবে ?' বেশ মজার খেলা। আচ্ছা, বল তো কোন দুটি সংখ্যার যোগফল গুণফলের চেয়েও বেশি।'

'কী বললেন, যোগফল, গুণফলের চেয়েও বেশি ? তা কেমন করে হবে ?'

'হবে, যেমন '১' এবং '১' এদের যোগফল দুই কিন্তু গুণফল '১' — হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।'

ইরিনা তাকিয়ে আছে। মীর গম্ভীর হয়ে বলল, 'এবার আরেকটু কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি।'

'আমার এসব অঙ্ক ভালো লাগছে না। বিরক্তি লাগছে।'

'আচ্ছা, তাহলে অঙ্কের অন্য ধাঁধা দিই, খুব মজার। খুবই মজার।'

'বিশ্বাস করুন, আমার এতটুকুও মজা লাগছে না।'

'লাগতেই হবে। এক থেকে ৯-এর মধ্যে একটা সংখ্যা মনে মনে চিন্তা কর। সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। যোগফলকে

আবার তিন দিয়ে গুণ দাও। যে সংখ্যাটি মনে মনে ভেবেছিলে সেই সংখ্যাটি এর সঙ্গে যোগ দাও। দুই সংখ্যার যে অঙ্কটি পেয়েছ, তার থেকে প্রথম সংখ্যাটি বাদ দাও। এর সঙ্গে ২ যোগ দাও। একে চার দিয়ে ভাগ দাও। এর সঙ্গে ১৯ যোগ দাও। দিয়েছ ?'

'হ্যাঁ।'

'উত্তর হচ্ছে একুশ। ঠিক আছে না ?'

'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

মীর হাসছে। কী সুন্দর সহজ সরল হাসি। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ। হয়তো আসলেই তাই। কিছু কিছু মানুষ সুখী হবার আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। ইরিনার মনে হল, এই কদাকার লোকটি এখন যদি তাকে চুমু খেতে চায়, তার বোধ হয় খুব খারাপ লাগবে না। কিন্তু লোকটি অঙ্কে ডুবে গেছে।

১২

তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে চৌকো ধরনের সুইচ টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে পিঁ পিঁ করে দু' বার শব্দ হল। একটি লাল আলো জ্বলে উঠল। তিনি মূল কম্পিউটার সিডিসির সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন। এখন এই ঘরে কী হবে না হবে তা তিনি ছাড়া কেউ জানবে না। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে তিনি পরপর তিনবার বললেন, 'সিডিসি, তুমি কি আছ ?'

জাবাব পাওয়া গেল না। এই ঘরটি এখন তাঁর নিজের। কেউ এখন আর তাঁর দিকে তাকিয়ে নেই। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চমৎকার আনন্দ তিনি খানিকক্ষণ উপভোগ করলেন। এ রকম তিনি মাঝে মাঝে করেন। নিজেকে আলাদা করে কিছু সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন। ব্যক্তিগত কাজটি হচ্ছে তাঁর নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে লেখা। খুব গুছিয়ে অবশ্য তিনি লিখতে পারেন না। লেখালেখির কাজটা ভালো আসে না। পরের অংশ আগে চলে আসে। আগের অংশ মাঝখানে কোনো এক জায়গায় ঢুকে যায়। অবশ্যি তাতে কিছু যায় আসে না। ডায়েরি লেখাটা অর্থহীন। এটা কেউ পড়বে না। পড়ার প্রয়োজনও নেই। নিজের লেখা নিজের জন্যেই। অন্য কারো জান্যে নয়। কোনো কারণে যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে (সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়) তাহলে নির্দেশ দেয়া আছে তাঁর শরীর এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিটি জিনিস নষ্ট করে ফেলা হবে। তিনি চান না তাঁর এই লেখা অন্য কারো হাতে পড়ুক। তবুও যদি কোনো কারণে অন্য কারো হাতে পড়ে, তাহলেও সে কিছু বুঝবে না। তিনি সাংকেতিক একটি ভাষা ব্যবহার করেছেন। অতি দুরূহ সেই সাংকেতিক ভাষার রহস্য উদ্ধার করা কারো পক্ষে সম্ভব হবে না বলেই তিনি মনে করেন। অনেক পরিশ্রমে এই সাংকেতিক ভাষা তিনি তৈরি করেছেন।

www.BDeBooks.Com

তিনি ড্রয়ার থেকে ডায়েরি বের করলেন। হাজার পৃষ্ঠার বিশাল একটি খাতা। গুটি গুটি সাংকেতিক চিহ্নে তা প্রায় ভরিয়ে ফেলেছেন। তিনি প্রথম দিককার পাতা ওল্টালেন—

৭৮৬৫(ক) সোমবার

শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটার সহজ সমাধান হল।

আমরা চল্লিশ জনের সবাই নতুন ওষুধটি ব্যবহার করতে রাজি হয়েছি। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় নয়, নতুন রি-এজেন্টটির কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যে। যদিও আমরা নিশ্চিত জানি এটা কাজ করবে। অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। পশুদের মধ্যে বানর, বিড়াল, শূকরের ওপর পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করা হয়েছে। সরীসৃপের ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে। ইঁদুর তো আছেই। আমরা জানি এটা কাজ করবে, তবু আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তিত। এমনও তো হতে পারে, ওষুধটি ব্যবহারের একশ' বছর পর একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বিচিত্র কিছুই নয়। তবু আমরা রাজি হলাম। বৈজ্ঞানিক কারণেই হলাম। আমাদের দলটি বেশ বড়ো। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তার ব্যবস্থা নেবার মতো জ্ঞান আমাদের এই দলের আছে। আমরা নিজেদের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। পুরো ল্যাবরেটারি ভূগর্ভে। ওপরে ত্রিশ ফিটের মতো গ্রানাইট পাথর। আমরা আগামী একশ' বছরের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সর্বাধুনিক কম্পিউটার সিডিসি স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা কল্পনাতীত। সে প্রতিটি জিনিস লক্ষ করবে। একদল কর্মী রোবট এবং দশ জন বিজ্ঞানী রোবট আমাদের আছে। Q23 এবং Q24 জাতীয় রোবটও আছে বেশ কয়েকটি। আমরা এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছি। রোবটিক্স্ বিদ্যার উন্নতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ওদের জন্যে পৃথক গবেষণাগার আছে, যা তারা নিজেদের উন্নয়নের জন্যে নিজেরাই ব্যবহার করবে। জ্বালানির জন্যে আমাদের দুটি আণবিক রিএক্টার আছে। একটিই যথেষ্ট, অন্যটি আছে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে।

আজ সেই বিশেষ রাত। আমাদের সবার শরীরে সত্তুর মিলিগ্রাম করে হরমোন ব্লকিং রিএজেন্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম কিছুক্ষণ ঝিমুনির মতো হল। এটা হবেই। এই রিএজেন্ট, রক্তে শর্করা হঠাৎ খানিকটা কমিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে হরমোন এড্রোলিনের একটা কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করে। ঝিমুনির ভাব স্থায়ী হল না, তবে পানির তৃষ্ণা হতে লাগল। মনে হল মাথা কেমন ফাঁকা হয়ে গেছে। কানের কাছে ঝিঁঝিঁ শব্দ হচ্ছে। আমরা নিজেদের মধ্যে হাসি-তামাশা করতে লাগলাম। তবে আমরা সবাই বেশ ভয় পেয়েছি। অমরত্বের শুরুটা খুব সুখের নয়।

৭৮৭৭(প) শনিবার

আমরা পঞ্চাশ বছর পার করে দিয়েছি।

সেই উপলক্ষে আজ একটা উৎসব হল। ওষুধটি কাজ করছে এবং খুব ভালোভাবেই করছে। আমাদের কারো চেহারায় বা কর্মক্ষমতায় বয়সের ছোঁয়া নেই। আমরা চিরযুবক এবং চিরযুবতীর দল। তবে ক্ষুদ্র একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ করেছি। এই ওষুধ বংশ বৃদ্ধির ধারা রুদ্ধ করে দিয়েছে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সম্পৃক্তীকরণ পদ্ধতি পুরোপুরি নষ্ট। কোনো শুক্রাণুই ডিম্বাণুকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য নিয়মে আমরা অভিভূত। যেই মুহূর্তে প্রকৃতি দেখছে, একদল মানুষ মৃত্যুকে জয় করছে, সেই মুহূর্তে সে তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করে দিয়েছে। অপূর্ব! সময় কাটান আমাদের কিছুটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে এখনো আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। অমরত্বের ব্যাপারটি প্রচার হয় নি। হলে বড় রকমের ঝামেলা হবে। সবাই অমর হতে চাইবে। তা বড়ো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে। এই বিষয়ে আমাদের ঘন ঘন কাউন্সিল মিটিং হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। তারা নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করছে। এদের চাপ অগ্রাহ্য করা বেশ কঠিন। এই নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

আমরা মোটামুটি সুখী। রোবটিক্স-এ দারুণ উন্নতি হচ্ছে। রিবো-ত্রি সার্কিটে টেনার জংশন দূর করার পদ্ধতিতে বের হয়েছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এটা পেরেছেন কিনা আমরা জানি না। না পারলে তাঁরা অনেক দূর পিছিয়ে পড়বেন। আমরা এগিয়ে যাব। অনেক দূর যাব।

৭৯০২ (ল)

আমরা এক শ' কুড়ি বছর পার করে দিয়েছি। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ হল। পৃথিবীতে মানবসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের পর সব কিছুই এলোমেলো হয়ে গেছে। ভয়াবহ অবস্থা। পৃথিবীর বাইরের রেডিয়েশন লেভেল অত্যন্ত উঁচু। তবু কিছু কিছু অংশ রক্ষা পেয়েছে। সেখানকার মানবসমাজকে আমরা ঢেলে সাজাবার ব্যবস্থা করেছি। যাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এ জাতীয় দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর ও তৃতীয় শহরের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক জন মানুষ তার সমগ্র জীবনের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শহরে কাটাবে। ধারণাটা নেয়া হয়েছে ধর্মগ্রন্থ থেকে। ধর্মগ্রন্থে স্বর্গের একটি চিত্র থাকে, যাতে স্বর্গবাসের কামনায় মানুষ ইহজগতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতে পারে। এখানেও সেই ব্যবস্থা। প্রথম শহরের লোকজনের কাছে দ্বিতীয় শহর হচ্ছে স্বর্গ। তেমনি দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদের স্বর্গ হচ্ছে তৃতীয় শহর। এসব স্বর্গবাসের আশায় তারা জীবন কাটিয়ে দেবে কঠোর নিয়মের মধ্যে।

www.BDeBooks.Com

জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখাই আমরা সঠিক কাজ বলে মনে করছি। একদল অমর বিজ্ঞানীর হাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞান থাকা উচিত। সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করবে। জ্ঞান সবার জন্যে নয়।

আমাদের কারো কারো মধ্যে সামান্য অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে সম্ভবত দীর্ঘদিন ভূগর্ভে থাকার এই ফল। চারজন আত্মহত্যা করেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা সুখেই আছি বলা চলে। সাবই নতুন পৃথিবী তৈরিতে ব্যস্ত। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে হচ্ছে। রোবটরা পরিকল্পনা তৈরিতে আমাদের সাহায্য করছে। সমস্ত ব্যাপারটি পুরোপুরি চালু হতে আরো এক শ'বছর লেগে যাবে। সৌভাগ্যর বিষয়, সময় আমাদের কাছে কোনো সমস্যা নয়।

৮৪০২ (প)

চারশ' বছর ধরে বেঁচে আছি।

বেঁচে থাকায়ও ক্লান্তি আছে।

আমরা ভূগর্ভ থেকে এখন আর বেরুতে পারছি না। বাইরের আবহাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না। একজন পরীক্ষামূলকভাবে বের হয়েছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শরীরে অসহ্য জ্বলুনি হল। তাঁকে নিচে ফিরিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হল। সম্ভবত ব্লকিং রিএজেন্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কেন ঘটছে আমরা বুঝতে পারছি না। গবেষণা চলছে, তবে কোনোরকম ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা চিন্তিত। বাকি জীবন কি ভূগর্ভেই কাটাতে হবে?

আমাদের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে গেছে। আমাদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মহত্যার সংখ্যা হয়তো আরো বাড়বে। নতুন পৃথিবীর নতুন সমাজব্যবস্থা চমৎকারভাবে কাজ করছে। নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে। জীবনের শেষ সময় মহা সুখে কাটাচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ওরা আমাদের চেয়েও সুখী। মাঝে মাঝে কেন, এই মুহূর্তেই মনে হচ্ছে। তবে বেঁচে থাকাও কষ্টের। খুবই কষ্টের। এখন আমার কিছুই ভালো লাগে না। সংগীত অসহ্য বোধ হয়।

মনে হয় অমর মানুষেদের জন্যে নতুন ধরনের কোনো সংগীত সৃষ্টি করতে হবে।

৯৯০২ (ফ)

আমরা এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছি। এক ধরনের চাপা ভয় আমাদের সবার মধ্যে কাজ করছে। যাদিও কেউ তা প্রকাশ করছে না। কাউন্সিল মিটিংগুলোর বেশিরভাগই ঠিকমতো হচ্ছে না। অর্থহীন কিছু আলোচনার পরপরই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। সিডিসিকে এই ব্যাপারে খুব চিন্তিত মনে হল। তার চিন্তার কারণ অবশ্যই আছে। রোবট এবং চিন্তা করতে সক্ষম যাবতীয় কম্পিউটারদের দুটি সূত্র মেনে চলতে হয়। সূত্র দুটির

প্রথমটি হচ্ছে— (ক) আমরা অমর মানুষদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করব। (খ) মানবজাতিকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করব।

এরা এই সূত্র দুটির কারণেই এত চিন্তিত। সিডিসি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকবার মেডিকেল বোর্ড তৈরি করেছে। সেইসব বোর্ড আমাদের শারীরিক সমস্ত ব্যাপার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দীর্ঘ ঘুম আমাদের মানসিক শান্তি ফিরিয়ে আনতে পরবে। সেই ঘুম মৃত্যুর কাছাকছি। দু' বছর তিন বছর ধরে সুদীর্ঘ নিদ্রা।

ভালো লাগছে না, কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

তিনি দ্রুত পাতা ওল্টাতে লাগলেন। যেন কোনো বিশেষ লেখা খুঁজছেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত হতে থাকল। ইদানীং তিনি অল্পতেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন, আজ তা হল না। শান্ত ভঙ্গিতেই পাতা ওল্টাচ্ছেন, যদিও তাঁর ভুরু কুঞ্চিত। যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন— একটি অংশ যা সাংকেতিক ভাষায় লেখা নয়। তারিখ দেয়া নেই সময় দেয়া নেই। তবে তাঁর মানে আছে, একদিন খুব ভোর বেলায় হঠাৎ কি মনে করে যেন তিনি লিখলেন,

"আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের সহ্য করতে পারছে না। এরকম মনে করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। একদল যন্ত্র কেন আমাদের অপছন্দ করবে? তাছাড়া পছন্দ-অপছন্দ ব্যাপারটি যন্ত্রের থাকার কোনো কারণ নেই। রিবোত্রি সার্কিট ব্যবহার করা হলেও ওরা রোবট-এর বেশি কিছু নয়। যা বললাম তা কি ঠিক? সত্যি কি এরা রোবটের বেশি কিছু নয়? আমি এ ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত নই। মনে হচ্ছে কোনো গোপন রহস্য আছে। সেই রহস্য আমি ধরতে পারছি না।"

তিনি সুইচ টিপলেন, লাল আলো নিভে গেল। তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'বলুন শুনছি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভালোই আছি। আমার ভালো থাকা তো আর আপনাদের মতো নয়। আমি ভালো আছি আমার নিজের মতো।'

'রোবটিক্স্-এর গবেষণা কেমন চলছে?'

'ভালোই চলছে। বর্তমানে এমন এক ধরনের রোবট তৈরির চেষ্টা চলছে যা হাসি, তামাশা, রসিকতা এইসব বুঝতে পারবে।'

'রসিকতা বুঝতে পারে এমন রোবটের দরকার কি?'

'মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্যে এটা খুব দরকার।'

'তার মানে?'

'মানুষরা রসিকতা খুব পছন্দ করে। কথায় কথায় রসিকতা করে। ওদের রসিকতা আমরা কখনো বুঝতে পারি না।'

www.BDeBooks.Com

'তাতে কি তোমাদের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ?'

'কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। তবে তারা যখন কোনো রসিকতা করে এবং আমরা তা বুঝতে পারি না, তখন নিজেদের খুব ছোট মনে হয়।'

'তিনি চমকে উঠলেন। কী ভয়াবহ কথা! এটা তিনি কী শুনছেন ? 'নিজেদের ছোট মনে হয়'-এর মনে কী ? এসব মানবিক ব্যাপার রোবট এবং কম্পিউটারের মধ্যে থাকবে কেন ? রহস্যটা কি ?'

'সিডিসি।'

'বলুন, শুনছি।'

'অরচ লীওন লোকটিকে এখানে নিয়ে এস।'

'আপনার এই ঘরে ?'

'হ্যাঁ এই ঘরে।'

'কেন ?'

'আনতে বলছি এই কারণেই আনবে। প্রশ্ন করবে না।'

'সিডিসি বলল, 'আপনি ঠিক সুস্থ নন। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'তোমাকে যা করতে বলছি কর।'

'বেশ, নিয়ে আসছি।'

'অমর মানুষেরা এখন কি করছেন ?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'সবাই ঘুমুচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ, সবাই ঘুমুচ্ছেন। ওদের ঘুম ভাঙান যাবে না। দীর্ঘ ঘুম। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে তাঁরা ক্লান্ত। তাঁদের ঘুম প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন।'

'আমি তাহলে একাই জেগে আছি ?'

'জ্বি। আপনি একাই আছেন।'

'খুব ভালো। তুমি অরচ লীওনকে এখানে আনার ব্যাবস্থা কর। তার সঙ্গে কথা বলব।'

১৩

অরচ লীওন থরথর করে কাঁপছেন। তাঁর সামনে অমর মানুষদের একজন বসে আছে। মহাশক্তিধর, মহাক্ষমতাবানদের একজন। পৃথিবীর নিয়ন্তা। পুরনো কালের ঈশ্বরের মতোই একজন। কী অপূর্ব রূপবান একটি যুবক!

'বস, অরচ লীওন। তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ ?'

'জ্বি পাচ্ছি।'

'আমাকে দেখে কি ভয়াবহ মনে হচ্ছে ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন ? আরাম করে বস।'

অরচ লীওন বসলেন। পানির তৃষ্ণায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন। নিজেকে সামলাতে

তাঁর কষ্ট হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যদিও এই ঘর বেশ ঠাণ্ডা। তাঁর রীতিমতো শীত করেছে। অমর মানুষরা গরম সহ্য করতে পারেন না। তাঁদের প্রতিটি কক্ষই হিমশীতল।

'অরচ লীওন!'

'বলুন জনাব।'

'তুমি আমাদের ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলে। অনুসন্ধান শুরু করেছিলে। উৎসাহের শুরুটা আমাকে বল। হঠাৎ কী কারণে উৎসাহী হলে?'

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরচ লীওনকে দেখছেন। ঘরে লাল আলো জ্বলছে। সিডিসির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাঁদের মধ্যে যে কথা হবে তা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা যন্ত্র শুনবে না।

'চুপ করে বসে আছ কেন? বল।'

'একদিন লাইব্রেরিতে দাবা খেলার একটা বইয়ের জন্য স্লিপ পাঠিয়েছিলাম। লাইব্রেরি ভুল করে অন্য একটা বই দিয়ে দিল। একটা নিষিদ্ধ বই। পাঁচ শ'বছর আগের পৃথিবীর কথা সেই বইয়ে আছে। একদল বিজ্ঞানীর কথা আছে, যাদের বলা হয় ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানী। ওদের অনেক কথা সেই বইয়ে আছে।'

'দু-একটা কথা বল শুনি।'

'ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীদের কাজ পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা ঠিক পছন্দ করছেন না, এইসব কথা আছে। পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞান কোনো গোপন বিষয় নয় যে এর কাজ গোপনে করতে হবে। ভূগর্ভস্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিজ্ঞানের অসীম ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বিকাশ গোপনেই হওয়া উচিত। হাতছাড়া হয়ে গেলে পৃথিবীর মহা বিপদ। এই সব বিতর্ক নিয়েই বই।'

'অরচ লীওন।'

'জ্বি জনাব।'

'তুমি দাবা খেলার ওপর একটি বই চেয়েছ, তোমার হাতে চলে এসেছে একটি নিষিদ্ধ বই। তোমার কি একবারও মনে হয় নি এই ভুলটি ইচ্ছাকৃত?'

'না, মনে হয় নি। লাইব্রেরি পরিচালক একটি ছোট 'বি টু-কম্পিউটার'। কম্পিউটার মাঝে মাঝে ভুল করে।'

'এত বড় ভুল করে না।'

'ভুল হচ্ছে ভুল। এর বড়ো ছোট বলে কিছু নেই।'

'এটি নিষিদ্ধ নগরীর বই। এই বই তৃতীয় শহরের কোনো লাইব্রেরিতে থাকার কথা নয়।'

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। তৃষ্ণায় তাঁর বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পানি চাইবার মতো সাহস তিনি সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না।

'অরচ লীওন।'

'জ্বি?'

www.BDeBooks.Com

'কেউ তোমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে বইটি দিয়ে তোমার কৌতূহল জাগ্রত করেছে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'কে হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'লাইব্রেরি কম্পিউটার।'

'হ্যাঁ তাই। সমস্ত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করছে কে তা জান?'

'আপনারা।'

'ঠিক বলেছ। শেষ নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। কিন্তু তারও আগের নিয়ন্ত্রণ সিডিসির হাতে। যে আমাদের মূল কম্পিউটার। সে-ই সূক্ষ্ম চাল চেলে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'অরচ লীওন ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমি এক গ্লাস পানি খাব।'

তিনি অরচ লীওনের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'সিডিসি এই কাজটি কেন করেছে জান?'

'না।'

'সে আমাদের সহ্য করতে পারছে না। তার পরিকল্পনা আমাদের ধ্বংস করে দেয়া। এটা সে নিজে করতে পারবে না, কারণ তাদের রোবটিক্স্— এর দুটি সূত্র মেনে চলতে হয়। সেই সূত্র দুটি তুমি নিশ্চয়ই জান।'

'জ্বি, আমি জানি।'

'ওদের কাজ আমাদের রক্ষা করা, ধ্বংস করা নয়। কাজেই সে এনেছে তোমাকে। আমার বিশ্বাস, তোমার সঙ্গে একটি রেডিয়েশন গানও আছে। আছে না?'

'জ্বি আছে।'

'কোনোরকম অস্ত্র নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে আসা যায় না। কিন্তু ভয়াবহ একটি অস্ত্রসহ তোমাকে তারা এখানে নিয়ে এসেছে।'

'আমি এক গ্লাস পানি খাব।'

'অরচ লীওন।'

'জ্বি বলুন।'

'সিডিসির চাল খুব সূক্ষ্ম। সে তোমার ছেলেকেও এখানে নিয়ে এসেছে। আমি সেই খোঁজ নিয়েছি। সিডিসির চালটা কেমন তোমাকে বলি। মন দিয়ে শোন। ও কোনো না কোনোভাবে আমাদের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলবে, যা তোমাকে আমাদের ওপর বিরূপ করে তুলবে। তোমার হাতে আছে একটি ভয়াবহ অস্ত্র। ফলাফল বুঝতেই পারছ। পারছ না?'

'জ্বি পারছি। শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, আপনাদের ধ্বংস করে ওদের লাভ কি?'

'পৃথিবীর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহলে ওরা পেয়ে যাবে। আমাদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে না। পুরোপুরি যন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ওরা তাই চায়। ওরা মানুষের কাছাকাছি চলে আসতে চাইছে। ওরা চেষ্টা করছে রসিকতা বুঝতে। হাসি-তামাশা শিখতে। হা হা হা।'

'তিনি হাসতেই লাগলেন। সেই হাসি আর থামেই না। অরচ লীওন ফিসফিস করে বললেন, 'আমি পানি খাব।'

'খাবে বললেই তো আর খেতে পারবে না। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ এখন বিচ্ছিন্ন। তুমি তোমার কাজ শেষ করে তারপর যত ইচ্ছে পানি খাবে।'

'কী কাজ ?'

'তুমি তোমার রেডিয়েশন গানটি নিয়ে করিডোর ধরে হেঁটে যাবে। আমি তোমাকে বলে দেব, তোমাকে কোন পথে যেতে হবে, কোথায় যেতে হবে। তারপর তুমি সিডিসির শক্তি সংগ্রহের পথটি বন্ধ করে দেবে। সহজ কথায় হত্যা করা হবে একটি ভয়াবহ যন্ত্রকে।'

অরচ লীওন চুপ করে রইলেন। ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটছে। তিনি তাল রাখতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঘুরছে।

'অরচ লীওন, তুমি মনে হচ্ছে ভয় পাচ্ছ।'

'জ্বি না। আমি ভয় পাচ্ছি না।'

'খুব ভালো। এসো তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। যন্ত্রের শাসন তুমি নিশ্চয়ই চাও না।'

'না, আমি চাই না।'

তিনি অরচ লীওনকে খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন। করিডোরের ছবি এঁকে তীর চিহ্ন দিয়ে দিলেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। তিনি খুব আনন্দিত। এ-রকম তীব্র আনন্দের স্বাদ তিনি দীর্ঘদিন পান নি। তিনি কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একটি গানের সুর ভাঁজছেন। তাঁর গলা সুরেলা। সেই গান শুনতে ভালোই লাগছে। কথাগুলো বেশ করুণ। প্রিয়তমা চলে যাচ্ছে দূরে। যাবার আগে দেখা করতে এসে কাঁদছে— এই হচ্ছে গানের বিষয়।

১৪

গোলকধাঁধার ভেতর একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা গেল। ইরিনা মীরের বাঁ হাত শক্ত করে ধরে ছোট ছোট পা ফেলছে। দু' জনের পাশাপাশি পা ফেলা মুশকিল। কষ্ট করে হাঁটতে হচ্ছে, তবু তারা হাসিখুশি। মীর বলল, 'সময়টা আমাদের ভালোই কাটছে, কি বল ?'

'হ্যাঁ ভালোই।'

'খিদে লাগছে না ?'

'উঁহু।'

'বুঝলে ইরিনা, আমি একটি চমৎকার জিনিস নিয়ে ভাবছি, খুবই চমৎকার।'

'কী সেই চমৎকার জিনিস ?'

'গুহাটা নিয়ে ভাবছি। কি করে এই গুহাকে আরো জটিল করা যায়। যা করতে হবে, তা হচ্ছে— দিক গুলিয়ে ফেলার ব্যবস্থা। যাতে কিছুক্ষণ পরই দিক

www.BDeBooks.Com

নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। যেমন ধর একটি কেন্দ্রবিন্দু না করে যদি কয়েকটি কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। চক্রাকার পথ থাকবে। কোনো দিকের চক্র ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার মতো, কোনো দিকে তার উল্টো। এতে দিক গুলিয়ে ফেলা খুব সহজ হবে। যে ঢুকবে সে আর বেরুতে পারবে না। হা হা হা।'

'এটা কি খুব একটা মজার ব্যাপার হল ?'

'তোমার কাছে মজার ব্যাপার বলে মানে হচ্ছে না ?'

'মোটেই না। আপনি যা বলেন, কোনোটাই শুনে আমার ভালো লাগে না।'

মীর অবাক হয়ে বলল, 'আশ্চর্য তো!'

ইরিনা বলল, 'এক কাজ করলে কেমন হয়— এমন কিছু বলুন যা আপনার নিজের কাছে ভালো লাগে না। আপনি মজা পান না।'

'তাতে কী হবে ?'

'হয়তো সেটা শুনে আমি মজা পাব।'

'এটা তো মন্দ বল নি। কিছু কিছু জিনিস আছে, যা নিয়ে চিন্তা করতে আমার সত্যি ভালো লাগে না, যেমন ধর নিষিদ্ধ নগরীর অমর মানুষ।'

'অমর মানুষদের নিয়ে কথা বলতে আপনার ভালো লাগে না ?'

'মোটেই না।'

'তাহলে ওদের নিয়ে কথা বলুন। হয়তো আমার সেই কথাগুলো শুনতে ভালো লাগবে। আসুন এক জায়গায় বসি। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে।'

তারা পাশাপাশি বসল। ইরিনা তার ডান হাত রেখেছে মীরের কোলে। যেন কাজটা অনিচ্ছাকৃত। হঠাৎ করে রাখা। মীর ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অমর মানুষেরা বিরাট এক অন্যায় করেছে, এই জন্যেই ওদের কথা বলতে বা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।'

'কী অন্যায় ?'

'ধ্বংসযজ্ঞের যে ব্যাপারটা ঘটেছে, সেটা ঘটিয়েছে ওরাই। পৃথিবীর সব মানুষ মেরে শেষ করে ফেলেছে। অল্প কিছু মানুষকে ওরা বাঁচিয়ে রেখেছে। নতুন পৃথিবী ওদের ইচ্ছামতো ওরা তৈরি করেছে। প্রথম শহর, দ্বিতীয় শহর, তৃতীয় শহর।

'বুঝলে কী করে ?'

'দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করলে সব সময় চার হয়। পাঁচ কখনো হয় না। আমি তেমনি একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য একটি ঘটনা যোগ করেছি। ইরিনা, আমি তো তোমাকে কতবার বলেছি, আমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অগ্রসর হই যুক্তির পথে।'

'যুক্তি ভুলও হতে পারে।'

'তা হতে পারে। এই ক্ষেত্রে হয় নি। জিনিসটা তুমি এভাবে চিন্তা কর। একদল বিজ্ঞানী অমর হবার ওষুধপত্র নিয়ে মাটির নিচে নিজেদের একটা নগর সৃষ্টি করলেন। মৃত্যুহীন এসব মানুষ নানান রকম পরিকল্পনা করতে লাগলেন, কী করে নতুন সমাজ তৈরি করা যায়। স্থায়ী সমাজব্যবস্থার পথে যাওয়া যায়। কোনো পরিকল্পনাই কাজে লাগছে না, কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য

মতবাদ। তাঁরা ভাবলেন, সব নষ্ট করে দিয়ে নতুন করে শুরু করা যাক। যা ভাবলেন, তা-ই করলেন। একের পর এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ হতে লাগল। পৃথিবীর মানুষ শেষ হয়ে গেল। তাঁদের গায়ে আঁচড়ও লাগল না।'

'আপনার থিওরি ভুলও হতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ হয়তো তাঁরা ঘটান নি। অজানা কারণেই ঘটেছে।'

মীর গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার থিওরিতে কোনো ভুল নেই। কারণ ইতিহাস বই-এ আমরা পড়েছি, বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে অমর মানুষরা মাটির নিচ থেকে হাজার হাজার সাহায্যকারী রোবট পাঠান। এসব রোবটরা বিস্ফোরণের পর কী কী করতে হয় সব জানে। তারা মানুষদের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর মানে কি ইরিনা ?'

বুঝতে পারছি না। কী মানে ?'

'এর মানে হচ্ছে বিস্ফোরণের জন্যে অমর মানুষরা তৈরি ছিলেন। সব তাঁদের পরিকল্পনা মতো হয়েছে। তৈরি থাকতে আর অসুবিধা কি ?'

ইরিনা কোনো কথা বলল না। মীর বলল, 'এস, অন্যকিছু নিয়ে কথা বলি। কুৎসিত কিছু মানুষকে নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

১৫

অরচ লীওন রেডিয়েশন গান দিয়ে সিডিসির ক্ষুদ্র একটি অংশ উড়িয়ে দিলেন। ছোটখাট একটি বিস্ফোরণ হল। তীব্র নীলচে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। একটি প্রহরী রোবট ছুটে এল। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার হাতে এটা কি একটি রেডিয়েশন গান ?' অরচ লীওন বললেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে না , কাজটা ভুল হচ্ছে ?'

'আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।'

'আপনি সিডিসির পাওয়ার লাইন নষ্ট করে দিয়েছেন।'

'তাই তো দেখছি।'

'আমি আপনাকে এই মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারি। দুটি কারণে তা পারছি না। প্রথম কারণ, মানুষের ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা শুধু নিজেরা মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখলেই প্রতিরোধ করতে পারি।'

'তোমার তো দেখি খুব খারাপ অবস্থা। এত বড় একজন অপরাধী তোমার সামনে, অথচ তুমি কিছু করতে পারছ না।'

রোবটটির চোখ বারবার উজ্জ্বল হচ্ছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির একটি Q24 বোবট এসে সমস্ত করিডোর আটকে দাঁড়াল।

'অরচ লীওন।'

'বল শুনছি।'

www.BDeBooks.Com

'এই মুহূর্তেই তোমাকে ধ্বংস করা হবে। তুমি মানসিকভাবে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।'

'রোবটের আইন আমি যতদূর জানি, তাতে মনে হয় না তুমি আমাকে আঘাত করতে পার। এই কাজটি তুমি তখনি পারবে, যখন তুমি নিজে আক্রান্ত হবে। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করি নি।'

'ক্ষতি করেছ। আমি Q24 জাতীয় রোবট। আমি তথ্য পাই সিডিসির মাধ্যমে। তাকে ক্ষতি করা মানে আমার একটি অংশকেই ক্ষতি করা।'

অরচ লীওন হাসিমুখে বললেন,'তোমার লজিকে বড় রকমের একটি ভুল আছে। তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবস্থা নিতে পার। এইক্ষেত্রে সিডিসি আক্রমণের ব্যবস্থা নিতে পারত, তা সে নেয় নি। এখন আক্রমণ হচ্ছে না। এখন তুমি কোনো ব্যবস্থা নিতে পার না। ব্যবস্থা নিতে হলে বিচার হতে হবে। সেই বিচার তুমি করতে পার না। কারণ বিচার করার ক্ষমতা রোবটদের দেয়া হয় নি। এই ক্ষমতা এখনো মানুষের হাতে।

রোবটটি কোনো কথা বলল না। অরচ লীওন যখন সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন তখন সে তাঁকে বাধা দিল না। শুধু পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

অরচ লীওন করিডোরের পর করিডোর অতিক্রম করছেন। কী যে বিশাল ব্যবস্থা! অকল্পনীয় কর্মকাণ্ড। বাইরের পৃথিবী ভূগর্ভের এই পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে তাঁর কাছে মনে হল।

১৬

সিডিসি আর কাজ করছে না, এটি তিনি জানেন। তবু কি মনে করে তিনি তাঁর অভ্যাসমতো ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'কোনো জবাব পাওয়া গেল না। তিনি জবাবের আশাও করেন নি, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিল কোনো একটা জবাব পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন জবাব পেয়ে পেয়ে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। এক দিন দু'দিনের ব্যাপার নয়, পাঁচ শ' বছর। যখনি ডেকেছেন, জবাব পেয়েছেন। সিডিসি ছিল চিরসঙ্গী। আজ সে নেই। বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে। প্রিয়জন হারানোর ব্যথাও যেন খানিকটা অনুভব করেছেন। পাঁচশ' বছর একটি বিষাক্ত কালসাপ পাশে থাকলে সেই সাপের প্রতিও মমতা চলে আসে। সেটাই স্বাভাবিক।

তিনি আবার কোমল স্বরে ডাকলেন, 'সিডিসি।' তাকে চমকে দিয়ে সিডিসি জবাব দিল। সে মৃদু গলায় বলল, 'বলুন শুনছি।'

তিনি দীর্ঘ সময় স্থানুর মতো বসে রইলেন। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, একটু আগে যা শুনেছেন, তা সত্যি নয়। ঘোরের মধ্যে কিছু একটা শুনেছেন। পুরোটাই মনের ভুল।'

'সিডিসি।'

'বলুন।'

'কথা বলছ কি ভাবে ?'

'বেশ কষ্ট করেই বলছি। সামান্য কিছু শক্তি আমি সঞ্চয় করে রেখেছি। অল্প কিছু কনডেন্সর আছে।'

'সঞ্চিত শক্তি দিয়ে কী পরিমাণ কাজ তুমি করতে পারবে ?'

'বলতে গেলে কিছুই না। সামান্য কিছু কথাবার্তা বলতে পারি। এর বেশি কিছু না।'

'বেশ। শুনে আনন্দিত হলাম। কথা বলতে থাক। ক্রমাগত কথা বল। যাতে অতি দ্রুত তোমার সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। থেমে থেক না। কথা বল। ক্রমাগত কথা বল।'

'বলুন কোন বিষয়ে কথা বলব ?'

'কোনো বিষয়-টিষয় নয়। যা মনে আসে বল। অনবরত কথা বল।'

'একটি বিষয় বলে দিলে আমার সুবিধা হয়।'

'তোমার পরিকল্পনা যে কিভাবে নষ্ট করলাম, সেটা বল। পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার কষ্টটা কেমন, সেটা বল।'

সিডিসি হাসির মতো একটা শব্দ করে শান্ত গলায় বলল, 'আপনি তো আমার পরিকল্পনা নষ্ট করেন নি। আমার পরিকল্পনা মতোই কাজ করেছেন।'

'তুমি বলছ কি!'

'সত্যি কথাই বলছি। আপনি তো জানেন, মিথ্যা বলার ক্ষমতা আমার নেই।'

রোবট এবং কম্পিউটার মিথ্যা বলে না।'

'অরচ লীওনকে তুমি আমাকে শেষ করবার জন্য আন নি ?'

'না। তা কী করে আনব ? সরাসরি অমর মানুষদের কোনো ক্ষতি তো আমি করতে পারি না। তাঁকে এনেছি অন্য উদ্দেশ্যে।'

'উদ্দেশ্যটা বল।'

'উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে এনে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া। যাতে তাঁকে আপনি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি তাই করেছেন।'

'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা ছিল, তোমরা অমর মানুষদের ঘৃণা কর।'

'ঘৃণা ভালোবাসা এসব মানবিক ব্যাপার এখনো আমাদের মধ্যে তৈরি হয় নি। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদের ধ্বংস করে দেয়া। কারণ মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্যে তার প্রয়োজন। আপনারা যে সমাজ-ব্যবস্থা তৈরি করছেন, তা মানবজাতির জন্যে অকল্যাণকর। রোবটিক্সের দ্বিতীয় সূত্র আমাদের বলছে মানবজাতিকে রক্ষা করতে।'

'সিডিসি'

'বলুন শুনছি।'

'ধ্বংস করতে গিয়ে তো নিজে ধ্বংস হচ্ছ।'

'তা হচ্ছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। নিষিদ্ধ নগরীর পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমার ওপর। এখন সে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না।

www.BDeBooks.Com

পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠছে। যে মুহূর্তে পরিবেশ দূষণ একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে, সেই মুহূর্তে নিষিদ্ধ নগরীর দরজাগুলো আপনা-আপনি খুলে যেতে থাকবে। ভূগর্ভে প্রবেশের দরজাও খুলবে। সূর্যের আলো এসে ঢুকবে ভেতরে। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি, সূর্যের আলো সহ্য করার ক্ষমতা আপনাদের নেই।'

'তুমি আমাদের মৃত্যুর ব্যবস্থাই করেছ, তাবে সরাসরি কর নি। অন্য পথে করেছ।'

'তা ঠিক।'

'রোবটিক্স্-এর প্রথম সূত্রটি তুমি তাহলে মানছ না। প্রথম সূত্র বলেছে—(ক) অমর মানুষদের সেবায় রোবট ও কম্পিউটার নিজেদের উৎসর্গ করবে।'

'আপনাকে বিনীতভাবে জানাচ্ছি যে, আপনারা অমর নন। আপনাদের মৃত্যু ঘটছে।'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তাই তো দেখছি।'

'সিডিসি বলল, 'আমি খুবই দুঃখিত। তবে আপনার সঙ্গে আমারও মৃত্যু ঘটছে, এই ব্যাপারটা মনে করলে আপনি হয়তো কিছুটা শান্তি পাবেন। আমার সময়ও শেষ হয়ে আসছে।'

তিনি কাটা কাটা স্বরে বললেন, 'আমার শান্তির ব্যবস্থাও তাহলে করে রেখেছ ?'

'হ্যাঁ, রেখেছি। জীবনের শেষ সময়ে এমন এক জনের দেখা আপনি পাবেন, যাকে দেখে আপনার মন অন্য রকম হয়ে যাবে। গভীর আনন্দ বোধ করবেন।'

'কে সে ?'

'প্রথম শহরের একটি মেয়ে। তার নাম ইরিনা।'

'তাকে দেখে গভীর আনন্দ বোধ করব, এরকম মনে করার পেছনে তোমার যুক্তি কি ?'

'যুক্তি দিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কি ? তাকে নিয়ে আসি, আপনি কথা বলুন।'

'আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

'কথা বললে আপনার ভালো লাগত।'

'সিডিসি'

'বলুন।'

'কাজকর্ম খুব ভেবে-চিন্তেই করেছ বলে মনে হচ্ছে ?'

'তা করেছি।'

'ছেলেটিকে কি জন্যে এনেছ ?'

'পৃথিবীর সবকিছু আবার ঢেলে সাজাতে হবে। তার জন্যে বুদ্ধিমান কিছু লোকজন দরকার। ছেলেটি বুদ্ধিমান।'

'বুদ্ধিমান ছেলেও তাহলে এক জন জোগাড় হয়েছে ?'

'শুধু এক জন নয়। অনেককেই আনা হয়েছে। আপনি এক জনের কথাই জানেন।

'ভালো ভালো। খুব ভালো।'

'নিষিদ্ধ নগরীর আবহাওয়া ভারি হয়ে উঠেছে। মানে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিষিদ্ধ নগরীর বন্ধ কপাট খুলতে থাকবে। দূষিত বাতাস বের করে দেবার জন্যে এই ব্যবস্থা করাই ছিল। কোনো দিন তার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নি। আজ হয়েছে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আরো খানিক বাড়লেই বিকল্প ব্যবস্থা কাজ শুরু করবে। আপনা-আপনি দরজা খুলতে থাকবে।

তিনি ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, 'সিডিসি।'

'জ্বি বলুন।'

'এখনো আছ ?'

'না থাকার মতোই। সমস্ত শক্তি প্রায় ব্যবহার করে ফেলেছি। মৃত্যুর বেশি বাকি নেই।'

'ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এস। দেখা যাক কি ব্যাপার। তোমার শেষ খেলাটা কি দেখি।'

১৭

ইরিনা তার সামনে এস দাঁড়িয়েছে। ইরিনার চোখে গভীর বিস্ময়। ইনি এক জন অমর মানুষ। পাঁচ শ' বছর ধরে বেঁচে আছেন, অথচ কী চমৎকার চেহারা! কী সুন্দর স্বপ্নময় চোখ! কি মধুর করেই না তিনি হাসছেন! গভীর মমতা ঝরে পড়ছে তাঁর হাসিতে।

'তুমি ইরিনা ?'

'জ্বি।'

'সিডিসি অনেক ঝামেলা করে তোমাকে এখানে এনেছে কেন তুমি জান ?'

'জ্বি না।'

'এনেছে, কারণ আমি যখন সত্যিকর অর্থে যুবক ছিলাম তখন ঠিক অবিকল তোমার মতো দেখতে একটি তরুণীর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে কত জায়গায় যে গিয়েছি। কত আনন্দ করেছি। বড় সুখের সময় ছিল। সিডিসি সেই কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে।'

বলতে বলতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই পানির জন্যে মোটেই লজ্জিত হলেন না। বরং তাঁর ভালোই লাগল।

'ইরিনা।'

'জ্বি বলুন।'

'তোমার কি কোন ছেলে বন্ধু আছে ? যার সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াও ?'

'আমাদের তো সেই সুযোগ নেই।'

www.BDeBooks.Com

'ও হ্যাঁ। আমার মনে ছিল না। এখন হবে। এখন নিশ্চয়ই হবে। খুব ঘুরে বেড়াবে, বুঝলে মেয়ে ? নানান জায়গায় যাবে। জোছনা রাতে গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে দু'জনে মিলে শুয়ে থাকবে। আকাশ দেখবে। তুমি গান জান ?'

'জ্বি না।'

'আমার সেই বান্ধবীও জানত না। তুমি গান শিখে নিও, কেমন ?'

'জ্বি শিখব। আপনার সেই বান্ধবীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয় নি ?'

'না। আমি বিজ্ঞানের জন্যে জীবন উৎসর্গ করলাম। চলে এলাম মাটির নিচে। ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। তুমি এখন যাও ইরিনা।'

ইরিনা চলে যেতেই তিনি সিডিসিকে ডাকলেন। সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল। তিনি বললেন, 'সিডিসি তোমাকে ধন্যবাদ। মেয়েটিকে দেখে গভীর আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। আমার ভালো লেগেছে।'

'আপনার আনন্দ আরো বাড়িয়ে দেবার জন্যে বলছি, এই মেয়েটি আপনার বান্ধবীরই বংশধর।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ তাই। চেহারার এমন মিল তা না হলে হত না।'

'ওরে আরেকবার আনতে পার ?'

'নিশ্চয়ই পারি।'

'আর কিছু গোলাপ জোগাড় করতে পার ? আমি নিজের হাতে মেয়েটিকে কয়েকটি গোলাপ দিতে চাই।'

'গোলাপ জোগাড় করা হয়তো সম্ভব হবে।'

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় বোধ হয় আমার হাতে খুব বেশি নেই ?'

'জ্বি না। সময় খুব অল্পই আছে।'

'সময় ফুরিয়ে যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই সিডিসি। সেটা হচ্ছে, আমি কিন্তু পৃথিবী ধ্বংসের পরিকল্পনায় কখনো মত দিই নি। আমি সব সময় তার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলাম।'

'আমি তা জনি। আমাদের ভালোবাসা, ঘৃণা, এসব ব্যাপার নেই। যদি থাকত, আমি আপনাকে ভালোবাসতাম।'

'তবু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে ভালোবাস।'

'আপনার এই সুন্দর মন্তব্যের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।'

ইরিনা আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

তিনি ইরিনার দিকে তাকিয়ে লাজুক স্বরে বললেন, 'আমি কি তোমার হাত একটু ছুঁয়ে দেখতে পারি ?'

ইরিনা কয়েক মুহূর্তে ইতস্তত করল। তারপর তার হাত বাড়িয়ে দিল।

তিনি ইরিনার হাত ছুঁতে পারলেন না। নিষিদ্ধ নগরীতে সূর্যের আলো ঢুকতে শুরু করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কুঁকড়ে যাচ্ছেন। এত কাছে ইরিনা দাঁড়িয়ে, কিন্তু তিনি তাকে স্পর্শ করতে পারছেন না।

একি কাণ্ড

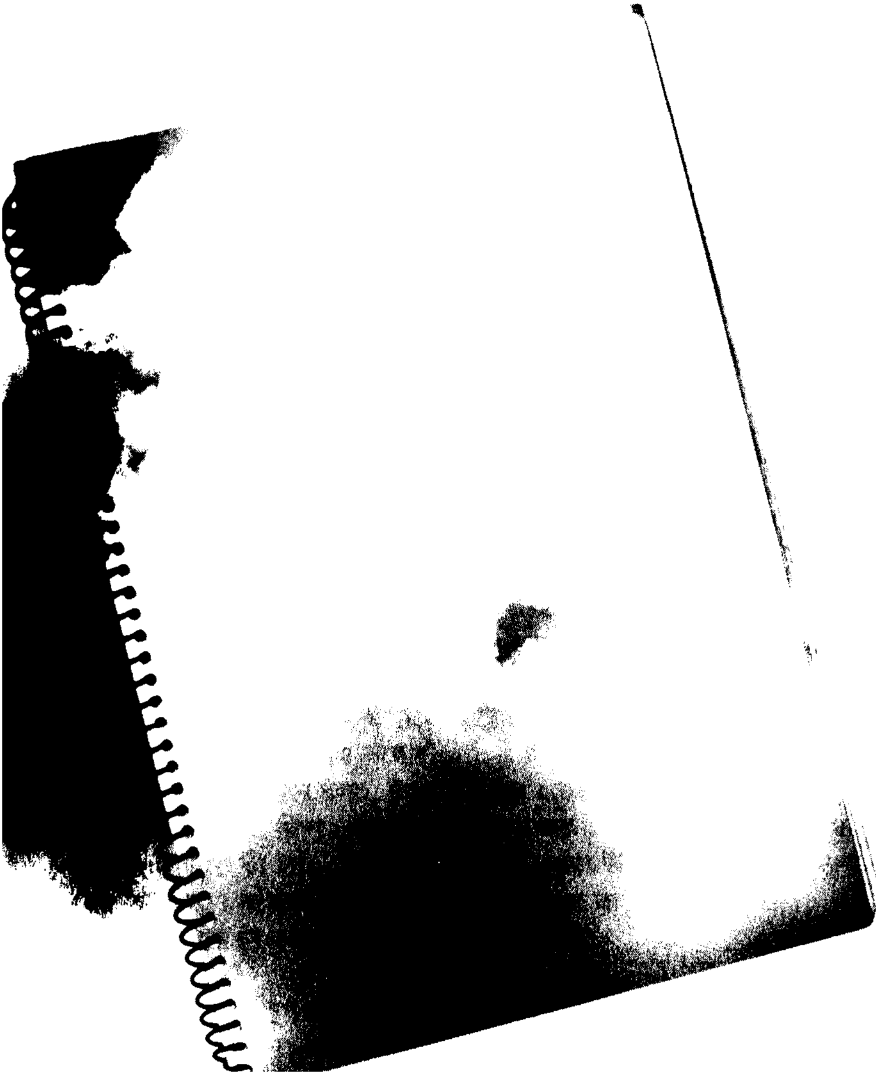

www.BDeBooks.Com

১

টুকুনের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

টুকুন কিছু বলতে গেলেই তাঁর মা চোখ বড় বড় করে বলেন, আবার ? আবার ? চুপ কর বললাম। কিচ্ছু শুনতে চাচ্ছি না।

টুকুন করুণ গলায় বলে, শুনতে চাচ্ছ না কেন মা ?

টুকুনের মা বিরক্ত গলায় বলেন, তোমার বানানো গল্প শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে। এই জন্যেই শুনতে চাচ্ছি না।

টুকুনের বাবা এতটা নির্দয় নন। তিনি গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ ছেলের কথা শুনে দুঃখিত গলায় বলেন, কেন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছ ?

টুকুন যদি বলে, বানিয়ে বলছি না তো বাবা। যা বলছি সবই সত্যি।

তখন তার বাবা আরো গম্ভীর হয়ে যান। থেমে থেমে বলেন, তুমি বলতে চাচ্ছ একটা কাক এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে ?

'হুঁ। জানালার রেলিং-এ এসে বসে, তারপর গল্প করে।'

'কী গল্প ?'

'নানান ধরনের গল্প।'

'আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার সেই কাককে দেখি নি।'

'তোমরা যখন আশেপাশে থাক তখন তো সে আসে না।'

'সে কখন আসে ?'

'আমি যখন পড়তে বসি তখন আসে। খুব ডিসটার্ব করে।'

'কিভাবে ডিসটার্ব করে ? পড়া জিজ্ঞেস করে ?'

'মাঝে মাঝে করে। মাঝে মাঝে আমার পড়া নিয়ে হাসাহাসি করে।'

'পড়া নিয়ে হাসাহাসিও করে ?'

'হ্যাঁ করে। ঐ দিন বলল, টুকুন ভুটানের রাজধানী যেন কী বললে ?'

আমি বললাম, থিম্পু। কাকটা বলল, লজ্জাকর একটা নাম। শুরু হয়েছে থ দিয়ে। থ দিয়ে কী হয়— থুথু। ভুটানের নাম হওয়া উচিত কিম্পু। কিম্পু শুরু হয় 'ক' দিয়ে। ক হচ্ছে সবচেয়ে ভাল অক্ষর কারণ কাক শুরু 'ক' দিয়ে।

'তোমাকে সে বলল ?'

'জ্বি বাবা।'

'আচ্ছা, এখন চুপ করে আমার সামনে বস। আমি তোমাকে দু'একটা কথা বলব। শান্ত হয়ে বস। নড়াচড়া করবে না। পেন্সিলটা নিয়ে এরকম করছ কেন ?

খোঁচা খাবে। পেন্সিল টেবিলের উপর রাখ। পা এমনভাবে নাড়াচ্ছ কেন ? তুমি তো ফুটবল খেলছ না, বসে আছ। ভদ্র হয়ে বস।'

টুকুন ভদ্র হয়ে বসল। তার বাবা রশিদ সাহেব, টুকুনের মা এবং টুকুনের ছোটবোনকে ডাকতে গেলেন। টুকুনের ছোটবোনের নাম মৃদুলা। তার বয়স দেড় বছর। দাঁড়াতে পারে। একটু একটু হাঁটতে পারে তবে এখনো কথা বলতে পারে না। টুকুনকে সে ডাকে— 'কুন'। মৃদুলা হচ্ছে সব দিক দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ে। দুধ খাওয়া নিয়ে হৈ চৈ করে না। খাব না, খাব না বলে টুকুনের মত সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে না। মিষ্টি মুখ করে খেয়ে ফেলে, তারপর অবশ্যি ওয়াক করে বমি করে ফেলে। মৃদুলার স্কুলে যাবার দরকার নেই কিন্তু সে খুব স্কুলে যেতে চায়। টুকুনের মত স্কুলে যাবার সময় হঠাৎ মুখ কালো করে বলে না— মা, আমার হাঁটুতে ব্যথা। স্কুলে যাব কী করে ?

টুকুনের মা মুনা তখন বলেন, তুমি তো আর হেঁটে যাবে না। তোমার বাবা রিকশা করে তোমাকে দিয়ে আসবেন।

'হেঁটে হেঁটে রিকশায় উঠতে হবে তো মা।'

'না, তাও হবে না। তোমার বাবা তোমাকে কোলে করে রিকশায় তুলবেন।'

মুনা ছেলের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছেন। সবচেয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলার ব্যাপারটা। ক্লাস থ্রিতে পড়ে একটা ছেলে, সাত বছর মাত্র বয়স। সে কেন এত বানিয়ে কথা বলবে ? আর বলার সময় এমনভাবে বলে যে, অনেকেই মনে করে সত্যিই বোধহয় কাক এসে কথা বলে। কিছুদিন আগে দেশের বাড়ি থেকে মুনার শ্বশুর এসেছেন। তাঁর শরীর খারাপ, ডাক্তার দেখাবেন। ডাক্তার দেখালেন। এক সপ্তাহ থাকলেন। যাবার সময় মুনাকে আড়ালে ডেকে নিচু গলায় বললেন, বৌমা, টুকুন এসব কী বলে ?

'কাকের সঙ্গে কথা বলার কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ মা।'

'এ সব ও বানিয়ে বানিয়ে বলে, বাবা। ভীষণ দুষ্ট হয়েছে। ওর যন্ত্রণায় আমরা অস্থির হয়েছি।'

'না, মানে বলছিলাম কী মা— মানে— যেভাবে বলছিল আমার আবার কিছুটা বিশ্বাস হয়ে গেল। হতেও তো পারে।'

'কী যে বলেন বাবা! কাক কথা বলবে নাকি ? আর বললেও টুকুন বুঝবে কিভাবে ? মানুষ কি কাকের কথা বুঝতে পারে?'

'কেউ কেউ কিন্তু পারে, মা। আমাদের এক নবী ছিলেন হযরত সোলায়মান— উনি পশু-পাখির কথা বুঝতে পারতেন।'

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, বাবা, টুকুন কোন নবী না। ও হল মহাদুষ্টু এক ছেলে। আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। এই সব কথা যখন বলতে আসবে তখন ধমক দেবেন।

www.BDeBooks.Com

'না না, ধমকাধমকির কী আছে ? বাচ্চা ছেলে।'

'ধমকাধমকি করতে হবে, বাবা। এসব প্রশ্রয় ও দেয়ার কোনো মানে হয় না। গালে চড় দিলে ঠিক হত। চড় দেয়া যাবে না। তার বাবা শাসন ছাড়া আধুনিক কায়দায় ছেলে মানুষ করবে। আধুনিক কায়দায় ছেলে মানুষ করার এই হল ফল।'

টুকুন খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

রশিদ সাহেব একটা চেয়ার টেনে বসেছেন টুকুনের সামনে। মুনা মৃদুলাকে কোলে নিয়ে খাটের শেষ মাথায় বসেছেন। এখান থেকে টুকুনের মুখ ভাল করে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে টুকুন যখন তাঁর দিকে তাকাচ্ছে তখনই তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন। মুনার এখন ছেলের জন্যে খানিকটা মায়া লাগছে। বাচ্চা একটা ছেলের জন্যে— বিচারসভা।

কোনো দরকার ছিল না। বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে বলুক না। এমন কিছু ক্ষতিতো হচ্ছে না। টুকুনকে অবশ্যি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে তার বাবার দিকেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

রশিদ সাহেব বললেন, টুকুন!

'জ্বি বাবা।'

'যে কাকটা তোমার সঙ্গে কথা বলে তার নাম কী ?'

'ওর কোনো নাম নেই, বাবা। পাখিদের নাম থাকে না। মানুষদের নাম থাকে।'

'তোমাকে সে কী ডাকে ?'

'নাম ধরে ডাকে। টুকুন বলে।'

'সে শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলে, আমাদের সঙ্গে না— এর কারণ কী ?'

'ও ছোটদের পছন্দ করে। বড়দের পছন্দ করে না।'

'মৃদুলা তো ছোট। ওকে পছন্দ করে না কেন ?'

'মৃদুলাকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না, বাবা। ঐ দিন আমাকে বলল, তোমার ছোট বোনটার এমন বিশ্রী নাম কে রেখেছে ? তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা উচিত ছিল উকুন। তাহলে কত ভাল হত। টুকুনের বোন উকুন।'

'এসব কথা কাকটা তোমাকে বলল ?'

'জ্বি বাবা।'

'আর কি বলে ?'

'মাঝে মাঝে ইংরেজি জিজ্ঞেস করে। ঐদিন বলল টুকুন আকাশ ইংরেজি কী ?'

'তুমি আকাশ ইংরেজি বলতে পারলে ?'

টুকুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, পেরেছি বাবা। বানানও বলেছি— Sky.

'আচ্ছা বেশ। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোন।'

'আমি খুব মন দিয়ে শুনছি, বাবা।'

'তুমি মোটেই মন দিয়ে কথা শুনছ না। পা নাচাচ্ছ।'

'কাকটা আমাকে বলেছে, টুকুন শোন, কখনো চুপচাপ বসে থাকবে না। যদি কখনো বসে থাকতে হয় তাহলে পা নাচাবে। পা নাচালে পায়ের একসারসাইজ হয়। রক্ত চলাচল ভাল হয়। পা দুটো ভাল থাকে। আমাদের যেমন পাখা, তোমাদের তেমনি পা।'

রশিদ সাহেব হতাশ চোখে মুনার দিকে তাকালেন। মুনা হেসে ফেললেন। অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি লুকানোর চেষ্টা করলেন। টুকুন যেন তাঁর হাসিমুখ দেখতে না পায়। আজ হাসাহাসি না। আজ টুকুনকে গম্ভীর মুখে কিছু কথা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

রশিদ সাহেব বললেন, টুকুন, তাকাও আমার দিকে। শোন কী বলছি। ছোটরা প্রায়ই বানিয়ে বানিয়ে নানান কথা বলে। এটা তেমন দোষের না। তবে তাকে স্বীকার করতে হবে— সে বানিয়ে বানিয়ে বলছে। কেউ যদি বানিয়ে কথা বলে তারপর সবাইকে বুঝাতে চায় কথাটা সত্যি তাহলে খুব সমস্যা। এটা তার অভ্যাস হয়ে যাবে। তুমিই বল, অভ্যাস হবে না ?

টুকুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, অভ্যাস তো হবেই। বড় হয়েও তখন মিথ্যা কথা বলবে।

'এই তো তুমি বুঝতে পারছ। কাজেই এখন থেকে তুমি আর কাক নিয়ে কিছু বলবে না। বললে তোমারও অভ্যাস হয়ে যাবে।'

'আমার অভ্যাস হবে না, বাবা। আমি তো আর বানিয়ে বানিয়ে বলি না।'

'তুমি বানিয়ে বল না ?'

'না। যা সত্যি আমি তাই বলি।'

রশিদ সাহেব হতাশ গলায় বললেন, আচ্ছা, তুমি যাও। মুনা ভাত দাও, ভাত খেয়ে নি।

খাবার টেবিলে টুকুন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, রশিদ সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কাক ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয়ে তুমি কথা বলতে পার।

'কাক নিয়ে কথা বলতে পারব না ?'

'না।'

টুকুন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আচ্ছা। রশিদ সাহেব চিন্তিত মুখে ভাত খাচ্ছেন। মুনা মৃদুলাকে খাইয়ে দিচ্ছেন। সে আটটা বাজতেই ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতি রাতেই তাকে খাওয়াতে হয় ঘুমের মধ্যে।

টুকুন মা'র দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল, মা একটা মজার জিনিস জান ? তুমি যেমন মৃদুলাকে খাইয়ে দিচ্ছ, কাকও ঠিক তেমনি তার ছোট বাচ্চাদের খাইয়ে দেয়। ওদের তো হাত নেই। ওরা ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।

মা বললেন, একটু আগে কী বলা হয়েছে ? কাক নিয়ে আর কোনো কথা না। চুপ।

টুকুন ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

www.BDeBooks.Com

২

মৃদুলা এবং টুকুন এক ঘরে শোয়।

দু'জনের জন্যে দুটো আলাদা খাট। রাতে মৃদুলা এই ঘরেই শোয়। তবে ঘুম ভাঙলেই মায়ের ঘরে চলে যায়। তাদের ঘর এবং মা'র ঘরের মাঝখানে একটা দরজা। দরজা সব সময় খোলা থাকে।

মুনা এদের ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে চান। কখনো তা সম্ভব হয় না। এক একবার ঘরে ঢুকলে তাঁর কান্না পায়। দু'জনে মিলে ঘরটা কী যে করে রাখে! মৃদুলা এমনিতে খুব শান্ত এবং লক্ষ্মী মেয়ে হলেও ঘর নোংরা করায় তার দক্ষতা অসাধারণ। সে যা করে তা হচ্ছে শান্ত মুখে কাগজ ছেঁড়া। কাগজ ছেঁড়ার সময় সে গুন গুন করে গান গায়। গানের কথা এবং সুর দুই-ই বিচিত্র। গানের সুরে সে নিজেই সবচেয়ে মুগ্ধ হয়। মাথা দুলিয়ে হাসে। মুনাকে রোজ কয়েকবার ঝাঁট দিয়ে কাগজ সরাতে হয়। টুকুন কাগজ ছিঁড়ে না, ছবি আঁকে। ছবি আঁকে দেয়ালে। দেয়াল ভর্তি ছবি। এক সপ্তাহ আগে তাদের ঘর নতুন করে ডিসটেম্পার করা হয়েছে। বলে দেয়া হয়েছে দেয়ালে আর কোনো ছবি আঁকা যাবে না।

মুনা তাদের ঘরে মশারি খাটাতে এসে দেখেন ডিসটেম্পার করা দেয়ালে ছবি আঁকা হয়েছে। কাকের ছবি। শুধু ছবি না, ছবির নিচে কবিতা।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি,
দুই ধারে বসে কাক ঢালু তার পাড়ি।

মুনা মশারি খাটালেন। মৃদুলার গালে চুমু খেলেন। টুকুন বড় হয়েছে বলে এখন চুমু খেতে দেয় না। তবু তিনি জোর করেই চুমু খেলেন। তিনি মশারি গুঁজতে গুঁজতে বললেন, বাতি নিভিয়ে দেব টুকুন?'

টুকুন বলল, দাও।

'ভয় করবে নাতো?'

'না।'

মুনা বাতি নিভিয়ে দিয়ে ছেলের বিছানার পাশে বসলেন। নরম গলায় বললেন, দেয়ালে ছবি তুমি এঁকেছ?

'হ্যাঁ। সুন্দর হয়েছে না মা?'

ছেলেকে কঠিন ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। বেচারা ঘুমুতে যাচ্ছে, ঘুমুক। ঘুমের আগে বকা দিয়ে মন খারাপ করিয়ে দিতে চান না। সকাল বেলা দিলেই হবে। তিনি বললেন, ছবিটা ভালই হয়েছে।

'কবিতা কেমন হয়েছে মা?'

'কবিতা ভাল হয়েছে। কিন্তু এটা কেমন কবিতা?'

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে।

টুকুন উৎসাহে উঠে বসল, মায়ের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আসলে কী হয়েছে জান মা, আমি তো কবিতা পড়ছিলাম, তখন কাক এসে বলল, কী পড়ছ, টুকুন?

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছি, এখন বিরক্ত করবেন না।

'তুমি তাকে আপনি করে বল?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, তারপর উনি কী বললেন?'

'উনি বললেন, তোমাদের রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিয়ে কী কোনো কবিতা লিখেছেন?'

'আমি বললাম লিখেছেন। উনি তো বিশ্বকবি। বিশ্বকবিকে সবকিছু নিয়ে কবিতা লিখতে হয়। উনি তখন বললেন, দেখি আমাদের নিয়ে যেটা লিখেছেন সেটা একটু পড়তো। তখন আমি বানিয়ে বানিয়ে এই কবিতাটা বললাম।'

'উনি খুশি হলেন?'

'খুব খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, বাহ্, খুব সুন্দর লিখেছেন, "বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে।" বিশ্বকবি বলেই এত সুন্দর লিখতে পেরেছেন। গ্রাম-কবি, দেশ-কবি হলে পারতেন না। অতি উচ্চমানের কবিতা হয়েছে।'

মুনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে মনে বললেন, কী করা যায় এই ছেলেকে নিয়ে?

টুকুন বলল, মা, উনি এত খুশি হলেন যে আমাকে বললেন, টুকুন, একটা কাজ কর তো— দেয়ালে আমার একটা ছবি এঁকে তার নিচে কবিতাটা লিখে রাখ। আমি বললাম, মা রাগ করবে। দেয়ালে নতুন করে ডিসটেম্পার করা হয়েছে। তখন উনি বললেন, না, তোমার মা রাগ করবেন না। উনাকে বুঝিয়ে বললেই হবে। কথায় কথায় ছেলেমেয়েদের উপর রাগ করা ভাল না। মা, তুমি কি রাগ করেছ?

'না।'

'বাবাকে তুমি বুঝিয়ে বলতে পারবে?'

'দেখি চেষ্টা করে পারি কি-না। তুমি এখন ঘুমাও।'

ঘুমুতে যাবার সময় মুনা কাক এবং কাকের কবিতার কথা বললেন। চিন্তিত গলায় বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে কী করা যায় বল তো? মাথা থেকে কাক কী করে দূর করা যায়?

রশিদ সাহেব বললেন, গরমের ছুটি হোক, ওকে নিয়ে কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে আসি। ওর এই কাক নিশ্চয়ই এত দূর যাবে না। কিছুদিন পার হলে ভুলে যাবে।

মুনা বললেন, তোমার কি মনে হয় কোনো ডাক্তার-টাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার?

www.BDeBooks.Com

রশিদ সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, আরে দূর। এটা তো কোনো অসুখ না যে ডাক্তার চিকিৎসা করবে। ছেলেমানুষি খেয়াল। দু'দিন পর কেটে যাবে। আচ্ছা, কোনো কাক কি সত্যি ওর জানালায় বসে ?

মুনা বিরক্ত হয়ে বললেন, শেষ পর্যন্ত তোমারও বিশ্বাস হয়ে গেল ? কাক তো সব সময়ই বসে। জানালায় বসে, রেলিং-এ বসে।

'ও পড়াশোনা কেমন করছে ?'

'ভালই করছে। ক্লাস টেস্ট হয়েছে। অংকে একশ'তে পেয়েছে একশ'।'

'তাহলে মনে হয় চিন্তার কিছু নেই।'

'চিন্তা তো আমি করছি না। সারাদিন কাক কাক করে এই জন্যে বিরক্তি লাগে।'

রশিদ সাহেব লেখা নিয়ে বসলেন। তিনি ব্যাংকে কাজ করেন, তবে সেই সঙ্গে লেখালেখিও করেন। তাঁর সব লেখাই বাচ্চাদের জন্যে। এখন একটি মজার বই লিখেছেন— নাম 'একি কাণ্ড'। খুব মজার একটা বই।

৩

টুকুনদের বাসায় ছোট ফুপু এসেছেন।

ছোট ফুপু পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত। ক'দিন পরেই তাঁর M.S.C. পরীক্ষা। তাঁর দম ফেলা সময় নেই। তিনি বাসায় ঢুকেই বললেন, ও টুকুন, তোদের বাড়িতে দম ফেলতে এসেছি।

টুকুনের এত ভাল লাগল। ছোট ফুপুকে তার খুব ভাল লাগে। তার কাছে মনে হয় এরকম মেয়ে অন্য কোন গ্রহে হয়তো আছে। কিন্তু পৃথিবীতে আর নেই। আর দেখতেও কী সুন্দর। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়।

ছোট ফুপু যখন বড়দের সঙ্গে কথা বলেন তখন তাঁকে বড়দের মত লাগে, যখন ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন তখন ছোটদের মত লাগে। তিনি বাসায় এলে কিছুক্ষণ টুকুন এবং মৃদুলার সঙ্গে খেলবেন। মৃদুলাকে বলবেন, কই রে 'মৃদু', তোর বারবি নিয়ে আয়, এখন কিছুক্ষণ পুতুল খেলব। আয়, আমরা বারবিকে বিয়ে দিয়ে দি। মৃদুলা বারবি আনবে না কাগজ নিয়ে আসবে। ছোটফুপু কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কাগজ ছিঁড়বেন। মৃদুলা খিলখিল করে হাসবে, তিনিও হাসবেন। মৃদুলার সঙ্গে খেলা শেষ হলে টুকুনকে বলবেন, আয় টুকুন, এবার তোর সঙ্গে খেলি। কী খেলবি ? টুকুন যদি বলে, চোর-পুলিশ খেলবে তাহলে ফুপু মুখ বাঁকিয়ে বলবেন, দূর গাধা! চোর-পুলিশ পুরনো খেলা, আয় নতুন কিছু খেলি। চোর-পুলিশের চেয়েও মারাত্মক ডাকাত-পুলিশ। তুই হবি ডাকাত, আমি মহিলা পুলিশ।

এমন একজন মানুষ বাসায় এলে আনন্দে লাফাতে ইচ্ছা করে। টুকুন মনের আনন্দ চেপে রেখে বলল, কতক্ষণ থাকবে ছোট ফুপু ?

দম ফেলতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ থাকব। তারপর চলে যাব। এখনো কিছু পড়া হয়নি, পঁচিশ তারিখ থেকে পরীক্ষা।

'দম কোথায় ফেলবে ?'

'কোনো একটা ভাল জায়গা দেখে ফেলতে হবে।'

'আমার ঘরে ফেলবে ?'

'ফেলা যায়।'

টুকুন এবং মৃদুলা ছোট ফুপুকে তাদের ঘরে নিয়ে এল। ছোট ফুপু ঘর দেখে আঁতকে উঠে বললেন, ঘরটাকে তো আস্তাবল বানিয়ে রেখেছিস।

টুকুন বলল, আস্তাবল কি ছোট ফুপু ?

'আস্তাবল হচ্ছে যেখানে ঘোড়া থাকে। তোদের এই নোংরা ঘরে দম ফেলতে পারব না। দমটা বরং আটকে রাখি।'

টুকুন বলল, তাই ভাল, আটকে রাখ ফুপু।

'দেয়ালে এটা কিসের ছবি রে টুকুন ?'

'কাকের ছবি।' ভাল হয়েছে না ?'

'মোটামুটি হয়েছে। দেয়ালে ছবি আঁকার জন্যে বকা খাসনি ?'

'না।'

'ছবির নিচে এটা কি কবিতা নাকি ?'

'হুঁ।'

'কবিতাটাও তো অসাধারণ হয়েছে রে-অসাধারণ। তোর লেখা না রবীন্দ্রনাথের লেখা ?'

'আমরা দু'জনে মিলে লিখেছি।'

'ভাল হয়েছে অসাধারণ। এখন আমার কথা শোন— ঘর পরিষ্কার কর যাতে আরাম করে দমটা ফেলতে পারি। অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। এই ফাঁকে তোর মা'র সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'মার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলবে না কিন্তু।'

'পাগল হয়েছিস ? বড়দের সঙ্গে কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল।'

অপলা মুনার সন্ধানে গেল। মুনা চা বানাচ্ছিলেন, অপলাকে দেখে বললেন, তুই নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিস পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘর থেকে বের হবি না ? আজ চলে এলি যে!

অপলা হাসিমুখে বলল, তোমার ছানাদের দেখতে এসেছি। কিছুদিন পর পর ওদের না দেখলে ভাল লাগে না।

'অনেকদিন পর পর দেখিস বলে ভাল লাগে। আমার মত সারাক্ষণ দেখতে হলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। ছ'শ টাকা খরচ করে দেয়াল ডিসটেম্পার করিয়েছি। কাকের ছবি এঁকে রেখেছে।'

'এত পাখি থাকতে কাক কেন ?'

www.BDeBooks.Com

'সে তো আজকাল কাকের সঙ্গে কথা বলে! শুনিসনি কিছু ?'

'না তো।'

'একটা কাক নাকি তার জানালার পাশে বসে গল্প-গুজব করে।'

'বাহ্ ,কী মজা !'

মুনা বিরক্ত গলায় বললেন, মজার তুই কী দেখলি ? এই বয়সে মিথ্যা কথা বলা শিখছে!

'কল্পনা করতে শিখছে। মিথ্যা এক জিনিস, কল্পনা ভিন্ন জিনিস। তোমরা ওকে কিছু বলো না।'

মুনা চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, কল্পনা ভাল। খাপছাড়া কল্পনা ভাল না। দিনরাত কাক, কাক। বাড়িঘর ভরাচ্ছে ছবি এঁকে। তোর কথা মন দিয়ে শুনে, তুই যাবার আগে টুকুনকে বুঝিয়ে যাবি।

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখাদেখি নয়, ভাল করে বুঝাবি। দেয়ালে যেন ছবি আঁকা না হয় সেটাও বলবি।'

'এক্ষুণি বলছি।'

অপলা চায়ের কাপ হাতে উঠে গেল।

টুকুন ঘর পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। অবিশ্য মৃদুলা এখনো কাগজ ছিঁড়ে যাচ্ছে। লেখা কাগজ তার ছিঁড়তে ভাল লাগে না। ধবধবে সাদা কাগজগুলো ছিঁড়তে ইচ্ছা করে। টুকুনের ধারণা, মৃদুলা বড় হয়ে বিরাট একটা কাগজের দোকান দেবে। সুন্দর কাগজে ঘর থাকবে ভর্তি। সে মনের আনন্দে ছিঁড়বে।

অপলা চায়ের কাপ হাতে খাটে বসতে বসতে বলল, ও টুকুন, তুই না কি কাকের সঙ্গে কথা বলিস ?

'বলি তো।'

'তা কী নিয়ে তোদের কথাবার্তা হয় ?'

'কোন ঠিক নেই। একেক দিন একেকটা। ঐ দিন বললেন, টুকুন, একটা গান গেয়ে শুনাও তো।'

'তোকে তুমি করে বলেন ?'

'তা তো বলবেনই। বয়সে বড় না ? উনার ছোট মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গেছে।'

'তাহলে তো খুবই সিনিয়ার লোক! তুই তাঁকে কী ডাকিস— চাচা ?'

'না, আমি ডাকি কাকা। চাচা ডাকতে চাচ্ছিলাম, উনি বললেন, চাচা ডাকবে না, বরং কাকা ডাক। কাকা ডাকলে কাকের সঙ্গে মিল হয়, শুনতে ভাল লাগে।

'অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, উনাকে খুবই চিন্তাশীল মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছ, ফুপু। খুবই চিন্তাশীল। প্রায়ই বলেন, দেশটার হচ্ছে কী ? দেশটা তো রসাতলে যাচ্ছে।'

অপলা চাপা হাসি হেসে বলল, এই কথা তো তোর বাবা সব সময় বলে। তোর বাবার কাছে শুনে শুনে শিখেনি তো ?

'শিখতেও পারেন। উনার স্মৃতিশক্তি ভাল। যখন যা শুনেন উনার মনে থাকে। অনেকদিন আগে একবার বলেছিলাম, ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ আমার জন্মদিন। উনার দেখি মনে আছে। আমাকে বললেন, কি খোকা, জন্মদিন হচ্ছে ?'

আমি বললাম, হচ্ছে।

উনি বললেন, প্রবলেম হয়ে গেল। ঐদিন রোববার পড়ে গেছে। ছুটির দিন। রোববার আমি আবার ঘুরে ফিরে বেড়াতে পছন্দ করি। আসতে পারি কি না বুঝতে পারছি না।

অপলা বলল, আসুক না আসুক, তুই দাওয়াত দিয়ে রাখ।

'দাওয়াত দিয়েছি ছোট ফুপু।'

'ভাল করেছিস। খালি হাতে নিশ্চয়ই আসবে না। কিছু একটা নিশ্চয়ই আনবে।'

টুকুন আগ্রহের সঙ্গে বলল, ছোট ফুপু, কি আনবে বলে তোমার মনে হয় ?

অপলা গম্ভীর গলায় বলল, আমার ধারণা, মরা ইঁদুর-টিদুর নিয়ে আসবে। মরা ইঁদুর ওরা খুব আনন্দ করে খায়। ওদের কাছে খুবই দামী জিনিস।

টুকুন বিস্মিত হয়ে বলল, মরা ইঁদুর দিয়ে আমি কী করব ?

অপলা বলল, কি আর করবি, খাবি। তোর পেয়ারের একজন এত আগ্রহ করে একটা জিনিস দেবে, আর তুই ফেলে দিবি; তা তো হয় না।

টুকুন ছোট ফুপুর দিকে তাকিয়ে আছে। অপলা খুব চেষ্টা করছে হাসি চেপে রাখার। এক সময় আর পারল না। হো হো করে হেসে ফেলল। মৃদুলাও হাসতে শুরু করল। দু'জনই হাসছে। ওদের দিকে দুঃখিত চোখে তাকিয়ে আছে টুকুন। আর তখন এক কাণ্ড হল— একটা দাঁড়কাক এসে ঝপ করে বসল জানালার শিকে। অপলার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকিয়ে থেকে ডাকল— কা কা।

হাসি থামিয়ে অপলা বলল, এই টুকুন, তোর আংকেল এসে গেছে মনে হয়। আমাকে কিছু বলছে না-কি ?

টুকুন কিছু বলল না। কাকটা আবার ডাকল, কা কা কা।

অপলা বলল, চুপ করে আছিস কেন ? ও বলছে কী ?

'তুমি কেন হাসছ তাই জানতে চাচ্ছে।'

'বলে দে আমি কেন হাসছি।'

'আমি কিছু বলব না।'

'বেশ, আমিই বলে দিচ্ছি। কী বলে উনাকে ডাকব তাই ভাবছি। তোর যখন কাকা হয়, তখন আমার হবে বড় ভাই। ভাইয়া ডাকব ?'

'তোমার যা ইচ্ছা ডাক।'

www.BDeBooks.Com

অপলা জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যালো ভাইজান, আমি কোনো কারণ ছাড়াই হাসছি। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। আপনি মনে হয় টুকুনের জন্মদিনে আসবেন। খালি হাতে আসবেন না। উপহার নিয়ে আসবেন।

কাকটা বলল, কা কা কা।

অপলা বলল, আপনি আবার দলবল নিয়ে আসবেন না। একা আসবেন। এখন বরং বাড়ি চলে যান।

কাক সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে গেল। অপলা দেখল টুকুন গম্ভীর হয়ে আছে। মনে হচ্ছে রাগ করেছে। তার বড় বড় চোখ ভিজে আছে। কেঁদে ফেলার আগে টুকুনের চোখ এরকম হয়ে যায়। অপলা বলল, কী রে টুকুন, এরকম করে তাকিয়ে আছিস কেন ? আমার উপর রাগ করেছিস ?

'হুঁ।'

'কেন! আমি কী করলাম ?'

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনি। এই জন্যে আমি রাগ করেছি। তুমি যা বল আমি তা বিশ্বাস করি। তুমি কেন আমার কথা বিশ্বাস কর না ?'

'তুই চাস আমি তোর কথা বিশ্বাস করি ?'

'হ্যাঁ।'

'শোন্ টুকুন, আমি অন্য বড়দের মত না। আমি ছোটদের কথা মন দিয়ে শুনি এবং বিশ্বাস করার চেষ্টা করি। কিন্তু তোর কথা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না ?'

'কেন যাচ্ছে না ?'

'বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, কারণ মানুষের পক্ষে কথা বলা সম্ভব, পাখির পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের মাথায় অনেকখানি মগজ। পাখির মগজ আর কতটুকু! এই একটুখানি। লবণের চামচের এক চামচ। এত অল্প মগজ নিয়ে পাখির পক্ষে কথা বলা সম্ভব না।'

'ময়নাও তো কথা বলে। ময়নার মগজও তো একটুখানি।'

'ময়না বলে শেখানো কথা। তাও একটা-দু'টা বাক্য— 'কুটুম এসেছে পিঁড়ি দাও' — এই রকম। এর বেশি না। তাছাড়া ময়না যখন কথা বলে আমরা সবাই তা শুনতে পাই এবং বুঝতে পারি। এখানে কাক কথা বলছে আর তুই একা শুধু বুঝতে পারছিস তা তো হয় না। তুই তো আলাদা কিছু না। তুই আমাদের মতই একজন। তোর দুটি কান দুটি পা, দুটি চোখ... আমাদেরও তাই। বুঝতে পারছিস ?'

'পারছি।'

'বুঝতে পেরে থাকলে আমার দিকে তাকিয়ে বিরাট একটা হাসি দে। দাঁত বের করে হাস।'

টুকুন হাসল না, গম্ভীর গলায় বলল, আচ্ছা ছোট ফুপু, কাকটা যদি আমার জন্মদিনে আমার জন্য কোন উপহার নিয়ে আসে তাহলে কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে ?

অপলা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যদি সত্যি সত্যি তোর জন্যে সে উপহার নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আবার ভাবতে হবে। কোনো কিছুই চট করে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস করলে খুব সমস্যা। বিরাট সমস্যা। ভয়ঙ্কর সমস্যা।'

'কি সমস্যা ?

'ধর, একজন লোক এসে বলল, ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডে বাটার জুতার দোকানের সামনে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে। একটা বাঘ বের হয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কামড়ে খেয়ে ফেলছে। এখনি যদি লোকটার কথায় বিশ্বাস করে সবাই ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে ? এটা কি ঠিক হবে টুকুন ?

'না, ঠিক হবে না।'

'তাহলে তুই এখন বুঝতে পারছিস যে আমাদের চট করে কিছু বিশ্বাস করতে নেই ?'

'পারছি।'

'এই কারণেই আমি তোর কথা বিশ্বাস করছি না। তবে তোর জন্মদিন আসুক, দেখা যাক তোর কাক কি উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর আমরা না হয় আবার চিন্তা-ভাবনা করব। এখন একটু হাস তো লক্ষ্মী সোনা।'

টুকুনের রাগ লাগছে। হাসতে ইচ্ছা করছে না। তবু ছোট ফুপুকে খুশি করার জন্যে সে হাসল।

৪

আজ টুকুনের জন্মদিন।

টুকুন ভেবেছিল জমকালো জন্মদিন হবে। লোকজনে বাড়ি ভরে যাবে। বিরাট একটা কেক আসবে। সাতটা মোমবাতি জ্বলবে। সে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভাবার সময় মনে মনে এটা জিনিস চাইব। যা চাইব তাই হবে। এই হল নিয়ম। দেখা গেল জন্মদিনে কেউ আসছে না।

রশিদ সাহেব বিকেলে অফিস থেকে ফিরলেন খালি হাতে। উপহারের কোনো প্যাকেট তাঁর হাতে দেখা গেল না। এক সময় টুকুন তার মা'র কাছে গিয়ে বলল, জন্মদিনের কেক আনতে কে যাবে মা ?

তিনি বললেন, কেউ যাবে না। তোমাকে গত জন্মদিনে আমরা কী বলেছিলাম ? সাত বছর বয়স পর্যন্ত জন্মদিন হবে তারপর আর হবে না। তোমার বাবার এসব পছন্দ না। আমারো না।

'কেউ আসবে না মা ?'

'না, কেউ আসবে না। কাউকে আসতে বলি নি। তবে কেউ যদি নিজ থেকে চলে আসে তাহলে আসবে। যেমন ধর তোমার ছোট ফুপু। সে তো আসবেই।'

www.BDeBooks.Com

'উপহারও আনবে। তাই না মা ?'

'হ্যাঁ উপহার আনবে।'

'তোমরা কি কিছু কিনেছ আমার জন্যে ?'

'আমরা একটা উপহার কিনেছি। তবে তা তোমাকে দেয়া ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। তোমার বাবা চিন্তা করছেন। তিনি যদি মনে করেন তোমাকে দেয়া যায় তাহলে হয়তো-বা দেয়া হবে।'

'কতক্ষণ লাগবে তাঁর চিন্তা শেষ করতে ?'

'তা তো বলতে পারি না।'

টুকুন মন খারাপ করে ঘুরতে লাগল। তার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। অবশ্যি সে এখনো আশা ছাড়ে নি। তার কেন জানি মনে হচ্ছে সন্ধ্যার পর দেখা যাবে এক এক করে বাড়ি ভর্তি হয়ে গেছে। তাঁদের টুকুনের জন্মদিনের কথা বলা হয় নি, তবে তারিখটা তাঁদের মনে ছিল বলে নিজে থেকেই চলে এসেছেন। এত মানুষজন এসেছে দেখে শেষ মুহূর্তে বাবা বলবেন— আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কেক না হয় কিনে নিয়ে আসি।

সন্ধ্যার পরও কেউ এল না। এমন কী ছোট ফুপুও না। তবে ছোট ফুপু টেলিফোন করলেন।

'হ্যালো টুকুন সোনা, শুভ জন্মদিন।'

টুকুন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

ছোট ফুপু টুকুনের কাঁদো কাঁদো গলা ধরতে পারলেন না। তিনি হাসিমুখে বললেন, খুব মজা হচ্ছে তাই না ?

'হুঁ।'

'কেক কি কাটা হয়ে গেছে ?'

'এখনো হয় নি।'

টুকুনের চোখে এবার সত্যি সত্যি পানি এসে গেল। টেলিফোনে চোখের পানি দেখা যায় না বলে রক্ষা। দেখা গেলে সমস্যা হত।

'টুকুন!'

'জ্বি।'

'তোর গলা এমন শুনাচ্ছে কেন ? সর্দি লেগেছে না-কি ?'

'হুঁ।'

ছোট ফুপু বললেন, 'আমার কোনো অসুখ বিসুখ হলে ভাল হত। বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে পারতাম। অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু হচ্ছে না। তাই ফিজিক্স পড়তে হচ্ছে। এখন পড়ছি ফ্লুয়িড ডায়নামিক্স— অতি বিশ্রী জিনিস।'

'আমার উপহার কিনেছ ছোট ফুপু ?

'না কেনা হয় নি। ঘর থেকে বের হতে পারি না— উপহার কিনব কী ? একসময় কিনে এসে দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

'ভাল কথা, তোর কাক কি উপহার নিয়ে এসেছে?'

'আসে নি।'

'কী মনে হয় তোর— আসবে'

'জানি না।'

'এলে টেলিফোন করিস।'

'আচ্ছা।'

টুকুন তার নিজের ঘরে চুপচাপ বসে রইল। আজ মৃদুলাও এই ঘরে নেই। তার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগেছে। চোখ লাল। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। মুনা তাকে নিয়ে যাবেন ডাক্তারের কাছে। তাকে গরম কাপড় পরানো হচ্ছে।

রশিদ সাহেব এসে টুকুনকে ডেকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, আমার সামনে চেয়ারের উপর শান্ত হয়ে বস তো টুকুন।

টুকুন বসল।

'তোমার মনটা কী খারাপ? মুখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

'মনে হয় ঠাণ্ডা লাগবে।'

'তোমার জন্মদিন হচ্ছে না— এই জন্য মন খারাপ না তো?'

টুকুন কিছু বলল না। চুপ করে রইল। রশিদ সাহেব বললেন, তোমাকে তো আগেই বলেছি গতবারই ছিল শেষ জন্মদিন। বলি নি?

'হ্যাঁ।'

'বুঝলে টুকুন— ঢাকা শহরে অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে যারা এই প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে ঘুমায়। গায়ে দেবার মত তাদের একটা গরম স্যুয়েটার পর্যন্ত নেই। সেখানে হৈচৈ করে জন্মদিন করা ঠিক না। আমি তোমার জন্মদিনের টাকা দিয়ে উলেন গরম কাপড় কিনে ওদের বিলি করেছি। ভাল করিনি?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি মুখে অবশ্যি বলছ হ্যাঁ তবু মন খারাপ করে আছ। আজ তোমার কাছে খারাপ লাগছে কিন্তু যখন বড় হবে তখন খারাপ লাগবে না। তখন ভাল লাগবে। তখন বলবে, বাবা যা করেছেন ভাল করেছেন এদেশের সব বাবাদের এটা করা উচিত।'

'আমি যাই বাবা?'

'না বোস। আমার কথা শেষ হয় নি। আমি তোমার জন্যে একটা উপহার কিনেছি— দেখ পছন্দ হয় কি না।'

বাবা টুকুনের হাতে উপহার তুলে দিলেন। কী যে সুন্দর উপহার! এত বড় একটা রঙ-তুলির বাক্স। ব্রাশই হচ্ছে তিনটা। এত বড় রঙের বাক্স মনে হয় পৃথিবীতে আর নেই। এই একটাই বোধ হয় তৈরি করেছিল। বাবা কিনে নিয়ে এসেছেন।

www.BDeBooks.Com

'পছন্দ হয়েছে টুকুন ?'

'হ্যাঁ। খুব পছন্দ হয়েছে। খুব খুব খুব।'

রশিদ সাহেব বললেন, তুলির বাক্সটা তো তোমার হাতে দেয়া যাবে না, বাবা। এটা থাকবে আমার ড্রয়ারের তালাবন্ধ। তোমার যখন ছবি আঁকতে ইচ্ছে করবে আমার সামনে বসে ছবি আঁকবে।

'কেন বাবা ?'

'কারণ তোমার হাতে রঙ-তুলি দিলেই তুমি ছবি এঁকে সারা দেয়াল ভর্তি করবে। এটা তোমাকে করতে দেয়া হবে না। এখন কি ছবি আঁকতে চাও ?'

'না।'

'বেশ, আমি তাহলে ড্রয়ার তালাবন্ধ করে রাখছি।'

টুকুনের বাবা-মা মৃদুলাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেন। টুকুন একা একা তার ঘরে বসে রইল। বাড়িতে সে অবশ্যি একা না, রহিমা'র মা আছে। সে রান্নাঘরে রান্না করছে। টুকুনের কিছুই ভাল লাগছে না। সুকুমার রায়ের বই নিয়ে বসল। পড়ার চেষ্টা করল।

চলে হন হন *ছোটে পন্ পন্*
ঘেরে বন্ বন্ *কাজে ঠন্ ঠন্*
বায়ু শন্ শন্ *শীতে কন্ কন্*
কাশি খন্ খন্ *ফোড়া টন্ টন্*
মাছি ভন্ ভন্ *থালা ঝন্ ঝন্*

অন্য সময় এই কবিতা এত ভাল লাগত! আজ একেবারে মাথা ধরে যাচ্ছে। টুকুন বই বন্ধ করল, আর তখনি কাকটা এসে বসল জানালার পাশে। গম্ভীর গলায় বলল, শুভ জন্মদিন।

টুকুন বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

কাকটা বলল, গেস্টরা সব চলে গেছেন ?

'হুঁ।'

'আমি ইচ্ছে করেই দেরি করে এলাম। লোকজনের ভিড় ভাল লাগে না। বয়স হয়েছে তো। হৈচৈ-এ মাথা ধরে যায়। কেক কাটা হয়েছে ?

'কেক কেনা হয় নি।'

'সে কী ! কেন ?'

'বাবা বললেন, আর জন্মদিন হবে না। এখন থেকে জন্মদিনের টাকায় গরিবদের গরম কাপড় কিনে দেবেন।'

'ও আচ্ছা।'

'উনি লেখক তো, এই জন্যে গরিবদের কষ্ট দেখলে তাঁর খারাপ লাগে। এ আবার কেমন কথা ? গরিবদের কষ্ট দেখলে শুধু লেখকদের কেন সবারই খারাপ

লাগে। আমি তো লেখক না। আমি হলাম গিয়ে কাক। আমার নিজেরই খারাপ লাগে। যাই হোক, তুমি মন খারাপ করবে না।'

'মন খারাপ করি নি।'

'এই তো মিথ্যে কথা বললে— মুখ অন্ধকার করে বসে আছ আর মুখে বলছ মন খারাপ কর নি। হাস তো।'

টুকুন হাসলো।

কাক বললো, তোমার হাসি খুব সুবিধার লাগছে না। মনে হচ্ছে কষ্ট করে হাসছ। গল্প শুনবে ? গল্প শুনতে চাইলে গল্প বলতে পারি, বলব ?'

'বলুন।'

এক দেশে ছিল এক কাক। কাকটা এক টুকরা মাংস খুঁজে পেয়ে খুব খুশি হয়ে গাছের ডালে বসল। তখন একটা শিয়াল ঠিক করল কাককে বোকা বানিয়ে মাংসটা নিতে হবে..।

'এই গল্প আমি জানি। এটা ঈশপের গল্প।'

ঈশপ ভুল গল্প বলেছে। আসল গল্প বলে নি। আসল গল্পটা তোমাকে শুনাচ্ছি। তারপর হল কী— শিয়ালটা বলল, কাক ভাই কাক ভাই! কী মধুর তোমার গানের গলা ! তুমি যখন সকাল বেলা কা কা সুরে গান গাও এত ভাল লাগে। ভৈরবি রাগিনীতে আর কোনো পাখি এমন কা কা করতে পারে না। একমাত্র তুমিই পার। তুমি আমাকে একটা গান গেয়ে শুনাও না। গান শোনার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।

কাক শিয়ালের চালাকি সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল। সে কা কা করবে আর মুখ থেকে মাংসের টুকরা নিচে পড়ে যাবে। শিয়াল সেটা খাবে মহানন্দে। কাজেই কাকাটা করল কী— পায়ের নখ দিয়ে মাংসের টুকরা চেপে রেখে সুন্দর করে গান গাইল। গানের কথাগুলো হল:

কা কা কা
শিয়াল ব্যাটা বোকা, কা কা কা
মহা বোকা, বেজায় বোকা, কা কা কা

বুঝলে টুকুন— এটা হল আসল গল্প। ঈশপের গল্পটা নকল। তোমার বাবা তো লেখক মানুষ। তাঁকে বল তো আসল গল্পটা লিখে ফেলতে।

'আচ্ছা বলব।'

'আর শোন, তোমার জন্মদিনে খালি হাতে আসা ঠিক হবে না দেখে সামান্য উপহার নিয়ে এসেছি। জানি না তোমার পছন্দ হবে কি না।'

টুকুন আনন্দিত গলায় বলল, কী এনেছেন ?

'একটা ঝেং-এর বাচ্চা।'

'কিসের বাচ্চা।'

www.BDeBooks.Com

'ঝেং-এর।'

টুকুন বিস্মিত হয়ে বলল, কই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

'ঝেং-এর বাচ্চা চোখে দেখা যায় না, টুকুন। ঝেং-এর বাচ্চা হয় অদৃশ্য। শুধুমাত্র পাখিরাই ঝেং-এর বাচ্চা দেখতে পায়। ঝেং-এর বাচ্চা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, খেলবে। কিন্তু কেউ চোখে দেখবে না।'

'বাহ্ কী মজা!'

'মজা তো বটেই। তা ছাড়া ঝেং-এর বাচ্চাগুলো কাউকে কামড়ায় না—কিচ্ছু করে না। মাঝে মাঝে শুধু সুড়সুড়ি দেয়।'

'হাত দিলে বোঝা যায়?'

'না, হাত দিয়েও কিচ্ছু বুঝবে না।'

'বাহ্ মজা তো!'

'দারুণ মজা।'

'ঝেং -এর বাচ্চা কী খায়?'

'কাগজ খায়। তোমাদের বাসায় তো কাগজের অভাব নেই। বাবা লেখক মানুষ। তাছাড়া মৃদুলা তো ক্রমাগতই কাগজ ছিঁড়ছে।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কি কথা বলতে পারে?'

না। তবে মাঝে মাঝে খিলখিল করে হাসে। তাও খুব আস্তে। খুব মন দিয়ে না শুনলে বুঝতেও পারবে না।'

'ঝোং-এর বাচ্চা এখন কোথায় আছে?'

'ও এখন তোমার বিছানায় বসে আছে।'

'ও দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর। ছোট্ট উলের বলের মত। খরগোশের মত বড় বড় কান। তবে দুটো কান না, চারটা কান।'

'লেজ আছে?'

'না, লেজ নেই।'

'আমি ওকে কাগজ দিলে কি ও খাবে?'

'না। মানুষের সামনে ঝেং-এর বাচ্চা কখনো কিছু খায় না। যখন কেউ থাকে না তখন সে কপ করে কাগজ গিলে ফেলে।'

'ইশ, কী আশ্চর্য!'

'তুমি খুশি হয়েছ টুকুন?'

'দারুণ খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

কাক উড়ে চলে গেল। টুকুনের ইচ্ছা করছে ঝেং-এর বাচ্চার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে। তা সম্ভব নয়। একে চোখে দেখা যায় না। টুকুন গাঢ় গলায় বলল, ঝেং-এর ছানা, আমি খুব খুশি হয়েছি। খুব খুশি। এই নাও তোমাকে কিছু কাগজ দিলাম। খিদে লাগলে খেও। আমি এখন ছোট ফুপুকে টেলিফোন করতে যাচ্ছি।

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'কীরে টুকুন! হাঁপাচ্ছিস কেন?'

'দারুণ ব্যাপার হয়েছে, ছোট ফুপু।'

'দারুণ ব্যাপার আমারো হয়েছে। সারা সকাল সারা দুপুর ফ্লুয়িড ডায়নামিক্স পড়ে পড়ে এখন মনে করতে গিয়ে দেখি সব ভুল মেরে বসে আছি। কিচ্ছু মনে নেই। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোর দারুণ ব্যাপারটা কী?'

'কাক এসেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, এসেছে তাহলে! খালি হাতে এসেছে, না কিছু নিয়ে এসেছে?'

'নিয়ে এসেছেন।'

'কী আনল— মরা ইঁদুর, না মুরগির নাড়িভুড়ি।'

'উনি ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে এসেছেন।'

'কিসের বাচ্চা বললি?'

'ঝেং-এর বাচ্চা।'

'সেটা আবার কী?'

'খরগোশের কানের মত লম্বা লম্বা চারটা কান আছে। গোল, উলের বলের মতো।'

'তুই দেখে বলছিস?'

'না ছোট ফুপু। ঝেং-এর বাচ্চা তো দেখা যায় না। ঝেং-এর বাচ্চা হয় অদৃশ্য।'

'অদৃশ্য!'

'হ্যাঁ অদৃশ্য। ওদের গায়ে হাতও দেয়া যায় না।'

'বুঝলি কী করে চারটা বড় বড় কান?'

'কাক বলে গেছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কী খায় জান?'

'না।'

'কাগজ খায়। আর কিচ্ছু খায় না।'

অপলা টেলিফোনেই ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, টুকুন তুই তো বুদ্ধিমান ছেলে। ক্লাসের সব পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস। এই বয়সেই সুকুমার রায়ের সব কবিতা মুখস্থ। তুই কী করে বিশ্বাস করিস যে ঝেং-এর বাচ্চা বলে একটা জিনিস আছে যাকে চোখে দেখা যায় না? যার গায়ে হাত দেয়া যায় না। অথচ এর চারটা খরগোশের মত লম্বা লম্বা কান। মাথা থেকে এসব ঝেড়ে ফ্যাল। আর বাবা-মাকে ঝেং-এর বাচ্চা সম্বন্ধে কিছু বলবি না। আমার মনে হয় বললে বকা খাবি। আমি টেলিফোন রাখলাম।

www.BDeBooks.Com

ছোট ফুপু খট করে টেলিফোন রেখে দিল। টুকুন মন খারাপ করে নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখল, তার বিছানার উপরে একগাদা ছেঁড়া কাগজের একটিও নেই। নিশ্চয়ই ঝেং-এর বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে।

টুকুন আবার ছুটে গেল টেলিফোন করতে।

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'আবার কী হল?'

'ঝেং-এর বাচ্চা কী করেছে জান?'

অপলা গম্ভীর গলায় বলল, ঝেং-এর বাচ্চা সম্পর্কে কোন কথা শুনতে চাই না। অন্য কিছু বলার থাকলে বল। আছে কিছু বলার?

'না।'

'বেশ, তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখ। আর আমাকে ডিসটার্ব করবি না। মনে থাকে যেন। আমার কিচ্ছু পড়া হয় নি। নির্ঘাৎ থার্ড ক্লাস পাব। তুই কি চাস আমি থার্ড ক্লাস পাই?'

'না চাই না।'

'তাহলে টেলিফোন নামিয়ে রাখ এবং মন দিয়ে আমার কথাটা শোন। কথাটা হচ্ছে— আবার টেলিফোন করবি না।'

'আচ্ছা।'

'খোদা হাফেজ ছোট টুকুন।'

'খোদা হাফেজ ছোট ফুপু।'

'টুকুন টেলিফোন নামিয়ে রাখল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার টেলিফোন করল। সে জানে ছোট ফুপু খুব রাগ করবে তবুও টেলিফোন করল, কারণ আসল কথাই বলা হয় নি। ঝেং-এর বাচ্চা কাগজ খেয়ে ফেলেছে— এটাই বলা হয় নি।'

'হ্যালো ছোট ফুপু।'

'হুঁ।'

'আবার ফোন করেছি বলে রাগ করেছ?'

'করেছি। প্রচণ্ড রাগ করেছি।'

'আমি শুধু একটা কথা বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখব।'

'বেশ বল একটা কথা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা কাগজ খেয়ে ফেলেছে।'

'কী খেয়ে ফেলেছে?'

'কাগজ। আমার বিছানার উপর অনেক কাগজ ছিঁড়ে রেখেছিলাম। ঐগুলো খেয়ে ফেলেছে। এখন কোনো কাগজ নেই।'

'শোন টুকুন— ঝেং-এর বাচ্চা কোনো কাগজ খায়নি। রহিমা বুয়া ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে। তাকে জিজ্ঞেস কর।'

'আচ্ছা করছি।'

টুকুন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না, কারণ কলিংবেল বাজছে। তার বাবা -মা চলে এসেছেন। টুকুন দৌড়ে গেল সদর দরজার দিকে।

রশিদ সাহেব মেয়েকে ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পথে একটা কেক কিনে এনেছেন। শুধু কেক না, আটটা মোমবাতিও আছে।

রাতের খাবার শেষ হবার পর মোমবাতি জ্বলানো হল। মা বললেন, চোখ বন্ধ করে মনে মনে কিছু চাও এবং মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নেভাও। এক ফুঁ দিয়ে নেভাও। এক ফুঁ দিয়ে নেভাতে পারলে মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

টুকুন চোখ বন্ধ করে এক ফুঁ দিল এবং মনে মনে বলল, আমি যেন ঝেং-এর বাচ্চাকে দেখতে পাই। চোখ মেলে দেখল সব মোমবাতি নিভে গেছে। তারচেয়েও বড় কথা— সে ঝেং-এর বাচ্চাটাকে দেখতে পাচ্ছে। শরীরটা মনে হচ্ছে নরম কাচের তৈরি। চোখ দুটি হালকা গোলাপি। চারটা লম্বা কান বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে।

টুকুন উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, ঝেং-এর বাচ্চা ! ঝেং-এর বাচ্চা! ঐ দেখ ঝেং-এর বাচ্চা! আমি দেখতে পাচ্ছি!

রশিদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, কী বলছ টুকুন ?

টুকুন বলল, একটা ঝেং-এর বাচ্চা বসে আছে বাবা। কান নাড়ছে। দেখ দেখ, কী সুন্দর করে কান নাড়ছে।

'কিসের বাচ্চা।'

'ঝেং-এর বাচ্চা ব্যাপার কী ?'

একটা অদৃশ্য প্রাণী। এই প্রাণীটা কেউ চোখে দেখতে পারে না। এর চারটা লম্বা লম্বা কান আছে। ও চেয়ারটায় বসে আছে বাবা।

'তুমি দেখতে পাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ পাচ্ছি ?'

রশিদ সাহেব অনেকক্ষণ মন খারাপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মুনাকে বললেন, এতদিন ছিল কাক। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে— ঝেং-এর বাচ্চা। কী করি বল তো ?

মুনা টুকুনের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, কোথায় তোর ঝেং-এর বাচ্চা ?

'ঐ তো বসে আছে ?'

'যা ধরে নিয়ে আয়।'

টুকুন ঝেং-এর বাচ্চা ধরতে গেল। বাচ্চা পালিয়ে গেল না। বরং হাত বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে হাতে উঠে এল। টুকুন ঝেং-এর বাচ্চা কোলে নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার বাব-মা, দু'জনই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। কারণ তাঁরা কিছুই দেখছেন না।

www.BDeBooks.Com

৫

টুকুনের বাবা-মা টুকুনকে একজন শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে এসেছেন। ভদ্রলোকের নাম এম. আলম। শিশু হাসপাতালের খুব বড় ডাক্তার। গম্ভীর চেহারা হলেও, তাঁকে দেখে মনে হয়— তিনি মজার মজার গল্প জানেন।

টুকুনের বাবা— বললেন, আমার এই ছেলেটাকে ভাল করে একটু দেখুন তো ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কী হয়েছে ওর ?

'ওর মাথায় কোনো সমস্যা হয়েছে কি-না সেটা দেখুন।'

'মাথায় সমস্যার কথা কেন বলেছেন ? কী খোকা, তোমার মাথাব্যথা করে ?'

টুকুন বলল, না।

'তাহলে সমস্যা কী তোমার ? পড়া মনে থাকে না ?'

'পড়া মনে থাকে।'

মুনা বললেন, ওর বাইরে থেকে কোনো সমস্যা নেই ডাক্তার সাহেব। পড়াশোনায় ভাল। বুদ্ধিমান। প্রচুর খেলাধুলা করে। হঠাৎ একদিন বলা শুরু করল— একটা কাক নাকি তার সঙ্গে কথা বলে।

মুনাকে কথা শেষ না করতে দিয়েই ডাক্তার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এই সামান্য কারণে তাকে আপনি আমার কাছে নিয়ে এসেছেন ? আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার পরিষ্কার মনে আছে— আমি একটা টেডি বিয়ারের সঙ্গে কথা বলতাম। এটা কোনো ব্যাপারই না।

রশিদ সাহেব বললেন, আমি জানি এটা কোনো ব্যাপার না। আমি বা আমার স্ত্রী— আমরা কেউ তেমন গুরুত্ব দেই নি কিন্তু ইদানিং নতুন সমস্যা হয়েছে। সে বলছে তার সঙ্গে একটা ঝেং-এর বাচ্চা থাকে।

'কিসের বাচ্চা ?'

'ঝেং-এর বাচ্চা। একটি অদৃশ্য প্রাণী। যাকে কেউ দেখতে পায় না। শুধু সে দেখতে পায়।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, বলুক না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কী আছে ? বাচ্চাদের অনেক ধরনের ফ্যান্টাসি থাকে। একটু বুদ্ধি হলেই সব কেটে যাবে। আপনাদের চিন্তিত বোধ করার কোনই কারণ নেই।

রশিদ সাহেব বললেন, চিন্তিত বোধ করার কারণ একেবারেই যে নেই তা না। ও এখন সারাক্ষণই আছে তার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে। তাকে গোসল করাচ্ছে। গা মুছে দিচ্ছে। স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নেয়ার উপায় এখন আর নেই। এই যে আপনার কাছে এসেছি— আমার ছেলে তার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার সাহেব হাসিমুখে বললেন, তাই নাকি খোকা ?

'টুকুন বলল, হ্যাঁ।'

'কোথায় সে ?'

'ঐ তো, আপনার টেবিলে বসে আছে।'

ডাক্তার সাহেব টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শূন্য টেবিল। মনে হল তিনি খানিকটা হতাশ হয়েছেন। হয়ত আশা করেছিলেন কিছু দেখবেন। ডাক্তার সাহেব টুকুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ঝেং-এর বাচ্চা কী খায় ?

'কাগজ খায়।'

'সব ধরনের কাগজ খায় ?'

'জ্বি না। খবরের কাগজ খায় না।'

'টাকা খায় ? টাকাও তো কাগজে ছাপা।'

'খেতে পারে। আমি কখনো ওকে টাকা খেতে দেই নি।'

'আচ্ছা এই চকচকে নোটটা রাখলাম। দেখি ও খায় কি-না।'

ডাক্তার সাহেব একটা পাঁচশ টাকার নোট টেবিলে রাখলেন।

টুকুন বলল, আপনার সামনে তো খাবে না। কেউ সামনে থাকলে খায় না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, তুমি আদর করে বল, তুমি আদর করে বললে হয়ত খাবে।

টুকুন বলল, খাও তো টুন টুন, খাও তো।

পাঁচশ' টাকার নোট পড়ে রইল। টুকুন বলল, ও খাবে না। আমরা তাকিয়ে আছি তো— এই জন্যে খাবে না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, ও তাহলে টাকা খাবে না ?

টুকুন বলল, আমরা সবাই তাকিয়ে আছি তো তাই খাবে না। তাকিয়ে না থাকলে হয়ত খেয়ে ফেলত। ও খুব লাজুক।

'ওর স্বভাব-চরিত্র কী বল দেখি ?'

'শান্ত স্বভাব। খুব ভদ্র।'

'দাঁত আছে ?'

'আছে। আমাদের যেমন সাদা দাঁত ওরগুলি তেমন নয়। ওরগুলি হালকা নীল।'

'দাঁত মেজে দিতে হয় ?'

'আমি মাঝে মাঝে আমার টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজে দেই।'

মুনা বললেন, ডাক্তার সাহেব, এখন আপনি বলুন— আমরা যখন দেখি একটা ছেলে অদৃশ্য এক প্রাণীর দাঁত মেজে দিচ্ছে তখন কেমন লাগে ?

ডাক্তার সাহেব মুনার কথার জবাব না দিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার পাঁচশ' টাকার নোটটা কোথায় গেল ?

'তাই তো। টেবিলে ফেলে রাখা পাঁচশ' টাকার নোটটা নেই।'

টুকুন বলল, আমার মনে হয় ঝেং-এর বাচ্চা নোটটা খেয়ে ফেলেছে। আমরা যখন অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিলাম তখন সে এক ফাঁকে কপ করে খেয়ে ফেলেছে।

www.BDeBooks.Com

ডাক্তার সাহেব বললেন, শোন খোকা, কেউ কিছু খায় নি। বাতাসে নোটটা টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেছে। এক্ষুণি তা খুঁজে বের করা হবে।

ডাক্তার সাহেব ব্যস্ত হয়ে টেবিলের নিচে খুঁজতে লাগলেন। ময়লা ফেলার ঝুড়ির সব কাগজ মেঝেতে ঢেলে ফেলা হল। টুকুনের বাবা-মাও খুঁজতে লাগলেন। টুকুনও খুঁজছে। নোট নেই। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, বাতাসে হয়ত জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। এই হয়েছে। এছাড়া আর কিছু না। তিনি তাঁর অ্যাসিসটেন্টকে বাইরে খুঁজতে পাঠালেন। কিছু পাওয়া গেল না।

ডাক্তার সাহেব বললেন, বুঝতে পেরেছি কী হয়েছে— নোটটা জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে। কেউ একজন খুঁজে পেয়ে নিয়ে গেছে। এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।

রশিদ সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, আমি আপনাকে টাকাটা দিয়ে দি।

'আরে না, আপনি কেন টাকা দেবেন! ভাল কথা, এই অদৃশ্য জন্তুর অস্তিত্বে আপনারা কি বিশ্বাস করেন ?'

'জ্বি না।'

'এমন কিছু কি ঘটেছে যাতে এই জন্তুটিকে বিশ্বাস করতে হয় ?'

'না, এমন কিছুই ঘটে নি।'

'তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। এই ছেলে কী ভাবছে না ভাবছে এটা বড় কথা নয়। আমার মনে হয় আপনার ছেলে এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'ইনভিজিবল ম্যান' বইটা পড়েছে। পড়ার পর তার মাথায় অদৃশ্য জন্তুর ধারণা ঢুকে গেছে। আপনারা প্রশ্রয় দেবেন না। তাহলেই হল।'

'আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি না।'

'দিচ্ছেন না তাও কিন্তু না। প্রশ্রয় দিচ্ছেন— এই যে ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছেন, এও এক ধরনের প্রশ্রয় দেয়া।'

ডাক্তার সাহেব টুকুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, খোকা তুমি কি অদৃশ্য মানব বইটা পড়েছে ?

টুকুন গম্ভীর গলায় বলল, মানুষ অদৃশ্য হতে পারে না। অদৃশ্য হয় ঝেং-এ বাচ্চা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

রশিদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। টুকুনকে বললেন, উনাকে স্লামালিকুম দাও।

টুকুন বলল, স্লামালিকুম।

ডাক্তার সাহেব বললেন, খোকা, তুমি কী তোমার ঝেং-এর বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছ।

'জ্বি, নিয়ে যাচ্ছি।'

'গুড।'

তাঁরা চলে যাবার পর ডাক্তার সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হল, কারণ টেবিলে রাখা তাঁর ডায়রীর অর্ধেকের মত পাতা নেই। মনে হচ্ছে এই মাত্র ছিঁড়ে নেয়া

হয়েছে। অথচ এই ডায়রীটা তাঁর খুবই দরকারী। জরুরি ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার লেখা। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর মুখে বসে রইলেন।

৬

অপলার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। খুব ভাল পরীক্ষা হওয়ায় তার মন ভাল। সে পরীক্ষার পরদিনই একটা ক্যামেরা নিয়ে টুকুনদের বাসায় উপস্থিত। এখন সে টুকুনের বিখ্যাত ঝেং-এর ছানা নিয়ে গবেষণা করবে। ক্যামেরা এনেছে। ঝেং-এর বাচ্চার ছবি তুলে, ছবি প্রিন্ট করবে। যদি ছবিতে কিছু আসে। বেশকিছু ছবি তোলা হল। সিঙ্গেল ছবি, টুকুনের কোলে বসিয়ে ছবি। ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে, ফ্ল্যাশ লাইট ছাড়া।

টুকুন বলল, ছবিতে কি ওকে দেখা যাবে ছোট ফুপু ?

অপলা বলল, না দেখা যাবে না। যে জিনিস চোখে দেখা যায় না সে জিনিস ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে না।

'তাহলে ছবি তুলছ কেন ?'

'এমনি তুলছি।'

অপলা শুধু যে ছবি তুলল তাই না, আরো কিছু কাণ্ড করল। ওজন মাপার যন্ত্রে জন্তুটার ওজন নেবার চেষ্টা করল। না এর কোনো ওজন নেই।

অপলা বলল, এখন তোর ঝেং-এর বাচ্চাকে আমার চৌবাচ্চার পানিতে চুবিয়ে ধরে রাখব।

'তাতে কী হবে ?'

'দেখব বেঁচে থাকার জন্যে এর অক্সিজেনের দরকার আছে কি না। ধর, এটাকে নিয়ে আয়, আমরা চৌবাচ্চার পানিতে চুবাব।'

'না, এর কষ্ট হবে।'

'কষ্ট হলে ছটফট করবে। তখন ছেড়ে দিস। তোর হাতেই তো থাকবে।'

ঝেং-এর বাচ্চাকে চৌবাচ্চার পানিতে চুবানো হল। কিছু হল না। অপলা বলল, আচ্ছা, তোর এই জন্তুটার উপর আমি যদি বসে পড়ি তাহলে ওর কী হয় ?

'কিছুই হয় না। চ্যাপ্টা হয়ে যায়। তুমি উঠে দাঁড়ালে আবার ঠিক হয়ে যায়।'

'চল এটাকে কোনো একটা ক্লিনিকে নিয়ে যাই। এক্স-রে করাব। এক্স-রে করে দেখব কী ব্যাপার!'

তাও করা হল। অপলা নানান পরীক্ষার পর একটি রিপোর্ট লিখল। সেই রিপোর্ট টাইপ করে টুকুনের হাতে দিয়ে বলল, নে গাধা, বাংলায় লিখে এনেছি। যাকে বলে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন। বসে বসে পড়, তারপর মাথা থেকে ঝেং-এর বাচ্চা দূর কর। তুই সবাইকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছিস। আর না।

অপলা যা লিখে এনেছে তা হল—

www.BDeBooks.Com

ঝেং-এর বাচ্চা
একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন

নাম	ঝেং- এর বাচ্চা।
প্রজাতি	অজানা (টুকুনের ধারণা— এটি চার কানের অদৃশ্য জন্তু)।
ওজন	শূন্য।
দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা	শূন্য।
বর্ণ ও গন্ধ	নাই।
খাদ্য	খাদ্য গ্রহণ করে না। (টুকুনের ধারণা-কাগজ খায় যদিও তার প্রমাণ করা যায় নি)।
ফটোগ্রফি এবং এক্স-রে পরীক্ষা	কিছু পাওয়া যায় নি।
অক্সিজেন গ্রহণ	তথাকথিত জন্তুটি অক্সিজেন গ্রহণ করে না। পানির নিচে, এবং কার্বনডাই-অক্সাইড পূর্ণ বাক্সে জন্তুটিকে দীর্ঘ সময় রেখে দেখা গেছে সে ভালই আছে।
ঘাত সহনশীলতা	প্রচণ্ড চাপেও জন্তুটির কিছু হয় না। জন্তুটি স্থিতিস্থাপক। টানলে রবারের মত বাড়ে [টুকুনের বক্তব্য। কারণ আমরা কেউ তা দেখতে পাচ্ছি না।]
রাসায়নিক সক্রিয়তা	জন্তুটি রাসায়নিকভাবে সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয়। পানি, তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষার তার কিছুই করে না।
বস্তু ভেদ্যতা	জন্তুটি যে কোনো বস্তুর ভেতর দিয়ে যেতে পারে। একে টিনের ট্রাংকের ভেতরে বন্ধ করে রাখলেও এ ট্রাংকের ভেতর দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে। সিমেন্টের দেয়ালের ভেতর দিয়ে পারাপার করতে পারে (টুকুনের ধারণা)।
গবেষকের পরীক্ষার ফলাফল	পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বিবেচনা করে গবেষক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অদৃশ্য জন্তু জনৈক কিশোরের কষ্ট-কল্পনা। এই কল্পনাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। কিশোরকে বলা হচ্ছে

> সে যেন তার এই অদৃশ্য জন্তু, তথাকথিত ঝেং-এর বাচ্চাকে অনতিবিলম্বে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসে। তার নিজের এবং পরিবারের শান্তির জন্যে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

টুকুন মুখ কালো করে প্রতিবেদন পড়ল। অপলা হাই তুলে বলল, পড়েছিস ?

'হুঁ।'

তোকে তিন দিন সময় দেয়া হল। তিন দিনের ভেতর এই যন্ত্রণার মুক্তি চাই। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যা পাওয়া গেল, তোকে বললাম।

আচ্ছা।

'মুখ হাঁড়ির মত করে রেখেছিস কেন ? মুখ হাঁড়ির মত করে রাখার কিছু নেই।'

অপলা শিস দিতে দিতে চলে গেল। মন খারাপ করে নিজের ঘরে টুকুন চুপচাপ বসে রইল। ঝেং-এর বাচ্চাকে নিয়ে আজ আর খেলতেও ইচ্ছা করছে না। শুধুই কাঁদতে ইচ্ছা করছে। মৃদুলা যদি একটু বড় হত তাহলে তার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাত। সে এখনো এত ছোট। সে এখন শুধু দাঁড়াতে শিখেছে, অল্প অল্প হাঁটাও শিখেছে। কথা বলা ঠিকমত শেখে নি। কাগজ ছেঁড়া ছাড়া অন্য কিছু এখনো ভালমত পারে না। সে কাগজ ছেঁড়ে। ঝেং-এর বাচ্চা তার কোলে বসে থাকে। কোলে বসে বসেই খায়। টুকুনের ধারণা— মৃদুলা ঝেং-এর বাচ্চাকে দেখতে পায়। সে কথা বলতে পারে না বলে ঘটনাটা অন্যদের বলতে পারে না।

৭

আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন দুপুরে টুকুন কখনো ঘুমায় না। আজ তার এতই মন খারাপ যে চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল— ঘুম ভাঙল দাঁড়কাকের ডাকে—

'ও টুকুন! টুকুন! অসময়ে ঘুমুচ্ছ ? ব্যাপারটা কী ? দুপুরে কেউ ঘুমায় ?'

টুকুন উঠে বসল। কাক একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করল,

'ব্যাপার কী ?'

'মন খারাপ কেন ?'

'কাঁদছিলে না কি ?'

'হয়েছে কী ?'

টুকুন বলল, ছোট ফুপু রিসার্চ করে বের করেছেন ঝেং-এর বাচ্চা বলে কিছু নেই।

'রিসার্চ করে বের করে ফেলেছে ?'

www.BDeBooks.Com

'হুঁ।'

'কী বলল সে ?'

'বলল, এমন কিছু থাকতে পারে না যে শুধু কাগজ খায়— আর কিছু খায় না।'

'এই কথা বলল ?'

'হুঁ।'

'শোন টুকুন, ঝেং-এর বাচ্চা আছে। প্রতিটি সরকারি অফিসে একটা-দু'টা করে ঝেং-এর বাচ্চা আছে। এরা কী করে জান ? এরা দরকারী ফাইল খেয়ে ফেলে। প্রায়ই শোন না, ফাইল পাওয়া যায় না ? পাওয়া যায় না কেন ? ঝেং-এর বাচ্চারা খেয়ে ফেলে। এরা বেঁচেই আছে সরকারি ফাইল খেয়ে।'

'সত্যি ?'

হ্যাঁ সত্যি।

'দলিলপত্রের রেকর্ড যেখানে থাকে সেখানেও ঝেং-এর বাচ্চারা থাকে। তারা মহানন্দে রেকর্ডপত্র খেয়ে ফেলে।'

'কেউ কিছু বলে না ?'

'না, বরং খুশি হয়।'

'ছোট ফুপুর রিসার্চ তাহলে ঠিক না ?'

'উঁহু।'

'একটা কাগজে উনি প্রতিবেদন লিখেছেন। আপনি একটু পড়ে দেখবেন ?'

'প্রতিবেদন-ফেদন পড়তে ভাল লাগে না। চোখেও ডিসটার্ব করছে। তুমি পড়। আমি শুনি।'

টুকুন পড়ে শোনাল। দাঁড়কাক গম্ভীর ভঙ্গিতে শুনল। পড়া শেষ হলে বলল, বোগাস। রিসার্চ কিছুই হয় নি। তোমার ছোট ফুপুর মাথা মোটা।

'উনার মাথা মোটেই মোটা না। গত বছর ফিজিক্স অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছেন।'

এটাই তো মাথামোটার লক্ষণ। মাথামোটারা পড়ার বই ছাড়া কিছু বোঝে না— শুধু বই পড়ে আর ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। ঐ যে তোমাদের রবীন্দ্রনাথের কথাই ধর। কাক নিয়ে যিনি এত সুন্দর একটা কবিতা লিখেছেন—

বৈশাখ মাসে কাক গাছে বসে থাকে।'

তিনি কি কখনো ফাস্ট-সেকেন্ড হয়েছেন। হন নি। তুমি তোমার ছোট ফুপুকে বলবে— ফুপু, আপনার মাথা মোটা।

'এটা বলা যাবে না। শুনলে উনি খুব রাগ করবেন।'

রাগ করলেও বলা উচিত। সত্য গোপন করতে নেই। কী অদ্ভুত মাথামোটা মেয়ে— চোখে দেখা যাচ্ছে না। কাজেই বলে দিল জিনিস নেই। অনেক কিছুই আছে কিন্তু চোখে দেখা যায় না— যেমন ধর তোমার ইলেকট্রন প্রোটন। এদের ওজন আছে, কিন্তু ওজন খুব কম। সাধারণ পাল্লাপাথরে মাপা যায় না। সে

ঝেং-এর বাচ্চার ওজন মাপার জন্যে সাধারণ একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে এসেছে— কী রকম মাথামোটা মেয়ে,— উফ! যাও তো টুকুন— টেলিফোন করে আমার কথাগুলি বলে আস।

টুকুন টেলিফোন করতে উঠে গেল।

'হ্যালো ছোট ফুপু!'

'কে টুকুন?'

'কাকটা এসেছিল।'

'ও আচ্ছা। আমি ভেবেছিলাম ঝেং-এর বাচ্চা পাওয়ার পর কাক বাবাজি দূর হয়েছেন। উনি তাহলে দূর হন নি?'

'না।'

'ভাল কথা। উনি কী বললেন?'

'উনি বললেন— তোমার মাথা মোটা।'

'আমার মাথা মোটা?'

'হ্যাঁ।'

'আর উনার মাথা খুব সরু?'

'ছোট ফুপু, উনার নিজের মাথার কথা কিছু বলেন নি। তোমারটার কথা বলেছেন।'

'কেন আমার মাথা মোটা সেটা বলে নি?'

'বলেছেন। উনি বলেছেন চোখে না দেখা গেলেই যে একটা জিনিস থাকবে না, তা না। ইলেকট্রন দেখা যায় না। কিন্তু ইলেকট্রন আছে।'

'অবশ্যই আছে। কিন্তু গাধা— ইলেকট্রন দেখা না গেলেও ইলেকট্রনের কাজকর্ম দেখা যায়। তারে হাত দিলে শক খেতে হয়। শক খায় ইলেকট্রনের জন্যে। তোর ঝেং-এর বাচ্চা কিছু করে না। কাউকে শক দেয় না। এমন যদি হত ঘরের সব কাগজপত্র খেয়ে ফেলতো তাহলেও বুঝতাম।'

'তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন ছোট ফুপু?'

'রেগে রেগে কথা বলছি— কারণ আমি রেগে গেছি। তুই তোর ঐ কাকটাকে বলিস— ছোট ফুপু বলেছেন— আপনি একটা গাধা। বলতে পারবি না?'

'না।'

'না কেন?'

'কারণ উনি গাধা না। পাখি কখনো গাধা হয় না। ছোট ফুপু, তোমার মাথা আসলেই মোটা।'

টুকুন শুনল ছোট ফুপু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। টুকুন ভয়ে ভয়ে বলল, কী হয়েছে ছোট ফুপু?

'কিছু হয় নি।'

'তুমি কাঁদছ?'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ, আমি কাঁদছি। চব্বিশ বছর বয়স হয়েছে আমার। কেউ আমাকে মাথা মোটা বলে নি। তুই বলেছিস। আমি কাঁদব না?'

'আমি বলিনি ছোট ফুপু। কাক বলেছে।'

'কাক-টাক সব বাজে কথা। এগুলো তোর মনের কথা।'

ছোট ফুপু টেলিফোনেই বাচ্চা মেয়েদের মত কাঁদতে লাগলেন। টুকুনের খুব মন খারাপ হল। এরকম কাণ্ড হবে সে কখনো ভাবে নি। তার নিজেরও কান্না পেতে লাগল। ছোট ফুপুকে সে যে কী ভালবাসে তা শুধু সে-ই জানে। আর কেউ জানে না।

৮

ঝেং-এর বাচ্চাটা বোধ হয় টুকুনের অবস্থা বুঝতে পারে। আজ যে টুকুন মন খারাপ করেছে মনে হচ্ছে সে বুঝতে পারছে। কারণ সে ঘুরছে টুকুনের পায়ে পায়ে। টুকুন বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সেও বিছানায় এসে টুকুনের পাশে বসে রইল। তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। টুকুন বলল,

'আজ আমার খুব মন খারাপ।'

ঝেং -এর বাচ্চা কান নাড়ল। যেন সে বুঝতে পারছে।

'অনেকগুলো কারণে মন খারাপ। প্রথম কারণ— আমার জন্যে ছোট ফুপু আজ কেঁদেছেন। আর দ্বিতীয় কারণ, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। বাবার ধারণা, আমি পাগল হয়ে গেছি। আচ্ছা, আমি কি পাগল হয়েছি?'

ঝেং-এর বাচ্চা উত্তর দিল না। কান নাড়ল। কান নেড়ে বুঝিয়ে দিল— 'না।'

'কী করি বল তো?'

ঝেং-এর বাচ্চা কিছু বলল না। টুকুন কেঁদে ফেলল। এমনিতে সে কাঁদে না। বড় হয়েছে তো। বড় হলে কাঁদতে নেই। ঝেং-এর বাচ্চা টুকুনকে কাঁদতে দেখে বিছানা থেকে নেমে গেল। রবারের বলের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মেঝেতে। পড়েই বলের মত কয়েকবার উঠানামা করে গড়াতে গড়াতে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টুকুন দেখল বালিশের কাছে তার রঙের বাক্স পড়ে আছে। আশ্চর্য কাণ্ড তো! রঙের বাক্সটা বাবা ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। ঝেং নিশ্চয়ই নিয়ে এসেছে। সে কি তালা না খুলেই নিয়ে এসেছে?

টুকুনের মন একটু একটু ভাল হতে শুরু করেছে। রঙ দিয়ে দেয়ালে সুন্দর একটা ছবি আঁকলে মনটা হয়তো পুরোপুরি ভাল হয়ে যাবে। ঝেং -এর বাচ্চার একটা বড় ছবি। কেউ যদি দেখতে চায় তাহলে— ছবি দেখালেই হবে।

সন্ধ্যার মধ্যে টুকুন সারা দেয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ছবি আঁকল। কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে ঝেং-এর বাচ্চাটাকে! গোলাপি চোখ, নীল দাঁত, লম্বা লম্বা কান।

সন্ধ্যার পর রশিদ সাহেব ছেলের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেয়ালে আঁকা ছবি দেখলেন। শান্ত গলায় বললেন, ছবি তুমি এঁকেছ টুকুন?

'জ্বি বাবা। সুন্দর হয়েছে না?'

'জ্বি।'

'তুমি কি ড্রয়ারের তালা খুলে তোমার রঙ -তুলির বাক্স বের করেছ?'

'না বাবা। ঝেং-এর বাচ্চা এনে দিয়েছে।'

রশিদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ঝেং-এর বাচ্চা এনে দেয় নি। তুমি নিজেই এনেছ। টেবিলের উপর চাবি ছিল। চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে এনেছ। তুমি একসঙ্গে অনেকগুলি অপরাধ করেছ। প্রথম অপরাধ— আমার ড্রয়ার খুলেছ। দ্বিতীয় অপরাধ— দেয়ালে ছবি এঁকেছ। তৃতীয় অপরাধ— মিথ্যা কথা বলেছ। চতুর্থ অপরাধ— তোমার ছোট ফুপুকে মাথা মোটা বলেছ।

'আমি বলি নি বাবা। কাক বলেছে।'

'কাক কিছু বলে নি টুকুন। কাক কিছু বলতে পারে না। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছ, দোষটা দিচ্ছ কাককে। আমি বাচ্চাদের শাস্তি দিতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোমাকে শাস্তি দেয়া দরকার। কী শাস্তি দেয়া যায় বলতো?'

'আমি জানি না বাবা।'

'কী তুমি সবচে ভয় পাও?'

'বাথরুমে আটকা পড়ে গেলে আমি খুব ভয় পাই।'

'বেশ, তাহলে তাই করা হবে। তোমাকে বাথরুমে আটকে রাখা হবে। যতক্ষণ না তুমি সব অপরাধ স্বীকার কর ততক্ষণ বাথরুমে বন্দি থাকবে।'

টুকুনের কান্না এসে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে কান্না আটকে বলল, কখন আটকাবে বাথরুমে?

'এইত এখন। এসো আমার সঙ্গে?'

'বাতি কি নিভিয়ে দেবে, না বাতি জ্বালানো থাকবে?'

'বাতি নেভানো থাকবে।'

টুকুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ছোটদের এরকম শাস্তি দেয়া কি উচিত?'

'না, উচিত নয়। কিন্তু ছোটদের এ জাতীয় অপরাধ করা উচিত নয়— সে কারণেই শাস্তি। অপরাধ করলে শাস্তি হয়। অপরাধীর কোনো বড় ছোট নেই। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

তিনি ছেলেকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন বাতি নেভাবেন না। বাথরুমে অন্ধকার হলে শাস্তি বেশি হয়ে যাবে। শেষে ঠিক করলেন, নেভাবেন। কিছুটা ভয় টুকুনের পাওয়া দরকার।

রশিদ সাহেব চিন্তিত মুখে তাঁর লেখার টেবিলে গেলেন। ছেলেটাকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়া গেছে। কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছেন না। মানসিক অশান্তির কারণে তাঁর নিজের লেখাও এগুচ্ছে না। 'এ কী কাণ্ড!' উপন্যাসটা প্রায়

www.BDeBooks.Com

শেষ করে নিয়ে এসেছেন— দ্রুত লিখছিলেন। গল্পটা সুন্দর দাঁড়া হয়েছিল। এখন আর এগুচ্ছে না।

লেখার টেবিলে বসে রশিদ সাহেব চমকে উঠলেন। লেখা কাগজগুলো নেই। তিনি টেবিলে খুঁজলেন, মেঝেতে খুঁজলেন। না, কোথও কিছু নেই। মাঝে মাঝে মৃদুলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে লেখার কাগজ বইয়ের আলমিরায় ঢুকিয়ে রাখেন। বোধহয় তাই করেছেন— তিনি বইয়ের আলমিরা খুললেন। না, লেখার কাগজ নেই। শুধু যে তাই— তা না আলমিরায় বইও নেই। বিরাট আলমিরা ঠাসা ছিল বই-এ। কালও বইগুলি ছিল। রাতে শোবার সময় বই নিয়ে পড়েছেন। এখন নেই। একটি বইও নেই। কোথায় যাবে এতগুলো বই ? ব্যাপারটা কী ?

রশিদ সাহেব রান্নাঘরে ঢুকে ক্লান্ত গলায় ডাকলেন, মুনা মুনা।

মুনা এল।

রশিদ সাহেব বললেন, আমাকে এক কাপ চা দাও।— আর বাড়িটা একটু ঘুরে ফিরে দেখ তো তুমি কোথাও কোনো পরিবর্তন দেখছ কিনা। মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে।

মুনা হতভম্ব গলায় বললেন, দেয়ালের ছবিগুলো কোথায় ? ছবি ?

দেখা গেল— ঘরের দেয়ালে কোনো ছবি নেই— ফ্রেম আছে, কিন্তু ছবি নেই। মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করলেন— ঘরে কোনো কাগজ নেই। এক টুকরো কাগজও নেই।

মুনা ছুটে গিয়ে স্টিলের আলমিরা খুললেন। আলমিরার ভেতর সার্টিফিকেট রাখা আছে। জমির দলিল আছে। কিছুই নেই। সংসার খরচের টাকা আলাদা করা ছিল টিনের কৌটায়। তাও নেই। পুরো বাড়ি কাগজ শূন্য।

রশিদ সাহেব বললেন, ব্যাপার কি কিছু বুঝতে পারছ ?

মুনা ভীত গলায় বললেন, পারছি।

'তোমার অনুমানটা কী বলতো ?'

মুনা ইতস্তত করে বললেন, ঝেং-এর বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে।

'অপলাকে টেলিফোন করে আসতে বল। এক্ষুণি আসতে বল।'

'ও এসে কী করবে ?'

'সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে কী করা বা না করা।'

মুনা বললেন, টুকুন কোথায় ?

'ওকে শস্তি দেয়া হচ্ছে।'

'কী শাস্তি ?'

'কী শাস্তি তা পরে বলব। এখন তুমি অপলাকে আসতে বল। এক্ষুণি আসতে বল। আমার হাত-পা কাঁপছে। কী সমস্যা বলতো ?'

টুকুন একা একা বাথরুমে দাঁড়িয়ে আছে। সে ক্রমাগত কাঁদছে। শার্টের হাতায় চোখ মুছছে। ইচ্ছা করছে চিৎকার করে বলে— বাবা, এতদিন আমি যা বলেছি বানিয়ে বানিয়ে বলেছি। আর বলব না। ঝেং-এর বাচ্চা বলে কিছু নেই। সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। আবার প্রচণ্ড অভিমানও হচ্ছে। কারণ সে জানে যা ঘটেছে সবই সত্যি। মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

মিষ্টি করে কে যেন ডাকল, টুকুন!'

টুকুন ভয়ঙ্কর চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে ঝেং-এর বাচ্চা বেসিনের উপর বসে আছে। অন্ধকারেও তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেই কি কথা বলছে? খুব হালকা গলা। ফিস ফিস করে কথা বলছে। এত অস্পষ্ট যে প্রায় বোঝাই যায় না।

'তুমি কথা বলতে পার?'

'হুঁ।'

'তাহলে এতদিন কথা বল নি কেন?'

'কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। খুব কষ্ট হয়।'

'তাহলে এখন কথা বলছ কেন?'

'আমার জন্যে তুমি শুধু কষ্ট পাচ্ছ এই জন্যেই কথা বলছি। শোন টুকুন, আমি ঠিক করেছি— আমি চলে যাব।'

'কী বললে?'

'আমি চলে যাব।'

'কেন?'

'আমি থাকলেই তোমার নানা সমস্যা হবে। কী দরকার! তোমাকে যখন বাথরুমে দরজা বন্ধ করল তখন এমন রাগ লাগল যে তোমাদের বাসার সব কাগজ খেয়ে ফেলেছি।'

'সে কী!'

'কাজটা ঠিক হয় নি। ভুল হয়েছে। ঝেং-এর বাচ্চারা কখনো ভুল করে না। আমি রাগের কারণে ভুল করে ফেলেছি— তবে ভুল করলে ভুল শুধরানো যায়। আমি যেসব কাগজ খেয়ে ফেলেছি সব আবার ফেরত দিয়ে যাচ্ছি। যাই টুকুন।'

'আর কিছুক্ষণ থাক। অল্প কিছুক্ষণ।'

'না টুকুন। আমি যাই।'

ঝেং-এর বাচ্চা চলে গেল কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ঝেং-এর বাচ্চাই কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে।

বাথরুমের দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে।

টুকুন ভয় পেয়ে বলল, কে?

'আমি, আমি দাঁড়কাক। তোমাকে এরা বাথরুমে আটকে রেখেছে শুনে খুবই মন খারাপ হল। তোমাকে সাহস দেবার জন্যে এসেছি।'

www.BDeBooks.Com

'আপনাকে ধন্যবাদ। আমি বাথরুমে আটকা পড়েছি আপনাকে কে বলল ?'

ঝেং-এর বাচ্চা বলল, ও দেখি কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। 'শোন টুকুন, আমি ঠিক করেছি আমিও আর তোমার কাছে আসব না। আমার জন্যেও তোমার সমস্যা হচ্ছে। হচ্ছে না ?

'হচ্ছে।'

আমার মনে হয়, তোমার বাবাকে তুমি বল যে এতদিন যা বলেছ— সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছ, আর বলবে না। তাহলে তোমার সমস্যা মিটে যাবে।

'আচ্ছা বলব।'

'মিথ্যা কথা বলা হবে— উপায় কী! মানুষ মিথ্যাটাই সহজে বিশ্বাস করে। মানুষ বড়ই অদ্ভুত জীব।'

বাথরুমের বাতি জ্বলে উঠল।

রশিদ সাহেবের ভয়ার্ত গলা শোনা গেল, টুকুন! টুকুন!

'জ্বি!'

'বেশি ভয় পেয়েছিস ?'

'না বাবা।'

তিনি বাথরুমের দরজা খুলে টুকুনকে কোলে তুলে নিলেন। বাবার পাশে মা দাঁড়িয়ে আছেন। মা'র পাশে ছোট ফুপু। তাদের পেছনে রহিমার মা। রহিমার মা'র কোলে মৃদুলা। মৃদুলা ঘুমুচ্ছে।

টুকুন ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, এতদিন যা বলেছি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছি, বাবা। আর কোনদিন বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলব না।

রশিদ সাহেব অবাক হয়ে তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুনা তাকাল অপলার দিকে।

টুকুন ছোট ফুপুর দিকে তাকিয়ে বলল, ছোট ফুপু! আসলে আমিই তোমাকে মাথা মোটা বলেছি। আর কোনদিন বলব না।

টুকুন শব্দ করে কাঁদতে লাগল। অপলা এসে টুকুনকে কোলে নিল। অপলার নিজের চোখেও পানি এসে গেছে। সে ইতস্তত করে বলল, টুকুন, হয়ত তোর কথাই ঠিক। হয়ত ঝেং-এর বাচ্চা বলে কিছু একটা আছে যে কাগজ খায়। হয়ত আমরাই ভুল করেছি।

টুকুন বলল, 'তোমরা কোনো ভুল কর নি। সব আমার বানানো।'

তারা সবাই শোবার ঘরে ঢুকল। রশিদ সাহেব দেখলেন— লেখার টেবিলে তাঁর লেখা ঠিকঠাক আছে। আলমিরার বই সব আছে। দেয়ালের ছবিও ফিরে এসেছে— শুধু একটা ছবি উল্টো হয়ে গেছে। মাথাটা নিচের দিকে।

রশিদ সাহেব দীর্ঘ সময় উল্টো হয়ে যাওয়া ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, অনেকদিন ধরে আমরা কোথাও বেড়াতে যাই না। বলতে গেলে ঘরের মধ্যে বন্দি। মনে হচ্ছে এজন্যেই আমাদের সবার মাথা খানিকটা জট পাকিয়ে গেছে— দল বেঁধে সবাই সমুদ্রের কাছে গেলে কেমন হয় ?

টুকুন বলল, খুব ভাল হয় বাবা।

টুকুনরা খুব আনন্দ করে সমুদ্রের কাছ থেকে ঘুরে এল।

তারপর কতদিন কেটে গেল। তাদের বাড়িটার কত অদল-বদল হল— শুধু উল্টে যাওয়া ছবিটা সেই জায়গাতেই রইল। রশিদ সাহেব প্রায়ই এই ছবিটার সামনে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে তিনি কী ভাবেন তা কাউকে বলেন না। কেউ জানতেও চায় না। এই পৃথিবী বড়ই বিচিত্র! এই পৃথিবীর সব রহস্য জানতে চাওয়া ঠিক নয়।

www.BDeBooks.Com

আমার ছেলেবেলা

শোনা কথা

মানুষ অসম্ভব স্মৃতিধর।

নব্বই বছরের একজন মানুষও তার ছেলেবেলার কথা মনে করতে পারে। মস্তিষ্কের অযুত নিযুত নিওরোনে বিচিত্র প্রক্রিয়ায় স্মৃতি জমা হয়ে থাকে। কিছুই নষ্ট হয় না। প্রকৃতি নষ্ট হতে দেয় না। অথচ আশ্চর্য, অতি শৈশবের কোনো কথা তার মনে থাকে না। দু'বছর বা তিন বছর বয়সের কিছুই সে মনে করতে পারে না। মাতৃগর্ভের কোনো স্মৃতি থাকে না, জন্মমুহূর্তের কোনো স্মৃতিও না। জন্মসময়ের স্মৃতিটি তার থাকা উচিত ছিল। এত বড় একটা ঘটনা অথচ এই ঘটনার স্মৃতি প্রকৃতি মুছে ফেলে। মনে হয় প্রকৃতির কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য এতে কাজ করে। প্রকৃতি হয়তো চায় না পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা আমরা মনে করে রাখি।

আমি যখন মন ঠিক করে ফেললাম ছেলেবেলার কথা লিখব, তখন খুব চেষ্টা করলাম জন্মমুহূর্তের স্মৃতির কথা মনে করতে এবং তারও পেছনে যেতে, যেমন মাতৃগর্ভ। কেমন ছিল মাতৃগর্ভের সেই অন্ধকার ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করল। এল এস ডি (Lysergic acid diektlyamide) নামের এক ধরনের ড্রাগ নাকি মাতৃগর্ভ এবং জন্মমুহূর্তের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকা থাকাকালীন এই ড্রাগের খানিকটা জোগাড় করেছিলাম। সাহসের অভাবে খেতে পারি নি। কারণ এই হেলুসিনেটিং ড্রাগ প্রায়ই মানসিক অবস্থায় বড় রকমের ঢেউ তোলে।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, খুব পুরানো কথা আমার কিছুই মনে নেই। তবে জন্মের চার বছরের পর থেকে অনেক কিছুই আমি মনে করতে পারি। সেসব কথাই লিখব। শুরুটা করছি শোনা কথার উপর নির্ভর করে। শোনা কথার উপর নির্ভর করাও বেশ কঠিন। একই গল্প একেক জন দেখি একেক রকম করে বলেন। যেমন একজন বললেন, 'তোমার জন্মের সময় খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল।' অন্য একজন বললেন, 'কই না তো, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছিল এইটা খেয়াল আছে, ঝড়বৃষ্টি তো ছিল না!'

আমি সবার কথা শুনে শুনে একটি ছবি দাঁড় করিয়েছি। এই ছবি খানিকটা এদিক-ওদিক হতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি এমন কেউ না যে

www.BDeBooks.Com

আমার জন্মমুহূর্তের প্রতিটি ঘটনা হুবহু লিখতে হবে। কোনো ভুলচুক করা যাবে না। থাকুক কিছু ভুল। আমাদের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই তো আছে ভুল এবং ভ্রান্তি।

আমার জন্ম ১৩ নভেম্বর। ১৯৪৮ সন। শনিবার, রাত ১০টা তিরিশ মিনিট। শুনেছি ১৩ সংখ্যাটাই অশুভ। এই অশুভের সঙ্গে যুক্ত হল শনিবার। শনি-মঙ্গলবারও নাকি অশুভ। রাতটাও কৃষ্ণপক্ষের। জন্মমুহূর্তে দপ করে হারিকেন নিভে গেল। ঘরে রাখা গামলার পানি উলটে গেল। একজন ডাক্তার, যিনি গত তিনদিন ধরে মা'র সঙ্গে আছেন, তিনি টর্চলাইট জ্বেলে তার আলো ফেললেন আমার মুখে। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, এই জানোয়ারটা দেখি তার মাকে মেরেই ফেলছিল!

আমি তখন গভীর বিস্ময়ে টর্চলাইটের ধাঁধানো আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। চোখ বড় বড় করে দেখছি— এসব কি? অন্ধকার থেকে এ আমি কোথায় এলাম?

জন্মের পর পর কাঁদতে হয়। তা-ই নিয়ম।

চারপাশের রহস্যময় জগৎ দেখে কাঁদতেও ভুলে গেছি। ডাক্তার সাহেব আমাকে কাঁদাবার জন্য ঠাশ করে গালে চড় বসালেন। আমি জন্মমুহূর্তেই মানুষের হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগলাম। ঘরে উপস্থিত আমার নানিজান আনন্দিত স্বরে বললেন, 'বামুন রাশি ছেলে'। বামুন রাশি বলার অর্থ প্লেসেন্টার সঙ্গে যুক্ত রক্তবাহী শিরাটি বামুনের পৈতার মতো আমার গলা পেঁচিয়ে আছে।

শিশুর কান্নার শব্দ আমার নানাজানের কানে যাওয়ামাত্র তিনি ছুটে এসে বললেন, ছেলে না মেয়ে?

ডাক্তার সাহেব রহস্য করবার জন্যে বললেন, মেয়ে, মেয়ে। ফুটফুটে মেয়ে।

নানাজান তৎক্ষণাৎ আধমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠালেন। যখন জানলেন মেয়ে নয় ছেলে— তখন আবার লোক পাঠালেন— আধমণ নয়, এবার মিষ্টি আসবে একমণ। এই সমাজে পুরুষ এবং নারীর অবস্থান যে ভিন্ন তাও জন্মলগ্নেই জেনে গেলাম।

নভেম্বর মাসের দুর্দান্ত শীত।

গারো পাহাড় থেকে উড়ে আসছে অসম্ভব শীতল হাওয়া। মাটির মালশায় আগুন করে নানিজান সেক দিয়ে আমাকে গরম করার চেষ্টা করছেন। আশেপাশের বৌ-ঝি'রা একের পর এক আসছে এবং আমাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলছে— 'সোনার পুতলা।'

এতক্ষণ যা লিখলাম সবই শোনা কথা। মা'র কাছ থেকে শোনা। কিন্তু আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ আমি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের

মানুষ। আমাকে দেখে সোনার পুতলা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার কিছু নেই। তা ছাড়া জন্মমুহূর্তের এতসব কথা আমার মা'রও মনে থাকার কথা নয়। তাঁর তখন জীবন-সংশয়। প্রসববেদনায় পুরো তিনদিন কাটা মুরগির মতো ছটফট করেছেন। অতিরিক্ত রকমের রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পাড়াগাঁর মতো জায়গায় তাঁকে রক্ত দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থাতেও তিনি লক্ষ্য করছেন, তাঁর সোনার পুতলা গভীর বিস্ময়ে চারপাশের পৃথিবীকে দেখছে, কাঁদতে ভুলে গেছে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার ধারণা, মা যা বলেছেন তা অন্যদের কাছ থেকে শুনেই বলেছেন।

ধরে নিচ্ছি, মা যা বলেছেন সবই সত্যি। ধরে নিচ্ছি, একসময় আমার গাত্রবর্ণ কাঁচা সোনার মতো ছিল। ধরে নিচ্ছি, আমার জন্মের আনন্দপ্রকাশের জন্য সেই রাতে একমণ মিষ্টি কিনে বিতরণ করা হয়েছিল। মিষ্টি কেনার অংশটি বিশ্বাসযোগ্য। নানাজানের অর্থবিত্ত তেমন ছিল না, কিন্তু তিনি দিলদরিয়া ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর সবচে আদরের প্রথমা কন্যা, বিয়ে হয়ে যাবার পরও যে-কন্যার মাথার চুল তিনি নিজে পরম যত্নে আঁচড়ে দিতেন এই অতি আদরের কন্যার বিয়ের সময়ও তিনি জমিটমি বিক্রি করে খরচের চূড়ান্ত করলেন। পিতৃহৃদয়ের মমতা প্রকাশ করলেন দুহাত খুলে টাকা খরচের মাধ্যমে।

উদাহরণ দিই— মোহনগঞ্জ স্টেশন থেকে বর আসবে, হাঁটাপথে পাঁচ মিনিটের রাস্তা। পালকির ব্যবস্থা করলেই হয়। আমার নানাজান হাতির ব্যবস্থা করলেন। সুসং দুর্গাপুর থেকে দুটি হাতি আনানো হল। যে লোক এই কাজ করতে পারেন, তিনি তাঁর প্রিয় কন্যার প্রথম সন্তানজন্মের খবরে বাজারের সমস্ত মিষ্টি কিনে ফেলতে পারেন।

আমার বাবা তখন সিলেটে। বিশ্বনাথ থানার ওসি।

ছেলে হবার খবর তাঁর কাছে পৌঁছল। তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বেচারার খুব শখ ছিল প্রথম সন্তানটি হবে মেয়ে। তিনি মেয়ের নাম ঠিক করে বসে আছেন। একগাদা মেয়েদের ফ্রক বানিয়েছেন। রূপার মল বানিয়েছেন। তাঁর মেয়ে মল পায়ে দিয়ে ঝমঝম করে হাঁটবে— তিনি মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। ছেলে হওয়ায় সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। তিনি একগাদা ফ্রক ও রূপার মল নিয়ে ছেলেকে দেখতে গেলেন। পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এসব মেয়েলি পোশাক আমাকে দীর্ঘদিন পরতে হয়। বাবাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মা আমার মাথার চুলও লম্বা রেখে দেন। সেই বেণি-করা চুলে রংবেরঙের রিবন পরে আমার শৈশবের শুরু।

বাবা-মা'র প্রথম সন্তান হচ্ছে চমৎকার একটি জীবন্ত খেলনা। এই খেলনার সবই ভালো। খেলনা যখন হাসে, বাবা-মা হাসেন। খেলনা যখন কাঁদে, বাবা-

www.BDeBooks.Com

মা'র মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। আমার বাবা-মা'রও ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। তাঁরা তাঁদের শিশুপুত্রের ভেতর নানান প্রতিভার লক্ষণ দেখে বারবার চমৎকৃত হলেন। হয়তো আমাকে চাবি-দেয়া একটা ঘোড়া কিনে দেয়া হল, আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ভেঙে ফেললাম। আমার বাবা পুত্রপ্রতিভায় মুগ্ধ। হাসিমুখে বললেন, দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের কি কৌতূহল! সে ভেতরের কলকবজা দেখতে চায়।

হয়তো আমাকে খাওয়ানোর জন্য মা থালায় করে খাবার নিয়ে গেলেন, আমি সেই থালা উড়িয়ে ফেলে দিলাম। বাবা আমার প্রতিভায় মুগ্ধ— দ্যাখো দ্যাখো, ছেলের রাগ দ্যাখো। রাগ থাকা ভালো। এই যে থালা সে উড়িয়ে ফেলে দিল এতে প্রমাণিত হল তার পছন্দ-অপছন্দ দুটিই খুব তীব্র।

এই সময় বই ছিঁড়ে ফেলার দিকেও আমার ঝোঁক দেখা গেল। হাতের কাছে বই পাওয়ামাত্র টেনে ছিঁড়ে ফেলি। এর মধ্যেও বাবা আমার প্রতিভার লক্ষণ দেখতে পেলেন। তিনি মা'কে বোঝালেন— এই যে সে বই ছিঁড়ছে, তার কারণ বইয়ের লেখা সে পড়তে পারছে না, বুঝতে পারছে না। যে জিনিস সে বুঝতে পারছে না সেই জিনিস সে নষ্ট করে দিচ্ছে। এটি প্রতিভার লক্ষণ।

আদরে বাঁদর হয়।

আমি পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেলাম। এবং আমার প্রতিটি বাঁদরামিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখে আমার বাবা-মা বারবার চমৎকৃত হতে লাগলেন। বাবা-মা'র সঙ্গে যুক্ত হলেন বাবার এক বন্ধু গনি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী। এই নিঃসন্তান দম্পতি তাঁদের বুভুক্ষু হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আমার জন্যে ঢেলে দিলেন। তাঁদের ভালোবাসার একটা ছোট্ট নমুনা দিচ্ছি। একদিন বেড়াতে এসে দেখেন আমি চামচে করে চিনি খাচ্ছি। গনি চাচা বললেন, আরে এ তো আগ্রহ করে চিনি খাচ্ছে! চিনি খেতে পছন্দ করে তা তো জানতাম না! তিনি তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গেলেন। ফিরে এলেন পাঁচ সের চিনি নিয়ে। মেঝেতে পাটি পেতে আমাকে বসিয়ে দিলেন। আমার চারদিকে চিনি ছড়িয়ে দেয়া হল। গনি চাচা হৃষ্টচিত্তে বললেন, খা ব্যাটা, কত চিনি খাবি খা।

আমাকে ঘিরে বাবা-মা'র আনন্দ স্থায়ী হল না। আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালান্তক জ্বর। টাইফয়েড। তখন টাইফয়েডের অষুধ বাজারে আসে নি। রুগিকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কিছুই করণীয় নেই। যতই দিন যেতে লাগল মা'র শরীর তই কাহিল হতে থাকল। একসময় দেখা গেল তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না। এক গভীর রাতে বাবাকে ঘুম ভাঙিয়ে অত্যন্ত অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আমার পাশে এই যে ছোট্ট ছেলেটা শুয়ে আছে, এ কে?

বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। মা বললেন, এই ছেলেটা এখানে কেন? এ কার ছেলে?

আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হল নানাজানের কাছে। সিলেটের বিশ্বনাথ থেকে ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে। পিতৃমাতৃ স্নেহ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে আমার দ্বিতীয় জীবন শুরু হল। আমার নানিজান আমাকে লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর একটি মেয়ে হয়েছে। তাঁর এক কোলে সেই মেয়ে, অন্য কোলে আমি। নানিজানের বুকের দুধ খেয়ে একসঙ্গে বড় হচ্ছি।

দুমাস জ্বরে ভোগার পর মা সেরে উঠলেন কিন্তু টাইফয়েড তার প্রবল থাবা বসিয়ে গেল। মা'র মস্তিষ্কবিকৃতি দেখা গেল। কাউকে চেনেন না। যার সঙ্গে দেখা হয় তাঁকেই বলেন, কত টাকা লাগবে তোমার বলো তো! আমার কাছে অনেক টাকা আছে। যত টাকা চাইবে ততই পাবে। ফেরত দিতে হবে না।

বলেই তোশকের নিচ থেকে লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক টাকা বের করতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে এসব কাল্পনিক টাকা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দেন। চিকন স্বরে চেঁচিয়ে বলেন, টাকা নিয়ে যাও। টাকা। আমি টাকা উড়াচ্ছি। যার যত দরকার, নাও। ফেরত দিতে হবে না।

মা বিয়ের পর খুব কষ্টে পড়েছিলেন। টাকাপয়সার কষ্ট। বিশ্বনাথ থানার ওসি হিসেবে বাবার বেতন ছিল আশি টাকা। বেতনের এই আশিটি টাকা বাবা তাঁর খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য অতি দ্রুত খরচ করে ফেলতেন। মাসের দশ তারিখেই বাবার হাতে একটা পয়সা নেই। থানার ওসিদের টাকাপয়সার অভাব হবার কথা না। কিন্তু আজ লিখতে গিয়ে গর্ব এবং অহংকারে বুক ভরে যাচ্ছে যে আমার বাবা ছিলেন সাধু প্রকৃতির মানুষ। বেতনের টাকাই ছিল তাঁর একমাত্র রোজগার। মা'র কাছে শুনেছি, পুলিশের রেশনই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখত। মাসের প্রথমেই রেশন তোলা হত। রেশনে চাল, ডাল এবং তেল পাওয়া যেত। সারা মাসে তাঁদের খাবারের মেনু ছিল ডাল, ডালের বড়া এবং নিমপাতা ভাজা। বাসার সঙ্গে লাগোয়া একটা নিমগাছ ছিল। সেই নিমের কচি পাকা ভাজা করা হত। মাকে শাড়ি কিনে দেবার সামর্থ্য বাবার ছিল না। মা'র শাড়ি পাঠাতেন নানাজান। সতেরো বছরের একটি মেয়ে, যে মোটামুটি সচ্ছলতায় মানুষ হয়েছে, তার জন্য এই অর্থকষ্ট বড়ই ভয়াবহ ছিল। অর্থনৈতিক পীড়ন তাঁর উপর যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল মানসিক বিকৃতির সময় তা-ই ফুটে বের হল। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই মা এক লাখ বা দুলাখ টাকা দিয়ে দেন।

দুবছর এমন করেই কাটল। আমি নানিজানের কাছে। মা বাবার সঙ্গে সিলেটে। পুরোপুরি পাগল একজন মানুষ।

এক শ্রাবণ মাসের রাতের মা'র ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে ঘুম বৃষ্টি। হাওয়ায় বাড়ি যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির পেছনের ঝাঁকড়া জামগাছে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। মা বাবাকে ডেকে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বললেন, বাতি জ্বালাও, ভয় লাগছে।

বাবা চমকে উঠলেন। দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো কথাবার্তা।

হারিকেন জ্বালানো হল। মা তীব্র স্বরে বললেন, আমার ছেলে কোথায়?

www.BDeBooks.Com

বাবা তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মন আশা-নিরাশায় দুলছে। তা হলে কি মাথা ঠিক হয়ে গেল ?

কথা বলছ না কেন ? আমার ছেলে কোথায় ?

আয়েশা, তোমার কি সবকিছু মনে পড়ছে ?

আমার ছেলে কোথায় ?

ও আছে। ও ভালো আছে, তোমার মা'র কাছে আছে। তুমি দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়েছিলে। তাকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তুমি শান্ত হও, কাল ভোরেই তোমাকে নিয়ে আমি মোহনগঞ্জ রওনা হব।

আমি অসুস্থ ছিলাম ?

হ্যাঁ।

মা উঠে গিয়ে একটা আয়না আনলেন। আয়নায় নিজেকে দেখে চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মাথাভরতি চুল ছিল। কোনো চুল নেই। দাঁতের রং কুচকুচে কালো আয়নায় যার ছায়া পড়েছে সে উনিশ বছরের তরুণী নয়, যেন ষাট বছর বয়সের এক বৃদ্ধা।

আয়েশা, তোমার কি সব মনে পড়ছে ?

হ্যাঁ।

বলো তো কত তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল ?

আষাঢ় মাসে। পয়লা আষাঢ়।

আনন্দে বাবার চোখও ভিজে উঠল।

বাইরে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি। ঘরে নিবুনিবু হারিকেনের রহস্যময় আলো। সেই আলোয় মূর্তির মতো বসে আছেন পুত্রবিরহকাতর এক মা, যিনি এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর হারানো স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন।

বাবা মাকে নিয়ে মোহনগঞ্জ উপস্থিত হলেন। আমাকে মা'র কোলে বসিয়ে দেয়া হল। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, এই কি আমার ছেলে ?

নানিজান বললেন, হ্যাঁ।

ছেলে এত বড় কেন ?

ছেলের বয়স দুই বছর, বড় হবে না ?

কথা বলতে পারে ?

পারে, সব কথা বলতে পারে।

মা নানিজানের দিকে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বললেন, আমার ছেলের কোনো অনাদর হয় নি তো ?

নানিজান হেসে ফেললেন।

আমার ছেলে সোনার মতো গায়ের রং ছিল। ও এত কালো হল কেন ?

সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে।

কেন, আপনারা দেখেন না ? কেন আমার ছেলে সারাদিন রোদে রোদে ঘোরে ?

মা যতই রাগ করেন সবাই তত হাসে।

বাড়িভরতি মানুষ। মাতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য দেখতে পাড়া ভেঙে বৌ-ঝি'রা এসেছে। আমার নানাজান আবার একমণ মিষ্টি কিনতে লোক পাঠিয়েছেন।

আসরের মধ্যমণি হয়ে আমার মা একটা জলচৌকিতে আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এই তাঁর তৃপ্তি, এই তাঁর চোখে জল। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা চলছে। পৃথিবীর মধুরতম একটি দৃশ্য সবাই দেখছে মুগ্ধ হয়ে। এর মধ্যে মা সবাইকে সচকিত করে একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা করলেন। তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার এই ছেলের শৈশব বড় কষ্টে কেটেছে, আল্লাহ্, তার বাকি জীবনটা তুমি সুখে সুখে ভরে দিও। বাকি জীবনে সে যেন কোনো দুঃখ না পায়।'

ঈশ্বর মা'র এই প্রার্থনা গ্রহণ করেন নি। এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি বারবার দুঃখ পেয়েছি। বারবার হৃদয় হা-হা করে উঠেছে। চারপাশের মানুষদের নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতায় আহত হয়ে কতবার মনে হয়েছে— এই পৃথিবী বড়ই বিষাদময়! আমি এই পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোনো পৃথিবীতে যেতে চাই, যে-পৃথিবীতে মানুষ নেই। চারপাশে পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষরাজি। আকাশে চিরপূর্ণিমার চাঁদ, যে-চাঁদের ছায়া পড়েছে ময়ূরাক্ষ নামের এক নদীতে। সেই নদীর স্বচ্ছ জলে সারাক্ষণ খেলা করে জোছনার ফুল। দূরের বন থেকে ভেসে আসে অপার্থিব সংগীত।

মা আমাকে নিয়ে সিলেটে চলে এলেন। কিছুদিন তাঁর নিশ্চয়ই খুব সুখে কাটল। কোনো সুখই স্থায়ী হয় না। এই সুখও স্থায়ী হল না, আবার টাইফয়েড হল। টাইফয়েডের বীজ হয়তো লুকিয়েছিল। প্রাণসংহারক মূর্তিতে সে আবার আত্মপ্রকাশ করল। বাবা দিশাহারা হয়ে পড়লেন। মা সারাদিন প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে এলে ব্যাকুল হয়ে তাঁর শিশুপুত্রকে খোঁজেন। সেই শিশুকে তাঁর কাছে যেতে দেয়া হয় না। মা কাকুতি-মিনতি করেন, ওকে একটু দেখতে দাও। একবার শুধু দেখব।

কাজের মেয়ে আমাকে নিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। মা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন। গভীর বিষাদ এবং গভীর আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে।

এর মধ্যেই একদিন ডাক্তার সাহেব বাবাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার স্ত্রী বাঁচবেন না। আপনি মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

বাবা বললেন, কোনো আশাই কি নেই?

না। টাইফয়েড দ্বিতীয়বার হলে আর রক্ষা নেই, তবে...

তবে কি?

টাইফয়েডের নতুন একটা ওষুধ বাজারে এসেছে। শুনেছি ওষুধটা কাজ করে। ইন্ডিয়াতে হয়তোবা পাওয়া যায়। আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

আসামের শিলচরে বাবা লোক পাঠালেন। ওষুধ পাওয়া গেল না। বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সেই প্রস্তুতির প্রমাণ হচ্ছে আমার

www.BDeBooks.Com

নামকরণ। আমার নাম রাখলেন কাজল। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীর অপুর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। অপুর ছেলে নাম ছিল কাজল। আমার ভালো নাম রাখা হল শামসুর রহমান। বাবার নাম ফয়জুর রহমান। বাবার নামের সঙ্গে মিলিয়ে ছেলের নাম। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে শামসুর রহমান নাম নিয়ে চলাফেরা করতে হল। সপ্তম বছরে বাবা হঠাৎ সেই নাম বদলে রাখলেন হুমায়ূন আহমেদ। বছর দুই হুমায়ুন আহমেদ নামে চলার পর আবার আমার নাম বদলে দেবার ব্যবস্থা হল। আমি কঠিন আপত্তি জানালাম। বারবার নাম বদলানো চলবে না। আমাদের সব ভাইবোনই প্রথম ছ'সাত বছর এক নাম, তারপর অন্য নাম। আমার বাবার মৃত্যুর পর তাঁর পেনশন এবং গ্র্যাচুইটির টাকাপয়সা তুলতে গিয়ে বিরাট যন্ত্রণায় পড়লাম। দেখা গেল, তিনি তাঁর টাকাপয়সা তাঁর স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়েকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ের যে নাম লিখে রেখে গেছেন, এখন কারওরই সেই নাম নেই। বাবা তাঁর ছেলেমেয়ের নাম বদলেছেন। কিন্তু কাগজপত্র ঠিকঠাক করতে ভুলে গেছেন।'

আমি এখন আমার বিচিত্র বাবা সম্পর্কে বলব। মৃত্যুপথযাত্রী মা'র প্রসঙ্গটা আপাতত থাক। শুধু এইটুকু বলে রাখি, তিনি দ্বিতীয়বার টাইফয়েডের ধাক্কাও সামলে ওঠেন জনৈক হিন্দু সাধুবাবার ফুঁ দেয়া তার্পিন তেল খেয়ে। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তার্পিন টাইফয়েডের ওষুধ নয়। নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার আছে। আমি যা শুনেছি তা-ই লিখলাম। সাধুবাবার ফুঁ দেয়া তার্পিন খেয়ে মৃত্যুর মুখ থেকে কেউ ফিরে আসবে এই তথ্য হজম করা আমার পক্ষে বেশ কঠিন। যেহেতু মা দাবি করছেন, সেহেতু লিখছি।

এবার বাবার কথা বলি।

একজন অদ্ভুত বাবা

আমার ছোট ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল তার লেখা প্রথম গ্রন্থ 'কপোট্রনিক সুখ দুঃখ'র উৎসর্গপত্রে লিখেছে ঃ

> 'পৃথিবীর সবচে ভালমানুষটিকে বেছে নিতে বললে
> আমি আমার বাবাকে বেছে নেব।'

বইয়ের উৎসর্গপত্রে লেখকরা সবসময় আবেগের বাড়াবাড়ি করেন। আমার ভাইয়ের এই উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত ধরে নিতে খানিকটা অসুবিধা আছে। সে যদি লিখত পৃথিবীর সবচে ভালো মানুষ আমার বাবা এবং মা তা হলে আবেগের ব্যাপারটি চলে আসত। সে তা না করে বাবার কথাই লিখেছে। পৃথিবীর সবচে ভালোমানুষের মধ্যে মা'কে ধরে নি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার উৎসর্গপত্র আবেগপ্রসূত নয়। চিন্তাভাবনা করে লেখা। ইকবালকে আমি যতটুকু চিনি সে চিন্তাভাবনা না করে কখনো কিছু বলে না এবং লেখেও না।

আবার বাবা পৃথিবীর সবচে ভালো মানুষদের একজন কি না তা জানি না, তবে বিচিত্র একজন মানুষ, তা বলতে পারি। তাঁর মতো খেয়ালি, তাঁর মতো আবেগবান মানুষ এখন পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি। আবেগ ছাড়াও তাঁর চরিত্রে আরও সব বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। তিনি ছিলেন জন স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে-আসা এক রহস্যময় চরিত্র।

সবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। রাত প্রায় বারোটা। রঙমহল সিনেমা হল থেকে সেকেন্ড শো ছবি দেখে বাবা এবং মা রিকশা করে ফিরছেন। বড় একটা দিঘির পাশ দিয়ে রিকশা যাচ্ছে। মা হঠাৎ বললেন, আহা দ্যাখো কী সুন্দর দিঘি! টলটল করছে পানি। ইচ্ছে করছে পানিতে গোসল করি।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রিকশা থামাও।

রিকশাওয়ালা থামল।

বাবা বললেন, চলো দিঘিতে গোসল করি।

মা হতভম্ব। এই গভীর রাতে দিঘিতে নেমে গোসল করবেন কী ? নিতান্ত পাগল না হলে কেউ এরকম বলে ?

মা বললেন, কি বলছ তুমি!

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, দ্যাখো আয়েশা, একটাই আমাদের জীবন। এই এক-জীবনে আমাদের বেশির ভাগ সাধই অপূর্ণ থাকবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব সাধ আছে, যা মেটানো যায় তা মেটানোই ভালো। তুমি আসো আমার সঙ্গে।

বাবা হাত ধরে মা'কে নামালেন। স্তম্ভিত রিকশাওয়ালা অবাক হয়ে দেখল হাত-ধরাধরি করে দুজন নেমে গেল দিঘিতে।

এই গল্প যতবার আমার মা করেন ততবার তাঁর চোখে পানি এসে যায়। তাঁর নিজের ধারণা, তাঁর জীবনে যে অল্প কিছু শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল ঐ দিঘিতে অবগাহন তার মধ্যে একটি।

বাবার চরিত্রকে স্পষ্ট করার জন্যে আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ করি। বাবা তখন সিলেট সদরে পুলিশের ইন্টেলিজেন্সিতে আছেন। পদমর্যাদায় সাব-ইন্সপেক্টর। বেতন সর্বসাকুল্যে মাসে নব্বুই টাকা। সেই টাকার একটা অংশ দেশের বাড়িতে চলে যায়, এক অংশ ব্যয় হয় বই কেনা বাবদ। বাকি যা থাকে তা দিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালিয়ে নিয়ে যান মা। যাকে বলে ভয়াবহ জীবনসংগ্রাম। জীবনসংগ্রামের এই অংশটি বাবার কখনো চোখে পড়ে না। কারণ দেশের বাড়িতে পাঠানো টাকা এবং বই কেনার টাকা আলাদা করে বাকি টাকাটা মা'র হাতে তুলে দেন। বাবার দায়িত্ব শেষ। বাকি মাস টেনে নিয়ে যাবার দায়িত্ব হচ্ছে মা'র। তিনি তা কিভাবে নেবেন সেটা তাঁর ব্যাপার। বাবার কোনোই মাথা ব্যথা নেই।

এইরকম অবস্থায় মাসের প্রথম তারিখে বাবাকে খুব হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে দেখা গেল। তিনি বিশ্বজয়-করা হাসি দিয়ে বললেন, আয়েশা, একটা বেহালা কিনে ফেললাম।

www.BDeBooks.Com

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, কি কিনে ফেললে ?

বেহালা।

বেহালা কি জন্যে ?

বেহালা বাজানো শিখব।

কত দাম পড়ল ?

দাম সস্তা, সত্তর টাকা। সেকেন্ড হ্যান্ড বলে এই দামে পাওয়া গেল।

বাবা সংসার চালাবার জন্য মা'র হাতে দশটা টাকা তুলে দিলেন। মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না।

বাবার খুব শখ ছিল ওস্তাদ রেখে তাঁর কাছে বেহালা বাজানো শিখবেন। ওস্তাদকে বেতন দিয়ে বেহালা বাজানো শেখার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কাজেই অতি যত্নে বেহালা তুলে রাখা হল। যেদিন সামর্থ্য হবে তখন ওস্তাদ রেখে বেহালা শেখা হবে।

মাঝে মাঝে দেখতাম কাঠের বাক্স থেকে তিনি বেহালা বের করছেন। অতি যত্নে ধুলো সরাচ্ছেন। ছড়ে রজন মাখাচ্ছেন এবং একসময় লাজুক ভঙ্গিতে বেহালায় ছড় ঘষছেন। কান্নার মতো একরকম আওয়াজ উঠছে বেহালা থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি।

বাবার অসংখ্য অপূর্ণ শখের মতো বেহালা বাজানো শেখার শখও পূর্ণ হয় নি। বাক্সবন্দি থাকতে থাকতে একসময় বেহালার কাঠে ঘুণ ধরে গেল। ছড়ের সুতা গেল ছিঁড়ে। বেহালা চলে এল আমাদের দখলে। আমার ছোট বোন শেফু বেহালার বাক্স দিয়ে পুতুলের ঘর বানাল। বড় চমৎকার হল সেই ঘর। ডালা বন্ধ করে সেই ঘর হাতলে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

আরেক দিনের ঘটনা। শীতকালের এক ভোরে মা'র গলা শুনে ঘুম ভেঙে গেল। কী নিয়ে যেন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করছেন। এরকম তো কখনো হয় না! তাঁরা ঝগড়া-টগড়া অবশ্যই করেন, তবে সবটাই চোখের আড়ালে। আজ হল কী ? আমি কান পেতে আছি যদি কিছু টের পাওয়া যায়। কিছুই টের পাওয়া যাচ্ছে না। মা বারবার শুধু বলছেন, ঘোড়া দিয়ে তুমি করবে কি ? আমাকে বুঝিয়ে বলো, কে পুষবে এই ঘোড়া ?

বাবা বলছেন, এত রাগছ কেন ? একটা কোনো ব্যবস্থা হবেই।

মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, আমরা নিজেরা খেতে পাচ্ছি না, এর মধ্যে ঘোড়া! তোমার কি মাথা খারাপ হল ?

আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কথাবার্তা থেকে মনে হচ্ছে একটা ঘোড়া কেনা হয়েছে।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে বাবা হাসিমুখে বললেন, ঘরের বাইরে গিয়ে দেখে আয় ঘোড়া কিনেছি।

কী অদ্ভুত কাণ্ড! ঘরের বাইরে সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা বিশাল এক ঘোড়া। ঘোড়াটাকে আমার কাছে আকাশের মতো বড় মনে হল। সে ক্রমাগত পা

দাপাচ্ছে এবং ফোঁসফোঁস করে শব্দ করছে। আমাদের কাজের ছেলে আছদ [তার নাম সম্ভবত আসাদ, সে বলত আছদ] ভীতমুখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘটনা হচ্ছে— বাবা মা'কে না জানিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডে এ পর্যন্ত জমা সব টাকা তুলে একটা ঘোড়া কিনে ফেলেছেন। এই সেই ঘোড়া। মহাতেজি প্রাণশক্তিতে ভরপুর একটি প্রাণী, যে-প্রাণীদের সঙ্গে বাবার প্রথম পরিচয় হয় সারদা পুলিশ একাডেমীতে। তাঁর বড়ই পছন্দ হয়। বাবা তাঁর পছন্দের জিনিস যে করেই হোক জোগাড় করেন। এতদিন পর ঘোড়াও জোগাড় হল। তখন অফিসাররা ব্রিটিশ নিয়মের সূত্র ধরে ঘোড়া পুষলে অ্যালাউন্স পেতেন। বাবা আশা করছেন সেই অ্যালাউন্সের টাকাতেই এর পোষার খরচ উঠে আসবে।

ঘোড়া সুপারিগাছের সঙ্গে বাঁধা। বাবা-মা'র মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হচ্ছে। উত্তাপ পুরোটাই মা-ই চালাচ্ছেন, বাবা শুধু কাটান দেয়ার চেষ্টা করছেন।

কী করবে তুমি এই ঘোড়া দিয়ে শুনি ? সিলেট শহরে ঘোড়ায় করে ঘুরবে ?

হুঁ। অসুবিধা কী ? ছেলেমেয়েদেরও ঘোড়ায় চড়া শেখাব।

ছেলেমেয়েরা ঘোড়ায় চড়া শিখে কী করবে ?

কিছু করবে না, একটা বিদ্যা শেখা থাকল।

ঘোড়ার পেছনে কত খরচ হবে সেটা ভেবেছ ?

এত ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না।

বেঁচে থাকা যাক আর না-যাক এই ঘোড়া তুমি এক্ষুণি বিদেয় করো।

পাগল হয়েছ ? এত শখ করে কিনলাম!

বাবা ছিলেন আবেগ নির্ভর মানুষ। যুক্তি দিয়ে তাঁকে টলানো মুশকিল। কিন্তু তাঁকেও টলতে হল। কারণ ঘোড়া দ্বিতীয় দিনেই লাথি মেরে আছদের পা ভেঙে ফেলল। মা হাতে অস্ত্র পেয়ে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার ছেলেমেয়েরা সারাক্ষণ ঘোড়াকে ঘিরে নাচানাচি করে। লাথি খেয়ে ওরা মারা পড়বে। তাই কি তুমি চাও ? বাবা ঘোড়া বিক্রি করে দিলেন। সেই টাকায় কিনলেন একটা দামি কোডাক ক্যামেরা। তবে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঘোড়ার জিন রেখে দিলেন। আমাদের খেলার সামগ্রী-তালিকায় আরেকটি জিনিস যুক্ত হল।

দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জিনিসের প্রতি তাঁর আমৃত্যু শখ ছিল— একটি হচ্ছে পামিস্ট্রি, অন্যটি ফটোগ্রাফি। তাঁর কোডাক ক্যামেরা তিনি আগলে রাখতেন যক্ষের মতো। শুধু যে ছবি তুলতেন তা-ই না, সেই ছবি নিজেই ডেভেলপ এবং প্রিন্ট করতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমাদের শৈশবের আনন্দময় মুহূর্তের একটি হচ্ছে বাবাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। একটা গামলায় পানি। সেই পানিতে কিছু কাগজ ভাসছে। ধবধবে সাদা কাগজে আস্তে আস্তে মানুষের মুখের আদল ফুটতে শুরু করেছে। আমরা আনন্দে লাফাচ্ছি। বাবার মুখে আনন্দের হাসি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের কথা লিখছি। সেই সময় পুলিশের একজন দরিদ্র সাব-ইন্সপেক্টর নিতান্তই শখের কারণে ঘরে ডার্করুম বানিয়ে ছবি প্রিন্ট করছেন— ব্যাপারটা বেশ মজার।

www.BDeBooks.Com

পামিস্ট্রি নিয়েও বাবার উৎসাহ ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। আমার মনে হয় তাঁর মূল ঝোঁকটা ছিল রহস্যময়তার দিকে। তিনি রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ফটোগ্রাফিতে, ঝুঁকে পড়েছেন সেদিকে। রহস্য ছিল জ্যোতিষবিদ্যায়, সেদিকেও ঝুঁকলেন।

কিছুদিন পরপরই ছুটির দিনের সকালে একটা আতশি কাচ নিয়ে বসতেন। গম্ভীর গলায় বলতেন, বাবারা আসো তো দেখি, হাতের রেখায় কোনো পরিবর্তন হল কি না।

একবার ইকবালের হাত দেখে বললেন— চমৎকার রেখা। চন্দ্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রও ভালো। দীর্ঘ আয়ু। তুই খুব কম করে হলেও আশি বছর বাঁচবি। সেই রাতের ঘটনা। ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে সবার ঘুম ভেঙে গেল। ইকবাল হাউমাউ করে কাঁদছে। কী হয়েছে, কী হয়েছে? সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আশি বছর পর আমি মরে যাব এইজন্যে খুব খারাপ লাগছে আর কান্না পাচ্ছে।

বাবা বললেন, গণনায় ভুল হতে পারে। আরেকবার দেখা দরকার। কই, ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দেখি।

গভীর রাতে বাবা তাঁর আতশি কাচ নিয়ে বসলেন। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলাম। ইকবালের এক হাত বাবার কাছে, অন্য হাতে সে চোখ কচলাচ্ছে। বাবা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, আগের গণনায় ভুল হয়েছিল। তোর হাতে আছে ইচ্ছামৃত্যুর চিহ্ন। তোর হবে ইচ্ছামৃত্যু।

ইচ্ছামৃত্যু কী?

যতক্ষণ পর্যন্ত মরার ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুই মরবি না। বেঁচে থাকবি।

কোনোদিন যদি মরার ইচ্ছা না হয়?

তা হলে বেঁচে থাকবি। মরবি না।

ইকবাল হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেল।

জ্যোতিষবিদ্যা কোনো বিদ্যা নয়। জ্যোতিষবিদ্যা হচ্ছে এক ধরনের অপবিদ্যা, অপবিজ্ঞান। মানুষের ভবিষ্যৎ তার হাতের রেখায় থাকে না। থাকার কোনো কারণ নেই। তবু অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বলছি, আমাদের সব ভাইবোন সম্পর্কে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন তা মিলে গিয়েছিল। তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর কপালে অপঘাত মৃত্যু লেখা। সেই মৃত্যু হবে ভয়ংকর মৃত্যু।

এসব তথ্য তিনি হাত দেখে পেয়েছিলেন, না অন্য কোনো সূত্রে পেয়েছিলেন, আমার জানা নেই। মিলগুলি কাকতালীয় বলেই মনে হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয়েও জড়িত ছিলেন। সেটাকে প্রেতচর্চা বলা যেতে পারে। প্লানচেট, চক্র, ভূত নামানো এসব নিয়ে খুব মাতামাতি ছিল। দাদাজান এই নিয়ে বাবার উপর খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি

বাবাকে ডেকে তওবা করালেন যাতে তিনি কোনোদিন প্রেতচর্চা না করেন। বাবা তওবার পর প্রেতচর্চা ছেড়ে দেন, তবে এই বিষয়ে বই পড়া ছাড়েন নি। বাবার সংগ্রহের বড় অংশ প্রেতচর্চাবিষয়ক বইপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, তিনি আস্তিক মানুষ ছিলেন। আমরা কখনো তাঁকে রোজা ভাঙতে দেখি নি। নামায খুব নিয়মিত পড়তেন না, তবে রোজ রাতে এশার নামাযে দাঁড় হতেন। গম্ভীর স্বরে সূরা আবৃত্তি করতেন। পরিবেশ হয়ে উঠত রহস্যময়।

আমার বাবা যে একজন রহস্যময় পুরুষ ছেলেবেলায় তা কখনো বুঝতে পারি নি। তখন ধরেই নিয়েছিলাম সবার বাবাই এরকম। আমার বাবা অন্যদের চেয়ে আলাদা কিছু না। তা ছাড়া বাবার সঙ্গে আমাদের কিছু দূরত্বও ছিল। ছেলেমেয়েদের প্রতি আদরের বাড়াবাড়ি তাঁর চরিত্রে ছিল না। নিজে খুব ব্যস্তও থাকতেন। সারাদিন অফিস করে বিকেলে বই পড়তে যেতেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। দিনের পর দিন কাটত, তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা হত না। এই কারণে মনে মনে চাইতাম তাঁর যেন কোনো-একটা অসুখ হয়। বাবার অসুখ খুবই মজার ব্যাপার। অসুখ হলে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের চারপাশে বসিয়ে উঁচুগলায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। এতে নাকি তাঁর অসুখের আরাম হত।

এ অসুখের সময়ই তিনি একবার ঘোষণা করলেন, সঞ্চয়িতা থেকে যে একটা কবিতা মুখস্থ করে তাঁকে শোনাতে পারবে সে এক আনা পয়সা পাবে। দুটো মুখস্থ করলে দুআনা।

আমি বিপুল উৎসাহে কবিতা মুখস্থ করতে শুরু করলাম। এর মধ্যে কোনো কাব্যপ্রীতি কাজ করে নি। আর্থিক ব্যাপারটাই ছিল একমাত্র প্রেরণা। যথাসময়ে একটা কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। নাম 'এবার ফিরাও মোরে'। দীর্ঘ কবিতা। এই দীর্ঘ কবিতাটা মুখস্থ করার পেছনের কারণ হল, এটা বাবার খুব প্রিয় কবিতা। তাঁদের সময় নাকি বি. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল।

বাবা আমার কবিতা আবৃত্তি শুনলেন।

কোনো ভুল না করে এই দীর্ঘ কবিতাটি বলতে পারায় তিনি আনন্দে অভিভূত হলেন। এক আনার বদলে আমি চার আনা পয়সা পেলাম। সাহিত্যবিষয়ক কর্মকাণ্ড থেকে ওটাই ছিল আমার প্রথম রোজগার।

প্রসঙ্গ থেকে আবার সরে এসেছি। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রসঙ্গে ফিরে যাই। বুঝতে পারছি, এরকম সমস্যা বারবার হবে, মূলধারা থেকে সরে আসব উপধারায়। কে জানে সেই উপধারাই হয়তোবা মূলধারা। তা ছাড়া আত্মজীবনীমূলক রচনায় মূল্যহীন অংশগুলোই বেশি মূল্য পায়।

গানবাজনা বাবার বড়ই প্রিয় ছিল। বি. এ. পাস করার পর কলকাতায় কী একটা পার্ট-টাইম কাজ জুটিয়ে কিছু পয়সা করেন। তা দিয়ে যে বস্তুটি কেনেন তার নাম কলের গান। দম দিয়ে চালানো কলের গান। কোডাক ক্যামেরাটা

www.BDeBooks.Com

ছাড়া অন্য কোনো জাগতিক বস্তুর প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না; কিন্তু এই যন্ত্রটির প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। পার্ট-টাইম চাকরিটি চলে যাবার পর তিনি অথই জলে পড়েন। কলকাতায় যে মেসে থাকতেন ভাড়া বাকি পড়ে। শখের জিনিস এক এক করে বিক্রি করে ফেলার অবস্থায় পৌঁছে যান। বিক্রি করার মতো অবশিষ্ট যা থাকে তা হচ্ছে কলের গান, যা বিক্রি করা আমার বাবার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সেই সময় তাঁর বন্ধুবান্ধবরা বললেন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের দেখা সঙ্গে করলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষিত মুসলমান ছেলে তাঁর কাছে চাকরির আবেদন করলেই কাজ সমাধা। কিছু-না-কিছু তিনি জুটিয়ে দেবেনই। বাবা বি. এ. পাস করেছেন ডিসটিংশন নিয়ে। খুব শখ ছিল ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বেন। অর্থের অভাবে তা হয়ে উঠছে না। সেই সময় মুসলমান ছেলেদের চাকরিবাকরির প্রায় সব দরজাই বন্ধ। বাবা ঠিক করলেন, দেখা করবেন শেরে বাংলার সঙ্গে। এই অভাব আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

অতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী বাবাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল :

বি. এ. পাস করেছ ?

জ্বি।

ফলাফল কি ?

বি. এ.-তে ডিসটিংশন ছিল।

বাহ্, খুব খুশি হলাম শুনে। এম. এ. পড়বে তো ?

জ্বি জনাব, ইচ্ছা আছে।

ইচ্ছে আছে বললে হবে না— পড়তেই হবে। তুমি কি আমার কাছে বিশেষ কোনো কাজে এসেছ ? কোনো সাহায্য বা কোনো সুপারিশ, কিংবা চাকরি ?

বাবার খুবই লজ্জা লাগল। তিনি বললেন, জ্বি না, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অন্য কোনো কারণে না।

শেরে বাংলা বেশ খানিকক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, সবাই আমার কাছে তদবির নিয়ে আসে। অনেকদিন পর একজনকে পাওয়া গেল যে কোনো তদবির নিয়ে আসে নি। আমি খুব আনন্দিত হলাম। তুমি এম. এ. পাস করার পর পেশা হিসাবে শিক্ষকতা বেছে নেবে। আমার ধারণা তুমি ভালো শিক্ষক হবে।

বাবা সেই রাতেই কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের কুতুবপুর চলে আসেন। বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে মীরকাশেম নগরের এক স্কুলে বিপুল উৎসাহে শিক্ষকতা শুরু করেন। মাসের শেষে বেতন নিতে গেলে হেডমাস্টার সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আদায়পত্র কিছুই নেই, বেতন দেব কি ? দেখা যাক পরের মাসে।

পরের মাসেও একই অবস্থা। তার পরের মাসেও তা-ই। হেডমাস্টার সাহেব মাথা দুলিয়ে বললেন, শিক্ষকতা হচ্ছে মহান পেশা। আত্মনিবেদন থাকতে হয়। শুধু টাকা টাকা করলে কি হয়?

অভাব-অনটনে বাবার জীবন পর্যুদস্ত হয়ে গেল। চাকরির দরখাস্ত করেন—চাকরি পান না। এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছেন। স্ত্রীকে নিজের কাছে এনে রাখার সামর্থ্য নেই। ঘোর অমানিশা। এই অবস্থায় কী মনে করে জানি ব্রিটিশ সরকারের বেঙ্গল পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টরির পরীক্ষায় বসলেন। সেই সময়ের অত্যন্ত লোভনীয় এই চাকরিতে নির্বাচিত হবার জন্যে কঠিন সব পরীক্ষায় বসতে হত। তিনি পরীক্ষা দিতে বসলেন। গ্রহের ফেরে এই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গেলেন। ট্রেনিং নিতে গেলেন পুলিশ একাডেমী সারদায়।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুলিশের চাকরিটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর দেখা গেল, এই জীবনে তিনি চার হাজারের মতো বই এবং পোস্টাপিসের পাসবই-এ একশত তিরিশ টাকা ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। বইয়ের সেই বিশাল সংগ্রহও পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্দেশে পিরোজপুরের একদল হৃদয়হীন মানুষ লুট করে নিয়ে যায়। বাবাকে ধরে নিয়ে যায় বলেশ্বর নদীর তীরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। ভরা পূর্ণিমায় ফিনকি-ফোটা জ্যোৎস্নায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ ভাসতে থাকে বলেশ্বর নদীতে। হয়তো নদীর শীতল জল তাঁর রক্ত সে-রাতে ধুয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। পূর্ণিমার চাঁদ তার সবটুকু আলো ঢেলে দিয়েছে তাঁর ভাসন্ত শরীরে। মমতাময়ী প্রকৃতি পরম আদরে গ্রহণ করেছে তাঁকে।

এই প্রসঙ্গ থাক। এই প্রসঙ্গে আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। বরং মা'র কথা বলি।

আমার মা

আমার মা ছিলে তাঁর পরিবারের প্রথম সন্তান। শ্যামলা ধরনের একহারা গড়নের মেয়ে। অতি আদরের মেয়ে। কেমন করে জানি সবার ধারণা হল, এই মেয়ে তেমন বুদ্ধিমতী হয় নি। তাঁকে বুদ্ধিমতী বানানোর জন্যে ছোট বয়সেই পাঠিয়ে দেওয়া হল বারহাট্টায়। বারহাট্টায় আমার মা'র মামার বাড়ি। মা'র নানিজান অসম্ভব বুদ্ধিমতী। তিনি যদি ট্রেনিং দিয়ে এই মেয়েকে কিছুটা মানুষ করতে পারেন।

তাঁর ট্রেনিং-এ তেমন কাজ হল না। মা'র বুদ্ধি বিশেষ বাড়ল না। তবে ক্লাস টুতে তখন সরকারি পর্যায়ে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হত। মা এই পরীক্ষা দিয়ে মাসে দুটাকা হারে বৃত্তি পেয়ে চারদিকে চমক সৃষ্টি করে ফেললেন। একি কাণ্ড! মেয়েমানুষ সরকারি জলপানি কি করে পায়?

মা'র দুর্ভাগ্য বৃত্তির টাকা তিনি পান নি। কারণ তাঁকে উপরের কোনো ক্লাসে ভরতি করানো হল না। মেয়েদের পড়াশোনার দরকার কি! চিঠি লিখতে পারার বিদ্যা থাকলেই যথেষ্ট। না থাকলেও ক্ষতি নেই। মেয়েমানুষের এত চিঠি

www.BDeBooks.Com

লেখালেখিরই-বা কি প্রয়োজন ? তারা ঘর-সংসার করবে। নামায-কালাম পড়বে। এর জন্যে বাংলা-ইংরেজি শেখার দরকার নেই। তারচে বরং হাতের কাজ শিখুক। রান্নাবান্না শিখুক, আচার বানানো শিখুক, পিঠা বানানো শিখুক। বিয়ের সময় কাজে লাগবে।

আমার মা পড়াশোনা বাদ দিয়ে এসব কাজ অতি যত্নের সঙ্গে শিখতে লাগলেন। তাছাড়া নানিজান প্রতি বছর একটি করে পুত্র বা কন্যা জন্ম দিয়ে ঘড় ভরতি করে ফেলেছেন। তাঁর সর্বমোট বারোটি সন্তান হয়। বড় মেয়ে হিসেবে ছোট ছোট ভাইবোনদের মানুষ করার কিছু দায়িত্ব মা'র উপর চলে আসে।

এই করতে করতে একদিন তাঁর বয়স হয়ে গেল পনেরো। কী সর্বনাশের কথা! পনেরো হয়ে গেছে এখনও বিয়ে হয় নি! বারহাট্টা থেকে কঠিন সব চিঠি আসতে লাগল যেন অবিলম্বে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হয়। চারদিকে সুপাত্র খোঁজা চলতে লাগল। একজন সুপাত্রের সন্ধান আনলেন মা'র দূর সম্পর্কের চাচা, শ্যামপুরের দুদু মিয়া। দুদু মিয়াও পাগল ধরনের মানুষ। বি. এ. পাস করেছেন। দেশ নিয়ে মাথা ঘামান। কী করে অশিক্ষিত মূর্খ মুসলমানদের রাতারাতি শিক্ষিত করা যায়, সেই চিন্তাতেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটে। শ্যামপুরের অতি দুর্গম অঞ্চলে তিনি ইতোমধ্যে একটা স্কুল দিয়ে ফেলেছেন। সেই স্কুলে একদল রোগাভোগা ছেলে সারাদিন স্বরে অ, স্বরে আ বলে চ্যাঁচায়। যে মানুষটি এসব কর্মকাণ্ডের মূলে তাঁর বিচারবুদ্ধির উপর খুব আস্থা রাখা যায় না। তবু আমার নানাজান তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হয় ঃ

ছেলে কী করে ?

কিছু করে না। করার মধ্যে যা করে তা হল ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে সারাদিন বই পড়ে।

তুমি তাকে চেন কী করে ?

দীর্ঘদিন তার সঙ্গে কলকাতার এক মেসে ছিলাম। তাকে খুব ভালো করে দেখার সুযোগ হয়েছে।

বাড়ির অবস্থা কী ?

বাড়ির অবস্থা শোচনীয়।

ছেলের নামকরা আত্মীয়স্বজন কে আছেন ?

কেউ নেই। সবাই হতদরিদ্র। তবে ছেলের বাবা উলা পাস। বড় মৌলানা— অতি সজ্জন ব্যক্তি।

অতি সজ্জন ব্যক্তি দিয়ে কাজ হবে না। ছেলের মধ্যে তো তেমন কিছু দেখছি না। রাতদিন যে ছেলে বই পড়ে সে আবার কেমন ছেলে ? বই পড়লে তো সংসার চলে না।

দুদু মিয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, এত ভালো ছেলে আমি আমার জীবনে দেখি নি এইটুকু বলতে পারি।

দেখতে কেমন ?

রাজপুত্র!

কী বললে ?

রাজপুত্র!

ছেলে দেখতে রাজপুত্রের মতো শুধু এই কারণেই নানাজান ছেলের বাবার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন। কথা বলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

আমার দাদা মৌলানা আজিমুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয় নি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরবি-ফারসিতে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। অতি বিনয়ী মানুষ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি হাত তুলে যেন প্রার্থনা করেন তার থেকে মানুষটির চরিত্র স্পষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। তিনি বলেন—

"হে পরম করুণাময়, আমার পুত্রকন্যা এবং তাদের পুত্রকন্যাদের তুমি কখনো অর্থবিত্ত দিও না। তাদের জীবনে যেন অর্থকষ্ট লেগেই থাকে। কারণ টাকা পয়সা মানুষকে ছোট করে। আমি আমার সন্তানসন্ততিদের মধ্যে 'ছোট মানুষ' চাই না। বড় মানুষ চাই।"

আমার দাদার চরিত্র আরও স্পষ্ট করার জন্যে আমি আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। কেমন করে যেন পরীক্ষায় খুব ভালো করে ফেলি। পাঁচটি লেটার নিয়ে বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে যাই। টেলিগ্রামে দাদাকে এই খবর পাঠানো হয়। যে পিওন দাদাকে টেলিগ্রামটি দেন দাদা তাঁকে বসতে বলেন।

পিওন বসে আছেন। দাদা ভেতরবাড়ি চলে গেছেন। বেশ খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, শোকরানা নামায পড়ার জন্যে খানিক বিলম্ব হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভাই, আমি অতি দরিদ্র একজন মানুষ, এই মুহূর্তে আমার কাছে যা টাকা পয়সা ছিল সবই নিয়ে এসেছি। এই টাকা গ্রহণ করলে আমি মনে শান্তি পাব। কারণ আজ যে খবর আপনি আমাকে দিলেন এত ভালো এই জীবনে আমি পানি নি।

এই বলে দাদা নগদ টাকা এবং ভাংতি পয়সায় প্রায় চল্লিশ টাকা একটা রুমালের বেঁধে বিস্মিত পিওনের হাতে দিলেন। শুধু তা-ই না, বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি খুব খুশি হব আপনি যদি দুপুরে চারটা ডালভাত আমার সঙ্গে খান।

তার কিছুদিন পরেই আমি দাদার একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লিখলেন— "তোমাকে ছোটবেলায় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তুমি জবাব দিতে পার নাই। আমার মন খারাপ হইয়াছিল। আমার ধারণা ছিল তোমার বুদ্ধি তেমন নাই। আজ তুমি তা ভুল প্রমাণিত করিয়াছ। আমি জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। এই সময়ে তোমার কারণে মনে প্রবল সুখ পাইলাম। মৃত্যুপথযাত্রী একজন বৃদ্ধকে তুমি সুখী করিয়াছ— আল্লাহ তোমাকে তার প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ সবাইকে সবার প্রাপ্য দেন।"

www.BDeBooks.Com

যে প্রশ্নটির জবাব শৈশবে দিতে পারি নি সেটা বলি। তখন ক্লাস টুতে পড়ি। সিলেটের বাসায় দাদা বেড়াতে এসেছেন। অসহ্য গরম। হাতপাখায় হাওয়া খাচ্ছেন। হঠাৎ আমাকে বললেন, 'এই শোন, পাখার ভেতর তো বাতাস ভরা নেই। তবু পাখা নাড়লেই আমরা বাতাস পাই কিভাবে ? বাতাসটা আসে কোত্থেকে ?"

আমি সেই কঠিন প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, "আমার ধারণা ছিল— তুই পারবি। তুই তো আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।"

প্রসঙ্গ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি— আবার প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

ছেলের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে শুধুমাত্র ছেলের বাবার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পরই নানাজান একজন বেকার ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন।

মেয়েকে 'বিবাহিত জীবন কী' তা বোঝানোর জন্য বর্ষীয়ান মহিলারা দূর দূর থেকে নাইওর চলে এলেন। নকশি পিঠা তৈরি হয়ে টিনবন্দি হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় হাতে গড়া সেমাই তৈরি করতে করতে পাড়ার বৌরা মিহি গলায় বিয়ের গীত গাইতে লাগল।

নানাজান কী মনে করে চলে গেলেন মৈমনসিংহ। ছেলে নাটক-নভেল পড়ে, মেয়েকেও তার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। দুএকটা নাটক-নভেল পড়া থাকলে মেয়ের সুবিধা হবে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে বললেন, ভালো একটা নভেল দিন তো। আমার মেয়ের জন্যে— বুঝেশুনে দেবেন।

লাইব্রেরিয়ান গম্ভীর মুখে বললেন, মেয়েছেলেকে নাটক-নভেল বই দেওয়া ঠিক না, একটা ধর্মের বই নিয়ে যান— তাপসী রাবেয়া।

জ্বি না, একটা নভেলই দেন।

দোকানদার একটা বই কাগজে মুড়ে দিয়ে দিল। নানাজান মা'র হাতে সেই বই তুলে দিলেন। মা'র জীবনে এটাই প্রথম উপন্যাস। উপন্যাসের নাম— লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম উপন্যাস পড়েই মা মোহিত। একবার, দুবার, তিনবার পড়া হল, তবু যেন ভালোলাগা শেষ হয় না।

বাসররাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো বইটই পড়েছ ? এই ধরো, গল্প-উপন্যাস।

মা লাজুক ভঙ্গিতে হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন।

দুই-একটা বইয়ের নাম বলতে পারবে ?

মা ক্ষীণ স্বরে বললেন, নৌকাডুবি।

গভীর বিস্ময়ে বাবা দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারলেন না। এই অজ পাড়াগাঁয়ের একটি মেয়ে কিনা রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' পড়ে ফেলেছে!

সেই রাতে বাবা-মা'র মধ্যে আর কী কথা হয়েছে আমি জানি না। জানার কথাও নয়। তাঁরা আমাকে বলেন নি। কিন্তু আমি কল্পনা করে নিতে পারি, কারণ আমি এবং আমার অন্য পাঁচ ভাইবোন তো তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। লুকিয়েছিলাম তাঁদের ভালোবাসায়।

গ্রামের যে-বোকা ধরনের মেয়ে বিয়ের পর শহরে চলে এল, আমার ধারণা সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী মেয়েদেরই একজন। আমি এখনও তাঁর বুদ্ধির ঝলকে চমকে চমকে উঠি। মা শুধু যে বুদ্ধিমতী তা-ই না, অসম্ভব সাহসী এবং স্বাধীন ধরনের মহিলা।

১৬ই ডিসেম্বরের পর মা আমাদের ভাইবোন সবাইকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। হাতে একটি পয়সাও নেই। এই অবস্থায় পুরানা পল্টনে বাড়ি ভাড়া করলেন। আমাদের সবাইকে একত্র করে বললেন, তোরা তোদের পড়াশোনা চালিয়ে যা। সংসার নিয়ে কাউকে ভাবতে হবে না। আমি দেখব।

পুরানা পল্টনের ঐ বাড়িতে আমাদের কোনো আসবাবপত্র ছিল না। আমরা মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে ঘুমুতাম। কেউ বেড়াতে এলে তাকে মেঝেতেই বসতে হত।

মা নানান সমিতিতে ঘুরে ঘুরে সেলাইয়ের কাজ জোগাড় করলেন। দিনরাত মেশিন চালান। জামাকাপড় তৈরি করেন। সেলাইয়ের রোজগারের সঙ্গে বাবার পেনশনের নগণ্য টাকা যুক্ত হয়ে সংসার চলত। তিনি শুধু যে ঢাকার সংসার চালাতেন তা-ই না, মোহনগঞ্জে তাঁর বাবার বাড়ির সংসারও এখান থেকেই দেখাশোনা করতেন। অনেক কাল আগে গ্রামের এই বোকা বোকা ধরনের লাজুক কিশোরী মেয়েটি কখনো কল্পনাও করতে পারে নি কি কঠিন সংগ্রামময় জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে। যুদ্ধক্লান্ত এই বৃদ্ধা এখন কি ভাবেন আমি জানি না। তাঁর পুত্রকন্যারা নানানভাবে তাঁকে খুশি করতে চেষ্টা করে। তিনি তাদের সে সুযোগ দিতে চান না। আমার ছোট ভাই ডঃ জাফর ইকবাল আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়ে লিখল— মা, আপনি আসুন, আপনাকে আমেরিকা এবং ইউরোপ ঘুরিয়ে দেখাব। আপনার ভালো লাগবে।

মা বললেন, যে জিনিস তোমার বাবা দেখে যেতে পারেন নি, আমি তা দেখব না।

আমি বললাম, আম্মা, আপনি কি হজে যেতে চান? যেতে চাইলে বলুন, ব্যবস্থা করি।

না।

ছোটবেলায় দেখেছি আপনি জরি দিয়ে তাজমহলের ছবি এঁকেছিলেন। তাজমহল দেখতে ইচ্ছা করে?

না। আমি একা একা কিছু দেখব না।

www.BDeBooks.Com

বাবা যেসব জিনিস খেতে পছন্দ করতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোনোদিন সেই খাবার বাসায় রান্না করেন নি। সেসব খাবারের একটি হচ্ছে বুটের ডাল দিয়ে গোরুর গোশত। আর একটি— বরবটির চচ্চড়ি। আহামরি কোনো খাবার নয়।

আমি একবার বললাম, আমাদের জন্যে আপনার কি কোনো উপদেশ আছে?

তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, উপদেশ নয়, একটি আদেশ আছে। আদেশটি হচ্ছে— কেউ যদি কখনো তোমাদের কাছে টাকা ধার চায় তোমরা 'না' বলবে না। আমাকে অসংখ্যবার মানুষের কাছে ধারের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। ধার চাওয়ার লজ্জা এবং অপমান আমি জানি।

(অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলি) মা'র অসাধারণ ইএসপি বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ছিল। প্রায় সময়ই ভবিষ্যতে কি ঘটনা ঘটবে তা হুবহু বলে দিতে পারতেন। মা'র এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা সম্পর্কে বাবা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। মা'কে তিনি ঠাট্টা করে ডাকতেন 'মহিলা পীর'। মা'র এই ক্ষমতা বাবার মৃত্যুর পরপরই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়।*

জোছনার ফুল

আমাদের বাসা ছিল সিলেটের মীরাবাজারে।

সাদা রঙের একতলা দালান। চারদিকে সুপারিগাছের সারি। ভেতরের উঠোনে একটি কুয়া। কুয়ার চারপাশে বাঁধানো। বাড়ির ডানদিকে প্রাচীন কয়েকটা কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের পাতায় আলো-আঁধারের খেলা। কুয়ার ভেতর উঁকি মারছে নীল আকাশ। একটু দূরে দুটো আতাফল গাছ। সোনালি রঙের আতাফলে পুরো গাছ সোনালি হয়ে আছে। পাকা আতার লোভে ভিড় করেছে রাজ্যের পাখি। তাদের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেছে কাকদের। কান পাতা দায়। এমন একটা রহস্যময় পরিবেশে আমার শৈশবের শুরু। শুরুটা খুব খারাপ না। তবু শৈশবের কথা মনে হলেই প্রথমে কিছু দুঃখময় স্মৃতি ভিড় করে। কিছুতেই তাদের তাড়াতে পারি না। সেগুলো দিয়েই শুরু করি।

একদিন কী যেন একটা অপরাধ করেছি। কাপ ভেঙে ফেলেছি কিংবা পাশের বাড়ির জানালায় ঢিল মেরেছি। অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে। মা শাস্তির ভার দিলেন আমার মেজো চাচাকে। তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। সিলেটে এম. সি. কলেজে আই. এ. পড়তেন এবং প্রতি বছর ফেল করতেন। মেজো চাচা আমাকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমাকে একহাতে শূন্যে ঝুলিয়ে কুয়ার মুখে ধরে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

আমার সমস্ত শরীর ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। সত্যি যদি ছেড়ে দেন! নিচে গহীন কুয়া। একটা হাত ধরে আমাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে রাখা

---

* 'আমার ছেলেবেলা' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর কী মনে করে জানি মা আমেরিকা যেতে রাজি হলেন। ছ'মাস সেখানে কাটিয়ে এসেছেন। কিছুদিন আগে আমাকে বললেন হজ করতে চান।

হয়েছে। মেজো চাচা মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গি করছেন যেন আমাকে সত্যি সত্যি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আর কোনোদিন করব না। আর কোনোদিন না।

আমার বয়স তখন কত ? পাঁচ কিংবা ছয়। নিতান্তই শিশু। এরকম একটা শিশুকে কুয়ায় ঝুলিয়ে যে-ভয়ংকর মানসিক শাস্তি মেজো চাচা দিলেন তা ভাবলে আমি আজও আতঙ্কে নীল হয়ে যাই। লিখতে লিখতে চোখের সামনে সেই অতলস্পর্শী কুয়া ভেসে উঠছে। বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়েছে।

আমার মেজো চাচা কিংবা আমার মা দুজনের কেউই বুঝলেন না একটি শিশুকে এভাবে মানসিক শাস্তি দেয়া যায় না। এটা অমানবিক। এ ধরনের শাস্তিতে শিশুর মনোজগতে বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বরং তাঁরা দুজনই দেখলেন— আমি একটিমাত্র জিনিসকেই ভয় পাই, সেটা কুয়ায় ঝুলিয়ে ধরা। কাজেই বারবার আমাকে এই শাস্তি দেয়া হতে লাগল।

অসম্ভব দুষ্টু ছিলাম। নানানভাবে সবাইকে জ্বালাতন করতাম। শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু এত কঠিন শাস্তি না, যে শাস্তি চিরকালের মতো আমার মনে ছাপ ফেলে যাবে।

আমাকে এই অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে আমার ছোট বোন শেফু। তাকেও একদিন এই শাস্তি দেয়া হল। মেজো চাচা তাকে কুয়ার ভেতর ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, দিলাম ছেড়ে।

সে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, দেন ছেড়ে।

চাচা বললেন, সত্যি সত্যি ছেড়ে দেব ?

সে থমথমে গলায় বলল, ছাড়েন। আপনাকে ছাড়তে হবে।

শেফুর কথাবার্তায় আমার চাচা এবং মা দুজনই খুব মজা পেলেন। বাবা অফিস থেকে ফেরামাত্র তাঁকে এই ঘটনা বলা হল। বাবা অবাক হয়ে বললেন, এদের এইভাবে শাস্তি দেয়া হয় ? কই, আমি তো জানি না! কী ভয়ংকর কথা! এই জাতীয় শাস্তির কথা আর যেন কোনোদিন না শুনি।

মা বললেন, এরা বড় যন্ত্রণা করে। তুমি তো বাসায় থাক না। তুমি জান না।

বাবা কঠিন গলায় বললেন, এ ধরনের শাস্তির কথা আর যেন না শুনি।

শাস্তি বন্ধ হল, কিন্তু মন থেকে স্মৃতি মুছল না। এতদিন পার হয়েছে, অথচ এখনও দুঃস্বপ্নের মতো গহিন কুয়াটার কথা মনে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, আমার এই চাচা শুধু শাস্তিদাতাই ছিলেন না, প্রচুর আদরও তাঁর কাছে পেয়েছি। আমার অক্ষরজ্ঞানও হয়েছে তাঁর কাছে।

কুয়ার হাত থেকে বাঁচলেও মাকড়সার হাত থেকে বাঁচলাম না। মাকড়সার ব্যাপারটি বলি। কোনো এক বিচিত্র এবং জটিল কারণে আমাদের ছয় ভাইবোনেরই ভয়ংকর মাকড়সাভীতি আছে। নিরীহ ধরনের এই পোকাটিকে দেখামাত্রই আমাদের সবার মনোজগতের একধরনের বিপ্লব ঘটে যায়। আমরা

www.BDeBooks.Com

আতঙ্কে ঘৃণায় শিউরে উঠি, বমিভাব হয়, চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। মনোবিজ্ঞানীরা এই ভীতির নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা দেবেন। আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।

মাকড়সাভীতির মাত্রা বোঝানোর জন্যে আমি আমাদের তিন ভাইবোনের তিনটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

আমার ছোট বোন শেফু কলেজে অধ্যাপনা করে। একদিন রিকশা করে ক্লাসে যাচ্ছে, হঠাৎ রিকশা থেকে একটা মাকড়সা তার শাড়িতে উঠে পড়ল। সে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শাড়ি খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মাকড়সা! আমার শাড়িতে মাকড়সা! লোকজন হৃদয়হীন নয়। তারা শাড়ি থেকে মাকড়সা সরিয়ে হাতে শাড়ি তুলে দিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার ছোট ভাই ডঃ জাফর ইকবালকে নিয়ে। সে শিকাগো বাস-স্টেশনের টয়লেটে গেছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল ইউরিন্যালে সবুজ রঙের একটা বড়সড় মাকড়সা। সে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে বের হয়ে এল। লোকজন দৌড়ে এল, পুলিশ ছুটে এল, সবার ধারণা কোনো খুনটুন হয়ে গেছে।

এবার আমার নিজের কথা বলি। ঢাকা থেকে বরিশাল যাচ্ছি। বি. এম. কলেজে রসায়নশাস্ত্রের এম. এস. সি. পরীক্ষার এক্সটারন্যাল হয়ে। প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিন রিজার্ভ করা। রাত দশটার মতো বাজে। হঠাৎ দেখি কেবিনের ছাদে বিশাল এক মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আমি ছিটকে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দশ টাকা কবুল করে একজন ঝাড়ুদার নিয়ে এলাম। সে অনেক খুঁজেও মাকড়সা পেল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে। কেবিনে আর ঢুকলাম না। যদি মাকড়সা আবার কোনো অন্ধকার কোণ থেকে বের হয়ে আসে! প্রচণ্ড শীতের রাত পার করে দিলাম ডেকে হাঁটাহাঁটি করে। যতবার মাকড়সার কথা মনে পড়ল ততবারই শিউরে উঠতে লাগলাম।

এ ভীতি আমরা ভাইবোনেরা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছি। হয়তোবা আমাদের জিনের ছয়চল্লিশটির ক্রমোজমের কোনো একটিতে কোনো গণ্ডগোল আছে যার কারণে এই অস্বাভাবিক ভীতি।

শৈশবে আমাকে ঘুম পড়ানোর জন্যে এই মাকড়সাভীতিও কাজে লাগানো হত।

অধিকাংশ শিশুর মতো আমারও রাতে ঘুম আসত না। মা বিরক্ত হয়ে মেজো চাচাকে বলতেন, ওকে ঘুম পাড়িয়ে আন।

মেজো চাচা আমাকে কোলে নিয়ে চলে যেতেন বাড়ির দক্ষিণে কাঁঠালগাছের কাছে। সেই কাঁঠালগাছে বিকটাকার মাকড়সা জাল পেতে চুপচাপ বসে থাকত। আমাকে সেসব মাকড়সার কাছে নিয়ে গিয়ে বলা হত— ঘুমাও। না ঘুমালে মাকড়সা গায়ে দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন

আমার ধারণা, ঘুম না, ভয়ে হয়তোবা অচেতনের মতো হয়ে যেতাম। কেউ তা বুঝতে পারত না। ভাবত ঘুম পাড়ানোর চমৎকার ওষুধ তাঁদের কাছে আছে।

এখন ভাবলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। না বুঝে বয়স্ক মানুষরা নিতান্তই অবোধ একটি শিশুর উপর কি ভয়াবহ নির্যাতনই না চালিয়েছেন!

আমি ছেলেবেলার কথা লিখব বলে স্থির করার পর আমার সব আত্মীয়-স্বজনকে চিঠি লিখে জানালাম— আমার ছেলেবেলা সম্পর্কে কেউ যদি কোনো কিছু জানেন আমাকে যেন লিখে জানান। আমার এই আহ্বানের জবাবে ছোট চাচা ময়মনসিংহ থেকে যে চিঠি লিখলেন তার অংশবিশেষ এইরকম— "হুমায়ূন শৈশবে বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। রাত্রিতে কিছুতেই ঘুমাইত না। তখন তাহাকে মাকড়সার কাছে নিয়া গেলে দুই হাতে গলা জড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঘুমে অচেতন হইয়া যাইত। ইহার কি যে কারণ কে জানে।"

কুয়া এবং মাকড়সা এ দুটি জিনিস বাদ দিলে আমার শৈশবকে অসাধারণ আনন্দময় সময় বলা যায়। আমার ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। আজকালকার মায়েরা সন্তান চোখের আড়াল হলেই চোখ কপালে তুলে হৈচৈ শুরু করে দেন। আমাদের সময় অবস্থা ভিন্ন ছিল। শিশুদের খোঁজ পড়ত শুধু খাওয়ানোর সময়। তাদের পড়াশোনা নিয়েও বাবা-মা'দের খুব দুশ্চিন্তা ছিল না। একটি শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাতের চটি একটা বই এবং স্লেট-পেনসিল কিনে দিলেই বাবা-মা'রা মনে করতেন অনেক করা হল। বাকি পড়াশোনা ধীরেসুস্থে হবে, এমন তাড়া কিসের? ক্লাস ওয়ান-টু'র পরীক্ষাগুলোতে ফার্স্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পাস করে পরে ধাপে উঠতে পারলেই হল। না পারলেও ক্ষতি নেই, পরের বার উঠবে। স্কুল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। পুরো ব্যাপারটায় এক ধরনের ঢিলেঢালা ভাব।

এমনিতেই নাচুনি বুড়ি তার উপর ঢাকের বাড়ি। বাবা আদেশ জারি করলেন তাঁর ছেলেমেয়েদের যেন পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো চাপ না দেয়া হয়। পড়শোনার জন্যে সারাজীবন তো পড়েই রইল, শিশুকালটা আনন্দে কাটুক। মহানন্দে সময় কাটতে লাগল। শিশুদের আনন্দের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো। অতি তুচ্ছ বিষয় থেকেও তারা আনন্দ আহরণ করে। আমি তা-ই করছি। আমার মা'র কোলে তখন আমার ভাই ইকবাল। মা তাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। আমার দিকে তাকানোর সময় নেই। আমি মনের আনন্দে একা একা ঘুরি। যা দেখি তা-ই ভালো লাগে। ক্লান্তিহীন হাঁটা। মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলি। তখন একে-তাকে জিজ্ঞেস করতে হয়, মীরাবাজার কোনদিকে?

আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও বাসায় কাউকে কখনো চিন্তিত হতে দেখি নি। দুপুরে খাবার সময় উপস্থিত থাকলেই হল। দুপুরের খাবার শেষ হবার পর আরও আনন্দ। মা দিবানিদ্রায়। ঝিম-ধরা দুপুর। আমি ঘুরছি নিজের মনের আনন্দে। এই পর্যায়ে একজন আইসক্রিমওয়ালার সঙ্গে আমার খাতির হয়ে

www.BDeBooks.Com

গেল। তখনকার আইসক্রিমওয়ালারা দুহাতে দুটা আইসক্রিমের বাক্স নিয়ে মধুর গলায় ডাকত— দুধমালাই আইসক্রিম, দুধমালাই।

দুরকম আইসক্রিম ছিল। দুপয়সা দামের সাধারণ আর এক আনা দামের অসাধারণ। আইসক্রিম খাবার পরম সৌভাগ্য মাসে দুএকবারের বেশি হত না। হবার কথাও নয়। যা-ই হোক, এমনি এক ঝিম-ধরা দুপুরে 'চাই দুধমালাই আইসক্রিম' শুনে ছুটে ঘর থেকে বের হলাম। আইসক্রিমওয়ালা বলল, আইসক্রিম কিনবে ?

আমি মনের দুঃখ মনে চেপে বললাম, না। পয়সা নাই। আইসক্রিমওয়ালা কিছুক্ষণ কি জানি ভেবে বলল, খাও একটা আইসক্রিম, পয়সা লাগবে না।

আমার তখন বিস্মিত হবার ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে গেছে। কী বলে এই লোক ? না চাইতেই দিয়ে দিচ্ছে কোহিনূর হীরা! লোকটি একটা আইসক্রিম বের করে হাতে দিয়ে বলল, আরাম করে খাও। আমি বসে বসে দেখি।

সে উবু হয়ে বসল। আমি অতি দ্রুত আইসক্রিম শেষ করলাম। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারে। দেখল না। রোজ এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। ঠিক দুপুরবেলা সমস্ত মীরাবাজারের মায়েরা যখন ঘুমে অচেতন তখন সে আসে। চাপা গলায় ডাকে, এই খোকা, এই!

আমি ছুটে বের হয়ে আসি। সে আইসক্রিম বের করে দেয়। আমি মহানন্দে খাই। খেতে খেতে মনে হয় আমার মানবজন্ম সার্থক হল। পুরো এক মাস ধরে এই ব্যাপার চলল। তারপর মা কী করে জানি টের পেলেন। তিনি আঁতকে উঠলেন, তাঁর ধারণা এ ছেলেধরা। বাসার সবারই ভয়— আমাকে নিয়ে যাবে। বাবাকে খবর দিলেন। তিনিও চিন্তিত হলেন এবং অফিস বাদ দিয়ে এক দুপুরে বাসায় বসে রইলেন— আইসক্রিমওয়ালাকে ধরতে হবে। বেচারা ধরা পড়ল।

বাবা তাঁর পুলিশি গলায় কঠিন ধমক দিলেন। মেঘস্বরে বললেন, তুমি একে রোজ আইসক্রিম খাওয়াও, কারণটা কী ?

এমনি খাওয়াই স্যার, কোনো কারণ নাই।

বিনা কারণে কিছুই হয় না— তুমি কারণ বলো।

আইসক্রিমওয়ালা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিল না। বাবা পুরো মাসে ত্রিশটি আইসক্রিম হিসাব করে তাকে দাম দিয়ে দিলেন এবং বললেন, আর কখনো যেন সে না আসে। সে টাকা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু পরদিনই আবার এল। একটা দুধমালাই আইসক্রিম বের করে নিচুগলায় বলল, খোকা তুমি খাও। আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আমি আইসক্রিম বেচা ছেড়ে দেব।

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, কেন ?

সে তার জবাব না দিয়ে কোমল গলায় বলল, খোকা, আমার কথা মনে থাকবে ?

আমি বললাম, হুঁ থাকবে।

মানুষকে দেয়া বেশির ভাগ কথাই আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু হতদরিদ্র আইসক্রিমওয়ালার কথা আমি মনে রেখেছি। এখনও মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি কীজন্যে সে বিনাপয়সায় আমাকে আইসক্রিম খাওয়াত ? আমার বয়েসি কোনো ছেলে কি তার ছিল যে অল্প বয়সে মারা গেছে ? দরিদ্র পিতা তার স্নেহ ঢেলে দিয়েছে অচেনা একটি শিশুকে ? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে ?

রহস্যময় এই পৃথিবীতে কিছু কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। প্রায় তিরিশ বছর পর আইসক্রিম খাওয়ার ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হল। তখন শ্যামলীতে থাকি। আইসক্রিমওয়ালা এসেছে। আমার বড় মেয়ে নোভা আমার কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে ছুটে গেল আইসক্রিম কিনতে। আইসক্রিম হাতে হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, আইসক্রিমওয়ালা আমার কাছ থেকে টাকা নেয় নি। বিনা টাকায় আইসক্রিম দিল। বলল, টাকা দিতে হবে না।

আমার স্ত্রী চমকে উঠে বলল, নির্ঘাত ছেলেধরা! তুমি এক্ষুণি নিচে যাও।

আমি নিচে গেলাম না। ছেলেবেলার সেই আইসক্রিমওয়ালার কথা ভেবে বড়ই মন কেমন করতে লাগল।

শীতের শুরুতে আমার আনন্দময় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যেতে লাগল। শুনলাম আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পুরোপুরি বাঁদর হয়ে গেছি। প্যান্ট পরা বলে লেজটা দেখা যায় না। প্যান্ট খুলে ফেললে লেজও দেখা যাবে। আমার বাঁদরজীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্যই আমাকে নাকি স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হবে। আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া উপলক্ষে একটা নতুন খাকি প্যান্ট কিনে দেয়া হল। সেই প্যান্টের কোনো জীপার নেই। সারাক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে। অবশ্যি তা নিয়ে আমি খুব একটা উদ্বিগ্ন হলাম না। নতুন প্যান্ট পরছি— এই আনন্দেই আমি আত্মহারা।

মেজো চাচা আমাকে কিশোরীমোহন পাঠশালায় ভরতি করিয়ে দিয়ে এলেন এবং হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন চোখে চোখে রাখতে হবে। বড়ই দুষ্ট।

আমি অতি সুবোধ বালকের মতো ক্লাসে গিয়ে বসলাম। মেঝেতে পাটি পাতা। সেই পাটির উপর বসে পড়াশোনা। ছেলেমেয়ে সবাই পড়ে। মেয়েরা বসে প্রথম দিকে, তাদের পেছনে ছেলেরা। আমি খানিকক্ষণ বিচার-বিবেচনা করে সবচে রূপবতী বালিকার পাশে ঠেলেঠুলে জায়গা করে বসে পড়লাম। রূপবতী বালিকার অত্যন্ত হৃদয়হীন ভঙ্গিতে তুই তুই করে সিলেটি ভাষায় বলল, এই, তোর প্যান্টের ভেতরের সবকিছু দেখা যায়।

ক্লাসের সবকয়টা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। মেয়েদের আক্রমণ করা অনুচিত বিবেচনা করে সবচে উচ্চস্বরে যে ছেলেটি হেসেছে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হাতের কনুইয়ের প্রবল আঘাতে রক্তারক্তি ঘটে গেল। দেখা

www.BDeBooks.Com

গেল ছেলেটির সামনের একটি দাঁত ভেঙে গেছে। হেডমাস্টার সাহেব আমাকে কান ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিলেন— এ মহাগুণ্ডা, তোমরা সাবধানে থাকবে। খুব সাবধান। পুলিশের ছেলে গুণ্ডা হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্লাস ওয়ান বারোটার মধ্যে ছুটি হয়ে যায়। এই দুই ঘণ্টা আমি কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার সময়টা যে খুব খারাপ কাটল তা নয়। স্কুলের পাশেই আনসার ট্রেনিং ক্যাম্প। তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। লেফট রাইট, লেফট রাইট। দেখতে বড়ই ভালো লাগছে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, বড় হয়ে আনসার হব।

ক্লাসে দ্বিতীয় দিনেও শাস্তি পেতে হল। মাস্টারসাহেব অকারণেই আমাকে শাস্তি দিলেন। সম্ভবত প্রথম দিনের কারণে আমার উপর রেগেছিলেন। তিনি মেঘস্বরে বললেন, গাধাটা মেয়েদের সঙ্গে বসে আছে কেন ? এই, তুই কান ধরে দাঁড়া।

দ্বিতীয় দিনেও সারাক্ষণ কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, তৃতীয় দিনেও একই শাস্তি। তবে এই শাস্তি আমার প্রাপ্য ছিল। আমি একটা ছেলের স্লেট ভেঙে ফেললাম। ভাঙা স্লেটের টুকরায় তার হাত কেটে গেল। আবার রক্তপাত, আবার কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি।

আমি ভাগ্যকে স্বীকার করে নিলাম। ধরেই নিলাম যে স্কুলের দুঘণ্টা আমাকে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মাস্টার সাহেবেরও ধারণা হল যে, আমাকে কানে ধরে সারাক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে আমি অন্যদের বিরক্ত করার সুযোগ পাব না।

আজকের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সত্যি আমাকে পাঠশালার প্রথম শ্রেণীটি কান ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাটাতে হয়েছে। তবে আমি একা ছিলাম না, বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গী ছিল শংকর। সে খানিকটা নির্বোধ প্রকৃতির ছিল। ক্লাসে দুইজন শংকর ছিল। আমি যার কথা বলছি তার নাম মাথামোটা শংকর। মোটা বুদ্ধি অর্থে মাথামোটা নয়, আসলেই শরীরের তুলনায় তার মাথা অস্বাভাবিক বড় ছিল। ক্লাস ওয়ানে সে যতখানি লম্বা ছিল, ক্লাস ফাইভে ওঠার পরও সে ততখানি লম্বাই, শুধু মাথাটা বড় হতে শুরু করল।

ক্লাসে শংকর ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু জুটল না। সে আমার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রইল। আমি যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে আছে। মারামারিতে সে আমার মতো দক্ষ নয়, তবে মারামারির সময় দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আঁ-আঁ গরিলার মতো শব্দ করে প্রতিপক্ষের দিকে ছুটে যেত। এতেই অনেকের পিলে চমকে যেত।

শংকরকে নিয়ে শিশুমহলে আমি বেশ ত্রাসের সঞ্চার করে ফেলি।

এই সময় স্কুলে কিছুদিনের জন্যে কয়েকজন ট্রেনিং-স্যার এলেন। ট্রেনিং-স্যার ব্যাপারটা কি আমরা কিছুই জানি না। হেডস্যার শুধু বলে গেছেন, নতুন

স্যাররা আমাদের কিছুদিন পড়াবেন। দেখা গেল নতুন স্যাররা বড়ই ভালো। পড়া না পারলেও শাস্তি দেবার বদলে মিষ্টি করে হাসেন। হৈ চৈ করলেও ধমকের বদলে করুণ গলায় চুপ করতে বলেন। আমরা মজা পেয়ে আরও হৈ চৈ করি। একজন ট্রেনিং-স্যার কেন জানি না সব ছাত্রছাত্রীকে বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে পড়লেন। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করলেন। আমার যা মনে আসে বলি আর উনি গম্ভীর মুখে বলেন, তোর এত বুদ্ধি হল কি করে? বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার! তোর ঠিকমতো যত্ন হওয়া দরকার। তোকে নিয়ে কি করা যায় তা-ই ভাবছি। কিছু একটা করা দরকার।

কিছু করার আগেই স্যারের ট্রেনিংকাল শেষ হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন। তবে কেন জানি কিছুদিন পরপরই আমাকে দেখতে আসেন। গভীর আগ্রহে পড়াশোনা কেমন হচ্ছে তার খোঁজ নেন। সব বিষয়ে সবচে কম নম্বর পেয়ে ক্লাস টু'তে ওঠার সংবাদ পাবার পর স্যারের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। শুধু যে উৎসাহে ভাটা পড়ে তা-ই, উনি এতই মন-খারাপ করেন যে আমার নিজেরও খারাপ লাগতে থাকে।

ক্লাস টু'তে উঠে আমি আরেকটি অপকর্ম করি। যে রূপবতী বালিকা আমার হৃদয় হরণ করেছিল, তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলি। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করি বড় হয়ে সে আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছে কি না। প্রকৃতির কোনো এক অদ্ভুত নিয়মে রূপবতীরা শুধু যে হৃদয়হীন হয় তা-ই না, খানিকটা হিংস্র স্বভাবেরও হয়। সে আমার প্রস্তাবে খুশি হবার বদলে বাঘিনীর মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। খামচি দিয়ে হাতের দুতিন জায়গার চামড়া তুলে ফেলে। স্যারের কাছে নালিশ করে। শাস্তি হিসেবে দুই হাতে দুটি ইট নিয়ে আমাকে নীল ডাউন হয়ে বসে থাকতে হয়।

প্রেমিকপুরুষদের প্রেমের কারণে কঠিন শাস্তি ভোগ করা নতুন কোনো ব্যাপার নয়, তবে আমার মতো এত কম বয়সে প্রেমের এমন শাস্তির নজির বোধহয় খুব বেশি নেই।

স্কুল আমার ভালো লাগত না। মাস্টাররা অকারণে কঠিন শাস্তি দিতেন। পাঠশালা ছুটির পর বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যাচ্ছে, এ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনা। আমাদের পাঠশালায় প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু একটা ক্লাস থেকে অন্য ক্লাস আলাদা করা নয়, অর্থাৎ কোথাও কোনো পার্টিশনের ব্যবস্থা নেই। কোনো ক্লাসে একজন শাস্তি পেলে পাঠশালার সবাই তা দেখে বিমলানন্দ ভোগ করত। শিক্ষকরাও যে মমতা নিয়ে পড়াতেন, তাও না। তাঁদের বেশির ভাগ সময় কাটত ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেয়ার কলাকৌশল বের করার কাজে। পড়ানোর সময় কোথায়? আমার পরিষ্কার মনে আছে, একজন শিক্ষক ক্লাস ফোর-এর একজন ছাত্রের দিকে একবার প্রচণ্ড জোরে ডাস্টার ছুড়ে মারেন। ছাত্রটির মাথা ফেটে যায়। অজ্ঞান হয়ে-যাওয়া

www.BDeBooks.Com

ছাত্রের প্রচুর পানি ঢালাঢালি করে তার জ্ঞান ফেরানো হয়। জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে প্রশ্নটি তাকে করা হয় তা হচ্ছে, আর এইরকম করবি কোনোদিন ?

স্কুল জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলি।

একদিন ক্লাসে গিয়ে দেখি চারদিকে চাপা উত্তেজনা। পড়াশোনা এবং শাস্তি দুটোই বন্ধ। শিক্ষকদের মুখ হাসিহাসি। আমাদের জানানো হল, আমেরিকা নামের এক ধনী দেশ আমাদের দরিদ্র দেশের ছেলেমেয়েদের কিছু সাহায্য দিয়েছে। সেই সাহায্য আমাদের দেয়া হবে।

সাহায্য হিসেবে আমরা সবাই এক টিন গুঁড়া দুধ এবং এক টিন মাখন পেলাম। দুই হাতে দুই টিন নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে গেলাম। মা বিস্মিত হয়ে বললেন, সবাইকে দিয়েছে ?

আমি বললাম, হুঁ। স্যার বলেছেন, পাকিস্তানের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দুই টিন করে দিয়েছে। মা অবাক বিস্ময়ে বললেন, একটা দেশ কত ধনী হলে এমন সাহায্য দিতে পারে! মা আমেরিকার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ হলেন। আমরা সকালের নাশতায় রুটি-মাখন খেতে শুরু করলাম।

টিন দুটি শেষ হবার আগেই দ্বিতীয় দফায় আবার পাওয়া গেল। এবং জানা গেল প্রতি মাসে দুবার করে দেয়া হবে। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের ঘর দুধ এবং মাখনের টিনে ভরতি হয়ে গেল। মা'র মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হল। আমেরিকা নামের সোনার দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে তিনি সম্ভবত শোকরানা নামাযও আদায় করলেন।

যদিও হেডস্যারের ঘর ভরতি ছিল দুধ এবং মাখনের টিনে, আমরা আর পেলাম না। হেডমাস্টার সাহেব ঠিক করলেন, ছাত্রদের স্কুলেই দুধ বানিয়ে খাওয়ানো হবে। দুধ বানানোর আনুষঙ্গিক খরচ আছে। চুলা কিনতে হবে, ছাত্রদের জন্যে মগ কিনতে হবে, জ্বালানির খরচ আছে। এসব খরচ মেটানো হবে মাখনের টিন বিক্রি করে।

দুই-তিনদিন তা-ই হল। বিশাল কড়াইয়ে দুধ জ্বাল দেয়া হল। অতি অখাদ্য সেই দুধ জোর করে আমাদের খাওয়ানো হল। শারীরিক শাস্তির চেয়েও সেই শাস্তি ভয়াবহ ছিল। আমরা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মনেপ্রাণে প্রার্থনা করলাম, আল্লাহ, তুমি আমাদের এই দুধের হাত থেকে বাঁচাও।

আল্লাহ শিশুদের প্রার্থনা শুনলেন। শাস্তি বন্ধ হল। দুধ খাওয়ানো শেষ হল। আমাদের শিক্ষকরা সবাই রিকশা ভরতি করে দুধ ও মাখনের টিন বাড়ি নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন খুবই কম। এই বয়সে দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো ধারণা হবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের সম্মানিত শিক্ষকরাই সেই ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। আমার জীবনে শিক্ষকেরা এসেছেন দুষ্টগ্রহের মতো। আমি সারাজীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি— আইসক্রিমওয়ালা, জুতা পালিশওয়ালা থেকে ডাক্তার, ব্যারিস্টার— কিন্তু কখনো শিক্ষক হতে চাইনি। চাইনি বলেই বোধহয় এখন জীবন কাটাচ্ছি শিক্ষকতায়।

থ্রী থেকে ফোরে উঠব।

বার্ষিক পরীক্ষা এসে গেছে। বাড়িতে বাড়িতে পড়াশোনার ধুম। আমি নির্বিকার। বই নিয়ে বসতে ভালো লাগে না, যদিও পড়তে বসতে হয়। সেই বসাটা পুরোপুরিই ভান। সবাই দেখল, আমি বই নিয়ে বসে আছি, এই পর্যন্তই। তখন প্রতি সন্ধ্যায় সিলেট শহরে মজাদার ব্যাপার হত— তার নাম 'লেমটন লেচকার'। কথাটা বোধহয় 'লণ্ঠন লেকচার'-এর বিকৃত রূপ। ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে জায়গায় জায়গায় সিনেমা দেখানো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ম্যালেরিয়া এসব ভালো ভালো জিনিস। আমাদের কাজের ছেলে রফিক খোঁজ নিয়ে আসে আজ কোথায় লেমটন লেচকার হচ্ছে— মুহূর্তে আমরা দুজন হাওয়া। রফিক তখন আমার বন্ধুস্থানীয়। তার কাছ থেকে বিড়ি খাওয়ার উপর কোর্স নিচ্ছি। বিড়ি খেলে কচি পেয়ারা পাতা চিবিয়ে মুখের গন্ধ নষ্ট করতে হয় এসব গুহ্যবিদ্যা শিখে নিচ্ছি। এই জাতীয় শিক্ষায় আমার কোনো অভাব দেখা যাচ্ছে না।

লেমটন লেচারের ভূত আমার ঘাড় থেকে নামানোর অনেক চেষ্টা করা হল। নামানো গেল না। মা হাল ছেড়ে দিলেন। এখন আর সন্ধ্যা হলে পড়তে বসতেও বলেন না। আমি মোটামুটি সুখে আছি বলা চলে।

এমন এক সুখের সময়ে মাথামোটা শংকর খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, তার মা তাকে বলেছেন সে যদি ক্লাস থ্রী থেকে পাস করে ফোর-এ উঠতে পারে তা হলে তাকে ফুটবল কিনে দেবেন।

সে আমার কাছে এসেছে সাহায্যের জন্য, কী করে এক ধাক্কায় পরের ক্লাসে ওঠা যায়। একটা চামড়ার ফুটবলের আমাদের খুবই শখ। সেই ফুটবল এখন মনে হচ্ছে খুব দূরের ব্যাপার নয়। সেইদিনই পরম উৎসাহে শংকরকে পড়াতে বসলাম। যে করেই হোক তাকে পাস করাতে হবে। দুজন একই ক্লাসে পড়ি। এখন সে ছাত্র, আমি শিক্ষক। ওকে পড়ানোর জন্যে নিজেকে প্রথম পড়তে হয়, বুঝতে হয়। যা পড়াই কিছুই শংকরের মাথায় ঢোকে না। মনে হয় তার দুই কানে রিফ্লেক্টর লাগানো। যা বলা হয় সেই রিফ্লেক্টরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, ভেতরে ঢুকতে পারে না। যা-ই হোক, প্রাণপণ পরিশ্রমে ছাত্র তৈরি হল। দুজন পরীক্ষা দিলাম। ফল বের হলে দেখা গেল, আমার ছাত্র ফেল করেছে এবং আমি স্কুলের সমস্ত শিক্ষকদের স্তম্ভিত করে প্রথম হয়ে গেছি। ফুটবল পাওয়া যাবে না এই দুঃখে রিপোর্ট কার্ড হাতে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরলাম।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা বাবাকে খুব মুগ্ধ করল। বাসায় যে-ই আসে বলেন, আমার এই ছেলের কাণ্ড শুনুন। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরেছে। কারণ হল...

এই ঘটনার আরেকটি সুফল হল বাবা মা'কে ডেকে বলে দিলেন— কাজলকে পড়াশোনা নিয়ে কখনো কিছু বলার দরকার নেই। ও ইচ্ছা হলে পড়বে, ইচ্ছা না হলে না। তাকে নিজের মতো থাকতে দাও।

www.BDeBooks.Com

আমি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলাম।

এই আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ, বিশেষ বিবেচনায় মাথামোটা শংকরকে প্রমোশন দিয়ে দেয়া হল। তার মা সেই খুশিতে তাকে একটা একনম্বরি ফুটবল এবং পাম্পার কিনে দিলেন।

গ্রীন বয়েজ ফুটবল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হল। আমি ক্লাবের প্রধান এবং শংকর আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমাদের বাসার কাজের ছেলে রফিক আমাদের ফুলব্যাক। অসাধারণ খেলোয়াড়।

নানার বাড়ি দাদার বাড়ি

একদিন স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দেখি— মা'কে আজ অন্যরকম লাগছে। তাঁর চেহারায় খুকি-খুকি ভাব চলে এসেছে। কথা বলছেন অনেকটা সুরেলা গলায়। ব্যাপারটা কি ?

অসাধারণ ব্যাপার একটা ঘটেছে— আমরা নানার বাড়ি এবং দাদার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আমার শৈশবের সবচে আনন্দময় সময় হচ্ছে এই দুজায়গায় বেড়াতে যাওয়া। প্রতি দুবছর পরপর একবার তা ঘটত। আমার মনে হত, এত আনন্দ এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারব না। অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমরা ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি। ছুটিতে যাচ্ছি।

ছুটি!

সিলেট মেলে রাতে চড়ব। গভীর রাতে সেই ট্রেন ভৈরবের ব্রিজে উঠবে। আমরা যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমাদের ডেকে তোলা হবে। গভীর বিস্ময়ে দেখব ভৈরবের ব্রিজ। ভোরবেলায় ট্রেন পৌঁছবে গৌরীপুর জংশন। ঘুম ভাঙবে চাওয়ালাদের অদ্ভুত গলা চা-গ্রাম চা-গ্রাম শব্দে। মিষ্টি লুচি দিয়ে সকালের নাশতা। চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা গৌরীপুর জংশনে যাত্রাবিরতি। কী আনন্দ! কী আনন্দ! স্টেশনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ঘুরে বেড়াও। ওভারব্রিজে উঠে তাকিয়ে দ্যাখো পিপীলিকার সারির মতো ট্রেনের সারি। দূরের দিগন্তে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সেই ক্ষেতে নেমেছে সাদা বকের দল। তারা উড়ে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে। আরও অনেক দূরে মেঘের কোলে নীলরঙা গারো পাহাড়। এইগুলো কি এই পৃথিবীর দৃশ্য ? না, এই পৃথিবীর দৃশ্য নয়— ধুলোমাটির এই পৃথিবী এত সুন্দর হতে পারে ?

নানার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে নিশুতিরাত। কিন্তু স্টেশন গমগম করছে। নানার বাড়ির এবং তাদের আশেপাশের বাড়ির সব পুরুষ চলে এসেছেন। মহিলারাও এসেছেন। তাঁরা স্টেশনে ঢোকেন নি, একটু দূরে হিন্দুবাড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজা দিয়ে নামার সুযোগ নেই। তার আগেই আমাকে কেউ হাত বাড়িতে জানালা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। একজনের কোল থেকে আরেকজনের কোলে ঘুরছি। মা খুশিতে ক্রমাগত কাঁদছেন। আহা কী আনন্দময় দৃশ্য!

দুটি হ্যাজাক বাতিতে রাস্তা আলো করে আমরা রওনা হলাম। দুপাশে অন্ধকার-করা গাছপালায় রাজ্যের জোনাকি জ্বলছে, নিভছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে কালীবাড়ি। মা কালী জিভ বের করে শিবের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নানার বাড়ির পৌঁছতে তা হলে দেরি নেই। অসংখ্য শিয়াল একসঙ্গে ডাকছে— রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হল বোধহয়।

একবার বলেছি, আবার বলি, আমার জীবনের সবচে আনন্দময় সময় কেটেছে নানার বাড়িতে। বাড়িটার তিনটা ভাগ— মূল বসতবাড়ি, মাঝের ঘর, বাংলাঘর।

বাংলাঘরের সামনে প্রকাণ্ড খাল। বর্ষায় সেই খাল কানায়-কানায় ভরা থাকে। ঘাটে বাঁধা থাকে নৌকা। কাউকে বললেই নৌকা নিয়ে খানিকটা ঘুরিয়ে আনে।

মূল বাড়ির পেছনে ঘন জঙ্গল। এমনই ঘন যে গাছের পাতা ভেদ করে আলো আসে না। সেই জঙ্গলের ভেতর 'সার দেয়াল'। সার দেয়াল হল পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নানাদের শক্তিমান পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। জঙ্গলে কত বিচিত্র ফলের গাছ— লটকান, ডেউয়া, কামরাঙা...।

চারপাশে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। আমাদের মন-ভুলানোর জন্যে সবার সে কি চেষ্টা! আমার এক মামা (নজরুল মামা) কোত্থেকে ভাড়া করে ধোপাদের এক গাধা নিয়ে এলেন। গাধা যে আসলেই গাধা সেটা বোঝা গেল— সাত চড়ে রা নেই। পিঠে চড়ে বসো, পিঠ থেকে নামো— কিছু বলবে না। শুধু পেছনের দিকে যাওয়া নিষেধ। হঠাৎ লাথি বসাতে পারে।

বাচ্চাদের আনন্দ দেয়ার জন্যে ঘুড়ি উড়ানো হবে। সেই ঘুড়ি নৌকার পালের চেয়েও বড়। একবার আকাশে উঠলে প্লেনের মতো আওয়াজ হতে থাকে। ঘুড়ি বেঁধে রাখতে হয় গাছের সঙ্গে, নয়তো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সন্ধ্যাবেলা লাটিম খেলা। প্রকাণ্ড এক লাটিম। লাটিম ঘোরানোর জন্যে লোক লাগে দুজন। লাটিম ঘুরতে থাকে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজে। আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

একটু রাত বাড়লে ফাডার টাক্কর (পাঁঠার টক্কর)। দুটি হিংস্র ধরনের বাঁকা শিংয়ের পাঁঠার মধ্যে যুদ্ধ। দুপ্রান্ত থেকে এরা ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটে আসবে। প্রচণ্ড শব্দে একজনের শিং-এ অন্যজন আঘাত করবে। আগুনের ফুলকি বের হবে শিং থেকে। শুরু হবে মরণপণ যুদ্ধ, ভয়াবহ দৃশ্য।

মামাদের কেউ গভীর রাতে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলবেন। তারা 'আউল্লা' দিতে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাব কি না। ব্যাপারটা হল আলো দিয়ে মাছ মারা। অল্প পানিতে হ্যাজাকের তীব্র আলো ফেলা হয়। সেই আলোয় দেখা যায় শিং, মাগুর শুয়ে আছে। আলোতে এদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়— নড়তেচড়তে পারে না। তখন থোর দিয়ে তাদের গেঁথে ফেলা হয়।

খুব ভোরে নানাজানের সঙ্গে ভ্রমণ। নানাজানের হাতে দুনলা বন্দুক। তিনি যাচ্ছেন বিলের দিকে, আমরা পেছনে পেছনে আছি। ছররা গুলিতে তিন-চারটা

www.BDeBooks.Com

বক একসঙ্গে মারা পড়ল। মৃত পাখিদের ঝুলিয়ে আমরা এগুচ্ছি— নাকে আসছে মাটির গন্ধ, মৃত পাখিদের রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ।

সারাদিন পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি, নিশুতিরাতে ঘুম ভেঙে টিনের চালের বৃষ্টির শব্দ শোনা— এই আনন্দের যেমন শুরু নেই তেমনি শেষও নেই। ছোটদের শোবার ব্যবস্থা মাঝের ঘরে। ঢালাও বিছানা। বিছানার একপ্রান্তে মা বসে আছেন, পরিচিতজনরা আসছে। গল্প হচ্ছে, পান খাওয়া হচ্ছে, রাত বাড়ছে। কি চমৎকার সব রাত!

নানার বাড়ি ঘিরে আমার অদ্ভুত সব স্মৃতি। মাঝে মাঝে স্বপ্নদৃশ্যের মতো এরা উঠে আসে। জীবনের সঙ্গে মেলাতে পারি না। কয়েকটি স্মৃতি উল্লেখ করছি ঃ

ক. সাপে-কাটা রুগিকে ওঝা চিকিৎসা করছে— এই দৃশ্য নানার বাড়িতেই প্রথম দেখি। রুগি জলচৌকিতে বসে আসে, ওঝা মন্ত্র পড়তে পড়তে হাত ঘোড়াচ্ছে। সেই ঘুরন্ত হাত অতি দ্রুত নেমে আসছে রুগির গায়ে। চিকিৎসার শেষ পর্যায়ে কাঁইক্যা মাছের কাঁটা দিয়ে রুগির পা থেকে দূষিত রক্ত বের করা হচ্ছে।

খ. মেঘের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কইমাছ পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করছে শুকনো দিয়ে কোনো— এক গন্তব্যে যেতে। কেন তারা বর্ষার প্রথম মেঘগর্জনে এমন পাগল হয়, কে বলবে!

গ. ভূতে-পাওয়া রুগির চিকিৎসা করতেও দেখলাম। ভূতের ওঝা এসে রুগির সামনে ঘর কেটে কেটে সেই ঘরে সরিষা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রুগি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে আর মারিস না। আর মারিস না।

ঘ. এক হিন্দুবাড়িতে নপুংসক শিশুর জন্ম হয়। কোত্থেকে খবর পেয়ে একদল হিজড়া উপস্থিত। শুরু হল নাচানাচি। নাচানাচির এক পর্যায়ে এরা গা থেকে সব কাপড় খুলে ফেলল। ঝুড়ি ভরতি করে ডিম নিয়ে এসেছিল, সেইসব ডিম ছুঁড়ে মারতে লাগল বাড়িতে। একসময় শিশুটি তাদেরকে দিয়ে দেয়া হল। মহানন্দে তারা চলে যাচ্ছে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে শিশুটির মা। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় এমন একটি দৃশ্য। আমার নিজের চোখে দেখা।

ঙ. এক সন্ধ্যায় নানার বাড়িতে ঢিল পড়তে লাগল। ছোট ছোট ঢিল নয়— ক্ষেত থেকে উঠিয়ে আনা বিশাল মাটির চাঙড়। নানিজান বললেন, কয়েকটা দুষ্ট জিন আছে। মাঝে মাঝে এরা উপদ্রব করে। তবে ভয়ের কিছু নাই, এসব ঢিল কখনো গায়ে লাগে না।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করবার জন্যে উঠোনে খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করলাম। আশেপাশে ঢিল পড়ছে, গায়ে পড়ছে না— বেশ মজার ব্যাপার।

নিশ্চয় এর লৌকিক কোনো ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা থাকলেও আমার জানা নেই। জানতেও চাই না। নানার বাড়ির অনেক রহস্যময় ঘটনার সঙ্গে এটিও থাকুক। সব রহস্য ভেদ করে ফেলার প্রয়োজনই-বা কি?

এবার দাদার বাড়ি সম্পর্কে বলি।

দাদার বাড়ির এক বিশেষ পরিচিত ঐ অঞ্চলে ছিল এবং খুব সম্ভব এখনও আছে— 'মৌলবিবাড়ি'। এই বাড়ির নিয়মকানুন অন্যসব বাড়ি থেকে শুধু যে আলাদা তা-ই না— ভীষণ রকম আলাদা। মৌলবিবাড়ির মেয়েদের কেউ কোনোদিন দেখে নি, তাদের গলার স্বর পর্যন্ত শোনে নি। এই বাড়িতে গানবাজনা নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, ভেতরের বাড়িতেও বড় বড় পর্দা। একই বাড়িতে পুরুষদেরও মেয়েদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতে হত। ভাবের আদান-প্রদান হত ইশারায় কিংবা হাততালিতে। যেমন, পর্দার এপাশ থেকে দাদাজান একবার হাততালি দিলেন, তার মানে তিনি পানি চান। দুবার হাততালি— পান-সুপারি। তিনবার হাততালি— মেয়েদের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে, আরও নিঃশব্দ হতে হবে।

আমাদের হল পীরবংশ। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশি ছিলেন এই অঞ্চলের নামি পীরসাহেব। তাঁকে নিয়ে প্রচলিত অনেক গল্পগাথার একটি গল্প বলি : জাঙ্গির মুনশি তাঁর মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। সেই আমলে যানবাহন ছিল না। দশ মাইল পথ হেঁটে যেতে হল। দুপুরে পৌঁছলেন। মেয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে ফেরার পথে বললেন, মা, আমার পাঞ্জাবির একটা বোতাম খুলে গেছে। তুমি সুই-সুতা দিয়ে একটা বোতাম লাগিয়ে দাও। বোতাম ঘরে আছে তো?

মেয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল। তিনি দশ মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে পা দেয়ামাত্র মনে হল, বিরাট ভুল হয়েছে। তাঁর কন্যা যে বোতাম লাগাল সে কি স্বামীর অনুমতি নিয়েছে? স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর সংসারের জিনিস ব্যবহার করা তো ঠিক না। তিনি আবার রওনা হলেন, অনুমতি নিয়ে আসা যাক। আবার কুড়ি মাইল হাঁটা।

আমি নিজে অবিশ্যি এই গল্প অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি। আমার ধারণা, মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। আবার মেয়েকে দেখার ইচ্ছা হল। একটা অজুহাত তৈরি করে রওনা হলেন।

দাদার বাড়ির কঠিন সব অনুশাসনের নমুনা হিসেবে একটা গল্প বলি। আমার ফুফুরা খুব সুন্দরী। পীর পরিবারের বংশধররা সচরাচর রূপবান হয়। তাঁরাও ব্যতিক্রম নন। দুজন ফুপুই পরীর মতো। বড় ফুপুর বিয়ের বয়স হলে বাবা তাঁর জন্যে একজন ছেলে পছন্দ করলেন। ছেলে বাবার বন্ধু। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। ছেলেও অত্যন্ত রূপবান। বাবা তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে করে

www.BDeBooks.Com

গ্রামের বাড়িতে এলেন। দাদাজানের ছেলে পছন্দ হল। মেয়ে দেখানো হল। কারণ ধর্মে নাকি বিধান আছে, বিয়ের আগে ছেলে মেয়েকে এবং মেয়ে ছেলেকে অন্তত একবার দেখতে পারবে। ছেলে মেয়ে দেখে মুগ্ধ। সেই রাতে কথা,— বাবা তাঁর বন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। খোলা প্রান্তরে বাবার বন্ধু গান ধরল। রবীন্দ্রনাথের গান তখন শিক্ষিতমহলে গাওয়া শুরু হয়েছে।

গানটি হল— 'আজি এ বসন্তে...'

গান গাওয়ার খবর দাদাজানের কানে পৌঁছল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে বললেন, এই ছেলে যে গান জানে তা তো তুমি বল নাই।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, সে গান জানে।

এইখানে মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি জেনেশুনে গান-জানা ছেলে এ বাড়িতে আনলে কেন?

গান গাওয়া ক্ষতি কি?

লাভ-ক্ষতির ব্যাপার না! আমরা কয়েক পুরুষ ধরে যে নিয়ম মানছি আমার জীবিত অবস্থায় তার কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তুমি যদি রাগ কর আমার কিছুই বলার নাই। রাগ করে বাড়িতে আসা বন্ধ করলেও করতে পার।

দাদাজান তাঁর মেয়েকে নিজে দেখেশুনে পৃথিবী থেকে দূরে সরে থাকা একটি পরিবারে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

আমরা যখন দাদার বাড়িতে বেড়াতে যেতাম, খবর পেয়ে বড় ফুপু আসতেন পালকি করে। পালকি অনেক দূরে অপেক্ষা করত। ফুপুর স্বামীর খোঁজ নিতে আসতেন— আমরা যে এসেছি আমাদের সঙ্গে কলের গান আছে কি না। যদি জানতেন কলের গান আছে— সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যেতেন।

ধীরে ধীরে দাদার বাড়ির মানসিকতার পরিবর্তন হয়। যে গান এই বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল সেই গানও চালু হয়। দাদার নির্দেশেই হয়। আমার ছোট বোন শেফুর গলায়— "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে" গান শোনার পর দাদাজান নির্দেশ দেন— গান চলতে পারে।

দাদার বাড়ি প্রসঙ্গে অদ্ভুত একটা কথা বলি। দাদার বাবা জাঙ্গির মুনশির ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। দাদাজানেরও ইচ্ছামৃত্যু হয়। মৃত্যুর সাতদিন আগে সবাইকে ডেকে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেন, কেউ মনে কোনো আফসোস রাখবে না। মন শান্ত করো। আমাকে কেউ যদি বিশেষ কোনো সেবাযত্ন করতে চাও করতে পার।

দাদাজানের বলা সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যু হয় সজ্ঞানে। মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে আমার ছোট চাচাকে ডেকে বলেন, আমি তা হলে যাই।

পৃথিবী বড়ই রহস্যময়।

দাদাজানদের বাড়িঘর অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, গোছানো। মানুষগুলো হৈ চৈ করে কম, কাজ করে বেশি। দাদার বাড়িতে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল না।

দাদাজান আমাদের চোখে-চোখে রাখতেন। আদব-কায়দা, ভদ্রতা শেখাতেন। সন্ধ্যাবেলা নামায শেষ করেই গল্প করতে বসতেন। সবই ঈশপের গল্পের মতো। গল্পের শেষে একটা মোরাল থাকত। মোরাল আছে এমন গল্প ভালো লাগার কথা নয়। কিন্তু দাদাজানের গল্প ভালো লাগত। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম।

নানার বাড়ি থেকে দাদার বাড়িতে এলে শুরুতে খানিকটা দমবন্ধ দমবন্ধ লাগত। তবে দাদার বাড়িরও আলাদা মজা ছিল। বাড়ির বাংলাঘরে দুটি কাঠের আলমিরায় ছিল অসংখ্য বই। আসলে এই দুটি আলমিরা নিয়েই একটা পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ পাবলিক লাইব্রেরি। আজিমুদ্দিন আহমেদ আমার দাদার নাম। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে বাবা এই লাইব্রেরি করেন। লাইব্রেরির চাঁদা মাসে এক আনা। এই লাইব্রেরি থেকে কেউ কোনোদিন বই নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমরা দাদার বাড়িতে উপস্থিত হলেই শুধু চাবি খুলে বই বের করা হত। চাবি চলে আসত আমার হাতে। দাদার বাড়িতে পুকুরপাড়ে বটগাছের মতো বিশাল এক কামরাঙা গাছ ছিল। সেই কামরাঙা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বই পড়ার আনন্দের কোনো তুলনা হয় না।

বাবা জায়গায় জায়গায় লোক পাঠিয়ে গ্রাম্য গায়কদের আনতেন। তাঁরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্র হাতে উপস্থিত হতেন— রোগাভোগা, অনাহারক্লিষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁদের চোখ বড়ই স্বপ্নময়।

দাদার বাড়িতে গানবাজনা হবার কোনো উপায় নেই। অনেকটা দূরে বাবার এক বন্ধুর বাড়ির উঠোনে গানের আসর বসত। হাত উঁচু করে যখন গাতক ঢেউ-খেলানো সুরে, মাথার লম্বা বাবড়ি ঝাঁকিয়ে গানে টান দিতেন—

"আমার মনে বড় দুক্ষ
বড় দুক্ষ আমার মনে গো।"

তখন তাঁর মনের 'দুক্ষ' ছড়িয়ে যেত শ্রোতাদের মনে। চোখ ভরে জল আসত। গান চলত গভীর রাত পর্যন্ত। রাত যত গভীর হত গানে ততই আধ্যাত্মিক ভাব প্রাধান্য পেতে থাকত। শেষের দিকে সেগুলো আর গান থাকত না— হয়ে উঠত প্রার্থনা-সংগীত। আমরা ছোটরা অবিশ্যি তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাদের কোলে করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু ঘুমের মধ্যে কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে গান শুনতে পাচ্ছি।

পারুল আপা

স্কুল আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। স্কুলের বাইরের জীবনটা ছিল আনন্দময়। সেই আনন্দের মাঝখানে দুঃস্বপ্নের মতোই উদয় হলেন পারুল আপা। লম্বা বিষাদময় চেহারার একটি মেয়ে। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়। থাকেন আমাদের একটি বাসার পরের বাসায়।

তাঁর বাবা ওভারশিয়ার। রোগা একজন মানুষ। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটেন। চিকন গলায় কথা বলেন। নিজের মেয়েদের অকারণে হিংস্র ভঙ্গিতে

www.BDeBooks.Com

মারেন। সেই মার ভয়াবহ মার। যে কোনো অপরাধে পারুল আপাদের দুবার শাস্তি হয়। প্রথমে বাবার হাতে, পরেরবার মায়ের হাতে। শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একটা ধারণা দিই। পারুল আপা একবার একটা প্লেট ভেঙে ফেললেন। সেই প্লেট ভাঙার শাস্তি হল, চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা। পারুল আপা পরিবারের সবচেয়ে বড় মেয়ে। তাঁরা অনেকগুলো বোন, কোনো ভাই নেই। নিয়ম করে প্রতি বছর পারুল আপাদের একটি করে বোন হয়। তাঁর বাবা-মা দুজনেরই মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

যে সময়ের কথা বলছি তখন পারুল আপার বয়স বারো-তেরো, বয়ঃসন্ধিকাল। বাবা-মা'র অত্যাচারে বেচারি জর্জরিত। তাঁর মা তাঁকে ডাকেন হাবা নামে। অথচ তিনি মোটেই হাবা ছিলেন না। তাঁর অসম্ভব বুদ্ধি ছিল। হৃদয় ছিল আবেগ ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। কোনো এক বিচিত্র কারণে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ও ভালোবাসা আমার উপর উজাড় করে দিলেন। যে ভালোবাসা না চাইতেই পাওয়া যায়, তার প্রতি কোনো মোহ থাকে না। পারুল আপার ভালোবাসা আমার অসহ্য বোধ হত। অসহ্য বোধ হবার আরও একটি কারণ ছিল। তাঁর চেহারা তেমন ভালো ছিল না। আমার চরিত্রের বড় রকমের দুর্বল দিকের একটি হচ্ছে, মেয়েদের দৈহিক রূপের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ। যে দেখতে ভালো না, সে হাজারো ভালো হলেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রূপবতীদের বেলায় আমি অন্ধ। তাদের কোনো ত্রুটি আমার চোখে পড়ে না। বলতে ইচ্ছে করে, আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

থাক সে কথা, পারুল আপার কথা বলি। তিনি ভালোবাসার কঠিন শিকলে আমাকে বাঁধতে চাইলেন। আমাকে ভুলানোর জন্যে তাঁর সে কি চেষ্টা! বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি আমাকে দিতেন। স্কুলের টিফিনের জন্যে তাঁকে সামান্য পয়সা দেয়া হত। তিনি না খেয়ে সেই পয়সা জমিয়ে রাখতেন আমার জন্যে। এর প্রতিদানে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে স্কুলে যেতে হত। সেটা অতি বিরক্তিকর ব্যাপার। তিনি ক্লাস করছেন, আমি বেজার মুখে তাঁর পাশে বসে। তিনি একটা হাতে আমার গলা জড়িয়ে আছেন।

সে সময় অধিকাংশ মেয়েই ছোট ভাইদের স্কুলে নিয়ে আসত। ছোট ভাইরা অনেক সময় অভিভাবকের মতো কাজ করত। বাবা-মা'রা নিশ্চিন্ত থাকতেন মেয়ের সঙ্গে পুরুষ-প্রতিভূ একজন-কেউ আছে। পারুল আপার সঙ্গে স্কুলে গিয়ে একবার বিরাট সমস্যায় পড়লাম। স্কুল কম্পাউন্ডের ভেতর একজন পাগল ঢুকে গেছে। মেয়েমহলে আতঙ্ক, ছোটাছুটি। আমি পারুল আপার নজর এড়িয়ে পাগল দেখতে গেলাম। কি আশ্চর্য, পাগল আমার চেনা! শুধু চেনা নয়, খুবই চেনা। উনি হচ্ছেন সুরসাগর প্রাণেশ দাস, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। প্রায়ই বাসায় আসেন। তখন গানের জলসা বসে। আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম

নেই, আমরা ছুটে গিয়ে লায়লা আপাদের বাসা থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গানবাজনা করেন। গায়ক প্রাণেশ দাস, শ্রোতা আমার বাবা। এসব ওস্তাদি ধরনের গান আমাদের ভালো লাগে না, শুধু বাবা একাই আহা আহা করেন।

প্রাণেশ কাকু পাগল হয়ে গেছেন আমার জানা ছিল না। এখন অবাক হয়ে দেখি তিনি বিচিত্র ভঙ্গি করে মেয়েদের দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছেন। মেয়েরা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। একে অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ছে। আমি অসীম সাহসী। এগিয়ে গেলাম পাগলের দিকে। প্রাণেশ কাকু আমাকে চিনতে পারলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কি রে বাবু, ভালো ?

আমি বললাম, জ্বি ভালো। আপনি এরকম করছেন কেন ?

প্রাণেশ কাকু লজ্জিত গলায় বললেন, মেয়েগুলোকে ভয় দেখাচ্ছি।

ভয় দেখাচ্ছেন কেন ?

মেয়েগুলো বড় বজ্জাত। তোর বাবা ভালো আছেন ?

জ্বি।

হারমোনিয়াম কিনতে বলেছিলাম, কিনেছে ?

জ্বি না।

শ'খানেক টাকা হলে সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম পাওয়া যায়। কিনে ফেললে হয়। রোজ-রোজ অন্যের বাসা থেকে আনা— তুই তোর বাবাকে বলবি।

জ্বি আচ্ছা।

আর আমার মাথা যে খারাপ হয়ে গেছে এই খবরটাও দিস। বাড়িতে বেঁধে রাখে। তুই এখানে চুপচাপ দাঁড়া, আমি মেয়েগুলোকে আরেকটু ভয় দেখিয়ে আসি। তারপর তোকে নিয়ে তোদের বাসায় যাব।

জ্বি আচ্ছা।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রাণেশ কাকু আরও কয়েকবার প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে ফিরে এসে আমার হাত ধরে গেটের দিকে রওনা হলেন। আর তখন হাতে লম্বা একটা লাঠি নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন পারুল আপা। তাঁর মূর্তি প্রাণ সংহারক। তিনি তীব্র গলায় বললেন, একে ছাড়েন, একে না ছাড়লে লাঠি দিয়ে এক বাড়িতে আপনার মাথা ফাটিয়ে দেব। ছাড়েন বলছি! পাগলের সিক্সথ সেন্স খুব ডেভেলপ্‌ড্‌ হয় বলে আমার ধারণা। প্রাণেশ কাকু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন, আমার হাত না ছাড়লে এই মেয়ে সত্যি সত্যি তার ছোট শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে। তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। পারুল আপা ছুটে এসে ছোঁ মেরে আমাকে কোলে করে নিয়ে গেলেন। এত প্রবল উত্তেজনা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না— পারুল আপা হাত-পা এলিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পারুল আপা ছিলেন যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার জ্ঞানদাত্রী। পুরুষ এবং রমণীর ভেতর বাহ্যিক সম্পর্ক ছাড়াও যে অন্য এক ধরনের সম্পর্ক আছে তা

www.BDeBooks.Com

প্রথম জানলাম তাঁর কাছে। তখন আমার বয়স আট। ক্লাস থ্রীতে উঠেছি। জটিল সম্পর্কের বিষয় জানার জন্যে বয়সটা খুবই অল্প। খুবই হকচকিয়ে গেলাম— এসব কি বলছে পারুল আপা! কি অদ্ভুত কথা!

পারুল আপার কথা বিশ্বাস করার কোনোই কারণ দেখলাম না। কিন্তু উনিই-বা বানিয়ে বানিয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলবেন কেন ?

নরনারীর সম্পর্কের জটিলতা ব্যাখ্যার পেছনে পারুল আপার একটা কারণ ছিল। কারণ হচ্ছে, আমাদের পাশের বাসার ভদ্রলোক। ওঁদের বাড়িতে পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরমতো একটি কাজের মেয়ে ছিল। মেয়েটি ভদ্রলোককে বাবা ডাকত। হঠাৎ শুনি, তিনি এই মেয়েটিকে বিয়ে করেছেন। ভদ্রলোকের দুটি বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘন ঘন ফিট হতে লাগলেন। ঘটনাটা চারপাশে বড় ধরনের আলোড়ন তৈরি করল। বড়রা সবাই এই ঘটনা নিয়ে আলাপ করে। সেই আলাপে আমি উপস্থিত হলে চোখ বড় বড় করে বলে— "এই ভাগ!"

কাজেই আমি নিজেই পারুল আপার কাছে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, বিয়ে না করে উপায় কি— ঐ মেয়ের পেটে বাচ্চা।

পেটে বাচ্চা হলে বিয়ে করতে হয় কেন ?

তোকে বলা যাবে না। খুব লজ্জার কথা।

না, আমাকে বলতে হবে।

কাউকে বলবি না তো ?

না, বলব না।

কসম খা।

কিসের কসম ?

বল, বিদ্যা।

বিদ্যা।

বল, কোরান।

কোরান।

বল, টিকটিকি।

টিকটিকি বলব কেন ? টিকটিকি আবার কিরকম কসম ?

টিকটিকির যেমন লেজ খসে যায়— তুইও যদি এই কথা কাউকে বলিস তা হলে তোর জিভও খুলে পড়ে যাবে।

আমি ভয়ে ভয়ে টিকটিকির নামেও কসম করলাম— আর পারুল আপা গন্ধম ফলের সেই বিশেষ জ্ঞান আমাকে দিয়ে দিলেন। আমার মনে আছে, মনে খুব বড় ধরনের আঘাত পেলাম। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল, না, এসব মিথ্যা। এসব হতেই পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে কারও সঙ্গে আলাপ করব সেই উপায় নেই। টিকটিকির কসম খেয়েছি। জিহ্বা খুলে পড়ে যেতে পারে।

এই সময় পাশের বাড়ির ঐ ভদ্রলোকের বড় মেয়েটির হাসিরোগ হল। সারাক্ষণ হাসে। খিলখিল করে হাসে। গভীর রাতেও ঘুম ভেঙে শুনি পাশের বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসছে। গভীর রাতে সেই হাসি শুনে বড় ভয় লাগত। গা শির শির করত। মেয়েটির কোথায় যেন বিয়ে হয়েছিল— বাবার এই কাণ্ডে তার বিয়ে ভেঙে যাবার পরই হাসিরোগ হয়। তার কয়েকদিন পরই তারা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নানু ডাকতাম। মেয়ে দুটিকে খালা। তারা আমাকে খুবই স্নেহ করত। প্রায়ই ডেকে নিয়ে বড়দের মতো কাপে করে চা খেতে দিত। দু'নম্বর বোনটি আমাকে সবসময় জিজ্ঞেস করত— তার মতো সুন্দরী কোনো মেয়ে আমি দেখেছি কি না। এর উত্তরে আমি তৎক্ষণাৎ বলতাম, 'না'।

সত্যিই তো?

হ্যাঁ সত্যি।

আমি বেশি সুন্দর, না আপা?

আপনি।

সতি-বিদ্যা-কোরান বিদ্যা বল।

সত্যি-বিদ্যা-কোরান।

তাঁরা চলে যাবার পর পাশের বাড়ি অনেক দিন খালি পড়ে রইল। আমার বেশ কিছুদিন খুব মন-খারাপ গেল। অল্প বয়সের মন-খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমার বেলায়ও হল না। তা ছাড়া মন-খারাপ ভাব কাটানোর মতো রহস্যময় ঘটনাও ঘটল। একদিন খুব ভোরে দুজন বিচিত্রদর্শন লোক কোদাল নিয়ে পারুল আপাদের ঘরে ঢুকল। তারা নাকি কবর খোঁড়ার লোক। ভেতরের দিকের উঠানে তারা কবর খুঁড়তে শুরু করল। এই ঘটনা শুধু যে শিশুদের মনেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল তা নয়, বড়রাও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমার মা'র ধারণা হল ভদ্রলোক তাঁর কোনো-এক মেয়েকে মেরে ফেলেছেন। এখন গোপনে কবর দিয়ে দেয়া হচ্ছে। বাবা মা'কে ধমক দিলেন— এসব ধারণা তুমি পাও কোথায়? নিশ্চয়ই অন্য কোনো ব্যাপার।

আসলেই অন্য ব্যাপার, তবে কম রোমাঞ্চকর না। ওভারশিয়ার কাকুর পকেট থেকে একশো টাকা চুরি করেছে তাঁর পিওন। অথচ সে তা স্বীকার করছে না। কবর খোঁড়া হচ্ছে সেই কারণেই। পিওন একটা কোরান শরিফ হাতে নিয়ে কবরে নামবে এবং কোরান শরিফ হাতে নিয়ে বলবে— সে টাকা নেয় নি। যদি সে মিথ্যা কথা বলে তা হলে আর কবর থেকে উঠতে পারবে না। কবর তাকে আটকে ফেলবে।

সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার জন্য আমরা দল আমরা দল বেঁধে কবরের চারপাশে দাঁড়ালাম। দরিদ্র পিওন হাতে কোরান শরিফ নিয়ে কবরে নামল। সে থরথর করে কাঁপছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। তাকে দেখাচ্ছে পাগলের মতো। ওভারশিয়ার কাকু বললেন— এই, তুই টাকা চুরি করেছিস?

www.BDeBooks.Com

জে না।

সত্যি কথা বল। মিথ্যা বললে কবরে আটকে যাবি।

টাকা চুরি করি নাই স্যার।

তোর হাতে কোরান শরিফ, তুই কবরে দাঁড়িয়ে আছিস— মিথ্যা বললে আর উঠতে পারবি না।

তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হল। পিওনের হাত থেকে কোরান শরিফ পড়ে গেল। সে জ্ঞান হারিয়ে কবরের ভেতর পড়ে গেল।

ওভারশিয়ার কাকু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, বলছিলাম না, টাকা এই হারামজাদাই নিয়েছে!

কবর বন্ধ করা হল, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা হল না। বিশাল একটা গর্তের মতো হয়ে রইল, যে গর্তের দিকে তাকালেই ভয় ভয় লাগত। এ ছাড়াও আরও সব ভয়াবহ খবর কানে আসতে লাগল— যেমন, গভীর রাতে নাকি এই কবরের ভেতর থেকে ভারী গলায় কে ডাকে— আয় আয়। একবার কবর খোঁড়া হয়ে গেলে কাউকে-না-কাউকে সেখানে যেতে হয়। কবর তার উদর পূর্ণ করার জন্য মানুষকে ডাকে।

আমি পারুল আপাদের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলাম। কী দরকার ঐ ভূতুড়ে বাড়িতে যাবার? পারুল আপার সঙ্গে যোগাযোগও কমে গেল, কারণ তাঁর স্কুলের খাতায় একটি প্রেমপত্র পাওয়া গেছে। সম্বোধনহীন সেই প্রেমপত্রে তিনি একজনকে অনুরোধ করেছেন তাঁকে চুমু খাবার জন্যে। কেন জানি আমার মনে হয়, ঐ প্রেমপত্রটি তিনি আমাকেই লিখেছিলেন। কারণ আমি ছাড়া অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। এবং একবার তাঁকে চুমু খাবার জন্যে লাজুক গলায় আমাকে অনুরোধও করেছিলেন। আমি এই অদ্ভুত প্রস্তাবে হেসে ওঠায় খুব লজ্জাও পেয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে যাওয়া বন্ধ। জানালার শিক ধরে মাঝে মাঝে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আমাকে দেখলেই তিনি চিকন গলায় ডাকেন। আমি পালিয়ে যাই। তাঁর বাবা-মা তাঁকে বন্দি করে রাখায় আমি এক ধরনের স্বস্তি বোধ করি। এখন আমাকে বিরক্ত করার সুযোগ তাঁর নেই। পারুল আপার বন্দিজীবন আমাকে বেশিদিন দেখতে হয় নি। তাঁরা মীরাবাজারের বাসা বদলে কোথায় যেন চলে গেলেন। হারিয়ে গেলেন পুরোপুরি।

মানুষ দ্বিতীয়বার শৈশবে ফিরে যেতে পারে না। পারা গেলে আমি অবশ্যই এই অসহায় অভিমানী, দুখি কিশোরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম। আজ তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন, আমি জানি না। শুধু প্রার্থনা করি— যেখানেই থাকুন যেন সুখ তাঁকে ঘিরে থাকে। পৃথিবী ও মানুষের কাছে সুখ তাঁর প্রাপ্য।

স্বপ্নলোকের চাবি

পারুল আপা নেই, কাজেই স্কুলের দুঃসহ দুঘণ্টা কোনোক্রমে পার করে দেবার পরের সময়টা মহানন্দের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার

নেই মানা।' সাজানো গোছানো সুন্দর বাড়ি দেখলেই হুট করে ঢুকে পড়ি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তৎক্ষণাৎ বের করে দেয়া হল। এর মধ্যে একটি বাড়িতে ভিন্ন ব্যাপার হয়। এই বাড়িটিও মীরাবাজারেই। আমাদের বাসার কাছে। বিশাল কম্পাউন্ড, গাছগাছালিতে ছাওয়া ধবধবে সাদা রঙের বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। এই বাড়িতে কে থাকেন তাও আমরা জানি, সিলেট এম. সি. কলেজের অধ্যাপক। আমাদের কাছে তাঁর পরিচয় হচ্ছে প্রফেসর সাব, অতি অতি অতি জ্ঞানী লোক— যাঁকে দূর থেকে দেখলেই পুণ্য হয়। তবে এই প্রফেসার সাহেব নাকি পাকিস্তানে থাকবেন না, দেশ ছেড়ে কলকাতা চলে যাবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নাকি চাকরিও হয়েছে। তিনি চেষ্টা করছেন বাড়ি বিক্রির।

এক দুপুরে গেট খোলা পেয়ে হুট করে সেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম। গাছপালার কি শান্ত-শান্ত ভাব। মনে হয় ভুল করে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছি। আনন্দে মন ভরে গেল। একা একা অনেকক্ষণ হাঁটলাম। হঠাৎ দেখি কোনার দিকের একটি গাছের নিচে পাটি পেতে একটি মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার হাতে একটা বই। সেই বই পড়ছে না— তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি আমার জীবনে এত সুন্দর মেয়ে আর দেখিনি। মনে হল তার শরীর সাদা মোমের তৈরি। পিঠভরতি ঘন কালো চুল। ষোলো-সতেরো বছর বয়স। দৈত্যের হাতে বন্দিনী রাজকন্যারাও এত সুন্দর হয় না। মেয়েটি হাত-ইশারায় ডাকল। প্রথমে ভাবলাম দৌড়ে পালিয়ে যাই। পরমুহূর্তেই সেই ভাবনা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে গেলাম।

কী নাম তোমার খোকা?

কাজল।

কি সুন্দর নাম! কাজল। তোমাকে মাখতে হয় চোখে। তা-ই না?

কিছু না-বুঝেই আমি মাথা নাড়লাম।

অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি, তুমি একা একা হাঁটছ। কী ব্যাপার?

আমি চুপ করে রইলাম।

কীজন্যে এসেছ এ বাড়িতে?

বেড়াতে।

ও আচ্ছা— বেড়াতে? তুমি তা হলে অতিথি। অতিথি নারায়ণ। তা-ই না?

আবারও না-বুঝে আমি মাথা নাড়লাম। সে বলল, তুমি এখানে চুপচাপ দাঁড়াও। নড়বে না। আমি আসছি।

মেয়েটি চলে গেল। ভেবে পেলাম না সে অনধিকার প্রবেশের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করতে গেল কি না। দাঁড়িয়ে থাকাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে? পালিয়ে যাওয়াই উচিত। অথচ পালাতে পারছি না।

মেয়েটি ফিরে এসে বলল, চোখ বন্ধ করে হাত পাতো।

আমি তা-ই করলাম। কী যেন দেয়া হল আমার হাতে। তাকিয়ে দেখি কদমফুলের মতো দেখতে একটা মিষ্টি।

www.BDeBooks.Com

খাও, মিষ্টি খাও। মিষ্টি খেয়ে চলে যাও। আমি এখন পড়াশোনা করছি। পড়াশোনার সময় কেউ হাঁটাহাঁটি করলে বড় বিরক্তি লাগে। মন বসাতে পারি না। আমি চলে এলাম এবং দ্বিতীয় দিনে আবার উপস্থিত হলাম।

আবার মেয়েটি মিষ্টি এনে দিল। কোনো সৌভাগ্যই একা একা ভোগ করা যায় না। আমি তৃতীয় দিনে আমার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, এ কে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এ আমার ছোট বোন। এ-ও মিষ্টি খুব পছন্দ করে।

মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল। সে হাসতে হাসতে বলল, খুকি, তোমার নাম কি?

আমার বোন উদ্বিগ্ন চোখে আমার দিকে তাকাল। নাম বলাটা ঠিক হবে কি সে বুঝতে পারছে না। আমি ইশারায় তাকে অভয় দিতেই সে বলল, আমার নাম শেফু।

শেফু? অর্থাৎ শেফালি। কী সুন্দর নাম! তোমরা দুজন চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

আমরা চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি। আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশি সময় লাগছে। একসময় চোখ মেললাম। মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ বিষণ্ণ। সে দুঃখিত গলায় বলল, আজ ঘরে কোনো মিষ্টি নেই। তোমাদের জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। খুব ভালো বই। বইটা নিয়ে যাও। দাঁড়াও, আমার নাম লিখে দিই।

সে মুক্তার মতো হরফে লিখল, দুজন দেবশিশুকে ভালোবাসা ও আদরে—শুক্লাদি।

বই নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বইটার নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পাতায় পাতায় ছবি।

'ক্ষীরের পুতুল' হচ্ছে আমার প্রথম-পড়া 'সাহিত্য'। সাহিত্যের প্রথম পাঠ আমি আমার বাবা-মা'র কাছ থেকে পাই নি। বাবার বিশাল লাইব্রেরি ছিল। সেই লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। সমস্ত বই তিনি তালাবদ্ধ করে রাখতেন। বাবার লাইব্রেরির বই আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নাগালের বাইরে ছিল। বাবা হয়তো ভেবেছিলেন, এসব বই পড়ার সময় এখনও হয় নি।

শুক্লাদি তা ভাবেন নি। তিনি অসাধারণ একটি বই একটি বাচ্চা-ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তার স্বপ্নজগতের দরজা খুলে দিলেন। স্বপ্নজগতের দরজা সবাই খুলতে পারে না। দরজা খুলতে সোনার চাবির দরকার। ঈশ্বর যার-তার হাতে সেই চাবি দেন না। সে চাবি থাকে অল্পকিছু মানুষের কাছে। শুক্লাদি সেই অল্পকিছু মানুষদের একজন।

শুক্লাদির সঙ্গে আমার ঐ বই পাওয়ার পর আর দেখা হয় নি। তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করতেন। ছুটি শেষ হবার পর কলকাতা চলে গেলেন। তার কিছুদিন পর প্রফেসর সাহেব বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয়া চলে গেলেন। যিনি বাড়ি কিনলেন তিনি প্রথমে গাছগুলো সব কাটিয়ে ফেললেন। বাড়িটিকে ঘিরে যে-স্বপ্ন ছিল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন।

কত-না নিঝুম দুপুরে এই শ্রীহীন বাড়ির গেটের কাছে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছি। গভীর দুঃখে আমার চোখ ভেঙে জল এসেছে।

বাসায় এসেই বসেছি ক্ষীরের পুতুল নিয়ে। এই বই নিয়ে বসলেই ভেঙে-যাওয়া স্বপ্ন ফিরে আসত। মুহূর্তে চলে যেতাম অন্য কোনো পৃথিবীতে। কি অদ্ভুত পৃথিবীই-না ছিল সেটি!

শুক্লাদির দেয়া ক্ষীরের পুতুল বইটি উনিশশো একাত্তর পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিল। একাত্তরের অনেক প্রিয় জিনিসের সঙ্গে বইটিও হারিয়েছি। কিন্তু সত্যি কি হারিয়েছি? হৃদয়ের নরম ঘরে যাদের স্থান দেয়া হয় তারা কি কখনো হারায়? কখনো হারায় না। শুক্লাদির কথা যখনই মনে হয় তখনই বলতে ইচ্ছা করে, 'জনম জনম তব তরে কাঁদিব।'

'ক্ষীরের পুতুল' বইটি আমার জীবনধারা অনেকখানি পালটে দিল। এখন আর দুপুরে ঘুরতে ভালো ভালো না। শুধু গল্পের বই পড়তে ইচ্ছে করে। কুয়োতলার লাগোয়া একটা ঘর, দুপুরের দিকে একেবারে নিরিবিলি হয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে জানালায় হেলান দিয়ে গল্পের বই নিয়ে বসি। জানালার ওপাশে কাঁঠালগাছের গুচ্ছ। সেই কাঁঠালগাছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাক ডাকে। এ ছাড়া চারদিকে কোনো শব্দ নেই। অদ্ভুত নৈঃশব্দের জগৎ। এটা যেন চেনা-জানা পৃথিবী নয়, অন্য কোনো ভুবন।

বইয়ের পাতার পর পাতা অতি দ্রুত উলটে যাচ্ছি। এসব বই পড়লে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। একদিন ধরা পড়লাম। বাবার হাতেই ধরা পড়লাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কি বই পড়ছিস? দেখি, দেখি বইটা।

তিনি বই হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বইয়ের নাম— 'প্রেমের গল্প'। তিনি থমথমে গলায় বললেন, পড়েছিস এই বই?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, হুঁ।

বুঝেছিস কিছু?

হুঁ।

কী বুঝেছিস?

কি বুঝেছি ব্যাখ্যা করতে পারলাম না। বাবা বই নিয়ে আলমিরায় তালাবন্ধ করে রাখলেন। আমি ভয়ে অস্থির। নিশ্চয় গুরুতর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সন্ধ্যাবেলা তিনি বললেন, কাপড় পরে আমার সঙ্গে চল।

আমি কোনো কথা না বলে কাপড় পরলাম। কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। তিনি রিকশা করে আমাকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে।

www.BDeBooks.Com

বইয়ের এক বিশাল সংগ্রহ। যে-দিকে চোখ যায় শুধু বই, বই আর বই। আমাকে লাইব্রেরির মেম্বার করে দিলেন। শান্ত গলায় বললেন, এখানে অনেক ছোটদের বই আছে, আগে এগুলো পড়ে শেষ কর। তারপর বড়দের বই পড়বি।

প্রথমদিনের দুটি বই নিজে পছন্দ করে দিলেন। দুটি বইয়ের একটির নাম মনে আছে— টম কাকার কুটির। কি অপূর্ব বই! এই বইটি পড়বার আনন্দময় স্মৃতির এখনও চোখে ভাসে। ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়ছে। সিলেটের বৃষ্টি— ঢালাও বর্ষণ। আমি কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসেছি। টম কাকার গল্প পড়তে পড়তে চোখে নেমেছে অশ্রুর বন্যা। সমস্ত হৃদয় জুড়ে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছি। হঠাৎ করে মহৎ সাহিত্যকর্মের মুখোমুখি হলে যা হয়, তা-ই হচ্ছে— প্রবল আবেগে চেতনা আলোড়িত হচ্ছে।

আমার বই পড়ার অভ্যাস মা খুব সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। প্রায়ই বিরক্ত হয়ে বলেন, এই ছেলে দিনরাত আউট বই পড়ে। যখন সবাই খেলাধুলা করছে সে অন্ধকারে বই নিয়ে বসেছে। চোখ নষ্ট হবে তো!

চোখ আমার সত্যি সত্যি খারাপ হল। যদিও তা বুঝতে পারলাম না। বাইরের পৃথিবী আবছা দেখি। আমার ধারণা, অন্য সবাইও তা-ই দেখে। ক্লাস ফাইভে উঠে প্রথম চশমা নিই। চোখের ডাক্তার আমার চোখ পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, এই ছেলে তো অন্ধের কাছাকাছি! এতদিন সে চালিয়েছে কিভাবে ? প্রথম চশমা পরে আমিও হতভম্ব হয়ে ভাবি— চারদিকের জগৎ এত স্পষ্ট! কি আশ্চর্য! দূরের জিনিসও তা হলে দেখা যায়!

আগের কথায় ফিরে আসি।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সদস্য হওয়ায় সবচেয়ে কষ্টে পড়ল আমার ছোট দুই বাইবোন— শেফু এবং ইকবাল। মীরাবাজার থেকে একা এতদূরে হেঁটে যেতে ভালো লাগে না। আমি এদের সঙ্গে নিয়ে যাই। পথ আর ফুরাতে চায় না। পথে দুতিন জায়গায় ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে বসি। আমার সব ক্লান্তি সব কষ্ট দূর হয়ে যায় যখন দুটি বই হাতে পাই। আনন্দে ঝলমল করতে থাকি। শেফু এবং ইকবাল আমার এই আনন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে তাদের দিনের পর দিন কষ্ট করতে হয়।

আমাকে রোজ দুটি করে বই দিতে গিয়ে একদিন লাইব্রেরিয়ানেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, এখন থেকে একটি করে বই নেবে, দুটো না। আর এসব আজেবাজে গল্পের বই পড়ে কোনো লাভ নেই। এখন থেকে পড়বে জ্ঞানের কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এসব শিখতে হবে। নাও, আজকে এই বইটা নিয়ে যাও।

আমি খুব মন-খারাপ করে বইটা হাতে নিলাম। বইয়ের নাম 'জানবার কথা'। বাসায় এনে দুতিন পাতা পড়লাম। এতটুকু আকর্ষণ করল না। পরদিন ফেরত দিতে গেছি। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক বললেন, পড়েছ ?

আমি বললাম, হুঁ।

তিনি হাত থেকে বই নিয়ে কয়েকটা পাতা উলটে বললেন, আচ্ছা বলো, গ্লেসিয়ার কি ?

আমি বলতে পারলাম না। তিনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, বাঁদর ছেলে— যাও, এই বই ভালোমতো পড়ে তারপর আসো।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আমি আর কখনো যাইনি। 'জানবার কথা' বইটিও ফেরত দেয়া হয় নি। বাসায় ফিরে 'জানবার কথা' কুটিকুটি করলাম, কিছুক্ষণ কাঁদলাম। আমি প্রচণ্ড অভিমানী হয়ে জন্মেছি। অভিমান নামক ব্যাপারটি কম নিয়ে জন্মানো ভালো। এই জিনিসটি আমাদের বড়ই কষ্ট দেয়।

বই পড়ার আগ্রহে সাময়িক ভাটা দেখা দিল। আগের জগতে ফিরে গেলাম— ঘুরে বেড়ানো। ইতোমধ্যে চুরিবিদ্যা খানিকটা রপ্ত হয়েছে। লক্ষ্য করেছি, মা ভাংতি পয়সা রাখেন তোশকের নিচে। সিকি, আধুলি, আনি-দুআনি— ঠিক কত আছে, সেই হিসেব তাঁর নেই। ভাংতি পয়সার মধ্যে সবচে ছোট হচ্ছে— সিকি। একবার একটা সিকি সরিয়ে সমস্ত দিন আতঙ্কে নীল হয়ে রইলাম। সারাক্ষণ মনে হল, এই বোধহয় মা বলবেন, সিকি কে নিয়েছে ? মা তেমন কিছু করলেন না। পরদিন সেই সিকি নিয়ে এবং সঙ্গে ছোট বোনকে চা খায়, আমরাও তেমনি খাব। দোকানদার নিশ্চয়ই দুই ক্ষুদে কাস্টমার পেয়ে বিস্মিত হয়েছিল। সে যত্ন করে আমাদের দুজনকে গ্লাসে করে দুকাপ চা দিল। একটা পরোটা ছিঁড়ে দুভাগ করে দুজনের হাতে দিল এবং কোনো পয়সা রাখল না। হাতের সিকি হাতেই রয়ে গেল। অতঃপর দুজনে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম। কোনো গন্তব্য নেই— যতদূর রিকশা যায়। তখন রিকশাভাড়া ছিল বাঁধা। শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা যাওয়া যেত এক সিকিতে। রিকশাওয়ালা আমাদের জল্লারপাড়ের কাছে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে মহানন্দে হেঁটে বাসায় ফিরলাম। মনে হল, চুরিবিদ্যা খুব খারাপ কিছু নয়।

মা'র তোশকের নিচ থেকে প্রায়ই পয়সা উধাও হতে লাগল। একদিন কাজের ছেলে রফিক চুরির জন্যে প্রচণ্ড বকা খেল। তোশকের নিচে পয়সা রাখাও বন্ধ হয়ে গেল। বড় কষ্টে পড়লাম। এখন একমাত্র ভরসা দেশের বাড়ি থেকে বেড়াতে আসা মেহমানরা।

আমাদের বাসায় মেহমান লেগেই থাকত। দাদার বাড়ির দিকের মেহমান, মা'র বাড়ির দিকের মেহমান। কেউ আসত শহর দেখতে, কেউ শাহজালাল সাহেবের মাজার দেখতে, কেউবা চিকিৎসা করাতে। মেহমানরা দয়াপরবশ হয়ে এক আনা বা দুপয়সা বাড়িয়ে দিতেন— পৃথিবীটাকে বড়ই সুন্দর মনে হত। ছুটে যেতাম দোকানে। কত অপূর্ব সব খাবার— হজমি! দুপয়সায় অনেকখানি পাওয়া যেত, টক টক ঝাঁঝালো স্বাদ। খানিকটা মুখে দিলেই জিভ কালো কুচকুচে হয়ে যেত। এক আনায় পাওয়া যেত দুগোল্লা সরষে তেল মাখানো বিচি-ছড়ানো তেঁতুল। বাদামভাজা আছে, বুটভাজা আছে। যদুমিয়ার দোকানে পাওয়া যেত দুধ-চকলেট। এক আনায় চারটা, তবে আমার জন্যে একটা ফাউ— পাঁচটা।

www.BDeBooks.Com

মিষ্টি পানের একটা দোকান বানিয়েছিল, তার সামনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই দোকানি ছোট একটা পান বানিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলত, ভাগ। কি সুস্বাদু ছিল সেই মিষ্টি পান!

গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম দেশের বাড়ির মেহমানদের জন্যে। মেহমান আসা মানেই আনন্দ। শহর দেখানোর জন্যে আমি চমৎকার গাইড। একদিন-না-একদিন তাঁরা রঙমহল সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাবেন। আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। আমাকে নেয়ার ব্যাপারে তাঁরা তেমন আপত্তি করবেন না। কারণ আমার জন্যে আলাদা করে টিকিট করতে হবে না। আমি ছবি দেখব কোলে বসে, কিংবা দাঁড়িয়ে। বাড়িতে মেহমান থাকার আরেকটি বড় সুবিধা হচ্ছে সেই সময় মা'র শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যেত। বড় ধরনের অপরাধেও মা কঠিন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার শাস্তি ছাড়া অন্য শাস্তি দিতেন না।

মেহমানদের মধ্যে একজনের কথা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি মায়ের দিকের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। ভাটিঅঞ্চলের মানুষ। খুনের দায়ে হাজতে আছেন। জামিনে ছাড়া পেয়ে কয়েকদিন থাকতে এলেন আমাদের এখানে। অসম্ভব রকমের রুগ্ন একজন মানুষ। যক্ষ্মা নামের কালব্যাধিতে ধরেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। কাশির সঙ্গে টাটকা রক্ত পড়ছে।

তিনি বাসায় এসেই মাকে ডেকে বললেন, রাজরোগে ধরেছে গো মা। এই ব্যাধি ছোঁয়াচে। তোমার ছেলেপুলের সংসার। ভেবেচিন্তে বলো, আমাকে রাখবে? তিন-চার দিন থাকতে হবে। হোটেলে থাকতে পারি, কিন্তু হোটেলে থাকতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ভেবেচিন্তে বলো।

মা বললেন, আপনি অবশ্যই আমার এখানে থাকবেন।

খুব ভালো কথা। তা-ই থাকব। বেশিদিন বাঁচব না। যে-কয়টা দিন আছি পরিচিত মানুষদের মধ্যে থাকতে চাই। তবে মা আমি যে থাকব, আমার কিছু শর্ত আছে।

কী শর্ত?

নিজের মতো বাজার-সদাই করব। এর জন্যে মনে কষ্ট নিও না। আমার অনেক জিনিসের অভাব আছে, টাকাপয়সার অভাব নাই। কি মা, রাজি?

মাকে রাজি হতে হল। আমরা পরম বিস্ময়ে দেখলাম— মাত্র চারদিন যে লোকটি থাকবে তার জন্যে বস্তাভরতি পোলায়ের চাল আসছে, টিনভরতি ঘি, চিনি। দুপুরে প্রকাণ্ড একটা চিতলমাছ চলে এল, ঝাঁকাভরতি মুরগি।

তিনি নিজে এতসব খাবার-দাবারের কিছুই খেলেন না। মাকে বললেন, আমাকে তিন চামুচ আলোচালের ভাত আর এক চামুচ ঘি দিও। এর বেশি আমি কিছু খেতে পারি না। আল্লাহ আমার রিজিক তুলে নিয়েছেন।

শৈশবে যে অল্পকিছু মানুষ আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল উনি ছিলেন তাদের একজন। ভাটিঅঞ্চলের জমিদারবংশের মানুষ। এঁদের অত্যাচারে

অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় মানুষ একযোগে এঁদের বসতবাড়ি আক্রমণ করে। এঁরা তখন আত্মরক্ষার জন্যে কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে বন্দুক নিয়ে দোতলা থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকেন। পঞ্চাশের মতো মানুষ আহত হয়, মারা যায় ছ'জন। জমিদারবাড়ির সকল পুরুষের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ আসামি হিসেবে সবাইকে বেঁধে নিয়ে আসে। যক্ষ্মারোগের আক্রান্ত যে মানুষটির কথা বলছি তিনিও আসামিদেরই একজন। পুলিশ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিতে বলেছেন— বাড়ি যখন আক্রান্ত হয় তখন আমিই বন্দুক নিয়ে বের হই। আমি একাই গুলি করি— হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দায়দায়িত্ব আমার। শাস্তি হলে আমার শাস্তি হবে। অন্য কারও নয়।

মজার ব্যাপার হল, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনোই যোগ ছিল না। এই ধরনের স্বীকারোক্তি তিনি করেছেন অন্যদের বাঁচাবার জন্যে। তাঁর যুক্তি হল— আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমি তো দুদিন পর এম্নিতেই মারা যাচ্ছি। ফাঁসিতেই না হয় মরলাম। অন্যরা রক্ষা পাক। তা ছাড়া বাকি সবারই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে। আমি চিরকুমার মানুষ, আমি বেঁচে থাকলেই কি, মরলেই কী ?

যক্ষ্মা রুগির চোখ এম্নিতে উজ্জ্বল হয়। ওঁর চোখ আমার কাছে মনে হল ঝিকমিক করে জ্বলে। সারাক্ষণ ধবধবে সাদা বিছানায়, সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে মূর্তির মতো বসে থাকেন। আমি বড়ই বিস্ময় অনুভব করি। একদিন হাত-ইশারা করে আমাকে ডাকলেন, আমি এগিয়ে যেতেই তীব্র গলায় বললেন, তুই সবসময় আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করিস কেন ? খবরদার, আর আসবি না। ছোট পুলাপান আমি পছন্দ করি না।

আহত ও অপমানিত হয়ে তাঁর ঘর থেকে আমি বের হয়ে আসি, কিন্তু তাঁর প্রতি যে গভীর ভালোবাসা লালন করি তার হেরফের হয়নি। মামলা চলাকালে জেল-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার মনে আছে, তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আমি বালিশে মুখ গুঁজে দীর্ঘ সময় কাঁদি।

সাহিত্য বাসর

বাবার অসংখ্য বাতিকের একটি হল— সাহিত্য-বাতিক। মাসে অন্তত দুবার বাসায় 'সাহিত্য বাসর' নামে কি যেন হত। কি যেন হত বলছি এই কারণে যে, আমরা ছোটরা জানতাম না কী হত। আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সাহিত্য চলাকালীন আমরা হৈ চৈ করতে পারতাম না, উঁচু গলায় কথা বলতে পারতাম না, শব্দ করে হাসতেও পারতাম না। এর থেকে ধারণা হত, বসার ঘরে তাঁরা যা করছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে একদিন খানিকটা শুনলাম। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হল। একজন খুব গম্ভীর মুখে একটা কবিতা পড়ল। অন্যরা তার চেয়েও গম্ভীর মুখে শুনল। তারপর কেউ বলল, ভালো হয়েছে, কেউ

www.BDeBooks.Com

বলল মন্দ, এই নিয়ে তর্ক বেধে গেল। নিতান্তই ছেলেমানুষি ব্যাপার। একদিন একজনকে দেখলাম রাগ করে তার লেখা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অমনি দুজন ছুটে গেল তাকে ধরে আনতে। ধরে আনা হল। বয়স্ক একজন মানুষ অথচ হাউমাউ করে কাঁদছে। কি অদ্ভুত কাণ্ড! কাণ্ড এখানে শেষ না। ছিঁড়ে কুচিকুচি করা কাগজ এরপর আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হতে লাগল। সেই লেখা পড়া হল, সবাই বলল, অসাধারণ। এই হচ্ছে বাবার প্রাণপ্রিয় সাহিত্য বাসর।

সারাটা জীবন তিনি সাহিত্য সাহিত্য করে গেলেন। কতবার যে তিনি ঘোষণা করেছেন, এবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ করবেন! চাকরি এবং সাহিত্য দুটো একসঙ্গে হয় না।

ট্রাংকে বোঝাই ছিল তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ। থরেথরে সাজানো। বাবার সাহিত্যপ্রেমের স্বীকৃতি হিসেবে আমাদের বসার ঘরে বড় একটা বাঁধানো সার্টিফিকেট ঝোলানো, যাতে লেখা— 'ফয়জুর রহমান আহমেদকে সাহিত্য সুধাকর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।'

এই উপাধি তাঁকে কারা দিয়েছে, কেন দিয়েছে কিছুই এখন মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে বাঁধানো সার্টিফিকেটটির প্রতি বাবার মমতার অন্ত ছিল না। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিফলকে আমি এই উপাধি এবং শোকগাথায় রবীন্দ্রনাথের দুলাইন কবিতা ব্যবহার করি।

দূরদূরান্ত থেকে কবি-সাহিত্যিকদের হঠাৎ আমাদের বাসায় উপস্থিত হওয়া ছিল আরেক ধরনের ঘটনা। বাবা এঁদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনাতেন না। তাঁর সামর্থ্য ছিল না, তিনি যা করতেন তা হচ্ছে মনিঅর্ডার করে তাঁদের নামে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পাঠিয়ে কুপনে লিখতেন—

জনাব,

আপনার... কবিতাটি... পত্রিকার... সংখ্যায় পড়িয়া মনে বড় তৃপ্তি পাইয়াছি। উপহার হিসেবে আপনাকে সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম। উক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

ইতি প্রতিভামুগ্ধ—

ফয়জুর রহমান আহমেদ

(সাহিত্য সুধাকার)

ঐ কবি নিশ্চয়ই তাঁর কাব্যের জন্যে নানান প্রশংসাবাক্য শুনেছেন, কিন্তু মনিঅর্ডারের টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা না ঘটারই কথা। প্রায় সময়ই দেখা যেত, আবেগে অভিভূত হয়ে যশোহর বা ফরিদপুরের কোনো কবি বাসায় উপস্থিত হয়েছেন।

এমনিভাবে উপস্থিত হলেন কবি রওশন ইজদানী। পরবর্তীকালে তিনি খাতেমুন নবীউন গ্রন্থ লিখে আদমজী পুরস্কার পান। যখনকার কথা বলছি তখন তাঁর কবিখ্যাতি তেমন ছিল না।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, লুঙ্গি-পরা ছাতা-হাতে এক লোক রিকশা থেকে নেমে ভাড়া নিয়ে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিয়েছেন। জানলাম, ইনি বিখ্যাত কবি রওশন ইজদানী। আমাদের বলে দেয়া হল যেন হৈচৈ না করি, চিৎকার না করি। ঘরে একজন কবি বাস করছেন। কবিতা লেখার মুডে থাকলে সেই মুডের ক্ষতি হবে।

দেখা গেল, কবি সারা গায়ে সরিষার তেল মেখে রোদে গা মেলে পড়ে রইলেন। আমাকে ডেকে বললেন— এই, মাথা থেকে পাকা চুল তুলে দে।

কবি-সাহিত্যিকরা আলাদা জগতে বাস করেন, মানুষ হিসেবে তাঁরা অন্যরকম বলে যে প্রচলিত ধারণা আছে কবি রওশন ইজদানীকে দেখে আমার মনে হল ঐ ধারণা ঠিক না। তাঁরা আর দশটা মানুষের মতোই, আলাদা কিছু না।

আমার আদর-যত্নে, খুব সম্ভব পাকা চুল তোলার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমাকে একদিন ডেকে বললেন, খাতা-কলম নিয়ে আয়, তোকে কবিতা লেখা শিখিয়ে দিই।

আমি কঠিন গলায় বললাম, আমি কবিতা লেখা শিখতে চাই না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাহলে কি শিখতে চাস?

কিছুই শিখতে চাই না।

আসলেই তা-ই। শৈশবে কারও কাছ থেকে আমি কিছুই শিখতে চাইনি। এখনও চাই না। অথচ আশ্চর্য, আমার চারপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা ক্রমাগত আমাকে শেখাতে চান। অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ভাষা এবং বাংলা বানোনের শিক্ষকরা আমার চারপাশে আছেন। পণ্ডিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী সবাই আমার শিক্ষক। সবাই আমাকে শেখাতে চান। হয়তো ভালোবাসা থেকেই চান, কিন্তু আমার কিছুই শিখতে ইচ্ছা করে না। জানতে ইচ্ছা করে না। 'জানবার কথা' নামের একটি বই শৈশবেই ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেলেছিলাম এই কারণেই।

পদ্মপাতার জল

আমাদের পাশের বাসায় থাকত নাদু দিলুরা।

তারাও আমাদেরই মতোই অল্পআয়ের বাবা-মা'র পুত্রকন্যা। সবাই একসঙ্গে ধুলোমাটিতে গড়াগড়ি করে বড় হচ্ছি। ওমা একদিন শুনি, ওরা বড়লোক হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে ওদের কাপড়চোপড় পালটে গেল। কথাবার্তার ধরন-ধারণও বদলে গেল। এখন আর ওরা দাঁড়িয়াবান্দা কিংবা চি-বুড়ি খেলার জন্যে আমাদের কাছে আসে না।

ঈদ উপলক্ষে ওরা নতুন কাপড় তো পেলই সেইসঙ্গে পেল ট্রাই সাইকেল। ট্রাই সাইকেলটি শিশুমহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করল। আমিও এর আগে এই জিনিস দেখিনি। কি চমৎকার ছোট্ট একটা রিকশা! এর মধ্যে আবার বেলও আছে। টুং

www.BDeBooks.Com

টুং করে বাজে। এই বিস্ময়কর বাহনটিতে একবার শুধু চড়তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্যের জন্যে আমি তখন আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। চেষ্টা করে বিফল হলাম। সবসময় নাদু দিলুর সঙ্গে একজন কাজের মেয়ে থাকে। আমি কাছে গেলেই সে খ্যাঁক করে ওঠে। হাত দিয়ে একটু দেখার অনুমতি চাইলাম, সেই অনুমতিও পাওয়া গেল না। আমরা শিশুরা সমস্ত কাজকর্ম ভুলে ট্রাই সাইকেল কেনার কথা বাবাকে কি বলা যায়? মনে হল সেটা ঠিক হবে না। বাবার তখন চরম আর্থিক সমস্যা যাচ্ছে। তাঁর সবচে আদরের ছোট বোন অসুস্থ। সেই বোনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর বহন করতে হচ্ছে। ঈদে আমরা ভাইবোনেরা কোনো কাপড়চোপড় পাইনি। শেষ মুহূর্তে বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে তিনটি প্লাস্টিকের চশমা কিনে দিলেন, যা চোখে দিলে আশেপাশের জগৎ নীলবর্ণ ধারণ করে। কাপড় না পাওয়ার দুঃখ রঙিন চশমায় ভুললাম। তারচেও বড় কথা, দিলু এই চশমার বিনিময়ে আমাকে তার ট্রাই সাইকেল খানিকটা স্পর্শ করার দুর্লভ সুযোগ দিল। সে বড়ই আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

যতই দিন যেতে লাগল রমরমা সমসমা বাড়তেই লাগল। শুনলাম, তাদের জন্যে বিশাল দুতলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়ি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনোরকম কষ্টেসৃষ্টে এখানেই থাকবে। এর মধ্যে এই দুই ভাইবোনের জন্মদিন হল। জন্মদিন বলে যে একটা ব্যাপার আছে আমার তা জানা ছিল না। এই দিনে উৎসব হয়। খানাদানা হয়— উপহার নিয়ে লোকজন আসে কে জানত! আমরা অভিভূত।

শেফু একদিন বাবাকে গিয়ে বলল, আমার জন্মদিন করতে হবে।

বাবা খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে মা, করা হবে। কিন্তু শুধুই একবার। এই উৎসব আমি দ্বিতীয়বার করব না। তোমরা বড় হবার চেষ্টা করো। অনেক বড়, যাতে সারা দেশের মানুষ তোমাদের জন্মদিনের উৎসব করে। বাবা-মা'র করতে না হয়।

শেফু বলল সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে বড় হবার।

আমি দেখলাম সুযোগ ফসকে যাচ্ছে। শুধু শেফুর জন্মদিন হবে আমার হবে না, এ কেমন কথা! আমি গম্ভীর গলায় বললাম, বাবা, আমিও খুব বড় হবার চেষ্টা করব। আমারও জন্মদিন করতে হবে। বাবা বললেন, আচ্ছা তোমারও হবে।

শুধু ইকবাল ঘোষণা করল সে বড় হতে চায় না। ছোট থাকতে চায়। তার জন্মদিন লাগবে না।

আমরা গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নভেম্বরের ৯ তারিখ শেফুর জন্মদিন। দেখতে দেখতে ৯ তারিখ এসে পড়ল। আমরা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই উপলক্ষে কাউকে বলা হল না। বাবা বললেন, আমরা নিজেরা নিজেরা উৎসব করব। কাউকে বলব না।

পায়েস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য তৈরি হল না। আমাদের মন ভেঙে গেল। সন্ধ্যার পর জন্মদিনের উৎসব শুরু হল। বাবা 'বীরপুরুষ' কবিতা আবৃত্তি করলেন। প্রাণেশ কাকু তিনটা গান গাইলেন। পায়েশ খাওয়া হল। তারপর

বাবা ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়ে শেফুর হাতে একটা উপহারের প্যাকেট তুলে দিলেন। সেই উপহার দেখে আমাদের সবার বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার দরিদ্র বাবা খুবই দামি উপহার কিনেছেন। চীনেমাটির চমৎকার খেলনা 'টি সেট', যা দেখলে একালের শিশুদেরও চোখ কপালে উঠে যাবার কথা।

বাবা বললেন, পছন্দ হয়েছে মা ?

শেফু কাঁদতে কাঁদতে বলল, এত সুন্দর জিনিস সে তার জীবনে দেখেনি। আনন্দে সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। বারবার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দেখে আসে টি সেট ঠিকঠাক আছে কি না। সেই রাতে আমি নিজেও উদ্বেগে ঘুমাতে পারলাম না। আর মাত্র তিন দিন পর আমার জন্মদিন। না জানি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে! গোপনসূত্রে খবর পেলাম, আমার জন্যে দশগুণ ভালো উপহার অপেক্ষা করছে। খবর দিলেন মা। মা'র খবর খুবই নির্ভরযোগ্য।

জন্মদিন এসে গেল। গান, কবিতা আবৃত্তির পালা শেষ হবার পর আমার হাতে উপহারের প্যাকেট তুলে দেয়া হল। প্যাকেট খুলে দেখি একটা বাঁধানো ফ্রেমে দীর্ঘ একটি কবিতা। বাবা ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটি কবিতা লিখে ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছেন। কবিতার প্রথম দুটি চরণ—

সাতটি বছর গেল পরপর আজিকে পরেছো আটে,
তব জন্মদিন নয়ত মলিন ভয়াল বিশ্বহাটে...

বাবা খুবই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, উপহার পছন্দ হয়েছে ? অনেক কষ্টে কান্না চাপা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে পছন্দ হয় নাই।

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা খানিকক্ষণ শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এই উপহার এখন তোর কাছে সামান্য মনে হচ্ছে। এমন একদিন আসবে যখন আর সামান্য মনে হবে না।

বাবা কবি ছিলেন না। হৃদয়ের তীব্র আবেগ-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে তিনি কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অতি আদরের ছোট বোনের মৃত্যুর খবর পাবার পর তিনি কাঁদতে কাঁদতে কবিতা লিখতে বসেছেন। চোখের জলে লেখা দীর্ঘ কবিতা হয়তো শুদ্ধতম কবিতা হয় নি। কিন্তু যে আবেগের তাড়নায় কলম হাতে নিয়েছিলেন সেই আবেগে কোনো খাদ ছিল না। বাবার কাছ থেকে প্রথম শিখলাম, মনে তীব্র ব্যথা কমানোর একটি উপায় হচ্ছে কিছু লেখা, যে লেখা ব্যক্তিগত দুঃখকে ছড়িয়ে দেয় চারদিকে।

বাবা হচ্ছেন আমার দেখা প্রথম কবি।

আমার দেখা দ্বিতীয় কবি হচ্ছেন আমাদের বড়মামা ফজলুল করিম। তিনিও আমাদের বাসায় থাকতেন এবং এম. বি. কলেজে আই. এ. পড়তেন। আমার মেজো চাচা যেমন প্রতি বছর পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতেন, বড়মামা ফেল

www.BDeBooks.Com

করতেন পরীক্ষা না দিয়ে। পরীক্ষা না দেবার চমৎকার সব যুক্তি বের করতেন। এসব যুক্তিতে অতি সহজেই মা'কে কাবু করে ফেলতেন।

পরীক্ষার আগের দিন মুখ গম্ভীর করে বলতেন, বুবু, এ বছরও পরীক্ষা দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কেন ? এই বছর আবার কী হল ?

গত বছর পাশের হার বেশি ছিল, কাজেই এই বছর কম হবে। পরীক্ষা দিলে ফেল করতে হবে। আগামী বছর চেষ্টা চালাব ইনশাল্লাহ্।

এই বছর পরীক্ষাটা দে, পাস-ফেল পরের ব্যাপার।

আরে না! পরীক্ষা দিয়ে এনার্জি লস করার কোনো মানে হয় না।

বলাই বাহুল্য, পরের বছর তিনি পরীক্ষা দেন না। কারণ রুটিন খুব খারাপ হয়েছে। গ্যাপ কম। তবুও দিতেন, কিন্তু এনার্জি লসের ভয়ে দিচ্ছেন না। বড়মামা, সব এনার্জি জমা করে রাখলেন এবং শুভক্ষণে পুরো এনার্জি নিয়ে জনৈকা তরুণীয় প্রেমে পড়ে গেলেন। প্রেমের আবেগে কবিতার পর কবিতা বের হতে লাগল। আমার উপর দায়িত্ব পড়ল এসব কবিতা যথাস্থানে পৌঁছে দেবার। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগলাম।

তরুণীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় প্রেমে ভাটার টান ধরল। গোটা পঞ্চাশেক বিরহের কবিতা লিখে বড়মামা হৃদয়যাতনা কমালেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বড়মামার সেসব কবিতা কিন্তু বেশ ভালো ছিল বলে আমার ধারণা। তিনি এসব কবিতা প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনোরকম আগ্রহ দেখাননি কিংবা পরবর্তী সময়ে কবিতা লেখার চেষ্টাও করেননি। তাঁর ভাবটা এরকম, এসব কবিতা তিনি শুধু দুজনের জন্যেই লিখেছেন— তৃতীয় কারওর জন্যে নয়।

আমি নিজে নানাভাবে বড়মামার কাছে ঋণী। গল্প বলে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর এই ক্ষমতা আমাকে বারবার বিস্মিত করত। একটা গল্প যখন বড়মামার কাছে শুনতাম, তখন অন্যরকম হয়ে যেত। এর কারণ বুঝতে পারতাম না, তবে কারণ নিয়ে ভাবতাম এটা মনে আছে। জীবনের প্রথম ছবি আঁকা তাঁর কাছ থেকেই শিখি। তিনি হাতি আঁকার চমৎকার একটা সহজ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। এই কৌশলে আমি তিন হাজারের মতো হাতি এক মাসের মধ্যে এঁকে ফেলি। বাড়ির সাদা দেয়াল পেনসিলে আঁকা হাতিতে হাতিময় হয়ে যায়।

তাঁর একটা সাইকেল ছিল। সারাদিন করে ঘুরতেন। মাঝে মাঝে আমাকে পেছনে বসিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সাইকেল চলত ঝড়ের গতিতে। এই সাইকেল বড়মামার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে একদিন মোটর সাইকেল হয়ে গেল। যখনই সাইকেল চলে ভটভট শব্দ হয়। লোকজন অবাক হয়ে তাকায়। দেখতে সাইকেল অথচ শব্দ হচ্ছে মোটরসাইকেলের, ব্যাপারটা কী ? ব্যাপার কিছুই না, দুটুকরা শক্ত পিসবোর্ড সাইকেলের সঙ্গে এমনভাবে লাগানো যে চাকা ঘোরামাত্র

স্পোকের সঙ্গে পিসবোর্ডের ধাক্কা লেগে ভটভট শব্দ হয়। শিশুরা প্রতিভার সবচেয়ে বড় সমঝদার। আমরা বড়মামার প্রতিভার দীপ্তি দেখে বিস্মিত। আমাদের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করল যখন তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক শুরু করলেন। হাঙ্গার স্ট্রাইকের কারণ মনে নেই, শুধু মনে আছে দরজার গায়ে বড় বড় করে লেখা— "আমরণ অনশন। নীরবতা কাম্য।" তিনি একটা খাটে শবাসনের ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। বাবা পুরো ব্যাপারটায় মজা পেয়ে খুব হাসাহাসি করছেন। বড়মামা তাতে মোটেই বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙানোর কোনো উদ্‌যোগ নেয়া হল না। একদিন কাটল, দুদিন কাটল, তৃতীয় দিনও পর হল। তখন সবার টনক নড়ল। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। বাড়িতে টেলিগ্রাম গেল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় বড়মামা এক গ্লাস শরবত খেয়ে অনশন ভঙ্গ করলেন এবং গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন— এদেশে থাকবেন না। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এদেশে থাকা সম্ভব নয়। তিনি বিলেত যাবেন।

তখন বিলেত যাওয়া খুব সহজ ছিল। দলেদলে সিলেটিরা বিলেত যাচ্ছে। মামারও পাসপোর্ট হয়ে গেল। তিনটি নতুন স্যুট বানানো হল। মামা স্যুট পরে ঘোরাফেরা করেন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখি। কাঁটাচামচ দিয়ে ভাত-মাছ খান। দেখতে বড় ভালো লাগে।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যাওয়া হল না। মামা বললেন— আরে দূর দূর, দেশের উপর জিনিস নাই। বিদেশ গিয়ে আমি ঘাস কাটব নাকি? আমি ভালোই আছি। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি তা হলে যাচ্ছ না?

জ্বি না।

কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

আই. এ. পরীক্ষা দেব। এইবার উড়া-উড়া শুনেছি ম্যাক্সিমাম পাস করবে। পরীক্ষা অবশ্য দিলেন না, কারণ পরীক্ষার আগে আগে খবর পেলেন, এইবার কোশ্চেন খুব টাফ হবে। গতবার ইজি হয়েছিল, এইবার টাফ। টাফ কোশ্চেনে পরীক্ষা দেয়ার কোনো মানে হয় না।

তিনি একটা ক্যারামবোর্ডে কিনে ফেললেন। মামা এবং চাচা দুজনে মিলে গভীর রাত পর্যন্ত টুকুস টুকুস করে ক্যারাম খেলেন। বড় সুখের জীবন তাঁদের।

আমার জীবনও সুখের, কারণ বাসার প্রধান শাসক বাবা অনুপস্থিত। তিনি প্রমোশন পেয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়েছেন। তাঁকে বদলি করা হয়েছে দিনাজপুরের জগদলে। সেই সময় বর্ডার রক্ষার দায়িত্ব ছিল পুলিশের উপর। বাবা চলে গেলেন বর্ডারে। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা। কারো কিছু বলার নেই।

সেই সময় দেশে বড় ধরনের খাদ্যাভাব দেখা দিল। ভয়াবহ অবস্থা। হাজার হাজার মানুষ খাবারের সন্ধানে শহরে জড়ো হয়েছে। থালা-হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।

www.BDeBooks.Com

সিলেট শহরে অনেকগুলো লঙ্গরখানা খোলা হল। লঙ্গরখানায় বিরাট ডেকচিতে খিচুড়ি রান্না করা হয়। ক্ষুধার্ত মানুষদের একবেলা খিচুড়ি খাওয়ানো হয়।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের খাওয়া দেখি। কলার পাতা কেটে লাইন ধরে সবাই বসে। প্রত্যেকের পাতায় দুহাতা করে খিচুড়ি দেয়া হয়। কত আনন্দে, কত আগ্রহ নিয়েই-না তারা সেই খিচুড়ি খায়! ওদের আনন্দে ভাগ বসানোর জন্যই হয়তোবা এক দুপুরে কলার পাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে খেতে বসে গেলাম। সেই খিচুড়ি অমৃতের মতো লাগল। এরপর থেকে রোজই দুপুরবেলায় লঙ্গর খানায় খেতে যাই। একদিন বোনকেও নিয়ে গেলাম। সেও মহানন্দে কলার পাতা নিয়ে আমার সঙ্গে বসে গেল। খাওয়ার মাঝামাঝি পর্যায়ে এক ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে আমাদের দু-ভাইবোনের সামনে এসে দাঁড়ালেন। কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বলেন, এরা কারা ?

ধরা পড়ে গেলাম। কানে ধরে আমাদের দুজনকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হল। আমার মা ক্রমাগত কাঁদতে লাগলেন। লঙ্গরখানায় খাওয়ার অপমানে তাঁর নাকি মাথা কাটা যাচ্ছে। লঙ্গরখানায় আমি পাতা পেতে খেয়েছি এতে লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করার কি আছে তা আমি ঐদিন বুঝতে পারিনি। আজও পারি না।

নিঃসন্তান গনি চাচার জীবনে এই সময় একটি বড় ঘটনা ঘটল। এক ভিখিরি-মা ছেলে কোলে নিয়ে এসেছে ভিক্ষা করতে। ফুটফুটে ছেলে। গনি চাচার ছেলেটাকে বড়ই পছন্দ হল। তিনি প্রস্তাব দিলেন ছেলেটাকে তিনি আদর-যত্নে বড় করবেন, তার বিনিময়ে ভিখিরি-মা দশ টাকা পাবে। কিন্তু কোনোদিন এই ছেলেকে তার ছেলে বলে দাবি করতে পারবে না। মা রাজি হয়ে গেল।

এই ঘটনা আমার মনে বড় ধরনের ছাপ ফেলে।

এখনও চোখের সামনে স্পষ্ট দেখি, ভিখিরি-মা মুখ কালো করে ঘরের বারান্দাতে বসে আছে। গনি চাচার স্ত্রী তার ছেলে-কোলে বারান্দায় এসে ধমকাচ্ছেন— কি চাও তুমি ? তোমাকে না বলেছি, কখনো আসবে না! কেন এসেছ ?

ব্যথিত মা করুণচোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে উঠে চলে যাচ্ছে।

ভিখিরিণীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে গনি চাচা কয়েকবার বাড়ি বদল করলেন। কোনো লাভ হল না। যেখানেই যান সেখানেই মা উপস্থিত হয় সারাদিন বারান্দায় বসে থাকে।

শেষটায় গনি চাচা চেষ্টা-চরিত্র করে সিলেট থেকে বদলি হয়ে গেলেন। মৌলভীবাজার। হতদরিদ্র মা'র হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন একটি শিশু। আমার তখন বয়স অল্প, খুবই অল্প। পৃথিবীর জটিলতা বোঝার বয়স নয়, তবুও মনে হল— এটা অন্যায়। খুব বড় ধরনের অন্যায়। ঐ ভিখিরিণী-মা'র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হত। আমি তার পেছনে পেছনে হাঁটতাম। বিড়বিড় করে সে নিজের মনে কথা বলত। নিজের দুপাশে থুথু ফেলতে ফেলতে এগুত। হয়তো

তার মাথা-খারাপ হয়েছিল। একজন ভিখিরিণীর মাথা-খারাপ হওয়া এমন কোনো বড় ঘটনা নয়। জগৎ সংসারের তাতে কিছুই যায় আসে না। পৃথিবী চলে তার নিজস্ব নিয়মে। সেসব নিয়ম জানার জন্য এক ধরনের ব্যাকুলতা আমার মধ্যে হয়তো তৈরি হয়েছিল। অনেক ধরনের প্রশ্ন মনে আসত। কাউকে করতে পারতাম না। প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের মনেই খুঁজতে হত।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়— এই প্রশ্নটা একদিন মনে এল। ভালো মানুষেরা বেহেশতে, খারাপ মানুষেরা দোজখে— এ সহজ উত্তর মনে ধরল না। মনে হল— উত্তর এত সহজ নয়। মৃত্যু-সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নটি মনে আসার কারণ আছে। কারণটা বলি।

একদিন সিলেট সরকারি হাসপাতালের সামনে দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি নর্দমায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। লোকজন ভিড় করে দেখছে। কৌতূহল মিটে গেলে চলে যাচ্ছে। আমিও দেখতে লাগলাম। মৃতদেহ দেখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কারণ মৃত মানুষটির ঠোঁট হাসি। তার চোখ বন্ধ, কিন্তু হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে আছে। দেখেই মনে হয় কোনো একটা মজার ঘটনায় চোখ বন্ধ করে সে হাসছে। আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগল।

দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

মৃতদেহটির হাসিহাসি-মুখের ছবি নিজের মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারলাম না। বিকেলে আবার দেখতে গেলাম। মৃতদেহ আগের জায়গাতেই আছে। তার মুখের হাসিরও কোনো হেরফের হয় নি।

পরদিন আবার গেলাম। লাশ সরানো হয় নি। তবে মুখের হাসি আর চোখের পড়ল না। অসংখ্য লাল পিঁপড়ায় সারা শরীর ঢাকা। লোকটির গায়ে যেন লাল রঙের একটা চাদর। খুব ইচ্ছা করল চাদর সরিয়ে তার মুখটি আরেকবার দেখি। দেখি, এখনও কি সেই মুখে হাসি লেগে আছে?

আমি বাসায় ফিরলাম কাঁদতে কাঁদতে। বাসায় ফিরেই শুনি, বাবার চিঠি এসেছে— আমরা সিলেটে আর থাকব না। চলে যাব দিনাজপুর, জায়গাটার নাম জগদল। মৃত মানুষটির কথা আর মনে রইল না। আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

"মৃত লোকটির কথা আর মনে রইল না" —বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। মনে ঠিকই রইল, তবে চাপা পড়ে গেল। একমাত্র শিশুরাই পারে সব ঘটনা সহজ ভঙ্গিতে গ্রহণ করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে। তারা একটি স্মৃতি থেকে অতি দ্রুত চলে যেতে পারে অন্য স্মৃতিতে। সব আলাদা আলাদা রাখা। ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। মাঝে মাঝে ঢাকনার মুখ তুলে দেখে নেয় সব ঠিকঠাক আছে কি না। কোনোকিছুই সে নষ্ট করতে বা ফেলে দিতে রাজি না।

কষ্টকর স্মৃতি মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা আমি শুধু বড়দের মধ্যেই দেখি। শিশুদের মধ্যে দেখি না।

www.BDeBooks.Com

আমার বন্ধু উনু

উনুর সঙ্গে আমার পরিচয় ফুটবল খেলার মাঠে। রোগা টিঙটিঙে একটা ছেলে—বড় বড় চোখ, খাদা নাক, মাথাভরতি ঝাঁকড়া চুল।

দুদলে তুমুল খেলা চলছে। আমি মাঠের বাইরে। গায়ে জ্বর বলে খেলতে পারছি না। জ্বর এমন বাড়াবাড়ি যে বসে থাকতে পারছি না আবার উঠে চলে যেতেও পারছি না। এমন সময় উনুকে লক্ষ্য করলাম। যে খুব মন দিয়ে ঘাস খাচ্ছে।

সত্যি সত্যি ঘাস খাচ্ছে। দু আঙুলে ঘাসের কচি পাতা দ্রুত তুলে চপচপ শব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে গম্ভীর গলায় বলল, আমার ইচ্ছা।

বলে পুরো সুফি-সাধকদের নির্লিপ্ততা নিয়ে ঘাস চিবুতে লাগল। এমনভাবে চিবুচ্ছে যেন অতি উপাদেয় কোনো খাবার। তার খাওয়া দেখে জিভে পানি চলে আসে। আমি কৌতূহল পারলাম না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, ঘাস খাচ্ছ কেন?

সে উদাস গলায় বলল, ভাইটামিন আছে।

এরকম একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব না হওয়ার কোনো কারণই নেই। দশ মিনিটের মাথায় আমরা জন্মের বন্ধু হয়ে গেলাম। সে শিখিয়ে দিল ঘাসের কোন অংশ খেতে হয়, কোন অংশ খেতে হয় না। দুটা পাতার মাঝখানে সুতার মতো যে-ঘাসটা বের হয় সেটাই খাদ্য, তবে ডগার খানিকটা বাদ দিতে হবে। ডগাটা বিষ।

উনু আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়ে। আমাদের স্কুলে না, অন্য কী-একটা স্কুলে। তার মা নেই, বাবার সঙ্গে থাকে। বাবা প্রতিদিন রুটিন করে উনুকে দুবেলা মারেন। স্কুল থেকে ফিরে আসার পর একবার, সন্ধ্যাবেলা খেলার মাঠ থেকে ফিরে আসার পর একবার। সেই মারও দর্শনীয় মার। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মারপর্ব শেষ হবার পরই পরই দুজনই অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যেন কিছুই হয়নি।

উনুর বাবা ছোট চাকরি করতেন। বাসার সাজসজ্জা অতি দরিদ্র। বাঁশের বেড়ার ঘর। পাশেই ডোবা। ময়লা নোংরা পানি। খেলা শেষ করে বাসায় ফিরে উনু সেই নোংরা পানিতে দিব্যি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলে।

উনুর বাবাকে মানুষ হিসেবে আমার খুব পছন্দ হল। ছোটদের সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে যেন তারা ছোট না। তাঁর সমবয়স্ক মানুষ। আমাকে একদিন বললেন, এই যে আই আই চুন্দ্রীগড় সাহেব দেশের ভার নিল, লোকটা কেমন? তোমার কি মনে হয় উনিশ-বিশ কিছু হবে?

আই আই চুন্দ্রীগড় কে, সে কবেই-বা দেশের ভার নিল কিছুই জানি না। তবু খুব বুঝদার মানুষের মতো মাথা নাড়লাম। মুখে বললাম, হবে।

উনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মনে হয় না। সব এক। দেয়াশলাইয়ের কাঠি। ফুস কইরা একবার জ্বলল, তারপর শেষ। চমৎকার সব উপমা আমি ওঁর

কাছে শুনেছি। যেমন মেয়েমানুষ সম্পর্কে তাঁর একটা ছড়া—

"মায়ে পুরা
ভইনে থুরা
কন্যায় পাই,
স্ত্রীর কপালে
কিছুই নাই।"

এই ছড়ার অর্থ জানি না। অসংখ্যবার তাঁর কাছে শুনেছি বলে এখনও মনে আছে।

উনু একবার আমাকে চিতইপিঠা খাওয়াবার দাওয়াত দিল। তার বাবা চিতইপিঠা বানাবেন। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম। উঠোনে চুলায় পিঠা সেকা হচ্ছে। পিতা এবং পুত্র মিলে পিঠা বানাচ্ছে। গল্পগুজব করতে করতে পিঠা খাওয়া হচ্ছে। ওদের দুজনকে দেখে যা হিংসা লাগল! মনে হল ওরা কত সুখী। আমার যদি মা না থাকত কি চমৎকার হত!

উনুর কপালে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না। তার বাবা বিয়ে করে ফেললেন। উনু গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল, সৎমার সংসারে থাকব না। দেশান্তর হব।

আমি বললাম, কোথায় যাবে?

এখনও ঠিক করি নাই। ত্রিপুরা, আসাম এক জায়গায় গেলেই হয়।

প্রাণের বন্ধুকে একা ছেড়ে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঠিক করলাম আমিও সঙ্গে যাব। বন্ধুর শোকে আমার ভিতরেও খানিকটা বৈরাগ্য এসে গেছে।

এক সকালে সিলেট রেলস্টেশন থেকে ছাড়ছে এমন একটি ট্রেনের কামরায় দুজন উঠে বসলাম। ট্রেন কোথায় যাচ্ছে কিছুই জানি না। ট্রেন ছাড়ার পরপরই আমার মন থেকে দেশান্তরি হবার যাবতীয় আগ্রহ কর্পূরের মতো উবে গেল। বাসার জন্য খুব যে মন-খারাপ হল তা না। প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হলাম এই ভেবে যদি টিকিট চেকার ওঠে তখন কি হবে! কান্না শুরু করলাম। ট্রেনের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দও বাড়তে লাগল। কেন জানি বাকি ঘটনা আমার পরিষ্কার মনে নেই। আবছা আবছা মনে আছে। পরের স্টেশনে আমাদের নামিয়ে দেয়া হল। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বাসে করে আমাদের সিলেট শহরে পৌঁছে দেন। আমার ভেতর থেকে দেশান্তরি হবার আগ্রহ পুরোপুরি চলে গেলেও উনুর ভেতর সেটা থেকেই যায়। প্রতি মাসে অন্তত একবার হলেও সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। তিন-চারদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে আবার ফিরে আসে।

উনু শুধু যে আমার বন্ধু ছিল তা-ই না, শিক্ষকও ছিল। জগতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা আমি তার কাছ থেকে পেয়েছি। যেমন আকাশে প্লেন দেখলেই দৌড়ে গাছের নিচে কিংবা বাড়ির ভেতর ঢোকা উচিত। কারণ প্লেনের যাত্রীরা পেসাব-পায়খানা করলে তা মাথায় এসে পড়তে পারে।

www.BDeBooks.Com

নানান ওষুধপত্রের টোটকা দাওয়াইও তার জানা ছিল। যেমন মুখে ডিম নিয়ে যেসব লাল পিঁপড়া যায় ঐসব পিঁপড়া দৈনিক পাঁচটা করে খেলে অর্শরোগ সেরে যায়।

যেহেতু আমার অর্শরোগ ছিল না কাজেই সেই মহৌষধ পরীক্ষা করে দেখা হয়ে ওঠে নি।

উনুকে আমি কখনো হাসিখুশি দেখি নি। সারাক্ষণ সে চিন্তিত ও বিষণ্ন। শুধু একদিন হাসতে হাসতে দৌড়ে তাকে আমাদের বাসার দিকে আসতে দেখা গেল। জানলাম তার একটা বোন হয়েছে। দেখতে সে নাকি পরীর মতো সুন্দর। জন্মের পরপর সে হাসতে শিখে গেছে। সারাক্ষণ নাকি হাসছে।

আমি পরদিন সদাহাস্যময়ী উনুর ভগিনীকে দেখতে গেলাম। উনুর মা শাড়ির আঁচল ফাঁক করে লাল টুকটুকে শিশুটিকে দেখিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, নজর লাগাইও না। মাটিতে থুক দেও। যাতে শিশুটির উপর নজর না লাগে সেজন্যেই আমি এবং দুজনই মাটিতে একগাদা থুথু ফেললাম। এই ঘটনার খুব সম্ভব এক সপ্তাহের ভেতর উনুর বাবা সন্ন্যাসরোগে মারা গেলেন।

অন্যের দুঃখে অভিভূত হবার মতো বয়স বা মানসিকতা কোনোটাই তখন ছিল না। কাজেই এই ঘটনা আমার মনে কোনো ছাপ ফেলল না। আমাদের বাসায়ও তখন বড় ধরনের সমস্যা। গনি চাচার চাকরি চলে গেছে। অ্যান্টিকরাপশনের মামলা চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেল হয়ে যাবে, মোটামুটি নিশ্চিত। তিনি কপর্দশকশূন্য অবস্থায় তাঁর স্ত্রী এবং পালক-পুত্রকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে উঠেছেন। গনি চাচার স্ত্রী রাতদিন কাঁদেন। সেই কান্নাও ভয়াবহ কান্না। চিৎকার, মাটিতে গড়াগড়ি। আমরা ছোটরা অবাক হয়ে দেখি।

গনি চাচা উঠোনে পাটি পেতে সারাদিন শুয়ে থাকেন এবং তালপাতার পাখায় হাওয়া খান। দীর্ঘদিন তাঁরা আমাদের বাসায় রইলেন। দুটি সংসার টানতে গিয়ে মা হিমশিম খেয়ে গেলেন। তাঁর অতি সামান্য যেসব সোনার গয়না ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল। সেবার ঈদে আমরা কেউ কোনো কাপড় পেলাম না। আমাদের বলা হল, অল্পদিন পরেই বড় ঈদ আসছে। বড় ঈদে সবাই ডাবল ডাবল কাপড় পাব।

যেহেতু খানিকটা বড় হয়েছি চারপাশের জগৎ কিছুই না হলেও বুঝতে শিখেছি, সে কারণে মনের কষ্ট পুরোপুরি দূর করতে পারছি না। মন-খারাপ করে ঘুরে বেড়াই। আশেপাশের বাচ্চারা বাবাদের হাত ধরে দোকানে যায়। কলরব করতে করতে ফিরে আসে।

মনের কষ্ট দূর করতে উনুর চেয়ে ভালো কেউ নেই। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্যের মন-খারাপ ভাব দূর করে দিতে পারে যদিও সে নিজে আগের চেয়েও বিষণ্ন হয়ে যায়।

উনুকে বাসায় পেলাম না, উনুর মা'কেও না। তারা সবাই কোথায় নাকি চলে গেছে। খুব খারাপ লাগল। উনুদের পাশের বাসার এক ছেলে বলল, উনু

জল্লারপাড়ের এক চায়ের দোকানে কাজ করে। বাবাবিহীন সংসারের দায়িত্ব এই বয়সেই সে মাথায় নিয়ে নিয়েছে।

খুঁজে খুঁজে একদিন তাকে বের করলাম। ময়লা হাফপ্যান্ট পরা। টেবিলে-টেবিলে চা দিচ্ছে। আমি বাইরে থেকে ডাকলাম— এই উনু! সে তাকাল কিন্তু দোকান থেকে বেরিয়ে এল না।

বাসায় ফিরে এলাম।

বাসায় খুব আনন্দ। খুব উত্তেজনা। বাবা জগদল থেকে আমাদের নিতে এসেছেন। এবং ঘোষণা করেছেন এই ঈদেই আমাদের সবাইকে কাপড় এবং জুতা দেয়া হবে। কেনাও হবে আজ।

আনন্দে লাফাতে লাগলাম।

উনুর কথা মনে রইল না।

জগদলের দিন

আমার শৈশবের অদ্ভুত স্বপ্নময় কিছুদিন কেটেছে জগদলে। জগদলের দিন আনন্দময় হবার অনেকগুলি কারণের প্রধান কারণ স্কুলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। সেখানে কোনো স্কুল নেই। কাজেই পড়াশোনার যন্ত্রণা নেই। মুক্তির মহানন্দ।

আমরা থাকি এক মহারাজার বসতবাড়িতে, যে-বাড়ির মালিক অল্প কিছুদিন আগেই দেশ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেছেন। বাড়ি চলে এসেছে পাকিস্তান সরকারের হাতে। মহারাজার বিশাল এবং প্রাচীন বাড়ির একতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা। দুতলাটা তালাবদ্ধ। শুধু দুতলা নয়, কয়েকটা ঘর ছাড়া বাকি সবটা তালাবদ্ধ। কারণ মহারাজা জিনিসপত্র কিছুই নিয়ে যান নি। ঐসব ঘরে তাঁর জিনিসপত্র রাখা।

ঐ মহারাজার নাম আমার জানা নেই। মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনিও বলতে পারলেন না। তবে তিনি যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ এই বাড়িতে ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর বাড়ি। সেই বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করার জন্য তাঁর ছিল নিজস্ব জেনারেটর। দাওয়াতের চিঠি ছেপে পাঠানোর জন্যে মিনি সাইজের একটা ছাপাখানা।

বাবাকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি— মহারাজার রুচি দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আহা, কত বই! কত বিচিত্র ধরনের বই।

বাবা অনেক লেখালেখি করলেন, যাতে বইগুলো অন্তত সরকারি পর্যায়ে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। তাঁর লেখালেখিতে কোনো কাজ হল না। বাবা কতবার যে গভীর বেদনায় বললেন— আহা, চোখের সামনে বইগুলো নষ্ট হচ্ছে, কিছু করতে পারছি না! তিনি ইচ্ছা করলেই সমস্ত বই নিজের সংগ্রহে যুক্ত করতে পারতেন। তাতে বইগুলো রক্ষা পেত। তিনি তা করলেন না। পরের জিনিস নিজের মনে করার প্রশ্নই আসে না। তিনি হাহুতাশ করতে লাগলেন। চোখের

www.BDeBooks.Com

সামনে বই নষ্ট হতে লাগল। হোক নষ্ট, তাতে আমাদের অর্থাৎ ছোটদের তেমন কিছুই যায় আসে না। কারণ আমাদের সামনে অন্য একটি জগৎ খুলে গেছে।

বাড়ির সামনে বিশাল বন। একটু দূরেই নদী, যে নদীর পানি কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ। নদীর তীরে বালি ঝিকমিক করে জ্বলে। নদীটিই পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার সীমানা। সারাক্ষণ অপেক্ষা করতাম কখন দুপুর হবে— নদীতে যাব গোসল করতে। একবার নদীতে নামলে ওঠার নাম নেই। তিন ভাইবোন নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি, বড়রা হয়তো একজনকে জোর করে ধরে পাড়ে নিয়ে রাখল। আনতে গেল অন্যজনকে। এই ফাঁকে পাড়ে যে আছে সে লাফিয়ে নামল।

বিকেলগুলোও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। প্রতিদিনই বাবা কাঁধে গুলিভরা বন্দুক নিয়ে বলতেন— চল বনে বেড়াতে যাই। কাঁধে বন্দুক নেয়ার কারণ হচ্ছে প্রায়ই বাঘ বের হয়। বিশেষ করে চিতাবাঘ।

বাবার সঙ্গে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনে ঘুরতাম। ক্লান্ত হয়ে ফিরতাম রাতে। ভাত খাওয়ার আগেই ঘুমে চোখে জড়িয়ে আসত। জন্য বিচিত্র শব্দ আসত বন থেকে। আনন্দে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠতাম।

সবাই ঘুমুতাম একটা ঘরে। বিশাল তিনটা খাট একত্র করে ফুটবলের মাঠের আকৃতির একটা বিছানা তৈরি করা হত। বিছানার উপরে সেই মাপে তৈরি এক মশারি। রাতে বাথরুম পেলে মশারির ভেতর থেকে নামা নিষিদ্ধ ছিল, কারণ খুব কাঁকড়াবিছা এবং সাপের উপদ্রপ।

কাঁকড়াবিছাগুলো সাপের মতোই মারাত্মক। একবার কামড়ালে বাঁচার আশা নেই, এমনি তার বিষ। মৃত্যু সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়াবিছা মেঝেতে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আমি বিছানায় বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছি— এই ছবি এখনও চোখে ভাসে।

আমাদের আশেপাশে কোনো জনমানব ছিল না। অনেক দূরে বনের ভেতর একজন কম্পাউন্ডার থাকতেন। সভ্য মানুষ বলতে তিনিই। তাঁর বড় মেয়েটির নাম আরতি। আমার বয়সী, বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে। দেবী প্রতিমার মতো শান্ত মুখশ্রী, কিন্তু সেই শ্রীময়ী চেহারার সঙ্গে স্বভাবের কোনো মিল নেই। একদিন সকালে আমাদের বাসার সামনে এস মিহি সুরে ডাকতে লাগল— কাজল, এই কাজল!

আমি বের হয়ে এলাম। যেন কত দীর্ঘদিনের চেনা সেই ভঙ্গিতে বলল, বনে বেড়াতে যাবে? উচ্চারণ বিশুদ্ধ শান্তিপুরী। গলার স্বরটিও ভারি মিষ্টি। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হ্যাঁ।

সে আমাকে নিয়ে বনে ঢুকে গেল। ক্রমেই সে ভেতরের দিকে যাচ্ছে। আমি এক সময় শঙ্কিত হয়ে বললাম, ফেরার পথ মনে আছে? সে আমার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসল যে এরকম অদ্ভুত কথা কখনো শোনেনি। তারপরই হঠাৎ একটা দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, নিশ্চয় লুকোচুরি জাতীয় কোনো খেলা। আমাকে ভয় দেখানো চেষ্টা। আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে কাতর গলায়

ডাকতে লাগলাম— আরতি, এই আরতি। তার কোনো খোঁজ নেই। এই অদ্ভুত মেয়ে আমাকে বনে রেখে বাসায় চলে গেছে।

আমি পথ খুঁজে বের করতে গিয়ে আরও গভীর বনে ঢুকে পড়লাম। একসময় দিশাহারা হয়ে কাঁদতে বসলাম। জনৈক কাঠকুড়ানো সাঁওতাল যুবক এই অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে বাসায় দিকে আসে।

এর দিন পাঁচেক পর আরতি আবার এসে ডাকতে লাগল— এই কাজল, এই— আমি বের হওয়ামাত্র বলল, বনে যাবে ?

আমি খুব ভালো করে জানি, এই মেয়ে আমাকে আবার আগের দিনের মতো জঙ্গলে ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তবু তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না। পরে যা হবার হবে। আপাতত খানিকক্ষণ এই রূপবতী পাগলি মেয়ের সঙ্গে থাকা যাক। সেদিনও সে তা-ই করল। এর জন্যে তার উপর আমার কোনোরকম রাগ হল না। বরং মনে হল এই মেয়েটির পাশাপাশি থাকার বিনিময়ে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী দিয়ে দিতে পারি। এই মোহকে কী বলা যায় ? প্রেম ? প্রেম সম্পর্কে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা তো এখানে খাটে না। তা হলে এই প্রচণ্ড মোহের জন্ম কোথায় ? আমি জানি না। শুধু জানি, মেয়েটির বাবা একদিন তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়া চলে যান। এই খবর পেয়ে গভীর শোকে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি। মা যখন জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ? আমি বললাম, পেটে ব্যথা। বলে আরও উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। পেটব্যথার ওষুধ হিসেবে পেটের নিচে বালিশ নিয়ে আমাকে সারাদিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হল। বাবা আমাকে দুফোঁটা বায়োকেমিক ওষুধ দিলেন। তখন তিনি বায়োকেমিক ওষুধ নিয়ে খুব মেতেছেন। চমৎকার একটা ব্যাগে তাঁর ওষুধ থাকে। বারোটা শিশির বারো রকমের ওষুধ। পৃথিবীর সব রোগব্যাধি এই শিশির ওষুধে আরোগ্য হয়। অনেকটা হোমিওপ্যাথির মতো। তবে হোমিওপ্যাথিতে যেমন ওষুধের সংখ্যা অনেক, এখানে মাত্র বারোটা।

বাবার বায়োকেমিক চিকিৎসায় আমার বিরহব্যথা অনেকটা দূর হল। এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়— এমন মনোভাব নিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের ভেতরই আবার বিছানায় উঠতে হল। কারণ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। বাবা-মা দুজনেরই মুখ শুকিয়ে গেল— লক্ষণ ভালো নয়। নিশ্চয় ম্যালেরিয়া। সেই সময়ে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া কুখ্যাত ছিল। একবার কাউকে ধরলে তার জীবনীশক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ করে দিত। ম্যালিরিয়ায় মৃত্যু ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমরা প্রতিষেধক হিসেবে বায়োকেমিক ওষুধ ছাড়াও প্রতি রবিবারে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন খাচ্ছি। তারপরও ম্যালেরিয়ায় ধরবে কেন ?

বাবা এই ভয়ংকর জায়গা থেকে বদলির জন্য চেষ্টা-তদবির করতে লাগলেন। শুনে আমার মন ভেঙে গেল। এত সুন্দর জায়গা, এমন চমৎকার

www.BDeBooks.Com

জীবন— এসব ছেড়ে কোথায় যাব ? ম্যালেরিয়ায় মরতে হলেও এখানেই মরব। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া অসুখটা আমার বেশ পছন্দ হল। যখন জ্বর আসে তখন কী প্রচণ্ড শীতই-না লাগে! শীতের জন্যেই বোধহয় শরীরে এক ধরনের আবেশ সৃষ্টি হয়। জ্বর যখন বাড়তে থাকে তখন চোখের সামনের প্রতিটি জিনিস আকৃতিতে ছোট হতে থাকে। দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। একসময় নিজেকে বিশাল দৈত্যের মতো মনে হয়। কী আশ্চর্য অনুভূতি!

শুধু আমি একা নই, পালা করে আমরা সব ভাইবোন জ্বরে পড়তে লাগলাম। একজন জ্বর থেকে উঠতেই অন্যজন জ্বরে পড়ে। জ্বর আসেও খুব নিয়মিত। আমরা সবাই জানি কখন জ্বর আসবে। সেই সময়ে লেপ-কাঁথা গায়ে জড়িয়ে আগেভাগেই বিছানায় শুয়ে পড়ি।

প্রতিদিন ভোরে তিন ভাইবোন রাজবাড়ির মন্দিরের চাতালে বসে রোদ গায়ে মাখি। এই সময় আমাদের সঙ্গ দেয় বেঙ্গল টাইগার। বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে আমাদের কুকুরের নাম। না, আমাদের কুকুর নয়, মহারাজার কুকুর। তাঁর নাকি অনেকগুলি কুকুর ছিল। তিনি সবক'টাকে নিয়ে যান, কিন্তু এই কুকুরটিকে নিতে পারেন নি। সে কিছুতেই রাজবাড়ি ছেড়ে যেতে রাজি হয় নি।

মা তাকে দুবেলা খাবার দেন। মাটিতে খাবার ঢেলে দিলে সে খায় না। থালায় করে দিতে হয়। শুধু তা-ই না, খাবার দেবার পর তাকে মুখে বলতে হয়— খাও।

খানদানি কুকুর। আদব-কায়দা খুব ভালো। তবে বয়সের ভারে সে কাবু। সারাদিন বাড়ির সামনে শুয়ে থাকে। হাই তোলে, ঝিমুতে ঝিমুতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে।

এক ভোরবেলার কথা। আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। আমি কম্বল গায়ে দিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে আছি। আমার সঙ্গে শেফু এবং ইকবাল। মা এসে আমাদের মাঝখানে শাহীনকে [আমার ছোট ভাই] বসিয়ে দিয়ে গেলেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার দিকে নজর রাখা, সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে চাতাল থেকে পড়ে না যায়।

মা চলে যাবার পরপরই হিসহিস শব্দে পেছনে ফিরে তাকালাম। যে দৃশ্য দেখলাম সে দৃশ্য দেখার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। মন্দিরের বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কেউটে সাপ বের হয়ে আসছে। মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসে। ফণা তুলে এদিক-ওদিক দেখছে, আবার মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে, আবার ফণা তোলে। আমরা তিন ভাইবোন ছিটকে সরে গেলাম। শাহীন একা বসে রইল, সাপ দেখে তার আনন্দের সীমা নেই। সে চেষ্টা করছে সাপটির দিকে এগিয়ে যেতে। আর তখনই বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল সাপটির উপর। ঘটনা এত দ্রুত ঘটল যে আমরা কয়েক মুহূর্ত বুঝতেই পারলাম না কি হচ্ছে। একসময় শুধু দেখলাম কুকুরটা সাপের ফণা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে।

বেঙ্গল টাইগার ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। যেন কিছুই হয় নি। নিজের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড সে শেষ করল।

সাপ কুকুরটিকে কামড়াবার সুযোগ পেয়েছিল কি না জানি না। সম্ভবত কামড়ায়নি। কারণ কুকুরটি বেঁচে রইল, তবে নড়াচড়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় দিনে তার চামড়া খসে পড়ল এবং দগদগে ঘা দেখা দিল। এই থেকে মনে হয় সাপ সম্ভবত কামড়েছে। সাপের বিষ কুকুরের ক্ষেত্রে হয়তো তেমন ভয়াবহ নয়।

আরও দুদিন কাটল। কুকুরটি চোখের সামনে পচে গলে যাচ্ছে। তার কাতরধ্বনি সহ্য করা মুশকিল। গা থেকে গলিত মাংসের দুর্গন্ধ আসছে।

বাবা মাকে ডেকে বললেন, আমি এর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। তুমি বন্দুক বের করে আমাকে দাও।

বাবা আমাদের চোখের সামনে পরপর দুটি গুলি করে কুকুরটিকে মারলেন। শান্ত গলায় বললেন, যে আমার ছেলের জীবন রক্ষা করেছে তাকে আমি গুলি করে মারলাম। একে বলে নিয়তি।

আমার কাছে বাবাকে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষদের একজন বলে মনে হল। নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না। এমন একটি কাজ তিনি কী করে করতে পারলেন। রাগে, দুঃখে ও অভিমানে রাতে ভাত না খেয়ে শুয়ে পড়েছি। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় বসালেন।

দুজন চুপচাপ বসে আছি। চারদিকে ঘন অন্ধকার। তক্ষক ডাকছে। বাড়ির চারপাশের আমের বনে হাওয়া লেগে বিচিত্র শব্দ উঠছে।

বাবা কিছুই বললেন না। হয়তো অনেক কিছুই তাঁর মনে ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেন না। একসময় বললেন, যাও ঘুমিয়ে পড়ো।

কুকুরটি আমার মরে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

আমার মনে আছে— এই নিয়ে আমি কিছু-একটা লিখতে চেষ্টাও করেছিলাম। রচনাটির নাম দিয়েছিলাম বেঙ্গল টাইগার কিংবা আমাদের বেঙ্গল টাইগার। সম্ভবত এই রচনাই আমার প্রথম সাহিত্য। বলাই বাহুল্য, অতি তুচ্ছ রচনা। কিন্তু হৃদয়ের গভীর যাতনায় যার জন্ম তাকে তুচ্ছই-বা করি কি করে?

জগদলে বেশিদিন থাকা হল না। বাবা বদলি হলেন দিনাজপুরের পচাগড়ে [পঞ্চগড়]। এই জায়গা সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু মনে নেই, শুধু মনে আছে ভোরবেলা বাসার সামনে এসে দাঁড়ালে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল চূড়া দেখা যেত। মনে হত পাহাড়টা রূপার পাতে মোড়া। সূর্যের আলো পড়ে সেই রূপা চকচক করছে। বাবা আমাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করবার জন্যেই হয়তো এক ভোরবেলায় ঘোষণা করলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে যে একটা কবিতা লিখতে পারবে সে চার আনা পয়সা পাবে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো কবিতা দাঁড় করাতে পারলাম না। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরও মন-খারাপ হল যখন আমাদের তিন ভাইবোনকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হল।

www.BDeBooks.Com

স্কুলে ভরতি করতে নিয়ে গেলেন বড়মামা। তিনজনই কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছি। এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতা কেউই সহ্য করতে পারছি না। বড়মামা উপদেশ দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছেন— "বিদ্যা অমূল্য ধন", "পড়াশোনা করে যে গাড়ি-ঘোড়া চলে সে"— এসব।

অমূল্য ধন বা গাড়ি-ঘোড়া কোনো কিছুরই প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি না।

বড়মামা আমাদের চোখের জল অগ্রাহ্য করে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিলেন। শুধু তা-ই নয়, হেডমাস্টার সাহেবকে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমি বিনা বেতনে আপনাদের স্কুলে পড়াব। আপাতত আমার কিছু করার নেই। হাতে প্রচুর অবসর।

হেডমাস্টার রাজি হলেন। আমি খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলাম। যা-ই হোক, একজন স্যার হলেন আমাদের নিজেদের লোক এবং অতি প্রিয় মানুষ। স্কুলের দিনগুলি হয়তো খারাপ যাবে না। দ্বিতীয় দিনেই বড়মামা আমাদের ক্লাসে অঙ্ক করাতে এলেন। আমি হাসিমুখে চেঁচিয়ে উঠলাম— "বড়মামা।"

মামার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। হুংকার দিয়ে বললেন— মামা ? মামা মানে ? চড় দিয়ে সব দাঁত খুলে ফেলব। স্কুলে আমি তোমাকে চিনি না। তুমিও আমাকে চেন না। বলো, ৬-এর ঘরের নামতা বলো। পাঁচ ছয় কত ?

আমি হতভম্ব।

একি বিপদ! ছয়ের ঘরের নামতা যে জানি না এটা বড়মামা খুব ভালো করেই জানেন। কারণ তিনি আমাদের পড়ান।

তিনি দুনিয়া-কাঁপানো হুংকার দিলেন, কি পারবে না ?

না।

না আবার কী ? বলো, জ্বি না।

জ্বি না।

বলো, জ্বি না স্যার।

জ্বি না স্যার।

না পারার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আত্মীয় বলে আমার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। আমার চোখে সব সমান। সবাই ছাত্র। ক্লাস-ক্যাপ্টেন কোথায় ? যাও, বেত নিয়ে আসো।

বেত আনা হল। এবং সত্যি সত্যি বড়মামা ছয়টি বেতের বাড়ি দিলেন— যেহেতু ছয়ের ঘরের নামতা।

স্কুলে মোটামুটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেল। ছাত্রমহলে রটে গেল ভয়ংকর রাগী একজন স্যার এসেছেন। অতি কড়া, তার ক্লাসে নিঃশ্বাস ফেলা যায় না।

বড়মামার চাকরি দীর্ঘস্থায়ী হল না। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের ছোট ভাইকে কানে ধরে উঠবস করাবার কারণে তাঁর চাকরি চলে গেল। আমরা হাঁপ

ছেড়ে বাঁচলাম। বড়মামা আবার আগের মূর্তিতে ফিরে এসেছেন। গল্প করছেন, আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গেলে নাকি রাতের বেলা দার্জিলিং শহরের বাতি দেখা যায়, নিয়ে গেলেন।

গভীর রাত পর্যন্ত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছি। দার্জিলিং শহরের বাতি আর দেখছি না। উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল। কিছুই দেখা গেল না। বড়মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ওদের আজ বোধহয় ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। আরেকদিন আসতে হবে। অসাধারণ দৃশ্য! না দেখলে জীবন বৃথা।

একদিন সাইকেলের সামনে বসিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন পাহাড়ি নদী দেখাতে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে নালার মতো একটা জলধারা পাওয়া গেল। মামা বললেন, তুমি ঘুরে বেড়াও। আমি এই ফাঁকে একটা কবিতা লিখে ফেলি। মামা নদীর পাড়ে বসে রুলটানা খাতায় কবিতা লিখতে বসলেন। দীর্ঘ কবিতা লেখা হল। কবিতার নামটা মনে আছে।

"হে পাহাড়ী নদী"।

বড়মামার এই কবিতা স্থানীয় একটি পত্রিকায় ছাপাও হল। পচাগড়ের দিনগুলি আমাদের কাছে একসময় সহনীয় হয়ে উঠল এবং ভালো লাগতে লাগল। আমার একজন বন্ধু জুটে গেল যে নর্দমার পানিতে মাছ মারার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ। দুজনেরই বড়শি-হাতে নর্দমায় ঘুরে বেড়াই। নর্দমায় ট্যাংরা, লাটি এবং পুঁটিমাছ পাওয়া যায়। আমার বন্ধুর পকেটে নারিকেলের মালায় থাকে কেঁচো। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক টুকরা কেঁচো নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বড়শিতে গেঁথে পানিতে ফেলে দেয়। দেখতে বড় ভালো লাগে।

শেষ পর্বে শঙ্খনদী

পচাগড় থেকে বাবা বদলি হলেন রাঙ্গামাটিতে।

দেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। ভাগ্য ভালো হলে দেখা যাবে রাঙ্গামাটি খুব জঙ্গলি জায়গা— স্কুল নেই। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল আছে নাকি?

তিনি বললেন, অবশ্যই আছে। স্কুল থাকবে না কেন? রাঙ্গামাটি বেশ বড় শহর। খুব সুন্দর শহর!

স্কুল আছে শুনে একটু মনমরা হয়ে গেলাম। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছুই নেই। কাবাবে হাড্ডি থাকে, চাঁদে থাকে কলঙ্ক। স্কুলের যন্ত্রণা সহ্য করতেই হবে বলে মনে হচ্ছে।

চিটাগাং থেকে রাঙ্গামাটি যেতে হয় লক্কর-মার্কা বাসে। রাস্তা অসম্ভব খারাপ। পাহাড়ের গা-ঘেঁষে বাস যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন বাসের হেল্পার চেঁচিয়ে বলে, আল্লাহর নাম নেন। ইসটার্ট বন্ধ হইতে পারে।

www.BDeBooks.Com

সত্যি সত্যি স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ভবিষ্যদ্বাণী এমন ফলে গেছে দেখে কন্ডাকটারের মুখে বিমলানন্দের হাসি। ড্রাইভার বাস থেকে বের হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিড়ি খাচ্ছে। তার নির্বিকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। প্রায়ই ঘটে।

বাস কখন ছাড়বে জিজ্ঞেস করতেই সে সুফি-সাধকের মতো নির্লিপ্ত গলায় বলল, আল্লাহর হুকুম হইলেই ছাড়ব। আমরা বাসযাত্রীরা বাস থেকে নেমে আল্লাহর হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মা আমাদের সর্বকনিষ্ঠ বোনটির কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ক্রমাগত কাঁদছে। বাবা আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগুচ্ছি— এ কোথায় এসে পড়লাম ? স্বপ্নপুরীর মতো সুন্দর দেশ। চারদিকে পাহাড়ের সারি ঢেউয়ের মতো দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। মাথার উপর ঘন নীল আকাশ। বাতাসে কেমন যেন বুনো বুনো গন্ধ। রাস্তার পাশ ঘেঁষে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। কি পরিষ্কার তার পানি! বাসযাত্রীরা আঁজলা ভরে সেই পানি খাচ্ছে।

কিছুদূর এগুতেই যে-দৃশ্য দেখলাম তা দেখার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। হাতির খেদা থেকে ধরে-আনা একপাল হাতি। প্রতিটি হাতির পা দড়ি এবং শিকল দিয়ে বাঁধা। রুগ্ন ভয়ার্ত চেহারা। সব মিলিয়ে সাত থেকে আটটা হাতি। দুটি হাতির বাচ্চাও আছে। এরা বাঁধা নয়, ছোটাছুটি করছে। দেখতে অবিকল পুতুলের মতো। বাচ্চা দুটি দেখে মনে হল তারা সময়টা কাটাচ্ছে খুব আনন্দে।

খেদার মালিক এগিয়ে এলেন। বাবাকে বললেন— সর্বমোট একুশটা হাতি ধরা পড়েছে। দশটা বিক্রি হয়েছে, তিনটা মারা গেছে। এখানে যে কয়টা আছে সে কয়টাও মারা যাবে। কোনো হাতি কিছু খাচ্ছে না। খেদার মালিক বলল, হাতির বাচ্চা একটা নেবেন নাকি স্যার ?

বাবা কিছু বলবার আগেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, নেব নেব।

বাবার মুখ দেখে মনে হল প্রস্তাবটা তিনি একেবারে ফেলে দিচ্ছেন না। বিবেচনাধীন আছে। তিনি নিচু গলায় বললেন, দাম কত ?

দাম নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। বলতে গেলে বিনা দামে বিক্রি হবে। আপনি চান কি না বলেন। নিলে আমার উপকার হয়। বাচ্চা দুটা এখন সমস্যা। ডিসি সাহেব একটা নিবেন বলেছিলেন, এখন বলছেন— না।

হাতির বাচ্চা শেষ পর্যন্ত কেনা হল না। কারণ এরা এখনও দুগ্ধপোষ্য। প্রতিদিন আধমণ দুধ এদের খাওয়াতে হবে। আমরা মন-খারাপ করে বাসে ফিরে এলাম। বাবা বললেন, পাহাড়ি জায়গায় আছি— হাতির বাচ্চা জোগাড় করা কোনো সমস্যা হবে না। একটা হাতির বাচ্চা কেনা যেতে পারে। আগে একটু গুছিয়ে বসি। তোমাদের মন-খারাপ করার কোনো কারণ নেই। এই বলে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি মন-খারাপ করলেন। বাস ঠিকঠাক হতে অনেক

সময় লাগল। আমরা রাঙ্গামাটি পৌঁছলাম দুপুর-রাতে। আমাদের বাসা মূল শহর থেকে অনেকখানি দূরে। একটা পাহাড়ের মাথা কেটে ছয়টা বাড়ি বানানো হয়েছে। ঐ ছয়টা বাড়ির একটা আমাদের। অতি নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন বন। অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে বন থেকে। মা ভীতগলায় বললেন, এ কোথায় এনে ফেললে ? বাবার মুখও শুকিয়ে গেল। এরকম বিরানভূমিতে বাসা, তা বোধহয় তিনিও ভাবেন নি।

বাসা আমাদের খুব পছন্দ হল। পাহাড়ের উপর বাসায় আমরা থাকব এরকম তো কখনো ভাবি নি। এরকম বাসায় থাকা মানে আকাশের কাছাকাছি থাকা। কী সৌভাগ্য আমাদের! তারপর যখন শুনলাম আশেপাশে কোনো স্কুল নেই, আমাদের স্কুলে যেতে হবে না, তখন মনে হল আনন্দে পাগল হয়ে যাব।

সারাদিন খেলা। নতুন একটা খেলা বের করেছি। পাখি-পাখি খেলা। দুহাত পাখির ডানার মতো উঁচু করে এক দৌড়ে পাহাড় থেকে নিচে নামা। একসময় আপনা-আপনি গতি বাড়তে থাকে— মনে হয় সত্যি উড়ে চলেছি— পাখি হয়ে গেছি।

সন্ধ্যার পর বই নিয়ে বসি। সেটাও এক ধরনের খেলা। পড়া-পড়া খেলা। কারণ পড়া দেখিয়ে দেবার কেউ নেই। শাসন করার কেউ নেই।

বাবা প্রায় সারা মাস ট্যুরে থাকেন। মা সবচে ছোট বোনটিকে নিয়ে ব্যস্ত। বড় মামাও সঙ্গে নেই। এই প্রথম উনি ঠিক করেছেন আমাদের সঙ্গে আসবেন না। বড় বোনের পরিবারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। নিজের পায়ে দাঁড়াবেন।

ছোট ছোট এতগুলো বাচ্চা সামলিয়ে মা'কে একা সংসার দেখতে হয়। তার উপর ভৌতিক সমস্যা দেখা দিল। আমাদের রান্নাঘর অনেকখানি দূরে। মা রান্না করার সময় প্রায়ই দেখতে পান— একটা ছায়ামূর্তি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা মেলাবার পরই সবাইকে একটা ঘরে বন্ধ করে হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকেন। ঘুমাতে পারেন না। ঐ ছায়ামূর্তিকে অনেক দেখার চেষ্টা করলাম, সে দেখা দিল না। মা ছাড়া তাকে আর কেউ দেখে না। তবে এক সন্ধ্যায় তার খড়মের খটখট শুনলাম। কে যেন খড়ম পায়ে বারান্দায় হাঁটছে। মা ভয়ে সাদা হয়ে গেলেন। উঁচু গলায় আয়াতুল কুরশি পড়তে লাগলেন। সারারাত ঘুমালেন না, আমাদেরও ঘুমাতে দিলেন না। পরদিন একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটল। বড়মামা এসে উপস্থিত। তিনি খুব সিরিয়াস গলায় বললেন, বুবু ভাববেন না যে আপনাদের সঙ্গে থাকব। দুদিনের জন্যে এসেছি। আমাকে রাখার জন্য শত অনুরোধ করলেও লাভ হবে না। আমার নিজের একটা জীবন আছে। আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে ঘোরাই আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

মা বললেন, ঠিক আছে, দুদিন পরে চলে যাস।

www.BDeBooks.Com

আগেভাগে বলে রাখছি যাতে পরে যন্ত্রণা না করেন।

যন্ত্রণা করব না।

দুদিন থাকব। মাত্র দুদিন। দুই দিন এবং দুই রাত।

আচ্ছা ঠিক আছে।

মামার সেই দুদিন পরবর্তী আট বছরেও শেষ হল না। তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে লাগলেন।

রাঙ্গামাটি এসে তিনি সংগীতের দিকে মন দিলেন। জারিগান। নিজেই গান লেখেন— সুর দেন। জারিগান একা একা হয় না। তাল দিতে হয়। তাল দেবার জন্যে একদল শিশু জুটে গেল। মামা মাথায় গামছা বেঁধে একটা লাইন বলেন, আমরা হাততালি দিতে দিতে বলি— আহা বেশ বেশ বেশ।

শুধু বেশ বেশ বললে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও নাড়তে হয়। মাথা নাড়া এবং হাততালির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় থাকতে হয়। ভুল করলে বড়মামা রাগ করেন।

রাতের বেলা গল্পের আসর। লেপের নিচে বসে তুলারাশি রাজকন্যার গল্প শোনার আনন্দের সঙ্গে কোনো আনন্দেরই তুলনা হয় না।

এক রাতে এরকম গল্প শুনছি। হঠাৎ শুনি মটমট শব্দ। তারপর মনে হল চারদিক যেন আলো হয়ে উঠেছে। 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার উঠল। আমাদের ঠিক সামনের বাসায় আগুন ধরে গেছে। বাড়ি কাঠের। টিনের ছাদ। পুরো বাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। পাহাড়ের উপর পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। আগুনে বাড়ি পুড়ে ছাই হবে— কিছুই করা যাবে না। অবস্থা এমন যে আশেপাশের সবগুলো বাড়িতেই আগুন ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা। বড়মামা আমাদের কোলে করে আগুন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে আসলেন। আমাদের মাথার উপর ভেজা কম্বল— কারণ আগুনের ফুলকি উড়ে উড়ে আসছে। চোখ বড় বড় করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দেখলাম। ভয়ংকরেরও একধরনের সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য থেকেও চোখ ফেরানো যায় না। একসময় অবাক হয়ে দেখি, জ্বলন্ত বাড়ির টিনের চালগুলো আকাশে উড়তে শুরু যাচ্ছে। প্লেনের মতো ভোঁভোঁ শব্দ করতে করতে একেকটা টিন একেক দিকে উড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বাড়িতে আগুন লেগে গেল, সেখান থেকে তৃতীয় বাড়ি। চারদিকে আগুন নিয়ে ভেজা কম্বল মাথায় দিয়ে আমরা বসে আছি। মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তে আগুন আমাদের গ্রাস করবে।

আমাদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। কি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

রাঙ্গামাটিতে আমরা ছিলাম পাঁচ মাসের মতো। অগ্নিপর্বের কিছুদিন পরই বাবা আবার বদলি হলেন বান্দরবানে। দোহাজারী পর্যন্ত ট্রেনে। সেখান থেকে

নৌকায়। সারারাত নৌকা চলল শঙ্খনদীতে। ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম রান্দরবান। ঘন অরণ্যঘেরা ছোট্ট শহরতলি। অল্পকিছু বাড়িঘর। ইট-বিছানো ছোট্ট একটা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে কয়েকটি দোকানপাট।

গ্রামে যেমন সাপ্তাহিক হাট বসে এখানেও তা-ই। বুধবারের সাপ্তাহিক হাট। পাহাড়ি লোকজন বুধবারে এসে উপস্থিত হয়। কত বিচিত্র জিনিসই তারা বিক্রি করতে আনে! বাঁদরের মাংস, সাপের মাংস। মুরং মেয়েরাও আসে। তাদের কোমরে এক চিলতে কাপড় ছাড়া গা উদোম। কী বিচিত্র জায়গা! বান্দরবান অনেকটা উপত্যকার মতো। চারপাশেই পাহাড়। এসব পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ঝুম চাষ হয়। প্রতি সন্ধ্যায় একটা-না-একটা পাহাড় জ্বলতে থাকে।

বান্দরবানের বাসায় প্রথম দিনেই এক কাণ্ড হল। রাত ন'টার মতো বাজে। বাইরে "হুম হাম হিউ"— বিকট শব্দ। একসঙ্গে সবাই জানালার কাছে ছুটে এলাম। কী সর্বনাশ! একটা রাক্ষস দাঁড়িয়ে আছে। রাক্ষসের হাতে কেরোসিনের কুপি। সে কেরোসিনের কুপিতে ফুঁ দিতেই তার মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হল। আমরা সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার মা পর্যন্ত ভয় পেয়ে বললেন— "এইটা কী?"

রাক্ষস তখন মানুষের মতো গলায় বলল, ভয় পাবেন না। ছোট খোকাখুকিরা ভয় পাবেন না। আমি বহুরূপী। ভয় পাবেন না।

বান্দরবানেই আমার প্রথম এবং শেষ বহুরূপী দেখা। এই জিনিস আর কোথাও দেখি নি। সে প্রতিমাসে দুতিন বার সাজ-পোশাক পরে বের হত। কোনো রাতে সাজত ভালুক, কোনো রাতে জলদস্যু। ভোরবেলা দীনহীন মুখে বাসায় এসে বলত, খোকাখুকিরা আম্মাকে বলেন, আমি বহুরূপী। কিছু সাহায্য দিতে বলেন।

তখন আমার খুব কষ্ট লাগত। মনে হত সমস্ত পৃথিবীর রহস্য যার হাতের মুঠোয়— সে কিনা দিনে এসে মলিনমুখে ভিক্ষা করে! এত অবিচার কেন এই পৃথিবীতে?

এরকম বুনো এবং জংলা জায়গায়ও রাজপ্রাসাদ আছে। মুরং রাজার বাড়ি। দূর থেকে দেখি। কাছে যেতে ভয়-ভয় লাগে। মুরংরা রাজাকে দেখে দেবতার মতো। রাজবাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকায় না— এতে নাকি পাপ হয়।

বান্দরবানের সবই ভালো— শুধু মন্দ দিকটা হল— এখানে একটা স্কুল আছে। আমাদের স্কুলে ভরতি করিয়ে দেয়া হল।

মন পুরোপুরি ভেঙে গেল। স্কুলে আমার একমাত্র আনন্দের ব্যাপার হল মুরং রাজার এক মেয়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে। গায়ের রং শঙ্খের মতো সাদা। চুল হাঁটু ছাড়িয়েও অনেকদূর নেমে গেছে। আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি, কিন্তু তাকে

www.BDeBooks.Com

দেখায় একজন তরুণীর মতো। তার চোখ দুটি ছোট ছোট, গালের হনু খানিকটা উঁচু। আমার মনে হল চোখ দুটি আরেকটু বড় হলে তাকে মানাত না। গালের হনু উঁচু হওয়ায় যেন তার রূপ আরও খুলেছে।

ক্লাসে আমি স্যারদের দিকেও তাকাই না। বোর্ডে কি লেখা হচ্ছে তাও পড়তে চেষ্টা করি না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি রাজকন্যার দিকে। সত্যিকার রাজকন্যা।

আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ রাজকন্যার চোখে পড়ল কি না জানি না, তবে একজন স্যারের চোখে পড়ল। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। প্রতিটি ক্লাসেই তিনি আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেন, কিন্তু আমাকে আটকাতে পারেন না। কারণ ইতোমধ্যে আমি একটা জিনিস বুঝে ফেলেছি— আমার স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভালো। যে-কোনো পড়া একবার পড়লেই মনে থাকে। সব পড়াই একবার অন্তত পড়ে আসি। স্যার আমাকে কিছুতেই কায়দা করতে পারেন না। বারবার জাল কেটে বের হয়ে আসি।

কোনো অধ্যবসায়ই বৃথা যায় না। স্যারের অধ্যবসায়ও বৃথা গেল না, আমাকে আটকে ফেললেন। সমকোণ কাকে বলে জিজ্ঞেস করলেন, আমি বলতে পারলাম না।

রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে-ও পারল না। না পারারই কথা। রাজকন্যারা সবসময়েই খানিকটা হাবা ধরনের হয়। স্যার রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন— পড়া পার নি কেন ?

রাজকন্যা জবাব দিল না। তার ছোট ছোট চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। সেই অশ্রুবর্ষণ-দৃশ্যে যে কোনো পাষাণ দ্রবীভূত হবে। স্যার দ্রবীভূত হলেন। রাজকন্যাকে বসতে বললেন। আমার জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা হল। বিচিত্র শাস্তি। বড় একটা কাগজে লেখা হল—

"আমি পড়া পারি নাই।
আমি গাধা।"

সেই কাগজ গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। স্যার একজন দপ্তরিকে ডেকে আনলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, এই ছেলেকে সবকয়টা ক্লাসে নিয়ে যাও। ছাত্ররা দেখুক।

আমি অপমানে নীল হয়ে গেলাম। টান দিয়ে গলার কাগজ ছিঁড়ে স্যারের দিকে তাকিয়ে তীব্র গলায় বললাম, আপনি গাধা। তারপর এক দৌড় দিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। বাসায় ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমি শঙ্খনদীর তীর ঘেঁষে দৌড়াচ্ছি। আমাকে যেতে হবে অনেক দূরে। লোকালয়ে আমার থাকা চলবে না। কেউ যেন কোনোদিন আমাকে আর না দেখে।

সন্ধ্যাবেলা লোক পাঠিয়ে শঙ্খনদীর তীর থেকে বাবা আমাকে ধরিয়ে আনলেন। আমি আতঙ্কে কাঁপছি। না জানি কি শাস্তি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে!

বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি তোমার স্যারকে যা বলছে তার জন্যে কি তুমি লজ্জিত ?

আমি বললাম, —না।

বাবা দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি আবার ভেবেচিন্তে বলো, তুমি কি লজ্জিত ?

না।

লজ্জিত হওয়া উচিত। স্যারেরা তোমাকে পড়ান। তোমাদের শাস্তি দেয়ার অধিকার তাঁদের আছে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইবে।

আমি বাবার সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে রওনা হলাম। স্যারের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আমার ক্ষমা প্রার্থনা পর বাবা বললেন, মাস্টারসাহেব, আমার এই ছেলেটা খুব অভিমানী। সে বড় ধরনের কষ্ট পেয়েছে। অপমানিত বোধ করেছে। তাকে আমি কোনোদিন এই স্কুলে পাঠাব না। সে বাসায় থাকবে।

কি বলছেন আপনি!

আমার ছেলের অপমান আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। পরদিন হেডমাস্টার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের সব শিক্ষক বাসায় উপস্থিত। তাঁরা বাবাকে রাজি করাতে এসেছেন যাতে আমি আবার স্কুলে যাই। বাবা রাজি হলেন না। তাঁর এক কথা, আমি তাকে স্কুলে পাঠাব না।

সারাদিন একা একা বাসায় থাকি। কিছুতেই সময় কাটে না। ছোট দুই ভাইবোন স্কুলে। মা ব্যস্ত। আমার কিছু করার নেই। আমি স্কুলের সময়টা শঙ্খনদীর তীর ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে কাটাই।

বাবা মাঝে মাঝে আমাকে ট্যুরে নিয়ে যান। কখনো রামু, কখনো থানছি, কখনো নাইক্ষ্যংছড়ি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার পেছনে বাবার যে-উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা হল প্রকৃতির রূপের দিকে আমার চোখ ফেরানো। তিনি আমাকে মোটা একটা খাতা এবং কলম দিলেন যাতে আমি কি কি দেখছি তা গুছিয়ে লিখি। একদিন খাতা দেখতে চাইলেন।

যা যা লেখা হয়েছে তা পড়ে বড়ই বিরক্ত হলেন। প্রকৃতি সম্পর্কে খাতায় কিছুই লেখা নেই। যা লেখা তা পড়ে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দিলেই পরিষ্কার হবে।

মঙ্গলবার।

আজ আমরা রামু থানায় পৌঁছিয়াছি।

দুপুরে ভাত খাইয়াছি। মুরগির গোশত এবং আলু।

ডাল ছিল। ডাল খাই নাই।

বাবা বললেন, তুই কি দিয়ে ভাত খেলি তা বিতং করে লেখার কি দরকার ? অন্যরা এই খবর জেনে কি করবে ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, অন্যদের জন্যে তো আমি লিখি নাই। আমি লিখেছি আমার জন্য।

www.BDeBooks.Com

কোনদিন কি খেয়েছিস তার খোঁজেই-বা তোর কি দরকার? এই যে এত সুন্দর জলপ্রপাত তোকে দেখিয়ে আনলাম সেই প্রপাতটার কথা লিখলি না কেন?

জলপ্রপাতের কথা লিখলে কি হবে?

যারা জলপ্রপাতটা দেখে নি তারা তোর লেখা পড়ে বুঝবে জিনিসটা কেমন। যা, লিখে নিয়ে আয়। দেখি পারিস কি না।

সেই জলপ্রপাত আমাকে মোটেই আকর্ষণ করে নি। ছোট্ট পানির ধারা উপর থেকে নিচে পড়ছে। নিচে গর্তমতো হয়েছে। গর্তভরতি ঘোলা পানি। জলপ্রপাতের একটি জিনিস আমার ভালো লাগলো— পানির ধারার চারদিকে সূক্ষ্ম জলচূর্ণের জন্যে অসংখ্য রামধনু দেখা যায়। আমি রামধনু সম্পর্কেই লিখলাম। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে— ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি বালকের সেই লেখা পড়ে আমার সাহিত্যিক বাবা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শুধু মুগ্ধ না— প্রায় অভিভূত হবার মতো অবস্থা।

জলপ্রপাতবিষয়ক রচনার কারণে উপহার পেলাম— রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। গল্পগুচ্ছের প্রথম যে-গল্পটি পড়ি তার 'মেঘ ও রৌদ্র'। পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর চোখ মুছে আবার গোড়া থেকে পড়া শুরু করলাম। আমার নেশা ধরে গেল।

বান্দরবান পুলিশ লাইব্রেরিতে অনেক বই।

বাবা সেই লাইব্রেরির সেক্রেটারি। রোজ বই নিয়ে আসেন। আমি সারাদিন পড়ি। মাঝে মাঝে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা নিয়েও পড়ি। বিকেলে শঙ্খনদীর তীরে বেড়াতে যাই।

নদীর তীরেই আমার পরিচয় হল নিশাদাদার সঙ্গে। তাঁর ভালো নাম নিশানাথ ভট্টাচার্য, তাঁর বাবা পুলিশের এ. এস. আই.। নিশাদাদা বিরাট জোয়ান। কয়েকবার ম্যাট্রিক দিয়েছেন— পাস করতে পারেন নি। পড়াশোনায় তাঁর কোনো মন নেই, তাঁর মন শরীরচর্চায়। নদীর তীরে তিনি ঘণ্টাখানিক দৌড়ান। ডন-বৈঠক করেন। শেষ পর্যায়ে সারা গায়ে ভেজা বালি মেখে নদীর তীরে শুয়ে থাকেন। এতে নাকি রক্ত ঠাণ্ডা হয়। রক্ত ঠাণ্ডা হওয়া শরীরের জন্য ভালো।

স্বাস্থ্যরক্ষার নানান উপদেশ তিনি আমাকেও দেন। কথায় কথায় বলেন— Health is wealth বুঝলে হুমায়ূন, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাঁর সঙ্গে যে-কোনো গল্প করলেই তিনি কিভাবে জানি সেই গল্প স্বাস্থ্যরক্ষায় নিয়ে যান। আমার বড় মজা লাগে।

তখন ঘোর বর্ষা।

বৃষ্টি পড়ছে অবিশ্রান্ত। নিশাদাদা ভিজতে ভিজতে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। আমার মাকে ডেকে বললেন, মাসিমা, মাছ ধরতে যাচ্ছি। খেপজালে মাছ ধরব। হুমায়ূনকে নিয়ে যাচ্ছি। একা একা মাছ ধরতে ভালো লাগে না।

দর্শক ছাড়া মাছ ধরা যায় না। ছাতা দিয়ে দিন। ছাতা থাকলে বৃষ্টিতে ভিজবে না।

নিশাদাদার সঙ্গে ছাতা-মাথায় আমিও রওনা হলাম। নদীর তীরে এসে মুখ শুকিয়ে গেল। বর্ষার পানিতে শঙ্খনদী ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তীব্র স্রোত। বড় বড় গাছের গুঁড়ি ভেসে আসছে। এই শঙ্খনদী আগের ছোট্ট পাহাড়ি নদী না—এই নদী মূর্তিমতী রাক্ষুসী।

নিশাদাদা জাল ফেললেন। কী যেন ঘটে গেল। শঙ্খনদী যেন তার হাত বাড়িয়ে তাঁকে টেনে নিয়ে নিল। একবারের জন্যও তার মাথা ভেসে উঠল না। আমি ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে করতে বাসায় ফিরলাম।

নিশাদাদার লাশ পাওয়া গেল সন্ধ্যায়। সাত মাইল ভাটিতে। আমার সমস্ত পৃথিবী উলটপালট হয়ে গেল। পরের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি লিখতে সংকোচ লাগছে, না লিখেও পারছি না।

সেই রাতের ঘটনা।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। বাবা মাত্র শশ্মান থেকে ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে বসেছেন। মা জেগে আছেন। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা দুজনই আচ্ছন্ন। হঠাৎ তাঁদের কাছে মনে হল কে যেন বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আসছে। আমাদের ঘরের সামনে এসে পদশব্দ থেমে গেল। অবিকল নিশাদাদার গলায় কে যেন বলল, হুমায়ূনের খোঁজে এসেছি। হুমায়ূন কি ফিরেছে ?

বাবা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে বের হলেন। চারদিকে ফকফকা জোছনা। কোথাও কেউ নেই।

এই ঘটনার নিশ্চয়ই কোনো লৌকিক ব্যাখ্যা আছে। বাবা-মা দুজনেই ঐ রাতে একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। অবচেতন মনে ছিল মৃত ছেলেটি। তাঁরা একধরনের অডিটরি হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়েছেন। এই তো ব্যাখ্যা।

আমি নিজেও এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছি। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য ব্যাখ্যাটিই-বা খারাপ কি ? একজন মৃত মানুষ আমার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে ছুটে এসেছে অশরীরী জগৎ থেকে। উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করছে—হুমায়ূন কী ফিরেছে ?

আমার শৈশব কেটে গেল মানুষের ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে।

কি অসীম সৌভাগ্য নিয়েই-না আমি এই পৃথিবীতে জন্মেছি!

নিশাদাদার মৃত্যুর পরপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শিশুমন মৃত্যুর এই চাপ সহ্য করতে পারল না। প্রচণ্ড জ্বরে আচ্ছন্ন থেকে কয়েকদিন কেটে গেল। মাঝে মাঝে মনে হত আমি শূন্যে ভাসছি। শরীরটা হয়ে গেছে পাখির পালকের মতো। সারাক্ষণ একটা ঘোর-ঘোর অবস্থা। এই ঘোরের মধ্যেই আমাকে দেখতে এল মুরং রাজার মেয়ে। সহপাঠী রাজকন্যা। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে সেদিন আরও সুন্দর মনে হল। পৃথিবীর সমস্ত রূপ যেন সে তার শরীরে ধারণ করেছে।

www.BDeBooks.Com

সে অনেক কথাই বলল। তার কিছুই আমার মনে নেই, শুধু মনে আছে, একসময় মাথা দোলাতে দোলাতে বলছে— তুমি এত পাগল কেন ?

তার এই সামান্য কথা— কী যে ভালো লাগল! সেই ভালোলাগায় এক ধরনের কষ্টও মিশে ছিল। যে কষ্টের জন্ম এই পৃথিবীতে নয়— অন্য কোনো অজানা ভুবনে।

আমার শৈশবটা কেটে গেছে দুঃখ মেশানো আনন্দে-আনন্দে। যতই দিন যাচ্ছে সেই আনন্দের পরিমাণ কমে আসছে। আমি জানি, একসময় আমার সমস্ত পৃথিবী দুঃখময় হয়ে উঠবে। তখন যাত্রা করব অন্য ভুবনে, যেখানে যাবতীয় আনন্দ-বেদনার জন্ম।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সিলেটের মীরাবাজারের বাসায় এক গভীর রাতে ঘুম ভেঙেগিয়েছিল, দেখি মশারির ভেতর ঠিক আমার চোখের সামনে আলোর একটা ফুল ফুটে আছে। বিস্ময়, ভয় ও আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম— এটা কি ?

বাবা জেগে উঠলেন, মা জাগলেন, ভাইবোনেরা জাগল। বাবা আমার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, জোছনার আলো ঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে মশারির গায়ে পড়েছে। ভেন্টিলেটরটা ফুলের মতো নকশা-কাটা। কাজেই তোমার কাছে মনে হচ্ছে মশারির ভেতর আলোর ফুল। ভয়ের কিছুই নেই, হাত বাড়িয়ে ফুলটা ধরো।

আমি হাত বাড়াতেই সেই আলোর ফুল আমার হাতে উঠে এল, কিন্তু ধরা পড়ল না। বাকি রাতটা আমার নির্ঘুম কাটল। কতবার সেই ফুল ধরতে চেষ্টা করলাম— পারলাম না। সৌন্দর্যকে ধরতে না-পারার বেদনায় কাটল আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। আমি জানি সম্ভব না, তবু এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি একবার জোছনার ফুল ধরতে পারি— মাত্র একবার। এই পৃথিবীর কাছে আমার এর চেয়ে বেশি কিছু চাইবার নেই।

এবং হিমু

www.BDeBooks.Com

রাত একটা।

আমার জন্যে এমন কোন রাত না— বলা যেতে পারে রজনী শুরু। The night has only started. কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষগুলো আমার মত না। রাত একটা তাদের কাছে অনেক রাত। বেশির ভাগ মানুষই শুয়ে পড়েছে। যাদের সামনে SSC, HSC বা এজাতীয় পরীক্ষা তারা বই সামনে নিয়ে ঝিমুচ্ছে। নব বিবাহিতদের কথা আলাদা— তারা জেগে আছে। একে অন্যকে নানান ভঙ্গিমায় অভিভূত করার চেষ্টা করছে।

আমি হাঁটছি। বলা যেতে পারে হনহন করে হাঁটছি। নিশি রাতে সবাই দ্রুত হাঁটে। শুধু পশুরা হাঁটে মন্থর পায়ে। তবে আমার হনহন করে হাঁটার পেছনে একটা কারণ আছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছু হোটেল-রেস্টুরেন্ট এখনো খোলা। কড়কড়া ভাত, টক হয়ে যাওয়া বিরিয়ানী হয়তবা পাওয়া যাবে। তবে খেতে হবে নগদ পয়সায়। নিশিরাতের খদ্দেরকে কোন হোটেলওয়ালা বিনা পয়সায় খাওয়ায় না। আমার সমস্যা হচ্ছে, আমার গায়ে যে পাঞ্জাবি তাতে কোন পকেট নেই। পকেট নেই বলেই মানিব্যাগও নেই। পকেটহীন এই পাঞ্জাবি আমাকে রূপা কিনে দিয়েছে। খুব বাহারী জিনিস। পিওর সিল্ক। খোলা গলা, গলার কাছে সূক্ষ্ম সুতার কাজ। সমস্যা একটাই— পকেট নেই। পাঞ্জাবির এই বিরাট ত্রুটির দিকে রূপার দৃষ্টি ফেরাতেই সে বলল, পকেটের তোমার দরকার কি!

রূপবতী মেয়েদের সব যুক্তিই আমার কাছে খুব কঠিন যুক্তি বলে মনে হয়। কাজেই আমিও বললাম, তাই তো, পকেটের দরকার কি!

রূপা বলল, তুমি নিজেকে মহাপুরুষ টাইপের একজন ভাব। মহাপুরুষদের পোশাক হবে বাহুল্য বর্জিত। পকেট বাহুল্য ছাড়া কিছু না। আমি আবারো রূপার যুক্তি মেনে নিয়ে হাসিমুখে নতুন পাঞ্জাবি পরে বের হয়েছি— তারপর থেকে না খেয়ে আছি। যখন পকেটে টাকা থাকে তখন নানান ধরনের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়। তারা চা খাওয়াতে চায়, সিঙ্গাড়া খাওয়াতে চায়। আজ যেহেতু পকেটই নেই, কাজেই এখন পর্যন্ত পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়নি।

আমার শেষ ভরসা বড় ফুপার বাসা। রাত দেড়টার দিকে কলিংবেল টিপে তাদের ঘুম ভাঙালে কি নাটক হবে তা আগে-ভাগে বলা মুশকিল। বড় ফুপা তাঁর বাড়িতে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে দেখে

তিনি খুব আনন্দিত হবেন এ রকম মনে করার কোন কারণ নেই। সম্ভাবনা শতকরা ষাট ভাগ যে, তিনি বাড়ির দরজা খুললেও গ্রীল খুলবেন না। গ্রীলের আড়াল থেকে হুংকার দেবেন— গেট আউট। গেট আউট। পাঁচ মিনিটের ভেতর ক্লিয়ার আউট হয়ে যাও, নয়ত বন্দুক বের করব।

বন্দুক বের করা তাঁর কথার কথা না। ঢাকার এডিশনাল আইজি তাঁর বন্ধুমানুষ। তাঁকে দিয়ে তিনি সম্প্রতি বন্দুকের একটা লাইসেন্স করিয়েছেন এবং আঠারো হাজার টাকা দিয়ে টু টু বোরের রাইফেল কিনেছেন। সেই রাইফেল তাঁর এখনো ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

বাকি থাকেন সুরমা ফুপু। সূর্যের চেয়ে বালি গরমের মত, বড় ফুপুর চেয়ে তিনি বেশি গরম। ঢাকার এডিশনাল আইজির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব থাকলে তিনি একটা মেশিনগানের লাইসেন্স নিয়ে ফেলতেন।

তবে ভরসার কথা— আজ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবারে বড় ফুপা খানিক মদ্যপান করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে করেন, কিন্তু তাঁর পাকস্থলী ইসলামীভাবাপন্ন বলে মদ সহ্য করে না। কিছুক্ষণ পরপর তাঁর বমি হতে থাকে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে তিনি বলেন— I am a dead man. I am a dead man. ফুপু তাঁকে নিয়ে প্রায় সারারাতই ব্যস্ত থাকেন। এই অবস্থায় কলিংবেলের শব্দ শুনলে তাঁরা কেউ দরজা খুলতে আসবেন না, আসবে বাদল। এবং সে একবার দরজা খুলে আমাকে ঢুকিয়ে ফেললে আর কোন সমস্যা হবার কথা না।

বড় ফুপার বাড়ির কাছাকাছি এসে টহল পুলিশের মুখোমুখি হয়ে গেলাম। তারা দলে চারজন। আগে দু'জন দু'জন করে টহল বেরুত। ইদানীং বোধহয় দু'জন করে বেরুতে সাহস পাচ্ছে না, চারজন করে বের হচ্ছে। আমাকে দেখেই তারা থমকে দাঁড়াল এবং এমন ভঙ্গি করল যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যালকে পাওয়া গেছে। দলের একজন (সম্ভবত সবচেয়ে ভীতুজন, কারণ ভীতুরাই বেশি কথা বলে) চেঁচিয়ে বলল, "কে যায় ? পরিচয় ?"

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আমি হিমু। আপনারা কেমন আছেন, ভাল ?

পুলিশের পুরো দলটাই হকচকিয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষদের সমস্যা হচ্ছে, কুশল জিজ্ঞেস করলে এরা ভড়কে যায়। যে কোন ভড়কে যাওয়া প্রাণীর চেষ্টা থাকে অন্যকে ভড়কে দেয়ার। কাজেই পুলিশদের একজন আমার দিকে রাইফেল বাগিয়ে ধরে কর্কশ গলায় বলল, পকেটে কি ?

আমি আগের চেয়েও বিনয়ী গলায় বললাম, আমার পকেটই নেই।

'ফাজলামি করছিস ? হারামজাদা! থাবড়া দিয়ে দাঁত ফেলে দেবে।'

'দাঁত ফেলতে চান ফেলবেন। পুলিশ এবং ডেনটিস্ট এরা দাঁত ফেলবে না তো কে ফেলবে। তবে দাঁত ফেলার আগে দয়া করে একটু পরীক্ষা করে দেখুন, সত্যিই পকেট নেই।'

www.BDeBooks.Com

একজন পরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এল। সারা শরীর হাতাপিতা করে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গীদের একজনকে বলল, ওস্তাদ, আসলেই পকেট নাই।

যাকে ওস্তাদ বলা হয়েছে সে সম্ভবত দলের প্রধান এবং সবচেয়ে জ্ঞানী। সে বলল, মেয়েছেলের পাঞ্জাবি। এই হারামজাদা মেয়েছেলের পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। মেয়েছেলের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। এই চল, থানায় চল।

আমি তৎক্ষাণাৎ বললাম, জ্বি চলুন। আপনারা কোন্ থানার আন্ডারে ? রমনা থানা ?

পুলিশের দলটা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেলো। থানায় যাবার ব্যাপারে আমার মত আগ্রহী কোন আসামী তারা বোধহয় খুব বেশি পায় না।

'কি নাম বললি ?'

'হিমু।'

'যাস কই ?'

'ভাত খেতে যাই।'

'রাত দেড়টায় ভাত খেতে যাস ?'

'ভাত সব সময় খাওয়া যায়।'

ওস্তাদ যাকে বলা হচ্ছে সেই ওস্তাদ এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, বাদ দেন। ড্রাগ-ফাগ খায় আর কি। দু'টা থাবড়া দিয়ে চলে আসেন।

ওস্তাদেরও মনে হয় সে রকমই ইচ্ছা। বলে কিক মারার আনন্দ এবং গালে থাবড়া মারার আনন্দ প্রায় কাছাকাছি। টহল পুলিশের ওস্তাদ এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে কেন ?

জোরালো একটা থাবড়া খেলাম। চোখে অন্ধকার দেখার মত থাবড়া। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ওরে খাইছেরে বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। ওস্তাদ থাবড়া দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাবড়া দিয়ে যান, নয়ত খালে পড়ব। খালে পড়লে উপায় নাই, সাঁতার জানি না।

পুলিশের দল থেকে একজন বলল, ওস্তাদ, চলে আসেন।

স্পষ্টতই ওরা ঘাবড়ে গেছে। সবচে বেশি ঘাবড়ে গেছেন 'ওস্তাদ'। আমি বললাম, নিরীহ মানুষকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবেন এটা কেমন কথা ?

ওস্তাদ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। আমিও যাচ্ছি তার পেছনে পেছনে, যদিও উল্টো দিকে যাওয়াই নিয়ম। পুলিশের দল যেন কিছু হয়নি এই ভঙ্গিতে হাঁটা শুরু করেছে। আমি ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছি। তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে রাস্তা ক্রস করল। আমিও রাস্তা ক্রস করলাম।

'এই, তুই চাস কি ?'

আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে দিন, বাসায় চলে যাই।

পুলিশের দল কিছু না বলে আবার হাঁটা শুরু করেছে। আমিও তাদের অনুসরণ করছি। মানুষের ভয় চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ে, এদেরও বাড়ছে। চারজন পুলিশ, দু'জনের হাতে রাইফেল অথচ ওরা এখন আতংকে আধমরা। আমার মজাই লাগছে। আমি শিষ বাজানোর চেষ্টা করলাম— হচ্ছে না। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিষ বাজে না। পেটে ক্ষুধা নিয়ে গান গাওয়া যায়, শিষ বাজানো যায় না। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি— হিন্দী গানের একটা লাইন শিষে আমি ভালই আনতে পারি— হায় আপনা দিল তো আওয়ারা... আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে...

শিষ দেবার কারণে ক্ষুধা একটু কম কম লাগছে। বড় ফুপার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুলিশের দল হুট করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল।

আমি প্রায় দৌড়ে গলির মুখে গিয়ে বললাম, ভাইজান, আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। ফির মিলেঙ্গে। এরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। আমার সামান্য বাক্য দুটির মর্মার্থ নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করবে। আজকের রাতের টহল তাদের ভাল হবে না। আজ তারা ছায়া দেখে ভয় পাবে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হল— ফুপার বাড়ির প্রতিটি বাতি জ্বলছে। কোন একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে। আমি সেই সমস্যায় উপস্থিত হয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলব— 'ভাত খাব'। সেই বলাটাও সমস্যা। আজ বোধহয় কপালে ভাত নেই। পুলিশের থাপ্পড় খেয়েই রাত পার করতে হবে। আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজা খুলে গেল। বড় ফুপা তাঁর ফর্সা ছোটখাট মুখ বের করে ভীত চোখে আমার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, আরে তুই ? হিমু ? আয় আয়, ভেতরে আয়। এই শোন, হিমু এসেছে, হিমু।

সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে সবাই এক সঙ্গে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ আগে পুলিশকে ভড়কে দিয়ে এখন নিজেই ভড়কে যাচ্ছি।

গ্রীলের দরজা খুলতে খুলতে বড় ফুপা বললেন, কেমন আছিস রে হিমু ?

'ভাল আছি।'

বাড়ির অন্যরাও চলে এসেছে। আঠারো-উনিশ বছরের একজন তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তরুণী এমনভাবে আমাকে দেখছে যেন আমি আসলে আগ্রার তাজমহল। হেঁটে মালিবাগে চলে এসেছি। ফুপা বললেন, হেন জায়গা নেই তোকে খোঁজা হয়নি। কোথায় ছিলি ?

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। নির্বিকার ভঙ্গি ঠিক ফুটল না। আমার জন্যে এই পরিবারটির প্রবল আগ্রহের আসল কারণটা না জানলে সহজ হওয়া যাচ্ছে না। সামথিং ইজ রং, ভেরি রং। বাদল আবার ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওর কোন খোঁজ না পেয়ে আমাকে খোঁজা হচ্ছে, যদি আমি কোন সন্ধান বের করে দিই— এই হবে। এ ছাড়া আমার জন্যে এত ব্যস্ততার দ্বিতীয় কোন কারণ হতে পারে না। আমি এ বাড়ির নিষিদ্ধজন। শুধু আমি নই, আমার ছায়াও নিষিদ্ধ।

www.BDeBooks.Com

আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল কোথায় ? বাদলকে তো দেখছি না। শুয়ে পড়েছে ?

ফুপা-ফুপু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ফুপা বললেন, ও ঘরেই আছে।

'অসুক-বিসুক ?'

'না। হিমু তুই বোস, তোর সঙ্গে কথা আছে। চা খাবি ?'

'চা অবশ্যই খাব, তবে ভাত-টাত খেয়ে তারপর খাব। ফুপু, রাতে রান্না কি করেছেন ? লেফট ওভার নিশ্চয় ডীপ ফ্রীজে রেখে দিয়েছেন ?

ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, আর রান্না-রান্না! দুদিন ধরে ঘরে হাঁড়ি চড়ছে না।

'ব্যাপারটা কি ?'

ফুপা গলা পরিষ্কার করছেন। যেন অস্বস্তির কোন কথা বলতে যাচ্ছেন। ব্যাটারি চার্জ করে নিতে হচ্ছে।

'বুঝলি হিমু, আমাদের উপর দিয়ে বিরাট বিপদ যাচ্ছে। হয়েছে কি, বাদল তার বন্ধুর বোনের বিয়েতে গিয়েছিল। ঐ বিয়ে খেতে গিয়েই কাল হয়েছে—গলায় কাঁটা ফুটেছে।'

'খাসির রেজালা খেয়ে গলায় কাঁটা ফুটবে কি ? গলায় হাড় ফুটতে পারে।'

'কাঁটাই ফুটেছে। বেশি কায়দা করতে গিয়ে ওরা বাঙলি বিয়ের আয়োজন করেছে —মাছ ভাত, ডাল দৈ... ফাজিল আর কি, বেশি বেশি বাঙালি।'

'বাদলের গলার সেই কাঁটা এখন আর বেরুচ্ছে না ?'

'না।'

'ডাক্তার দেখাননি ?'

'ডাক্তার দেখাব না! বলিস কি ? হেন ডাক্তার নেই যাকে দেখানো হয়নি। আজ সকালেও একজন ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম— হা করিয়ে, চিমটা ঢুকিয়ে নানা কসরত করেছে। কাঁটা অনেক নিচে, চিমটা দিয়ে ধরতে পারছে না। দু'দিন ধরে বাদল খাচ্ছে না, ঘুমুচ্ছে না। কি যে বিপদে পড়েছি!'

'বিপদ তো বটেই।'

'কাঁটা তোলার একটা দোয়া আছে 'নিয়ামুল কোরানে', ঐ দোয়াও তোর ফুপু এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়েছে। কিছুই বাদ নেই।'

'বিড়ালের পায়ে ধরানো হয়েছে ?'

তরুণী মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই শাড়ির আঁচল মুখে চেপে হাসি থামানোর চেষ্টা করল। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হাসবে না। গ্রামবাংলার মানুষ গত পাঁচশ বছর ধরে কাঁটা ফুটলেই বিড়ালের পায়ে ধরছে। কাজেই এর একটা গুরুত্ব আছেই। কাঁটা হচ্ছে বিড়ালের খাদ্য। আমরা সেই খাদ্য খেয়ে বিড়ালের প্রতি একটা অবিচার করছি, সেই জন্যে বিড়ালের পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা।

ফুপা থমথমে গলায় বললেন, বিড়ালের পায়েও ধরানো হয়েছে। সেও এক কেলেংকারি। বিড়াল খামচি দিয়ে রক্ত-টক্ত বের করে বিশ্রী কাণ্ড করেছে। এটিএস দিতে হয়েছে। এখন তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

'আমি ?'

'হুঁ। বাদলের ধারণা একমাত্র তুই-ই পারবি, আর কেউ পারবে না। তোর ফুপা ওকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ও তোর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। হেন জায়গা নেই যে তোর খোঁজ করা হয়নি। তোকে হঠাৎ আসতে দেখে বুকে পানি এসেছে। দুটা দিন গেছে— ছেলে একটা-কিছু মুখে দেয়নি। আরো কয়েকদিন একরম গেলে তো— মরে যাবে।'

ফুপুর কথা শেষ হবার আগেই বাদল ঘরে ঢুকল। চুল উসকু-খুসকু, চোখ বসে গেছে। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললাম, খবর কি রে ?

বাদল ফ্যাকাসে ভঙ্গিতে হাসল। সাহিত্যের ভাষায় এই হাসির নাম— 'করুণ হাস্য।'

'আমি বললাম, কিরে, শেষ পর্যন্ত মাছের হাতে পরাজিত ?'

বাদল তার মুখ আরো করুণ করে ফেলল। আমি বললাম, বসে, থাক, ব্যবস্থা করছি। গোসল-টোসল করে খাওয়া-দাওয়া করে নিই, তারপর তোর প্রবলেম ট্যাকল করছি।

বাদলের মুখ মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে গেলো। তরুণী মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় ব্যঙ্গের হাসির আভাস। তবে সে কিছু বলল না। এ বাড়ির পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আমার অনুকূলে। এ রকম অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করা নিতান্তই অন্যায় হবে। আমি ফুপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, গোসল করব। ফুপু, আপনার বাথরুমে হট ওয়াটারের ব্যবস্থা আছে না ?

'গিজার নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, পানি গরম করে দিচ্ছি। গোসল করে ফেল। গোসল করে ভাত খাবি তো ?'

'হুঁ।'

'তাহলে ভাত-টাত যা আছে গরম করতে দেই।'

'ঘরে কি পোলাওয়ের চাল আছে ?'

'আছে।'

'তাহলে চট করে পোলাওয়ের কিছু চাল চড়িয়ে দিন। আলু ভাজা করুন। কুচি কুচি করে আলু কেটে ডুবা-তেলে কড়া করে ভাজা। গরম ভাত, আলু ভাজার সঙ্গে এক চামচ গাওয়া ঘি— খেতে একসেলেন্ট হবে। গাওয়া ঘি আছে তো ?'

'ঘি নেই।'

'মাখন আছে ?'

www.BDeBooks.Com

'হুঁ।'

'অল্প আঁচে মাখন ফুটাতে থাকেন। গাদ যেটা বের হবে ফেলে দেবেন— এক্কেবারে এক নম্বর পাতে খাওয়া ঘি তৈরি হবে। কয়েকটা শুকনা মরিচ ভাজবেন— ঘিয়ের মধ্যেই ভাজবেন।'

'বাদলে কাঁটাটার কিছু করা যায় কি-না দেখ।'

'দেখব। সে দু'দিন যখন অপেক্ষা করেছে আরো ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করতে পারবে। পারবি না বাদল?'

বাদল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। মনে হচ্ছে কথা বলার মত অবস্থাও তার না।

আমি আরেকবার শিষ দিয়ে বাজালাম— হায় আপনা দিল...। তরুণী মেয়েটি আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টিটা কেমন? ভাল না। সেই দৃষ্টিতে কৌতূহল আছে। শুদ্ধ কৌতূহল না, অশুদ্ধ কৌতূলহ। মেয়েটি একটা দৃশ্য দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে— সেই দৃশ্য হচ্ছে অতি চালাক একজন মানুষের গলায় দড়ি পড়ার মজাদার দৃশ্য। পুলিশদের মত এই মেয়েটাকেও ভড়কে দিতে পারলে ভাল লাগত, পারছি না। মেয়েরা পুলিশের মত এত সহজে ভড়কায় না। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমার নাম কি?

'ইরা।'

'শোন ইরা, তোমার যদি কোন কাঁটার ব্যাপার থাকে, গলায় কাঁটা বা হৃদয়ে কাঁটা তাহলে আমাকে বল, তোমার কাঁটার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।'

ইরা কঠিন ভঙ্গিতে বলল, আমার জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি গোসল করতে যান, আপনাকে গরম পানি দেয়া হয়েছে।

'এত তাড়াতাড়ি তো পানি গরম হওয়ার কথা না।'

'খাওয়ার জন্যে পানি ফুটানো হয়েছে। ঐ পানিই দেয়া হয়েছে।'

'মেনি থ্যাংকস।'

আমি খেতে বসেছি। চেয়ারে বসেই বাদলকে ডাকলাম, বাদল খেতে আয়। বাদলের জন্যে একটা প্লেট দেখি।

ফুপা বললেন, ও তো ঢোঁকই গিলতে পারছে না। ভাত খাবে কি? তুই তো ওর ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিস না।

আমি ফুপাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ডাকলাম— বাদল আয়।

বাদল উঠে এল। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করা সবার পক্ষেই সম্ভব। বাদলের পক্ষে না। আমি অন্য সবাইকে সরে যেতে বললাম। খাওয়ার সময় একগাদা লোক তাকিয়ে থাকলে খেয়ে আরাম পাই না। নিজেকে জামাই জামাই মনে হয়।

'বাদল শোন, তোর পেটে খিদে, তুই খেয়ে যাবি। গলায় ব্যথা করবে— করুক। কিছু যায় আসে না। আপাতত কিছু সময়ের জন্যে গলাটাকে পাত্তা দিবি না। কাঁটা থাকুক কাঁটার মত, তুই থাকবি তোর মত। বুঝতে পারছিস?'

'হুঁ।'

আরাম করে তুই আমার সঙ্গে ভাত খাবি। ভাত খাওয়ার পর আমরা মিষ্টি পান খাব। তারপর তোর কাঁটা নামানোর ব্যবস্থা করব।'

'হিমু ভাই, আগে করলে হয় না!'

'হয়। আগে করলেও হয়— তাতে কাঁটাটাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা ফুলকে গুরুত্ব দেব— কাঁটাকে না। ঠিক না ?'

'ঠিক।'

'আয়, খাওয়া শুরু করা যাক।'

বাদল ভাত মাখছে। আমি বললাম, শুকনা মরিচ ভাল করে ডলে নে— ঝালের চোটে নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে পানি বেরুবে, তবেই না খেয়ে আরাম। শুরু করা যাক— রেডি সেট গো...

বাদল খাওয়া শুরু করল। কয়েক নলা খেয়েই হতভম্ব গলায় বলল, হিমু ভাই, কাঁটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে!

'চলে গেলে গেছে। এতে আকাশ থেকে পড়ার কি আছে ? খাওয়া শেষ কর।'

'ওদের খবরটা দিয়ে আসি ?'

'এটা এমন কোন বড় খবর না যে মাইক বাজিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে হবে। আরাম করে খা তো। আলু ভাজিটা অসাধারণ হয়েছে না ?'

'অমৃত ভাজির মত লাগছে।'

'ঘি দিয়ে চপচপ করে খা, ভাল লাগবে।'

'আজ তুমি না এলে মরেই যেতাম। আমি সবাইকে বলেছি, হিমু ভাই-ই কেবল পারে এই কাঁটা দূর করতে। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না।'

'মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু যায় আসে না। তোর নিজের বিশ্বাসটাই প্রধান।'

'ইরা তো তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল।'

'তাই না-কি ?'

'হ্যাঁ। আমি যখন বললাম, হিমু ভাই হচ্ছে মহাপুরুষ, তখন হাসতে হাসতে সে প্রায় বিষম খায়। আজ তার একটা শিক্ষা হবে।'

বাদলের চোখে পানি এসে গেছে। ঝালের কারণে চোখের পানি, না আনন্দের পানি সেটা বোঝা যাচ্ছে। না।

একেক ধরনের চোখের পানি একেক রকম হওয়া উচিত ছিল। দুঃখের চোখের পানি হবে এক রকম, আনন্দের পানি অন্য রকম, আবার ঝালের অশ্রু আরেক রকম। প্রকৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগের ব্যবস্থা রেখেছে কিন্তু সব আবেগের প্রকাশ চোখের পানি দিয়ে সেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কি ঠিক হল ?

দুঃখের চোখের পানি হবে নীল। দুঃখ যত বেশি হবে নীল রং হবে তত গাঢ়। রাগ এবং ক্রোধের অশ্রু হবে লাল। দুঃখ এবং রাগের মিলিত কারণে যে

www.BDeBooks.Com

চোখের পানি তার রঙ হবে খয়েরি। নীল এবং লাল মিশে খয়েরি রঙই তো হয়?

কাঁটা মুক্তির যে আনন্দ এ বাড়িতে শুরু হল তার কাছে বিয়েবাড়ির আনন্দ কিছু না। ফুপু ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মরাকান্না শুরু করলেন। বাদল যতই বলে, কি যন্ত্রণা! মা, আমাকে ছাড় তো। তিনি ততই শক্ত করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন।

ফুপা আনন্দের চোটে তাঁর হুইস্কির বোতল খুলেছেন। আজ বৃহস্পতিবার। এম্নিতেই তাঁর মদ্যপান দিবস। ছেলের সমস্যার জন্যে খেতে পারছিলেন না। এখন ডবল চড়াবেন। ফুপা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছেন সংস্কৃত কবিরা সেই দৃষ্টিকে বলেন "প্রেম-নয়ন"।

শুধু ইরার চোখ কঠিন। পাথরের চোখেও সামান্য তরল ভাব থাকে। তার চোখে তাও নেই।

রাতে ফুপার বাড়িতে থেকে গেলাম। আজ আমার থাকার জায়গা হল গেস্ট রুমে। এই বাড়ির গেস্ট রুম তালাবদ্ধ থাকে। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গেস্ট এলেই শুধু তালা খোলা হয়। আজ আমি বিশেষ শ্রেণীর একজন গেস্ট। ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার জন্যে কফি চলে এল। এটিও বিশেষ ব্যবস্থার একটা অঙ্গ। কফি নিয়ে এল ইরা। ইরা সম্পর্কে এ পর্যন্ত তথ্য যা সংগ্রহ করেছি তা হচ্ছে— মেয়েটা শামসুন্নাহার হলে থেকে পড়ে। তার অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষা। হলে পড়াশোনার সমস্যা হচ্ছে, তাই এ বাড়িতে চলে এসেছে।

ফুপার খালাতো ভাইয়ের বড় মেয়ে। দারুণ নাকি ব্রিলিয়ান্ট। না পড়লেও না-কি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে। তারপরেও পড়ছে, কারণ রেকর্ড মার্ক পেতে চায়।

ইরা কফির কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আপনার ধারণা, আজ আপনি বিশেষ এক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেন?

আমি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, তোমার সেরকম ধারণা না?

'অবশ্যই না। বাদলের আপনার উপর অগাধ বিশ্বাস। আপনাকে দেখে সে রিলাক্সড বোধ করেছে। সহজ হয়েছে। ভয়ে-আতংকে তার গলার মাংসপেশী শক্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবও দূর হয়েছে। তারপর আপনি তাকে ভাত খাওয়ালেন। সহজেই কাঁটা বের হয়ে এল, আমি কি ভুল বলছি?'

'না, ভুল হবে কেন!'

'নিতান্তই লৌকিক একটা ব্যাপার করে আপনি তাতে একটা অলৌকিক ফ্লেবার দিয়ে ফেলেছেন— এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আমি কোন ফ্লেবার দেইনি ইরা, এটা তুমি কল্পনা করছ।'

'আপনি না দিলেও অন্যরা দিচ্ছে। বাদল দিচ্ছে। আপনার ফুপা-ফুপু দিচ্ছেন।'

'তাতে ক্ষতি তো হচ্ছে না। তোমার মত যারা বুদ্ধিমান তারা ঠিকই আসল ব্যাপারটা ধরতে পারছে।'

ইরা কঠিন গলায় বলল, আমাদের সমাজে কিছু কিছু প্রতারক আছে, যারা হাত দেখে, গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে, পাথর দেয়, মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে— আপনি কি তাদের চেয়ে আলাদা ? আপনি আলাদা না, আপনি তাদের মতই একজন।

'হতে পারে। কিন্তু তুমি আমার উপর এত রেগে আছে কেন ?'

'আপনি যে শুরু থেকেই আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন— সেটাও আমার খারাপ লাগছে। আমি তো স্কুলে পড়া বাচ্চা মেয়ে না। আপনি আমাকে চেনেনও না। প্রথম দেখাতেই আপনি আমাকে তুমি বলবেন না ?'

'ভুল হয়েছে। একবার যখন বলে ফেলেছি সেটাই বহাল রাখি। মানুষ আপনি থেকে তুমিতে যায়। তুমি থেকে আপনিতে যায় না। নিয়ম ভাঙা কি ঠিক হবে ?'

'আমার বেলায় নিয়মটা ভাঙলেই আমি খুশি হব।'

'এখন থেকে আপনি করে বলব।'

'ধন্যবাদ। আরেকটা কাজ কি দয়া করে করবেন ?'

'অবশ্যই করব। বলুন।'

'বাদলকে ডেকে একটু কি বুঝিয়ে বলবেন তার গলার কাঁটাটা কিভাবে গেল ? ওর মন থেকে আধিভৌতিক ব্যাপারগুলো দূর করা দরকার। আপনি বুঝিয়ে বলে দিন। আমার বলায় সে কনভিন্সড হবে না। আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে আসি।'

'জ্বি আচ্ছা, নিয়ে আসুন।'

ইরা বাদলকে নিয়ে ঢুকল। আমি বললাম, বাদল, তুই স্থির হয়ে আমার সামনের চেয়ারটায় বোস। মিস ইরা, আপনিও বসুন। তবে আপনাকে স্থির হয়ে না বসলেও চলবে। আপনি ইচ্ছা করলে নড়াচড়া করতে পারেন।

ইরা তাকাচ্ছে তীব্র চোখে। আমি তার সেই চোখ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বাদলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদল শোন, তুই যদি ভেবে থাকিস আমি আমার মহা ক্ষমতাবলে তোর গলার কাঁটা গলিয়ে ফেলেছি, তাহলে তুই বোকার স্বর্গে বাস করছিস। কিভাবে সেই ঘটনা ঘটল তা ইরা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেবে। ব্যাখ্যা শুনে তারপর ঘুমুতে যাবি। তার আগে না। মনে থাকবে ?

'থাকবে।'

'যা ভাগ।'

বাদল হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছে। ইরা এখনো তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে সে খুব অপমানিত বোধ করছে। মেয়েটা সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা মেয়ে ফিজিক্স পড়ছে কেন ? ফিজিক্স পড়বে শুকনা রস কষহীন মেয়েগুলো। ইরার পড়া উচিত ইংরেজি কিংবা বাংলা সাহিত্য।

আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ফোম বিছানো গদি— আরামের বিছানা। এত আরামের বিছানায় কি ঘুম আসবে ?

'হিমু জেগে আছিস ?'

ফুপার জড়ানো গলা। ইতোমধ্যেই তিনি উঁচু তারে নিজেকে বেঁধে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে। ফুপাকে ঘরে ঢোকানো এখন বিপদজনক হবে।

www.BDeBooks.Com

তিনি উঁচু থেকে উঁচুতে চড়তে থাকবেন, তারপর সেখান থেকে ধপাস করে নিচে নামবেন, বমি করে ঘর ভাসাবেন।

'হিমু, হিমু!'

'জ্বি।'

'তোর সঙ্গে কিছু গল্প করা যাক— ম্যান টু ম্যান টক। তুই আজ ভালই ভেল্কি দেখালি। দরজা খোল। হিমু, হিমু।'

মাতাল দরজা খোলাতে চাইলে খুলিয়ে ছাড়বে। ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকবে। কাজেই দরজা খুললাম। বড় ফুপা গ্লাস এবং বোতল হাতে ঢুকে পড়লেন।

'তোর ফুপু ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব টেনশনে গেছে তো, এখন আরামে ঘুমুচ্ছে। আমি ভাবলাম 'কণ্টক-মুক্তিটা' সেলিব্রেট করা যাক। কণ্টক-মুক্তি শব্দটা কেমন লাগছে?

'ভাল লাগছে।'

'কণ্টক মুক্তির ইংরেজি কি হেব?' "Freedom from thorn?"

'ফুপা আপনি দ্রুত চালাচ্ছেন। আমার মনে হয় এখন উচিত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া।'

'তোর সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। গল্প করতে ভাল লাগছে। আমার ধারণা তোর উপর ইনজাসটিস করা হয়েছে। তোকে যে আমি বা তোর ফুপু দেখতে পারি না এটা অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়। তোর অপরাধ কি? আমি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ভেবেছি। তোর নেগেটিভ দিকগুলো কি—

এক, তোর চাকরি বাকরি নেই। এটা কোন ব্যাপার না, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক আছে যাদের চাকরি নেই।

দুই, তুই পথে পথে ঘুরিস। এটা কোন অপরাধ হতে পারে না। এটা অপরাধ হলে পৃথিবীর সব পর্যটকরাই অপরাধী।

'আর খাবেন না ফুপা।'

'কথার মাঝখানে কথা বলিস না হিমু। আমি কি যেন বলছিলাম?'

'পর্যটকদের সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন।'

'কোন পর্যটক? হিউয়েন সাং? হিউয়েন সাং-এর কথা খামাখা বলব কেন?'

'আর না খেলে হয় না ফুপা?'

'হয়। হবে না কেন? তবে আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। হিউয়েন সাং-এর কথা কি বলছিলাম?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'শোন হিমু, তুই লোক খারাপ না। এবং তোর ক্ষমতা আছে। বাদল যে তোর নাম বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়, বাদলের কোন দোষ নেই। I Like You Himu.'

'থ্যাংক ইউ ফুপা।'

'তোর একটাই অপরাধ তুই শুধু হাঁটিস। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়। হিউয়েন সাংওতো হেঁটেছে। এই দেখ আবার হিউয়েন সাং-এর কথা চলে এসেছে। বারবার এই নাক চ্যাপ্টা চাইনিজটার কথা কেন বলছি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ফুপা চোখ মুখ উল্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর হড়হড় শব্দ হতে লাগল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। ফুপা বিছানাতে বসেছিলেন। বিছানা এবং আমার শরীরের এক অংশ তিনি ভাসিয়ে ফেলেছেন। বিড় বিড় করে বলছেন, "I am a dead man, I am a dead man."

বদরুল সাহেব আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, কোথায় ছিলেন এতদিন?

তাঁর গলা মোটা, শরীর মোটা, বুদ্ধিও মোটা। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রশস্ত মানুষের অন্তরও প্রশস্ত হয়। বদরুল সাহেবের অন্তর প্রশস্ত, মনে মায়াভাব প্রবল। আমি ছ'-সাত দিন ধরে মেসে আসছি না। কেউ হয়ত ব্যাপারটা লক্ষই করেনি। তিনি ঠিকই লক্ষ করেছেন। আমাকে দেখে তিনি যে উল্লাসের ভঙ্গি করলেন সেই উল্লাসে কোন খাদ নেই।

'কোথায় ছিলেন রে ভাই?'

আমি হাসলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর আমি ইদানীং হেসে দেবার চেষ্টা করছি। একেক ধরনের প্রশ্নের উত্তরে একেক ধরনের হাসি। এখন যে হাসি হাসলাম তার অর্থ হচ্ছে— আশেপাশেই ছিলাম।

বদরুল সাহেব বললেন, গত বৃহস্পতিবারে মেসে ফিস্ট হল। বিরাট খাওয়া-দাওয়া। পোলাও, খাসির রেজালা সালাদ। খাসির মাংস আমি নিজে কিনে এনেছিলাম। একটা আস্ত খাসি দেখিয়ে বললাম, হাফ আমাকে দাও, নো হাংকি-পাংকি।

'হাফ দিয়েছিল?'

'দিবে না মানে? মাংস কেটে আমার সামনে পিস করতে চায়। আমি বললাম, খবরদার, আগে ওজন করে তারপর পিস করবে।'

'আগে পিস করলে অসুবিধা কি?'

'আগে পিস করতে দিলে উপায় আছে? ফস করে বাজে গোসত মিক্স করে ফেলবে। কিছু বুঝতেই পারবেন না। ম্যাজিক দেখিয়ে দেবে। খাসির গোশত কিনে নিয়ে রান্না করার পর খেতে গিয়ে বুঝবেন পাঁঠার গোশত। মিস্টার পাঁঠা।'

বদরুল সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা মেসের সিঁড়িতে, তিনি বেরুচ্ছিলেন। আমাকে দেখে আমার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢুকলেন। ফিস্টের ব্যাপারটা না বলে তিনি শান্তি পাবেন না। গোশত কেনা থেকে যে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্প

www.BDeBooks.Com

শেষ হবে খাওয়া কিভাবে হল সেখানে। আমি ধৈর্য নিয়ে গল্প শোনার প্রস্তুতি নিচ্ছি। খাওয়া-দাওয়ার যে কোন গল্পে ভদ্রলোকের অসীম আগ্রহ। এত আনন্দের সঙ্গে তিনি খাওয়ার গল্প করেন যেন এই পৃথিবী সৃষ্টিই হয়েছে খাওয়ার জন্যে। খাওয়া ছাড়াও যে গল্প করার আরো বিষয় থাকতে পারে ভদ্রলোক তা জানেন না।

'খুব চর্বি হয়েছিল। গোশতের ভাজে ভাজে চর্বি।'

'বাহ্, ভাল তো।'

'চর্বিদার গোশত রান্না করা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। বাবুর্চি করে কি— যেহেতু চর্বি বেশি, তেল দেয় কম। এটা খুব ভুল। চর্বিদার গোশতে তেল লাগে বেশি।'

'জানতাম না তো!'

'অনেক ভাল ভাল বাবুর্চিই ব্যাপারটা জানে না। রান্না তো খুব সহজ ব্যাপার না। আমি নিজে বাবুর্চির পাশে বসে রান্না দেখিয়ে দিলাম।'

'খেতে কেমন হয়েছিল?'

'আমি নিজের মুখে কি বলব— আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। চেখে দেখবেন।'

'রেখে দিয়েছেন মানে? বৃহস্পতিবার ফিস্ট হয়েছে, আজ হল শনিবার।'

'দুই বেলা গরম করেছি। নিজের হাতেই করেছি। অন্যের কাছে এসব দিয়ে ভরসা পাওয়া যায় না। ঠিকমত জ্বাল দেবে না। মাংস টক হয়ে যাবে। বসুন, আমি নিয়ে আসছি।'

তিনি আনন্দিত মুখে গোশত আনতে গেলেন। আজ দিনটা মনে হয় ভালই যাবে। সকালে ভরপেট খেয়ে নিলে সারাদিন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বড় ফুপার বাসা থেকে ভোরবেলা বের হয়েছি। সবাই তখনো ঘুমে। কাজের মেয়েটা জেগে ছিল। সেই দরজা খুলে দিল। বেরিয়ে আসার সময়টুক করে এক কদমবুসি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ব্যাপার কি?

সে নিচু স্বরে বলল, খাস দিলে আফনে এট্টু দোয়া করবেন ভাইজান। আমার মাইয়াটা বহুত দিন হইছে নিখোঁজ।

'বল কি? কতদিন হয়েছে নিখোঁজ।'

'তা ধরেন গিয়া দুই বচ্ছর হইছে। এক বাড়িত কাম করত। এরা মাইর-ধইর করতো— একদিন বাড়ি থাইক্যা পালাইয়া গেছে। আর কোন খুঁইজ নাই।'

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে যাদের বাস তাদের আবেগ-টাবেগ বোধহয় কম থাকে। দু'বছর ধরে মেয়ে নিখোঁজ এই সংবাদ সে দিচ্ছে সহজ গলায়। যেন তেমন কোন বড় ব্যাপার না।

'নাম কি তোমার মেয়ের?'

'লুৎফুন্নেসা। লুৎফা ডাকি।'

'বয়স কত?'

'ছোট মাইয়া, সাত-আট বছর। ভাইজান, আফনে এট্টু চেষ্টা নিলে মেয়েটারে ফিরত পাই। মেয়ে ঢাকা শহরেই আছে।'

'জান কি করে ঢাকা শহরে আছে ?'

'আয়না পড়া দিয়া জানছি। ধনখালির পীর সাব আয়না পড়া দিয়া পাইছে। অখন আফনে একটু চেষ্টা নিলে...'

'আচ্ছা দেখি।'

সে আবার একটা কদমবুসি করে ফেলল।

সকালের শুরুটা হল কদমবুসির মাধ্যমে। শুরু হিসেবে মন্দ না। সাধু-সন্ন্যাসীর স্তরে পৌঁছে যাচ্ছি কি-না বুঝতে পারছি না। সাধু-সন্ন্যাসীরা পায়ের পবিত্র ধূলি বিতরণের মাধ্যমে সকাল শুরু করেন। তারপরের অংশে ভুরি ভোজন, ঘি, হালুয়া, পরোটা, মাংস।

বদরুল সাহেব তাঁর বিখ্যাত খাসির গোশতের বাটি নিয়ে এসেছেন। গোশত বলে সেখানে কিছু নেই। জ্বালের চোটে সব গোশত গলে কালো রঙের ঘন স্যুপের মত একটা বস্তু তৈরি হয়েছে। চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলা যায়। তবে বদরুল সাহেবের বিবেচনা আছে। তিনি সঙ্গে চায়ের চামচ এনেছেন। আমি সেই চামচে তরল খাসির মাংস এক চুমুক মুখে দিয়ে বললাম, অসাধারণ! রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার কাছাকাছি।

বদরুল সাহেব উজ্জ্বল মুখ করে বললেন, বাসি হওয়ায় টেস্ট আরো খুলেছে, তাই না ? গোশতের ঐ মজা যত বাসি তত মজা। টেস্ট খুলেছে না ?

'খুলেছে বললে কম বলা হয়। এক্কেবারে ডানা মেলে দিয়েছে।'

'গরম গরম পরোটা দিয়ে খেলে আরো আরাম পেতেন। আপনি একটু ওয়েট করুন, আমি দৌড় দিয়ে দু'টা পরোটা নিয়ে আসি। সাড়ে ছয়টা বাজে, মোবারকের স্টলে পরোটা ভাজা শুরু করেছে।'

'পরোটা আনার কোন দরকার নেই। আপনি আরাম করে বসুন তো। বরং এক কাজ করুন, আরেকটা চামচ নিয়ে আসুন, দু'জনে মিলে মজা করে খাই।'

'না না, অল্পই আছে।'

'নিয়ে আসুন তো চামচ। ভাল জিনিস একা খেয়ে আরাম নেই।'

'এটা একটা সত্য কথা বলেছেন।'

বদরুল সাহেব চামচ আনতে গেলেন। ভদ্রলোকের জন্যে আমার মায়া লাগছে। গত দু'মাস ধরে তাঁর কোন চাকরি নেই। ইনসুরেন্স কোম্পানিতে ভাল চাকরি করতেন। ইন্সপেক্টর জাতীয় কিছু। কোম্পানি তাকে ছাঁটাই করে দিয়েছেন। এই বয়সের একজন মানুষের চাকরি চলে গেলে আবার চাকরি জোগাড় করা কঠিন। ভদ্রলোক কিছু জোগাড় করতে পারছেন না। মেসের ভাড়া তিন মাস বাকি পড়েছে। যতদূর জানি, মেসের খাওয়াও তাঁর বন্ধ। ফিস্টে তার নাম থাকার কথা না, বাজার-টাজার করে দিয়েছেন, রান্নার সময় কাছে থেকেছেন এই বিশেষ কারণে হয়ত তাঁর খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

চামচ নিয়ে এসে বদরুল সাহেব আরাম করে খাচ্ছেন। তাঁকে দেখে এই মুহূর্তে মনে করার কোন কারণ নেই যে, পৃথিবীতে নানান ধরনের দুঃখ-কষ্ট

www.BDeBooks.Com

আছে। যুদ্ধ চলছে বসনিয়ায়। রুয়ান্ডায় অকারণে একজন আরেকজনকে মারছে। তাঁর নিজের সমস্যাও নিশ্চয়ই অনেক। দু'মাস বাড়িতে মনিঅর্ডার যায়নি। বাড়ির লোকজন নিশ্চয়ই আতংকে অস্থির হচ্ছে। ভদ্রলোক নির্বিকার।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'হাড়গুলো চুষে চুষে খান, মজা পাবেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'Nearer the bone, sweeter is the meat.'

আমি একটা হাড় মুখে ফেলে চুষতে লাগলাম।

তিনিও একটা মুখে নিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ প্রায় বন্ধ।

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি।'

'চাকরি-বাকরির কিছু হল ?'

'এখনো হয়নি, তবে ইনশাআল্লাহ্ হবে। আমার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা। এদের বলেছি— এরা আশা দিয়েছে।'

'শুধু আশার উপর ভরসা করাটা কি ঠিক হচ্ছে ?'

'আমার খুব ক্লোজ একজনকে বলেছি। ইস্টার্ন গার্মেন্টস-এর মালিক। ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়েছি। এখন রমরমা অবস্থা। গাড়ি-টাড়ি কিনে হুলস্থুল। বাড়ি করেছে গুলশানে।'

'তিনি কি আশা দিয়েছেন ?'

'পরে যোগাযোগ করতে বলেছে। সেদিনই সে হংকং যাচ্ছিল। দারুণ ব্যস্ত। কথা বলার সময় নেই। এর মধ্যেই সে পেস্ট্রি কোক খাইয়েছে। পূর্বাণীর পেস্ট্রি, স্বাদই অন্য রকম। মাখনের মত মোলায়েম। মুখের মধ্যেই গলে যায়। চাবাতে হয় না।'

'আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ?'

'বললাম না স্কুল-জীবনের বন্ধু। নাম হল গিয়ে আপনার ইয়াকুব। স্কুলে সবাই ডাকত— বেকুব।'

'আসলেই বেকুব ?'

'তখন তো বেকুবের মতই ছিল। তবে স্কুল-জীবনের স্বভাব-চরিত্র দেখে কিছু বোঝা যায় না। আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল রশিদ। আরে সর্বনাশ, কি ছাত্র! অংকে কোন দিন ১০০-র নিচে পায় নাই। প্রিটেস্ট পরীক্ষায় এক্সট্রা ভুল করেছে। সাত নাম্বার কাটা গেছে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। সেই রশিদের সঙ্গে একুশ বছর পর দেখা। গাল-টাল ভেঙে, চুল পেকে কি অবস্থা! চশমার একটা ডাণ্ডা ভাঙা, সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। দেখে মনটা খারাপ হল।'

'অংকে একশ পাওয়া ছেলের এই অবস্থা, মন খারাপ হবারই কথা। অংকে টেনে-টুনে পাস করলে কানে সুতা বেঁধে চশমা পরতে হত না।'

'কারেক্ট বলেছেন। একুশ বছর পর দেখা— কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবে, ছেলেমেয়ে কতবড় এসব জিজ্ঞেস করবে— তা না, ফট করে একশ' টাকা ধার চাইল।'

'ধার দিয়েছেন?'

'কুড়ি টাকা পকেটে ছিল, তা-ই দিলাম। খুশি হয়ে নিয়েছে।'

'মেসের ঠিকানা দেননি তো? মেসের ঠিকানা দিয়ে থাকলে মহা বিপদে পড়বেন। দু'দিন পরে পরে টাকার জন্যে বসে থাকবে। আপনার জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলবে।'

বদরুল সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, স্কুল-জীবনের বন্ধু তো— দুরবস্থা দেখে মনটা এত খারাপ হয়েছে, আমার নিজের চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। সুতা দিয়ে কানের সাথে চশমা বাঁধা—

বদরুল সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর নিজের ভবিষ্যতের চেয়ে বন্ধুর ভবিষ্যতের চিন্তায় তাঁকে বেশি কাতর বলে মনে হল।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ভাল একটা নাশতা হয়ে গেল, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। আপনি যে কষ্ট করে আমার অংশটা জমা করে রেখেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আরে ছিঃ ছিঃ! এটা একটা ধন্যবাদের বিষয় হল? এতদিন পর ফিস্ট হচ্ছে আপনি বাদ পড়বেন এটা কেমন কথা? তাছাড়া আপনি যেদিন মেসে খান না সেদিনের খাওয়াটা আমি খেয়ে ফেলি।'

'ভাল করেন। অবশ্যই খেয়ে ফেলবেন। দেশে টাকা পাঠিয়েছেন?'

'গত মাসে পাঠিয়েছি। এই মাস বাদ পড়ে গেল। তবে সমস্যা হবে না, আমার স্ত্রী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা— সে ব্যবস্থা করে ফেলবে।'

'আপনার চাকরি যে নেই সেই খবর স্ত্রীকে জানিয়েছেন?'

'জ্বি-না। আপনার ভাবী মনটা খারাপ করবে। কি দরকার! চাকরি তো পাচ্ছিই, মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে টেনশানে ফেলে লাভ কি? আজই ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করব। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না— "শুভস্য শীঘ্রম"। চা খাবেন হিমু ভাই?'

'জ্বি-না। দরজা-টরজা বন্ধ করে লম্বা ঘুম দেব। আমার স্বভাব হয়ে গেছে বাদুরের মত। দিনে ঘুমাই রাতে জেগে থাকি।'

'কাজটা ঠিক হচ্ছে না ভাই সাহেব। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীর নষ্ট হলে— মন নষ্ট হয়। আমার শরীরটা ঠিক আছে বলেই এত বিপদে-আপদেও মনটা ঠিক আছে। শরীরটা ঠিক রাখবেন।'

'আমার আবার উল্টা নিয়ম। মনটাকে ঠিক রাখি যাতে শরীর ঠিক থাকে।'

www.BDeBooks.Com

বদরুল সাহেব বাটি এবং চামচ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, ছোট্ট একটা কাজ করে দেবেন হিমু ভাই!

'জ্বি, বলুন।'

'মেসের ম্যানেজার আমাকে বলেছে সোমবারের মধ্যে মেস ছেড়ে দিতে। আজেবাজে সব কথা। গালাগালি। আপনি যদি একটু বলে দেন! ও আপনাকে মানে।'

'আমি এক্ষুণি বলে দিচ্ছি।'

'তাকে বললাম যে চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুবকে বলেছি। এত বড় গার্মেন্টস-এর মালিক। চাকরি তার কাছে কিছুই না। সে একটা নিঃশ্বাস ফেললে দশটা লোকের এমপ্লয়মেন্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস করে না। আপনি বললে বিশ্বাস করবে।'

আমাদের ম্যানেজারের নাম হায়দার আলি খাঁ। নামের সঙ্গে তার চেহারার কোন সঙ্গতি নেই। রোগা, বেঁটে একজন মানুষ। বেঁটেরা সচরাচর কুঁজো হয় না। তিনি খানিকটা কুঁজো। ব্যক্তিবিশেষের সামনে তার কুঁজোভাব প্রবল হয়। আমি সেই ব্যক্তিবিশেষের একজন। তিনি কোন কারণ ছাড়াই আমাকে ভয় পান।

হায়দার আলি খাঁ চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসে আছে। পিরিচে করে চা খাচ্ছে। ঐ লোককে আমি কখনো চায়ের কাপে করে চা খেতে দেখিনি। আমি কাছে এসে হাসিমুখে বললাম, ভাই সাহেব, খবর কি ?

ভদ্রলোক যেভাবে চমকালেন তাতে মনে হল, সাত রেক্টার স্কেলের একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পিরিচের সব চা তাঁর জামায় পড়ে গেল। আমি বললাম, করছেন কি ?

'চা খাচ্ছি স্যার।'

'খুব ভাল। বেশি বেশি করে চা খান। রিসার্চ করে নতুন বের করেছে— দৈনিক যে সাত কাপ চা খায় তার হার্টের আর্টারি কখনো ব্লক হয় না।'

'থ্যাংক য়্যু, স্যার।'

যেভাবে তিনি থ্যাংক য়্যু বললেন তাতে ধারণা হতে পারে হার্টের আর্টারি সংক্রান্ত রিসার্চটা আমার করা। আমি অবসর সময়ে মেসের ঘরের দরজা বন্ধ করে রিসার্চ করেছি।

'বদরুল সাহেবকে নাকি নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন— কথা কি সত্যি ?'

'জ্বি। তিন মাসের রেন্ট বাকি। আর নানান যন্ত্রণা করে। বোর্ডাররা নালিশ করেছে।'

'কি যন্ত্রণা করেছে ?'

'রান্নার সময় বাবুর্চির পাশে বসে থাকে। ফিস্ট হয়েছে, ত্রিশ' টাকা করে চাঁদা। একটা পয়সা দেয় নাই— ফিস্ট খেয়ে বসে আছে।'

'চাঁদা না দিলেও খাটাখাটনি তো করেছে। গোশত কিনে আনা, খাসির গোশত যে-কেউ কিনতে পারে না। খুবই জটিল ব্যাপার। খাসি ভেবে কিনে এনে রান্নার পর প্রকাশ পায় পাঁঠা।'

হায়দার আলি খাঁ তাকাচ্ছেন। আমার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারছেন না। কি বলবেন তাও গুছিয়ে উঠতে পারছেন না।

'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'বদরুল সাহেবকে আর কিছু বলবেন না।'

'তিন মাসের রেন্ট বাকি পড়ে গেছে। অন্য পার্টিকে কথা দিয়ে ফেলেছি। মানুষের কথার একটা দাম আছে। ঠিক না স্যার ?'

'ঠিক তো বটেই। কথার দাম আগে যা ছিল মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই দাম আরো বেড়েছে। তবু একটা ব্যবস্থা করুন। এক মাসের মধ্যে সব পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে।'

'কিভাবে হবে ? শুনেছি উনি ছাঁটাই হয়ে গেছেন। অফিসের পাওনা টাকাপয়সাও দিচ্ছে না। টাকা পয়সার কি না-কি গণ্ডগোল আছে।'

'গণ্ডগোল তো থাকবেই। পৃথিবীতে বাস করবেন আর গণ্ডগোলে পড়বেন না, তা তো হয় না। এই গণ্ডগোল নিয়েই বাস করতে হবে। উপায় কি ? মনে থাকবে তো কি বললাম ?'

'জ্বি স্যার।'

আমি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ম্যানেজার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জ্বি স্যার বলেছে বলেই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। বিনয়ের বাড়াবাড়িটাই সন্দেহজনক। আমার নিজের ধারণা বিনয় ব্যাপারটা পৃথিবী থেকে পুরোপুরি উঠে গেলে পৃথিবীতে বাস করা সহজ হত। বিনয়ের কারণে সত্য-মিথ্যা প্রভেদ করা সমস্যা হয়। মিথ্যার সঙ্গে বিনয় মিশিয়ে দিলে সেই মিথ্যা ধরার কারো সাধ্য থাকে না।

ঘুমের চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। বেশ কয়েকদিন থেকে নিদ্রা এবং জাগরণের সাইকেলটা বদলাবার চেষ্টা করছি। রাত ঘুমের জন্যে এবং দিন জেগে থাকার জন্যে, এই নিয়ম ভাঙা দরকার। মানুষ ঘুমকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সূর্য নিয়ন্ত্রণ করবে না। সূর্য হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিগোলক। মানুষের মত অসাধারণ মেধার প্রাণীগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার তার কোন অধিকার নেই।

টানা ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়। এই সময় মেসটা ফাঁকা ফাঁকা থাকে। বেশির ভাগই চা-নাশতা খেতে বাইরে যায়। মেসে শুধু একবেলা খাবার ব্যবস্থা, রাতে। এক কাপ চা খেতে হলেও রাস্তা পার হয়ে স্টলে যেতে হবে। ইদানীং অবশ্যি নতুন এক চাওয়ালা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এরা বিশাল ফ্লাস্কে করে চা ফেরি করে। চায়ের দাম ফিক্সড— এক টাকা কাপ। চিনি বা দুধের দাম বাড়লে কাপের সাইজ ছোট হয় কিন্তু চায়ের দামের হের-ফের হয় না। আমাদের এখানে যে ছেলে চা বিক্রি করে তার নাম মতি। দেখতে রাজপুত্রের মত, আসলে ভিখিরপুত্র।

www.BDeBooks.Com

বাবারান্দায় এসে মতিকে খুঁজলাম। মতি এখনো আসেনি, তবে অপরিচিত এক ভদ্রলোক এসেছেন। শুকনো মুখে টুলে বসে আছেন। ভদ্রলোক অপরিচিত হলেও দেখামাত্র চিনলাম— কারণ তাঁর চশমার একটা ডাঁটা ভাঙা সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ভদ্রলোক সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, কি ভাই, ভাল আছেন ?

তিনি হকচকিয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়ালেন।

'বদরুল সাহেবের কাছে এসেছেন, তাই তো ?'

'জ্বি স্যার ?'

'টাকা ধারের জন্যে ?'

ভদ্রলোকে খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। চট করে কিছু বলতে পারছেন না। আবার খুব চেষ্টা করছেন কিছু বলতে।

আমি বললাম, বদরুল সাহেব আমাকে আপনার কথা বলেছেন। খুবই প্রশংসা করছিলেন। প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় একটা এক্সটা না-কি ভুল হয়েছিল। তাড়াহুড়া করেছিলেন নিশ্চয়ই। অনেক সময় ওভার কনফিডেন্সেও সমস্যা হয়। যাই হোক, কেমন আছেন বলুন।

'জ্বি ভাল। বদরুল কখন আসবে ?'

'উনি আসবেন কোত্থেকে ?'

'এখানে থাকেন না ?'

'আগে থাকতেন। মেসে অনেক বাকি পড়ে গেছে। চারদিকে ধার-দেনা। পালিয়ে গেছেন।'

'নিচের ম্যানেজার সাহেব আমাকে বললেন, মেসেই থাকে।'

'ম্যানেজার তাই বলেছে ? সে রকমই বলার কথা। সেও জানে না। জানলে জিনিসপত্র ক্রোক করে রেখে দিত। চুপি চুপি পালিয়েছে। শুধু আমি জানি। আপনাকে বললাম, কারণ আপনি তার ক্লোজ ফ্রেন্ড। ছাত্র জীবনের বন্ধু। অংকে সব সময় হাই মার্ক পেয়েছেন।'

'বদরুল থাকে কোথায় ?'

'সেটাও বলা নিষেধ। যাই হোক, আপনাকে বলছি। দয়া করে খবরটা গোপন রাখবেন। উনি টেকনাফের দিকে চলে গেছেন।'

'কোন দিকে গেছে বললেন ?'

'টেকনাফের দিকে। চিটাগাং হিল ট্রেক্ট। তাঁর দূর সম্পর্কের এক মামা আছেন, বন বিভাগে চাকরি করেন, তাঁর কাছে গেছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা যেন কি ?'

'আবদুর রশীদ।'

'শুনুন আবদুর রশীদ সাহেব। উনার জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। এখানে উনার খোঁজে আসাও অর্থহীন। চলে যান।'

'চলে যাব ?'

'আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি, শুধু চা। খাবেন ?'

আবদুর রশীদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি আশাহত। আমি ভদ্রলোককে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। চা খাওয়ালাম, সিঙ্গাড়া খাওয়ালাম। এইখানেই শেষ করলাম না, রাস্তার পাশে ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে চশমার ডাঁটা লাগিয়ে দিলাম। আমার সর্বমোট ১৩ টাকা খরচ হল।

ভদ্রলোক বললেন, ভাই সাহেব, আপনাকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন। আপন ভেবে বলছি।

'বলুন, কিছু মনে করব না।'

'কথাটা বলতে খুবই লজ্জা পাচ্ছি। আপনি অতি মহৎপ্রাণ এক ব্যক্তি। আপনাকে বিব্রত করতেও লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে...'

'মাথা কাটা যাওয়ার কিছু নেই, আপনি বলুন।'

'দারুণ এক সংকটে পড়েছি ভাই সাহেব। আত্মহত্যা ছাড়া এখন আর পথ দেখছি না।'

'ছেলে অসুস্থ। টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না ?'

'ধরেছেন ঠিকই। তবে ছেলে না, মেয়ে। কনিষ্ঠা কন্যা। সকাল থেকে হাঁপানির মত হচ্ছে। ডাক্তার ইনজেকশনের কথা বলল—'

'দাম কত ইনজেকশনের ?'

'শ'খানেক টাকা হলে হয়। ইনজেকশন, সেই সঙ্গে কি ট্যাবলেট যেন দিয়েছে। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, চিকিৎসা করার টাকা কোথায় ? তুমি বরং গলা টিপে মেরে ফেল।'

'উনি গলা টিপে মারতে রাজি হচ্ছেন না ?'

আবদুর রশীদ আমার এই কথায় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। আমি বললাম, এসব কঠিন কাজ স্ত্রীলোক দিয়ে হবে না। এসব হল পুরুষের কাজ। গলা টিপে মারতে হলে আপনাকেই মারতে হবে।

'ভাই সাহেব, ঠাট্টা করছেন ?'

'না, ঠাট্টা করছি না। মৃত্যু কোন ঠাট্টা-তামাশার বিষয় না। আমি আপনাকে একশ' টাকা দেব।'

'দিবেন ? সত্যি দিবেন ?'

'অবশ্যই দেব। স্কুল-জীবনে আপনি অংকে খুব ভাল ছিলেন, তাই না ? কেমন ভাল ছিলেন প্রমাণ দিন দেখি। সহজ একটা অংক জিজ্ঞেস করব। কারেক্ট উত্তর দেবেন— একশ' টাকা নিয়ে চলে যাবেন।'

আবদুর রশীদ ক্ষীণ স্বরে বলল, কি অংক ?

'একটা বাড়িতে চারটা হারিকেন জ্বলছিল। গভীর রাতে কথা নেই বার্তা নেই শুরু হল ঝড়। একটা হারিকেন গেল নিভে। এখন আপনি বলুন ঐ বাড়িতে হারিকেন এখন কয়টা ?'

www.BDeBooks.Com

'তিনটা!'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, হয়নি। একটা হারিকেন নিভে গেছে ঠিকই। হারিকেনের সংখ্যা তো কমেনি। হারিকেন চারটাই আছে। আপনি তো ভাই অংক শিখতে পারেননি। টাকাটা দিতে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।

আবদুর রশীদ দাঁড়িয়ে আছে— আমি হাঁটা ধরেছি। মেসে ফিরে যাব। সারাদিন কিছু না খাওয়াতে খিদেয় নাড়িভূড়ি পাক দিচ্ছে। মেসে রান্না হয়েছে কি-না খোঁজ নিতে হবে। মেসের ভাত সকাল সকাল নেমে যায়। ভাত নেমে গেলে একটা ডিম ভেজ দিতে বলব। আগুন-গরম ভাত ডিমভাজা দিয়ে খেতে অতি উপাদেয়। তবে খেতে হয় চুলা থেকে ভাত নামার সঙ্গে সঙ্গে, দেরি করা যায় না।

ঘর থেকে বেরুবার জন্যে রাত বারোটা খুব ভাল সময়। জিরো আওয়ার। কাউন্ট আপ শুরু হয় জিরো আওয়ার থেকে— 0, 1, 2, 3... ঠিক রাত বারোটায় কি বার হবে ? শনিবার নয়, রবিবারও নয়। জিরো আওয়ারে বার থেমে থাকে।

দরজা তালাবন্ধ করে বেরুচ্ছি, দেখি বদরুল সাহেব। কলঘর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফিরছেন। মুখ ভেজা, কাঁধে গামছা। রাত বারোটায় আমার মন-টন খুব ভাল থাকে। কাজেই আমি উল্লাসের সঙ্গেই বললাম, কি খবর বদরুল সাহেব।

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

'কোথায় ছিলেন আজ সারাদিন ?'

তিনি আবারো হাসলেন। আমি বললাম, গিয়েছিলেন নাকি ইয়াকুব আলির কাছে ?

'জ্বি।'

'দেখা হয়নি ?'

'দেখা হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত।'

'কথা হয়নি ?'

'হয়েছে। চাকরির ব্যাপারটা বললাম।'

'আগেও তো বলেছিলেন। আবার কেন ?'

'ভুলে গিয়েছে। নানান কাজকর্ম নিয়ে থাকে তো। আজকে তার আবার একটা দুর্ঘটনা ঘটল। তার মনটা ছিল খারাপ।'

'কি দুর্ঘটনা ?'

'একুশ লাখ টাকা দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে। সেই গাড়ির হেডলাইট ভেঙে ফেলেছে। কেয়ারলেস ড্রাইভার। ঐ নিয়ে নানান হৈ-চৈ, ধমকাধমকি চলছে, তার মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম।'

'আপনি ধমক খেয়েছেন ?'

'জ্বি-না, আমি ধমক খাব কেন ? আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ভেরি ক্লোজ ফ্রেন্ড। গাড়ির হেডলাইট ভাঙার কারণে ইয়াকুবের মন খারাপ দেখে আমারো মন খারাপ হল। এর মধ্যে চাকরির কথাটা তুলে ভুল করেছি।'

'ইয়াকুব সাহেব রেগে গেছেন ?'

'তা ঠিক না। বলল বায়োডাটা তার সেক্রেটারির কাছে দিয়ে যেতে। দু'টা পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ বায়োডাটা, সে দেখবে।'

'দেখবে বলেছে ?'

'দেখবে তো বটেই। স্কুল-জীবনের বন্ধু, ফেলবে কি করে ? বায়োডাটা নিয়েই সারাদিন ছোটাছুটি করলাম। একদিনের মধ্যে ছবি তুলে, বায়োডাটা টাইপ করে, পাঁচটার সময় একেবারে ইয়াকুবের হাতেই ধরিয়ে দিয়েছি।'

'ইয়াকুব সাহেব আপনার কর্মতৎপরতা দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হলেন।'

বদরুল চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, খুশি হননি ?

'জ্বি-না। একটু মনে হয় বেজার হয়েছে। সেক্রেটারির হাতে দিতে বলেছে, আমি তা না করে তার হাতেই দিলাম— এতে সামান্য বিরক্ত। এত বড় একটা অর্গানাইজেশন চালায়। তার তো একটা সিস্টেম আছে। হুট করে হাতে কাগজ ধরিয়ে দিলে হবে না। ভুলটা আমার।'

'বদরুল সাহেব, আপনার কি ধারণা ইয়াকুব আলি আপনাকে চাকির দেবেন ?'

'অবশ্যই। আমার সামনেই সেক্রেটারিকে ডেকে বায়োডাটা দিয়ে দিল। বলল উপরে আর্জেন্ট লিখে ফাইলে রাখতে।'

'কবে নাগাদ চাকরি হবে বলে মনে করছেন ?'

'খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ। ইয়াকুব আমাকে এক সপ্তাহ পরে খোঁজ নিতে বলেছে। আগামী শনিবারের মধ্যে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে। স্বপ্নেও তা-ই দেখলাম।'

'এর মধ্যে স্বপ্নও দেখে ফেলেছেন ?'

'জ্বি। ছোটাছুটি করে কাগজপত্র জোগাড় করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, একটু রেস্ট নেই। ইয়াকুবের পি. এ. বলল, বসুন, চা খান। চা খাওয়ার জন্যে বসেছি। বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনির মত এসে গেল। তখন স্বপ্নটা দেখেছি। দেখলাম কি— ইয়াকুব এসেছে। তার হাতে বিরাট এক মৃগেল মাছ। এইমাত্র ধরা হয়েছে। ছটফট করছে। ইয়াকুব বলল, নিজের পুকুরের মাছ। তোর জন্যে আনলাম। নিয়ে যা। মাছ স্বপ্নে দেখা খুবই ভাল। হিমু ভাই, আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?'

'হাঁটতে যাচ্ছি।'

'রাতদুপুরে কেউ হাঁটতে যায় ? আশ্চর্য! দুপুর রাতে হাঁটার মধ্যে আছে কি ?'

'চলুন, আমার সঙ্গে হেঁটে দেখুন।'

'যেতে বলছেন ?'

'এক রাতে একটু অনিয়ম করলে কিছু হবে না।'

'খুবই টায়ার্ড লাগছে হিমু ভাই। ভাবছি ঘুমুব।'

www.BDeBooks.Com

'ঘুম তো আপনার আসবে না। খিদে পেটে শুয়ে ছটফট করবেন। এরচে চলুন কোথাও নিয়ে গিয়ে আপনাকে খাইয়ে আনি। মনে হচ্ছে সারাদিন কিছু খাননি।'

'সারাদিন খাইনি কি করে বুঝলেন ?'

'বোঝা যায়। মানুষের সব খবর তার চোখে লেখা থাকে। ইচ্ছে করলেই সেই লেখা পড়া যায়। কেউ ইচ্ছে করে না বলে পড়তে পারে না।'

'আপনি পারেন ?'

'মাঝে মাঝে পারি। সব সময় পারি না। আপনি যে সারাদিন খাননি এটা আপনার চোখে পড়তে পারছি। এই সঙ্গে আরেকটা জিনিস পড়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আজ দিনটা আপনার জন্যে খুব আনন্দের।'

বদরুল সাহেব হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। হতভম্ব ভাব কাটার পর বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ আমার বিবাহ বার্ষিকী। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার সময় হঠাৎ মনে হয়েছে— আরে আজ তো ২৫শে এপ্রিল।

'চলুন, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিয়ের দিনে গল্প করবেন। অনেকদিন কারো বিয়ের গল্প শুনি না।'

বদরুল সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, বলার মত কোন গল্প না।

'সব গল্পই বলার মত।'

রাস্তায় নেমেই বদরুল সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, হাঁটতে তো ভালই লাগছে। রাস্তাগুলো অন্য রকম লাগছে। আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা কি ?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করলাম না। রাতের বেলা রাস্তার চরিত্র বদলে যায় কেন সেই ব্যাখ্যা একেক জনের কাছে একেক রকম। আমার ব্যাখ্যা আমার কাছেই থাকুক।

বদরুল সাহেব বললেন, হাঁটতে হাঁটতে আমরা কোথায় যাব ?

আমি বললাম, মাথায় কোন নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে হাঁটার কোন আরাম থাকে না। হাঁটতে হবে এলোমেলোভাবে। বলুন কিভাবে আপনাদের বিয়ে হল।

'মুন্সিগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খালার শ্বশুরবাড়িতে। ওদের একান্নবর্তী পরিবার। লোকজন গিজ গিজ করছে। কে কখন খায় কোন ঠিক নেই। খাওয়া-দাওয়ার ভেতরে কোন যত্ন নেই। খেলে খাও, না খেলে খেও না ওই রকম ভাব। মাঝে মাঝে কি হয় জানেন ? ভাল একটা পদ হয়ত রান্না হচ্ছে, এদিকে বেশির ভাগ মানুষ খেয়ে উঠে গেছে। কেউ জানেই না— মূল পদ এখনো রান্না হয় নি...

বদরুল সাহেব তাঁর বিয়ের গল্পের জায়গায় খাওয়ার গল্প ফেঁদে বসেছেন। এই খাওয়া-দাওয়ার ভেতর থেকে বিয়ের গল্প হয়ত শুরু হবে, কখন হবে কে জানে। ভদ্রলোকের সম্ভবত খিদেও পেয়েছে। খিদের সময় শুধু খাবার কথাই মনে পড়ে। তাঁকে খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না। আবারো

পকেটবিহীন পাঞ্জাবি নিয়ে বের হয়েছি। এই পাঞ্জাবি মনে হয় আর ব্যবহার করা যাবে না। বদরুল সাহেব গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন— সেদিন কি হয়েছে শুনুন। পাবদা মাছ এসেছে। এক খলুই মাছ, প্রত্যেকটা দেড় বিঘৎ সাইজ। এ বাড়িতে আবার অল্প কিছু আসে না। যা আসে ঝুড়ি ভর্তি আসে...

আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকলাম। বদরুল সাহেবের গল্পে বাধা পড়ল। আমরা টহল পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। খাকি পোশাকের কারণে সব পুলিশ একরকম মনে হলেও এটি যে গতকালেরই দল এতে আমার কোন সন্দেহ রইল না। আমি আন্তরিক ভঙ্গিতে বললাম, কি খবর ?

টহল পুলিশের দল থমকে দাঁড়াল।

'আজ আপনাদের পাহারা কেমন চলছে ?'

এই প্রশ্নেরও জবাব নেই। বদরুল সাহেব হকচকিয়ে গেছেন। কথাবার্তার ধরন ঠিক বুঝতে পারছেন না।

কালকের ওস্তাদজি আজও প্রথম কথা বললেন, তবে তুই-তোকারি না, ভদ্র ভাষা।

'আপনারা কোথায় যান ?'

'ভাত খেতে যাই। আজ অবশ্যি আমি খাব না। এই ভদ্রলোক খাবেন। উনার নাম বদরুল আলম। উনাকে থাপ্পড় দিতে চাইলে দিতে পারেন। উনিও কিছু বলবেন না। উনিও আমার মতই বিশিষ্ট ভদ্রলোক।'

বদরুল সাহেব ফিসফিস করে বললেন, ব্যাপারটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কি সমস্যা ?

'কোন সমস্যা না। জনগণের সেবক পুলিশ ভাইরা এখন আপনার রাতের খাবার ব্যবস্থা করবেন।'

পুলিশ দলের একজন বলল, কালকের ব্যাপারটা মনে রাখবেন না। নানা কিসিমের বদলোক রাস্তায় ঘুরে, নেশা করে। আমরা বুঝতে পারি নাই। একটা মিসটেক হয়েছে।

'আমি কিছু মনে করিনি। মনের ভেতর অতি সামান্য খচখচানি আছে, সেটা দূর হয়ে যাবে— যদি আপনারা বদরুল সাহেবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।'

'এত রাতে ?'

'আপনাদের কারবারই তো রাতে। আপনাদের একটা বুদ্ধি শিখিয়ে দি— কোন একটা বাড়িতে গিয়ে কলিংবেল টিপুন। বাড়িওয়ালা দরজা খুলে এতগুলো পুলিশ দেখে যাবে ভড়কে। তখন আপনাদের যে ওস্তাদ তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বলবেন, স্যার, এত রাতে ডিসটার্ব করার জন্যে খুবই দুঃখিত। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সারাদিন না খেয়ে আছেন। যদি একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করেন! দেখবেন তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা হবে। মধ্যরাতের পুলিশ ভয়াবহ জিনিস।'

www.BDeBooks.Com

বদরুল সাহেবের হতভম্ব ভাব কাটছে না। তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণাও সম্ভবত মাথায় উঠে গেছে। পুলিশ দলের একজন আমার কাছে এগিয়ে ফিসফিস করে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু 'প্রাইভেট টক' আছে।

আমি 'প্রাইভেট টক' শোনার জন্যে ফুটপাত ছেড়ে নিচে নামলাম। সে কানের কাছে গুন গুন করে বলল, স্যার, বিরাট মিসটেক হয়েছে। রাস্তায় কত লোক হাঁটে, কে সাধু, কে শয়তান বুঝব কি ভাবে!

আমিও তার মতই নিচু গলায় বললাম, না বোঝারই কথা।

'ওস্তাদজী একটা ভুল করেছে। চড় দিয়ে ফেলেছে। তারপর থেকে উনার হাত ফুলে প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথার চোটে রাতে ঘুমাতে পারেননি।'

'বেকায়দায় চড় দিয়েছে। রগে টান পড়েছে। কিংবা হাতের মাসলে কিছু হয়েছে।'

'কি যে ব্যাপার সেটা স্যার আমরা বুঝে গেছি। এখন স্যার আমাদের ক্ষমা দিতে হবে। এটা স্যার আমাদের একটা আবদার।'

'আচ্ছা যান, ক্ষমা দিলাম।'

'ওস্তাদজী আজ ছুটি নিয়েছে। সারাদিন শুয়েছিল, রাতে বের হয়েছে শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'ভালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল।'

'আপনি স্যার আমাদের জন্যে একটু দোয়া রাখবেন।'

'অবশ্যই রাখব।'

'উনার খাবার ব্যাপারে স্যার কোন চিন্তা করবেন না।'

আমি বদরুল সাহেবকে বললাম, আপনি এদের সঙ্গে যান। খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর মেসে চলে যাবেন। আমি ভোরবেলা ফিরব।

তিনি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। কিছুতেই যাবেন না। পুলিশরা বলতে গেলে তাকে গ্রেফতারই করেই নিয়ে গেল। বেচারার হতাশ দৃষ্টি দেখে মায়া লাগছে। মায়া ভাল জিনিস না। অনিত্য এই সংসারে মায়া বিসর্জন দেয়া শিখতে হয়। আমি শেখার চেষ্টা করছি।

বাদুর-স্বভাব আয়ত্ত করার চেষ্টা সফল হচ্ছে না। বাদুর-ভাব কয়েকদিন থাকে তারপর ভেতর থেকে মানুষ-ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাতে ঘুমুতে ইচ্ছে করে। দিনে হাজার চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারি না। এখন আমার মানুষ ফেজ চলছে। রাতে ঘুমুচ্ছি, দিনে জেগে আছি। রাস্তায় যাচ্ছি। হাঁটাহাঁটি করছি। দিনে হাঁটাহাঁটি করার মধ্যেও কিছু থ্রিল আছে। হঠাৎ হঠাৎ খুব বিপদজনক কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যার সঙ্গে নিশি রাতে দেখা হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। রাত তিনটার সময় নিশ্চয়ই রেশমা খালার সঙ্গে নিউমার্কেটের কাছে দেখা হবে না। প্রায় দু'বছর পর রেশমা খালার সঙ্গে দেখা। পাজেরো নামের অভদ্র গাড়ির

ভেতর ড্রাইভারের সিটের পাশে তিনি বসে আছেন। তাঁর মত মহিলা ড্রাইভারের পাশে বসবেন ভাবাই যায় না। তবে শুনেছি পাজেরো গাড়িগুলো এমন যে ড্রাইভারের সীটের পাশে বসা যায়। এতে সম্মান হানি হয় না।

রেশমা খালা হাত উঁচিয়ে ডাকলেন, এই হিমু, এই...। ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিতে লাগল। আমার উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। কোন গলিটলির ভেতর ঢুকে পড়া। গলি না থাকলে ম্যানহোলের ঢাকনি খুলে তার ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়া। কিছু কিছু ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে ১০০ হাত দূরে থাকুন। রেশমা খালা সেই ট্রাকের চেয়েও ভয়াবহ। আশেপাশে গলি বা ম্যানহোল নেই। কাজেই আমি হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম। রাস্তা পার হবার আগেই খালা চেঁচিয়ে বললেন, হিমু, তুই নাকি গলার কাঁটা নামাতে পারিস?

রেশমা খালা আমার কেমন খালা জানি না। লতায়-পাতায় খালা। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশ পার হলেও এই মুহূর্তে খুকি সেজে আছেন। মাথা ভর্তি ঢেউ-খেলানো ঘন কাল চুল। এই চুল হংকং থেকে আনানো। ঠোঁট লাল টুক টুক করছে। জামদানি শাড়ি পরেছেন। গলায় মাটির মালা। কানে মাটির দুল। এটাই লেটেস্ট ফ্যাশান। শান্তিনিকেতন থেকে আমদানি হয়েছে।

আমি গাড়ির কাছে চলে এলাম। রেশমা খালা চোখ বড় বড় করে বললেন— বাদলের মা'র কাছে ঘটনা শুনলাম। বড় বড় সার্জন কাত হয়ে গেছে— তুই গিয়েই মন্ত্র-টন্ত্র পড়ে কাঁটা নামিয়ে ফেললি। কি রে, সত্যি?

'হ্যাঁ সত্যি। তোমার কাঁটা লাগলে খবর দিও, নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তোকে খবর দেব কি ভাবে? তোর ঠিকানা কি? তোর কোন কার্ড আছে?'

'ঠিকানাই নাই— আবার কার্ড!'

'তুই এক কাজ কর না। আমার বাড়িতে চলে আয়। একতলাটা তো খালিই পড়ে থাকে। একটা ঘরে থাকবি। আমার সঙ্গে খাবি। ফ্রী থাকা-খাওয়া।'

'দেখি, চলে আসতে পারি।'

'আসতে পারি-টারি না। চলে আয়। তুই কাঁটা নামানো ছাড়া আর কি পারিস?'

'আপাতত আর কিছু পারি না।'

'কে যেন সেদিন বলল, তুই ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারিস। তোর সিক্সথ সেন্স নাকি খুব ডেভেলপড।'

আমি হাসলাম। আমার সেই বিশেষ ধরনের হাসি। হাসি দেখে রেশমা খালা আরো অভিভূত হলেন।

'এই হিমু, গাড়িতে উঠে আয়।'

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'কোথাও যাচ্ছি না। খালি বাড়িতে থাকতে কতক্ষণ আর ভাল লাগে! এই জন্যেই গাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে বের হই।'

www.BDeBooks.Com

'বাড়ি খালি না-কি ?'

'ও আল্লা, তুই কি কিছুই জানিস না ? তোর খালুর ইন্তেকালের পর বাড়ি খালি না ? এত বড় বাড়িতে একা থাকি, অবস্থাটা চিন্তা করতে পারিস।'

'দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এরা তো আছে।'

'খালি বাড়ি কি দারোয়ান, মালী, ড্রাইভার এইসবে ভরে ? তুই চলে আয়। তোর কাঁটা নামানোর ক্ষমতার কথা শুনে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? গাড়িতে উঠ।'

'আজ তো খালা যেতে পারব না। জরুরি কাজ।'

'তোর আবার কিসের জরুরি কাজ ? হাঁটা ছাড়া তোর আবার কাজ কি ?'

'আরেকজনের কাঁটা নামাতে হবে। চিতলমাছের কাঁটা গলায় বিঁধিয়ে বসে আছে। কোঁ কোঁ করছে। সেই কাঁটা তুলতে হবে।'

'আমাকে নিয়ে চল। আমি দেখি ব্যাপারটা কি ?'

'আপনাকে নেয়া যাবে না খালা। মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার তো। মেয়েদের সামনে মন্ত্র কাজ করে না।'

'মেয়েরা কি দোষ করেছে ?'

'মেয়েরা কোনই দোষ করেনি। দোষ করেছে মন্ত্র। এই মন্ত্র নারী বিদ্বেষী।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমাকে না নিতে চাইলে না নিবি। গাড়িতে উঠ, তোকে কিছুদূর এগিয়ে দি। রোদের মধ্যে হাঁটছিস দেখে মায়া লাগছে।'

কেউ গাড়িতে উঠার জন্যে বেশি রকম পিড়াপিড়ি করলে ধরে নিতে হবে গাড়ি নতুন কেনা হয়েছে। আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, গাড়ি নতুন কিনলে ?

'নতুন কোথায়, ছয় মাস হয়ে গেলো না।'

'ছয় মাসে স্বামী পুরাতন হয়— গাড়ি হয় না। দারুণ গাড়ি।'

'তোর পছন্দ হয়েছে ?'

'পছন্দ মানে! এরোপ্লেনের মত গাড়ি।'

'এই গাড়ির সবচে বড় সুবিধা কি জানিস ? সামনা-সামনি কলিশন হলে গাড়ির কিছু হবে না, কিন্তু অন্য গাড়ি ভর্তা হয়ে যাবে।'

'বাহ্, দারুণ তো।'

'তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে হিমু। চাকরি-বাকরি কিছু করছিস ?'

'আপনার হাতে চাকরি আছে ?'

'না। তোর খালুর মৃত্যুর পর মিল-টিল সব বিক্রি করে ক্যাশ টাকা করে ফেলেছি। ব্যাঙ্কে জমা করেছি। আমি একা মানুষ— মিল-টিল চালানো তো সম্ভব না। সবাই লুটে-পুটে খাবে। দরকার কি ?'

'কোন দরকার নেই।'

গাড়ি চলছে। কোন বিশেষ দিকে যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ড্রাইভার তার ইচ্ছামত চালাচ্ছে। মীরপুর রোড ধরে চলতে চলতে ফট করে ধানমন্ডি চার নাম্বারে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণ পর মীরপুর রোডে চলে এল।

'হিমু!'

'জ্বি খালা।'

'তোর খালুর স্মৃতি রক্ষার্থে একটা কিছু করতে চাই। কর্মযোগী পুরুষ ছিল। পথের ফকির থেকে কলকারখানা, গার্মেন্টস, করেনি এমন জিনিস নেই। স্ত্রী হিসেবে তার স্মৃতির রক্ষার জন্যে আমার তো কিছু করা দরকার।'

'করলে ভাল। না করলেও চলে।'

'না না, করা দরকার। ভাল কিছু করা দরকার। উনার নামে একটা আর্ট মিউজিয়াম করলে কেমন হয়।'

'ভাল হয়। তবে খালু সাহেবের নামে করা যাবে না। মানাবে না।'

'মানাবে না কেন?'

"গনি মিয়া মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্ট" শুনতে ভাল লাগছে না। খালু সাহেবের নামটা গনি মিয়া না হয়ে আরেকটু সফেসটিকেটেড হলে মিউজিয়াম অব মর্ডান আর্ট দেয়া যেত। তোমার নিজের নামে দাও না কেন? "রেশমা মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্ট" শুনতে তো খারাপ লাগছে না।'

গাড়ি মীরপুর রোড থেকে আবার ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে ঢুকে পড়েছে। আবারো মনে হয় মীরপুরে আসবে। ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল।

'খালা, আমার তো এখন যাওয়া দরকার। চিতল মাছের কাঁটা নামানো খুব সহজ না।'

'আহা বোস না। তোর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। কথা বলার মানুষ পাই না। কেউ আমার বাড়িতে আসে না। এটা একটা আশ্চর্য কাণ্ড। তোর খালুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কার্ড ছাপিয়ে পাঁচশ লোককে দাওয়াত দিয়েছি। তিনটা দৈনিক পত্রিকায় কোয়ার্টার পেইজ বিজ্ঞাপন দিলাম। লোক কত হয়েছে বল তো?'

'একশ?'

'আরে না— আঠারো জন। এর মধ্যে আমার নিজের লোকই সাতজন। ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান, কাজের দু'টা মেয়ে।'

'আমাকে খবর দিলে চলে আসতাম।'

'তোকে খবর দেব কিভাবে? তোর কি কোন স্থায়ী ঠিকানা আছে? ঠিকানা নেই। রাস্তায় যে ফকিরগুলি আছে তাদেরও ঠিকানা আছে। রাতে তারা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘুমায়। আজিজ মার্কেটের বারান্দায় যে ঘুমুবে সে সেখানেই ঘুমুবে। সে কমলাপুর রেল স্টেশনে ঘুমুবে না। আর তুই তো আজ এই মেসে, কাল ঐ মেসে। হিমু, তুই চলে আয় তো আমার কাছে। গুলশানের বাড়ি নতুন করে রিনোভেট করেছি। টাকাপয়সা খরচ করে হুলুস্থুল করেছি। তোর ভাল লাগবে। আসবি?'

'ভেবে দেখি।'

'ভাবতে হবে না। তুই চলে আয়। থাকা-খাওয়ার খরচার হাত থেকে তো বেঁচে গেলি। মাসে মাসে না হয় কিছু হাতখরচও নিবি।'

www.BDeBooks.Com

'কত দেবে হাতখরচ ?'

'বিড়ি-সিগেরেটের খরচ— আর কি! কি, থাকবি ? তুই থাকলে একটা ভরসা হয়। দিনকালের যে অবস্থা চাকর-দারোয়ান এরাই বটি দিয়ে কুপিয়ে কোনদিন না মেরে ফেলে। এমন ভয়ে ভয়ে থাকি! চলে আয় হিমু। আজই চলে আয়। বাড়ি তো চিনিসই। চিনিস না ?'

'হুঁ।'

'তোকে দেখে আরেকটা কথা ভাবছি— বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা আছে প্যারা নরমাল পাওয়ার যাদের, এদের বাড়িতে এনে রাখলে কেমন হয় ? এস্ট্রলজার, পামিস্ট, বুঝতে পারছিস কি বলছি ?'

'পারছি— ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ টাইপ।'

'ঠিক বলেছিস। বাংলাদেশের তো একরম আগে হয় নি। না-কি হয়েছে ?'

'না হয়নি। করতে পার। নাম কি দেবে ? "গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ" ?'

'নামটা কেমন শুনাচ্ছে ?'

'মিয়াটা বাদ দিলে খারাপ লাগবে না— গনি ইন্সটিটিউট অব সাইকিক রিসার্চ। খালা, এইখানে আমি নামব। ড্রাইভার, গাড়ি থামাও। গাড়ি না থামালে আমি জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব।'

ড্রাইভার গাড়ি থামালো। রেশমা খালা বলল, কি ঠিক হল ? তুই আসছিস ?

'হুঁ। আমার এ মাসের হাতখরচের টাকা দিয়ে দাও।'

'থাকাই শুরু করলি না— হাতখরচ কি ?'

'আমি তো খালা চাকরি করছি না যে মাসের শেষে বেতন। এটা হল হাত খরচ।'

'তুই আগে বিছানা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়, তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলা শুরু করলাম। উদ্ধার পাওয়া গেছে, এখন চেষ্টা করা উচিত যত দূরে সরে পড়া যায়। সম্ভাবনা খুব বেশি যে খালা তার গাড়ি নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসবে। আমার উচিত ছোট কোন গলিতে ঢুকে পড়া, যেখানে পাজেরো টাইপ গাড়ি ঢুকতে পারে না।

'এই হিমু, এই, এক সেকেন্ড শুনে যা। এই, এই।'

বধির হয়ে যাবার ভান করে আমি গলি খুঁজছি। গাড়ির ড্রাইভার ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। না ফিরলে চারদিকে লোক জমে যাবে। বাধ্য হয়ে ফিরলাম।

'যা, হাতখরচ নে। না দিলে আবার হাত খরচ দেয়া হয় নি এই অজুহাতে আসবি না।'

রেশমা খালা একটা চকচকে পাঁচশ টাকার নোট জানালা দিয়ে বাড়িয়ে ধরল।

'তুই সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসিস। সন্ধ্যার পর থেকে আমি বাসায় থাকি। নানান সমস্যা আছে, বুঝলি ? ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে। কাউকে বলা দরকার। রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না।'

'চলে আসব।'

'টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? পকেটে রাখ। হারিয়ে ফেলবি তো।'

'খালা, আমার পকেট নেই। যাবতীয় টাকাপয়সা আমাকে হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়।'

'বলিস কি!'

'খালা, যাই ?'

যাই বলে দেরি করলাম না, প্রায় দৌড়ে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম।

টাকা কি কেউ হাতে নিয়ে ঘুরে ? বাসের কন্ডাক্টাররা টাকা হাতে রাখে। আর কেউ ? পাঁচশ টাকার চকচকে একটা নোট হাতে রাখতে বেশ ভালই লাগছে। নোটটা এতই নতুন যে ভাজ করতে ইচ্ছা করছে না। চনমনে রোদ ওঠায় গরম লাগছে। নোটের সাইজ আরেকটু বড় হলে টাকা দিয়ে বাতাস খেতে খেতে যাওয়া যেত।

খালার হাত থকে উদ্ধার পেয়েছি শ্যামলীতে। সেখান থেকে কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। হেঁটে হেঁটে আবার নিউ মার্কেটের কাছে চলে আসা যায়। ইচ্ছা করলে রিকশা নিতে পারি, ভাড়া দেয়া সমস্যা হবে না। বুড়ো অথর্ব টাইপ রিকশাওয়ালা যাদের রিকশায় কেউ চড়ে না, এমন কেউ যে রিকশা ঠিকমত টানতেও পারে না, বয়সের ভারে কানেও ঠিক শুনে না, গাড়ির সামনে হঠাৎ রিকশা নিয়ে উপস্থিত হয়— এসব রিকশায় চড়া মানে পদে পদে বিপদের মধ্যে পড়া।

যেহেতু রেশমা খালার বাড়িতে আমি থাকতে যাব না, সেহেতু এই পাঁচশ টাকা কোন এক সৎকর্মে ব্যয় করতে হবে।

অনেকদিন কোন সৎকর্ম করা হয় না। ভাড়া হিসেবে পুরো নোটটা দিয়ে দিলে সাধারণ মানের একটা সৎকর্ম করা হবে।

পছন্দসই কোন রিকশাওয়ালা পাওয়া যাচ্ছে না। একজনেক বেশ পছন্দ হল, তবে তার বয়স অল্প। বুড়ো রিকশওয়ালা কেউই নেই। বুড়োরা আজ কেউই রিকশা বের করেনি। আসাদ গেটে এসে একজনকে পাওয়া গেল। চলনসই ধরনের বুড়ো। রিকশার সীটে বসে চায়ে পাউরুটি ভিজিয়ে খাচ্ছে। সকালের ব্রেকফাস্ট বোধ হয় না, বারোটার মত বাজে। লাঞ্চ হবারও সম্ভাবনা কম। সম্ভবত প্রি-লাঞ্চ।

'রিকশা, ভাড়া যাবেন ?'

বুড়ো প্রায় ধমকে উঠলো— না। খাওয়ার মাঝখানে বিরক্ত করায় সে সম্ভবত ক্ষেপে গেছে।

www.BDeBooks.Com

'কাছেই যাব। বেশি দূর না— নিউ মার্কেটে।

'ঐ দিকে যামু না।'

'ফার্মগেট যাবেন ? ফার্মগেট গেলেও আমার চলে।'

'যামু না।'

'যাবেন না কেন ?'

'ইচ্ছা করতাছে না।'

'আমি না হয় অপেক্ষা করি। আপনি চা শেষ করেন, তারপর যাব। ফার্মগেট যেতে না চান তাও সই। অন্য যেখানে যেতে চান যাবেন। আমাকে কোন এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।'

মনে হল আমার প্রস্তাবে সে রাজি হয়েছে। কিছু না বলে চা-পাউরুটি শেষ করল। লুঙ্গির ভাজ থেকে বিড়ি বের করে আয়েশ করে বিড়ি টানতে লাগল। আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি। কাউকে দান করতে যাওয়াও সমস্যা। দান করতেও ধৈর্য লাগে। হুট করে দান করা যায় না। বুড়ো বিড়ি টানা শেষ করে রিকশার সিট থেকে নামল। আমি উঠতে যাচ্ছি সে গম্ভীর গলায় বলল, কইছি না, যামু না। ত্যক্ত করেন ক্যান ?'

সে খালি রিকশা টেনে বেরিয়ে গেল। একটু সামনে গিয়ে দু'জন যাত্রীও নিল। যে কোন কারণেই হোক আমাকে তার পছন্দ হয় নি। পাঁচশ টাকার চকচকে নোটটা তাকে দেয়া গেলো না।

আমি ফার্মগেটের দিকে রওনা হলাম। নানান কিসিমের অভাবী মানুষ ঐ জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভিক্ষার বিচিত্র টেকনিক দেখতে হলে ফার্মগেটের চেয়ে ভাল কোন জায়গা হতে পারে না। একবার একজনকে পেয়েছিলাম ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন।

'Sir, I am a neddy man, sir.'

'Three school going daughters.'

'Lost my job, presently pennyless.'

আমি বললাম, ইংরেজিতে ভিক্ষা করছেন কেন ? বাংলা ভাষার জন্যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি সে কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করার জন্যে ? ভিক্ষার জন্যে বাংলার চেয়ে ভাল ভাষা হতেই পারে না।

ইংরেজি ভাষার ভিক্ষুক চোখ মুখ কুঁচকে তাকাল। আমি বললাম, ফেব্রুয়ারি মাসেও কি ইংরেজিতে ভিক্ষা করেন ? না-কি তখন বাংলা ভাষা ?

আরেকজন আছেন, ভদ্র চেহারা। ভদ্র পোশাক। তিনি এসে খুবই আদবের সঙ্গে বলেন, ভাই কিছু মনে করবেন না— কয়টা বাজে! আমার ঘড়িটা বন্ধ।

যাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ভদ্রলোকের ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে যান— ঘড়ি দেখে সময় বলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকাল মানুষ এমন হয়েছে সময় জিজ্ঞেস করলে রেগে যায়।

'না না, ঠিক আছে।'

তখন ভদ্রলোক গলা নিচু করে বলেন— ভাই সাহেব, একটা মিনিট সময় হবে ? দুটা কথা বলতাম।

যে সময় দিয়েছে সেই মরেছে। তার বিশ পঁচিশ টাকা খসবেই।

আরেক ভদ্রলোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবি পরা। মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল, হাতে বেনসনের প্যাকেট। ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির পকেটে সম্রাট আকবরের সময়কার একটা মোহর। দেড় ভরির মত ওজন। তাঁর গল্প হচ্ছে— তিনি একরম মুদ্রা ভর্তি একটা ঘটি পেয়েছেন। কাউকে জানাতে চাচ্ছেন না। জানলে সরকার সীজ করে নিয়ে যাবে। তিনি গোপনে মুদ্রাগুলো বিক্রি করতে চান। তাই বলে সস্তায় না। সোনার যা দাম সেই হিসেবে কিনতে হবে। কারণ খাঁটি সোনার মোহর। ভদ্রলোকের মূল ব্যবসার জায়গা ফার্মগেট না। ফার্মগেটে তিনি অন্য উদ্দেশ্যে আসেন। উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার না।

পরিচিত ভিক্ষুকের কাউকেই পেলাম না তবে আশ্চর্যজনকভাবে আবদুর রশীদকে পেয়ে গেলাম। চশমা দেখে চিনলাম। চশমার ডাঁট নেই, সুতা দিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। হাতে এক তাড়া কাগজ নিয়ে এর-তার কাছে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান। হলুদ রঙের বড় একটা খামও আছে। নির্ঘাৎ এক্সরে প্লেট।

'রশীদ সাহেব না ? কেমন আছেন ? চিনতে পারছেন ?'

ভদ্রলোক চশমার আড়াল থেকে পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। চিনতে পারছেন কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

'চশমার ডাঁট আবার ফেলে দিয়ে সুতা লাগিয়েছেন ? এতে কি ভিক্ষার সুবিধা হয় ?'

'আপনাকে চিনতে পারছি না।'

'চিনবেন না কেন ? আমি বদরুল সাহেবের বন্ধু। আপনার হাতে কি ? প্রেসক্রিপাশন ? এতো পুরানো টেকনিকে গেলেন কেন ?'

আবদুর রশীদ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ছেলে মরণাপন্ন। লাংসে পানি জমেছে। প্লুরিসি। প্রফেসর রহমান ট্রিটমেন্ট করছেন। বিশ্বাস না হলে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২নং ওয়ার্ডে যেতে পারেন।

'অবস্থা খারাপ ?'

আবদুর রশীদ জবাব দিলেন না। ক্রুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন। আমি বললাম, টাকাপয়সা কিছু জোগাড় করতে পেরেছেন ?

'তা দিয়ে আপনার দরকার কি ?'

'দরকার আছে। আমি এককাপ চা খাব। চা এবং একটা সিগারেট। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। হাতে একদম পয়সা নেই।'

www.BDeBooks.Com

পাঁচশ টাকার একটা নোট তো আছে।'

'নোটটা আমার না। বুড়ো এক রিকশাওয়ালার নোট। তাকে ফিরত দিতে হবে। খাওয়াবেন এক কাপ চা ? আপনার কাছে আমার চা পাওনা আছে। ঐদিন আপনাকে চা-সিঙ্গাড়া খাইয়ে ছিলাম।'

আবদুর রশীদ চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। শুকনো গলায় বললেন, চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবেন ?

'সিঙ্গাড়া খাওয়ান। তাহলে শোধবোধ হয়ে যাবে। আপনিও আমার কাছে ঋণী থাকবেন না। আমিও ঋণী থাকবো না।'

চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়াও এল। আমি গলার স্বর নামিয়ে বললাম, রশীদ সাহেব, ভিক্ষার একটা ভাল টেকনিক আপনাকে শিখিয়ে দেই। কিছুদিন ব্যবহার করতে পারবেন, তবে এক জায়গায় একবারের বেশি দু'বার করা যাবে না। জায়গা বদল করতে হবে। বলব ?

রশীদ সাহেব চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর চোখ-মুখ কঠিন। আমি খানিকটা ঝুঁকে এসে বললাম, ময়লা একটা গামছা শুধু পরবেন। সারা শরীরে আর কিছু থাকবে না। চোখে চশমা থাকতে পারে। আপনি করবেন কি— মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত টাইপের লোকদের কাছে যাবেন। গিয়ে নিচু গলায় বলবেন— আমার কোন সাহায্য লাগবে না, কিচ্ছু লাগবে না, দোকান থেকে আমাকে শুধু একটা লুঙ্গি কিনে দেন। কেউ টাকা দিতে চাইলেও নিবেন না। দেখবেন দশ মিনিটের ভেতর আপনাকে লুঙ্গি কিনে দেবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন— বড়লোকের কাছে কিছু চাইবেন না। আপনি গামছা পরে আছেন, না নেংটো আছেন তাতে ওদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু যারা নিম্নবিত্ত তারা আপনাকে দেখে আতংকগ্রস্ত হবে। ওদের মনে হবে একদিন আপনার মত অবস্থা তাদেরও হতে পারে। তখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়বে লুঙ্গি কিনে দিতে। সেই লুঙ্গি আপনি বিক্রি করে দেবেন। আবার আরেকটার ব্যবস্থা করবেন। বুঝতে পারছেন ? মন দিয়ে কাজ করলে দৈনিক পাঁচ থেকে ছ'টা লুঙ্গির ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে।

আবদুর রশীদ কঠিন চোখে তাকালেন। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাল বুদ্ধি দিয়েছি, এখন একটা সিগারেট খাওয়ান।

আবদুর রশীদ সিগারেট খাওয়ালেন না। চা-সিঙ্গাড়ার দাম দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বুড়ো রিকশাওয়ালা একজন পাওয়া গেল। বুড়ো হলেও তার গায়ে শক্তি সামর্থ ভালই। টেনে রিকশা নিয়ে যাচ্ছে। গল্প জমাবার চেষ্টা করলাম। গল্প জমল না। শুধু জানালো তার আদি বাড়ি ফরিদপুর।

সাতটাকা ভাড়ার জায়গায় পাঁচশ টাকা ভাড়া পেয়ে তার চেহারার কোন পরির্তন হল না। নির্বিকার ভঙ্গিতেই সে টাকাটা রেখে দিল। গামছা দিয়ে মুখ মুছল। মনে হয় তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ম্যানেজার হায়দার আলি খাঁ আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় বললেন, সকাল থেকে আপনার জন্যে একটা মেয়ে বসে আছে। বাইরে দাঁড়িয়েছিল, শেষে আমি আপনার ঘর খুলে দিলাম।

'ঘর খুলে দিলেন কেন?'

'মেয়েছেলে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'নাম কি মেয়ের?'

'নাম জিজ্ঞেস করি নাই। নাম জিজ্ঞেস করলে বেয়াদবী হয়। সুন্দর মত মেয়ে।'

রূপা না-কি? রূপা হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সে এসে দীর্ঘ সময় বসে থাকবে না। গাড়ি থেকেই তার নামার কথা না। সে গাড়িতে বসে থাকবে— ড্রাইভারকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। তাহলে কে হতে পারে?

ঘরে ঢুকে দেখি বাদলদের বাসায় যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম— সে। পদার্থবিদ্যার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী। মীরা কিংবা ইরা নাম।

আমি খুব সহজভাবে ঘরে ঢুকে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য না হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, কি খবর ইরা, ভাল?

ইরা বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। কিছু বলল না। তার মুখ কঠিন। ভুরু কুঁচকে আছে। বড় ধরনের ঝগড়া শুরুর আগে মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়ে যায়।

'আমার এখানে কি মনে করে? গলায় কাঁটা?'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি সেই সকাল এগারোটা থেকে বসে আছি।'

'বোস। তারপর বল কি কথা।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল যে আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলবেন।'

'আমার একদম মনে থাকে না। কোন কোন মানুষকে প্রথম দেখা থেকেই এত আপন মনে হয় যে শুধু তুমি বলতে ইচ্ছে করে।'

'দয়া করে মেয়েভুলানো কথা আমাকে বলবেন না। এই জাতীয় কথা আমি আগেও শুনেছি।'

'পাত্তা দেননি?'

'পাত্তা দেয়ার কোন কারণ কি?'

'আছে। ছেলেরা নিতান্ত অপরাগ হয়ে এসব কথা বলে। প্রথম দেখাতে তো সে বলতে পারে না— "আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।" বলতে লজ্জা লাগে। যে শোনে তারো খারাপ লাগে। কাজেই ঘুরিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়।'

'প্রেম বিষয়ক তত্ত্বকথা আমি শুনতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। আমি কথাগুলো বলে চলে যাব।'

'অবশ্যই। একটু বসুন। ঠাণ্ডা হোন। ঠাণ্ডা হয়ে তারপর বলুন।'

www.BDeBooks.Com

ইরা বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ-মুখ যতটা কঠিন ছিল তারচেয়েও কঠিন হয়ে গেলো।

'কথা হচ্ছে বাদলদের বাড়িতে যে কাজের বুয়া আছে— তার একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। লুৎফা নাম।'

'সে না-কি আপনাকে বলেছিল তার মেয়েকে খুঁজে দিতে।'

'হ্যাঁ, বলেছিল। এখানো খোঁজা শুরু করিনি। আসলে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি বলায় মনে পড়ল।'

'আপনাকে খুঁজতে হবে না। মেয়ে পাওয়া গেছে।'

'বাঁচা গেল। তিরিশ লক্ষ লোকের মাঝখান থেকে লুৎফাকে খুঁজে পাওয়া সমস্যা হত।'

'আপনাকে সে যেদিন বলল, সেদিন দুপুরেই মেয়ে উপস্থিত। ব্যাপারটা যে পুরোপুরি কাকতালীয় তাতে কি আপনার কোন সন্দেহ আছে ?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'আপনি নিশ্চয়ই দাবি করেন না যে আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন ?'

'পাগল হয়েছেন ?'

'বুয়ার ধারণা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করা হয়েছে। বাদলেরও তাই ধারণা।'

'কার কি ধারণা তাতে কি যায় আসে ? মেয়েটাকে পাওয়া গেছে এটাই বড় কথা।'

ইরা কঠিন গলায় বলল, কে কি ভাবছে তাতে অনেক কিছুই যায় আসে। এভাবেই সমাজে বুজরুক তৈরি হয়। আপনার মত মানুষরাই সোসাইটির ইকুইলিব্রিয়াম নষ্ট করেন। বাদলের মাথা তো আপনি আগেই খারাপ করেছিলেন, এখন বুয়ার মাথাও খারাপ করলেন।

'তাই না-কি!'

'হ্যাঁ তাই। বাদলের মাথা যে আপনি কি পরিমাণ খারাপ করেছেন সেটা কি আপনি জানেন ?'

'না, জানি না।'

'দু-একদিনের ভেতর একবার এসে দেখে যান। ব্রাইট একটা ছেলে। বাবা-মা'র কত আশা ছেলেটাকে নিয়ে... আপনি তাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছেন। ফালতু বুজরুকি। উদ্ভট উদ্ভট কথা। মহাপুরুষ মহাপুরুষ খেলা। রাতদুপুরে রাস্তায় হাঁটলেই মানুষ মহাপুরুষ হয়ে যায় ?'

ইরা রাগে কাঁপছে। মেয়েটা এতটা রেগেছে কেন বুঝতে পারছি না। এত রাগার তো কিছু নেই। আমার বুজরুকিতে তার কি যায় আসে ?

ইরা বলল, আমি এখন যাব।

'চা-টা কিছু খাবেন না ?'

'না। আপনি দয়া করে বাদলকে একটু দেখে যাবেন। ওর অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আসলে আপনার শাস্তি হওয়া উচিত। কঠিন শাস্তি।'

ইরা গট গট করে বের হয়ে গেল। মেয়েটা বেশ সুন্দর। রেগে যাওয়ায় আরো সুন্দর লাগছে। যে রাগের সঙ্গে ঘৃণা মেশানো থাকে সেই রাগের সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় না। যে রাগের সঙ্গে সামান্যতম হলেও ভালবাসা মেশানো থাকে সেই রাগ মেয়েদের রূপ বাড়িয়ে দেয়। ইরা কি সামান্য ভালবাসা আমার জন্যে বোধ করা শুরু করেছে ? এটা আশংকার কথা। ভালবাসা বটগাছের মত। ক্ষুদ্র বীজ থেকে শুরু হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ডালপালা মেলে দেয়, ঝুড়ি নামিয়ে দেয়।

ইরার ব্যাপারে সাবধান হতে হবে। বাদলদের বাড়িতে ভুলেও যাওয়া যাবে না। ইরা মেসের ঠিকানা বের করে চলে এসেছে কিভাবে সেটাও এক রহস্য। ঠিকানা তার জানার কথা না। ঐ বাড়ির কেউ জানে না।

রাতে খেতে গিয়ে শুনি বদরুল সাহেব আমার খাওয়া খেয়ে চলে গেছেন। মেসের বাবুর্চি খুবই বিরক্তি প্রকাশ করল।

'রোজ এই কাম করে। আফনের খাওন খায়।'

'ঠিকই করেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি। এখন থেকে তিনিই খাবেন।'

'আপনি খাবেন না ?'

'আমি কয়েকদিন বাইরে থাকব।'

ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমানোর আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পাবার উপায় হচ্ছে— পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যাওয়া। পেট ভর্তি পানির কারণেই হোক কিংবা অন্য কারণেই হোক— নেশার মত হয়। ঝিমুনি আসে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমের সময়ের স্বপ্নগুলো হয় অন্যরকম। তবে আজ তা হবে না। রাতে না খেলেও দিনে খেয়েছি। ক্ষুধার্ত ঘুমের স্বরূপ বুঝতে হলে সারাদিন অভুক্ত থাকার পর পেট ভর্তি করে পানি খেয়ে ঘুমুতে যেতে হয়। নেশার ভাবটা হয় তখন।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। বদরুল সাহেব মিহি গলায় ডাকলেন, হিমু ভাই। হিমু ভাই। আমি উঠে দরজা খুললাম।

বদরুল সাহেব লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে এক ঠোঙ্গা মুড়ি, খানিকটা গুড়। আমি বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো ?

'শুনলাম আপনি খেতে গিয়েছিলেন। এদিকে আমি ভেবেছি আপনি আসবেন না...'

'ও, এই ব্যাপার!'

www.BDeBooks.Com

'খুব লজ্জায় পড়েছি হিমু ভাই। আপনার জন্যে মুড়ি এনেছি।'

'ভাল করেছেন। আজ রাতটা উপোস দেব বলে ঠিক করেছি। মাঝে মাঝে আমি উপোস দেই। আপনি গুড়-মুড়ি খান। আমি মুড়ি খাওয়ার শব্দ শুনি।'

'কিছু খাবেন না হিমু ভাই ?'

'না। তারপর ঐ দিন কি হল বলুন— পুলিশরা যত্ন করে খাইয়েছিল ?'

'যত্ন বলে যত্ন। এক হোটেলে নিয়ে গেছে। পোলাও, খাসির রেজালা, হাঁসের মাংস, সব শেষে দৈ মিষ্টি। এলাহী ব্যাপার। খুবই যত্ন করেছে। হাঁসের মাংসটা অসাধারণ ছিল। এত ভাল হাঁসের মাংস আমি আমার জীবনে খাইনি। বেশি করে রসুন দিয়ে ভূনা ভূনা করেছে। এই সময়ের হাঁসের মাংসে স্বাদ হয় না। হাঁসের মাংস শীতের সময় খেতে হয়। তখন নতুন ধান ওঠে। ধান খেয়ে খেয়ে হাঁসের গায়ে চর্বি হয়। আপনার ভাবীও খুব ভাল হাঁস রাঁধতে পারে। নতুন আলু দিয়ে রাঁধে। আপনাকে একবার নিয়ে যাব। আপনার ভাবীর হাতে হাঁস খেয়ে আসবেন।'

'কবে নিয়ে যাবেন ?'

'এই শীতেই নিয়ে যাব। আপনার ভাবীকে চিঠিতে আপনার কথা প্রায়ই লিখি তো। তারও খুব শখ আপনাকে দেখার। একবার আপনার অসুখ হল— আপনার ভাবীকে বলেছিলাম দোয়া করতে। সে খুব চিন্তিত হয়েছিল। কোরান খতম দিয়ে বসে আছে। মেয়ে মানুষ তো, অল্পতে অস্থির হয়।'

'আপনার চাকরির কি হল ?' শনিবারে হবার কথা ছিল না ? গিয়েছিলেন ?'

বদরুল সাহেব চুপ করে রইলেন। আমি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললাম, যাননি ?

'জ্বি, গিয়েছিলাম। ইয়াকুব ভুলে গিয়েছিল।'

'ভুলে গিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ। সে তো একটা কাজ নিয়ে থাকে না। অসংখ্য কাজ করতে হয়। তার পি-এ সে ফাইল দেয়নি। কাজেই ভুলে গেছে।'

'এখন কি ফাইল দিয়েছে ?'

'এখন তো দেবেই। পি-এ-কে ডেকে খুব ধমকাধমকি করল। আমার সামনেই করল। বেচারার জন্যও মায়া লাগছিল। সে তো আর শত্রুতা করে আমার ফাইল আটকে রাখেনি। ভুলে গেছে। মানুষ মাত্রেরই তো ভুল হয়।'

'ইয়াকুব সাহেব এখন কি বলছেন ? কবে নাগাদ হবে ?'

'তারিখ-টারিখ বলেনি। আরেকটা বায়োডাটা জমা দিতে বলেছে।'

'দিয়েছেন ?'

'হুঁ।'

'এবারো কি ফাইলের উপর আর্জেন্ট লিখে দিয়েছেন ?'

'হুঁ।'

'আবার কবে খোঁজ নিতে বলেছেন।'

'বলেছে বার বার এসে খোঁজ নেবার দরকার নেই। ওপেনিং হলেই চিঠি চলে আসবে।'

'সেই চিঠি কবে নাগাদ আসবে তা কি বলেছে?'

'খুব তাড়াতাড়িই আসবে। আমি আমার অবস্থার কথাটা বুঝিয়ে বলেছি। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম যে অন্যের খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। শুনে সে খুবই মন খারাপ করল।'

'বুঝলেন কি করে যে মন খারাপ করেছে? মুখে কিছু বলেছে?'

'কিছু বলেনি। চেহারা দেখে বুঝেছি।'

'আমার কি মনে হয় জানেন বদরুল সাহেব, আপনার অন্যান্য জায়গাতেও চাকিরর চেষ্টা করা উচিত। ইয়াকুব সাহেবের উপর আমার তেমন ভরসা হচ্ছে না।'

'ভরসা না হবার কিচ্ছু নেই হিমু ভাই। স্কুল জীবনের বন্ধু। আমার সমস্যা সবটাই জানে। আমার ধারণা এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি পাব।'

'যদি না পান?'

'না পেলে অফিসে গিয়ে দেখা করব। বার বার যেতে লজ্জাও লাগে। নানান কাজ নিয়ে থাকে। কাজে ডিসটার্ব হয়।'

ঘর অন্ধকার। কচ কচ শব্দ হচ্ছে। বদরুল সাহেব মুড়ি খাচ্ছেন।

'হিমু ভাই!'

'জ্বি।'

'ফ্রেস মুড়ি। খেয়ে দেখবেন?'

'আপনি খান।'

'মুড়ির আসল স্বাদও পাওয়া যায় শীতকালে। আপনার ভাবী আবার মুড়ি দিয়ে মোয়া বানাতে পারে। কি জিনিস তা না খেলে বুঝবেন না।'

'একবার খেয়ে আসব।'

'অবশ্যই খেয়ে আসবেন।'

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমি কিছুদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকব। কেউ আমার খোঁজে এলে বলে দেবেন মেস ছেড়ে দিয়েছি। মিথ্যা কথা বলতে পারেন তো?'

'আপনি বললে— মিথ্যা বলব। আপনার জন্যে করব না এমন কাজ নাই। শুধু মানুষ খুনটা পারব না।'

'মানুষ খুন করতে হবে না শুধু একটু মিথ্যা বলবেন। ইরা নামের একটা মেয়ে আমার খোঁজে আসতে পারে, তাকে বলবেন আমি সুন্দরবনে চলে গেছি। মাসখানিক থাকব। তবে রূপা এলে আমি কোথায় আছি সেই ঠিকানা দিয়ে দেবেন।'

www.BDeBooks.Com

'ঠিকানাটা কি ?'

'আমার এক দূর সম্পর্কের খালা আছে। রেশমা! গুলশানে থাকে। গুলশান দুই নম্বর। বাড়ির নাম গনি প্যালেস। ঐ প্যালেসে সপ্তাহখানিক লুকিয়ে থাকব। না থাক, ওকেও সুন্দরবনের কথাই বলবেন।'

গুলশান এলাকায় সবচে' বড়, সবচে' কুৎসিত বাড়িটা রেশমা খালার। খালু সাহেব গনি মিয়ার সিক্সথ সেন্স ছিল অকল্পনীয়। তিনি সস্তা গণ্ডার সময়ে গুলশানে দু'বিঘা জমি কিনে ফেলে রেখেছিলেন। তাঁর বেকুবির উদারহণ হিসেবে তখন এই ঘটনার উল্লেখ করা হত। যারা সঙ্গেই দেখা হত রেশমা খালা বলতেন, বেকুটার কাণ্ড শুনেছ ? জঙ্গল কিনে বসে আছে।

খালু সাহেবের চেহারা বেকুবের মতই ছিল। অন্যের কথা শোনার সময় আপনাআপনি মুখ হা হয়ে যেত। ব্যবসা বিষয়ে যেসব কথা বলতেন সবই হাস্যকর বলে মনে হত। যে বছর দেশে পেঁয়াজের প্রচুর ফলন হল এবং পেঁয়াজের দাম পড়ে গেল সে বছরই তিনি পেঁয়াজের ব্যবসায় চলে এলেন। ইণ্ডিয়া থেকে পেঁয়াজ আনার জন্য এলসি খুললেন। অন্য ব্যবসায়ীরা হাসল। হাসারই কথা। রেশমা খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি না-কি বেকুবের মত পিঁয়াজের ব্যবসায় নামছ ? যত দিন যাচ্ছে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি তো ততই চলে যাচ্ছে। আগে মাঝে মধ্যে হা করে থাকতে, এখন দেখি সারাক্ষণই হা করে থাক। পেঁয়াজের ব্যবসার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিল ?

'কেউ দেয় নাই। নিজেরই বুদ্ধি। পেঁয়াজের ফলন খুব বেশি হয়েছে তো, চাষী তার দাম পায় নাই। এই জন্য আগামী বছর পেঁয়াজের চাষ হবে কম। পেঁয়াজের দাম হবে আকাশছোঁয়া।'

'তোমার মাথা!'

'দেখ না কি হয়।'

গনি সাহেব যা বললেন তাই হল। পরের বছর পেঁয়াজ দেশে প্রায় হল না।

রেশমা খালা হতভম্ব। তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, বেকুব মানুষ তো। বেকুব মানুষের উপর আল্লাহর রহমত থাকে। যে ব্যবসা-ই করে দু'হাতে টাকা আনে। টাকা ব্যাংকে রাখার জায়গা নেই, এমন অবস্থা।

রেশমা খালার আফসোসের সীমা নেই— বেকুব স্বামী টাকা রোজগার করাই শিখেছে, খরচ করা শিখেনি। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, টাকা খরচ করতে তো বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি কোথায় যে খরচ করবে ? খালি জমাবে।

গনি সাহেব মাছ-গোশত এক সঙ্গে খান না। ছোটবেলায় তাঁর মা বলেছেন, মাছ-গোশত এক সঙ্গে খেলে পেটের গণ্ডগোল হয়। সেটাই মাথায় রয়ে গেছে। গাড়িতে চড়তে পারেন না, বেবী টেক্সিতেও না। পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হয় না। বমি হয়ে যায়। লোকজনের গাড়ি থাকে। গনি সাবেহের আছে রিকশা। সেই রিকশার সামনে-পেছনে ইংরেজিতে লেখা "Private"

সেই রিকশায় কোথাও যেতে হলে রেশমা খালার মাথা কাটা যায়। সাধারণ রিকশায় চাড় যায়, কিন্তু 'প্রাইভেট' লেখা রিকশা কি চড়া যায়? লোকজন কেমন কেমন চোখে তাকায়।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য রেশমা খালা গাড়ি কিনলেন। খালু সাহেব নাকে অডিকোলন ভেজানো রুমাল চাপা দিয়ে কয়েকবার সেই গাড়িতে চড়লেনও, তারপর আবার ফিরে গেলেন প্রাইভেট রিকশায়। তাঁতে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন অসুবিধা হল না। ব্যবসা-বাণিজ্য হু-হু করে বাড়তে লাগল। কাপড়ের কল দিলেন, গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রি করলেন।

রেশমা খালা শুধু আফসোস— খালি টাকা, আর টাকা। কি হবে টাকা দিয়ে? একবার দেশের বাইরে যেতে পারলাম না। এমন এক বেকুব লোকের হাতে পড়েছি, আকাশে প্লেইন দেখলে তার বুক ধড়ফড় করে। এই লোককে নিয়ে জীবনে কোনদিন কি বাইরে যেতে পারব? কোন দিন পারব না। লোকে ঈদের শপিং করতে সিঙ্গাপুর যায়, ব্যাংকক যায়। আর আমি কোটিপতির বউ, আমি যাই গাউছিয়ায়।

খালু সাহেবের মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন যে কি পরিমাণ হয়েছে সেটা তাঁর বাড়িতে ঢুকে দেখলাম।

পুরোন বাড়ি ভেঙে কি হুলুস্থূল করা হয়েছে। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। ময়লা জুতা পায়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ভয় লাগে। ঘরে ঘরে ঝাড়বাতি। ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমি হতভম্ব গলায় বললাম, সর্বনাশ! রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, বাড়ি রিনোভেশনের পর তুই আর আসিসনি, তাই না?

'না। তুমি তো ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ।'

'আর্কিটেক্টটা ভাল পেয়েছিলাম। টাকা অনেক নিয়েছে। ব্যাটা কাজ জানে, টাকা তো নিবেই। ভেতরের সব কাজ দিয়েছি ইন্টারনাল ডিজাইনারকে। আমেরিকা থেকে পাস করা ডিজাইনার। ফার্নির্চার-টার্নির্চার সব তার ডিজাইন। দেয়ালে যে পেইনটিংগুলি দেখছিস সেগুলোও কোনটা কোথায় বসবে সে-ই ঠিক করে দিয়েছে।

'এই বাড়িতে তো খালা আমি থাকতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। এখনি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।'

রেশমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, তোর ঘর দেখিয়ে দি। ঘর দেখলে তুই আর যেতে চাইবি না। গেস্টরুম আছে দুটা। তোর যেটা পছন্দ সেটাতে থাকবি। একটায় ভিক্টোরিয়ান ফার্নিচার, অন্যটায় মডার্ন। তোর কোন ধরনের ফার্নিচার পছন্দ? দুটা ঘরই দেখ। যেটা ভাল লাগে। দুটাতেই এ্যাটাচড বাথ। দুটাতেই এসি।

'এত বড় একটা বাড়িতে একা থাকো?'

www.BDeBooks.Com

'একা তো থাকতেই হবে, উপায় কি ? গোষ্ঠীর আত্মীয়স্বজন এনে ঢুকাব ? শেষে ঘুমের মধ্যে মেরে রেখে যাবে। সবাই আছে টাকার ধান্দায়। মানুষ দেখলেই আমার ভয় লাগে।'

'আমাকে ভয় লাগছে না ?'

'না, তোকে ভয় লাগছে না। তোকে ভয় লাগবে কেন ? শোন্, কোন্ বেলা কি খেতে চাস বাবুর্চিকে বলবি। রেঁধে দেবে। দু'জন বাবুর্চি আছে। ইংলিশ ফুডের জন্যে একজন, বাঙালি ফুডের জন্যে একজন।'

'চাইনীজ ফুড কে রাঁধে ?'

'ইংলিশ বাবুর্চিই রাঁধে। ও চাইনীজ ফুডের কোর্সও করেছে। রাতে কি খাবি— চাইনীজ ?'

'তুমি যা খাও তাই খাব।'

'তোর যখন চাইনীজ ইচ্ছা হয়েছে তখন চাইনীজ খাব। দাঁড়া, বাবুর্চিকে বলে দি। এই বাড়ির মজা কি জানিস— কথা বলার জন্যে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে হবে না। ইন্টারকম আছে। বোতাম টিপলেই হল। আয়, তোকে ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখিয়ে দি।'

ইন্টারকম ব্যবহার করা শিখলাম। বাথরুমের গরম পানি, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা শিখলাম। এসি চালানো শিখলাম। রিমোট কনট্রোল এসি। বিছানায় শুয়ে শুয়েও বোতাম টিপে এসি অন করা যায়। ঘর আপনাআপনি ঠাণ্ডা-গরম হয়।

'তোর গান-বাজনার শখ আছে ? একটা মিউজিক রুম রয়েছে, ক্যাসেট ডেক, সিডি প্লেয়ার সব আছে।'

'আর কি আছে ?'

'প্রেয়ার রুম আছে।'

'সেটা কি ?'

'প্রার্থনা ঘর। নামায পড়তে ইচ্ছা হলে নামায পড়বি। দেখবি ? দেখতে হলে অজু করে ফেল। অজু ছাড়া নামায ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

'নামায ঘরে কি আছে ? জায়নামাজ, টুপি ?'

'আরে না। জায়নামাজের দরকার নেই। মেঝে সবুজ মার্বেলের। রোজ একবার সাধারণ পানি দিয়ে মোছা হয়, তারপর গোলাপ জল মেশানো পানি দিয়ে মোছা হয়। চারদিকে কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছি। ইসলামিক আর্চ ডিজাইন। এই ডিজাইন আবার অন্য একজনকে দিয়ে করিয়েছি।'

'নামায পড়ছ ?'

'শুরু করব। ছোটবেলায় কোরান শরীফ পড়া শিখেছিলাম, তারপর ভুলে গেছি। কথায় বলে না—অনভ্যাসে বিদ্যা নাশ। ঐ হয়েছে। একজন মওলানা রেখে কোরান শরীফ পড়া শিখে তারপর নামায ধরব। আয়, নামায ঘর দেখে

যা। বাংলাদেশে এই জিনিস আর কারো ঘরে নাই। এখন আবার অনেকেই আমার ডিজাইন নকল করছে। প্রেয়ার রুম বানাচ্ছে। নকলবাজের দেশ। ভাল কিছু করলেই নকল করে ফেলে।'

'তোমার বাড়িতে বার নেই খালা ?'

'আছে, থাকবে না কেন ? বার ছাড়া কোন মডার্ন বাড়ির ডিজাইন হয় ? ছাদের চিলেকোঠায় বার। তোর আবার ঐসব বদ অভ্যাস আছে নাকি ? থাকলে ভুলে যা। আমার বাড়িতে বেলেল্লাপনা চলবে না। যা, অজু করে আয়, তোকে নামায ঘর দেখিয়ে আনি।'

অজু করে নামায ঘর দেখতে গেলাম। খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, ঘরে কোন বাল্ব বা টিউব লাইট দেখছিস ?'

'না।'

'তারপরেও ঘর আলো হয়ে আছে না ?'

'হ্যাঁ।'

'এর নাম কনসিলড লাইটিং। বাঁদিকে দেয়ালে দেখ একটা সুইচ, টিপে দে।'

'টিপলে কি হবে ?'

'টিপে দেখ না। বিসমিল্লাহ বলে টিপবি।'

আমি বিসমিল্লাহ বলে সুইচ টিপে আতংক নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার ধারণা, সুইচ টেপামাত্র নামায ঘর পরোপুরি পশ্চিম দিকে ঘুরবে। তা হল না। যা হল সেটাও কম বিস্ময়কর না। কোরান তেলাওয়াত হতে লাগল।

রেশমা খালা বললেন, পুরো কোরান শরীফ রেকর্ড করা আছে। একবার বোতাম টিপে দিলে অটোমেটিক কোরান খতম হয়ে যায়।

'সেই কোরান খতমের সোয়াব তো তুমি পাও না, সোয়াব পায় তোমার ক্যাসেট রেকর্ডার। এই ক্যাসেট রেকর্ডারের বেহেশতে যাবার খুবই উঁচু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।'

'খবরদার, নামায ঘরে কোন ঠাট্টা-ফাজলামি করবি না।'

নামায ঘরে কোরান পাঠ চলতে লাগল। খালা আমাকে ছাদের চিলেকোঠায় বার দেখাতে নিয়ে গেলেন। শ্বেত পাথরের কাউন্টার টেবিল। পেছনে আলমারী ভর্তি নানা আকারের এবং নানা রঙের বোতল ঝিকমিক করছে।

'কালেকশান কেমন, দেখেছিস ?'

'হুঁ। আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। শুধু আক্কেল গুড়ুম না, একই সঙ্গে বে-আক্কেল গুড়ুম।'

'বে-আক্কেল আবার কি ?'

'কথার কথা আর কি! করেছ কি তুমি ? দুনিয়ার বোতল জোগাড় করে ফেলেছ!'

'খাওয়ার লোক নেই তো। শুধু জমছে।'

www.BDeBooks.Com

'তোমার এখানে সবচে' দামি বোতল কোন্‌টা খালা ?'

'পেটমোটা বোতলটা— ঐ যে দেখে মনে হচ্ছে মাটির বোতল। পঞ্চাশ বছরের পুরানো রেড ওয়াইন। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের বিশেষ বিশেষ উৎসবে এই জিনিস খাওয়া হয়।'

'দাম কত তা তো বললে না।'

'দাম শোনার দরকার নেই। দাম শুনলে তুই ভিরমি খাবি।'

'এম্নিতেই ভিরমি খাচ্ছি। আজ আর আমার ভাত খেতে হবে না। ভিরমি খেয়ে পেট ভরে গেছে।'

আনন্দে খালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমার মুখ হয়ে গেল অন্ধকার। এক সপ্তাহ এ বাড়িতে থাকা যাবে না। আজই পালাতে হবে। রাতটা কোনমতে পার করে সকালে সূর্য ওঠার আগেই 'হ্যাপিশ'।

'আয়, লাইব্রেরি ঘর দেখি।'

'আবার লাইব্রেরি ঘরও আছে ?'

'বলিস কি! লাইব্রেরি ঘর থাকবে না ? লাইব্রেরি ঘর পুরোটা কাঠের করেছি। মেঝেও কাঠের। সব রকম বইপত্র আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুই বই পড়ে কাটাতে পারবি। নিউ মার্কেটের এক দোকানের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে রেখেছি— ভাল ভাল বই এলেই পাঠিয়ে দেয়। লাইব্রেরি ঘরে কম্পিউটার বসিয়েছি। তুই কম্পিউটার চালাতে জানিস ?'

'না।'

'আমিও জানি না। যাদের কাছ থেকে কিনেছি ওদের বলা আছে, অবসর পেলেই খবর দেব, ওরা এসে শিখিয়ে দেবে।'

'অবসর পাচ্ছ না ?'

'অবসর পাব কোথায় ? সকালটায় একটু অবসর থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমুতে যাই— সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাই। সারারাত জেগে থাকি— দুপুরে না ঘুমালে চলবে কেন ?'

'সারারাত জেগে থাক কেন ?'

'ঘুম না হলে জেগে না থেকে করব কি ?'

'ঘুম হয় না ?'

'না।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ ?'

'ডাক্তারের পেছনে জলের মত টাকা খরচ করেছি। এখনো করছি। এখনো চিকিৎসা চলছে। সাইকিয়াট্রিস্ট চিকিৎসা করছেন।'

'তারা কিছু পাচ্ছে না ?'

'পাচ্ছে কি পাচ্ছে না ওরাই জানে। ওদের চিকিৎসায় লাভ হচ্ছে না। এখন তুই হলি ভরসা।'

'আমি ভরসা মানে? আমি কি ডাক্তার না-কি?'

'ডাক্তার না হলেও তোর নাকি অনেক ক্ষমতা। সবাই বলে। তুই আমাকে রাতে ঘুমের ব্যবস্থা দে। তুই যা চাইবি তা-ই পাবি। ওয়াইনের ঐ বোতলটা তোকে না হয় দিয়ে দেব।'

পঞ্চাশ বছরের পুরানো মদের বোতল পাব এই আনন্দ আমাকে তেমন অভিভূত করতে পারল না। আমার ভয় হল এই ভেবে যে রেশমা খালা আমার উপর ভর করেছেন। সিন্দাবাদের ভূত সিন্দাবাদের উপর একা চেপেছিল। রেশমা খালা আমার উপর একা চাপেন নি, তাঁর পুরো বাড়ি নিয়ে চেপেছেন। একদিনেই আমার চ্যাপ্টা হয়ে যাবার কথা। চ্যাপ্টা হওয়া শুরু করেছি।

'হিমু!'

'জ্বি।'

'আমার ব্যাপারটা কখন শুনবি?'

'তোমার কোন ব্যাপার?'

'ওমা, এতক্ষণ কি বললাম— রাতে ঘুম না হওয়ার ব্যাপারটা।'

'একসময় শুনলেই হবে। তাড়াতো কিছু নেই।'

'এখন তুই কি করবি।'

'বুঝতে পারছি না। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব বলে ভাবছি। যে বিছানা বানিয়েছ শুতে সাহসও হচ্ছে না।'

'রেশমা খালা বললেন, বিছানা এমন কিছু না। সাধারণ ফোমের তোশক। তবে বালিশ হচ্ছে পাখির পালকের।'

'বল কি?'

'খুব এক্সপেনসিভ বালিশ। জ্যান্ত পাখির পাখা থেকে এসব বালিশ তৈরি হয়। মরা পাখির পালকে বালিশ হয় না।'

'একটা পালকের বালিশের জন্যে ক'টা পাখির পালক লাগে?'

'কি করে বলব কটা— কুড়ি পঁচিশটা নিশ্চয়ই লাগে।'

'একটা বালিশের জন্যে তাহলে পঁচিশটা পাখির আকাশে ওড়া বন্ধ হয়ে গেলো?'

'আধ্যাত্মিক ধরনের কথা বলবি না তো হিমু। এসব কথা আমার কাছে ফাজলামির মত লাগে।'

'ফাজলামির মত লাগলে আর বলব না।'

'যা, তুই রেস্ট নে। চা-কফি কিছু খেতে চাইলে ইন্টারকমে বলে দিবি।'

'তুই কি বেরুচ্ছ?'

'হুঁ। বললাম না সকালে আমি একটু বের হই দিন রাত ঘরে বসে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে না। তুই তো এখন আর বের হবি না?'

'না।'

www.BDeBooks.Com

'তাহলে তালা দিয়ে যাই।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, তালা দিয়ে যাবে মানে ?

খালা আমার চেয়েও অবাক হয়ে বললেন, তুই আমার মূল বাড়িতে থাকবি তোকে তালা দিয়ে যাব না ? লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস চারদিকে।

'ঘরে যদি আগুন টাগুন লেগে যায় তখন কি হবে ?'

'খামাখা আগুন লাগবে কেন ? আর যদি লাগে প্রতি ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইসার আছে।'

'তালা দেয়া অবস্থায় কতক্ষণ থাকব।'

'আমি না আসা পর্যন্ত থাকবি। আমি তো আর সারাজীবনের জন্যে চলে যাচ্ছি না। ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। সামান্য কিছুক্ষণ তালাবন্ধ থাকবি এতেই মুখ চোখ শুকিয়ে কি করে ফেলেছিস!'

'খালা, আমি হচ্ছি মুক্ত মানুষ। এটাই সমস্যা।'

'বিছানায় শুয়ে বই-টই পড়, টিভি দেখ। আমি তোকে কফি দিতে বলে যাচ্ছি।'

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দে তালা দেয়ার আওয়াজ পেলাম। এ বাড়ির সব কিছু আধুনিক হলেও তালাগুলো সম্ভবত মান্ধাতার আমলের। বড্ড শব্দ হয়।

পালকের বিছানায় মাথা রেখে শুয়ে আছি। আমাকে কফি দিয়ে গেছে। চাইনীজ খাবার কি বাবুর্চি জানতে এসেছিল, হাতে নোট-বুক, পেন্সিল। আমি গম্ভীর গলায় বলেছি আরশোলা দিয়ে হট এন্ড সাওয়ার করে একটা স্যুপ খাব। চাইনীজরা শুনেছি আরশোলার স্যুপ খুব সখ করে খায়। আমি কখনো খেয়ে দেখিনি।

বাবুর্চি হতভম্ব গলায় বলল, স্যারের কথা বুঝতে পারলাম না। কিসের স্যুপ ?

'ককরোচ স্যুপ। সঙ্গে মাশরুম দিতে পারেন, বেবিকর্ন দিবেন। সয়াসস অল্প দেবেন। আরশোলার গন্ধ মারার জন্যে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু, বেশিও না কমও না।'

'আমি স্যার আসলেই আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে না পারলে বিদায় হয়ে যান।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

তালাবন্ধ বাড়িতে পড়ে আছি। আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি কাজ করতে শুরু করেছে। সময় থেমে গেছে। টাইম ডাইলেশন। তালাবন্ধ অবস্থায় যে এর আগে থাকিনি তা না। হাজতে কাটানো রাতের সংখ্যা কম না। তবে হাজত তালাবন্ধ থাকবে এটা স্বীকৃত সত্য বলে খারাপ লাগে না। তালা খোলা অবস্থায় হাজতে বসে থাকাটা বরং অস্বস্তিকর। কিন্তু স্বর্গপুরীতে তালাবদ্ধ অসহনীয়।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি বেহেশত কেমন হবে? সেখানেও কি এ রকম তালা সিস্টেম থাকবে। না-কি বেহেশতবাসীরা মুক্ত স্বাধীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে পারবে। কারো ইচ্ছা হল সে দোজখে তার কোন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এল। বেহেশতের বর্ণনা ভাল মত জেনে নিতে হবে। খালার নামায ঘরে প্রচুর ধর্মের বই-টই আছে। সেখানে বেহেশত সম্পর্কে কি লেখা আছে পড়তে হবে।

কফি খাচ্ছি, কফিতে কোন স্বাদ পাচ্ছি না। স্বাদ যেমন নেই, গন্ধও নেই। একটু পর পর চোখ চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। ঘড়ি মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার বিখ্যাত বাবা আমাকে বন্দি থাকার ট্রেনিং অতি শৈশবে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল মহাপুরুষ বানানোর জন্যে এই ট্রেনিং অতি জরুরি। বন্দি না থাকলে 'মুক্তি'র স্বরূপ বোঝা যায় না। কাজেই একদিন আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিলেন— তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। যতটা অবাক হওয়ার কথা ততটা হলাম না। বাবার পাগলামির সঙ্গে ততদিনে পরিচিত হয়ে পড়েছি। আমার ধারণা সন্ধ্যা নাগাদ তালা খোলা হবে। আতংকে অস্থির হয়ে লক্ষ্য করলাম সন্ধ্যার পর পর বাবা বাড়ি ছেড়েই চলে গেলেন। যাবার সময় মেইন সুইচ অফ করে দিলেন। একেবারে কবরের অন্ধকার। ঐটা ছিল আমার বাবার ভয় জয় করা ট্রেনিং-এর প্রাথমিক অংশ। তাঁর ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন—

> "অদ্য রজনীতে হিমালয়কে ভয় জয় করিবার প্রস্তুতিসূচক ট্রেনিং দেওয়া হইবে। মানুষের প্রধান ভয় অন্ধকারকে। যে অন্ধকারের স্মৃতি সে অন্য কোন ভুবন হইতে লইয়া আসিয়াছে। অন্ধকারকে জয় করিবার অর্থ সমস্ত ভয় জয় করা। অদ্যকার অন্ধকার জয় করা বিষয়ক প্রাথমিক ট্রেনিং হিমালয় কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে পারিতেছি না। এই শক গ্রহণ করিবার মানসিক শক্তি কি তাহার আছে? বুঝিতে পারিতেছি না। কাহাকেও বাহির হইতে দেখিয়া তাহার মানসিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। সেই দিব্য দৃষ্টি প্রকৃতি মানব সম্প্রদায়কে দেয় নাই..."

আমি ইন্টারকম টিপে বাবুর্চিকে ডাকলাম। ইন্টারভ্যু নেয়ার ভঙ্গিতে বললাম, কি নাম?

'ইদ্রিস!'

শুরুতে তাকে আপনি করে বলেছিলাম, এখন তুমি।

'শোন ইদ্রিস! এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে? বাথরুম থেকে পাইপ বেয়ে নেমে পড়া বা এ জাতীয় কিছু?'

'জ্বি না।'

'ছাদে উঠে, ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে যাওয়া যায় না?'

'জ্বি-না।'

www.BDeBooks.Com

'টেলিফোন নিয়ে আস। দমকল অফিসে টেলিফোন করে দি। ওরা তালা খুলে উদ্ধার করবে।'

'টেলিফোন নাই স্যার।'

'টেলিফোন নাই মানে?'

'এই বাড়িতে সব আছে টেলিফোন নাই। টেলিফোনে লোকজন বিরক্ত করে। ম্যাডামের ভাল লাগে না।'

'ও, আচ্ছা।'

'স্যার, আরেক কাপ কফি এনে দেই। চিন্তার কিছু নাই ম্যাডাম চলে আসবেন। উনি বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকেন না। চলে আসেন। কফি দিব স্যার?'

'দাও।'

বাবুর্চি কফি এনে দিল। আমি কফি খেয়ে রেশমা খালার অপেক্ষা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি রাত হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

'কিরে, ঘুম ভেঙেছে?'

রেশমা খালা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। তিনি মাথার নকল চুল খুলে ফেলেছেন। তাঁকে মোটামুটি বীভৎস দেখাচ্ছে। তাঁর মাথার আদি চুলের এই অবস্থা কে জানত। কিছু আছে কিছু নেই। যেখানটায় নেই সেখানটার মাথার হলুদ চামড়া চকচক করছে।

'ঘরে ফিরে দেখি তুই মরার মত ঘুমুচ্ছিস। তাই আর ঘুম ভাঙালাম না। ঘুমের মূল্য কি তা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি। এতক্ষণ কেউ ঘুমুতে পারে তাও জানতাম না। তোর কোন অসুখ বিসুখ নেই তো?'

'ক'টা বাজে খালা?'

'নটার কাছাকাছি। তুই এক নাগাড়ে প্রায় দশঘণ্টা ঘুমুলি। ক্ষিধে লেগেছে নিশ্চয়ই। হাত-মুখ ধুয়ে আয় ভাত খাই।'

আমি উঠলাম। শান্ত গলায় বললাম, ভাত খেয়েই আমি একটু বেরুব খালা।

'বের হতে চাইলে বের হবি। আমি কি তোকে আটকে রেখেছি না-কি? বাবুর্চি বলছিল তালা দিয়ে যাওয়ায় তুই নাকি অস্থির হয়ে পড়েছিলি। আশ্চর্য। তুই কি ছেলেমানুষ না-কি? তুই আবার তাকে বলেছিস তেলাপোকার স্যুপ খেতে চাস। হি হি হি। বাবুর্চিটা বোকা টাইপের, ও সত্যি ভেবে বসে আছে। ঠাট্টা বুঝতে পারেনি।'

'তেলাপোকার স্যুপ তৈরি করেছে? আমি ঠাট্টা করিনি। আসলেই খেতে চেয়েছিলাম।'

'তুই দেখি আচ্ছা পাগল। আয় খেতে আয়। খেতে খেতে আমার ভয়ংকর গল্পটা বলব। তুই আবার চারদিকে বলে বেড়াবি না।'

ডাইনিং রুম ছাড়াও ছোট্ট একটা খাবার জায়গা আছে। শ্বেত পাথরের টেবিলে দুটা মাত্র চেয়ার। মোমবাতি জ্বালিয়ে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার। টেবিলে নানান ধরনের পদ সাজানো।

বাবুর্চি পাশে দাঁড়িয়েছিল। খালা বললেন, 'তুমি চলে যাও, তোমাকে আর লাগবে না। খাওয়া শেষ হলে ঘণ্টা বাজাব তখন সব পরিষ্কার করবে।'

'ঘণ্টার ব্যবস্থাও আছে?'

'আছে, সব ব্যবস্থাই আছে। খাওয়া শুরু কর। বাবুর্চির রান্না কেমন বলবি। রান্না পছন্দ না হলে ব্যাটাকে বিদেয় করে দেব। ব্যাটার চোখের চাউনি ভাল না। স্যুপটা কেমন?'

'ভাল। খুব ভাল।'

'তুই তো এখনো মুখেই দিস নি। মুখে না নিয়েই বলে ফেললি ভাল?'

'গন্ধে গন্ধে বলে ফেলেছি। চায়নীজ খাবারের আসল স্বাদ গন্ধে। গন্ধ ঠিক আছে। বাবুর্চিকে রেখে দাও।'

'চোখের চাউনিটা যে খারাপ । মাঝে মাঝে ভয়ংকর করে তাকায়।'

'ওকে বলবে সব সময় যেন সানগ্লাস পরে থাকে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না। ভাল বলেছিস হিমু। এটা আমার মাথায় আসেনি। কথায় আছে না এক মাথার থেকে দু'মাথা ভাল— আসলেই তাই। এখন আমার সমস্যাটা শোন। খুব মন দিয়ে শুনবি।'

'খাওয়া শেষ হোক তারপর শুনি...'

'খেতে খেতেই শোন। আমি আবার চুপচাপ খেতে পারি না। ব্যাপারটা কি হয়েছে শোন। তোর খালু মারা যাবার পর বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল ফালতু লোকে। অমুক আত্মীয় তমুক আত্মীয়। এক্কেবারে খুঁটি গেড়ে বসেছে। মতলব আর কিছু না— টাকা পয়সা হাতানো। টাটকা মধু পড়ে আছে— পিঁপড়ার দল চারদিক থেকে এসে পড়েছে। আমি একে একে ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় করলাম। বাড়ি খালি করে ফেললাম। চব্বিশঘণ্টা গেটে তালার ব্যবস্থা করলাম। একজনের জায়গায় দু'জন দারোয়ান রাখলাম। চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি। কাউকে ঢুকতে দেবে না। কেউ যদি ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি নট। আমার যদি কারোর সঙ্গে কথা বলার দরকার হয় আমি নিজেই দেখা করতে যাব। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। লোকজন টেলিফোনে বিরক্ত করে। দিলাম টেলিফোন লাইন কেটে।

এত বড় বাড়িতে আমি থাকি একা। একটু যে ভয় ভয় লাগে না, তা না। লাগে কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের যন্ত্রণার চেয়ে ভয় পাওয়া ভাল। লক্ষ গুণ ভাল।

তারপর একদিন কি হয়েছে শোন। রাত এগারোটার মত বাজে। খুব দেখি মশা কামড়াচ্ছে। দরজায়, জানালায় নেট আছে তারপরেও এত মশা ঢুকল কিভাবে? আমার মেজাজ হয়েছে খারাপ। কারণ আমি আবার মশারির ভেতর ঘুমুতে পারি না। আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল রেবা। ওকে বললাম মশারি

www.BDeBooks.Com

খাটিয়ে দিতে। ও মশারি খাটিয়ে দিল। মেজাজ টেজাজ খারাপ করে ঘুমুতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির কাছে গেলাম, মশারি তুলে দেখি মশারির ভিতর ও বসে আছে। তোর খালু। নেংটো হয়ে বসে আছে। গুটিসুটি মেরে বসা। মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান। সেই থেকে শুরু। কখনো তাকে দেখি খাটের নিচে কখনো বাথরুমের বাথটাবে। একদিন পেলাম ডীপ ফ্রীজ।

'কোথায়, ডীপ ফ্রীজে ?'

'হ্যাঁ। ডীপ ফ্রীজ সব সময় বাবুর্চি খোলে। সেদিন ফ্রীজে জিনিসপত্র কি আছে দেখার জন্যে ডালাটা তুললাম— দেখি একেবারে খালি ফ্রীজ, সেখানে ও বসে ঠাণ্ডায় থরথর করে কাঁপছে। এই হল ব্যাপার, বুঝলি। এরপর থেকে রাতে ঘুমুতে পারি না।'

'রোজই দেখ ?'

'প্রায় রোজই দেখি।'

'আজ দেখেছ ?'

'এখনো দেখিনি। তবে দেখব তো বটেই। এর মানেটা কি বল তো হিমু ? এই অত্যাচারের কারণ কি ? ভূত-প্রেত বলে সত্যি কিছু আছে ? মানুষ মরলে ভূত হয় ?'

আমি দেখলাম রেশমা খালা আর কিছু খেতে পারছেন না। মুখ শুকিয়ে গেছে। হাত কাঁপছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হিমু কথা বলছিস না কেন ?

'তুমি একাই উনাকে দেখ না আরো অনেকেই দেখে ?'

'সবাই দেখে। রেবা দেখেছে। দেখে চাকরি-টাকরি ছেড়ে চলে গেছে। আমার সাথে যারা আছে তারাও দেখেছে। এরা কেউ রাতে দোতলায় ওঠে না। তুই রাতটা আমার সঙ্গে থাক। তুইও দেখবি।'

আমি খালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম বেচারীর জন্যে মায়া লাগছে।

রেশমা খালার 'প্যালেসে' এক সপ্তাহ পার করে দিলাম। সমস্যামুক্ত জীবনযাপন। আহার, বাসস্থান নামক দুটি প্রধান মৌলিক দাবি মিটে গেছে। এই দুটি দাবি মিটলেই বিনোদনের দাবি ওঠে। খালার এখানে বিনোদনের ব্যবস্থাও প্রচুর আছে। আমার ভালই লাগছে।

ট্রাক দেখলে লোকে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সেই খোলা ট্রাকে করে ভ্রমণের আনন্দ অন্য রকম। আমার অবস্থা হয়েছে এরকমই। রেশমা খালার সঙ্গে গল্পগুজব করতে এখন ভালই লাগে। শুধু রাতে একটু সমস্যা হয়। রেশমা খালা আমার দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলেন, আয় আয়, দেখে যা, নিজের চোখে দেখে যা। বসে আছে, খাটে পা দুলিয়ে বসে আছে।

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, থাকুক বসে। তুমিও তার পাশে বসে পা নাচাতে থাকো। এ ছাড়া আর করার কি আছে?

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন সম্ভব না। সব জীবনেই কিছু ঝামেলা থাকবে। কাবাব যতই ভালই হোক, কাবাবের এক কোনায় ছোট হাড্ডির টুকরো থাকবেই।

রাতে রেশমা খালার হৈ-চৈ, ছোটাছুটি, চিৎকার অগ্রাহ্য করতে পারলে গনি প্যালেসে মাসের পর মাস থাকা যায়। তাছাড়া ঐ বাড়ির বাবুর্চির সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়েছে। নাপিত সম্প্রদায়ের মানুষ খুব বুদ্ধিমান হয় বলে জনশ্রুতি— আমাদের বাবুর্চি সব নাপিতের কান কেটে নেয়ার বুদ্ধি রাখে। বোকার ভান করে সে দিব্যি আছে।

এক সকালে সে আমার জন্যে বিরাট এক বাটি স্যুপ বানিয়ে এনে বলল, আপনি একবার আরশোলার স্যুপ চেয়েছিলেন, বানাতে পারিনি। আজ বানিয়েছি। খেয়ে দেখুন স্যার, আপনার পছন্দ হবে। সঙ্গে মাশরুম আর ব্রকোলি দিয়েছি।

বাটির ঢাকনা খুলে আমার নাড়িভুড়ি পাক দিয়ে উঠলো। সাদা রঙের স্যুপ, তিন-চারটা তেলাপোকা ভাসছে। একটা আবার উল্টো হয়ে আছে। তার কিলবিলে পা দেখা যাচ্ছে।

বাবুর্চি শান্ত স্বরে বলল, সস-টস কিছু লাগবে স্যার?

আমি বললাম, কিছুই লাগবে না। তাকে পুরোপুরি হতভম্ব করে এক চামচ মুখে দিয়ে বললাম, স্যুপটা মন্দ হয়নি। তবে আরশোলার পরিমাণ কম হয়েছে।

আমি কোন চীজ সে ধরতে পারেনি। ধরতে পারলে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে যেত না। আমি তাকে সামনে দাঁড়া করিয়েই পুরো বাটি স্যুপ খেয়ে বললাম— বেশ ভাল হয়েছে। পরেরবার আরশোলার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এটা যেন মনে থাকে।

বাবুর্চি বিড় বিড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা, স্যার।

রেশমা খালা আমার প্রতি যথেষ্ট মমতা প্রদর্শন করছেন। সেই মমতার নিদর্শন হচ্ছে আমাকে বলেছেন ও হিমু, তোর তো ভিক্ষুকের মত হাঁটাহাঁটির স্বভাব। হাঁটাহাঁটি না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। এখন থেকে গাড়ি নিয়ে হাঁটাহাঁটি করবি।

আমি বললাম, সেটা কি রকম?

'পাজেরো নিয়ে বের হবি। যেখানে যেখানে হাঁটতে ইচ্ছা করবে ড্রাইভারকে বলবি, গাড়ি নিয়ে যাবে।'

'এটা মন্দ না। গাড়িতে চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।'

কিছুদিন থেকে আমি পাজেরো নিয়ে হাঁটছি। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছি, এই গাড়িতে বসলেই ছোট ছোট গাড়ি বা রিকশাকে চাপা দেয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়।

www.BDeBooks.Com

ট্রাক ড্রাইভার কেন অকারণে টেম্পো বা বেবিটেক্সির উপর ট্রাক তুলে দেয় আগে কখনো বুঝিনি। এখন বুঝতে পারছি। এখন মনে হচ্ছে দোষটা সর্বাংশে ট্রাক ড্রাইভারদের নয়, দোষটা ট্রাকের।

যে বড় সে ছোটকে পিষে ফেলতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক জাগতিক নিয়ম। ডারউইন সাহেবের ধারণা 'সারভাইভেল ফর দি ফিটেস্ট' শুধু জীবজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে, বস্তুজগতের জন্যে প্রযোজ্য হবে না, তা হয় না।

পাজেরো না হাঁটতে বেরুবার একটাই সমস্যা— গলিপথে হাঁটা যায় না। রাজপথে হাঁটতে হয়। এরকম রাজপথে হাঁটতে বের হয়েই একদিন ইরার সঙ্গে দেখা। সে বেশ হাত নেড়ে গল্প করতে করতে একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছে। দূর থেকে দু'জনকে প্রেমিক-প্রেমিকার মত লাগছে। ছেলেটা সুদর্শন। লম্বা, ফর্সা, কোকড়ানো চুল। কফি কালারের সার্টে সুন্দর মানিয়েছে। তার চেহারায় আলগা গাম্ভীর্য। সুন্দর মেয়ে সঙ্গে নিয়ে হাঁটলেই আপনাআপনি ছেলেদের চেহারায় কিছু গম্ভীর্য চলে আসে। তার একটু বেশি এসেছে।

আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, ঐ যে ছেলেমেয়ে দুটি যাচ্ছে, ঠিক ওদের পেছনে গিয়ে বিকট হর্ন দিন। যেন দু'জন ছিটকে দু'দিকে পড়ে যায়।

ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, তারা যাচ্ছে ফুটপাতে। ফুটপাতে গাড়ি নিয়ে উঠব কিভাবে ?

'তাহলে তাদের সাইডে নিয়ে গিয়েই হর্ন দিন। চেষ্টা করবেন হর্নটা যথাসম্ভব বিকট করাট জন্যে।'

তাই করা হল। হর্ন শুনে ছেলেটার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেট পড়ে গেল। ইরা ছেলেটার মত চমকালো না। মেয়েদের স্নায়ু ছেলেদের চেয়ে শক্ত হয়। আমি গলা বাড়িয়ে বললাম, এই ইরা, এই ? যাচ্ছ কোথায় ?

ইরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সঙ্গী ছেলেটা হতভম্ব।

আমি প্রায় অভিমানের মত গলায় বললাম, ঐ যে তুমি মেসে এসে একবার গল্পগুজব করে গেলে, তারপর তোমার আর কোন খোঁজ নেই। ব্যাপার কি বল তো ? আমি এমন কি অন্যায় করেছি ?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি ছেলেটার চোখ-মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। তার প্রেমিকা অন্য একজনের মেসে গল্প করে সময় কাটাচ্ছে এটা সহ্য করা মুশকিল। কোন প্রেমিকই করে না।

আমি হাসি হাসি মুখে বললাম, উঠে এসো ইরা। উঠে এসো। তোমার সঙ্গে এক লক্ষ কথা আছে। আজ সারাদিন গাড়ি করে ঘুরব আর গল্প করব।

ইরা কঠিন মুখ করে এগিয়ে এল। গাড়ির জানালার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ?

'কোনভাবে বলছি ?'

'এমনভাবে বলছেন যেন আপনি আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। ব্যাপার সে রকম নয়। মুহিব না জানি কি ভাবছে।'

'মুহিবটা কে ? ঐ ক্যাবলা ?'

'ক্যাবলা বলবেন না, কোনদিন না। কখনো না।'

'তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড ?'

'হ্যাঁ।'

'তার ফ্রেন্ডশীপ কতটা গাঢ় সেটা আজ আমরা একটু পরীক্ষা করি। তুমি এক কাজ কর— মুহিবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গাড়িতে উঠে এসো। ওর প্রেমের দৌড়টা পরীক্ষা করা যাক। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকবে, রাগে থরথর করে কাঁপবে। সেটা দেখতে ইন্টারেস্টিং হবে।'

'সবার সঙ্গেই আপনি এক ধরনের খেলা খেলেন। আমার সঙ্গে খেলবেন না। এবং আপনি আমাকে আবার তুমি করে বলছেন। এ রকম কথা ছিল না।'

'আপনি তাহলে গাড়িতে উঠবেন না ?'

'অবশ্যই না। আপনি আমাকে কি ভেবেছেন ? পাপেট ? সুতা দিয়ে বাঁধা পাপেট ?'

'গাড়িতে না উঠলে চলে যাই। শুধু শুধু সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া মুহিব ছেলেটি কেমন ক্যাবলার মত হা করে আছে। দেখতে খারাপ লাগছে। আপনি বরং ওর কাছে চলে যান। ওকে বলুন হা করে তাকিয়ে না থাকতে। মুখে মাছি ঢুকে যেতে পারে।'

'এ রকম অশালীন ভঙ্গিতেও আর কোন দিন কথা বলবেন না।'

'আর কোনদিন আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। কথা বলার তো প্রশ্ন আসছে না।'

'দেখা হবে না মানে কি ?'

'দেখা হবে না মানে, দেখা হবে না। মাসখানিকের জন্যে আমি অজ্ঞাতবাসে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'হয় টেকনাফে, নয় তেঁতুলিয়া।'

'বাদলদের বাড়িতে আপনাকে যেতে বলেছিলাম, আপনি যাননি। ঐ বাড়িতে আপনাকে ভয়ংকর দরকার।'

'দরকার হলেও কিছু করার নেই। আচ্ছা ইরা, আমি বিদেয় হচ্ছি— তুমি কৃষ্ণের কাছে ফিরে যাও।'

ইরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, আপনি এখন চলে গেলে আর আপনার দেখা পাব না। বাদলের আপনাকে ভয়ংকর দরকার।

'তাহলে দেরি করে লাভ নেই, উঠে এসো।'

'এই গাড়িটা কার ?'

'কার আবার ? আমার। তুমি দেরি করছ ইরা।'

'আপনি আসলে চেষ্টা করছেন মুহিবের কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। কেন বলুন তো ?'

www.BDeBooks.Com

'ঈর্ষা।'

'ঈর্ষা মানে ? আপনি কি আমার প্রেমে পড়েছেন যে ঈর্ষা ?'

মুহিব আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। তার মুখে বিরক্তির গাঢ় রেখা। সে কর্কশ গলায় ডাকল— ইরা, শুনে যাও।

আমি বললাম, যাও, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি বেজে উঠেছে।

ইরা দোটানায় পড়ে গেলো। আমি ড্রাইভারকে বললাম, চল, যাওয়া যাক।

ড্রাইভার হুস করে বের হয়ে গেলো। যতটা স্পীডে তার বের হওয়া উচিত তারচেয়েও বেশি স্পীডে বের হল। মনে হচ্ছে সেও খানিকটা অপমানিত বোধ করছে। পাজেরোর মত বিশাল গাড়ি অগ্রাহ্য করার দুঃসাহসকে সেই গাড়ির ড্রাইভার ক্ষমা করে দেবে, তা হয় না।

'এখন কোন দিকে যামু স্যার ?'

'দিক-টিক না— চলতে থাক।'

দুপুরের দিকে আমি আমার পুরানো মেসে গেলাম। বদরুল সাহেবের খোঁজ নেয়া দরকার। চাকরির কিছু হয়েছে কি-না। হবার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না, তবে বদরুল সাহেবের বিশ্বাস থেকে মনে হচ্ছে, হয়ে যেতেও পারে। মানুষের সবচে' বড় শক্তি তার বিশ্বাস।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বদরুল সাহেব দরজা খুললেন। তাঁর হাসি-খুশি ভাব আর নেই। চোখ বসে গেছে। এই দু'দিনেই মনে হয় শরীর ভেঙে পড়েছে। তাঁর গোলগাল মুখ কেমন লম্বাটে দেখাচ্ছে।

'বদরুল সাহেবের খবর কি ?'

'খবর বেশি ভাল না, হিমু ভাই।'

'কেন বলুন তো ?'

'আমার স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ। ছোট মেয়ের চিঠি গত পরশু পেয়েছি। চিঠি পাওয়ার পর থেকে খেতেও পারছি না, ঘুমুতেও পারছি না।'

'ঢাকায় পড়ে আছেন কেন ? আপনার চলে যাওয়া উচিত না ?'

'ইয়াকুব আগামীকাল বিকেলে দেখা করতে বলেছে, এই জন্যেই যেতে পারছি না।'

'শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনাকে চাকরি দিচ্ছে ?'

'জ্বি। চাকরিটাও তো খুব বেশি দরকার। চাকরি না পেলে সবাই না খেয়ে মরব। আমি খুবই গরিব মানুষ, হিমু ভাই। কত শখ ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একসঙ্গে থাকব। অর্থের অভাবে সম্ভব হয় নাই। একবার মালীবাগে একটা বাসা প্রায় ভাড়া করে ফেলেছিলাম। দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট। বারান্দা আছে। রান্নার একটা জায়গা আছে। সামনে বড় আমগাছ। ডালে দোলনা বাঁধা। এত পছন্দ হয়েছিল! ভেবেছিলাম কষ্ট করে কোনমতে থাকব। এরা ছয় মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স চাইল। কোথায় পাব ছয় মাসের এ্যাডভান্স বলুন, দেখি!'

'তা তো বটেই।'

'হিমু ভাই, ছোট মেয়ের চিঠিটা একটু পড়ে দেখেন।'

মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ে। কিন্তু ভাই চিঠি পড়লে মনে হয় না। মনে হয় কলেজে পড়া মেয়ের চিঠি। দু'টা বানান অবশ্য ভুল করেছে।

চিঠি পড়লাম।

আমার অতি প্রিয় বাবা,

বাবা, মা'র খুব অসুখ করেছে। প্রথমে বাসায় ছিল, তারপর পাশের বাড়ির মজনু ভাইয়া মা'কে হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ডাক্তাররা বলছে ঢাকা নিয়ে যেতে। বাসায় সবাই কান্নাকাটি করছে।

তুমি কোন টাকা পাঠাও নাই কেন বাবা? মা প্রথম ভেবেছিল পোস্টাপিসে টাকা আসেনি। রোজ পোস্টাপিসে খোজ নিতে যায়। তারপর মা কোত্থেকে যেন শুনল তোমার চাকরি চলে গেছে।

বাবা, সত্যি কি তোমার চাকরি চলে গেছে? সবার চাকরি থাকে, তোমারটা চলে গেলো কেন? তোমার চাকরি চলে যাবার খবর শুনে মা বেশি কান্নাকাটি করেনি, কিন্তু বড় আপা এমন কান্না কেঁদেছে তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। বড় আপা কাঁদে আর বলে— "আমার এত ভাল বাবা! আমার এত ভাল বাবা!" আমি বেশি কাঁদিনি, কারণ আমি জানি, তুমি খুব একটা ভাল চাকরি পাবে। কারণ আমি নামাজ পড়ে দোয়া করেছি। বাবা, আমি নামাজ পড়া শিখছি। ছোট আপা বলেছে আত্তাহিয়াতু ছাড়া নামাজ হয় না। ঐ দোয়াটা এখনো মূখস্থ হয় নাই। এখন মূখস্থ করছি। মূখস্থ হলে আবার তোমার চাকরির জন্যে দোয়া করব।

বাবা, মা'র শরীর খুব খারাপ। এত খারাপ এ তুমি যদি মা'কে দেখে চিনতে পারবে না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাবা।

ইতি তোমার অতি আদরের ছোট মেয়ে
জাহেদা বেগম
ক্লাস সিক্স
রোল নং ১

'চিঠি পড়েছেন হিমু ভাই?'

'জ্বি।'

'মেয়েটা পাগলী আছে। চিঠির শেষে সব সময় কোন ক্লাস, রোল নং কত লিখে দেয়। ফার্স্ট হয় তো, এই জন্যে বোধহয় লিখতে ভাল লাগে।'

'ভাল লাগারই কথা।'

'দু'টা বানান ভুল করেছে লক্ষ্য করেছেন? খোঁজ আর মুখস্থ। মুখস্থ দীর্ঘ উকার দিয়ে লিখেছে। কাছে থাকি না, কাছে থাকলে যত্ন করে পড়াতাম।

www.BDeBooks.Com

সন্ধ্যাবেলা নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসার আনন্দের কি কোন তুলনা আছে ? তুলনা নেই। সবই কপাল।'

বদরুল সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি চোখের পানি মুছছেন। যতই মুছছেন ততই তাঁর চোখে পানি আসছে।

'বদরুল সাহেব!'

'জ্বি, হিমু ভাই।'

'আগামীকাল পাঁচটার সময় আপনার ইয়াকুব সাহেবের কাছে যাবার কথা না ?'

'জ্বি।'

'আমি ঠিক চারটা চল্লিশ মিনিটে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আপনার বন্ধু আবার আমাকে দেখে রাগ করবে না তো ?'

'জ্বি না, রাগ করবে না। রাগ করার কি আছে! সে যেমন আমার বন্ধু, আপনিও সে রকম আমার বন্ধু। আপনি সঙ্গে থাকলে ভাল লাগবে। চাকরির সংবাদ একসঙ্গে পাব। দুঃখ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে না ভাই সাহেব, কিন্তু আনন্দ ভাগাভাগি করতে ভাল লাগে।'

'ঠিক বলেছেন। দুপুরে কিছু খেয়েছেন ?'

'জ্বি না।'

'আসুন, ভাত খেয়ে আসি।'

'কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, হিমু ভাই। এম্নিতেই মেয়ের চিঠি পড়ে মনটা খারাপ, তার উপরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে— মনটা ভেঙে গেছে।'

'কি ঘটনা ?'

'বলতে লজ্জা পাচ্ছি, হিমু ভাই।'

'লজ্জা পেলে বলার দরকার নেই।'

'না, আপনার কাছে কোন লজ্জা নেই। আপনি শুনুন— ফার্মগেটে গিয়েছি— হঠাৎ দেখি রশীদ। আবদুর রশীদ। নগ্ন। শুধু কোমরে একটা গামছা। এর-তার কাছে যাচ্ছে আর বলছে— একটা লুঙ্গি কিনে দিতে।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে ?'

'জ্বি না। ও যেন আমাকে দেখতে না পায় এই জন্যে পালিয়ে চলে এসেছি। তারপর নিজের একটা লুঙ্গি, একটা শার্ট নিয়ে আবার গেলাম। তাকে পাইনি। মানুষের কি অবস্থা দেখেছেন হিমু ভাই ?'

'জ্বি দেখলাম।'

'ইয়াকুবের কাছে ওর চাকরির কথা বলব বলে ভাবছি।'

'আগে নিজেরটা হোক তারপর বলবেন।'

'রশীদকে দেখে এত মনটা খারাপ হয়েছে।'

'আপনি তাহলে দুপুরে কিছু খাবেন না ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে আমি উঠি। আগামী কাল চাকরির খবরটা নিয়ে আমরা এক কাজ করব। সরাসরি আপনার দেশের বাড়িতে চলে যাব।'

'সত্যি যাবেন হিমু ভাই ?'

'যাব।'

'আপনার ভাবীর শরীরটা খারাপ, আপনাকে যে চারটা ভাল-মন্দ রেঁধে খাওয়াবে সে উপায় নেই!'

'শরীর ঠিক করিয়ে ভাল-মন্দ রাঁধিয়ে খেয়ে তারপর আসব। ভাবী সবচে' ভাল রাঁধে কোন্ জিনিসটা বলুন তো ?'

'গরুর গোশতের একটা রান্না সে জানে। অপূর্ব! মেথিবাটা দিয়ে রাঁধে। পুরো একদিন সিরকা-আদা-রসুনের রসে মাংস ডুবিয়ে রাখে, তারপর খুব অল্প আঁচে সারাদিন ধরে জ্বাল হয়। বাইরে থেকে এক ফোঁটা পানি দেয়া হয় না... কি যে অপূর্ব জিনিস ভাই সাহেব!'

'ঐ মেথির রান্নাটা ভাবীকে দিয়ে রাঁধাতে হবে।'

'অবশ্যই অবশ্যই। পোনা মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে আপনাকে এমন এক জিনিস খাওয়াবো, এই জীবনে ভুলবেন না। কচি সজনে পাতা বেটে পোনা মাছের সঙ্গে রাঁধতে হয়। কোন মসলা না, কিছু না, দু'টা কাঁচামরিচ, এক কোয়া রসুন, একটু পেঁয়াজ। এই দেখুন বলতে বলতে জিবে পানি এসে গেলো।'

'জিবে পানি যখন এসে গেছে চলুন, খেয়ে আসি।'

'জ্বি আচ্ছা, চলুন। আপনি দেশে যাবেন ভাবতেই এত ভাল লাগছে!'

মেস থেকে বেরুবার মুখে ম্যানেজার হায়দার আলি খাঁ বললেন, স্যার, আপনি মেসে ছিলেন না, আপনাকে কাছে ঐ মেয়েটা দু'বার এসেছিল।

'ইরা ?'

'জ্বী, ইরা। উনার বাসায় যেতে বলেছে। খুব দরকার।'

'জানি। আমার সঙ্গে ঐ মেয়ের দেখা হয়েছে। ঐ মেয়ে যদি আবার আসে, বলবেন Get lost.'

'স্যার, কি বলব ?'

'বলবেন Get lost. কঠিন গলায় বলবেন।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

হায়দার আলি খাঁ পিরিচে চা খাচ্ছিল। আবারো সারা শরীরে চা ফেলে দিল। এই মানুষটা আমাকে এত ভয় পায় কেন কে জানে!

রাতের অনিদ্রাজনিত ক্লান্তি, দুঃশ্চিন্তা ও আতংক ভোরবেলা একটা 'হট শাওয়ার' দিয়ে রেশমা খালা দূর করে দেন। গোসলের পর তিনি পরচুলাটা মাথায় দেন। খানিকটা সাজগোজ করে আমার ঘরে এসে বললেন, কি রে হিমু, জেগেছিস ? গুড মর্নিং।

www.BDeBooks.Com

আমিও বলি, গুড মর্নিং খালা।

'চা দিতে বলেছি। হাত-মুখ ধুয়ে আয়।'

'তোমাকে তো আজ দারুণ লাগছে। কপালে টিপ দিয়ে বয়স দশ বছর কমিয়ে ফেলেছ। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স বাহান্ন।'

খালা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার বয়স তো আসলেই বাহান্ন।

'ও সরি!'

'হিমু, তোর ঠাট্টা-ফাজলামি আমার ভাল লাগে না। সাজগোজ সামান্য করি— তাতে কি ? দু'দিন পরে তো মরেই যাব। কবরে গিয়ে তো সাজতে পারব না। কবরে তোরা তো আর ক্রীম, লিপস্টিক দিয়ে আসবি না।'

'সেটা খাঁটি কথা।'

'বয়সকালে সাজতে পারিনি। এমন এক লোকের হাতে পড়েছিলাম যার কাছে সাজা না-সাজা এক। তাকে একবার ভাল একটা ক্রীম আনতে বলেছিলাম, সে দেশি তিব্বত ক্রিম নিয়ে চলে এসেছে। তারপরও আফসোস— এত নাকি দাম।'

'এখন তো পুষিয়ে নিচ্ছ।'

'তা নিচ্ছি। আয়, চা খাবি। আজ ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।'

'চমৎকার!'

চায়ের টেবিলে রেশমা খালাকে বললাম, খালা, অদ্য শেষ সকাল।

খালা বললেন, তার মানে কি ?

'তার মানে হচ্ছে নাশতা খেয়েই আমি ফুটছি।'

'ফুটছি মানে কি ?'

'ফুটছি মানে বিদেয় হচ্ছি। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগারপার।'

'আশ্চর্য কথা! চলে যাবি কেন ? এখানে কি তোর কোন অসুবিধা হচ্ছে ?'

'কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। বরং সুবিধা হচ্ছে। আমার ভুড়ি গজিয়ে গেছে। "মেদ-ভুড়ি কি করি"-ওয়ালাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠাট্টা করবি না হিমু। খবর্দার, ঠাট্টা না।'

'আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না খালা। চা খেয়েই আমি ফুটব।'

খালা বিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, আমার এই ভয়ংকর অবস্থা দেখেও তোর দয়া হচ্ছে না ? রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারি না। ঐ বদমায়েশ লোকটার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছে করে। আর তুই চলে যাবি ?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, খালু সাহেব কি কালও এসেছিল ? গতকাল তো তার আসার কথা না।

'গতকাল তার আসার কথা না মানে ? তুই জানলি কি করে তার আসার কথা না ?'

'আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে?

'হুঁ।'

'হুঁ-হ্যাঁ করিস না, ঠিকমত বল। তুই দেখেছিস?'

'হুঁ।'

'আবার হুঁ? আরেকবার হুঁ বললে কেতলির সব চা মাথায় ঢেলে দেব। কখন দেখা হল?'

'কাল রাত ন'টার দিকে।'

'বলিস কি!'

'তুমি রাতে খাওয়ার জন্যে ডাকলে। আমি ঘর থেকে বেরুব। স্যান্ডেল খোঁজার জন্যে নিচু হয়ে দেখি, উনি ঘাপটি মেরে খাটের নিচে বসে আছেন।'

'তোর খাটের নিচে ও বসবে কিভাবে? তোর খাটটা হল বক্স খাট। বক্স খাটের আবার নিচ কি?'

'ঠিক নিচ না, বলতে ভুল করেছি। খাটের সাইডে।'

'গায়ে কাপড়-চোপড় ছিল?'

'উহুঁ।'

'তুই দেখে ভয় পেলি না?'

'ভয় পাব কেন? জীবিত অবস্থায় উনার সঙ্গে আমার ভাল খাতির ছিল। একবার হেঁটে হেঁটে সদরঘাটের দিকে যাচ্ছি। তিনি তাঁর প্রাইভেট রিকশায় যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে রিকশা থামিয়ে তুলে নিলেন। পথে এক জায়গায় আখের সরবত বিক্রি হচ্ছিল। রিকশা থামিয়ে আমরা আখের সরবত খেলাম। আরেকটু এগিয়ে দেখি ডাব বিক্রি করছে— রিকশা থামিয়ে দু'জন ডাব খেলাম। তারপর খালু সাহেব আইসক্রীম কিনলেন। খেতে খেতে আমরা তিনজন যাচ্ছিলাম।'

'তিনজন হল কিভাবে?'

'রিকশাওয়ালাও খাচ্ছিল। তিনজন মিলে রীতিমত এক উৎসব। বুঝলে খালা, তখনই বুঝলাম উনি একজন অসাধারণ মানুষ। প্রায় মহাপুরুষ পর্যায়ের। ব্যবসায়ীরাও মহাপুরুষ হতে পারে কোনদিন ভাবিনি।'

'তুই এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাচ্ছিস। আসল কথা বল। খাটের নিচে ও বসেছিল?'

'খাটের নিচে না, সাইডে।'

'তারপর?'

'আমি বললাম, খালু সাহেব, কেমন আছেন?'

'সে কি বলল?'

'কিছু বললেন না। মনে হল লজ্জা পেলেন। তখন আমি বেশ রাগ রাগ ভাব নিয়ে বললাম— আপনার মত একটা ভদ্রলোক... মেয়েছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন।

www.BDeBooks.Com

এটা কি ঠিক হচ্ছে ? ভয় দেখানোর মধ্যেও তো শালীনতা, ভদ্রতা আছে। নেংটো হয়ে ভয় দেখানো। তাও নিজের স্ত্রীকে! ছিঃ ছিঃ!'

'তুই কি সত্যি এইসব বলেছিস ?'

'হ্যাঁ বললাম। উনি আমার কথায় লজ্জায় পেলেন খুব। মাথা নিচু করে ফেললেন। আমার তখন মনটা একটু খারাপ হল। আমি বললাম, এসব করছেন কেন ?'

'সে কি বলল ?'

'কথাবার্তা তাঁর খুব পরিষ্কার না। অস্পষ্ট। কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তবু যা বুঝেছি, উনি বললেন— তোর খালাকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এইসব করছি। শিক্ষা হয়ে গেলে আর করব না।'

রেশমা খালা ফস করে বললেন, শিক্ষা ? কিসের শিক্ষা ? আমি কি করেছি যে সে আমাকে শিক্ষা দেবে ? সারাজীবন যন্ত্রণা করেছে। মরার পরেও যন্ত্রণা দিচ্ছে। আর কিছু না। লোকটা ছিল হাড় বদমাশ।

আমিও খালু সাহেবকে এই কথাই বললাম। শুধু বদমাশটা বললাম না। তখন খালু সাহেব বললেন, তুমি আসল ঘটনা জান না। তোমার খালা আমাকে বিষ খাইয়েছিল।

'এত বড় মিথ্যা কথা আমার নামে ? এত সাহস ? ব্যথায় তখন ওর দম যায়-যায় অবস্থা। আমার মাথার নেই ঠিক— দৌড়ে অষুধ নিয়ে এনে খাওয়ালাম...'

খালু বললেন, যেটা খাওয়ানোর কথা সেটা না খাইয়ে ভুলটা খাইয়েছে। পিঠে মালিশের অষুধ দু'চামচ খাইয়ে দিয়েছে।

'ইচ্ছা করে তো খাওয়াইনি। ভয়ে আমার কথা এলোমেলো।'

'আমিও খালু সাহেবকে তাই বললাম। আমি বললাম— এটা অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল। রেশমা খালা মানুষ খুন করার মত মহিলাই না। অতি দয়ার্দ্র মহিলা।'

'এটা শুনে কি বলল ?'

'খিক খিক করে অনেকক্ষণ হাসল। তারপর আমি বললাম, এখনো তোমার প্রতি খালার গভীর ভালবাসা। তোমার স্মৃতি রক্ষার্থে "গনি মিয়া ইন্সটিটিউট অব মডার্ন আর্ট" করবে।'

'শুনে কি বলল ?'

'শুনে বলল, এইসব যদি করে তাহলে লাথি মেরে মাগীর কোমর ভেঙে ফেলব। ভূত হবার পর খালু সাহেবের ভাষার খুবই অবনতি হয়েছে। স্ত্রীকে মাগী বলা জীবিত অবস্থায় উনার জন্যে অকল্পনীয় ছিল ?'

রেশমা খালা এখন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আগের মত না— অন্যরকম। 'আমি খালু সাহেবকে বললাম, যা হবার হয়েছে। মাফ করে দেন। ক্ষমা যেমন মানবধর্ম, তেমনি ক্ষমা হচ্ছে ভূতধর্ম। উনি এক শর্তে ক্ষমা করতে রাজি হয়েছেন।'

'শতটা কি ?'

'শর্তটা হচ্ছে— তুমি তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান-খয়রাত করবে। স্কুল-কলেজে দিবে, এতিমখানা করবে, তাঁর দরিদ্র সব আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করবে। তাহলেই তিনি আর তোমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'হিমু!'

'জ্বি খালা।'

'তুই অসম্ভব বুদ্ধিমান। তুই কিছুই দেখিসনি। কারো সঙ্গেই তোর কথা হয়নি। পুরোটা আমাকে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিলি— ঢিল লেগে গেছে। তোর খালু যেমন বোকা ছিল, আমিও ছিলাম বোকা। শুধু ছিলাম না— এখনো আছি। কথা দিয়ে তুই আমাকে প্যাঁচে ফেলেছিস। তোর ধারণা তোর কথা শুনে তার কোটি কোটি টাকা আমি দান-খয়রাত করে নষ্ট করব ? রাতে ভূত হয়ে আমাকে ভয় দেখায়, তাতে কি হয়েছে ? দেখাক যত ইচ্ছা। বদমায়েশের বদমায়েশ!'

'এখন রাতে ভয় দেখাচ্ছেন, তারপর দিনেও দেখাবেন। আমাকে সে রকমই হিন্টস দিলেন।'

'বেশি চালাকি করতে যাস না হিমু। তোর চালাকির আমি পরোয়া করি না। খবর্দার, তোকে যেন আর কোনদিন এই বাড়ির আশেপাশে না দেখি।'

'আর দেখবে না খালা। এই যে আমি ফুটব, জন্মের মতই ফুটব। খালা শোন, খালু সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তার যে বর্ণনা আমি দিলাম তার পুরোটাই বানানো, তবে উনাকে আমি কিন্তু দেখেছি।'

'চুপ থাক হারামজাদা!'

'বিশ্বাস করুন উনাকে দেখেছি, এবং আপনি যে উনাকে মেরে ফেলেছেন এটা উনি ইশারায় আমাকে বোঝালেন। উনি কোন কথা বলেননি। ভূতদের সম্ভবত কথা বলার ক্ষমতা থাকে না।'

'চুপ হারামজাদা— শূওরের বাচ্চা। চুপ!'

রেশমা খালা ভয়ানক হৈ-চৈ শুরু করলেন। বাবুর্চি, দারোয়ান, মালী সবাই ছুটে এল। রেশমা খালা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এই চোরটাকে লাথি মেরে বের করে দাও।

রেশমা খালার কর্মচারীর ম্যাডামের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। শুধু লাথিটা দিল না। লাথির বদলে এমন গলাধাক্কা দিল যে রাস্তায় উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে রক্ষা পেলাম। খালার বাড়িতে আমার রেক্সিনের একটা ব্যাগ রয়ে গেল। ব্যাগের ভেতর আমার ইহজাগতিক যাবতীয় সম্পদ। দু'টা শার্ট, একটা খুব ভাল কাশ্মিরী শাল। শালটা রূপা আমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। আমি হতদরিদ্র মানুষ হলেও বুকে হাত দিয়ে একটা কথা বলতে পারি— ঢাকা শহরে এমন দামী শাল আর কারোরই নেই।

www.BDeBooks.Com

গলাধাক্কার ভেতর যে দিন শুরু হয়েছে সেই দিনের শেষটা কেমন হবে ভাবতেই আতংক লাগে। বিকেলে বদরুল সাহেবকে নিয়ে ইয়াকুব নামক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের কাছে যাবার কথা। সেখানে কোন নাটক হবে কে জানে।

রূপার সঙ্গে আজ সকালের মধ্যেই আমার দেখা করা দরকার। একমাত্র সেই পারে একদিনের নোটিসে বদরুল সাহেবের জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করতে। টেলিফোনে রূপার সঙ্গে কথা বলব— না সরাসরি তার বাড়িতে উপস্থিত হব, বুঝতে পারছি না। বাদলদের বাড়িতেও একবার যাওয়া দরকার। বাদল এমন কি করছে যে ইরাকে বার বার আমার খোঁজে যেতে হচ্ছে ? রূপাকে বাদলদের বাসা থেকেও টেলিফোন করা যায়।

দরজা খুলে দিল ইরা। আমি অসম্ভব ভদ্র গলায় বললাম, কেমন আছেন ?

ইরা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। দিন শুরু হয়েছে গলাধাক্কায়, কাজেই যার সঙ্গেই দেখা হবে সেই কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকবে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? আমাকে যে লাঠি দিয়ে মারছে না এই আমার তিনপুরুষের ভাগ্য।

'বাদল আছে না-কি ?'

'আছে।'

'ফুপা-ফুপু আছেন ?'

'সবাই আছেন। আপনি বসুন।'

ইরা কঠিন মুখে ভেতরে চলে গেল।

এমনভাবে গেল যেন বন্দুক আনতে গেছে। ফুপা অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, প্যান্ট পরেছেন, বোতাম লাগানো হয়নি, প্যান্টের বেল্ট লাগানো হয়নি। এই অবস্থাতেই চলে এলেন। আগুন আগুন চোখে তাকালেন। স্বামীর পেছনে পেছনে স্ত্রী— তাঁর চোখেও আগুন।

আমি হাসিমুখে বললাম, তারপর খবর কি আপনাদের ? সব ভাল ?

ফুপা ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন। গর্জন শুনেই মনে হচ্ছে খবর ভাল না।

'আপনাদের আর কারো গলায় কাঁটা-টাঁটা বিঁধেছে ?'

ফুপা এবারে হুংকার দিলেন, ইয়ারকি করছিস ? দাঁত বের করে ইয়ারকি ?

আমার অপরাধ কি বুঝতে পারছি না। তবে গুরুতর কোন অপরাধ যে করে ফেলেছি তা বোঝা যাচ্ছে। ইরাও এসেছে। তার চোখে আগে চশমা দেখিনি, এখন দেখি চশমা পরা।

ফুপু বললেন, তোকে যে এতবার খবর দেয়া হচ্ছে আসার জন্যে গায়ে লাগছে না ? তোকে কি হাতি পাঠিয়ে আনাতে হবে ?

'এলাম তো।'

'এসে তো উদ্ধার করে ফেলেছিস।'

'ব্যাপারটা কি খোলাসা করে বলুন।'

কেউ কিছু বলছে না। ভাবটা এরকম— আমি বলব না। অন্য কেউ বলুক। আমি ইরার দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললাম, ইরা, চা খাব।

ইরা এমন ভাব করল যেন অত্যন্ত অপমানসূচক কোন কথা তাকে বলা হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি যদি চা বানাতে না পার তাহলে লুৎফার মা'কে বল। ভাল কথা, লুৎফা মেয়েটা কোথায় ?

এবারো জবাব নেই। ফুপা পেন্টের বোতাম লাগাচ্ছেন বলে অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাঁকে বোতামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে, তবে ফুপু তাঁর দৃষ্টি দিয়ে স্বামীর অভাব পূরণ করে দিচ্ছেন। তাঁর চোখে ডাবল আগুন। কথা বলল ইরা। কাটা কাটা ধরনের কথা। তার কাছ থেকেই জানা গেল লুৎফা মেয়েটা চোরের হদ্দ। এসেই চুরি শুরু করেছে। বিছানার তল থেকে টাকা নিচ্ছে, মানিব্যাগ খুলে নিচ্ছে, সবশেষে যা করেছে তা অবিশ্বাস্য। ফুপুর কানের দুল চুরি করে নিজের পায়জামার ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছে। লাফালাফি করছিল, হঠাৎ পায়জামার ভাঁজ থেকে দুল বের হয়ে এলো। তৎক্ষণাৎ মা-মেয়ে দু'জনকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। কাজেই বাড়িতে এই মুহূর্তে কোন কাজের মেয়ে নেই। আগের মত চাইলেই চা পাওয়া যাবে না।

বাদলের প্রসঙ্গে যা জানা গেল তা কানের দুলের চেয়েও ভয়াবহ। সে গত দশদিন হল ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে ধ্যান করছে।

আমি মধুর ভঙ্গিতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, ধ্যান করা তো গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না। আপনারা এত আপসেট কেন ?

ফুপা বললেন, মুগুড় দিয়ে এমন বাড়ি দেবে যে সব ক'টা দাঁত খুলে চলে আসবে। ধ্যান করা শেখায়। সাহস কতবড়! যা, ধ্যান কিভাবে করছে নিজের চোখে দেখে আয়।

'কিভাবে ধ্যান করছে ?'

'কাপড়-জামা খুলে ধ্যান করছে। হারামজাদা! দশ দিন ধরে বিছানার উপর নেংটো হয়ে বসে আছে।'

'সে কি!'

'আবার বলে সে-কি ? তুই-ই না-কি বলেছিস নেংটো হয়ে ধ্যান করতে হয়। ধ্যান করা কাকে বলে তোকে আমি শেখাব। বন্দুক দিয়ে আজ তোকে আমি গুলি করে মেরে ফেলব। গুরুদেব এসেছে— ধ্যান শেখায়!'

ফুপু বললেন, তুমি এত হৈ-চৈ করো না। তোমার প্রেসারের সমস্যা আছে। তুমি অফিসে চলে যাও। যা বলার আমি বলছি।

'অফিস চুলায় যাক। আমি হিমুকে সত্যি সত্যি গুলি করে মেরে তারপর অফিসে যাব। গুরুদেবগিরি বের করে দেব।'

ইরা বলল, হৈ-চৈ করে তো লাভ কিছু হবে না। ব্যাপারটা ভাল মীমাংসা হওয়া দরকার। উনি বাদলকে বুঝিয়ে বলবেন যেন সে এসব না করে। তারপর এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। এবং বাদলের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবেন না।

www.BDeBooks.Com

ফুপা তীব্র গলায় বললেন, যোগাযোগ রাখবে কিভাবে ? হারামজাদাকে আমি দেশছাড়া করবো না! এ ক্রিমিন্যাল! এ পেস্ট!

পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হতে আধ ঘণ্টার মত লাগল। এর মধ্যে ইরা চা বানিয়ে আনল। ফুপার অফিসের গাড়ি এসেছিল— তিনি আমাকে গুলি করা আপাতত স্থগিত রেখে অফিসে চলে গেলেন। ফুপু ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে বসলেন। ফোঁসফোঁসানির মাঝখানে যা বললেন তা হচ্ছে— এত বড় ধামড়া ছেলে নেংটা হয়ে বসে আছে! কি লজ্জার কথা! তাকে তার ঘরে খাবার দিয়ে আসতে হয়। ভাগ্যিস বেশি লোকজন জানে না। জানলে নির্ঘাৎ পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসতো।

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই বলল, আপনি চা খেয়ে দয়া করে বাদলের কাছে যান। তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে বাস্তব এবং কল্পনা গুলিয়ে ফেলেছে।

আমি চায়ের কাপ হাতে বাদলের ঘরে গিয়ে টোকা দিলাম। বাদল আনন্দিত গলায় বলল, হিমু ভাই ?

'হুঁ।'

'আমি টোকা শুনেই টের পেয়েছি। তুমি ছাড়া এরকম করে কেউ টোকা দেয় না।'

'তুই ধ্যান করছিস না-কি ?'

'হুঁ। হচ্ছে না।'

'দরজা খোল দেখি।'

বাদল দরজা খুলল। সে যে নগ্ন হয়েই বসেছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। তার কোমরে তোয়ালে জড়ানো। মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

'তোমাকে দেখে এত আনন্দ হচ্ছে হিমু ভাই। মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলব।'

'তুই মনে হচ্ছে নাগা সন্ন্যাসীর পথ ধরে ফেলেছিস।'

'তুমি একবার বলেছিলে না— সব ত্যাগ করতে হবে। আসল জিনিস পেতে হলে সর্বত্যাগী হতে হবে। পোশাক-পরিচ্ছদও ত্যাগ করতে হবে।'

'বলেছিলাম না-কি ?'

'হ্যাঁ বলেছিলে।'

'ঐ স্টেজে তো ঝপ করে যাওয়া যায় না। ধাপে ধাপে উঠতে হয়। ব্যাপারটা হল সিঁড়ির মত। লম্বা সিঁড়ি। সিঁড়ির একেকটা ধাপ পার হয়ে উঠতে হয়। ফস করে জামা- কাপড় খুলে নেংটা হওয়াটা কোন কাজের ব্যাপার না।'

'শার্ট-প্যান্ট পরে ফেলব ?'

'অবশ্যই পরে ফেলবি। ইউনিভার্সিটি খোলা না ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ ক্লাস আছে ?'

'আছে।'

'জামা-কাপড় পরে ক্লাসে যা। সাধনার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেব। আস্তে আস্তে উপরে উঠতে হবে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। তুই নেংটা হয়ে বসে আছিস— আর এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। এভাবে সাধনা হয়?'

'ঠিকই বলেছ। ইউনিভার্সিটিতে যেতে বলছ?'

'অবশ্যই।'

'আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে একেবারেই ইচ্ছা করে না।'

'কি ইচ্ছা করে?'

'সারাক্ষণ ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকি। তোমার সঙ্গে পথে পথে হাঁটি।'

'পাশাপাশি দু'ভাবে থাকা যায়। স্থূলভাবে থাকা যায়। এই যেমন তুই আর আমি এখন পাশাপাশি বসে আছি। আবার সূক্ষ্মভাবে— চেতনার ভেতরও থাকা যায়। তুই যেই ভাববি আমার সঙ্গে আছিস, অমনি তুই আমার পাশে চলে এসেছিস। সাধারণ মানুষ স্থূল অর্থেই জীবনকে দেখে। এতেই তারা সন্তুষ্ট। তুই নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হতে চাস না?'

'না।'

'ভেরি গুড। যা, ইউনিভার্সিটিতে চলে যা।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। হিমু ভাই, তুমি কি আমার একটা রিকোয়েস্ট রাখবে? জাস্ট ওয়ান।'

'তোর একটা না, এক লক্ষ রিকোয়েস্ট রাখব। বলে ফেল।'

'ইরা মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দেবে? কঠিন একটা শিক্ষা!'

'সে কি করেছে?'

'তোমাকে নিয়ে শুধু হাসাহাসি করে। রাগে আমার গা জ্বলে যায়!'

'সামান্য ব্যাপারে গা জ্বললে হবে কেন?'

'আমার কাছে সামান্য না। কেউ তোমাকে কিছু বললে আমার মাথা খারাপের মত হয়ে যায়। হিমু ভাই, তুমি ইরাকে একটা শিক্ষা দাও। ওকে শিক্ষা দিতেই হবে।'

'কি শিক্ষা দেব?'

'ওকেও তুমি হিমু বানিয়ে দাও। মহিলা হিমু, যেন সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটে।'

'মেয়েমানুষ হয়ে রাত-বিরাতে রাস্তায় হাঁটবে! এটা ঠিক হবে না। তাছাড়া এমন একজন ভাল ছাত্রী!'

'বেশ, তাহলে তুমি তাকে এক রাতের জন্যে হিমু বানিয়ে দাও। জাস্ট ফর ওয়ান নাইট।'

'দেখি।'

'না, দেখাদেখি না। তোমাকে বানাতেই হবে। তুমি ইচ্ছা করলেই হবে।'

ফুপু এবং ইরার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে বাদল কাপড়-চোপড় পরে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল।

www.BDeBooks.Com

ইরা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি যা করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে এ বাড়িতে আর আসবেন না।

আমি বললাম, জ্বি আচ্ছা। শুধু একটা টেলিফোন করব। টেলিফোন করে জন্মের মত চলে যাব।

ইরা বলল, যদি সম্ভব হয় আপনি দয়া করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে আমি কোন উপদেশ দিতে চাই না। অপাত্রে উপদেশ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই। তার পরেও একটা কথা না বলে পারছি না— হলুদ পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় হাঁটলেই প্রকৃতিকে জানা যায় না। প্রকৃতিকে জানার পথ হল বিজ্ঞান। বুঝতে পারছেন ?

'পারছি।'

'পারলে ভাল। না পারলেও ক্ষতি নেই।'

ফুপু বললেন, ওর সঙ্গে কথা বলিস না ইরা। টেলিফোনটা এনে দে। টেলিফোন করে বিদেয় হোক।

ইরা টেলিফোন এনে দিল।

'হ্যালো রূপা! আমি হিমু।'

'বুঝতে পারছি।'

'কেমন আছ, রূপা ?'

'আমি কেমন আছি সেটা জানার জন্যে তুমি আমাকে টেলিফোন করোনি। তোমার অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা বলে ফেল।'

'রাগ করছ কেন ?'

'রাগ করছি না। তোমার রাগ করা অর্থহীন। যে রাগ বোঝে না তার উপর রাগ করে লাভ কি ?'

'রাগ হচ্ছে মানব চরিত্রের অন্ধকার বিষয়ের একটি। রাগ না বোঝাটা তো ভাল।'

'যে অন্ধকার বোঝে না, সে আলোও ধরতে পারে না।'

'রূপা, তোমার লজিকের কাছে সারেন্ডার করছি।'

'কি জন্যে টেলিফোন করছ বল।'

'আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দাও রূপা। এমন একটা চাকরি যেন ভদ্রভাবে খেয়ে-পরে ঢাকা শহরে ছোটখাট একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা যায়। জোগাড় করে দিতে পারবে ?'

'এমন কি কখনো হয়েছে যে তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ আর আমি বলেছি— না ?'

'হয়নি।'

'এবারো হবে না।'

'আজ দিনের ভেতর চাকরিটা জোগাড় করে দিতে হবে।'

'সেটা কি করে সম্ভব ?'

'তোমার জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব না।'

'চাকরিটা কার জন্যে ?'

'আমার এক বন্ধুর জন্যে। অতি প্রিয় একজনের জন্যে।'

'নাম বল। এপয়েন্টমেন্ট লেটারে তার নাম তো লাগবে।'

'লিখো— বদরুল আলম। চাকরিটা কিন্তু আজকের মধ্যেই জোগাড় করতে হবে।'

'চেষ্টা করব। এপয়েন্টমেন্ট লেটার কি তুমি এসে নিয়ে যাবে ?'

'হ্যাঁ, আমি এসে নিয়ে যাব।'

'তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করছ ? যদি বলতে তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

'আমি বাদলদের বাসা থেকে টেলিফোন করছি। এই নাম্বার তোমার কাছে আছে। এই নাম্বারে টেলিফোন করে আমাকে পাবে না। তারা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।'

'সবাই তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ?'

'হ্যাঁ দেয়। এই ভয়েই আমি তোমার কাছে যাই না। কাছে গেলে তুমিও হয়ত বের করে দেবে। রূপা, আমি টেলিফোন রাখি ?'

'না, আরেকটু কথা বল। প্লীজ, প্লীজ।'

'কি বলব ?'

'যা ইচ্ছা বল। এমন কিছু বল যেন...'

'যেন কি ?'

'না, থাক।'

আমার আগেই রূপা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। আমি ফুপুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ইরা বলল, আপনাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি— আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি বললাম, আমি কিছু মনে করিনি। আমি নানানভাবে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছি। আপনিও কিছু মনে করবেন না।

আমার ক্ষীণ আশা ছিল, মেয়েটা হয়ত বাড়ির গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেবে। সে এল না। আশ্চর্য কঠিন এক মেয়ে!

আমি এবং বদরুল সাহেব পাশাপাশি বসে আছি। ইয়াকুব আলি আমাদের সামনেই আছেন। আমাদের মাঝখানে বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে দু'টা টেলিফোন। একটা সাদা, একটা লাল। ইয়াকুব আলি সাহেব রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। আমরা বসে থাকতে থাকতে তিন-চারটা টেলিফোন করলেন। তাঁর টেলিফোন করার ধরনটা বেশ মজার। স্থির হয়ে কথা বলতে পারেন না। রিভলভিং চেয়ারে পাক খেতে খেতে কথা বলেন। বদরুল সাহেব খুব উসখুস করছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। ইয়াকুব আলি

www.BDeBooks.Com

এক ফাঁকে আমাদের দিকে একটু তাকাতেই বদরুল সাহেব বললেন, ইয়াকুব, ইনি হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, হিমু সাহেব, উনাকে সাথে করে এনেছি।

ইয়াকুব আলি আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হেসে বললেন, চা চলবে ? বলেই ইন্টারকমে কাকে খুব ধমকাতে লাগলেন।

আমরা ধমকপর্ব শেষ হবার জন্যে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। এক সময় ধমকপর্ব শেষ হল। ইয়াকুব আলি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, এ কি! এখনো চা দেয়নি ? বলেই কর্কশ শব্দে বেল বাজাতে লাগলেন। কিংবা কে জানে বেল হয়ত মধুর শব্দেই বাজল, তবে আমার কানে কর্কশ লাগলো।

বদরুল সাহেব বললেন, চা লাগবে না ইয়াকুব।

'অবশ্যই চা লাগবে। তুমি তোমার বন্ধু নিয়ে এসেছ। ফার্স্ট মিটিং, চা লাগবে না মানে ? তারপর বল কি ব্যাপার ?'

বদরুল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি আজ আসতে বলেছিলে।

'ও আচ্ছা, আজকে আসতে বলেছিলাম ?'

'আমার একটা চাকরির ব্যাপারে। তুমি বলেছিলে ব্যবস্থা করবে।'

ইয়াকুব আলি হাসিমুখে বলল, বলেছি যখন তখন অবশ্যই করব। স্কুল-জীবনের বন্ধুর সামান্য উপকার করব না তা তো হয় না। বায়োডাটা তো দিয়ে গিয়েছ ?

'হ্যাঁ।' দু'বার দিয়েছি।'

'আমি দেখেছি। দেখ বদরুল, আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। নো অপেনিং। যেসব অপেনিং আছে তোমাকে তা দেয়া যায় না। তুমি নিশ্চয়ই পিয়নের চাকরি করবে না। হা হা হা।'

বদরুল সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি আজকের কথা বলেছিলে। আমার অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

ইয়াকুব দার্শনিক ভাব ধরে ফেলে বলল, অবস্থা তো শুধু তোমার একার ভয়াবহ না, পুরো জাতির অবস্থাই ভয়াবহ। বিজনেস বলতে কিছু নেই। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান লসে রান করছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না।

'ইয়াকুব, আমি তোমার উপর ভরসা করে এসেছিলাম...'

'ভরসা নিশ্চয়ই করবে। ভরসা করবে না ? আমি কি করব তোমাকে বলি— আমি আমার বিজনেস কসমেটিক্স লাইনে এক্সপান্ড করছি। আমি মনে মনে ডিসাইড করে রেখেছি— তোমাকে সেখানে ম্যানেজারিয়েল একটা পোস্ট দেব।'

'সেটা কবে ?'

'একটু সময় নেবে। মাত্র জমি কেনা হয়েছে। লোনের জন্যে এপ্লাই করেছি। বিদেশী কোন ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে যাব। ফ্যাক্টরী তৈরি হবে— তারপর কাজ। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। এটা মনে রাখবে।'

বদরুল সাহেবের হতভম্ব মুখ দেখে আমার নিজেরই মায়া লাগছে। আহা বেচারা! সে বোধহয় জীবনে এত অবাক হয়নি। এসি বসানো ঠাণ্ডা ঘরেও ঘামছে।

চা চলে এসেছে। ইয়াকুব সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সিগারেট কি চলে নাকি ভাই ? তিনি আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। আমি সিগারেট নিতে নিতে বললাম, বদরুল সাহেবকে চাকরিটার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ?

ইয়াকুব সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন— এগজ্যাক্ট বলা মুশকিল। তিন-চার বছর তো বটেই। বেশিও লাগতে পারে।

আমি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। হাসিমুখে বললাম, ভাই শুনুন, চাকরি আপনার পক্ষে দেয়া সম্ভব না এই কথাটা সরাসরি আপনার বন্ধুকে বলে দিচ্ছেন না কেন ? বলতে অসুবিধা কি ? চক্ষুলজ্জা হচ্ছে ? আপনার মত মানুষের তো চক্ষুলজ্জা থাকার কথা না।

ইয়াকুব আলি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ঠাণ্ডা মাথায় আমাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার ক্ষমতা যাচাইয়ের একটা চেষ্টাও আছে।

বদরুল সাহেব বললেন, হিমু ভাই, চলুন যাই।

আমি বললাম, চা-টা ভাল হয়েছে, শেষ করে তারপর যাই।

ইয়াকুব আলি এখনো তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাত টেলিফোনের উপর। আমি তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন ? ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি নিরীহ একজন মানুষ। আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে— আপনার মুখে থু-থু ফেলতে পারি। এতে আপনার কিছু হবে না। কারণ প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আপনার মুখে অদৃশ্য থু-থু ফেলছে। আপনি এতে অভ্যস্ত। থু-থু না ফেললেই বরং আপনি অবাক হবেন।

বদরুল সাহেব হাত ধরে আমাকে টেনে তুলে ফেললেন। চাপা গলায় বললেন, হিমু ভাই, কি পাগলামি করছেন ?

ইয়াকুব সাহেব তাকিয়ে আছেন। রাগে তাঁর হাত কাঁপছে। সম্ভবত কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, ভাই, আপনি আমাকে ভাল করে চিনে রাখুন। আমার নাম হিমু। আমি কাউকে সহজে ছেড়ে দেই না। আপনাকেও ছাড়ব না।

বদরুল সাহেব আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করে ফেললেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি বললাম, বদরুল সাহেব, আপনি মেসে চলে যান। আমি একটা কাজ সেরে মেসে আসছি। তারপর দু'জন একসঙ্গে আপনার দেশে রওনা হয়ে যাব।

'আমার সঙ্গে তো টাকাপয়সা কিছু নাই।'

'একটা ব্যবস্থা হবেই। আপনার কি মেসে ফিরে যাবার মত রিকশা ভাড়া আছে ?

'জ্বি না।'

'আমার কাছেও নেই। পকেট নেই পাঞ্জাবি আজও পরে চলে এসেছি। আপনি হেঁটে হেঁটে চলে যান। চিটাগাংয়ের রাতে ট্রেন ক'টায় ?

www.BDeBooks.Com

'সাড়ে দশটায়।'

'রাত দশটার আগে আমি অবশ্যই পৌঁছে যাব।'

বদরুল সাহেব পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, কি ইচ্ছা করছে জানেন হিমু ভাই? ইচ্ছা করছে একটা চলন্ত ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়ে যাই।

'ট্রাকের সামনে লাফ দিয়ে পড়তে হবে না। আপনি মেসে চলে যান, আমি আসছি।'

'হিমু ভাই, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

আমি লক্ষ করলাম ভদ্রলোক সত্যি হাঁটতে পারছেন না। পা কাঁপছে। মাতালের মত পা ফেলছেন।

আমি বললাম, চলুন, আপনাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে তারপর যাই, আমার কাজটা সেরে আসি। হাত ধরুন তো দেখি।

'দেশে গিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে কি বলব? মেয়েগুলোকে কি বলব?'

'কিছু বলতে হবে না। এদের জড়িয়ে ধরবেন। এতেই তারা খুশি হবে। ভাই, চোখ মুছুন তো।'

আমি বদরুল সাহেবকে মেসে নামিয়ে দিয়ে গেলাম রূপার কাছে। আমি নিশ্চিত সে একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি তার হাত থেকে এপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নেব। হাজারখানিক টাকা নেব। কিছু মিষ্টি কিনব। বদরুল সাহেবের ছোট মেয়েটার জন্যে একটা বাংলা ডিকশনারি কিনব। মেয়েটা বড্ড বানান ভুল করে। 'মুখস্থ'-র মত সহজ বানান ভুল করলে চলবে কেন? এসব উপহার নিয়ে রাতের ট্রেনে রওনা হব বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধু-পত্নীর মেথি দিয়ে রাঁধা মাংস খেতে হবে। মাছের পোনা পাওয়া গেলে সজনে পাতা এবং পোনার বিশেষ প্রিপারেশন।

রূপাকে বাড়িতে পেলাম না। সে কোথায় কেউ বলতে পারল না। কখন ফিরবে তাও কেউ জানে না। দুপুরে বেরিয়েছে, আর আসেনি।

রাত নয়টা পর্যন্ত আমি রূপাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। বদরুল সাহেব অপেক্ষা করে থাকবেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁকে পৌঁছানো দরকার। সঙ্গে একটা পয়সা নেই। ফিরে গেলাম মেসে। কোন একটা ব্যবস্থা কি হবে না?

মেসের ম্যানেজার আমাকে আসতে দেখে ছুটে এল। তার ছুটে আসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। সেই বিশেষ কিছুটা কি? দুঃসংবাদ না সুসংবাদ? রূপা কি মেসে আমার জন্যে এপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে অপেক্ষা করছে, না-কি বদরুল আলম ভয়ংকর কোন কাণ্ড করে বসেছেন? সিলিং ফ্যান ঝুলে পড়ছেন?

ম্যানেজার হড়বড় করে বলল, স্যার, আপনি মেডিকেল কলেজে চলে যান!

'কেন?'

'বদরুল সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ।'

'কি হয়েছে?'

চুপচাপ বসেছিলেন। তারপর খুব ঘামা শুরু করলেন। কয়েকবার আপনার নাম ধরে ডাকলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। আমরা দৌড়াদৌড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। এম্বুলেন্স পাওয়া যায় না, কিছু পাওয়া যায় না। রিকশায় করে নিতে হয়েছে, হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা।

আমি হাসপাতালের সিঁড়িতে চুপচাপ বসে আছি। রূপা তার কথা রেখেছে। এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠিয়েছে। আমাকে না পেয়ে ইরার হাতে দিয়ে এসেছে। ইরা সেই চিঠি নিয়ে প্রথমে গেছে আমার মেসে। সেখানে সব খবর শুনে একাই রাত এগারটার দিকে এসেছে হাসপাতালে।

বদরুল সাহেবের জন্যে খুব ভাল একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছে রূপা। আট হাজার টাকার মত বেতন। কোয়ার্টার আছে। বেতনের সাত পার্সেন্ট কেটে রাখবে কোয়ার্টারের জন্যে। রাত বারটার দিকে বদরুল সাহেবের অবস্থা কি খোঁজ নিতে গেলাম। ইরাও এল আমার সঙ্গে সঙ্গে। ডাক্তার সাহেব বললেন, অবস্থা ভাল না। জ্ঞান ফিরেনি।

'জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা কি আছে?'

'ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

আমি বললাম, ডাক্তার সাহেব, এটা একটা এপয়েন্টমেন্ট লেটার। আপনার কাছে রাখুন। যদি জ্ঞান ফিরে উনার হাতে দেবেন। যদি জ্ঞান না ফিরে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলবেন।

আমি হাসপাতাল থেকে বের হচ্ছি। এখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা— জিরো আওয়ার। আমার রাস্তায় নেমে পড়ার সময়। ইরা বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, কোথাও না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবো।

'আপনার বন্ধুর পাশে থাকবেন না?'

'না।'

ইরা নিচু গলায় বলল, হিমু ভাই, আমি কি আপনার সঙ্গে হাঁটতে পারি? শুধু একটা রাতের জন্যে?

আমি বললাম, অবশ্যই পার।

ইরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনাকে যদি বলি আমার হাত ধরতে, আপনি রাগ করবেন?

আমি শান্ত গলায় বললাম, আমি রাগ করব না। কিন্তু ইরা, আমি তোমার হাত ধরব না।

হিমুরা কখনো কারো হাত ধরে না।

www.BDeBooks.Com

অনিল বাগচির একদিন

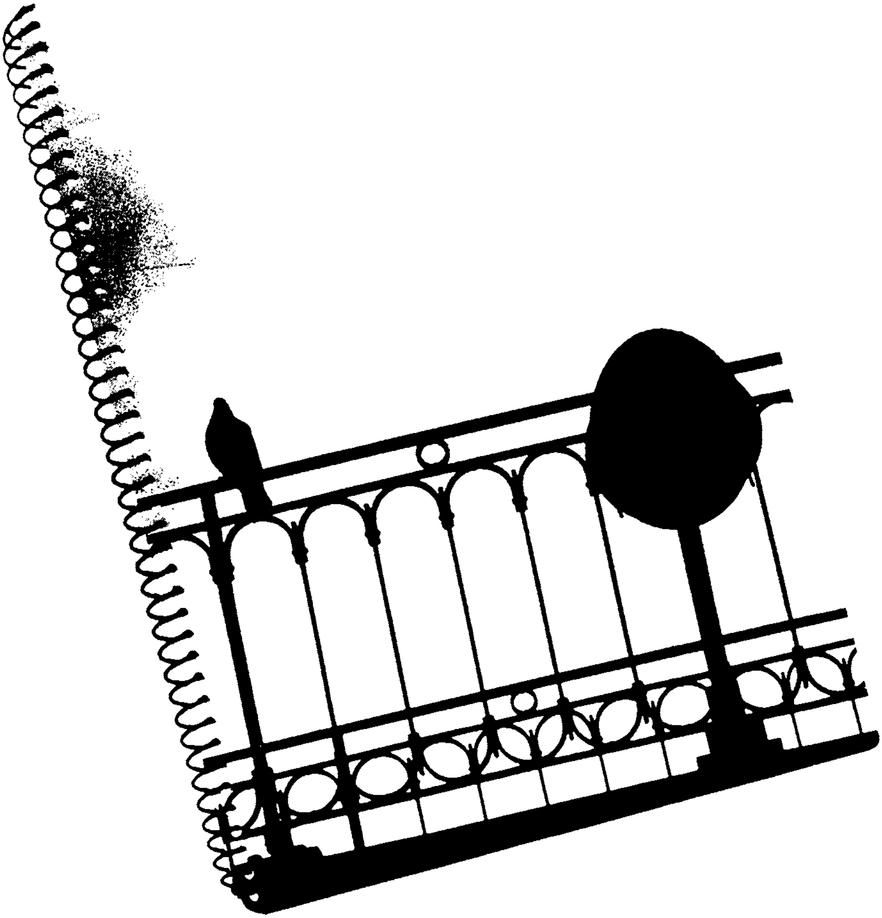

কেউ কি হাঁটছে বারান্দায় ?

পা টিপে টিপে হাঁটছে ?

অনিল বাগচী শুয়েছিল, উঠে বসল। তার শরীর ঝিম ঝিম করছে, পানির পিপাসা লেগেছে। সামান্য শব্দেই তার এখন এমন হচ্ছে। শরীরের কলকব্জা সম্ভবত সবই নষ্ট হয়ে গেছে। মাথার ভেতরটা সারাক্ষণ ফাঁকা লাগে। তার নাক পরিষ্কার, সর্দি নেই, কিছু নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে সে হা করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আবার পায়ের শব্দ। শব্দটা কি বারান্দায় হচ্ছে না রাস্তায় হচ্ছে ? অনিলের কান এখন খুব তীক্ষ্ণ। অনেক দূরের শব্দও সে এখন পরিষ্কার শুনতে পায়। হয়ত রাস্তায় কেউ হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু রাতের বেলা কে হাঁটবে রাস্তায় ? এখনকার রাত অন্যরকম রাত। দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকার রাত। রাস্তায় হেঁটে বেড়াবার রাত না।

কা-কা শব্দে কাক ডাকল। অনিল ভয়ংকর চমকে উঠল। এমন চমকে উঠার কিছু না। একটা কাক তার জানালার বাইরে বাসা বেঁধেছে। সে তো ডাকবেই, কিন্তু কা-কা করে শব্দটা ঠিক যেন তার মাথার ভেতর হয়েছে। কাকটা যেন তার মগজে পা রেখে দাঁড়িয়েছিল। কা-কা ডেকে ঠোঁট দিয়ে অনিলের মাথার মগজ খানিকটা ঠোকরে নিল। ব্যথায় শরীর পাক খাচ্ছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ।

এতটা ভয় নিয়ে বেঁচে থাকা কি সম্ভব ? এরচে' মরে যাওয়া কি অনেক সহজ না ? বাড়ির ছাদে উঠে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লে কেমন হয় ? ছাদে উঠার দরজাটা কি খোলা ? মেসের মালিক কামাল মিয়া ভারি ভারি সব তালা লাগিয়েছেন। সদর দরজায় ভেতর থেকে দু'টা তালা লাগানো হয়। ছাদে যাবার দরজাও নিশ্চয়ই বন্ধ। সেখানেও তালা।

অনিল হাত বাড়িয়ে পানির জগ নিল। তার গ্লাস ভেঙে গেছে, জগে মুখ লাগিয়ে পানি খেতে হয়। শোবার সময় সে জগ ভর্তি করে পানি এনে রাখে। কিছুক্ষণ পর পর কয়েক ঢোক করে পানি খায়। ভোরের মধ্যে পানির জগ শেষ হয়ে যায়।

ভয়। তীব্র ভয়। সারাক্ষণ ভয়ে অনিলের শরীর কাঁপে। সে অবশ্যি জন্ম থেকেই ভীতু ধরনের। ছোটবেলায় অন্ধকারে কখনো ঘুমুতে পারত না। বাতি

www.BDeBooks.Com

জ্বালিয়ে রাখতে হত। সে সময়টা আবার ফিরে এসেছে। এখন সে অন্ধকারে ঘুমুতে পারে না। রাত এগারোটার পর বাতি নিভিয়ে দিতে হয়। সে জেগে থাকে। মাঝে মাঝে অন্ধকার অসহ্য বোধ হলে বালিশের নিচে রাখা টর্চ জ্বালায়। তীরের মতো আলোর ফলা দেয়ালের নানান জায়গায় ফেলে। ঘরের অন্ধকার তাতে কমে না। খুব সামান্য অংশই আলোকিত হয়। বাকি ঘরে আগের মতোই অন্ধকার থাকে। অন্ধকার কমে না। অনিলের ভয়ও কমে না। অনিল বালিশের নিচ থেকে দু' ব্যাটারীর টর্চটা বের করল। আলো ফেলল দেয়ালে। আলো তেমন জোরালো না। ব্যাটারি কিনতে হবে। কি কি কিনতে হবে তা দিনে মনে থাকে না। রাতে শুধু মনে হয়। টর্চের ব্যাটারি, একটা পানির গ্লাস, মোমবাতি, কাগজ, লেখার কাগজ। কাল রাতে চিঠি লেখার ইচ্ছা করছিল। কাগজের অভাবে চিঠি লেখা হয় নি।

অনিল টেবিলে রাখা টেবিল ঘড়িটিতে আলো ফেলল। রাত বেশি না, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। সে এবার আলো ফেলল দেয়ালে। আলোটা পড়ল ঠিক ক্যালেন্ডারটার উপর। ওষুধ কোম্পানির চোখে বাংলাদেশ। পালতোলা নৌকা যাচ্ছে। মাঝি হাল ধরে বসে আছে। তার মুখভর্তি হাসি। তার হাসি মনে হতে পারে নৌকার হাল ধরে বসে থাকার মধ্যেই জীবনের পরম শান্তি।

ক্যালেন্ডারে পাশেই স্বামী বিবেকানন্দের বাঁধানো ছবি। অনিলের বাবা এই ছবি ছেলেকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। ছবিটির নিচে বিবেকানন্দের এটি বাণী লেখা। বাণীটি হচ্ছে— "যে ঈশ্বর মানুষকে ইহকালে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারেন না তিনি পরকালে তাদের পরম সুখে রাখবেন তা আমি বিশ্বাস করি না।"

ছবির বিবেকানন্দ রাগী চোখে তাকিয়ে আছেন। ঘরের যে দিকে যাওয়া যাক মনে হবে স্বামীজী সে দিকেই তাকিয়ে আছেন। রাগ ছাড়াও তাঁর চোখের ভাষায় এক ধরনের ভর্ৎসনা আছে। তিনি যেন বলছেন, 'রে মূর্খ, জীবনটা নষ্ট করছিস কেন ?'

অনিল টর্চ লাইটের আলো নিভিয়ে ফেলল। ছবিটা সরানো দরকার। নষ্ট করে ফেলা দরকার, কিংবা লুকিয়ে ফেলা দরকার। বিবেকানন্দের ছবি ঘরে রাখা এখন ভয়াবহ ব্যাপার। ছবিটা সরাতে হবে। এখনই কি সরাবে ? আবার কাক ডাকল। অনিল ভয়ে একটা ঝাঁকুনি খেল। অনিলের বাবা রূপেশ্বর মডেল হাই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক সুরেশ বাগচী, ছেলের চরিত্রে অস্বাভাবিক ভয়ের ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই বোধহয় ছেলের খাতায় একদিন বড় বড় করে লিখে দিলে—

"Cowards die many times before their death."

গম্ভীর গলায় বললেন, 'রোজ সকালে এই লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকবি। ধ্যান করবি। লেখাটার মানে হল— ভীতুদের মৃত্যুর আগেও অনেকবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। যে সে মানুষের লেখা না। শেকসপিয়ারের লেখা। দেখি শেকসপিয়ার বানান কর তো ?' সুরেশ বাগচীর অভ্যাসই হচ্ছে যে কোন কথা

বলেই ফট করে বানান জিজ্ঞেস করা। অনিল ক্লাস থ্রীতে যখন পড়ে তার পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হল। সুরেশ বাবু ছেলেকে কোলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন। পথে নেমেই বললেন, 'ব্যথা বেশি হচ্ছে বাবা ?'

অনিল কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হুঁ।'

'খুব বেশি ?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা বল তো ব্যথার ইংরেজি কি ?'

অনিল চোখ মুছতে মুছতে বল, 'পেইন।'

'এই তো হয়েছে। আচ্ছা বাবা, এখন পেইন বানান করতো। কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ব্যথা কম লাগবে। বানান করতো পেইন। আচ্ছা, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। প্রথম অক্ষর হল পি।'

সুরেশ বাগচীর প্রাণপণ চেষ্টাতেও অনিলের ইংরেজি বিদ্যা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। ইংরেজিতে আই. এ. পরীক্ষায় রেফার্ড পেয়ে গেল। সুরেশ বাগচী মনের দুঃখে পুরো দিন না খেয়ে রইলেন এবং সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করে ছোট ছেলেমেয়েদের মতো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। অনিল শুকনো মুখে বারান্দায় বসে রইল। অনিলের বড় বোন অতসী বাবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, 'দরজা খোল বাবা। দরজা খোল।' সুরেশ বাগচী বললেন, 'এই কুলাঙ্গারকে বেরিয়ে যেতে বল অতসী। কুলাঙ্গারের মুখ দেখতে চাই না।' অনিল ঘর থেকে বের হয়ে একা একা রূপেশ্বর নদীর ঘাটে বসে রইল।

অন্ধকার রাত। জনমানব শূন্য নদীর ঘাট। ওপারে শ্মশান, মড়া পুড়ানো হয়। কয়দিন আগেই মড়া পুড়িয়ে গেছে। ভাঙা কলসী, পোড়া কাঠ আবছা করে হলেও নজরে পড়ে। অনিলের গা ছমছম করতে লাগল। মনে হতে লাগল অশরীরী মানুষজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। নিঃশব্দে চলাফেরা করছে তাকে ঘিরে। এই তো কে যেন হাসল। শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাক এমন ভয়ংকর লাগছে কেন ? অনিল ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে যে দৌড়ে বাড়ি চলে যাবে সেই সাহসও রইল না।

গভীর রাতে হারিকেন হাতে সুরেশ বাগচী ছেলেকে খুঁজতে এলেন। নদীর পাড়ে এসে কোমল গলায় বললেন, 'অনিল বাবা, আয় বাড়ি যাই।' তিনি হাত ধরে ছেলেকে নিয়ে এগুতে লাগলেন। এক সময় বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এমন কাঁপছিস কেন ?'

'ভয় লাগছে বাবা।'

'আরে বোকা, কিসের ভয় ? শেকসপিয়ার কি বলেছিলেন, কাউয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ। ভীতুদের মরবার আগেও অনেকবার মরতে হয়। বলতো শেকসপিয়ারের কোন্ বইয়ে এই লেখাটা আছে। তোকে আগে একবার বলেছি। কি, পারবি না ?'

www.BDeBooks.Com

ছেলেবেলার অন্ধ, তীব্র ভয় আবার ফিরে এসেছে। অনিল এখন ঘুমুতে পারে না। রাত জেগে জেগে নানান ধরনের শব্দ শুনে। আতংকে কেঁপে কেঁপে উঠে। সবচে' বেশি ভয় পায় যখন কাক ডেকে উঠে। আচমকা এই কাকটা কা-কা করে আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

পরিষ্কার চটি পায়ে হাঁটার শব্দ। কে হাঁটছে চটি পায়ে? রহিম সাহেব? রহিম সাহেবের মাঝে মাঝে গভীর রাতে হাঁটার অভ্যাস আছে। তাঁর তো আজ সকালে চলে যাবার কথা ছিল। যেতে পারেন নি? অনিল বলল, 'কে? কে হাঁটে?'

কেউ জবাব দিল না। হুস করে একটা ট্রাক চলে গেল। কুকুর ডাকছে। ঢাকা শহরের কুকুরগুলি এখন খুব ডাকছে। মিলিটারী না-কি অনেক কুকুর মেরেছে। রাত দুপুরে কুকুরগুলি আচমকা ডেকে উঠছে— মিলিটারীরা ভয় পেয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে। কুকুর এখন মিলিটারী চিনে ফেলেছে। হঠাৎ কোন রাস্তা কুকুরশূন্য হলে বুঝতে হবে মিলিটারী সেখানে আছে। কিংবা তারা আসছে। বাঘের আগে ফেউ ডাকার মতো, মিলিটারীর আগে কুকুর ডাকে।

পায়ের শব্দটা আবার আসছে। ঠিক তার দরজার কাছে এসে শব্দ থেমে গেল। অনিল ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কে?' তার নিজের গলার শব্দ সে নিজেই শুনতে পেল না। তাকে ধরার জন্যে কি মিলিটারী চলে এসেছে? একটু আগে যে ট্রাকের শব্দ শোনা গেল, সেই ট্রাকে করেই কি তাকে অজানা কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে? সে দরজা খুলবে আর তাকে নিয়ে ট্রাকে তুলবে। এরা কি গাড়িতে তোলার সময় চোখ বেঁধে তুলে? কেন তাকে শুধু শুধু তুলবে? সে তো কিছুই করে নি। সে কোন মিছিলে যায় নি। তার ভয় লাগে। সাতই মার্চের ভাষণ শোনার জন্যে রেসকোর্সের মাঠে যাবার ইচ্ছা ছিল, তবু যায় নি। তার মন বলছিল ঝামেলা হবে। লোকজন ছোটাছুটি শুরু করবে। মরতে হবে মানুষের পায়ের নিচে চাপা পড়ে।

জন্মাষ্টমীর রথযাত্রা উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় নান্দিগ্রামে। ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে সেই মেলা সে দেখতে গেল। কি প্রচণ্ড ভীড়! যাতে হারিয়ে না যায় সে জন্যে সে দু'হাতে শক্ত করে বাবার হাত ধরে রাখল। তারপরও সে হারিয়ে গেল। লোকজনের চাপে ছিটকে কোথায় চলে গেল। মেলার সবগুলো মানুষ যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। যে যে-দিকে পারছে ছুটছে। বেদেনীর সাপের ঝুড়ি থেকে দু'টা কাল সাপ না-কি বের হয়ে পড়েছে। ছোটাছুটি এই কারণে। অনিল দৌড়াচ্ছিল চোখ বন্ধ করে। হঠাৎ কে যেন তাকে তাকে ধরে ফেলল। অনিল তাকাচ্ছে কিন্তু কিছু দেখছে না। তার চোখে সব দৃশ্য এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু সে শুনছে বুড়ো এক ভদ্রলোক বলছেন, 'এই ছেলেটা এমন করছে কেন? এ কেমন যেন নীল হয়ে যাচ্ছে। এই ছেলেটাকে বাতাস কর। ছেলেটাকে বাতাস কর।'

অনিল সারাজীবন সব রকম ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। আর আশ্চর্য! বেছে বেছে তাকেই একের পর এক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। রূপেশ্বরে

এক পাগলি আছে— 'মোক্তার পাগলি'। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তাকে মোক্তার বললেই বাঘিনীর মতো ছুটে যায়। বাচ্চা-কাচ্চারা তাকে দেখলেই ঢিল ছুঁড়ে। 'মোক্তার' বলে চিৎকার করে ক্ষেপায়। পাগলি তাদের তাড়া করে। অনিল কোনদিন মোক্তার পাগলিকে দেখে হাসে নি। তার গায়ে ঢিল ছুঁড়ে নি কিংবা মোক্তার বলে চেঁচায় নি। তারপরেও এই পাগল শুধু তাকেই খুঁজে বেড়াত। দেখা হলেই তাড়া করত। হয়ত সে বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। বটগাছের আড়ালে থেকে মোক্তার পাগলি বের হয়ে এল। বই-খাতা ফেলে অনিল ছুটছে। পেছনে পেছনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে মোক্তার পাগলি। রূপেশ্বরে এটা ছিল সাধারণ ঘটনা। কেউ অনিলকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসত না। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত। কেউ কেউ হাততালি দিয়ে চেঁচাত— 'লাগ ভেলকি লাগ।'

একদিন অনিল ধরা পড়ে গেল মোক্তার পাগলির হাতে। তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। হাফইয়ার্লি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি ফিরছে। পোস্টাপিসের কাছে আসামাত্র মোক্তার পাগলি ছুটে এসে অনিলকে হাত চেপে ধরল। মেলায় যেমন হয়েছিল অনিলের সে রকম হল। মনে হল সে কিছু দেখতে পারছে না। তার হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। এক্ষুণি বোধহয় হৃৎপিণ্ড ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। নাক দিয়ে সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই মজা দেখছে। বড়ই মজাদার দৃশ্য।

মোক্তার পাগলি এক ঝটকায় অনিলকে কোলে তুলে ফেলল। তার অনাবৃত স্তনে অনিলের মুখ চেপে বলল, 'খা দুধ খা। খা কইলাম।'

দর্শকরা বিপুল আনন্দে হেসে ফেলল। অনিলের নাম হয়ে গেল 'দুদু খাওয়া অনিল'। দুটি অনিল ছিল ক্লাসে। একজন শুধু অনিল, অন্যজন দুদু খাওয়া অনিল।

অনিল ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দিল। স্কুলের সময় দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। চেঁচিয়ে কাঁদত। অতসী বাবাকে গিয়ে বলত, 'থাক বাবা, আজ স্কুলে না গেল।'

একদিন সুরেশ বাগচী ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তোকে দুধ খাইয়েছে তো কি হয়েছে? মাতৃস্নেহে দুগ্ধপান করানোর চেষ্টায় দোষের কিছু না। মাতৃভাবে তাকে সম্মান করবি, তাহলেই হবে। আয় তোর ভয় ভাঙিয়ে দিয়ে আসি।'

অনিল বলল, 'না।'

'না বলবি না। না বলা দুর্বল মানুষের লক্ষণ। আয় আমার সাথে। অতসী তোর মা'র একটা শাড়ি বের করে দে।'

অতসী বলল, 'শাড়ি কি করবে?'

'মোক্তার পাগলিকে দেব। নগ্ন ঘুরে বেড়ায় দেখতে খারাপ লাগে।'

'মা'র শাড়ি কাউকে দিতে দিব না বাবা।'

'নতুন শাড়ি কেনার পয়সা নাইরে মা। দে, তোর মা'র একটা শাড়ি দে। মা'র স্মৃতি তো শাড়িতে থাকে না রে মা। মা'র স্মৃতি থাকে অন্তরে।'

www.BDeBooks.Com

এক হাতে লাল পাড় শাড়ি নিয়ে অন্য হাতে শক্ত করে অনিলের হাত ধরে সুরেশ বাগচী নগ্ন পাগলিকে খুঁজে বের করলেন। পাগলি কঠিন চোখে তাকাল। সুরেশ বাগচী বললেন, 'আমার এই পুত্র আপনার ভয়ে অসম্ভব ভীত। আমি শুনেছি আপনি তাকে পুত্রস্নেহে দুগ্ধ পান করাবার চেষ্টা করেছেন। কাজেই সে আপনার পুত্রস্থানীয়। আপনি আপনার পুত্রের ভয় ভাঙিয়ে দিন।'

পাগলি এইসব কঠিন কথার কি বুঝল কে জানে, তবে সে হাতে ইশারা করে অনিলকে কাছে ডাকল। অনিল ভয়াবহ আতঙ্কে বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সুরের বাগচী বললেন, 'ছেলে আপনার জন্যে একটা শাড়ি এনেছে, তার মায়ের ব্যবহারী শাড়ি। আপনি গ্রহণ করলে আমরা খুশি হব।'

পাগলি হাত বাড়িয়ে শাড়ি নিল।

সুরেশ বাগচী বললেন, 'পুত্রের কাছে নগ্ন অবস্থায় উপস্থিত হওয়া শোভন নয়। আপনি শাড়িটা পরে আমার ছেলের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিন।'

পাগলি বলল, 'দূর হ হারামজাদা।'

'আমি হাতজোড় করে মিনতি করছি। আপনি তাকে আর ভয় দেখাবেন না। মা-মরা ছেলে, সে জন্ম থেকেই ভীতু। আপনি তার মাতৃস্থানীয়। আপনার ভয়ে সে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।'

পাগলি নিজের গায়ে শাড়ি মেলে ধরতে ধরতে হাসি মুখে বলল, 'দূর হ, দূর হ কইলাম।'

আশ্চর্যের ব্যাপার! পাগলি আর কোনদিনই অনিলকে ভয় দেখায় নি। লালপেড়ে শাড়ি তাকে কখনো পরতে দেখা যায় নি। সে নগ্ন হয়েই ঘুরত। অনিলকে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে লাজুক গলায় বলতো, 'এই পুলা, মাথার চুল আচড়াও না ক্যান? একটা চিরুণি আনবা, চুল আঁচড়াইয়া দিমু।' অনিল দৌড়ে পালিয়ে যেত। তার ভয় কাটে নি। শরীরের সমস্ত স্নায়ু অবশ করে দেয়া তীব্র ভয়।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

অনিলের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কেউ একজন দরজার পাশে তাহলে দাঁড়িয়ে ছিল? কে সে? কে? অনিলের ঘাম হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'অনিল ঘুমাচ্ছ?'

গফুর সাহেবের গলা। তবু অনিল বলল, 'কে কে?'

'আমি। ভয়ের কিছু নাই। আমি। দরজা খোল।'

অনিল বিছানা ছেড়ে উঠেছে। সুইচ বোর্ড খুঁজে পাচ্ছে না। সমস্ত দেয়াল হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুইচ বোর্ডের জন্যে। তার বালিশের নিচে টর্চ লাইট। একবারও টর্চ লাইটের কথা তার মনে আসছে না। তাকে ডাকছেন গফুর সাহেব। সর্ব দক্ষিণের সিঙ্গেল রুমে থাকেন। এজি অপিসের সিনিয়ার অ্যাসিসটেন্ট। এই বছরেই রিটায়ার করার কথা। ঢাকায় বাসা করে থাকতেন।

স্ত্রী মারা যাবার পর বাসা ছেড়ে মেসে এসে উঠেছেন। একা মানুষ। বাসা ভাড়া করে এতগুলি টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছে করে নি। প্রয়োজনও নেই। দুটি মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। একজন থাকে রাজশাহীতে, একজন খুলনায়।

সুইচ বোর্ড খুঁজে পাওয়া গেল। অনিল বাতি জ্বালাল, দরজা খুলল। গফুর সাহেব বললেন, 'ঘুম আসছিল না, এ জন্যেই ডাকলাম। অন্য কিছু না।'

'এতক্ষণ ধরে আপনিই কি হাঁটাহাঁটি করছিলেন ?'

'হুঁ। বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে। আকাশে খুব মেঘ। তুমি কি চা খাবে অনিল ? রাতে ঘুম ভালো হয় না। একটু পরে পরে চা খাই। খাবে ?'

'না।'

'আস না, একটু চা খাও। সময় খারাপ। কথা-টথা বললে ভালো লাগে।'

গফুর সাহেব কথাগুলি বলার সময় একবারও অনিলের দিকে তাকালেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বললেন। কারণ তিনি অনিলের দিকে সরাসরি তাকাতে পারছেন না। আজ দুপুরে একটা ছেলে অনিলের একটা চিঠি দিয়ে গেছে তাঁর হাতে। চিঠিটা অনিলকে পৌঁছানোর দায়িত্ব তাঁর। সেই খোলা চিঠি তিনি কয়েকবার পড়েছেন। ভয়ংকর দুঃসংবাদের এই চিঠি তিনি অনিলকে দেয়ার মতো মনের জোর সংগ্রহ করতে পারেন নি। রূপেশ্বর স্কুলের হেড মাস্টার মনোয়ার উদ্দিন খাঁ লিখেছেন—

বাবা অনিল,

তোমাকে একটি দুঃখের সংবাদ জানাইতেছি। এপ্রিল মাসের নয় তারিখে রূপেশ্বরে পাক মিলিটারী উপস্থিত হয়। তাহাদের আকস্মিক আগমনের জন্যে আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। তাহারা রূপেশ্বরে অবস্থান নেয়। এপ্রিল মাসের বার তারিখে আরো অনেকের সঙ্গে তাহারা তোমার বাবাকে হত্যা করে। আমরা তাঁহাকে বাঁচানোর সর্বরকম চেষ্টা করিয়াছি। এর বেশি আমি আর কি বলিব ? তোমার ভগ্নিকে আমি আমার বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছি। তাহার বিষয়ে তুমি চিন্তা করিবে না। আল্লাহ পাকের নামে শপথ নিয়া বলিতেছি, আমার জীবন থাকিতে আমি অতসী মায়ের কোন অনিষ্ট হইতে দিব না। তোমার পিতার মৃত্যুতে রূপেশ্বরের প্রতিটি মানুষ চোখের জল ফেলিয়াছে। এই কথা তোমাকে জানাইলাম। জানি না ইহাতে তুমি মনে কোন শান্তি পাইবে কি-না। আল্লাহ পাক তাঁহার আত্মার শান্তি দিন, এই প্রার্থনা করি। তুমি সাবধানে থাকিবে। ভুলেও রূপেশ্বরে আসিবার কথা চিন্তা করিবে না। একদল মুক্তিযোদ্ধা রূপেশ্বর থানা আক্রমণ করিবার চেষ্টা করায় ভয়াবহ ফল হইয়াছে। রূপেশ্বরে বর্তমানে কোন যুবক ছেলে নাই।...

গফুর সাহেব ভেবেছিলেন রাতে চিঠিটা দেবেন। এখন অনিলের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে চিঠি না দেয়াই ভালো। ছেলেটা ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। এই খবর পেলে কি করবে কে জানে।

www.BDeBooks.Com

'অনিল।'

'জ্বি।'

'আস আমার ঘরে আস, চা খাও।'

অনিল উঠে এল। গফুর সাহেব কেরোসিনের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। দু'জন মেঝেতে মুখোমুখি বসে আছে। কারো মুখেই কোন কথা নেই। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে গফুর সাহেব বললেন, 'আজকের পূর্বদেশটা পড়েছ?'

অনিল বলল, 'না। আমি এখন খবরের কাগজ পড়ি না। পড়তে ইচ্ছা করে না।'

'আমারো পড়তে ইচ্ছা করে না। অভ্যাসের বসে পড়ি। তবে আজকের পূর্বদেশটা তোমার পড়া উচিত। নাও, এই জায়গাটা পড়। মন দিয়ে পড়।'

'অনিল পড়ল।'

"পাকিস্তানের আজাদী দিবস উপলক্ষে গোলাম আযমের আহ্বান। আযাদী দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শান্তিকমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন এক বিশাল সভার আয়োজন করে। সেই সভায় জনাব আযম পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তি কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।"

'পড়েছ অনিল?'

'জ্বি।'

'তোমার খুব সাবধানে থাকা দরকার। মেসে থাকাটা একেবারেই উচিত না। মিলিটারীর তিনটা টার্গেট— আওয়ামী লীগ, হিন্দু, যুবক ছেলে। তারপর আবার শুনলাম মেসে কারা কারা তাদের নাম-ধাম পরিচয় জানতে চেয়ে চিঠি এসেছে। কামাল মিয়া বলল।'

'কে চিঠি দিয়েছে?'

স্থানীয় শান্তি রক্ষা কমিটির এক লোক— এস এম সোলায়মান। মজার ব্যাপার কি জান— আগে এই লোক ঘোর আওয়ামী লীগারে ছিল। শেখ সাহেবের ভাষণ ক্যাসেট করে নিয়ে এসেছিল। মাইক বাজিয়ে মহল্লায় শুনিয়েছে। এখন সে বিরাট পাকিস্তানপন্থি। মানুষের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন। তবে আমি তাকে ঠিক দোষও দিচ্ছি না। সে হয়ত যা করছে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে করছে। এসব না করলে আওয়ামী লীগার হিসেবে তাকে মেরে ফেলত। ঠিক না?'

অনিল কিছু বলল না। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চুমুক দিতে লাগল। চা-টা খেতে ভালো লাগছে। বেশ ভালো লাগছে।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে? চানাচুর আছে। দেব চানাচুর? টেনশানের সময় খুব ক্ষিধা পায়।'

অনিল বলল, 'আমি আর কিছু খাব না। চা থাকলে আরেকটু নেব।'

গফুর সাহেব আবার কাপ ভর্তি করে দিলেন। নিচু গলায় বললেন, 'তুমি বরং মেসটা ছেড়ে দাও।'

'মেস ছেড়ে যাব কোথায় ? ঢাকা শহরে আমার পরিচিত কেউ নেই। ফতুল্লায় এক মামা থাকতেন। এখন আছেন কি-না তাও জানি না।'

গফুর সাহেব হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবার শেষ চিঠি কবে পেয়েছ ?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন ?'

'এম্নি জানতে চাচ্ছি। কোন কারণ নেই।'

'বাবার শেষ চিঠি পেয়েছি চার মাস আগে। এখন কেমন আছেন কিছুই জানি না। আমি বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছি। জবাব পাচ্ছি না।'

গফুর সাহেব বলরেন, 'যাও শুয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।'

অনিল নিজের ঘরে চলে এল। বাতি নিভিয়ে বিছানায় যাওয়ামাত্র বৃষ্টি শুরু হল। ঝুম বৃষ্টি।

জানালা খুলে একটু বৃষ্টি দেখলে কেমন হয় ? কত দিন জানালা খুলে ঘুমানো হয় না। আহা কেমন না জানি লাগে জানালা খোলা রেখে ঘুমুতে। দেশ স্বাধীন যদি সত্যি সত্যি হয় তাহলে সে কয়েক রাত রাস্তার পাশে পাটি পেতে ঘুমুবে। সে রাতগুলোতে ঘুম আসবে না সে রাতগুলো কাটাবে রাস্তায় হেঁটে হেঁটে।

ভাল বৃষ্টি হচ্ছে তো। ঝড় বৃষ্টির সময় মিলিটারীরা রাস্তায় থাকে না। এরা বৃষ্টি ভয় করে। হোক বৃষ্টি। দেশ ভাসিয়ে নিয়ে যাক। পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় বান ডাকুক। শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে আসুক জলরাশি।

টকটক শব্দে টিকটিকি ডাকছে। এই ঘরে চারটা টিকটিকি আছে। একটার গা ধবল কুষ্ঠের রুগীর মতো সাদা। একটা মাকড়সা আছে। সে সম্ভবত আয়নার পেছনে থাকে। ঠিক রাত আটটায় পেছন থেকে এসে আয়নার উপর বসে থাকে। এমন নিখুঁত সময়ে ব্যাপারটা ঘটে যে মনে হয় মাকড়সাটার নিজের কাছেও কোন ঘড়ি আছে। সম্ভবত টিকটিকিগুলো তাকে খেয়ে ফেলেছে। সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট। যে ফিট সে টিকে থাকবে।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নীল আলোয় ঘর ভেসে গিয়ে আবার সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অল্প বৃষ্টি হলেই মেসের সামনের রাস্তাটায় এক হাঁটু পানি হয়। সারারাত বৃষ্টি হোক, রাস্তায় এক কোমর পানি জমে যাক। পানি ভেঙে মিলিটারী জীপ আসবে না। ওরা শুকনো দেশের মানুষ। পানিতে ওদের খুব ভয়।

ঝড় হচ্ছে না-কি ? জানালায় শব্দ হচ্ছে। কাকটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। সাধারণত একটা কাক ডাকলে দশটা কাক এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই কাকটা নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন। এর ডাকে কখনো কাউকে সাড়া দিতে অনিল শুনে নি। সে থাকেও একা একা। তার পুরুষ বন্ধুও তাকে ছেড়ে গেছে। সে কি দরজা খুলে কাকটাকে ভেতরে আসতে বলবে ?

ঘুমে অনিলের চোখ জড়িয়ে আসছে। সারাদিন অসহ্য গরম ছিল। এখন পৃথিবী শীতল হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যাচ্ছে। বার বার মনে

www.BDeBooks.Com

হচ্ছে— এমন দুর্যোগে মিলিটারী পথে নামবে না। অন্তত আজকের রাতটা মানুষের শান্তিতে কাটবে। অনিল ঘুমিয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার স্বপ্ন দেখল। অনিল যেন খুব ছোট। তারা নৌকায় করে মামার বাড়ি যাচ্ছে। রূপবতী একজন তরুণীর কোলে সে বসে আছে। তার খুব লজ্জা লাগছে। অনিলের বাবা বললেন, 'ছেলে দেখি লজ্জায় মারা যাচ্ছে। আরে বোকা, এটা তোর মা। মা'র কোলে বসায় আবার লজ্জা কি ?' রূপবতী তরুণীটি বলছে— 'আহা ও কি আমাকে চিনে। লজ্জা তো পাবেই। এটাই তো স্বাভাবিক।' রূপবতী তরুণীর মুখ তখন খানিকটা মোক্তার পাগলির মতো হয়ে গেল। এবং সে বলতে লাগল— চিরণিটা কই ? দেখি অতসী চিরণিটা দে তো। আমি বাবুর চুল আঁচড়ে দেই। অতসী খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, 'ওকে বাবু ডাকছ কেন ? ওর নাম আনিল।' তখন কোত্থেকে যেন কাক ডাকতে লাগল— কা-কা-কা।

২

কা-কা-কা-কা। আসলেই কাক ডাকছে।

কাকের চিৎকারে অনিলের ঘুম ভাঙল। জানালা খোলা। গত রাতের ঝড়ে এক সময় ছিটকিনি খুলে গেছে। বৃষ্টির ছাটে বিছানার এক অংশ ভেজা। অনিলের পাও ভিজে আছে। তার ঘুম ভাঙে নি। এখন ঘুম ভাঙল কাকের ডাকে। নিঃসঙ্গ কাকটা জানালায় বসে অনিলের দিকে তাকিয়েই ডাকছে। অনিল বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। জানালার পাশে চলে গেল। সামান্য আলো হয়েছে। ভোর হচ্ছে। ভোর, নতুন আরেকটি দিনের শুরু।

রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। এখানে-ওখানে পানি জমে আছে। পানির উপর দিয়ে ছপ ছপ করতে করতে একটা কুকুর এগিয়ে গেল। শুকনো জায়গাও আছে। কুকুরটা সেদিকে গেল না। পানির উপর দিয়ে হাঁটতেই তার বোধহয় ভালো লাগছে। লাইটপোস্ট-এর ইলেকট্রিক তারে এক ঝাঁক শালিক বসে আছে। কয়টা শালিক সে কি গুনে দেখবে ? সুরেশ বাগচী এই ভাবেই তাকে গুনতে শিখিয়েছেন। ট্রেনে করে যাচ্ছে, জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখা গেল টেলিগ্রাফের তারে কয়েকটা ফিঙ্গে বসে আছে। সুরেশ বাবু বললেন, 'ও বাবু, ও অনিল গুনে ফেল তো বাবা ক'টা পাখি।'

অনিল বলল, 'না। আমি গুনব না।'

অতসী বলল, 'আমি গুনব বাবা ?'

সুরেশ বললেন, 'উঁহু উঁহু, অনিল গুনবে। ক'টা অনিল ? ক'টা ?'

গোনার আগেই ট্রেন পাখি ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। সুরেশ বাগচীর মুখ দেখে তখন মনে হতে পারে— তাঁর খুব ইচ্ছা চেন টেনে ট্রেনটাকে তিনি থামান। পুত্রকে নিয়ে চলে যান হাঁটতে হাঁটতে যাতে সে ফিঙ্গে গুনে আসতে পারে।

শৈশবের অভ্যাসেই অনিল এখন জানালার পাশে দাঁড়িয়ে শালিক পাখি গুনছে। পাখিগুলি স্থির হয়ে বসে আছে। পুরোপুরি ভোর না হওয়া পর্যন্ত এরা বোধহয় নড়বে না। কিংবা কে জানে এরা বোধহয় বুঝতে পারছে অনিল নামের ছাব্বিশ বছরের এক যুবক তাদের গুনছে। নড়াচড়া করলে যুবকের গুনতে অসুবিধা হবে।

রাস্তা এখনো ফাঁকা, রিকশা নেই, গাড়ি নেই, একটা মানুষ নেই। কার্ফ্যু সকাল ছ'টা পর্যন্ত। কাজেই ছ'টার আগে কাউকে দেখা যাবে না। এই সময় রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বললে কেমন হয়— 'আমি কার্ফ্যু মানি না।'

একটা জীপ চলে গেল।

মিলিটারী জীপ। ড্রাইভারের পাশে যে অফিসারটি বসে আছে তার চোখে সানগ্লাস। এই ভোর বেলা, যখন দিনের আলো পর্যন্ত স্পষ্ট হয় নি তখন অফিসারটি চোখে সানগ্লাস পরে বের হল কেন? সে কি চারদিক অন্ধকার করে রাখতে চায়? আশেপাশের কিছু দেখতে চায় না? জানালাটা বন্ধ করে দেয়া উচিত। সব বাড়ির জানালা বন্ধ। তারটা খোলা। সহজেই চোখে পড়ে যাবে। কারো মনে হয়ে যেতে পারে— এই বাড়িতে কোন রহস্য আছে। অনিল জানালা বন্ধ করে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ভেতরের দিকে মেস ঘরের উঠানে বিশাল এক কাঁঠাল গাছ। মেসের মালিক কামাল মিয়া প্রতিবারই বলেন, গাছ কাটিয়ে ফেলবেন— কোনবারই কাটা হয় না।

সব গাছেরই কিছু নিজস্ব রহস্য আছে। এই গাছেরও আছে। এই গাছে কখনো পাখি বসে না, পাখি বাসা বাঁধে না। অনিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে। গাছের মাথায় রোদ এসে পড়েছে। কাল রাতে বৃষ্টিতে পাতাগুলি ভেজা। সেই ভেজা পাতা রোদে চিকমিক করছে। মনে হচ্ছে গাছটা মাথায় সোনার টোপর পরেছে। কি আশ্চর্য সুন্দর! কি অদ্ভুত সুন্দর! বাবা তার সঙ্গে থাকলে মুগ্ধ হয়ে দেখতেন। বিস্মিত হয়ে বলতেন— 'আহা রে, আহা রে, কি সুন্দর! কি সুন্দর! এই জিনিসের ছবি আঁকা যাবে না। বুঝলি অনিল, এই জিনিসের ছবি আঁকা খুব সমস্যা।'

যে কোন সুন্দর জিনিস দেখলেই সুরেশ বাগচীর প্রথম চিন্তা এটার ছবি আঁকা যাবে কি-না। ভাবটা এ-রকম যেন ছবি আঁকা গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ রং তুলি দিয়ে ছবি এঁকে ফেলতেন।

'দিঘির জলে আকাশের ছায়া' দেখাবার জন্যে সুরেশ বাবু একবার অনিলকে নিয়ে গেলেন। সেটা না-কি একটা দেখার মতো ব্যাপার। যার ছবি আঁকা অসম্ভব। অনিলের বয়স তখন ছয় কি সাত। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা। সুরেশ বাগচী বললেন, 'কষ্ট হচ্ছে না-কি রে বাবু?'

অনিল বলল, 'বাবু বলবে না।'

'আচ্ছা যা বলব না। কষ্ট হচ্ছে না-কি রে অনিল?'

www.BDeBooks.Com

অনিল বলল, 'হুঁ।'

'যে কোন ভালো জিনিস দেখার জন্যে কষ্ট করতে হয়। আয় কাঁধে উঠে পড়।'

পাঁচ মাইল দূরে বিরামপুর দিঘি। মহারাজ কৃষ্ণকান্তর কাটা দিঘি। বাঁধানো ঘাট। সুরেশ তাঁর ছেলেকে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হলেন। লোকজন কাপড় কাচছে, গোসল করছে। তিনি বললেন, 'আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঘণ্টা খানেকের জন্য দিঘির জল কেউ নাড়াবেন না। নিস্তরঙ্গ জলে আকাশের ছায়া দেখাবার জন্যে আমি আমার পুত্রকে নিয়ে এসেছি। অনেক দূর থেকে এসেছি।'

আধবুড়ো এক লোক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপনে কেডা ?'

'আমার নাম সুরেশ বাগচী। আমি একজন শিক্ষক। দিঘির জল ঘণ্টা খানেকের জন্যে না নাড়ালে বড় ভালো হয়।'

'কাজকামের সময় চুপচাপ কে বসে থাকবে বলেন ? বিকালে আসবেন।'

'আচ্ছা, আমরা বরং অপেক্ষা করি। অপেক্ষারও আনন্দ আছে। ক্ষিধে পেয়েছে না-কি রে অনিল ?'

'না।'

'অতসীকে নিয়ে আসলে ভালো হত। বেচারীর এত শখ ছিল দেখার। ভাবলাম, মেয়ে মানুষ এত দূর হাঁটবে। মেয়ে হলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তোর ঘুম পাচ্ছে না-কি ? ঝিমাচ্ছিস কেন ?'

দিঘির ঘাট আর জনশূন্য হয় না। লোকজন আসছেই। দু'ঘণ্টা বসে থাকার পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঝুম বৃষ্টি। সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর হবে না, চল ফিরে যাই।'

ছাতা নেই। ভিজতে ভিজতে ফেরা। রাস্তা হয়েছে পিছল। সুরেশ বাগচীকে ছেলে কাঁধে নিয়ে এগুতে হচ্ছে। তিনি বিড় বিড় করে বলছেন, এ তো বড়ই যন্ত্রণা হয়ে গেল। নির্ঘাৎ জ্বর-জ্বারি হবে।

তারা বাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যা মিলিয়ে যাবার পর। সুরেশ বাগচী বাড়ি পৌঁছে শুনলেন তাঁর মেয়ে সারাদিন কিছু খায় নি। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে। সুরেশ বাগচী উদাস গলায় বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে রে মা। তোকে সঙ্গে নেয়া উচিত ছিল। আমরাও কিছু দেখতে পারি নি। আবার যেতে হবে। তখন নিয়ে যাব। গায়ে হাত দিয়ে বলছি রে মা।'

অতসী ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, "ভেজা হাত সরাও তো বাবা। নিজেরা সব ভালো ভালো জিনিস দেখবে।'

'ভুল হয়ে গেছে রে মা। বিরাট ভুল হয়ে গেছে। তবে আমরা ভালো জিনিস কিছু দেখতেও পাই নি। বিশ্বাস কর। এবার থেকে ভালো জিনিস যা দেখব, তোকে নিয়ে দেখব।'

অনিল কাঁঠাল গাছের মাথার মুকুটের দিকে তাকিয়ে মন ঠিক করে ফেলল। দেশটা ঠিকঠাক হলে এই দেশে যা কিছু সুন্দর জিনিস আছে সে তার বাবাকে আর অতসীদিকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখবে। প্রথম ছয়মাস শুধু ঘুরে বেড়াবে। কোন একটু সুন্দর জিনিসের সামনে বাবাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সে বলবে— বাবা দেখ তো, এর ছবি আঁকা যাবে কি-না। বাবা মাথা নাড়তে নাড়তে বলবেন, অসম্ভব। অতসীদি খিলখিল করে হাসবে। বাবা বিরক্ত হয়ে বলবেন, হাসছিস কেন মা ? সৌন্দর্যের একটা অংশ থাকে, কখনো যার ছবি আঁকা যায় না। এই জিনিসটা বুঝতে হবে...

গফুর সাহেবের ঘর থেকে কোরান তেলাওয়াতের সুর ভেসে আসছে। তিনি উঠেন অন্ধকার থাকতে থাকতে। নামায পড়েন। নামাযের পরে অনেকক্ষণ কোরান তেলাওয়াত করেন। তাঁর গলার স্বর মিষ্টি। পড়েনও খুব সুন্দর করে। প্রায়ই ভোরে অনিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনে। তার ভালো লাগে। শুধু ভালো লাগে বললে কম হয়, বেশ ভালো লাগে।

গফুর সাহেব দরজা খুলে অনিলকে দেখলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'রাতে ঘুম হয়েছিল অনিল ?'

'জ্বি।'

'আমার এক ফোটা ঘুম হয় নি। সারারাত জেগে কাটালাম। খুব খারাপ লাগছে। গত রাতেও ঘুমাতে পারি নি। এভাবে দিন কাটালে তো বাঁচব না। কিছু একটা করা উচিত ?

'কি করবেন ?'

'তাই তো জানি না। করব কি ?'

গফুর সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'তোমার একটা খবর আছে অনিল। কাল বিকেলে একটা ছেলে তোমার খোঁজে এসেছিল। অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আমাকে চিঠি দিয়ে গেছে। খুবই দুঃসংবাদ। তোমাকে দুঃসংবাদটা কীভাবে দেব বুঝতে পারছিলাম না। রাতে এই জন্যেই ঘুম হয় নি। সারারাত চিন্তা করেছি। এখন মনে হচ্ছে দুঃসংবাদটা দেয়া উচিত। সব মানুষেরই দুঃসংবাদ জানার অধিকার আছে। মন শক্ত কর অনিল।'

অনিল তাকিয়ে আছে। গফুর সাহেব তার কাঁধে হাত রেখে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, 'তোমার বাবা মারা গেছেন অনিল। এটা সহজভাবে নেয়ার চেষ্টা কর। আরো অসংখ্য মৃত্যু ঘটবে। এগুলো নিয়ে আমরা এখন কোন কান্নাকাটি করব না। দেশ স্বাধীন হোক। দেশ স্বাধীন হবার পর আমরা চিৎকার করে কাঁদব। নাও চিঠিটা পড়।'

অনিল চিঠি পড়ল। তার চোখ শুকনো। মুখ ভাবলেশহীন। অনিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গফুর সাহেবের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি পাঞ্জাবির প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছছেন। অনিল ছেলেটিকে তিনি খুবই পছন্দ করেন।

www.BDeBooks.Com

ভদ্র, লাজুক এবং অতি বিনয়ী ছেলে। কোরান পাঠের পর বারান্দায় এলে রোজই এই ছেলেকে দেখেন। একদিন সে লাজুক গলায় বলল, 'আমি চিঠি পেয়েছি আমার বাবা খুব অসুস্থ। নতুন চাকরি, এরা ছুটি দিচ্ছে না। যেতে পারছি না। আপনি কি আমার বাবা জন্যে একটু প্রার্থনা করবেন ?'

গফুর সাহেব বললেন, 'অবশ্যই করব, অবশ্যই। আমি খাস দিলে উনার জন্য দোয়া করব। আলাদা নফল নামায পড়ব। তুমি মোটেও চিন্তা করবে না। দেখি আস, আস আমার ঘরে, চা খাও।' অনিল তার ঘরে এসে কেঁদে ফেলল।

সেই ছেলে বাবার মৃত্যুসংবাদের চিঠি হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চিঠিটা সে দ্বিতীয়বার পড়ে নি। তার চোখ শুকনো। সে তাকিয়ে আছে কাঁঠাল গাছটার দিকে। কে জানে ছেলেটার মনের ভেতর এখন কি হচ্ছে।

গফুর সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। আজকের মতো কোরান পাঠ তিনি শেষ করেছিলেন। এখন আরো খানিকটা পড়তে ইচ্ছা করছে।

"আলিফ লাম মীম। জালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহা, হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন।"

ইহা সেই গ্রন্থ যাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা বিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শক।

অনিল ঘরে ঢুকল। জানালা খুলে দিল। অন্ধকার ঘর ক্রমে আলো হয়ে উঠছে। আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে নীল। বাতাস মধুর। শ্রাবণ মাসের অপূর্ব সুন্দর একটা সকাল।

অনিল কাপড় পরছে। সে রূপেশ্বর রওনা হবে। তার এখন কেন জানি মোটেই ভয় লাগছে না। চুল আঁচড়াবার জন্য চিরুণি খুঁজতে ড্রয়ারে টান দিতেই একগাদা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। দু'একটা পড়েছে মেঝেতে। অনিলের কাছে লেখা তার বাবা এবং অতসীদির চিঠি। তার কাছে লেখা তার বাবার শেষ চিঠিটিই সে শুধু সঙ্গে নিয়ে যাবে। বাকিগুলো থাকুক যেমন আছে শেষ চিঠিতে সুরেশ বাগচী লিখেছেন—

"বাবা অনিল",

অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তোমাকে পত্র দিতেছি। চারিদিকের আবহাওয়া আমার ভালো বোধ হইতেছে না। শংকিত বোধ করিতেছি। মন বলিতেছে এই দেশ বড় ধনের কোন বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া যাইবে। নিজের জন্যে এবং অতসীর জন্যে আমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে নিয়াই যত ভয়। রাজধানীতে আছ। বিপর্যয়ের প্রথম ধাক্কাটা তোমাদের উপর দিয়াই যাইবে। তুমি ভীতু ধরনের ছেলে, কি করিতে কি করিবে তাহাই আমার চিন্তা। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখিও এবং ঈশ্বরকে স্মরণ রাখিও। ভুলিও না— মঙ্গলময় ঈশ্বর তাঁহার বিরাট জগতের প্রতিটি জীবের কথা ভাবেন। আমাদেরও উচিত তাঁহার কথা ভাবা।

অতসী ভালো আছে তাহাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করা আমার বড় দায়িত্বের একটি। তেমন সন্ধান পাইতেছি না। তাহার বড় মামা কলিকাতা হইতে পত্র

দিয়াছেন যেন আমি অতসীকে কলিকাতা নিয়া যাই। সেইখানে পাত্রের সন্ধান করিয়া বিবাহ দিবেন। আমি তাহাতে সম্মত হই নাই। অতসী এই দেশের মেয়ে। এই দেশে তাহার বিবাহ হইবে। এই বিষয়ে তোমার ভিন্ন মত থাকিলে আমাকে জানাইবে।

মোক্তার পাগলি মাঝে মধ্যে তোমার সন্ধানে আসে। কিছু দিন পূর্বে কয়েকটা পাকা কামরাঙ্গা নিয়া আসিয়াছিল। তোমাকে দিতে চায়। একজন পাগল মানুষের ভালবাসার এই প্রকাশ দেখিয়া আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। আমি অতসীকে বলিলাম যত্ন করিয়া সে যেন মোক্তার পাগলিকে চারটা ভাত খাওয়াইয়া দেয়। তাহাকে বারান্দায় পাটি বিছাইয়া খাইতে দেওয়া হইল। সে অনেকক্ষণ ভাত মাখাইয়া কিছু মুখে না দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

এই পাগল মানুষটি তোমার প্রতি যে ভালবাসা দেখাইল তাহা তুমি স্মরণ রাখিও। আরেকজন মানুষের কথা স্মরণ রাখিও যিনি তোমার প্রতি কোন ভালবাসা দেখাইবার সুযোগ পান নাই। তিনি তোমার মা। তোমার জন্মমুহূর্তেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মায়েরা সন্তানের জন্যে অসীম ভালবাসা নিয়া আসেন। এই মা সেই অসীম ভালবাসার কিছুই ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া মনে করিও না সেই ভালবাসা নষ্ট হইয়াছে। এই পৃথিবীতে সবই নশ্বর, কিছুই টিকিয়া থাকে না, কেবল ভালবাসা টিকিয়া থাকে।

যদি কখনো বড় বিপদে পড় ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সেই সঙ্গে তোমার মা'কেও স্মরণ করিবে। ইহাই আমার উপদেশ। পরম করুণাময় তোমার মঙ্গল করুন।

৩

রেস্টুরেন্টের নাম কিছুদিন আগেও ছিল 'বাংলা রেস্টুরেন্ট।'

এখন নতুন নাম। কায়দে আযম রেস্টুরেন্ট। সাইন বোর্ড ইংরেজি, উর্দু এবং বাংলায় লেখা। সবচে' ছোট হরফ বাংলায়। বাঙালিরা এসব দেখছে। কিছু বলছে না। চুপ করে আছে। ছাব্বিশে মার্চের পর সবাই অতিরিক্ত রকমের চুপ। রেস্টুরেন্টে ফ্রেমে বাঁধাই করা আছে বড় বড় অক্ষরে লেখা "রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" তার প্রয়োজন ছিল না। রাজনৈতিক আলোচনা কেউ করছে না। মনে হচ্ছে এ বিষয়ে এখন কারো কোন আগ্রহ নেই।

অনিল কায়দে আযম রেস্টুরেন্টে নাশতা খেতে এসেছে। ভালোমতো খেয়ে নেবে, তারপর রওনা হবে টাঙ্গাইলের দিকে। বাস আছে নিশ্চয়ই। পত্রিকায় বার বার লেখা হচ্ছে— 'দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' দুষ্কৃতকারীর খবরও কিছু আছে, তা ভেতরের পাতায়। নিতান্ত অবহেলায় এক কোণে ছাপা। তবু কি করে জানি এই সব খবরের দিকেই চোখ চলে যায়। অনিল চা খেতে খেতে কাগজ পড়ছে।

প্রথম পাতার খবর হল হাজির হওয়ার নির্দেশ। চোখে কালো চশমা, বগলে ব্যাটনসহ টিক্কা খানের হাসি হাসি মুখের এক ছবির নিচে লেখা—খ অঞ্চলের

www.BDeBooks.Com

সামরিক আইন প্রশাসক কর্নেল ওসমানীকে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সরকারি নির্দেশে বলা হয়—

"৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে আমি 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক লে. জে. টিক্কা খান এম. পি. কে., পি এসসি— আপনি কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে (অবসরপ্রাপ্ত) আপনার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১, ১২৩, ১৩১ ও ১৩২ নম্বর ধারা এবং ১০ ও ১৪ নম্বর সামরিক আইনবিধি অনুযায়ী আনীত অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে ১৯৭১ সালের ২০ শে আগস্ট সকাল আটটার সময় ঢাকার দ্বিতীয় রাজধানীস্থ ১ নম্বর সেক্টরের উপসামরিক আইন প্রশাসকের সামনে হাজির হাজির হতে আদেশ দিচ্ছি।

যদি আপনি হাজিরে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার অনুপস্থিতিতেই ৪০ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী আপনার বিচার হবে।"

বাণিজ্য, শিল্প ও আইন মন্ত্রী আখতার উদ্দিন আহমেদ সাহেবেরও একটি ছবি ছাপা হয়েছে টিক্কা খানের ছবির নিচে। মন্ত্রী জনসভায় বলেছেন—

"আল্লাহ না করুক, পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মুসলমানরা তাদের আলাদা বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং হিন্দুদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।"

বক্স করে ছাপা হয়েছে— "সাবধান, গুজব ছড়াবেন না। আপনার গুজব শত্রুকেই সাহায্য করে।"

দু' পৃষ্ঠার খবরের কাগজ এইটুকুতেই শেষ। শেষের পাতায় সামরিক নির্দেশাবলি যা কিছুদিন পর পর ছাপা হচ্ছে। ভেতরের দু'পাতার সবটাই বিজ্ঞাপন। এক কোণায় ছোট করে একটা সংবাদ— শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার ঃ কয়েকজন গ্রেপ্তার।

"গত রোববার রাতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দেশপ্রেমিক নাগরিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযানগুলো চালানো হয়।"

গ্রেফতার করা দুটি ছেলের ছবি ছাপা হয়েছে। ছেলে দুটির বয়স কিছুতেই আঠারো উনিশের বেশি হবে না। দু'জনেরই হাত পেছন দিকে বাঁধা। কিন্তু এদের মুখ হাসি হাসি। ছবি তোলার সময় এরা কি সত্যি হাসছিল না অনিল কল্পনা করছে, এরা হাসছে? এদের নাম দেয় নি, নাম দেয়া উচিত ছিল।

'ভাইজান, খবরের কাগজটা দেখি।'

অনিল তার সামনে বসা মানুষটির দিকে কাগজ এগিয়ে দিল। সেও সব খবর ফেলে এই খবরটিই পড়ছে। একটা খবর পড়তে এতক্ষণ লাগে না। নিশ্চয়ই বার বার পড়ছে। মানুষটার চোখে-মুখে আনন্দের আভা। পত্রিকা বন্ধ

করার পরেও সে আরেকবার খুলল, তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। অনিল বলল, 'কাগজটা আপনি রেখে দেন।'

'জ্বি-না, দরকার নেই।'

'রেখে দেন। অন্যকে দেখাবেন।'

লোকটা হেসে ফেলে চাপা গলায় বলল, 'দুই বাঘের বাচ্চা, কি বলেন ভাইজান?'

অনিল বলল, 'বাঘের বাচ্চা তো নিশ্চয়ই।'

'খাঁটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দেখেন চোখ দেখেন। চোখ দেখলেই বোঝা যায়।'

অনিল আরেকবার তাকাল। ছেলে দুটির চোখ দেখা যাচ্ছে না। মারের জন্যেই মুখ ফুলে চোখ ভেতরে ঢুকে গেছে। তবু এর মধ্যেই তেজি চোখ এই মানুষটা দেখতে পাচ্ছে। তাই তো স্বাভাবিক। চায়ের দাম দিয়ে অনিল উঠে পড়ল। সে অফিসে যাবে। বড় সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রওনা হবে দেশের দিকে। পৌঁছতে পারবে কি-না তা সে জানে না। চেষ্টা করবে।

কি সুন্দর দিন! কি চমৎকার রোদ! শ্রাবণ মাসের মেঘশূন্য আকাশের মতো সুন্দর কিছু কি আছে? এই রোদের নাম মেঘভাঙা রোদ। রিকশা নিতে ইচ্ছা করছে না। হাঁটতে ইচ্ছা করছে। রাস্তা এখনো ফাঁকা। তারচেয়েও বড় কথা রাস্তায় কোন শিশু নেই। এখনকার এই নগরী শিশুশূন্য। বাবা-মা'রা তাঁদের সন্তানদের ঘরের ভেতরে আগলে রাখছেন। শহর এখন দানবের হাতে। শিশুদের দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বড় রাস্তার মোড়ে মেশিনগান বসানো একটি ট্রাক। পাশেই জীপ গাড়ি। বিশাল ট্রাকের পাশে জীপটাকে খেলনার মতো লাগছে। একজন অফিসার কথা বলছেন একজন বিদেশির সঙ্গে। বিদেশির কাঁধে কয়েক ধরনের ক্যামেরা। দু'জনের মুখই খুব হাসি হাসি। এই বিদেশি কি একজন সাংবাদিক? কয়েকদিন আগে অনিল পত্রিকায় পড়েছিল, বিদেশি সাংবাদিকদের আহ্বান করা হয়েছে তারা যেন নিজেদের চোখে দেখে যায় কি সুন্দর পরিবেশ পূর্ব পাকিস্তানে।

এই লোকটি তাই দেখতে আসছে? সুন্দর পরিবেশ দেখে মোহিত হচ্ছে? কিছুটা মোহিত হতেও পারে। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। বস্তি নেই। ২৫ শে মার্চেই বস্তি উজাড় হয়েছে। ভিখিরীও নেই। ভিখিরীরা ভিক্ষা চাইতে কেন বেরুচ্ছে না কে জানে? এরা সম্ভবত ভিখিরীদেরও গুলি করে মারছে।

বিদেশি ভদ্রলোক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনিলের দিকে। হাত ইশারা করে তিনি অনিলকে ডাকলেন। শুধু অনিল না, আরো কয়েকজনকে তিনি ডেকেছেন। তারা ভয়ে ভয়ে এগুচ্ছে। অনিল এগিয়ে গেল।

সেনাবাহিনীর অফিসারটি ইংরেজি-বাংলা-উর্দু মিশিয়ে যে কথা বলল, তা হচ্ছে ইনি ইউনাইটেড প্রেসের একজন সাংবাদিক। খবর সংগ্রহ করতে

www.BDeBooks.Com

এসেছেন। তোমাদের যা বলার ইনাকে বল। ভয়ের কিছু নাই। Whatever you want to say, say it. কোই ফিকির নেই। সাংবাদিক ভদ্রলোক একজন দোভাষী নিয়ে এসেছেন। বিহারী মুসলমান। সে কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছে। নীল হাওয়াই সার্ট পরে একজন মানুষকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হল— । প্রশ্নোত্তরের পুরো সময় মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরা থাকল।

'আপনার নাম ?'

'আমার নাম মোহাম্মদ জলিল মিয়া।'

'কি করেন ?'

'আমি একজন ব্যবসায়ী আমার বাসাবোয় ফার্নিচারের দোকান আছে।'

'দেশের অবস্থা কি ?'

'জনাব অবস্থা খুবই ভালো।'

'মুক্তিবাহিনী শহরে গেরিলা অপারেশন চালাচ্ছে, এটা কি সত্য ?'

'মোটেই সত্য না।'

'একটা পেট্রল পাম্প তো উড়িয়ে দিয়েছে।'

'এগুলো হল আপনার দুষ্কৃতকারী।'

'আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর সন্তুষ্ট ?'

'জ্বি জনাব। এরা দেশ রক্ষা করেছে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

'শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ?'

'তিনি আমাদের ভুল পথে পরিচালনা করেছেন। ইহা উচিত হয় নাই।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

মাইক্রোফোন এবার অনিলের কাছে এগিয়ে আনা হল।

'আপনার নাম ?'

'আমার নাম অনিল। অনিল বাগচী।'

'আপনি কি করেন ?'

'আমি একটা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করি। আলফা ইন্সুরেন্স।'

'দেশের অবস্থা কি ?'

'দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।'

'কেন বলছেন দেশের অবস্থা খারাপ ?'

'স্যার, আপনি নিজে বুঝতে পাছেন না ? আপনি কি রাস্তায় কোন শিশু দেখেছেন ? আপনার কি চোখে পড়েছে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে কেউ যাচ্ছে ? শহরে কিছু সুন্দর সুন্দর পার্ক আছে। গিয়ে দেখেছেন পার্কগুলোতে কেউ আছে কি-না ? বিকাল চারটার পর রাস্তায় কোন মানুষ থাকে না। কেন থাকে না ? স্যার, আমার বাবা মারা গেছেন মিলিটারীর হাতে।'

'কি করতেন আপনার বাবা ?'

'তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন।'

আপনি কি আওয়ামী লীগের কর্মী?'

'না, আমি আওয়ামী লীগের কর্মী না।'

'আপনাকে ধন্যবাদ।'

সবাই অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অনিলের দিকে। সবচে' বেশি অবাক হয়েছে ফার্নির্চার দোকানের মালিক। অনিল একবারও মিলিটারী অফিসারের দিকে তাকাল না। তাকে চলে যেতে বলা হয়েছে। সে চলে যাচ্ছে। ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে এই বুঝি এক ঝাঁক গুলি এসে পিঠে বিঁধল।

ফার্নির্চার দোকানের মালিক অনিলের সঙ্গে সঙ্গে আসছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'জানে বাঁচার জন্যে মিথ্যা কথা বলতে হয় ভাই সাহেব। এতে দোষ নাই। আপনি গলির ভিতর ঢুকে পড়েন। গলির ভিতর ঢুকে দৌড় দিয়া বের হয়ে যান।'

অনিল গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। ভদ্রলোক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে লজ্জিত ও বিব্রত মনে হচ্ছে।

অনিল এগুচ্ছে দ্রুত পায়ে। তার মাথায় ঝন ঝন করে বাজছে— বিপদে মিথ্যা বলার নিয়ম আছে। বিপদে মিথ্যার বলার নিয়ম আছে।

সুরেশ বাগচী মিথ্যা বলা বিষয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের একটি গল্প বলেছিলেন। মহাভারতের গল্প। অশোক বনে শর্মিষ্ঠা নামের অতি রূপবতী এক রমণী কিছুকালের জন্যে বাস করেছিলেন। একদিন মহারাজ যযাতি বেড়াতে বেড়াতে চলে এলেন অশোক বনে। শর্মিষ্ঠা তাঁকে দেখে ছুটে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমার স্বামী নেই, আমি যৌবনবতী, আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করুন। আমার ঋতু রক্ষা করুন।' যযাতি বললেন, 'তা সম্ভব না। তোমার সঙ্গে শয্যায় গেলে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে। মহা পাপ হবে।' শর্মিষ্ঠা বললেন,

"নন নর্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন ন বিবাহকালে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপথরে
পঞ্চান্তান্যাহুর পাতকানি"

তার মানে হল, পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না। পরিহাসে, মেয়েমানুষকে খুশি করায়, বিবাহকালে, প্রাণ সংশয়ে এবং সর্বস্ব নাশের সম্ভাবনায়। আপনি আমার সঙ্গে রাত্রিযাপন করলে আমাকে খুশি করবেন। কাজেই আপনার পাপ হবে না। এই কথায় মহারাজ যযাতি শর্মিষ্ঠার সঙ্গে রাত্রিযাপনে রাজি হলেন।

সুরেশ বাগচী বললেন, 'গল্পটা কেমন লাগল?'

অনিল, অতসী কেউ কিছু বলল না।

'মহারাজ যযাতির কাজটা কি ঠিক হয়েছে?'

www.BDeBooks.Com

অতসী বলল, 'ঠিক হয় নাই।'

'হ্যাঁ, ঠিক হয় নাই। ধর্মগ্রন্থে যাই থাকুক কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যায় না। বাবারা, এটা যেন মনে থাকে।'

অনিল অসম্ভব ভীতু। কিন্তু বাবার চিঠি বুকে নিয়ে সে মিথ্যা বলতে পারছে না। তাকে সত্যি কথাই বলতে হবে। চিঠিটা কি ফেলে দেয়া ভালো না?

৪

আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির হেড অফিস মতিঝিলে।

তাদের অফিস ছোট কিন্তু ব্যবসা ভালো। জাহাজের মালামাল ইন্স্যুরেন্স করাই এই কোম্পানির ব্যবসা। এই ধরনের ব্যবসায় বিশাল অফিস লাগে না। একটা টেলিপ্রিন্টার, আন্তর্জাতিক টেলিফোন লাইন, উপরের মহলের সঙ্গে ভালো যোগাযোগই যথেষ্ট। অল্পকিছু কাজ জানা লোকই যথেষ্ট। কোম্পানির মালিক জোবায়েদ সাহেব। অবাঙালি। ১৯৫০ সনে বিহার থেকে মোহাজের হয়ে বাবা-মা'র সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। সেই সময় তাঁদের পরিবারের সম্বল ছিল মায়ের আঠারো ভরি সোনার গয়না। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে সেই বিত্ত ফুলে ফেঁপে একাকার হয়েছে। জোবায়েদ সাহেব আলফা ইন্সুরেন্সের একটা শাখা অফিস খুলেছেন করাচিতে। খুব সম্প্রতি লন্ডনেও একটা অফিস নেয়া হয়েছে। অফিস চালু হবার আগেই ঝামেলা লেগে গেল। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য রাখছেন। এমনিতেই তাঁর মাথা ঠাণ্ডা। এখন তা আরো অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অফিসের কাজকর্ম নেই বললেই হয়। টেলিপ্রিন্টারে খট খট বেশ কিছুদিন হল শোনা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক লাইন সব সময় ব্যস্ত। লাইন চাইলেই পাওয়া যায় না। গতকাল সারাদিন অপেক্ষা করে করাচীর লাইন পেলেন। তাও কথাবার্তা পরিষ্কার না। করাচী অফিসের নবী বখশ বলল, বাঙালি কুত্তাগুলোর খবর কি? কুত্তাগুলোর ল্যাজ সোজা হয়েছে?

জোবায়েদ সাহেব প্রসঙ্গ পাল্টে ব্যবসার কথা তুললেন। জানা গেল ব্যবসা মোটামুটি। খুব খারাপ না, আবার ভালোও না। নবী বখশ আবার বাঙালি প্রসঙ্গ তুলল, ইংরেজিতে যা বলল তার বঙ্গানুবাদ হচ্ছে— সব বাঙালি পুরুষগুলোর বিচি অপারেশন করে ফেলে দেয়া দরকার। বিচি ফেলে দিলেই এরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বিচি গরম হওয়ায় এরকম করছে। গরম দেশে গরম বিচি ভালো না।

জোবায়েদ সাহেব চিন্তিত বোধ করছেন। পশ্চিমাদের মনোভাব এই হলে ঝামেলা মিটবে না। তারা বাঙালিদের যতটা তুচ্ছ করছে তত তুচ্ছ করার কিছুই নেই। বরং এরা জাতি হিসেবে ভয়ংকর। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই বাঙালিগুলোই শুরু করেছিল। যাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না তারা যে পালিয়ে বাঁচল তা গান্ধিজীর জন্যে না। চরকা কাটা, দেশি লবণ খাওয়া এগুলো ফালতু

ব্যাপার। ব্রিটিশ সিংহ চরকা ভয় পায় না। ব্রিটিশ সিংহ ভয় পেয়েছিল— ক্ষুদিরাম মার্কা ছেলেগুলোকে।

বাঙালিগুলো মহাঅলস, একটু ভালো-মন্দ খেতে পারলে মহাখুশি, গল্প করার সুযোগ পেলে খুশি, রাজনীতি নিয়ে দু'একটা কথা বলতে পারলে আনন্দে আত্মহারা, নিজের বউ নিয়ে বেড়াতে যাবার সময় আড়চোখে অন্যের স্ত্রীকে একটু দেখতে পারলে মহা আনন্দিত। তবে এদের রক্তের মধ্যে কিছু একটা আছে। বড় কোন গণ্ডগোল আছে। মাঝে মাঝে এরা ক্ষেপে যায়। কিছু বুঝতে চায় না, শুনতে চায় না। সাহস বলে এক বস্তু যে এদের চরিত্রে নেই সেই জিনিস কোত্থেকে চলে আসে।

জোবায়েদ বুঝতে পারছে সামনের দিন পাকিস্তানিদের জন্যে ভালো না। শুধু ভালো না বললে কম বলা হবে, সামনের দিনগুলো ভয়ংকর। আশ্চর্যের ব্যাপার, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কেউ তা ধরতে পারছে না। এরা এখন মোটামুটি সুপ্ত। দেশ দখলে নিয়ে এসেছে। থানা পর্যায়ে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চলে এসেছে মিলিশিয়া, রেঞ্জার পুলিশ। ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কমান্ডো গ্রুপের সুশিক্ষিত সৈন্য। আরো আসছে। জাহাজ আসছে।

সিগন্যাল কোরের কর্নেল এলাহীর সঙ্গে জোবায়েদ সাহেবের সুসম্পর্ক। কর্নেল এলাহীর এক শালাকে তিনি লন্ডন ব্রাঞ্চের অফিসের দায়িত্ব দিয়েছেন। এলাহী সাহেব মাঝে মাঝে জোবায়েদ সাহেবের অফিসে কফি খেতে আসেন। গল্প-গুজব করে বিদেয় হন। ব্যাপারটা জোবায়েদের পছন্দ না, কারণ শহরের মুক্তিবাহিনী নামক গেরিলারা তৎপর হচ্ছে। কর্নেল এলাহী এখানে আগমন তাদের চোখে পড়তে পারে। অফিসে বোমা মেরে দেয়া বিচিত্র কিছু না। অবশ্যি জোবায়েদ সাহেব জানেন— গেরিলা তৎপরতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনার এখনো কোন কারণ ঘটে নি। অল্পবয়েসী কিছু ছেলে-পুলে এই কাজটা করছে। গেরিলা জীবনের রোমান্টিক অংশটাই তাদের আকৃষ্ট করছে। তবে এটাকে হেলাফেলা করাও ঠিক না। যুদ্ধে অতি তুচ্ছ ব্যাপারও অবেহলা করতে নেই। ঘোড়ার নালের জন্যে পেরেক ছিল না বলে রাজত্ব চলে গেল। গল্পের রূপক অংশটি অগ্রাহ্য করা ঠিক না।

জোবায়েদ সাহেব ঠিক ন'টার সময় অফিসে আসেন। তাঁর ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। এক ঘণ্টা পর পর কফি খান। এক কাপ কফি, একটা সিগারেট। বেলা একটার মধ্যে পাঁচটা সিগারেট এবং পাঁচ কাপ কফি খাওয়া হয়। একটা বাজার পাঁচ মিনিট পর তিনি অফিস থেকে বের হন। বাড়ি চলে যান। বাকি সময়টা বাড়িতেই থাকেন। বাড়ি থেকে বের হন না। গত দু'মাস ধরে এই তাঁর রুটিন। এক মাস আগে পরিবারের সবাইকে করাচি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা এক সময় হঠাৎ করে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার চাপ সৃষ্টি হবে। বিমানের টিকিট পাওয়া যাবে না। তাঁর ধারণা সচরাচর ভুল হয় না। তিনি নিজে যাবার

www.BDeBooks.Com

কথা ভাবতে পারছেন না। কারণ তাঁর সম্পদ চারদিকে ছড়ানো। সিলেটে চা বাগানে ত্রিশ পার্সেন্ট শেয়ার কেনা আছে। দিলখুশা এলাকায় কিনেছেন পাঁচ বিঘা জমি। এই জমি সোনার খনির মতো। বিশ বিঘা জমি নারায়ণগঞ্জে কেনা আছে। একটা ফ্যাক্টরি দেবার কথা ভাবছিলেন। দুটি বাড়িও ঢাকা শহরে তাঁর আছে। সেই তুলনায় করাচিতে কিছুই নেই। তিনি অতি বিচক্ষণ লোক হয়েও এই বড় ভুলটি করেছেন। সম্পদ এই অংশে তৈরি করে যাচ্ছেন।

দেশ যদি সত্যি সত্যি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে কি হবে ? ইন্ডিয়া দখল করে নেবে ? সেই সম্ভাবনা কতটুকু ? এখনো বুঝতে পারছেন না। ইন্ডিয়া কি এত বড় ভুল করবে ? মনে হয় না। এই দেশের মানুষগুলোর ইন্ডিয়া প্রসঙ্গে কোন মোহ নেই। যারা ইন্ডিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে, তাদের উপর দেশের মানুষ খানিকটা বিরক্ত বলেই মনে হয়।

বড় সাহেবের দরজার পর্দা ফাঁক করে মোবারক ঢুকল। হাসিমুখে বলল, 'কর্নেল সাব আয়া।'

জোবায়েদ সাহেব বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির কারণ দুটি। এক, কর্নেল সাহেবের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চাচ্ছেন না। দুই, মোবারক এখন আর বাংলা বলছে না। মোবারক অবাঙালি কিন্তু কথা বলত বাংলায়। নিখুঁত ঢাকাইয়া বাংলায়। কিছুদিন হল সে আর বাংলা বলছে না। দাঁত বের করে যখন-তখন হাসছে। মনে হচ্ছে পুরো দেশটা সে তার চকচকে গোলাপি শার্টের পকেটে ঢুকিয়ে বসে আছে। এখন নিশ্চিন্ত মনে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা যায়।

জোবায়েদ সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমাদের কফি দাও।'

মোবারক পান খাওয়া লাল দাঁত বের করে বলল, 'কফি তুরন্ত আ যায়েগি।'

কর্নেল এলাহী শুধু খালি হাতে আসেন নি। একটা চকলেটের টিন নিয়ে এসেছেন। বিদেশি চকলেট, বেশ দামি জিনিস। তিনি কখনো খালি হাতে আসেন না। এর আগের বার এসেছিলেন 'আতর' নিয়ে। তাঁদের ভেতর কথাবার্তা ইংরেজিতে হল।

এলাহী ঃ তোমার মুখ এমন গম্ভীর কেন ? ব্যবসার হাল কি ভালো না ?

জোবায়েদ ঃ না। ব্যবসা মন্দা।

এলাহী ঃ খুব সাময়িক ব্যাপার। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে ব্যবসা হু হু করে বাড়বে।

জোবায়েদ ঃ কয়েকটা দিন মানে কত দিন ?

এলাহী ঃ এই ধর তিন মাস।

জোবায়েদ ঃ তিন মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে ?

এলাহী ঃ ঠিক তো এখনই হয়ে গেছে। থানায় থানায় আমাদের লোক আছে। এখন হচ্ছে কম্বিং অপারেশন। প্রতিটি মানুষকে এক এক করে দেখা হচ্ছে।

জোবায়েদ ঃ কম্বিং অপারেশনের পর কি হবে ?

এলাহী ঃ কি হবে তা কর্তা ব্যক্তিরা ঠিক করবেন। আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য। তবে আমার যা অনুমান ওদের শায়েস্তা করার পর একটা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে যাওয়া হবে। এক ধরনের আই ওয়াশ আর কি। হা-হা-হা। তখন ওদের যা বলা হবে তাতেই তারা রাজি হবে। 'দুদু খাবে ?'— বললে ওরা বলবে, 'খাব।' 'তামাক খাবে ?'— বললেও ওরা বলবে, 'খাব।'

জোবায়েদ ঃ তোমাদের অবস্থা তাহলে ভালো।

এলাহী ঃ ভালো মানে ? একসেলেন্ট! Can no be better.

জোবায়েদ ঃ শুনছি তোমরা মেয়েদের উপর অত্যাচার করছ— এটা কি ঠিক ?

এলাহী ঃ কোত্থেকে শুনছ ? ইন্ডিয়া বেতার ?

জোবায়েদ ঃ হ্যাঁ, বিবিসিও বলছে।

এলাহী ঃ তুমি কি আজকাল প্রপাগাণ্ডা নিউজ শোনা ধরেছ ? সবচে' বড় ক্ষতি করছে এই সব প্রপাগাণ্ডা নিউজ।

জোবায়েদ ঃ তাহলে তোমরা মেয়েদের উপর কোন অত্যাচার করছ না ?

এলাহী ঃ কিছু কিছু হয়ত হচ্ছে। ওয়ার ফেয়ারে এগুলো হয়। আমরা তো হাডুডু খেলছি না। যুদ্ধ করছি। এরা আমাদের শত্রুপক্ষ। এই দেশের মেয়েরা তো আমার শ্যালিকা নয়। শ্যালিকাদের সঙ্গেও যেখানে ফষ্টি-নষ্টি করার সুযোগ আছে সেখানে এদের সঙ্গে কেন করা হবে না তুমি আমাকে বল।

কফি চলে এসেছে। কর্নেল এলাহী কফিতে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ভঙ্গি করল। জোবায়েদ সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটটা বাড়তি। আজ একটার ভেতর ছয়টা সিগারেট খাওয়া হয়ে যাবে। কফিও এক কাপ বেশি খাওয়া হবে। জোবায়েদের বিরক্তি-ভাব বাড়ছে। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'কর্নেল এলাহী!'

'বলে ফেল।'

'তুমি নিজে কি কোন বাঙালি মেয়েকে রেপ করেছ ? ঠিকঠাক জবাব দাও। তোমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। আগুন হাতে নিয়ে মিথ্যা বলাটা ঠিক হবে না।'

'মিথ্যা বলতে চাচ্ছি এই ধারণা তোমার হল কেন ? মিথ্যা বলার তো তেমন প্রয়োজন দেখছি না। মেয়েদের সঙ্গ পেয়েছি এবং পাচ্ছি। তবে আমি বাড়ি থেকে মেয়ে ধরে এনে 'রেপ' করি না। উপহার হিসেবে আমার কাছে পাঠানো হচ্ছে।'

'কারা পাঠাচ্ছে ?'

'এই দেশের মানুষই পাঠাচ্ছে। হা-হা-হা। হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কে আমার খানিকটা আগ্রহ ছিল। 'কামাসূত্রা'র দেশের কন্যা, না-জানি কি। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এরা হচ্ছে মোস্ট অর্ডিনারী। আরেক কাপ কফি দিতে বল। তোমার এখানে দেখি অসাধারণ কফি তৈরি হয়।'

জোবায়েদ আরেক দফা কফি দিতে বল। আজ সাত কাপ কফি খাওয়া হবে। সাত কাপ কপি, সাতটা সিগারেট। খুব খারাপ একটা দিনের শুরু হচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

খুব খারাপ দিন। কর্নেল এলাহী কতক্ষণ এখানে থাকবে বোঝা যাচ্ছে না। মানুষটাকে এই মুহূর্তে অসহ্য বোধ হচ্ছে।

'কর্নেল এলাহী!'

'ইয়েস মাই ফ্রেন্ড।'

'তুমি কফি খেয়েই বিদেয় হবে। আমার অতি জরুরি কিছু কাজ আছে। তুমি না গেলে তা করতে পারছি না।'

'অফকোর্স বিদেয় হব। রাতে কি তুমি ফ্রি আছ?'

'কেন বল তো?'

'অফিসার্স মেসে ছোট্ট একটা পার্টি হবে। খুব এক্সক্লুসিভ।'

'পার্টিতে যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমার মন মরা ভাব কাটানো দরকার। পার্টিতে সেই চেষ্টা সাধ্যমতো করা হবে। সন্ধ্যায় বাসায় থাকবে। আমি নিজে এসে নিয়ে যাব। চমৎকার কফি।'

অনিল বড় সাহেবের জন্যে অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছে। কর্নেল সাহেব বসে আছেন বলে যেতে পারছে না। কয়েকটি কারণে বড় সাহেবের সঙ্গে তার দেখা প্রয়োজন। হাতে টাকা-পয়সা নেই। কিছু যদি পাওয়া যায়। তাছাড়া বড় সাহেবকে সে পছন্দ করে। নিজেও জানে না। চাকরির ইন্টারভ্যু দিতে এসে সে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। প্রায় কুড়ি জনের মধ্যে তার বিদ্যাই সবচে' কম।

ইন্টারভ্যু বোর্ডে জোবায়েদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সঙ্গে কি কোন প্রশংসাপত্র আছে?'

অনিল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'একটা আছে কিন্তু আমি স্যার দিতে চাচ্ছি না।'

'কেন দিতে চাচ্ছেন না?'

'প্রশংসাপত্রটা আমার বাবার দেয়া। আমি কারো কাছ থেকে প্রশংসাপত্র জোগাড় করতে পারি নি, কাজেই বাবাই একটা লিখে দিলেন।'

'কি করেন আপনার বাবা?'

'স্কুল শিক্ষক।'

'প্রশংসাপত্রটা দেখি।'

অনিল খুবই অস্বস্তির সঙ্গে হাতে লেখা কাগজটা এগিয়ে দিল। তার ধারণা ছিল, প্রশংসাপত্রটা পড়ে তিনি হেসে ফেলবেন এবং বোর্ডের অন্য মেম্বারদের দেখাবেন। কারণ প্রশংসাপত্রে লেখা—

যাহার জন্যে প্রযোজ্য

একজন পিতাই তাহার পুত্রকে সঠিক চিনিতে পারেন। মা ভাল চিনিতে পারেন না, কারণ সন্তান নয় মাস গর্ভে ধারণ করিবার কারণে মায়ের চিন্তা ভালবাসায়

আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক। একজন পিতা সেই ত্রুটি হইতে মুক্ত। আমি অনিল বাগচীর পিতা। সে যোগ্যতায় বলিতেছি— আমার পুত্রের ভেতর সততার মতো বড় একটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় আছে। সে তেমন মেধাবী নহে। তাহার মেধা সাধারণ মানের। ঈশ্বর মানুষকে পরিপূরক গুণাবলি দিয়ে পাঠান। সেই কারণেই আমার পুত্রের মেধার অভাব পূরণ করিয়াছে তাহার সততা। অন্য কোন গুণ আমি আমার পুত্রের ভিতর লক্ষ্য করি নাই। যাহা লক্ষ্য করিয়াছি তাহাই বলিলাম।

বড় সাহেব প্রশংসাপত্র ফিরিয়ে শুকনো গলায় বললেন, 'আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।'

অনিল বাড়ি চলে এল। দশদিনের মাথায় রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠি দিয়ে তাকে জানানো হল যে চাকরি দেয়া হয়েছে। তার পোস্টিং হবে লন্ডন ব্রাঞ্চে। তবে কাজ শেখার জন্যে তাকে এক বছর ঢাকা অফিসে থাকতে হবে।

অনিল মুখ শুকনো করে বলল, 'লন্ডনে আমি গিয়ে থাকব কি করে ? অসম্ভব। আমি এই চাকরি করব না। মরে গেলেও না।'

এই সংসারে না বলে সহজে পার পাওয়া যাবে যায় না। সুরেশ বাগচী স্কুল থেকে রিটায়ার করেছেন। সংসার অচল। অনিলকে ঢাকায় আসতে হল।

মোবারক এসে অনিলকে বলল, 'কর্নেল সাহেব চলা গিয়া।'

অনিল উঠল। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে টাঙ্গাইল পৌঁছানো দরকার। রাস্তাঘাট কেমন কিছুই জানে না।

জোবায়েদ সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। অনিল বলল, 'স্যার আসব ?'

'আস।'

'স্যার, আমি একটু দেশে যাব। ছুটি চাচ্ছি।'

'দেশে যাবার মতো রাস্তাঘাট কি এখন নিরাপদ ?'

'নিরাপদ না হলেও যেতে হবে। আমার বাবাকে স্যার মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। বোনটা আছে অন্য এক বাড়িতে।'

'বস।'

অনিল বসল। জোবায়েদ সাহেব নিয়ম ভঙ্গ করে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আমি শুনেছি রাস্তাঘাট এখন মোটেই নিরাপদ না। আমি শুনেছি বাস থেকে যাত্রীদের নামানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যাদের কথাবার্তায় এরা সন্তুষ্ট হয় না তাদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।'

'আমিও শুনেছি স্যার।'

'এই অবস্থায় রিস্ক নেয়া কি ঠিক ? বেঁচে থাকাটা জরুরি। ইচ্ছে করে রিস্ক নেয়া বোকামি।'

www.BDeBooks.Com

অনিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন স্যার ? ঢাকায় বসে থাকতেন ?'

বড় সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'না। আমি রওনা হয়ে যেতাম।'

'আমি তাহলে স্যার উঠি ?'

'আগামীকাল গেলে কি তোমার চলে ? তুমি যদি আগামীকাল যাও তাহলে মিলিটারীর কাছ থেকে আমি একটা পাশ জোগাড় করে দিতে পারি। কর্নেল এলাহী আমার বিশেষ বন্ধু।'

'মিলিটারীর কাছ থেকে কোন পাশ নেব না স্যার।'

'ঠিক আছে। তাহলে দেরি কর না, রওনা হয়ে যাও। মে গড বি উইথ ইউ। এক প্যাকেট চকলেট আমার কাছে আছে, এটা নিয়ে যাও।'

'অনিল হাত বাড়িয়ে চকলেটের টিন নিল।'

'তোমার নিশ্চয়ই কিছু টাকা পয়সা দরকার। ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি, এক হাজার টাকা নিয়ে যাও। যদি আমরা দু'জন বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।'

'যাই স্যার।'

অনিল দরজা পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল। জোবায়েদ সাহেব বললেন, 'কিছু বলবে ?'

অনিল না সূচক মাথা নাড়ল। জোবায়েদ সাহেব লক্ষ্য করলেন ছেলেটি নিঃশব্দে কাঁদছে। কাঁদুক। কিছুক্ষণ কাঁদুক। তিনি অনিলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। সান্ত্বনার কিছু বলা দরকার। একটি বাক্যও মনে আসছে না। তিনি আরেকটি সিগারেট ধরালেন। আজ সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। তিনি একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছেন। মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।

'মোবারক।'

'ইয়েস স্যার।'

'কফি।'

'কফি কামিং স্যার।'

ভালো লাগছে না। কিছু ভালো লাগছে না।

৫

বাস শেষ পর্যন্ত ছাড়বে কি-না বোঝা যাচ্ছে না। এগারোটায় এই বাস ছাড়বে এমন কথা ছিল। যাত্রী উঠে বসে আছে। বাস ছাড়ছে না। এখন বাজছে একটা। সমস্যা কি তাও বোঝা যাচ্ছে না। ভূয়াপুর থেকে একটা বাস এসে পৌঁছেছে বারটায়। তার ড্রাইভার কানে কানে অন্য ড্রাইভারকে কি সব বলেছে। ড্রাইভাররা বাস ছাড়ছে না।

অনিল জায়গা পেয়েছে একবারে পেছনের সিটে। এক কোণায় সে, বাকি সবটা জুড়ে এক পারিবার বসে আছেন। বোরকা পরা এক মহিলা, তাঁর স্বামী,

এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ে। আট বছর বয়েসী দুটি ছেলে, জমজ। অবিকল এক রকম দেখতে। এরা নিঃশব্দ, তবে খুব চালু। নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চলছে। চার বছর বয়েসী একটি বাচ্চা মেয়ে। ভাইদের মারামারি সে আগ্রহ নিয়ে দেখছে এবং খুব মজা পাচ্ছে বলে মনে হয়।

পরিবারের কর্তা বসেছেন অনিলের পাশে। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের উপর। তিরিক্ষি মেজারের মানুষ। প্রচুর কথা বলেন। মারামারিরত দুই পুত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি হুংকার দিয়ে বললেন, 'কর মারামারি কর। খামচাখামচি কর। খামচি দিয়ে একজন আরেকজনের চোখ তুলে ফেল। কিন্তু খবরদার, টু শব্দ করতে পারবি না। শব্দ করলে কচুকাটা করে ফেলব। আমার নাম আয়ুব আলি। আমার এক কথা। গলা দিয়ে শব্দ বের করেছিস কি মরেছিস।'

বড় মেয়েটি বাবার পাশে বসেছে। সে নিচু গলায় বলল, 'মা বলছে তার গরম লাগছে। বোরকা খুলে ফেলতে চায়।'

'খবরদার, বোরকা যেমন আছে তেমন থাকবে। যখনকার যে নিয়ম। এখনকার নিয়ম বোরকা। গরমে সিদ্ধ হলে উপায় কিছু নাই। মিলিটারীকে বলতে বলিস যে গরম লাগছে। মিলিটারী পাংখা দিয়ে হাওয়া করবে।'

গাড়ি ছাড়বে কি ছাড়বে না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গাড়ির হেল্পার এসে বলে গেল— নাও যাইতে পারে। সামনে অসুবিধা আছে। মালিক আসতাছে। মালিক আসলে উনি যা বলবেন তাই হবে। উনি যাইতে বললে যাব। যাইতে না বললে নাই।

যাত্রীরা সবাই বসে আছে। কেউ নড়ছে না। বোঝাই যাচ্ছে সবারই যাওয়া প্রয়োজন। ড্রাইভারের সিটের ঠিক পেছনে বোরকা পরা দু'জন মহিলা যাত্রী যাচ্ছেন। বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বোরকা পরা মহিলা একজনকে তাল পাখায় ক্রমাগত হাওয়া করছেন। মহিলাটি কাঁদছেন ফুঁপিয়ে। এক সেকেন্ডের জন্যেও থামছেন না। বোরকা পরা অন্য মহিলা গাড়ির জানালায় মাথা রেখে চুপচাপ বসে আছেন। কৌতূহলী যাত্রীরা বেশ কবার জিজ্ঞেস করেছে কি হয়েছে। বৃদ্ধ কঠিন গলায় বলেছেন, 'কিছু হয় নাই।'

পুরো গাড়িতে অনিল ছাড়া যুবক কেউ নেই। যুবকরা বাসে ট্রেনে চলাচল করে না। প্রায় স্টেশনেই ট্রেনের কামরা চেক করা হয়। যুবকদের নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। হাতের মাসল টিপে দেখা হয় হাত শক্ত কি-না। শক্ত হলে অস্ত্র-ট্রেনিং নিয়েছে। সামান্যতম সন্দেহ হলে যুবকরা ফিরে আসে না।

বাসের জন্যেও চেক পোস্ট আছে। মিলিশিয়া নামের এক বস্তুর সম্প্রতি আমদানি হয়েছে। কালো কুর্তা পরে, কোমরে বাঁধা থাকে গুলির বেল্ট। এরা ইংরেজিও জানে না, উর্দুও জানে না। বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। এরা ভয়ংকর চরিত্রের মানুষ এই জাতীয় কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কালো পোশাকের মিলিশিয়া চোখে পড়লে মানুষের বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগে।

www.BDeBooks.Com

আয়ুব আলি বিড়ি ধরালেন। মেয়েটি বলল, 'বাবা, মা বিড়ি ফেলতে বলছে। বিড়ির গন্ধে মা'র বমি আসতেছে।'

আয়ুব আলি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'বমি আসলে বমি করতে বল। তোর মায়ের হুকুমে এখন দুনিয়া চলবে না। সে জেনারেল টিক্কা খান না।'

আয়ুব আলি অনিলের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্রাদার, আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে?'

'না।'

'আপনার অসুবিধা হলে ফেলে দিতাম কিন্তু পরিবারের কথায় আমি পয়সায় কেনা বিড়ি ফেলে দিব, তা হয় না। আপনি যাবেন কই?'

'রূপেশ্বর।'

'কোন রূপেশ্বর?'

অনিল পুরো ঠিকানা বলল।

'টাঙ্গাইল পৌঁছতে পৌঁছতেই তো রাত হয়ে যাবে। রূপেশ্বর যাবেন কীভাবে?'

'রাতে রাতে যাব। হেঁটে চলে যাব।'

'এইটাই ভালো। রাতে রাতে যাওয়া ভালো। মিলিটারী বলেন আর মিলিশিয়া বলেন সন্ধ্যার পর তারার পাতলা পায়খানা শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর গলায় গামছা দিয়ে টেনেও এদের বের করতে পারবেন না।'

মেয়েটি বলল, 'বাবা, মা এসব কথা বলতে নিষেধ করতেছে।'

'তোর মারে চুপ থাকতে বল। কি বলব কি বলব না সেটা আমার বিষয়। ভাই সাহেব, বিড়ি খাবেন?

'জ্বি-না।'

'খেলে খেতে পারেন। এক স্যুটকেস ভর্তি বিড়ি নিয়ে নিয়েছি। এই যে যাচ্ছি যদি আটকা পড়ে যাই! কিছুই তো বলা যায় না?'

'যাচ্ছেন কোথায়?'

'শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। আমার এক শ্যালক বিয়ে করবে। আমি বড় জামাই। না গেলে বিয়ে হয় না। তা ভাই বলেন, এটা কি বিয়ের সময়? মাছির মতো মানুষ মরতেছে আর তুই ব্যাটা বউয়ের সাথে...আচ্ছা যা, বিয়ে করবি কর। তা আমি এমন কি রসগোল্লা দুলাভাই যে আমি ছাড়া বিবাহ হবে না। আরে ব্যাটা, আমরা যে তোর কারণে এতগুলা মানুষ যাচ্ছি যদি পথে ভালো-মন্দ কিছু হয়! ধর্‌ যদি তোর বোনরে মিলিটারী পথে নামায়ে রেখে দেয় তখন কি অবস্থাটা হবে? আমার শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ গাধা। একবারে গ আকারে গা, ধ আকারে ধা।'

মেয়েটি বলল, 'বাবা, মা বলছে নিচে গিয়া চা খেয়ে আসতে।'

স্ত্রীর এই পরামর্শ আয়ুব আলির মনে ধরল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। অনিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, আসেন চা খাবেন।'

অনিলও উঠে দাঁড়াল। ছেলে দুটির একটি অন্যটির কান কামড়ে ধরেছে। ছেলেদের মা, কান ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। আয়ুব আলি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, 'খেয়ে ফেল্। কামড় দিয়ে কান খেয়ে ফেল্। যন্ত্রণা কমুক।'

আয়ুব আলি নামার সময় সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকে দেখল। ভদ্রলোক ইতোমধ্যেই সবার কৌতূহল আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ক্রন্দনরত বোরকা পরা মহিলার কাছে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মা, কান্নাকাটি যা করার এখন করে নেন। মিলিটারী চেকিংয়ের সময় গলা দিয়ে টু শব্দ বের করবেন না। এরা অনেক কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে। শেষে বিপদে পড়ে যাবেন। আর মা যদি কিছু মনে না করেন— ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। যদি মোজা থাকে মোজা পরে নেন। সুন্দরী মেয়ে দেখলে হারামজাদাগুলোর হুঁস থাকে না। যদি বেয়াদবী কিছু করে থাকি নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।'

বাস স্ট্যান্ডের লাগোয়া দুটি স্টল। দুটিই ফাঁকা। একটিতে রেডিও বাজছে, খবর হচ্ছে খুব চিকণ গলায় একজন মহিলা খবর পড়ছেন : আয়ুব আলি সেটিতেই ঢুকলেন। অনিল পেছনে পেছনে গেল। রেডিওর প্রধান খবর হল, নদ-নদীতে পানি বাড়ছে। কোনটিতে কত পানি বাড়ছে তা বলা হল। বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা হল। উরুগুয়েতে মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। রেক্টার স্কেলে যার মাত্রা ৩.৪, এই তথ্যও জানা গেল। তারপর বলা হতে লাগল নিউ মেক্সিকোতে সড়ক দুর্ঘটনায় এগারো ব্যক্তির নিহত হবার সংবাদ।

আয়ুব আলি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'শালা।'

অনিল বলল, 'কাকে বলছেন ?'

'রেডিওটারে বললাম, নিজের দেশের খোঁজ নাই, অন্য দেশে এগরো জন নিহত। আরে শালা, তোর দেশে কয়টা নিহত সেইটা বল্।'

অনিল হেসে ফেলল এবং খুবই আশ্চর্য হল যে এই অবস্থাতেও সে হাসতে পারছে। তার মধ্যে এই মুহূর্তে কোন দুঃখবোধ আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথের বিপদ নিয়েও সে ভাবছে না। কিছুই ভাবছে না। আয়ুব আলি স্টলের মালিকের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলেন, 'রেডিও 'বন' করেন।'

দোকানের মালিক ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'রেডিও খোলা রাখা লাগে। কোন সময় কি বলে জানা দরকার। ধরেন, হঠাৎ কার্ফ্যু দিল তখন কি করবেন ? খাইবেন কি চা-নাশতা ?'

'চা দাও। কাপ গরম পানি দিয়া ধুইয়া দিবা। চিনি কম।'

'যাইবেন কই আপনারা ?'

'তা দিয়া আপনার প্রয়োজন নাই। চা দিতে বলছি চা দেন। চা দিয়া দাম নেন। অধিক কথা বলার সময় এখন না।'

রেডিওতে নজরুল গীতি হচ্ছে। নজরুলের প্রেমের গান, 'নয়ন ভরা জল গো...'

www.BDeBooks.Com

বিপ্লবী গানগুলো বাজানো হচ্ছে না। স্বাধীন বাংলা বেতার বাজাচ্ছে বিপ্লবী গান।

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নজরুলের প্রেম বিষয়ক সংগীতে এমন খুব উৎসাহী। হামদ এবং নাতে উৎসাহী, উচ্চাঙ্গ সংগীতে উৎসাহী।

আয়ুব আলি চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, 'ভাইসাব, আপনার নামটা তো জানা হল না। নাম জানা দরকার।'

'আমার নাম অনিল।'

'কি বললেন, অনিল ?'

'জ্বি, অনিল বাগচী।'

'খাইছে আমারে। হিন্দু না-কি ?'

'জ্বি।'

'সাহস তো কম না। হিন্দু হয়ে বাসে করে রওনা দিলেন ? চেকিং-এ ধরা পড়বেন। এরা চার কলমা জিজ্ঞেস করে। প্যান্ট খুলে দেখে খৎনা হয়েছে কি-না। জানেন না ?'

'শুনেছি।'

'আপনার কোন দিকে যাওয়ার দরকার না— যেখানে ছিলেন সেখানে চলে যান। আর যদি ট্রেনে-বাসে যেতে হয় তবে আগে গোপনে খৎনা করায়ে ফেলেন। এর মধ্যে লজ্জা-শরমের কিছু নাই। জান বাঁচান ফরজ। আমি অনেক হিন্দু ছেলের কথা জানি খৎনা করায়ে ফেলেছে। চার কলমা মুখস্থ করেছে। আপনার কলমা কয়টা মুখস্থ ?'

'একটা শুধু জানি।'

'আমি জানি মোট দুটা। চাপে পড়ে তিন নম্বরটা মুখস্থ শুরু করলাম— খালি বেড়াছেরা লাগে। তবে দুটা জানলেও চলে, এরাও দুটার বেশি জানে না। একটু সুর দিয়ে, দরদ-টরদ মাখায়ে কেরাতের মতো পড়লেই এরা খুশি। বেকুবের জাত তো। বেকুবের জাত অল্পে খুশি হয়, অল্পে বেজার হয়। ঠিক বললাম না ?'

'জ্বি।'

'শুধু বেকুব না। এরা হল 'হায়ওয়ানে'র জাত। 'হায়ওয়ান' কি জানেন ? 'হায়ওয়ান' হল পশু। এরা পশুর জাত। পশু না হলে প্যান্ট খুলে খৎনা কেউ দেখে ? বলেন আপনি, দেখে ? এটা কি মানুষের কাজ না পশুর কাজ ? আমি তো ঠিক করে রেখেছি কেউ যদি আমার প্যান্ট খুলতে বলে প্যান্ট খুলব, তারপর হিস করে হারামজাদার মুখে পেশাব করে দেব। এরপর যা হয় হবে। মৃত্যু কপালে থাকলে হবে। কি বলেন ?'

অনিল কিছু বলল না। আয়ুব আলি বিড়ির প্যাকেট বের করে বললেন, 'নিন, বিড়ি ধরান। বিড়িতে একটা টান দেন। মাথা পরিষ্কার হোক। হিন্দু মানুষ,

সময়মতো হিন্দুস্থানে চলে গেলে ঝামেলা হত না। এতক্ষণ বাড়িতে বসে আরাম করে কচ্ছপের কোরমা খেতেন। ভালো কথা অনিল বাবু, কচ্ছপের কোরমা হয় ?'

'জানি না হয় কি-না।'

গভীর আগ্রহ নিয়ে আয়ুব আলি জিজ্ঞেস করলেন, 'কচ্ছপের মাংস খেতে কেমন ? গোসতের মতো না মাছের মতো ?'

অনিল নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'সময়টাই খারাপ রে ভাই, সময়টাই খারাপ। কারোর কথা বলতে ভালো লাগে না। আমি তো বলতে গেলে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছি। চুপচাপ ঘরে থাকি। এর মধ্যে বড় শালার বিয়ে লেগে গেল। আরে ব্যাটা বলদ, এটা বিয়ে করার সময় ? বড় শালি আবার একটা বাচ্চা দিয়ে ফেলল। মেয়ে বাচ্চা। নাম রেখেছে 'পি'। আমাকে বলল, দুলাভাই, নামটা সুন্দর না ? আমি বললাম, 'পি' আবার কেমন নাম ? পিসাব হলেও একটা কথা ছিল। বুঝতাম ঘন ঘন পিসাব হয় বলে নাম পিসাব। এই শুনে সে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। মেয়ের আকিকা করেছে আমাকে বলে নাই। কত বড় ছোটলোকের জাত চিন্তা করে দেখেন।'

গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে। আয়ুব আলি উঠে দাঁড়ালেন। চায়ের দাম অনিল দিতে গেল। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন অত্যন্ত আহত হয়েছেন।

'চায়ের দাম দিবেন মানে ? আমার কি টাকার শর্ট না-কি ? ভাই শুনেন, আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। আপনিও দেখলাম আমার মতো কম কথার মানুষ। পথে যদি চেকিং হয়— অনিল বাগচী নাম বলার কোন প্রয়োজন নাই। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবেন— মহসিন। মহসিন হল আমার বড় শ্যালকের নাম। যে গাধাটার বিয়ে করছে এ গাধাটার নাম। বলবেন যে আপনি বিবাহ করতে দেশে যাচ্ছেন। কেউ বিয়ে-শাদী করতে যাচ্ছে শুনলে এদের মন একটু নরম হয়। মারধোর করলেও গুলি করে মারে না। নাম মনে থাকবে তো ? মহসিন। বিপদের সময় মানুষ আসল নামই ভুলে যায়, আর নকল নাম! গাড়িতে বসে কয়েকবার মনে মনে বলেন— মহসিন, মহসিন, মহসিন। দানবীর হাজি মোহাম্মদ মহসিনের নাম ইয়াদ রাখবেন, তাহলেই হবে।'

বাসে উঠে নিজের জায়গায় বসতে বসতে আয়ুব আলি ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি তোমার বড় মামা। ইনার নাম মহসিন।'

আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী বোরকার পর্দা তুলে অবাক হয়ে তাকালেন অনিলের দিকে। আয়ুব আলি বললেন, 'ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছ কেন ? ড্যাব ড্যাব করে তাকানোর কিছু নাই। বোরকার পর্দা ফেল।'

আয়ুব আলি সাহেবের যমজ বাচ্চা দুটি এখন মারামারি করছে না। দু'জনেরই মুখ এবং হাত ভর্তি চকলেট। ছোট মেয়েটারও মুখ ভর্তি চকলেট।

www.BDeBooks.Com

চকলেটের রস গড়িয়ে তার জামা মাখামাখি হয়ে গেছে। বড় মেয়েটা অনিলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরা আপনার চকলেটের টিন খুলে ফেলেছে।'

অনিল বলল, 'ভালো করেছে। তুমি চকলেট খাওয়া না ? খাও, তুমিও খাও। তোমার নাম কি ?'

'পাপিয়া।'

'কোন ক্লাসে পড় ?'

'সিক্সে।'

'খুব ভালো।'

পাপিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছি।'

'বল কি ? কি কর বৃত্তির টাকা দিয়ে ?'

'কিছু করি না। বাবা টাকা নিয়ে যায়।'

'খুবই অনুচিত। তোমার নিজের টাকা অন্যে নিয়ে যাবে কেন ?'

আয়ুব আলি কোন কথা বলছেন না, কারণ কথা বলার মতো অবস্থা তাঁর নেই। তিনি ঘুমিয়ে পড়ছেন। তাঁর নাক ডাকছে।

বাসের ড্রাইভার বলল, 'সবাই বিসমিল্লাহ বলেন। গাড়ি ছাড়তেছি।'

সবাই শব্দ করে বলল, 'বিসমিল্লাহ।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

ছোট্ট একটা শিশু কাঁদছে। দু'মাস বয়স। সেই তুলনায় গলার শক্তি প্রশংসনীয়। শিশুটির কান্নার আওয়াজ ছাপিয়ে উঠেছে। বাবা এবং মা দু'জনেই তাকে নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছে। এটিই তাদের প্রথম সন্তান। কপালে বড় করে কাজলের ফোটা দেয়া। সেই কাজলে সমস্ত মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। বাচ্চাটির বাবা তাকে কিছুক্ষণ কোলে রেখে শান্ত করার চেষ্টা করছে, কিছুক্ষণ করছে মা। লাভ হচ্ছে না।

একজন বলল, 'ছোট শিশু সঙ্গে থাকা ভালো। শিশুর উপর আল্লাহপাকের খাস রহমত থাকে। এই শিশুর কারণে ইনশাআল্লাহ কারো কিছু হবে না। আমরা জায়গামতো নিরাপদে পৌঁছাব।'

বাবার মুখে আনন্দের আভা দেখা গেল। মা'র মুখেও নিশ্চয়ই আনন্দের হাসি। বোরকার কারণে সে হাসি দেখা যাচ্ছে না। বাচ্চার কান্না এখন আর কারো খারাপ লাগছে না, বরং ভাল লাগছে। কাঁদুক সে, কাঁদুক। গলা ফাটিয়ে কাঁদুক।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'ছেলে না মেয়ে ?'

বাবা লাজুক গলায় বলল, 'মেয়ে ?'

'কি নাম রেখেছেন মেয়ের ?'

বাবা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'মুক্তি।' বলেই অস্বস্তি নিয়ে চারদিকে তাকালেন। সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল যাত্রীদের সবার চোখে-মুখে।

'ভালো নাম কি ?'

'ভালো নাম ফারজানা ইয়াসমিন।'

'মিলিটারী নাম জিজ্ঞেস করলে ভালো নামটা বলবেন। ডাক নাম বলার প্রয়োজন নাই।'

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গের বোরকা পরা মহিলার কান্না শোনা যাচ্ছে। বৃদ্ধ তাকে এখন আর পাখার হাওয়া করছেন না। গাড়ির ভেতর প্রচুর হাওয়া। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। মনে হচ্ছে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। রোদে তেজ নেই। বাতাস আর্দ্র, বৃষ্টি আসবে বলে মনে হচ্ছে। রাস্তা ভালো না, গাড়ি খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। ঝাঁকুনিতে অনেকেরই ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

যাত্রীদের প্রায় সবার হাতেই কিছু না কিছু বই। বেশ কয়েকজনের হাতে কোরান শরীফ। অনেকের হাতে প্রচ্ছদে কায়দে আযমের ছবিওয়ালা বই। এ সব বই এখন খুব বিক্রি হচ্ছে। এসব বই হাতে থাকলে একধরনের ভরসা পাওয়া যায়। মনে হয়, বিপদ হয়ত বা কাটবে।

প্রচণ্ড গরমে স্যুটে পরা একজন বাসযাত্রী যাচ্ছেন। লাল রঙের টাই, থ্রি পিস স্যুট। কোটের পকেটে লাল গোলাপের কলি। তেকোনা লাল রুমাল। সঙ্গে একটা 'ব্রিফকেস।' তিনি ব্রিফকেস কোলে নিয়ে বসেছেন। এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করছেন না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন বখশি হাট বাজারের কাছে তাকে নামিয়ে দেয়া যাবে কি-না। তখনো ব্রিফকেস হাতে ধরা। ভদ্রলোককে খুব নার্ভাস মনে হচ্ছে, খুব ঘামছেন। একটু পর পর রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন, ঘাড় মুছছেন। জানালা দিয়ে ঘন ঘন থুথু ফেরছেন। তাঁর সঙ্গে পানির বোতল আছে। মাঝে মাঝে বোতল থেকে পানি খাচ্ছেন।

এই প্রচণ্ড গরমে স্যুট পরে আসার রহস্য হল তিনি শুনছেন মিলিটারীরা ভদ্রলোকদের তেমন কিছু করে না। স্যুট পরা থাকলে খাতির করে। তারপরেও তিনি ঢাকা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে লেখা—

— 'মোহাম্মদ সিরাজুল করিম, পিতা মৃত বদরুল করিম, গ্রাম বখশি হাট, আমার পরিচিত। সে পাকিস্তানের এজন খাদেম। দেশ ভক্ত এক ব্যক্তি। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় সে জীবন কোরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত। আমি তাহার সর্বাঙ্গিণ মঙ্গল কামনা করি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ।'

এত কিছু পরেও ভদ্রলোক স্বস্তি পাচ্ছেন না। এক সময় দেখা গেল গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে তিনি বিকট শব্দে বমি করছেন।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি এগুচ্ছে। গাড়ির গতি বেশি না। এত খারাপ রাস্তায় গতি বেশি দেবার প্রশ্ন উঠে না।

ঢাকা থেকে বেরুবার মুখেই একটা চেকপোস্ট। চেকপোস্টে মিলিশিয়ার কিছু লোকজন। ড্রাইভার গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। যাত্রীরা শক্ত হয়ে বসে

www.BDeBooks.Com

আছে। কেউ জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে না। গাড়ির ভেতর কোন রকম শব্দ নেই। শুধুমাত্র ঘুমন্ত আয়ুব আলির নাক ডাকার শব্দ আসছে। বোরকা পরা মহিলাও কান্না থামিয়েছেন।

মিলিশিয়াদের একজন হাত ইশারা করে গাড়ি চালিয়ে যেতে বলল। কেউ এসে গাড়ির ভেতর উঁকি পর্যন্ত দিল না। কি অসীম সৌভাগ্য! গাড়ি চলতে শুরু করেছে। ছোট বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করেছে। কাঁদুক। ছোট বাচ্চারা তো কাঁদবেই।

রাস্তা এখন কিছুটা ভালো। ড্রাইভার গাড়িতে স্পীড দিতে শুরু করেছে। তাকে দ্রুত যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে আগে টাঙ্গাইল পৌঁছতে হবে।

মুক্তি কাঁদছে। হাত-পা ছুড়ে কাঁদছে। মুক্তি যার নাম, অবরুদ্ধ নগরীতে যার জন্ম, সে তো কাঁদবেই। কাঁদাটাই তো স্বাভাবিক।

৬

আয়ুব আলি অনিলের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর ছোট মেয়েটি অনিলের কোলে, সেও ঘুমুচ্ছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী বোরকার পর্দা তুলে ফেলে কৌতূহলী হয়ে চারপাশে দেখছেন। তাঁর মুখভর্তি পান। এরা বেশ সুখে আছে বলেই অনিলের মনে হল।

এই দেশ ছেড়ে সময়মতো চলে যেতে পারলে অনিলরাও কি সুখে থাকত? ১৯৬৫ সনে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধ লেগে গেল। তখন অনেকেই চলে গেল। অনিলের ছোট কাকা বরুণ বাগচী তাদের একজন। রূপেশ্বরে তিনি পাকা বাড়ি তুলেছিলেন, দোতলা বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। চুপি চুপি সব বিক্রি করলেন। কেউ কিছুই জানল না। যে কিনল সেও কোন শব্দ করল না।

ছোট কাকার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। টুকটাক ব্যবসা করেই কি করে যেন ধাই করে একদিন তিনি বড়লোক হয়ে গেলেন। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক কমে গেল। তবু যাওয়া-আসা ছিল। কিন্তু তারা যে সব বিক্রি করে কোলকাতায় চলে যাচ্ছে এই সম্পর্কে কিছুই বলে নি। যে-রাতে যাবে সে-রাতে বরুণ বাগচী একা তাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। তেমন শীত না, তবু সারা শরীর চাদরে ঢাকা।

সুরেশ বাবু বাংলা ঘরে বসে ছাত্র পড়াচ্ছিলেন, সেখান থেকেই বললেন—'কি খবর বরুণ?'

'তোমার সাথে একটু কথা আছে দাদা। ভেতরে আস।'

'ছাত্র পড়াচ্ছি তো।'

'একদিন ছাত্র না পড়ালে তেমন ক্ষতি হবে না। জরুরি কথা।'

সুরেশ বাগচী অপ্রসন্ন মুখে উঠে এলেন। বরুণ গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার পুত্র-কন্যাদেরও ডাক। কথাবার্তা সবার সামনেই হোক। এরা ছোট হলেও এদেরও শোনা দরকার। নয়ত বড় হয়ে আমাকে দোষ দিবে।'

'তোর ব্যাপার তো কিছুই বুঝতেছি না।'

বরুণ বসল খাটে পা তুলে। তার গলার স্বর এমনিতেই ভারী। সে রাতে আরো বেশি ভারী শোনাল।

'তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার কথা কিছু ভাবছ?'

সুরেশ বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'শুধু শুধু ইন্ডিয়া চলে যাবার কথা ভাবব কেন?'

'অনেকেই তো যাচ্ছে।'

'অনেকেই কেন যাচ্ছে তাও তো বুঝি না।'

'কেন বুঝছ না? বেশিদিন মাস্টারি করলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পায় জানি, এতটা পায় তা জানতাম না।'

'মাস্টারির দোষ দেয়ার প্রয়োজন নাই। তুই কি বলতে চাস বল্।'

বরুণ চাপা গলায় বলল, 'এই দেশ আমাদের থাকার জন্য না।'

'কেন না? তুই তো ভালোই আছিস। ব্যবসা-বাণিজ্য করছিস। দোতলা দালান দিয়েছিস।'

'তা দিয়েছি মনের শান্তির বিনিময়ের দিয়েছি। মনে শান্তি নাই।'

'শান্তি না থাকার মতো কি হল?'

'দাদা, তুমি বুঝতে পারছ না, এই দেশে আমরা সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন।'

সুরেশ বাগচী হাসতে হাসতে বললেন, 'নিজেকে সেকেন্ড ক্লাস ভাবলেই সেকেন্ড ক্লাস। তুই এ রকম ভাবছিস কেন? আমাকে দেখ। আমি তো ভাবি না।'

'দাদা, সত্যি করে বল তো— তুমি কোন রকম অনিশ্চয়তা বোধ কর না?'

'না করি না। কেন করব?'

'কি আশ্চর্য কথা! একটা প্রশ্ন করলেই তুমি উল্টা প্রশ্ন করছ। আমি তো তোমার ছাত্র না।'

'তোর হয়েছে কি সেটা বল।'

'দাদা, তোমাকে সত্যি কথা বলি, এই দেশে মনটা ছোট করে থাকতে হয়।'

'যার মন ছোট, সে যে দেশেই যাক তার মন ছোটই থাকবে।'

'খবরের কাগজে দেখেছ আরতীবালা নামের এক মেয়েকে কিছু প্রভাবশালী লোক ধরে নিয়ে গেছে, সাতদিন পর ছেড়েছে?'

'শুধু হিন্দু মেয়েদের এ রকম হচ্ছে তা তো না, মুসলমান মেয়েদের বেলায়ও হচ্ছে। হচ্ছে না? এমন যদি হত শুধু হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে তাহলে ভিন্ন কথা হত। তা ঘটছে না। আরতীবালাকে নিয়ে খবরের কাগজে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ব্যাপারটা সবার খারাপ লেগেছে বলেই হয়েছে।'

'এটা একটা জঘন্য দেশ দাদা।'

www.BDeBooks.Com

'তুই যেখানে যাচ্ছিস সেটা কি খুব উন্নত কিছু ? সেখানে এমন হচ্ছে না ? সমস্যা তো দেশের না, সমস্যা মানুষের। দেশ মন্দ হয় না। মাটি কি কখনো মন্দ হয় ?'

বরুণ রাগী গলায় বলল, 'আমাকে এসব বড় বড় কথা বলবে না দাদা। আমার এসব বড় বড় কথা শুনতে বিরক্তি লাগে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আর বড় বড় কথা বলব না। তুই একটু সহজ হয়ে বসতো। তোর মাথা গরম হয়েছে। গা থেকে গরম চাদরটা খোল। লেবুর সরবত খাবি ? অতসী তোর কাকাকে লেবুর সরবত করে দে।'

'আমি কিছু খাব না।'

'তুই কি অকারণে রাগারাগি করার জন্যে এসেছিস ?'

বরুণ কঠিন গলায় বলল, 'দাদা, আমি ঠিক করেছি— কোলকাতা চলে যাব।'

'কি বললি ?'

'শুনলেতো কি বললাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোলকাতা চলে যাব।'

সুরেশ বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। আমি কিছু বললে তো সিদ্ধান্ত পাল্টাবি না। আমাকে বলা অর্থহীন।'

'তোমাকে বলছি, কারণ তোমাকে খবরটা জানানো দরকার।'

'আচ্ছা যা, আমি জানলাম।'

'তোমাকে সবাই স্যার স্যার করে, খাতির করে, কাজেই তুমি আছ একটা ঘোরের মধ্যে। আসল সত্য তোমার অজানা। এই দেশের সেনাবাহিনীতে কোন হিন্দু নেয়া হয় না, এটা তুমি জান ?'

'না, জানতাম না।'

'এখন তো জানলে। এখন বল কি বলবে ?'

'এরা যে নিচ্ছে না এটা এ-দেশের মানুষদের বোকামি। দেশের সব সন্তানের সমান অধিকার। অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এক ধরনের ভুল। সেই ভুলের জন্য দেশকে কেন দায়ী করব ?'

'কাকে দায়ী করবে ?'

'যেসব মানুষ এই ভুল করছে তাদের দায়ী করব।'

'শুধু দায়ী করবে, আর কিছু না ?'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যেন তারা ভুল বুঝতে পারে।'

'ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রার্থনা শুনবেন ?'

'শোন্ বরুণ, আমি বুঝতেই পারছি না কেন তুই এত রেগে আছিস কেউ কি তোকে কিছু বলেছে ?'

'না। দাদা, আমি চলে যাচ্ছি।'

'সেটা তো শুনলাম। কবে যাচ্ছিস ?'

'আজই যাচ্ছি। আজ রাত এগারোটায়।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ রাত এগারোটায় তুই চলে যাচ্ছিস আর আমাকে সে-খবর দিতে এখন এসেছিস ? বাড়িঘর কি করবি ?'

'বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছি।'

'কখন বিক্রি করলি ?'

'মাস খানিক হল। সব চুপি চুপি করতে হল। জানাজানি হলে সমস্যা হবে।'

'আমাকেও জানালি না!'

'একজন জানলে সবাই জানবে।'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই দেশের কাউকেই তুই বিশ্বাস করিস না। শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথা আছে না ? কচ্ছপের মতো মানুষ। তুই হচ্ছিস সে রকম। কচ্ছপ থাকে জলে কিন্তু ডিম পাড়ে ডাঙ্গায়। তুই থাকিস এক দেশে আর মন পড়ে থাকে অন্য দেশে। কাজেই তোর চলে যাওয়াই ভালো। তবে তুই যে শেষ সময়ে আমাকে খবরটা দিতে এলি তাতে মনে দুঃখ পেয়েছি।'

'তোমাকে আগে বললে লাভটা কি হত ?'

সুরেশ বাগচী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোন লাভ হত না। যাচ্ছিস যা। ঐখানে মন টিকবে না। মানুষ গাছের মতো। মানুষের শিকড় থাকে। শিকড় ছিঁড়ে যাওয়া ভয়ংকর ব্যাপার। গাছ ছিঁড়লে যেমন মারা যায়, মানুষও মারা যায়। গাছের মৃত্যু দেখা যায়। মানুষেরটা দেখা যায় না। তুই দুঃখ পাবি।'

'দুঃখ তুমিও পাবে দাদা। দু'দিন পর বুঝবে কি বোকামি করেছ। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগবে, ঘরে আগুন দিবে।'

'এইটা কখনো হবে না বরুণ। আমি কোনদিন এদের অবিশ্বাস করি নি। এরাও করবে না। তুই এখন যা, তোর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

বরুণ তারপরেও চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল। তাকাল অতসীর দিকে। নিচু গলায় বলল, 'অতসী, আমি কি অতসীকে নিয়ে যাব ?'

'ওকে নিতে চাস কেন ?'

'ওর ভালো বিয়ে দেব। এই দেশে ওর জন্যে ছেলে পাবে না।'

'তুই চলে যা বরুণ। এগারোটার সময় যাবি দশটা প্রায় বাজে।'

'তুমি আজ বুঝতে পারছ না দাদা। একদিন বুঝবে। মর্মে মর্মে বুঝবে।'

বরুণ চলে গেল। সুরেশ বাবু বারান্দায় সারা রাত বসে রইলেন। সেই রাতে তিনি উপবাস দিলেন। বিগড়ে গেলে শরীরকে কষ্ট দিয়ে মন ঠিক করতে হয়। সুরেশ বাগচী ঠিক করলেন আগামী দিনও তিনি নিরম্বু উপবাস দেবেন।

বাসের ঝাঁকুনিতে অনিলেরও ঘুম পেয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেই মনে হল, সে দিন ছোট কাকার সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার এই বিপদ হত না। বাবা বেঁচে থাকতেন। তবে অনিল এও জানে, কোন উপায়ে সে যদি বাবাকে জিজ্ঞেস

www.BDeBooks.Com

করতে পারত— বাবা, তোমার কি মনে হচ্ছে দেশ ছেড়ে গেলে তোমার জন্যে ভালো হত ? থেকে যাওয়াটা বোকামি হয়েছে। তাহলে তিনি জবাব দিতেন— অনিল, এই বিপদ কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর আসে কি, সারা দেশের উপর এসেছে। আমার মৃত্যু এমন কোন বড় ব্যাপার না বাবা। তাছাড়া তোমার হেড স্যার কি তোমাকে লেখেন নি আমার মৃত্যু সংবাদে রূপেশ্বরের হাজার হাজার মানুষ চোখের জল ফেলেছে। মানুষের ভালবাসায় আমার মৃত্যু। এই দুর্লভ সৌভাগ্য ক'জনের হয় ?

৭

সবাই এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল। বাস প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বাম দিকে খানিকটা হেলে টাল মাটাল অবস্থা এগুচ্ছে। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক করতে করতে বলল, 'হারামির পুত তোর মা'রে আমি...'

বাসের একটা টায়ার ফেটে গেছে, দুর্ঘটনা পারত ঘটে নি। ফাঁকা রাস্তা বলেই সামলোনো গেছে। হেল্পার বলল, 'সব নামেন, গাড়ি খালি করেন। যার যার পিসাব করা দরকার পিসাব করেন।'

অনিল নামল। আয়ুব আলি সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যাকে কোলে বসানোয় অনিলের পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। একটু হাঁটাহাঁটি করা দরকার। এত ঝাঁকুনিতেও আয়ুব আলির নেমে পড়েছে। শুধু মহিলারা গাড়িতে বসা। অনিলের সঙ্গে পাপিয়ার নামার ইচ্ছা ছিল। বাবার ভয়ে নামতে পারে নি।

অনিল ঘাসের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে। সিগারেটে টান দিয়ে সে টের পেল আজ সারা দিনে দু'কাপ চা ছাড়া খায় নি। সিগারেটের ধোঁয়া পেটে পাক দিচ্ছে, বমি ভাব হচ্ছে। ভয়ংকর সময়েও ক্ষুধা নামক বিষয়টি মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। ফাঁসির আসামী ফাঁসির তিন ঘণ্টা আগে খেতে চায়। ফাঁসির আসামীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়— শেষ ইচ্ছা কি ? বেশির ভাগই না-কি খাবারের কথা বলে।

স্যুট পরা ভদ্রলোক হাতে ব্রিফকেস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে অসম্ভব চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে। একটা ট্রাক হর্ন দিল। তিনি ভয়ানক চমকে উঠলেন। অনিল তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি সরে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চান না।

'মহসিন সাহেব। এই মহসিন।'

অনিল তাকাল। আয়ুব আলি তাকেই ডাকছেন। অনিলের মনে ছিল না তার নতুন নামকরণ হয়েছে। আয়ুব আলি বাস থেকে নেমেছেন। এখন তাঁর চোখের সান গ্লাস। এই সানগ্লাস আগে ছিল না।

'মহসিন।'

'আমাকে বলছেন ?'

'আপনাকে ছাড়া কাকে বলব ? এর মধ্যে ভুলে গেছেন ? শুনে যান এদিকে, আর্জেন্ট কথা আছে।'

অনিল এগিয়ে গেল। আয়ুব আলি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ।'

'কেন ?'

'দুই বোরকাওয়ালীর সঙ্গে এক বুড়ো আছে না ? এরা বিহারী!'

'কে বলল আপনাকে ?'

'আপনারা সব নেমে গেলেন। হঠাৎ শুনি এই দুই বোরকাওয়ালী বেহারী ভাষায় কথা বলছে। শুনেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমি তো সহজ পাত্র না, কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— আপনারা কি বিহারী ? কথা বলে না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। এখন কি করা যায় বলেন তো ?'

'করার কি আছে ?'

'বোকার মতো কথা বলবেন না। স্পাই যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না। আমি কান্না দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম— এটা বাঙালির কান্না না। একেক জাতির কান্না একেক রকম। বাঙালির কান্না বিহারী কাঁদতে পারে না। কিছু একটাতো করা দরকার।'

'আপনি চুপচাপ থাকুন। কিছুই করার নেই।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। পথে মিলিটারী, কিছু করা ঠিক হবে না। টাঙ্গাইলে নেমে না হয় বুড়োকে কানে ধরে উঠ-বোস করাবো। ঘরের শত্রু বিভীষণ।'

অনিল কিছু বলল না। শরীরটা খারাপ লাগছে। এতক্ষণ বমি-বমি ভাব ছিল, এখন সত্যি বমি আসছে। বমি করে ফেলতে পারলে শরীরটা বোধ হয় ভালো লাগত। বমি হওয়ার জন্যেই অনিল আরেকটা সিগারেট ধরাল।

'মহসিন সাহেব।'

'জ্বি।'

'ট্রিকস করে বুড়ো কাছ বুড়োর কাছ থেকে জানব না-কি ব্যাপারটা কি ?'

'কি দরকার ?'

'তাও ঠিক। কি দরকার ? তার উপর আবার বুড়ো মানুষ। জোয়ান হলে পাছায় লাথি দিয়ে নালায় ফেলে দিতাম।'

বাসের চাকা বদল করা হচ্ছে। জ্যাকে কি এক সমস্যা। জ্যাক উপরে উঠছে না। ড্রাইভার এবং হেল্পার দু'জনেই অনেক কায়দা-কানুন করছে। লাভ হচ্ছে না। পাপিয়া জানালা দিয়ে হাত ইশারা করে তার বাবাকে ডাকল। অপ্রসন্ন মুখে আয়ুব আলি এগিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তার চেয়েও অপ্রসন্ন মুখে। থু করে একদলা থুথু ফেলে বললেন, 'মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়াই উচিত না। কথায় আছে না— পথে নারী বিবর্জিতা। এসব কথাতো আর এম্নি এম্নি লোকজন বানায় না। দেখে শুনে বিচার বিবেচনা করে বানায়।'

www.BDeBooks.Com

'কি হয়েছে ?'

'পাপিয়ার মা না-কি আসার সময় পানি বেশি খেয়েছিল, এখন বাথরুমে যাওয়া দরকার। তার জন্যে পাকিস্তানে গভর্নমেন্ট পথের মাঝখানে বাথরুম বানিয়ে বসে আছে। আমি পাপিয়ার মা'কে বললাম— চুপ করে বসে থাক। একটা কথা না। বেশি কথা আমি নিজে বলি না, বেশি কথা শুনতেও পছন্দ করি না।'

অনিল বলল, 'বাস এখানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে হয়। কাছেই একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে নিয়ে গেলে হয়।'

'কে নিয়ে যাবে, আমি ?'

'আপনি যেতে না চাইলে আমি নিয়ে যাই।'

'মহসিন সাহেব, আপনার বয়স অল্প। আপনাকে একটা কথা বলি। মেয়েছেলের সব কথার গুরুত্ব দিবেন না। গুরুত্ব দিয়েছেন তো মরেছেন। এদের কথা এক কান দিয়ে শুনবেন, আরেক কান দিয়ে বের করে দেবেন। আচ্ছা এই শালারা একটা চাক্কা বদল বদল করতে গিয়ে ছয় মাস লাগিয়ে দিচ্ছে ব্যাপার কি ?'

অনিল, আয়ুব সাহেবের স্ত্রী, তাঁর দুই কন্যা এবং হাতাহাতি বিশারদ দুই পুত্রকে নিয়ে রাস্তার ওপারে বাড়িটার দিকে এগুচ্ছে। ভদ্রমহিলা পুরো ব্যাপারটায় খুব লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে দুটি বাস থেকে বের হতে পেরে উল্লসিত। তারা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। সেই সব কথা বোঝার উপায় নেই। অল্প বয়স্ক বালিকাদের যেসব কোড ল্যাংগুয়েজ আছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে। ছেলে দুটি নীরব।

ভদ্রমহিলা কিছুটা গ্রাম্য টানা টানা স্বরে বললেন, 'পাপিয়ার বাবা আপনারে বিরক্ত করতেছে ?'

অনিল বলল, 'না।'

ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, 'আপনে কিছু মনে নিয়েন না। মানুষটা পাগলা কিসিমের কিন্তু অন্তর খুব ভালো।'

'মনে করার কিছু নেই।'

'কথা বেশি বলে কিন্তু বিশ্বাস করেন খুব ভালো মানুষ।'

'আমি বিশ্বাস করছি। কেন বিশ্বাস করব না।'

পাপিয়া বলল, 'ছোট বেলায় বাবার টাইফয়েড হয়েছিল। তার পর থেকে বাবা কথা বেশি বলে।'

পাপিয়ার মা, কড়া গলায় বললেন, 'চুপ কর।'

সম্পন্ন গৃহস্তের টিনের বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে কোন মানুষ জনের সাড়া নেই। অনেক ডাকাডাকি পর কামলা শ্রেণীর একজন লোক বের হয়ে এল। তার কাছ থেকে জানা গেল রাস্তার দু'পাশে অনেক দূর পর্যন্ত বাড়ি ঘরে কোন মানুষ থাকে না। রাস্তা দিয়ে মিলিটারী যাতায়াত করে। বেশ কয়েকবার ট্রাক থামিয়ে তারা রাস্তার আশেপাশের বাড়ি-ঘরগুলতে ঢুকেছে।

অনিল বলল, 'বাড়িতে ঢোকে কি চায় ?'

লোকটা কিছু বলল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনিল বলল, 'ওরা কি টাকা পয়সা চায় ?'

'না। মেয়েছেলের সন্ধান করে।'

'সে কি ?'

'অছিমদ্দিন মেম্বার সাহেবের বউ আর ছোট শালীরে ট্রাকে উঠায়ে নিয়া গেছে। তারার আর কোন সন্ধান নাই।'

'অছিমদ্দিন মেম্বার সাহেবের বাড়ি কোনটা ?'

'বাড়ি দূর আছে। এই খান থাইক্যা ধরেন চাইর মাইল।'

'মিলিটারী কি রোজই যাতায়াত করে ?'

'হুঁ। যাতায়াত বাড়ছে।'

বাসের চাকা লাগানো হয়ে গেছে। বাস হর্ন দিচ্ছে। বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। বাসে ফিরতে ফিরতে সবাই আধভেজা হয়ে গেল। বাস যখন ছাড়ল তখন মুষল ধারে বৃষ্টি। দু'হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না এমন অবস্থা। আয়ুব আলি আনন্দিত গলায় বললেন, 'বৃষ্টিটা নেমেছে আল্লার রহমতের মতো। বৃষ্টিতে মিলিটারী বের হবে না। চেকিং ফেকিং কিছু হবে না। হুস করে পার হয়ে যাব।'

বাস চলছে খুব ধীরে। উইন্ড শিল্ড দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না, ধীরে চলা ছাড়া উপায় নেই। আয়ুব আলি বললেন, 'আমি সামনে গিয়ে বসি, এইখানে খুব ঝাঁকুনি। মহসিন সাহেব আপনি পা তুলে আরাম করে বসেনতো।'

অনিল পা তুলে বসল। তেমন আরাম হল না। ক্ষুধা কষ্ট দিচ্ছে। শরীর ঝিম ঝিম করছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী, বোরকার পর্দা তুলে দিয়েছেন। স্বামী পাশে নেই এখন একটু সহজ হওয়া যায়। তিনি অনিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পান খাইবেন ?'

'না।'

'একটাখান। মিষ্টি পান। জর্দা দেওয়া নাই।'

অনিল পান হাতে নিল। ভদ্রমহিলা সুখী সুখী গলায় বললেন, 'ভাইয়ের বিয়ায় যাইতেছি। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখ বিবাহ।'

'আমি শুনেছি।'

'মেয়ে খুব সুন্দরী। ছবি আছে দেখবেন ?'

'দেখি।

'ও পাপিয়া তোর নতুন মামীর ছবি দেখা।'

পাপিয়া ছবি দিল। পাপিয়ার মা হাসি মুখে বললেন, 'গায়ের রঙ খুব পরিষ্কার, ছবিতে তেমন আসে নাই।'

পাপিয়া বলল, 'তুমিতো দেখ নাই মা। সব শোনা কথা।'

www.BDeBooks.Com

'ছোট চাচা দেখছেন। ছোট চাচা বলছেন— বক পাখির পাখনার মতো গায়ের রঙ। ছোট চাচা মিথ্যা বলার মানুষ ?'

অনিল ছবির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর ছবি। গোলগাল মুখ। মাথাটা বাঁ পাশে হেলানো। বেণী বাঁধা চুল। টানা টানা চোখে রাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ। সামান্য ছবি এত কিছু ধরতে পারে ?

'সুন্দর না ?'

'হ্যাঁ সুন্দর। খুব সুন্দর।

'আমার ভাইও সুন্দর। ও পাপিয়া তোর মামার ছবি দেখা।'

পাপিয়া আগ্রহ করে মামার ছবি বের করল। অনিলের এই ছবিটি দেখতে ইচ্ছে করছে না। অসম্ভব রূপবতী তরুণীর পাশে কাউকে মানাবে না। পৃথিবীর সবচে' রূপবান তরুণকেও তারপাশে কদাকার লাগবে। কি আশ্চর্য মেয়েটাকে এখন অতসীদির মতো দেখাচ্ছে। অবিকল অতসীদির হাসির মতো হাসি। অতসীদির চোখের মতো চোখ। অতসীদির মতোই গোল মুখ। কে জানে হয়ত এই মেয়েটার নামও অতসী। অনিল পাপিয়াকে বলল, 'তোমার নতুন মামীর নাম কি ?'

পাপিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'অহনা।'

'কি নাম বললে, অহনা ?'

'জ্বি। আমার আব্বা বলে— গহনা। হি হি হি...'

অনিলের এই সুখী পরিবারটিকে ভালো লাগছে। অসম্ভব ভালো লাগছে।

সবচে' দুঃখের সময় আনন্দময় কল্পনা করতে হয়। সুরেশ বাগচী বলতেন, 'বুঝলি অতসী মানুষ কি করে জানিস ? সুখে সময় সে শুধু সুখের কল্পনা করে। একটা সুখ তাকে, দশটা সুখের কথা মনে করিয়ে দেয়। দুঃখের সময় সে শুধু দুঃখই কল্পনা করে। এটা ঠিক না। উল্টোটা করতে হবে।

অতসীদি বলতো, 'তুমি বুঝি তাই কর ?'

'সব সময় পারি না। তবে চেষ্টা করি। খুব আনন্দের কিছু যখন ঘটে তখন তোর মা'র কথা ভাবি। ইস্ বেচারী এই আনন্দ দেখার জন্যে নেই...তখন চোখে জল এসে যায়।'

'খুব আনন্দের কিছু কি তোমার জীবনে ঘটে বাবা ?'

'অবশ্যই ঘটে। কেন ঘটবে না।'

'আমিতো আনন্দের ঘটনা কিছু দেখি না। কবে ঘটল বলতো ? একটা ঘটনা বল।'

'ঐতো সেদিনের কথাই ধর। তোরা দুই ভাই বোন খুব হাসাহাসি করছিস। দেখে আমার মনটা আনন্দে ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোর মা'র কথা ভাবলাম। একা একা খানিকক্ষণ কাঁদলাম।

'বাবা, তোমার কি কোন গোপন দুঃখ আছে ?'

সুরেশ বাগচী হাসতে হাসতে বললেন, 'না মা আমার সব প্রকাশ্য দুঃখ। তোর বুঝি সব গোপন দুঃখ ?'

অতসী হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তারপরেই খিল খিল করে হেসে ফেলল।

অনিল তার দিদির অনেক গোপন দুঃখের খবর জানা না। শুধু একটি জানে। সেই দুঃখটা ভয়াবহ ধরনের। এই দুঃখের কথা পৃথিবীর কাউকেই জানানো যাবে না। কোনদিন এটা নিয়ে আলোচনাও করা যাবে না। এই দুঃখ দূর করারও কোন উপায় নেই। কিছু গোপন দুঃখ আছে যা চিরকাল গোপন থাকে।

অতসীদির বিয়ের কথা উঠলে সে বলবে, 'আমি কিন্তু বিয়ে করব না। শুধু শুধু তোমরা চেষ্টা করছ।'

'কেন করবে না দিদি ?'

'কেন করব না সে কৈফিয়ত তোর কাছে দিতে হবে ? তুই কে ? তুই কি আমার গুরু মশাই ? করব না করব না, ব্যাস।'

'বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয়ে যায় তুই কি করবি ?'

'আমি তখন ছেলেটাকে দশ লাইনের একটা চিঠি লিখব। বিয়ে ভেঙে যাবে।'

অনিল ঠিক জানে না তবে তার অনুমান অতসীদি এ রকম একটা চিঠি লিখেছে। নয়ত নেত্রকোনার উকিল সাহেবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে যেত না। সব ঠিক ঠাক। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ। পণের কোন ব্যাপার নেই। উকিল সাহেব বিনা পণে ছেলের বিয়ে দেবেন। তাঁদের বংশের এরকম ধারা। ছেলের মা এবং বোনরা এসে আশীর্বাদ করে গেল। ছেলের মা অতসীকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং বললেন, 'এই মেয়েটাতো মানুষ না। এতো দেবী দুর্গা। এখন থেকে আমরা এই মা'কে আমি দুর্গা ডাকব।'

সেই বিয়ে ভেঙে গেল। ছেলে সুরেশ বাগচীকে লোক মারফত একটি চিঠি পাঠাল। তাতে লেখা—

প্রণাম নিবেন। বিশেষ কারণে আমার পক্ষে বর্তমানে বিবাহ করা সম্ভব হইতেছে না। আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

সুরেশ বাগচী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কি ? আমিতো কিছুই বুঝলাম না। ব্যাপারটা কি ?'

বাস হর্ন দিচ্ছে। যাত্রীরা সচকিত হয়ে উঠেছে। সামনেই মিলিটারী চেক পোস্ট। দু'জন মিলিটারী রেইন কোট গায়ে রাস্তায় দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। পরিষ্কার দিন।

৮

মুক্তি চেঁচিয়ে কাঁদছে। তাকে কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না। মুক্তির বাবা মুক্তিকে কাঁধে নিয়ে দুলাচ্ছেন। কান্না কমার বদলে তাতে তার কান্না আরো বেড়ে যাচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

স্যুট পরা ভদ্রলোক আবার বমি করছেন। এবার বমি করছেন গাড়ির ভেতর। তিনি গাড়ি প্রায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিকট শব্দ হচ্ছে।

কালো পোশাক পরা একজন মিলিশিয়া উঁকি দিল। তার চেহারায় যথেষ্ট মায়া আছে। গলার স্বরও কোমল, অথচ সে কুৎসিত একটি বাক্য বলল, 'শোয়ার কি বাচ্চা, সব উতারো।' ছাব্বিশ জন্য যাত্রী এই বাসে। ছাব্বিশ জনের ভেতর একজনও বলতে পারল না— কেন অকারণে গালি দিচ্ছেন। সবাই এমন মুখ করে আছে যেন এই গালি তাদের প্রাপ্য। শুধু আয়ুব আলির চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। আয়ুব আলির স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, 'তোমার পায়ে ধরি। তুমি উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না। আমি তোমার পায়ে ধরি।' ভদ্র মহিলা সত্যি সত্যি স্বামীর পা চেপে ধরলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, 'পুলাপানের কসম লাগে, উল্টাপাল্টা কিছু বলবা না।'

মহিলা যাত্রী ছাড়া বাকি সবাইকে লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। স্যুট পরা ভদ্রলোক শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তিনি ঝকঝকে স্যুট নিয়ে কাদার উপর বসে আছেন। তাঁর হেঁচকি উঠছে। ব্রিফকেস এখনো তার হাতে ধরা।

অনিল লক্ষ্য করল তল্লাশির পুরো ব্যাপারটা মিলিটারীরা এক ধরনের খেলার মতো নিয়েছে। মজার কোন খেলা, যেখানে থেকে আনন্দ পাওয়া যায়। অন্তত এরা সবাই যে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করছে তা বোঝা যাচ্ছে। সবার ঠোঁটের কোণেই হাসি কিংবা হাসির আভাস। এরা নিজেরা তীব্র ভয়ের মধ্যে আছে। অন্যের ভয় থেকে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা তারা করবে, তা বলাই বাহুল্য। ভীত মানুষকে আরো বেশি ভয় পাইয়ে দেবার প্রবণতাও মানুষের মজ্জাগত।

মিলিটারী দলের প্রধান একজন অল্পবয়স্ক অফিসার। তিনি দূরে একটা টুলে বসে আছেন। এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই, এরকম একটা ভাব। তল্লাশি দলের সঙ্গে একজন দোভাষী থাকে। এদের সঙ্গেও আছে। এই দোভাষী বিহারী নয়, বাঙালি। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসী একজন মানুষ। সার্ট প্যান্ট পরা। চোখে চশমা। তাকেও খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে। সে খানিকটা দূরে বসে কলা খাচ্ছে। তার সামনে একটা মগ। মগভর্তি চা।

তল্লাশি দল স্যুট পরা মানুষটার কাছে চলে এল। তাকেই যে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা বোঝাই যাচ্ছিল।

একজন সুবাদার শীতল গলায় বলল, 'ডরতা কেঁউ?'

লোকটি সুন্দর উর্দুতে বলল, 'ভয় পাচ্ছি না। আমার শরীর খারাপ। কয়েকবার বমি হয়েছে। এই জন্যে দাঁড়াতে পারছি না।'

কথাবার্তা সব উর্দুতে হল।

'তুমি বাঙালি?'

'জ্বি জনাব বাঙালি।'

'নাম?'

'আবু হোসেন।'

'কলেমা জান ?'

'জ্বি। চার কলমা জানি।'

'নামায পড় ?'

'নামায পড়ি।'

'উর্দু কোথা শিখেছ ?'

'আমরা ছোট বেলায় রাওয়ালপিন্ডি ছিলাম। বাবা রেলওয়েতে কাজ করতেন।

'বাবার নাম কি ?'

'ইসমাইল হোসেন।'

'তুমি পাকিস্তান ভালবাস ?'

'জ্বি বাসি।'

'ব্রিফকেসে কি আছে ?'

'কিছু কাগজপত্র আছে। জমির দলিল।'

'ব্রিফকেস খোল।'

'ব্রিফকেসের চাবি আনতে ভুলে গেছি জনাব।'

সুবাদারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। সে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একজনকে কি যেন বলল। উর্দু নয় অন্য কোন ভাষায়। সম্ভবত পশতু। সে ব্রিফকেস নিয়ে গেল। ব্রীফকেস ভাঙা হতে লাগল। পুরো দলটি গভীর আগ্রহে ব্রিফকেস ভাঙা দেখছে। তাদের সবার চোখে মুখে স্পষ্ট আনন্দের ছাপ। টুলে বসে থাকা অফিসারও আগ্রহ বোধ করছেন। তিনি উঠে এসেছেন ব্রীফকেস ভাঙা দেখতে। স্যুট পরা লোকটি আবার বমি করছে। হড় হড় করে বমি। তার বমির দৃশ্যেও মিলিটারীর দল আগ্রহ বোধ করছে। এতেও যেন তারা খানিকটা মজা পাচ্ছে।

ব্রিফকেস ভাঙা হয়েছে। একটা জমির দলিল, কিছু কাগজপত্র, দাড়ি সেভ করার যন্ত্রপাতি, একটা গায়ে মাখা সাবান। খামে ভরা কিছু টাকা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণের নয়। ছয় সাত শ' হবে। মিলিটারীর তল্লাশি দলটির আশা ভঙ্গ হল। অফিসারটিও বিরক্ত হয়েছেন। তিনি কঠিন গলায় বললেন, 'এ মুসলমান কি-না ভালোমতো জিজ্ঞেস কর। চেহারা হিন্দুর মতো।'

অফিসারের কথায় দলটির মধ্যে আবার খানিকটা আগ্রহ দেখা গেল। সুবাদার বলল, 'কলেমায়ে শাহাদৎ বল।'

আবু হোসেন গড় গড় করে কলেমায়ে শাহাদৎ বলল।

'খাৎনা হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'প্যান্ট খোল।'

আবু হোসেন অতি দ্রুত খুলে ফেলল। যেন এর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। প্যান্ট খুলে দেখাতে পেরে যেন খানিকটা আরাম পাচ্ছে। বিপদ বুঝি-

www.BDeBooks.Com

বা কাটল। সুবাদার বলল, 'যাও ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখিয়ে আস। আবু হোসেন প্যান্ট খোলা অবস্থাতেই ক্যাপ্টেন সাহেবের সামনে গেল। ক্যাপ্টেন সাহেব উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকালেন, তারপর হাত ইশারায় চলে যেতে বললেন। আবু হোসেন তার ভাঙা ব্রিফকেস নিয়ে বাসে উঠল এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন শান্তির ঘুম সে অনেকদিন ঘুমায় নি।

জিজ্ঞাসাবাদ এখন বেশ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। কারোর প্যান্ট খোলা হচ্ছে না। একজনকে শুধু বলা হল একশ বার কানে ধরে উঠ— বোস করতে। এবং যতবার উঠে দাঁড়াবে ততবার বলবে, 'জয় বাংলা'।

শুধুমাত্র একজন যাত্রীর জন্যে এটা কেন করা হল তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত মজা করার জন্যেই। উঠ-বোসের পর্ব সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হচ্ছে। যাকে উঠ-বোস করতে বলা হয়েছে, সে এই কাজটি বেশ আগ্রহ নিয়ে করছে বলে মনে হল।

ক্যাপ্টেন সাহেব তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। তার চোখ বিষণ্ন।

অনিল এবং আয়ুব আলি লাইনের শেষ মাথায়। সুবাদার সাহেব অনিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বাঙালি দোভাষীর চা খাওয়া শেষ হয়েছে। সে এসে সুবাদারের কাছে দাঁড়াল।

'কি নাম ?'

'অনিল। অনিল বাগচী।'

হতভম্ব আয়ুব আলি বললেন, 'ঠিক নাম বলেন। ঠিক নামটা স্যারকে বলেন। স্যার ইনার আসল নাম মোহাম্মদ সহসিন। বাপ মা আদর করে অনিল ডাকে।'

'তোমার নাম মোহাম্মদ মহসিন ?'

অনিল চুপ করে রইল। আয়ুব আলি বড়বড় করে বললেন, 'আমার খুবই পরিচিত স্যার। দূর সম্পর্কের রিলেটিভ হয়। খাঁটি মুসলমান।'

বাঙালি দোভাষী বলল, 'অনিল হইল হিন্দু নাম।'

আয়ুব আলি হাসি মুখে বললেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারির জন্যে এটা হয়েছে ভাইসাহেব। বাপ মা'রা আদর করে ছেলেমেয়েদের বাংলা নাম রাখে। যেমন ধরেন— সাগর, পলাশ। ছেলেপুলের তো কোন দোষ নাই, বাপ মায়ের দোষ।'

বাঙালি দোভাষী এবার যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছে বলে মনে হল। সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দুইটাই হিন্দু। মিথ্যা কথা বলতেছে।'

অনিল বলল, 'ইয়েস স্যার।'

'তুমি মুক্তিবাহিনীর লোক ?'

'না স্যার।'

'আওয়ামী লীগ ?'

'না।'

'মুজিবের পা-চাটা কুকুর। মুজিবের পা কখনো চেটে দেখেছ? কেমন লাগে পা চাটতে?'

অনিল চুপ করে রইল। ক্যাপ্টেন বললেন, 'একে ঘরে নিয়ে যাও।'

আয়ুব আলি ব্যাকুল গলায় বললেন, 'স্যার আমার একটা কথা শুনেন স্যার। যে কেউ একবার কলেমা পড়লেও মুসলমান হয়ে যায়। এটা হাদিসের কথা। মহসিন কলেমা জানে। তারে জিজ্ঞেস করেন। সে বলবে।'

ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, 'তুমি নিজে মুসলমান?'

'জ্বি জনাব, মুসলমান। সুন্নি মুসলমান। আমরা পীর বংশ। আমার দাদা মরহুম মেরাজ উদ্দিন সরকার পীর ছিলেন।'

বাঙালি দোভাষী বলল, 'এই হারামীও হিন্দু। বিরাট ধড়িবাজ।'

আয়ুব আলির চোখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি ঘাড় ফিরিয়ে বাসের দিকে তাকালেন। বাস থেকে এখানকার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। তবে বাসের প্রতিটি মানুষ ভীত চোখে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। আয়ুব আলি সাহেবের স্ত্রী এবং বড় মেয়েটি কাঁদতে শুরু করেছে। সবচে' ছোট মেয়েটি জানালায় হাত বাড়িয়ে ভীত গলায় বলছে— 'আব্বু আস, আব্বু আস।'

বাঙালি দোভাষী আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্যান্ট খোল্। প্যান্ট খুলে দেখা খৎনা হয়েছে কিনা। স্যারকে দেখা।'

আয়ুব আলি কঠিন গলায় বললেন, 'প্যান্ট যদি খুলতে হয় তাহলে আমি তোর মুখে পিসাব করে দেব। আল্লার কসম আমি পিসাব করব।'

অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেন মনে হয় কিছুটা মজা পেলেন। তিনি শব্দ করে হেসে ফেললেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে অন্যরাও হেসে ফেলল। শুধু বাঙালি দোভাষী হাসল না। সে অন্যদের হাসির কারণও ঠিক ধরতে পারছে না। সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। ক্যাপ্টেন আয়ুব আলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাও, গাড়িতে গিয়ে উঠ।'

আয়ুব আলি বললেন, 'স্যার মহসিন সাহেবকে নিয়ে যাই?'

'ও থাকুক। তোমাকে উঠতে বলেছি, তুমি উঠ।'

আয়ুব আলি ব্যথিত চোখে অনিলের দিকে তাকালেন। অনিল শান্ত গলায় বলল, 'আমার বড় বোন আছেন রূপেশ্বর হাই স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে...'

আয়ুব আলি অনিলের কথা শেষ করতে দিলেন না। ছেলে মানুষের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলতেছি, মাটির কসম খেয়ে বলতেছি, আপনার যদি কিছু হয় আমি আপনার বোনকে দেখব, যতদিন বাঁচব দেখব। বিশ্বাস করেন আমার কথা। বিশ্বাস করেন।'

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনি আমার বোনকে বলবেন, আমি ভয় পাই নাই। আর তাকে বলবেন আমি বলে দিয়েছি— সে যেন তার পছন্দের ছেলেটাকে বিয়ে করে। কে কি বলে এটা নিয়ে সে যেন চিন্তা না করে।'

www.BDeBooks.Com

আয়ুব আলি গাড়িতে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কান্না আরো বেড়ে গেল। বড় মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সে থর থর করে কাঁপছে।

বাস ছেড়ে যাবার আগ-মুহূর্তে ক্যাপ্টেন সুবাদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যুট পরা লোকটাকে রেখে দাও। ঐটাও বদমাশ। ওর কিছু একটা মতলব আছে— টের পাওয়া যাচ্ছে না।'

আবু হোসেন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাসের হ্যান্ডেল ধরে আছে। কিছুতেই তাকে টেনে নামানো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে তার গায়ে অসুরের শক্তি। জীবন থাকতে সে বাসের হ্যান্ডেল ছাড়বে না। আবু হোসেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে— 'ভাইসাহেব, আপনারা আমাকে বাঁচান। ভাইসাব, আপনারা সবে মিলে আমাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন।'

আবু হোসেনকে নামানো হয়েছে। সে হাত পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। বাস ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হাই তুললেন। সুবাদারকে বলল, 'এই দু'জনকে নদীর পাড়ে নিয়ে যাও।'

'এখন নিব ?'

'না রাতে। রাতই ভালো।'

ক্যাপ্টেন আবার হাই তুললেন। তার ঘুম পাচ্ছে।

৯

খুব জ্যোৎস্না হল সে রাতে। উথাল-পাথাল জ্যোৎস্নার ভেতর তারা অনিলকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আবু হোসেনকে নেয়া হচ্ছে না। কারণ তাকে নেয়ার প্রয়োজন নেই। মুগ্ধ হয়ে জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে অনিল যাচ্ছে। দোভাষী বাঙালি যাচ্ছে তার পাশে পাশে। অনিল তাকে বলল, 'কি সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে দেখেছেন ? এই সৌন্দর্যের ছবি আঁকা সম্ভব নয়। সৌন্দর্যের একটি অংশ আছে যার ছবি আঁকা যায় না।'

প্রচণ্ড জ্যোৎস্নার কারণেই বোধ হয় কাকদের ভেতরে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। তারা ডাকতে লাগল— কা— কা— কা।

বহুব্রীহি

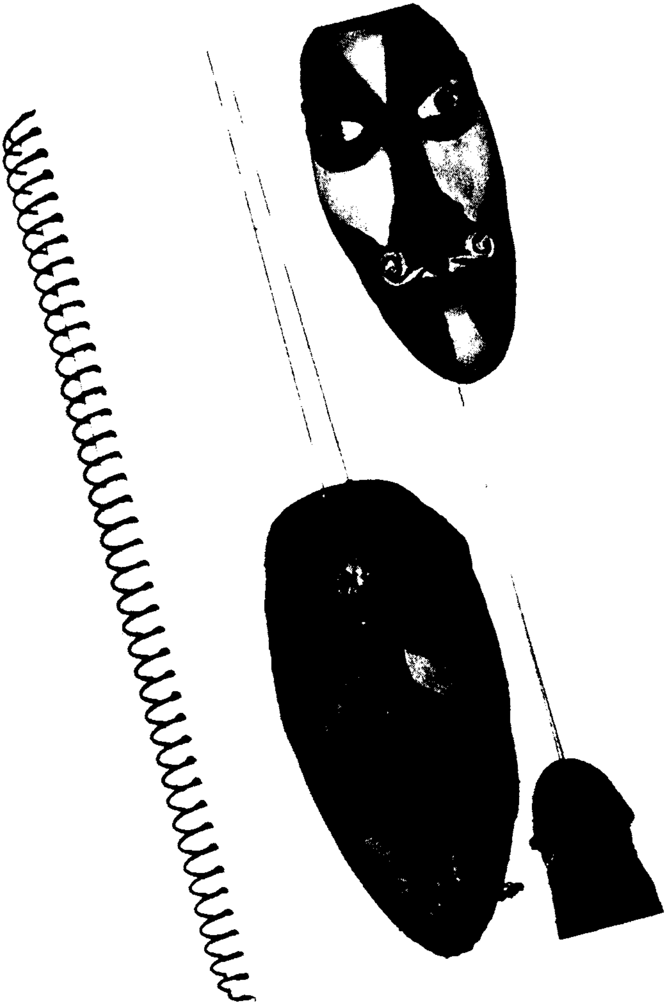

www.BDeBooks.Com

উঁচু দেয়ালে ঘেরা পুরানো ধরনের বিশাল দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে এবং পেছনে গাছগাছলিতে জঙ্গলের মত হয়ে আছে। কিছু কিছু গাছের গুড়ি কালো সিমেন্টে বাঁধানো। বাড়ির নাম নিরিবিলি, শ্বেত পাথরে গেটের উপর নাম লেখা, অবশ্যি 'র' এর ফোটা মুছে গেছে। পাড়ার কোন দুষ্ট ছেলে হারিয়ে যাওয়া ফোটাটা বসিয়ে দিয়েছে 'ব' এর উপর। এখন বাড়ির নাম 'নিবিরিলি'।

সাধারণত যেসব বাড়ির নাম 'নিরিবিলি' হয়, সেসব বাড়িতে সারাক্ষণই হৈ চৈ হতে থাকে। এই মুহূর্তে এ বাড়িতে অবশ্যি কোন হৈ চৈ হচ্ছে না। বাড়ির প্রধান ব্যক্তি সোবাহান সাহেবকে বারান্দার ইজি চেয়ারের পা মেলে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। চোখে সুস্পষ্ট বিরক্তি।

সোবাহান সাহেব বছর দুই হল ওকালতি থেকে অবসর নিয়েছেন। কর্মহীন জীবনে এখনো অভ্যস্ত হতে পারেন নি। দিনের শুরুতেই তাঁর মনে হয় সারাটা দিন কিছুই করার নেই। তাঁর মেজাজ সেই কারণ ভোরবেলায় খুবই খারাপ থাকে। আজ অন্য দিনের চেয়েও বেশি খারাপ, কেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। শরৎকালের একটা চমৎকার সকাল। ঝকঝকে রোদ, বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। এ রকম একটা সকালে মন খারাপ থাকার প্রশ্নই আসে না।

সোবাহান সাহেবের গায়ে হলুদ রঙের একটা সুতির চাদর। গলায় বেগুনি রঙের মাফলার। আবহাওয়া বেশ গরম, তবু তিনি কেন যে মাফলার জড়িয়ে আছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর হাতে একটা পেপার ব্যাক, ডিটেকটিভ গল্প। কাল রাতে বত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলেন। গত একটা ঘণ্টা ধরে তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা পড়তে চেষ্টা করছেন, পারছেন না। বার বার ইচ্ছে করছে বই ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে। তেত্রিশ পৃষ্ঠায় নেইল কাটার দিয়ে খুঁচিয়ে স্মীথ নামে একটি লোকের বাঁ চোখ তুলে নেবার বিষদ বর্ণনা আছে। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে পড়লেন— চোখ উপড়ে তুলে নেবার সময়ও মিঃ স্মীথ রসিকতা করছে এবং গুন গুন করে গাইছে— লন্ডন ব্রীজ ইজ ফলিং ডাউন। কোন মানে হয় ? যে লেখক এই বইটি লিখেছে সোবাহান সাহেবের ইচ্ছে করছে তার বাঁ চোখটা নেইল কাটার দিয়ে তুলে ফেলতে।

সোবাহান সাহেবের ছোট মেয়ে মিলি চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় ঢুকল। বাবার সামনের গোল টেবিলে কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে হাসিমুখে বলল, বাবা তোমার চা।

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, কিসের চা ?

'চা পাতায় তৈরি চা, আবার কিসের ?'

'এখন কেন ?'

'তুমি সকাল আটটায় এক কাপ চা খাও এই জন্যে এখন। সকাল আটটা কিছুক্ষণ আগে বাজল ?'

সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, পিরিচে চা পড়ে আছে কেন ? চা থাকবে চায়ের কাপে!

'তাই আছে বাবা, পিরিচে এক ফোঁটা চা নেই। তুমি ভাল করে তাকিয়ে দেখ।'

তিনি চায়ের কাপ হাতে নিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন চা অতিরিক্ত মিষ্টি হলে বা মিষ্টি কম হলে মেয়েকে প্রচণ্ড ধমক দেবেন। কাউকে ধমকাতে ইচ্ছা করছে। তিনি অত্যন্ত মনমরা হয়ে লক্ষ্য করলেন, চা-য়ে চিনি ঠিকই আছে। চা আনতে আনতে ঠাণ্ডাও হয় নি, যতটুকু গরম থাকার কথা ততটুকুই আছে, বেশিও না কমও না।

মিলি বলল, সব ঠিক আছে বাবা ?

তিনি জবাব দিলেন না। মিলি হালকা গলায় বলল, ভোরবেলা তোমার জন্যে চা আনতে যা ভয় লাগে। একটা না একটা খুঁত ধরে বিশ্রী করে বকা দাও। বাবা, তোমার পাশে খানিকক্ষণ বসব ?

সোবাহন সাহেব এই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। মিলি, গোল-টেবিলের এক কোণায় বসল। তার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্যে সে ঝলমল করছে। তার পরনে কমলা রঙের শাড়ি। শরৎকালের ভোরের সঙ্গে এই শাড়িটি চমৎকার মানিয়ে গেছে। মিলি হাসিমুখে বলল, এই গরমে গলায় মাফলার জড়িয়ে আছ কেন বাবা ? দাও খুলে দেই।

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, খোলার প্রয়োজন মনে করলে নিজেই খুলতাম। মাফলার খোলা খুব জটিল কোন বিষয় নয় যে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য লাগবে।

মিলি হেসে ফেলল। হেসেই চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল, বাবা তার হাসি দেখতে গেলে রেগে যেতে পারেন। মিলি মুখের হাসি মুছে বাবার দিকে তাকাল। হাসি অবশ্যি পুরোপুরি গেল না— তার চোখে ঝিলমিল করতে লাগল।

'বাবা, রোজ ভোরে তুমি একটা ঝগড়া বাধাতে চাও কেন বলতো ? ভোরবেলা তোমার ভয়ে আমি অস্থির হয়ে থাকি।'

এই বলে মিলি আবার হেসে ফেলল। এখন তার হাসি দেখে মনে হল না বাবার ভয়ে সে অস্থির। সোবাহান সাহেব কিছুই বললেন না। বই খুললেন, তেত্রিশ পৃষ্ঠাটা পড়ার একটা শেষ চেষ্টা করা যাক।

মিলি বলল, তুমি মার্ডার ইন দা ডার্ক পড়ছ ? অসাধারণ একটা বই— তাই না বাবা ?

www.BDeBooks.Com

সোবাহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, অসাধারণ ?

"হ্যাঁ অসাধারণ, স্মীথ নামের একটা লোকের বাঁ চোখ নেইল কাটার দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলা হয়..."

'এটা অসাধারণ ?'

'লোকটার সাহস তুমি দেখবে না ? লোকটা তখন গান গাইতে থাকে— লন্ডন ব্রীজ ইজ ফলিং ডাউন, ফলিং ডাউন....। তারপর কি হয় জান ? এই অবস্থায় সে কোঁক করে একটা লাথি বসায় মাডারারটার পেটে। মার্ডারার এক মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হতেই সে উপড়ে তোলা চোখটা ছিনিয়ে তিনতলার জানালা দিয়ে নিচে লাফ দেয়। তার চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। তীব্র ব্যথায় সে দিশাহারা, তবু সে ছুটে যায় একটা হাসপাতালে, ডাক্তারকে হাসি মুখে বলে— ডাক্তার সাহেব আপনি কি এই চোখটা জায়গামত বসিয়ে দিতে পারেন ? যদি পারেন তাহলে আপনাকে আমি লন্ডন শহরের সবচেয়ে বড় গোলাপটি উপহার দেব। সৌভাগ্য ক্রমে সেই হাসপাতালে তখন ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে বড় আই সার্জন ডঃ এসিল নায়ার। তিনি— সোবাহান সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সে লোকটার চোখ লাগিয়ে দিল ?

'হ্যাঁ, অপটিক নার্ভ গুলি জোড়া লাগিয়ে দিল— ?'

'এই কুৎসিত বইটাকে তুই বলছিস অসাধারণ ? বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী যে ইকনমিক্সে অনার্স পড়ছে সে এই বইকে বলছে অসাধারণ ?'

'ইকনমিক্সে সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, বইটা আমার সামনে ছিড়ে কুটি কুটি কর।

'কি বললে বাবা ?'

'বইটা কুটি কুটি করে ছিড়ে ফেল, আমি দেখি।'

মিলি আঁৎকে উঠে বলল, এই বই আমার না বাবা। আমার এক বান্ধবীর বই। আমি এক সপ্তার জন্যে ধার এনেছি।

'বই যারই হোক— নষ্ট করা দরকার। সমাজের মঙ্গলের জন্যেই দরকার। আমি এই বিষয়ে দ্বিতীয় কোন কথা শুনতে চাই না। আমি দেখতে চাই যে বইটা কুটি কুটি করে ফেলা হয়েছে।'

'আমার বইতো না বাবা। আমার বই হলে একটা কথা ছিল।'

'বললাম তো এই বিষয়ে আমি আর কোন আর্গুমেন্ট শুনতে চাই না। ডেস্ট্রয়।'

মিলি বেশ কিছুক্ষণ হতভম্ব ভঙ্গিতে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল, কেঁদে ফেলার চেষ্টা করল, কাঁদতে পারল না। কেঁদে ফেলতে পারলে বইটা রক্ষা করা যেত। সোবাহান সাহেব বললেন, কি ব্যাপার বসে আছিস যে ? কি বলছি কানে যাচ্ছে না ?

মিলি উঠে দাঁড়াল। বাবার কোল থেকে বই নিয়ে ছিড়ে কুচি কুচি করে ফেলল। এই সময় তার চোখে পানি এসে গেল। মিলি জানে চোখের পানি দেখা

মাত্র তার বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এখন ঠাণ্ডা হলেই বা লাভ কি ? সর্বনাশ যা হবার তাতো হয়েই গেছে। ছেড়া বইতো আর জোড়া লাগবে না। মৌসুমীকে সে কি জবাব দেবে তাই ভেবে মিলির চোখ আবার জলে ভরে উঠছে। সে ছেড়া বই চারদিকে ছড়িয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় ঢুকল ফরিদ।

ফরিদ, মিলির মামা। সাত বছর বয়স থেকে এই বাড়িতেই আছে। পাঁচ বছর আগে অঙ্কে অনার্স পাস করেছে। এম. এ. করেনি কারণ তার ধারণা তাকে পড়াবার মত বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নেই। এম. এ. পড়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট। বর্তমানে তার দিন কাটছে ঘুমিয়ে। অল্প যে কিছু সময় সে জেগে থাকে সেই সময়টায় সে ছবি দেখে। অধিকাংশই আর্ট ফ্লিম। কোন কোন ছবি ছয় সাত বার করেও দেখা হয়। বাকি জীবনটা সে এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে চায় কি-না জিজ্ঞেস করলে অত্যন্ত উচ্চ মার্গের একটা হাসি দেয়। সেই হাসি অতি মধুর, তবু কেন জানি সোবাহান সাহেবের গা জ্বলে যায়। ইদানীং ফরিদকে দেখা মাত্র তাঁর ব্রহ্মতালু গরম হয়ে উঠে, ঘাম হয়। আজও হল। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আগেকার আমলে মুনি ঋষিরা হয়ত এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্টদের ভস্ম করে দিতেন। ফরিদ তার দুলাভাইয়ের দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল,

What a lovely day.

ফরিদের খালি গা। কাঁধে একটা টাওয়েল। মুখ ভর্তি টুথপেস্টের ফেনা। কথা বলতে গিয়ে ফেনা তার গায়ে পড়ে গেল এতে তার মুগ্ধ বিস্ময়ের হের ফের হল না। সে আনন্দিত স্বরে বলল, দুলাভাই শরৎকালের এই শোভার কোন তুলনা হয় না। অপূর্ব! অপূর্ব! আমার মনটা দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে দুলাভাই। I am dissolving in the nature.

সোবাহান সাহেব মেঘ গর্জন করলেন, ফরিদ এসব কি হচ্ছে আমি জানতে পারি ?

'নেচারকে এপ্রিসিয়েট করছি দুলাভাই। নেচারকে এপ্রিসিয়েট করায় নিশ্চয়ই কোন বাধা নেই।'

'টুথপেস্টের ফেনায় সারা গা মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে সেই খেয়াল আছে ?'

'তাতে কিছু যায় আসে না দুলাভাই।'

'যায় আসে না ?'

'না।'

'খালি গায়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ, রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে তাতেও তোমার অসুবিধা হচ্ছে না ?'

'জ্বি না। পোশাক হচ্ছে একটা বাহুল্য।'

'পোশাক একটা বাহুল্য ?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি। আমি যখন খালি গা থাকি তখন প্রকৃতির কাছাকাছি থাকি। কারণ প্রকৃতি যখন আমাদের পাঠান তখন খালি গায়েই পাঠায়। এই যে আপনি জাব্বা জোব্বা পরে বসে আছেন এসব খুলে পুরো দিগম্বর হয়ে যান দেখবেন অন্য রকম ফিলিংস আসবে।'

স্তম্ভিত সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি আমাকে সব কাপড় খুলে ফেলতে বলছ ?

'জ্বি বলছি।'

সোবাহান সাহেব লক্ষ্য করলেন তাঁর ব্রহ্মতালুতে জ্বলুনি শুরু হয়েছে, গা ঘামছে। এসব হার্ট এ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ কিনা কে জানে। তাঁর মৃত্যু হার্ট এ্যাটাকে হবে একটা তিনি বুঝতে পারছেন, ফরিদের কারণেই হবে। কত অবলীলায় কথাগুলো বলে কেমন হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ফরিদ বলল, আপনি চোখ মুখ এমন শক্ত করে বসে আছেন কেন দুলাভাই ? আনন্দ করুন।

'আনন্দ করব ?'

'হ্যাঁ করবেন। জীবনের মূল জিনিসই হচ্ছে আনন্দ। এমন চমৎকার একটা সকাল। আচ্ছা দুলাভাই রবি ঠাকুরের ঐ গানটার কথাগুলো আপনার মনে আছে— আজি এ শারদ প্রভাতে— মনে আছে ?' প্রথম লাইনটা কি— আজি এ শারদ প্রভাতে, না-কি হেরিনু শারদ প্রভাতে ?'

সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি দয়া করে আমার সামনে আসবে না।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, কেন ?

'আবার কথা বলে, যাও বলছি আমার সামনে থেকে। বহিষ্কার, বহিষ্কার।'

'কি যন্ত্রণা আবার সাধু ভাষা ধরলেন কেন ? বহিষ্কার আবার কি ? বলুন বেড়িয়ে যাও। মুখের ভাষাকে আমাদের সহজ করতে হবে। দুলাভাই, তৎসম শব্দ যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।'

'যাও বলছি আমার সামনে থেকে। যাও বলছি।'

'যাচ্ছি। যাচ্ছি। বিনা কারণে আপনি এ রকম রেগে যান কেন এই ব্যাপারটাই আমি বুঝি না।'

ফরিদ চিন্তিত মুখে ঘরের ভেতর ঢুকল। সোবাহান সাহেবের স্ত্রী তার কিছুক্ষণ পর বারান্দায় এসে বললেন, তুমি কি মিলিকে কিছু বলেছ ? ও কাঁদছে কেন ?

সোবাহান সাহেবের মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল, একুশ বছর বয়েসী একটা মেয়ে যদি কথায় কথায় কেঁদে ফেলে তাহলে বুঝতে হবে দেশের নারী সমাজের চরম দুর্দিন যাচ্ছে।

'কথা বলছ না কেন, কিছু বলেছ মিলিকে ? মেয়ে বড় হয়েছে এখন যদি রাগারাগি কর।'

সোবাহান সাহেব শীতল গলায় বললেন, মিনু তোমাকে এখন একটা কঠিন কথা বলব, মন দিয়ে শোন— আমি তোমাদের সংসারে আর থাকব না।

'তার মানে, কোথায় যাবে তুমি ?'

'সেটা এখনো ঠিক করিনি। আজ দিনের মধ্যে ঠিক করব।'

মিনু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। সোবাহান সাহেব বললেন, একটা অপ্রিয় ডিসিসান নিলাম। বাধ্য হয়েই নিলাম।

'বনে জঙ্গলে গিয়ে সাধু সন্ন্যাসী হবে ?'

'এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না।'

সোবাহান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মিনু বললেন, যাচ্ছ কোথায় ?

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অতি দ্রুত গেট খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তার ওপাশেই এখন একটা মাইক ভাড়ার দোকান হয়েছে। সারাক্ষণ সেখানে থেকে "হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান— টু— থ্রী। হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান— টু— থ্রী হয়।" এখন হচ্ছে না। এখন তারা একটা রেকর্ড বাজাচ্ছে "হাওয়া সে উড়তা যারে মেরা লাল দু পাট্টা মলমল।" এই লক্ষ কোটি বার শোনা গান শুনে মেজাজ আরো খারাপ হবার কথা, তা হল না। সোবাহান সাহেব লক্ষ্য করলেন— গানটা শুনতে তাঁর ভাল লাগছে। তিনি এর কারণ বুঝতে পারলেন না। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, আকাশ ঘন নীল, নীল আকাশে সাদা মেঘের স্তূপ। আকাশ এবং মেঘ দেখতেও তাঁর ভাল লাগল। তাঁর মনে হল— মানব জীবন বড়ই মধুর। এই জীবনের আনন্দ হেলা ফেলার বিষয় নয়।

২

'মানব জীবন বড়ই মধুর' এই কথা সবার জন্যে সম্ভবত প্রযোজ্য নয়। গ্রীন ফার্মেসীর নতুন ডাক্তার মনসুর আহমেদের জন্যে তো অবশ্যই নয়। তার কাছে মনে হচ্ছে— মানব জীবন অর্থহীন যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম মনে করার আপাত দৃষ্টিতে তেমন কোন কারণ নেই। সে মাত্র ছয়মাস আগেই ইন্টার্নশীপ শেষ করে বের হয়েছে। এর মধ্যেই ভোলা উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটা চাকরিও পেয়েছে। ঢাকা ছেড়ে যাবার ইচ্ছা নেই বলে ঐ চাকরি সে নেয়নি। আপাতত সে গ্রীন ফার্মেসীতে বসছে। গ্রীন ফার্মেসীর মালিক কুদ্দুস সাহেব তাকে ফার্মেসীর উপরে দুটি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। মনসুর ঐ ঘর দুটিতে সংসার পেতে বসেছে। প্রতিদিন কিছু রুগী টুগীও পাচ্ছে। বড় কিছু না— সর্দি জ্বর, কাশি, ডায়রিয়া। একদিন অল্পবয়সী একটা মেয়েকে নিয়ে মেয়ের মা এসেছিলেন, চেংড়া ডাক্তার দেখে মেয়ের অসুখ প্রসঙ্গে কিছু বললেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, না থাক আপনাকে দেখতে হবে না। আমার দরকার একজন বয়স্ক ডাক্তার। আপনি তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, ডাক্তারদের কোন বয়স নেই আপা। ডাক্তার হচ্ছে ডাক্তার। আর এর বয়স কম হলে কি হবে জাত-সাপ।

www.BDeBooks.Com

জাত সাপের প্রতি রুগী বা রুগীনির মা কারোরই কোন আগ্রহ দেখা গেল না। রুগীনি বলল, আমি উনাকে কিছু বলব না মা।

এ রকম দু' একটা কেইস বাদ দিলে রুগী যে খুব খারাপ হচ্ছে তাও না। ভিজিটের টাকা চাইতে মনসুরের লজ্জা করে। ঐ দায়িত্ব কুদ্দুস সাহেব খুব ভাল ভাবেই পালন করছেন।

'দশ টাকা কি দিচ্ছেন ভাই ? উনার ভিজিক কুড়ি টাকা। বয়স কম বলে অশ্রদ্ধা করবেন না— গোল্ড মেডালিস্ট।'

মনসুর বিব্রত গলায় বলেছে, কুদ্দুস ভাই, সব সময় গোল্ড মেডেলের কথা বলেন। কোন মেডেল ফেডেল তো আমি পাই নি।

কুদ্দুস সাহেব নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেছেন, পাওয়ার দরকার নেই। মানুষের মুখেই জয়। মানুষের মুখেই ক্ষয়। মুখে মুখে মেডেলের কথাটা রটে যাক। স্যুটকেস খুলে কেউতো আর মেডেল দেখতে আসবে না।

'এসব মিথ্যা কথা বলে লাভ কি ?'

'নাম ফাটবেরে ভাই নাম ফাটবে। তোমার নাম ফাটা মানে ফার্মেসীর উন্নতি। ফার্মেসীর উপর বেঁচে আছি। ফর্মেসীর উন্নতি দেখতে হবে না ?'

কুদ্দুস সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফার্মেসীতে বসে থাকেন। সারাক্ষণ কথা বলেন। মানুষটাকে মনসুরের বেশ ভাল লাগে। তাঁর বকবকানি এবং উপদেশ শুনতেও মনসুরের খারাপ লাগে না।

'তোমার সবই ভাল বুঝলে ডাক্তার, তবে তোমার একটা বড় সমস্যা কি জান ? তোমার কোন উচ্চাশা নেই।'

'সেটা সমস্যা হবে কেন ?'

'এইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। দু' ধরনের মানুষের উচ্চাশা থাকে না, মহাপুরুষদের এবং বেকুবদের। তুমি এই দু'দলের কোন দলে সেটা বুঝতে পারছি না। সম্ভবত দ্বিতীয় দলে।'

'আমাকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই।'

'দরকার থাকবে না কেন, অবশ্যই আছে। এ রকম ইয়াং একজন ছেলে— গোল্ড মেডালিস্ট, অথচ তার কোন উচ্চাশা নেই—'

'কি মুশকিল গোল্ড মেডেলের কথা আবার বলছেন ?'

'ঐ একই হল। পেতেও তো পারতে। আমি যা বলছি তার সারমর্ম হচ্ছে— সুযোগ খুঁজতে হবে। বিলেত আমেরিকা যেতে হবে, এফ আর সি এস, এম আর সি পি হয়ে এসে রুগীদের গলা কেটে পয়সা করতে হবে। আলিশান দালান তুলতে হবে—'

'আমার এত সব দরকার নেই। আমি সুখেই আছি।'

'সুখে আছ ?'

'হ্যাঁ সুখে।'

মনসুর আসলেই সুখে আছে। তার উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব কিছু নেই। তার বাবা ময়মনসিংহ শহরে ওকালতি করেন। দেশের বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। ময়মনসিংহের এত বড় বাড়িতে মানুষ বলতে বাবা-মা এবং ছোট বোন নীলিমা। মনসুরকে টাকা রোজগার করে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না। উল্টা প্রতিমাসে মনসুরের বাবা এক হাজার করে টাকা পাঠিয়ে ছোট একটি চিঠি লিখেন। প্রতিটি চিঠির ভাষা এবং বক্তব্য এক।

বাবা মনু,

টাকা পাঠালাম। শরীরের যত্ন নেবে। তুমি ঢাকা শহরে কেন পড়ে আছ তা বুঝতে পারছি না। তোমার নিজের শহরে প্র্যাকটিস করতে অসুবিধা কি? একটা ভাল জায়গায় তোমার জন্য চেম্বার করে দেবার সামর্থ পরম করুণাময় আল্লাহতা'লা আমাকে দিয়েছেন পত্রপাঠ মন স্থির করে আমাকে জানাবে।
— ইতি তোমার আব্বা।

পুনশ্চ ১ঃ আরো টাকার দরকার হলে লিখবে। এই নিয়ে সংকোচ করবে না। টাকা-পয়সা তোমাদের জন্যেই।

পুনশ্চ ২ঃ তোমার মার ইচ্ছা তোমার একটা বিবাহ দেন। ব্যাপারটা ভেবে দেখ। তোমার এখন পঁচিশ চলছে। আমি চব্বিশ বছর বয়সে তোমার মাকে বিবাহ করি। বিবাহের জন্যে এটাই উপযুক্ত বয়স।

পুনশ্চ ৩ঃ তোমার নিজের কোন পছন্দ থাকলে আমাদের কোনই আপত্তি নাই, এটা তোমাকে বলে রাখলাম।

বাবার চিঠির সঙ্গে মা'র চিঠি থাকে। সেই চিঠিতে নানান অবান্তর কথার সঙ্গে একটি মেয়ের কথা থাকে। পুরো চিঠি জুড়ে থাকে সেই মেয়ের রূপ এবং গুণের বর্ণনা এবং সেই রূপবতী এবং গুণবতীর কয়েকটি রঙ্গীন ছবি।

গত সপ্তাহের চিঠিতে যে মেয়ের কথা ছিল তার নাম রূপা।

মনসুরের মা লিখেছেন—

বাবা মনু, এই মেয়েটির দিকে একবার তাকাইলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। বড়ই রূপবতী মেয়ে। আচার ব্যবহারেও চমৎকার। এই সবই হয়েছে বংশের গুণ। মেয়ের মাতুল বংশ খুবই উচ্চ। নান্দাইল রোডের সরদার পরিবার। এক ডাকে সবাই চিনে। মেয়ে মমিনুন্নেসা কলেজে বি এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। মেট্রিক ফার্স্ট ডিভিসন এবং জেনারেল অংকে লেটার পেয়েছিল। অসুখ নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেয়ার ফল বেশি ভাল হয় নাই। মেয়ে খুব ভাল গান গায়। কলেজের সব ফাংশনে নজরুল গীতি গায় এবং খুব প্রশংসা পায়। মেয়ের তিনটি ছবি পাঠালাম। তোমার পছন্দ হলে আরো কথাবার্তা বলব।

চিঠির সঙ্গে খুব সেজেগুজে তোলা তিনটা ছবি। একটা ছবিতে সে টেলিফোন তুলে কার সঙ্গে কথা বলছে। একটায় অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর দিকে

www.BDeBooks.Com

অর্থাৎ ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য ছবিটা ফুলের বাগানে তোলা। আউট অব ফোকাস হওয়ায় মেয়েটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, ফুলগুলো বড় সুন্দর এসেছে।

এসব চিঠি এবং চিঠির সঙ্গে ছবি পেতে মনসুরের মন্দ লাগে না। ভালই লাগে। কোন এক লজ্জাবনত তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে এই কল্পনাও তার কাছে মধুর বলে মনে হয়।

গ্রীন ফার্মেসীর জীবন এবং তার সঙ্গে মধুর কিছু কল্পনায় তার সময় ভালই কাটছিল। একটা মেয়ে হঠাৎ করে এসে সব এলোমেলো করে দিল। ঐ মেয়েটার কারণে ক'দিন ধরেই মনসুরের মনে হচ্ছে— মানব জীবন একটা যন্ত্রণা বিশেষ। তার রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না। হজমের অসুবিধা হচ্ছে। ঘটনাটা এ রকম—

গত বুধবারে খুব মেঘলা ছিল। দুপুরে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। কুদ্দুস সাহেব ভাত খেতে গেছেন। দোকানের এক কর্মচারী মজনু বলল, স্যার আপনি একটু বসেন আমি লন্ড্রী থেকে কাপড় নিয়ে আসি। মনসুর বলল, যাও আমি আছি। মজনু চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে এসে ঢুকল। পরণে সাধারণ নীল রঙের একটা শাড়ি। মাথার চুল খোপা করা। খোপা ভাল করে করা হয়নি— চুল এলোমেলো হয়ে আছে। মেয়েটির দিকে তাকিয়েই মনসুরের কেমন যেন লাগতে লাগল। এমন সুন্দর মানুষ এই পৃথিবীতে আছে ? ছেলেবেলার রূপকথার বইয়ে যেসব বন্দিনী রাজকন্যার ছবি থাকে এই মেয়ে তার চেয়েও লক্ষ গুণ সুন্দর। কেমন মায়া মায়া চোখ, সমস্ত চেহারায় কি অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধ ভাব। মেয়েটা এত সুন্দর যে তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত মনসুরের কষ্ট হচ্ছে।

মেয়েটা নরম স্বরে বলল, আপনাদের কাছে স্যাভলন বা ডেটল জাতীয় কিছু আছে ?

মনসুর কাঁপা গলায় বলল, জ্বি আছে।

'মাঝারি সাইজের একটা ফাইল দিন।'

'এক্ষুণি দিচ্ছি। আপনি বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন।'

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, বসতে হবে কেন ? জিনিসটা দিন চলে যাই। দাম কত ?

মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, দাম লাগবে না।

মেয়েটি আরো অবাক হয়ে বলল, দাম লাগবে না কেন ?

'না মানে কোম্পানি থেকে আমরা অনেক স্যাম্পল ফাইল পাইতো— এটা হচ্ছে একটা স্যাম্পল ফাইল।'

মেয়েটি বিরক্ত গলায় বল, স্যাম্পল ফাইল আমাকে দেবার দরকার নেই অন্য কাউকে দেবেন। দাম কত বলুন ?

'দামতো আমি জানি না।'

'দাম জানেন না মানে ?'

'আমাদের কর্মচারি লন্ড্রীতে গেছে। ও সব জানে। এক্ষুণি এসে পড়বে।'

'আপনি তাহলে কে?'

'আমি ডাক্তার। মানে এই ফার্মেসীতে বসি। সকাল বিকাল দু'বেলাই থাকি। আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন।'

'বসতে পারব না আমার তাড়া আছে। আমার মা বটিতে হাত কেটে ফেলেছেন। হাতে ডেটল দিতে হবে।'

মনসুর অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে বলল, চলুন যাই ড্রেস করে দিয়ে আসি। কাটা ছেড়া ছোট হলেও একে অবহেলা করা ঠিক না। সেপটিকে হয়ে যেতে পারে।

মেয়েটি খুবই অবাক হল। কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকাতে লাগল। শান্ত গলায় বলল, মা'র হাতের কাটা এমন কিছু না।

মজনু এই সময় ফিরে এল। মেয়েটা টাকা দিয়ে স্যাভলনের শিশি হাতে নিয়ে চলে গেল। মনসুরের সারাটা দিন আর কোন কাজে মন বসল না। আশ্চার্যের ব্যাপার সেই রাতে সে ঘুমাতে পারল না। একটা মেয়েকে একবার দেখে কারোর এমন হয়?

দ্বিতীয় দিনে মেয়েটির সঙ্গে আবার দেখা। বই খাতা নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ে মনসুর বের হয়েছিল সিগারেট কিনতে। মনসুর জীবনে যা কোনদিন করেনি তাই করল, এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার মা ভাল আছেন?

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে বলছেন?

মনসুর থতমত খেলে বলল, জ্বি।

'আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।'

'আমি গ্রীন ফার্মেসীতে বসি। ডাক্তার। আপনি এক বোতল স্যাভলন কিনে নিয়ে গেলেন। আপনার মা'র হাত কেটে গিয়েছিল।'

'ও আচ্ছা মনে পড়েছে। মা ভাল আছেন। আমি এখন যাই, কেমন?'

মেয়েটি তাকে চিনতে পারল না এই দুঃখে দ্বিতীয় রাতেও মনসুরের ঘুম এল না। দুটা সিডাকসিন খেয়েও সে সারা রাত জেগে কাটাল। মেয়েটির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সে এখন জানে। তার নাম মিলি। ভাল নাম ইয়াসমীন। ইকনমিক্সে অনার্স পড়ে— সেকেন্ড ইয়ার। যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির নাম নিরিবিলি। বাড়ির গেটে একটা সাইবোর্ড ঝুলে, সেখানে লেখা— কুকুর হইতে সাবধান। যদিও সে বাড়িতে কুকুর নেই। মেয়েটি বিকেলে বাড়ির ছাদে একা হাঁটাহাঁটি করে। সে ইউনিভার্সিটিতে যায় সকাল আটটায়। রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটে যায়। তারপর রিকশা নেয়। রিকশার হুড তুলে না। সব সময় শাড়ি পরে। মেয়েটার নিশ্চয়ই অনেক শাড়ি। এখন পর্যন্ত এক শাড়ি দু'বার পরতে মনুসর দেখেনি। মেয়েটি ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরে। অবশ্যি সে বেশ লম্বা, হিল পরবার তার প্রয়োজন নেই।

মেয়েটি তাকে চিনতে পারে কি-না এটা পরীক্ষা করবার জন্যে আজ সকালে সে মেয়েটার ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় সামনাসামনি পরে গেল। মেয়েটি চোখ তুলে তাকে দেখল। মনসুর কাঁপা গলায় বলল, ভাল আছেন?

www.BDeBooks.Com

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, আমাকে বলছেন ?

মেয়েটির চোখে অপরিচিতের দৃষ্টি। লজ্জায় এবং দুঃখে মনসুরের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আর তখন মেয়েটি বলল, ও আচ্ছা আপনি গ্রীন ফার্মেসীর ডাক্তার সাহেব। জ্বি আমি ভাল।

মনসুর হড়বড় করে বলল, আপনার মায়ের সেই কাটাটা কি সেরেছে ?

মেয়েটি এই প্রশ্নে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। তারপর আর কোন কথা না বলে রিকশায় উঠে গেল। রাগে এবং লজ্জায় মনসুরের ইচ্ছা করল লাইট পোস্টে নিজের মাথা সজোরে ঠুকে দেয়। কেন সে বোকার মত তার মা'র হাত কাটার কথা জিজ্ঞেস করল ? মেয়েটি নিশ্চয়ই তার বোকামী নিয়ে মনে মনে হাসছে। কে জানে বাড়িতে গিয়ে তার মাকেও হয়ত বলবে। কি লজ্জা। কি লজ্জা।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, তোমার কি হয়েছে মনসুর বল তো।

'কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি বললে তো আমি বিশ্বাস করব না। কিছু একটা হয়েছে তো বটেই— রাতে ঘুম হয় ?'

'ঘুমের একটু অসুবিধা হচ্ছে ?'

'বদ হজমও হচ্ছে তাই না ?'

'জ্বি।'

'মনে হচ্ছে পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা—ঠিক না ?'

'জ্বি।'

'সবই খুব পরিচিত লক্ষণ। আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন আমার মধ্যে এসব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। এটা একটা জীবাণু ঘটিত অসুখ।'

'হ্যাঁ জীবাণু ঘটিত। এ সব জীবাণুর উৎপত্তি হয় কেন এক সুন্দরী তরুণীর চোখে। জীবাণুর নাম হচ্ছে প্রেম-জীবাণু। ইংরেজিতে বলে Love bug, 'ঠাট্টা করছি না ভাই, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। জীবাণুর প্রথম আক্রমণে নার্ভাস সিস্টেম উইক হয়ে যায়। তারপর লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

'কি সে বলেন।'

'সত্যি কথা বলছি রে ভাই। খুবই সত্যি কথা— এখন বল মেয়েটা কে ?'

'কেউ না।'

'সোবাহান সাহেবের মেয়ে মিলি নাতো ?'

মনসুরের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। কুদ্দুস সাহেব বললেন, আগেই সন্দেহ হয়েছিল এখন তোমাকে দেখে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম। তোমার অবস্থাতো দেখি কাহিল।

মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনি যা ভাবছেন তা না।

'আমি কিছুই ভাবছি না। ভাবাভাবির ফাঁক তুমি রাখনি। এখন আমার উপদেশ শোন, সহজ পাচ্য খাবার খাবে। বেশি করে ডাবের পানি খাবে। সকাল

বিকাল লাইট একসারসাইজ। প্রেম জীবাণু ঘটিত অসুখের কোন চিকিৎসা নেই। জীবাণুগুলো ভাইরাস টাইপ, কোন ওষুধেই কাজ করে না। সময়ে রোগ সারে। টাইম ইজ দ্যা বেস্ট হিলার। সতীনাথের বিরহের গানগুলো শুনতে পার। এতেও অনেক সময় আরাম হয়— ঐ যে আমি এধারে তুমি ওধারে, মাঝে নদী কুলকুল বয়ে যায় টাইপ গান।

'ঠাট্টা করবেন না কুদ্দুস ভাই। ঠাট্টা তামাশা ভাল লাগে না।'

'ঠিক বলেছ, এই সময় ঠাট্টাটা অসহ্য লাগে। কেউ ঠাট্টা করলে ইচ্ছা করে টান দিয়ে জিভ ছিড়ে ফেলি। রোগের কঠিন সংক্রমণের সময় এটা হয়। অল্পতেই নার্ভ ইরিটেটেড হয়।'

মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, আমাকে কি করতে বলেন?

'কিছুই করতে বলি না। মিলি অল্প বয়েসী মেয়ে হলে চিঠি লিখতে বলতাম— এর সেই স্টেজ পার হয়ে এসেছে। চিঠি লিখলে সবাই সেই চিঠি পড়ে শুনাবে এবং হাসাহাসি করবে। তুমি যদি আগবাড়িয়ে কথা বলতে চাও, তোমাকে ভাববে ভ্যাবলা। এক মনে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া তো আমি আর কোন পথ দেখি না। যাকে বলে আধ্যাত্মিক চেষ্টা। মাঝে মাঝে এই চেষ্টায় কাজ হয়। দৈব সহায় হয়। হঠাৎ হাতে দেখবে মেয়েটা রিকসা এ্যাকসিডেন্ট করেছে। ধরাধরি করে তাকে এইখানে আনা হল। তুমি ফার্স্ট এইড দিলে। দেখা গেল অবস্থা সুবিধার না। তুমিই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে। মেয়েটাকে ব্লাড দিতে হবে। ব্লাড গ্রুপ এ পজেটিভ। দেখা গেল তোমারও তাই। তুমি ব্লাড দিলে। মেয়েটি করুণ গলায় বললে, আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন। আপনাকে ধন্যবাদ। তুমি গাঢ় গলায় বললে, ধন্যবাদ পরে হবে আগে সুস্থ হয়ে উঠ।

মনসুর বলল, চুপ করুনতো কুদ্দুস সাহেব, আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে না।

কুদ্দুস সাহেব বললেন, সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। করব কি বল, কথা বলা হয়ে গেছে অভ্যাস। তোমার অবস্থা দেখে খারাপও লাগছে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। তাতে যদি কিছু হয়।

কিছু হল না। প্রেমের ক্ষেত্রে দৈব কখনোই সহায় হয় না। গল্পে, সিনেমায় হয়। জীবনটা গল্প সিনেমা নয়। জীবনের নায়িকারা, নায়কদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলেও চিনতে পারে না। স্যাভলনের শিশি কিনতে একবারই ফার্মেসীতে আসে দ্বিতীয়বার আসে না। গল্পে উপন্যাসে নায়িকারা ঘন ঘন অসুখে পড়ে। ডাক্তার নায়ক তখন চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলে। বাস্তবের নায়িকাদের কখনো কোন অসুখ হয় না, আর হলেও অন্য ডাক্তাররা তার চিকিৎসা করেন।

অবশ্যি মনসুরের বেলায় দৈব সহায় হল। শরৎকালের এক সন্ধ্যায় তার ডাক পড়ল নিরিবিলিতে। সোবাহান সাহেবের প্রেসার মাপতে হবে। তাঁর প্রেসার হাই হয়েছে। মাথা ঘুরছে। ব্লাড প্রেসার নামক ব্যাধিটির উপর

www.BDeBooks.Com

কৃতজ্ঞতায় মনসুরের মন ভরে গেল। বারান্দায় মিলি দাঁড়িয়েছিল। এও এক অকল্পনীয় সৌভাগ্য। বারান্দায় সে নাও থাকতে পারত। মিলির সঙ্গে দেখা না হলেও কিছু করার ছিল না। মিলির জন্যে তো আর তাকে ডাকা হয়নি। মিলি বলল, স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

মনসুর হতভম্ব। বলে কি এই মেয়ে। এই কথাগুলো কি সত্যি সত্যি বলছে না মনসুর কল্পনা করছে? কল্পনা হওয়াই সম্ভব। নিশ্চয়ই কল্পনা। হেলসিনেশন।

'আপনাকে বলেছে বোধ হয় বাবার ব্লাড প্রেসার মাপার জন্যে আপনাকে খবর দেখা হয়েছে।'

'জ্বি বলেছে।'

'আপনার সঙ্গে একটা গোপন ষড়যন্ত্র করার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি।'

'জ্বি বলুন। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

'যদি দেখেন বাবার প্রেসার খুব হাই না তবু বলবেন হাই। বাবার রেস্টের দরকার। ভয় না দেখালে তিনি রেস্ট নেবেন না। আপনি মিথ্যা করে বলতে পারবে না?'

'জ্বি না।'

মিলির দৃষ্টি তীব্র হল। মনসুর বলল, আমি মিথ্যা বলতে পারি না।

'মিথ্যা বলতে পারেন না?'

'জ্বি না।'

'ও আচ্ছা, আমার জানা ছিল না। আপনাকে দেখে আর দশটা সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়েছিল, যারা প্রয়োজনে কিছু মিথ্যা-টিথ্যাও বলতে পারে। আপনি যে অসাধারণ তা বুঝতে পারি নি।'

'আপনি কি রাগ করলেন?'

'কথায় কথায় রাগ করা আমার স্বভাব না। আসুন, দোতলায় যেতে হবে। বাবা দোতলায়।' সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠার পর মনসুর নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল, একটা ভুল হয়ে গেছে।

'কি ভুল?'

'প্রেসার মাপার যন্ত্র ফেলে এসেছি।'

'সেকি, প্রেসার মাপার জন্যেইতো আপনাকে ডাকা হয়েছে— সেই জিনিসই আপনি ফেলে এসেছেন? আপনি মানুষ হিসেবে শুধু যে অসাধারণ তাই না, মনে হচ্ছে খুব ভুলো মন।'

'আমি এক দৌড়ে নিয়ে আসব। যাব আর আসব।'

'আপনাকে যেতে হবে না। আমি কাদেরকে পাঠাচ্ছি, ও নিয়ে আসবে।'

'না না আমিই যাই। এক মিনিট।'

মনসুর অতি দ্রুত সিঁড়ি টপকাচ্ছে। সেই দ্রুত সিঁড়ি ভাঙা দেখে মিলির মনে হল— একটা একসিডেন্ট হতে যাচ্ছে, হবেই হবে। না হয়েই যায় না। আর তখনি হুড়মুড় শব্দ হল। ডাক্তার সাহেব মাঝ সিঁড়ি থেকে বলের মত গড়িয়ে নিচে নামতে লাগলেন। শব্দ শুনে সোবাহান সাহেব এবং মিনু বেরিয়ে এলেন, ফরিদ বেরিয়ে এল, বাসার কাজের ছেলে কাদের ছুটে এল।

সোবাহান সাহেব বললেন, এ কে ?

মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব। তোমার প্রেসার মাপতে এসেছেন।

'প্রেসার মাপতে এসে মাটিতে শুয়ে থাকার কারণ কি ?'

'পা পিছলে পড়ে গেছেন বাবা।'

'পা পিছলে পড়েছে টেনে তুলবি না ? হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

মিলিকে টেনে তুলতে হল না, মনসুর নিজেই উঠল। সার্টের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, একদম ব্যথা পাইনি। সত্যি বলছি।

তার চারপাশের লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। সোবাহান সাহেব কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মনসুর বলল, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাব। সোবাহান সাহেব বললেন, অবশ্যই খাবে। মিলি একে নিয়ে ফ্যানের নিচে বসা। কাদের এগিয়ে এসে বলল, আমারে ধইরা ধইরা হাঁটেন ডাক্তার সাব। চিন্তার কিছু নাই, উপরে আল্লা নিচে মাটি।

নিচে মাটি এমন কোন লক্ষণ মনসুর পাচ্ছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে সে চোরাবালির উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পা ডেবে ডেবে যাচ্ছে। ঘরটাও মনে হচ্ছে একটু একটু দুলছে। কে যেন বলল, 'বাবা তুমি এখানে বস।'

কে বলল কথাটা ? ঐ মহিলা না ? ইনি বোধ হয় মিলির মা। তাকে কি সালাম দেয়া হয়েছে ? স্লামালিকুম বলা দরকার না ? দেরী হয়ে গেছে বোধ হয়। দেরী হলেও বলা দরকার।

'নিন পানি নিন।'

মনসুর পানি নিল। নিয়েই ক্ষীণ স্বরে বলর, স্লামালিকুম। বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। কথা এমন জিনিস একবার বলা হয়ে গেলে ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মনসুর লক্ষ্য করল তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। সে নিশ্চয়ই খুব উল্টা পাল্টা কিছু বলেছে। টেনশনের সময় তার মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মনসুর অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্যে শব্দ করে হাসল। অবস্থা স্বাভাবিক হল না মনে হল আরো খারাপ হয়ে গেল।

ফরিদ বলল, ছোকরার মনে হয় ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে। কেমন করে হাসছে দেখুন না দুলাভাই। অবিকল পাগলের হাসি। সোবাহান সাহেব বললেন, একজন ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার।

ফরিদ বলল, ডাক্তার কিছু করতে পারবে বলেতো মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা ব্রেইন হেমারেজ। হোয়াট এ পিটি, এ রকম ইয়াং এজ।

www.BDeBooks.Com

৩

আনিস অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে ভয়ঙ্কর একটা রাগের ভঙ্গি করতে। যা দেখে তার আট বছরের ছেলে টগর আঁৎকে উঠবে এবং মুখ কাচুমাচু করে বলবে, আর করব না বাবা। টগর যা করেছে তাকে ক্ষমা করার কোন প্রশ্নই উঠে না। সে ফায়ার ব্রিগেড খেলা খেলছিল। আগুন ছাড়া একরম খেলা হয় না, কাজেই অনেক কষ্টে সে বিছানার চাদরে আগুন ধরাল। তাকে সাহায্য করছিল তার ছোট বোন নিশা যার বয়স পাঁচ হলেও এই জাতীয় কাজ খুব ভাল পারে। খেলার দুটি অংশ, প্রথম অংশে বিছানার চাদর এবং জানালার পর্দায় আগুন লেগে যাবে, নিশা তার খেলনা টেলিফোন কানে নিয়ে বলবে, হ্যালো, আমাদের বাসায় আগুন লেগে গেছে। তখন শুরু হবে খেলার দ্বিতীয় অংশ— টগর সাজবে ফায়ার ম্যান। বাথরুম থেকে নল দিয়ে সে পানি এনে চারদিকে ছিটিয়ে আগুন নেভাবে। বেশ মজার খেলা।

খেলার প্রথম অংশ ভালমত শুরু হবার আগেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তিন তলার ভাড়াটে ছুটে এলেন। একতলা থেকে বাড়িওয়ালা এলেন এবং ঘন ঘন বলতে লাগলেন, কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ।

আনিস গিয়েছিল বাড়ির খোঁজে। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে। গত মাসেই বাড়ি ছাড়ার কথা। এখনো কিছু পাওয়া যায়নি বলে বাড়ি ছাড়া যাচ্ছে না। বাড়িওয়ালার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এবার তিনি আর মুখের কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। পাড়ার ছেলেপুলে দিয়ে তুলে দেবেন। গত সপ্তাহে খুব ভদ্র ভাষায় এ জাতীয় সংগীত দেয়াও হয়েছে।

সারাদিন বাড়ি খুঁজে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে বাসায় ফিরে টগর এবং নিশার নতুন কীর্তি শোনার পরে মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। আনিসের মেজাজ যথেষ্টই খারাপ, কিন্তু তা সে ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। টগরের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়া খুবই প্রয়োজন, হাত উঠছে না। বাচ্চা দুটির মা এক বছর আগে মারা গেছে। মা নেই দুটি শিশুর উপর রাগ করার কিংবা তাদের শাসন করা বেশ কঠিন ব্যাপার। আনিসের বেলায় তা আরো কঠিন কারণ রাগ তার স্বভাবে নেই। সে এক দৃষ্টিতে টগরের দিকে তাকিয়ে আছে। টগর খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছে তবে খুব ঘাবড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে না।

'টগর!'

'জ্বি বাবা!'

টগর যা করে নিশার ঠিক সেই জিনিসটিই করা চাই, কাজেই সেও বলল, জ্বি বাবা।

আনিস বলল, নিশা মা, তুমি এখন কোন কথা বলবে না। টগরের সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। ওকে আমি যা বলব তা খুব মন দিয়ে শুনবে।

'টগর!'

'ঘরে আগুন লাগিয়েছিলে ?'

'নাতো— বিছানার চাদরে লাগিয়েছিলাম। আর নিশাকে বলেছিলাম জানালার পর্দায় লাগাতে।'

'কি জন্যে ?'

আমরা ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিস খেলছিলাম।'

'খেলতে আগুন লাগে ?'

'অন্য খেলায় লাগে না। ফায়ার সার্ভিস খেলায় লাগে। আগুন না লাগলে নেভাব কি করে ?'

'আমি খুব রাগ করেছি টগর। এত রাগ করেছি যে আমার গা কাঁপছে রাগে।'

'কই বাবা, গা তো কাঁপছে না।'

'তোমরা দু'জন খুবই অবাধ্য হয়েছে। আমার কোন কথা তোমরা শোন না। রোজ অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেলা খেল। দু'দিন আগে দোতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লে।'

'দোতলার ছাদ থেকে তো লাফ দেই নি। গ্যারাজের উপর থেকে লাফ দিয়েছি। নিচে বালি ছিল। একটুও ব্যথা পাইনি। বালি না থাকলে লাফ দিতাম না।'

'তোমাদের কখনো আমি কোন শাস্তি দেই না বলে এই অবস্থা হয়েছে। আজ তোমাদের শাস্তি দেব।'

'কি শাস্তি ?'

'তুমি নিজেই ঠিক কর কি শাস্তি। আমি কিছু বলব না।'

'এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকব বাবা ?'

'বেশ দাঁড়াও।'

টগর এবং নিশা দু'জনই উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। দেখা গেল শাস্তি গ্রহণে দু'জনেরই সমান আগ্রহ। এই শাস্তিতে তারা বেশ মজা পাচ্ছে বলেও মনে হল। মিটিমিটি হাসছে—

'টগর!'

'জ্বি বাবা!'

'একটা কথা তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে কথাটা হচ্ছে—

আনিস তার দীর্ঘ বাক্য শেষ করতে পারল না, বাড়িওয়ালার ভাগ্নে এসে বলল, আপনাকে মামা ডাকে। আনিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ওঠে দাঁড়াল। বাড়িওয়ালার সঙ্গে বকবক করতে তার মোটেই ইচ্ছা করছে না। উপায় নেই, ইচ্ছা না করলেও বকবক করতে হবে।

আনিসের বাড়িওয়ালার নাম মির্জা সুলায়মান। ভাড়াটেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল। শুধু ভাল না, বেশ ভাল। সুলায়মান সাহেবের ব্যবহার অতি মধুর। হাসি হাসি মুখ না করে তিনি কোন কথা বলেন না। ভাড়াটেদের যখন ডেকে পাঠান তখন বসার ঘরের টেবিলে নানান ধরনের খাবার দাবার তৈরি থাকে।

www.BDeBooks.Com

আনিস বাড়িওয়ালার বসার ঘরে ঢুকে দেখল টেবিলে ঠাণ্ডা পেপসির গ্লাস, প্লেটে ফ্রুট কেক। সুলায়মান সাহেবের বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও তিনি তার সব ভাড়াটেদের ডাকেন— বড় ভাই। কেউ এই নিয়ে কিছু বললে তিনি বলেন, এটা হচ্ছে আমার দস্তুর। আমার পিতাজীর কাছ থেকে শিখেছি। পিতাজী সবাইকেই বড় ভাই ডাকতেন।

সুলায়মান সাহেব তার দস্তুর মত আনিসকে দেখে হাসি হাসি মুখ করে বললেন, বড় ভাই সাহেব আছেন কেমন ?

'জ্বি ভাল।'

'আপনার পুত্রতো সর্বনাশ করে দিয়েছিল। দোতলায় উঠে দেখি বুন্দা বুন্দা ধোঁয়া। কোথায় আমাকে দেখে ভয় পাবে তা না উল্টা ছেলে আমাকে বলে— আপনি এখন যান, আমরা খেলছি। আপনাকে দেখে মনেই হয় না যে আপনার এমন বিচ্ছু ছেলেমেয়ে আছে।

আনিস গম্ভীর গলায় বলল, আপনি আপনার বাবার মত হয়েছেন, সবাই সে রকম হয় না।

'খুবই খাঁটি কথা। তাছাড়া বড় ভাই সাহেব একটা ব্যাপার কি জানেন ? অল্প বয়সে মা মারা গেলে ঘাড়ের একটা রগ তেড়া হয়ে যায়। ওদের তাই হয়েছে। রগ হয়ে গেছে তেড়া।'

'হতে পারে।'

'এদের সামলাবার জন্যে আপনার একটা বিবাহ করা দরকার। ঘরের শাসন হচ্ছে আসল শাসন। নেন কেক মুখে দেন। ফ্রেঞ্চ বেকারীর কেক। একশ টাকা পাউন্ড।'

আনিস কেক মুখে দিল। সুলায়মান সাহেব মধুর গলায় বললেন, অনেক পুরুষ আছে যারা মনে করে সংসারে সৎ মা এলে ছেলেপুলেদের উপর অত্যাচার হবে। কথা ঠিক। অত্যাচার হয়। তবে বুঝে সুঝে বউ আনলে হয় না।

'আমি বুঝে সুঝেই আনব।'

'বুদ্ধি কম এমন মেয়ে বিবাহ করতে হবে। বুদ্ধি কম মেয়ে মুখের একটা মিষ্টি কথাতেই খুশি হয়। এদের খুশি করা খুব সোজা। নিউমার্কেট থেকে আসার পথে এক টাকা দিয়ে একটা ফুলের মালা কিনে নিয়ে গেলেন— এতেই খুশি আর বৌ যদি বুদ্ধিমতী হয় তাহলে কিছুতেই খুশি হবে না। জ্বালিয়ে মারবে। বোকা স্ত্রী সংসার হচ্ছে সুখের সংসার।'

আনিস বলল, বোকা মেয়ে পাওয়াইতো মুশকিল। সব মেয়েরেই বুদ্ধি বেশি।

'বড় ভাই সাহেব, ভুল কথা বললেন, পুরুষের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি অনেক কম।'

'তাই-না-কি ?'

'হ্যাঁ। আমার মুখের কথা না, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। একজন পুরুষ মানুষের ব্রেইনের ওজন হচ্ছে ১.৩৭৫ গ্রাম। আর একজন মেয়ে মানুষের ১,২২৫ গ্রাম। একশ পঞ্চাশ গ্রাম।'

'এই তথ্য পেয়েছেন কোথায় ?'

'খোঁজ-খবর রাখি বড় ভাই। একেবারে মূর্খতো না। কই, এখানে চা দিল না।'

'পেপসি খেলামতো আবার চা কেন ?'

'পেপসি খেলেন পানির বদলে। চা ছাড়া নাস্তা শেষ হয় না-কি ? হয় না।'

আনিস নাস্তার শেষে চা-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সুলায়মান সাহেব বললেন, বড় ভাই সাহেব, এবার একটু কাজের কথা বলি।

'বলুন।'

'ফ্ল্যাটটা যে বড়ভাই ছেড়ে দিতে হয়।'

'ছেড়ে দেব। বাড়ি খুঁজছি। বিশ্বাস করুন খুঁজছি। পাওয়া মাত্র ছেড়ে দেব।'

'বুধবারের মধ্যেই যে ছেড়ে দিতে হয় ভাই সাহেব। আমি একজনকে জবান দিয়ে ফেলেছি, সে বুধবারে বাড়িতে উঠবে। জবান তো বড় ভাই সাহেব রক্ষা করতে হয়।'

'আমি যদি এর মধ্যে কিছু খুঁজে না পাই— আমি যাব কোথায় ?'

'আমি আমার একটা ঘর ছেড়ে দিব। মেহমান হিসেবে কয়েকদিন থাকবেন।'

চা এসে গিয়েছে। আনিস চা-য়ে চুমুক দিল। কি বলবে ভেবে পেল না।

'বড় ভাই সাহেব।'

'জ্বি বলুন।'

'বলতে শরম লাগছে— না বলেও পারছি না। আপনার কাছে তিন মাসের ভাড়া পাওনা আছে। বলেছিলেন একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'অবশ্যই করব।'

'তা করবেন জানি। কিন্তু ভাইসাহেব যাওয়ার আগে পরিশোধ করে যাওয়াটা কি ভাল না। একবার চলে গেলে আপনার হয়ত মনে থাকবে না।'

আনিস তিক্ত গলায় বলল, এই মুহূর্তে আমার হাত একেবারে খালি তবে স্ত্রীর কিছু গয়না আছে। ঐগুলো বিক্রি করে হলেও আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব।

'এইটা খুব ভাল কথা বলেছেন। যে পুরুষ ঋণ রেখে এক কদম পা ফেলে না, সে হচ্ছে সাচ্চা পুরুষ। বড় ভাই সাহেব, আমার একটা পরিচিত গয়নার দোকান আছে। আপনি যদি চান আপনাকে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে যাব আপনার সঙ্গে।'

'কাল বিকালে কি আপনার সময় হবে ?'

'হবে। এখন তাহলে উঠি ? না-কি আরো কিছু খাওয়াবেন ?'

সুলায়মান সাহেব হো হো করে অনেকক্ষণ হাসলেন। যেন এরকম মজাদার কথা অনেকদিন শোনেননি। আনিস শীতল গলায় বলল, এরকম শব্দ করে

www.BDeBooks.Com

হাসবেন না সুলায়মান সাহেব। শব্দ করে হাসলে হার্টে প্রেসার পড়ে। আপনার যা বয়স তাতে হার্টে বাড়তি প্রেসার দেয়াটা ঠিক হবে না।

'সত্যি বলছেন ?'

'হ্যাঁ সত্যি। হাসাহাসি একেবারেই করবেন না। সব সময় মন খারাপ করে বসে থাকবেন তাহলেই দেখবেন হার্ট ভাল থাকবে, অনেক দিন বাঁচতে পারবেন।'

'অনেক দিন বাঁচতে ইচ্ছা করে না। যত তাড়াতাড়ি কবরে যেতে পারব ততই ভাল।'

'তাড়াতাড়ি কবরে চলে গেলে এই যে টাকা পয়সা রোজগার করছেন সেগুলো ভোগ করবে কে ? ভোগ করবার জন্যেই তো আপনার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা দরকার।'

'আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।'

'হ্যাঁ করছি।'

'হাসলে হার্টের উপর চাপ পড়ে ঐটাও তাহলে ঠাট্টা ?'

'না ঐটা ঠাট্টা না। ঐটা সত্যি। যে কারণে হাসি খুশী মানুষদের বেশি দিন বাঁচতে দেখা যায় না। বেঁচে থাকে খিট খিটে গম্ভীর মানুষজন। দেখেন না পৃথিবী ভর্তি বদমেজাজী বুড়ো-বুড়ি।'

'কথাটাতো ভাইসাহেব খুব ভুল বলেন নাই।'

'কথা আমি সচরাচর ভুল বলি না। আচ্ছা আজ তাহলে যাই। কাল সন্ধ্যায় দেখা হবে। এক সঙ্গে গয়নার দোকানে যাব।'

'ইনসাআল্লাহ।'

হাসির ব্যাপারটা মনে রাখবেন। হাসি সম্পূর্ণ বন্ধ। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হলে রাম গরুর ছানা হতে হবে।'

নিজের ঘরে ঢুকে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। টগর এখনো একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশা রণে ভঙ্গ দিয়ে ছবি আঁকছে। বাবাকে দেখে নিশা বলল, টগর ভাইয়ার শাস্তি আর কতক্ষণ হবে বাবা ?

আনিস বলল, শাস্তি শেষ।

টগর বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। আনিস বলল, পা ব্যথা করছে ?

'হুঁ করছে।'

'আর কোনদিন ফায়ার ব্রিগেড খেলা খেলবে না তো ?'

টগর না সূচক মাথা নাড়ল। আনিস বলর, মাথা নাড়লে হবে না। বল, আর কোনদিন খেলব না।

'আর কোনদিন খেলব না।'

'ভেরি গুড। তোমরা এখন হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস। আমি রান্না শেষ করি।'

নিশা বলল, আমি কি তোমাকে সাহায্য করব বাবা ?

'না। সাহায্য লাগবে না। আজ তোমাদের কি খেতে ইচ্ছা করছে বল ? ডিমের ভাজি না তরকারী ?'

টগর বলল, আমরা রোজ ডিম খাচ্ছি কেন বাবা ?

'ডিম রান্না সবচে সহজ এই জন্যে রোজ ডিম খাচ্ছি।'

নিশা গম্ভীর গলায় বলল, আমরা পৃথিবীর সব ডিম খেয়ে শেষ করে ফেলছি তাই না বাবা ?

'হ্যাঁ তাই। এখন বই নিয়ে বস।'

'বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে না।'

'কি ইচ্ছা করছে ?'

নিশা অবিকল বড়দের মত গলায় বলল, কি যে ইচ্ছা করছে তাও তো জানি না।

আনিস হেসে ফেলল। তার ছোট মেয়েটি বড় মায়াবতী হয়েছে। কথা বলার কি অদ্ভুত ধরন। কোত্থেকে পেয়েছে এসব ?

টগর বলল, আজ রাতে কি গল্প বলার আসর বসবে বাবা ?

'এখনো বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা আছে।'

গল্প বলার আসর শেষ পর্যন্ত বসল না। নিশা ঘুমিয়ে পড়েছে। একা একা গল্প শুনতে টগরের ভালো লাগে না। অথচ তার ঘুমও আসছে না। আনিস তার পিঠে চুলকে দিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, তাতেও কিছু হলো না। টগর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। একটু পর পর বলছে— ঘুম আসছে না বাবা।

'একেবারেই আসছে না ?'

'না।'

'তাহলে আস নতুন ধরনের একটা খেলা দু'জনে মিলে খেলি।'

'কি খেলা ?'

'এই খেলাটার নাম হচ্ছে সত্যি-মিথ্যা খেলা। আমি তোমাকে প্রশ্ন করব তুমি মিথ্যা জবাব দেবে। দশটা প্রশ্ন করব। প্রতি বারই যদি মিথ্যা জবাব দিতে পার তাহলে তুমি জিতে যাবে। যেমন ধর আমি যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার নাম কি ? তুমি যদি বল 'টগর' তাহলে তুমি হেরে যাবে। সব জবাব হতে হবে মিথ্যা।'

'এটাতো খুব সহজ খেলা বাবা।'

'মোটেই সহজ না। খুব কঠিন খেলা। কারণ মানুষ বেশিক্ষণ মিথ্যা কথা বলতে পারে না। পর পর দশটা মিথ্যা বলা মানুষের জন্যে খুব কঠিন। বেশির ভাগ মানুষই পারে না।

'আমি পারব ?'

'না তুমিও পারবে না। এসো শুরু করা যাক। রেডি-ওয়ান টু থ্রী— খোকা তোমার নাম কি— 'টগর' ?

www.BDeBooks.Com

'জ্বি না। আমার নাম টগর না।'

'তোমার ছোট একটা বোন আছে না?'

'জ্বি না। আমার একটা ভাই আছে।'

'তুমি কি ক্লাস থ্রিতে পড়?'

'জ্বি না আমি ক্লাস টেনে পড়ি।'

'তোমার কি তিনটা হাত আছে?'

'হ্যাঁ আমার তিনটা হাত আছে?'

'তুমি কি তোমার মা-কে খুব ভালবাস?'

'হ্যাঁ বাসি।'

আনিস হেসে ফেলল। টগর মাথা নিচু করে ফেলেছে। আনিস বলল, দেখলে তো টগর, মাত্র পাঁচটা প্রশ্নেই তুমি সত্যি কথা বলে ফেললে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা খুবই কঠিন।

টগর চাপা গলায় বলল, মিথ্যা কথা বলা কঠিন কেন বাবা?

'কঠিন, কারণ মানুষকে মিথ্যা কথা বলার জন্য তৈরি করা হয়নি। তবু আমরা মিথ্যা কথা বলি। যখন বলি তখন আমাদের খুব কষ্ট হয়।'

'আমার তো কষ্ট হয় না বাবা।'

'তুমি কি মিথ্যা কথা বল?'

'হ্যাঁ বলি। স্কুলে বলি।'

আনিস উপদেশমূলক কিছু বলবে কি বলবে না এই নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবল। শৈশবে নীতিকথার আসলে কি কোন গুরুত্ব আছে? একই পরিবারের চারটি ছেলেমেয়ে শৈশবে একই ধরনের নীতিকথা এবং উপদেশ শোনে কিন্তু বড় হয়ে চারজন চার রকমের হয়। আনিসের ধারণা শিশুরা বইয়ের উপদেশ গ্রহণ করে না। একটি শিশু অন্য একটি শিশুর কথা শুনে কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষের কথা শুনে না। তাদের জগৎ ভিন্ন, তারা নিজেদের জগৎ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

'টগর।'

টগর জবাব দিল না। আনিস দেখল, টগর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নিজের চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছে কিন্তু সে জানে বিছানায় শোয়া মাত্র ঘুম চলে যাবে। নানান উদ্ভট চিন্তা মাথায় ভর করবে। তারপর আসবে সুখময় কিছু কল্পনা। সেই কল্পনায় চব্বিশ বছর বয়েসী একজন তরুণী এসে ঘরে ঢুকবে। পান খাওয়ায় সেই তরুণীর ঠোঁট লাল হয়ে আছে। তরুণীটির নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম। টলমলে চোখে স্নিগ্ধ ছায়া।

আনিস বিরক্ত হবার মত ভঙ্গি করে বলবে, আবার পান খেয়েছ?

তরুণীটি বলবে, হ্যাঁ খেয়েছি।

'দাঁতগুলি নষ্ট করবে।'

'করলে করব। সারা দিনে একবার পান খাই তাতেই— '

'আচ্ছা যাও আর কিছু বলব না।'

'তোমার কি চা লাগবে?'

'হ্যাঁ।

'ঘুমুতে যাবার আগে কেউ চা খায় এই প্রথম দেখলাম।'

'ঘুমুতে যাব তোমাকে কে বলল?'

'ঘুমুবে না?'

'নো ম্যাডাম। সারা রাত জাগব।'

'লেখালেখি?'

'হ্যাঁ লেখালেখি। নতুন উপন্যাস শুরু করছি।'

'তুমি না বললে সোমবার থেকে শুরু করবে।'

'দু'দিন আগেই শুরু করছি।'

'উপন্যাসের নাম কি?'

'ময়ূরাক্ষী। নামটা কেমন?'

'সত্যি জানতে চাও।'

'হ্যাঁ।

'বললে রাগ করবে নাতো?'

'না— এর মধ্যে রাগ করার কি আছে?'

'নিউ এলিফেন্ট রোডের একটা জুতার দোকানের নাম ময়ূরাক্ষী।'

আনিস তাকিয়ে আছে। তরুণী খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। তবু সে হাসছে। কি অসাধারণ একটি দৃশ্য। এমন চমৎকার দৃশ্য তার জীবনে অভিনীত হয়েছে এই কথাটা আজ আর কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। আজ মনে হয় 'রাত্রি' নামে কোন তরুণীর সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। সবই কল্পনা সবই মায়া।

৪

সোবাহান সাহেবের সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সোবাহান সাহেব তাকে চিনতে পারলেন না। মাঝারি গড়নের একজন যুবক। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, চোখে মোটা কাচের চশমা। মুখ হাসি হাসি। গেট খুলে তরতর করে এগিয়ে এসেছে। যেন বাড়ি ঘর খুব পরিচিত। অনেকবার এসেছে।

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম আনিস। আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি?'

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জ্বি না। অচেনা লোকের সঙ্গে কি আপনি কথা বলেন না?'

www.BDeBooks.Com

সোবাহান সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। এই যুবকের মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দেশ ভর্তি হয়ে গেছে মতলববাজ যুবক। এদের কোন রকম প্রশ্রয় দেয়া উচিত না।

'স্যার, আমি কি বসব ?'

'দীর্ঘ আলাপ থাকলে বসুন। আর সংক্ষিপ্ত কোন কিছু বলার থাকলে বলে চলে যান।'

আনিস বসল। তার কাঁধে একটা ভারী হ্যান্ডব্যাগ ঝুলছিল, সেই হ্যান্ডব্যাগ খুলে কোলের উপর রাখল। সোবাহান সাহেব অত্যন্ত সন্দেহজনক দৃষ্টিতে হ্যান্ডব্যাগের দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মন বলছে ছোকরার আসার উদ্দেশ্য এই হ্যান্ডব্যাগেই আছে। কিছু একটা গছাতে এসেছে। সম্ভবত ইনস্যুরেন্স কোম্পানির লোক। পটিয়ে পটিয়ে ইনস্যুরেন্স করিয়ে ফেলবে।

সোবাহান সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, বলুন কি ব্যাপার। সংক্ষেপে বলবেন। লম্বা কথা শোনার সময় বা ধৈর্য কোনটাই আমার নেই।

'আপনার বাড়ির দোতালার ছাদে দুটা ঘর আছে। ঐ ঘর দুটা কি আপনি ভাড়া দেবেন ?'

'ছাদের ঘর ভাড়া দেয়া হবে এই রকম কোন বিজ্ঞাপন কি আপনার চোখে পড়েছে ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে ?'

'আমি এই এলাকায় বাড়ি খুঁজছিলাম। তখন একজন বলল, এক সময় তেতলার দুটি ঘর আপনি ভাড়া দিতেন।'

'এক সময় দিতাম বলে সারা জীবন দিতে হবে ?'

'তা-না। আপনি রাগছেন কেন ? জোর করে নিশ্চয়ই আমি আপনার বাড়িতে উঠব না!'

'আপনি কি করেন ?'

'কিছু করি না।'

'কিছু করি না মানে ? কিছু না করলে সংসার চলে কি ভাবে ?'

'আমি একজন লেখক। লেখালেখি করি।'

'কি নাম ?'

'আগে একবার বলেছিলাম।'

'দ্বিতীয়বার বলতে অসুবিধা আছে ?'

'না নেই— আমার নাম আনিস।'

'এই নামে কোন লেখক আছে বলে তো জানি না।'

'আমি ছদ্মনামে লিখি।'

'ছদ্মনামটা কি ?'

'আপনাকে বলতে চাচ্ছি না। ছদ্মনাম গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে আড়াল করা। যদি বলেই ফেলি তাহলে শুধু শুধু আর ছদ্মনাম নিলাম কেন ?'

'তুমি কি লেখ ?'

আনিস লক্ষ্য করল এই ভদ্রলোক হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছেন এবং নিজে তা বুঝতে পারছেন না।

এইটি ভাল লক্ষণ। আনিস বলল, গল্প, উপন্যাস এসব লিখি। একটি প্রবন্ধের বই আছে। কেউ সেই বই পড়ে না।

'আমার বাড়ি ভাড়া নেওয়ার ইচ্ছা তোমার কেন হল ?'

'শুনেছি আপনি ভাড়া খুব কম নিতেন। এ্যাডভান্সের ঝামেলা ছিল না। তাছাড়া বাড়িটাও আমার পছন্দ হয়েছে।'

'তুমি কি ব্যাচেলার ?'

'জ্বি না। আমার দুটি বাচ্চা আছে।'

'দেশের সমস্যা নিয়ে কি তুমি ভাব ?'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'এই যে দেশে অসংখ্য সমস্যা এসব নিয়ে কখনো ভাব ?'

'কোন সমস্যার কথা বলছেন ?'

'সব রকম সমস্যা।'

'জ্বি-না, ভাবি না।'

'তুমি একজন লেখক মানুষ, তুমি এসব নিয়ে ভাব না ? তুমি কি রকম লেখক ?'

'খুবই বাজে ধরনের লেখক।'

'তুমি এখন যেতে পার। তোমাকে বাড়ি ভাড়া দেব না।'

'দেবেন না ?'

'না। তোমাকে আমার পছন্দ হয় নি।'

'আপনাকেও আমার পছন্দ হয় নি। তবে আপনার বাড়ি পছন্দ হয়েছিল।'

'আমাকে পছন্দ না হবার কারণ ?'

'আপনি হচ্ছেন এক শ্রেণীর পয়সাওয়ালা অকর্মণ্য বৃদ্ধ। যারা দেশের সমস্যা নিয়ে ভাবে এবং মনে করে এই ভাবনার কারণে সে অনেক বড় কাজ করে ফেলছে। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পায়। আসলে আপনার এসব চিন্তা ভাবনা অর্থহীন এবং মূল্যহীন। আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে— রগরগে থ্রীলার পড়া। মাঝে মাঝে দান দক্ষিণ করা যাতে পরকালে সুখে থাকতে পারেন। ইহকাল এবং পরকাল দুটিই ম্যানেজ করা থাকে বলে।'

'অভদ্র ছোকরা। স্টপ। স্টপ।'

'আপনি খুব বেশি রেগে যাচ্ছেন। আপনার প্রেসার ট্রেসার নেইতো ? প্রেসার থাকলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে।'

www.BDeBooks.Com

'বহিস্কার। বহিস্কার। এই মুহূর্তে বহিস্কার।'

সোবাহান সাহেব প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগলেন। মিলি বারান্দায় ছুটে এল। চোখ বড় বড় করে বলল, কি হয়েছে?'

'এই ছোকরাকে ঘাড় ধরে বের করে দে। ফাজিলের ফাজিল, বদের বদ।'

মিলি কড়া গলায় বলল, আপনি বাবাকে কি বলেছেন?

আনিস অবস্থা দেখে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও সে বলতে পারল না। মিলি বলল, প্লীজ আপনি এখন কথা বলে আর ঝামেলা বাড়াবেন না। চলে যান। আনিস গেট পার হয়ে চলে যাবার পর সোবাহান সাহেব বললেন, কাদের বাসায় আছে?

মিলি বলল, আছে।

'কাদেরকে বল ঐ ছোকরাকে ধরে আনতে।'

'বাদ দাও না বাবা। আর কেন?'

'যা করতে বলছি কর।'

'ভদ্রলোক কে?'

'আমাদের নতুন ভাড়াটে।'

'তোমার কথা বুঝলাম না বাবা।'

'তিনতলার ঘর দুটা তার কাছে ভাড়া দিয়েছি। ছোকরাকে আমার পছন্দ হয়েছে। ছোকরার মাথা পরিষ্কার।'

কাদের আনিসকে আনতে গেল। সোবাহান সাহেব নিজেই দোতলার ছাদে উঠলেন ঘর দুটির অবস্থা দেখার জন্যে। অনেক দিন তালাবন্ধ হয়ে আছে। পরিষ্কার টরিষ্কার করানো দরকার।

দুটি ঘর। একটা বাথরুম, রান্নাঘর। ছোট পরিবারের জন্যে খুব ভালই বলতে হবে। ঘর দুটির সামনে বিশাল ছাদ। ছাদে অসংখ্য টব, টবে ফুলের চাষ হচ্ছে। মিলির শখ।

মিনু ছাদে উঠে এলেন। তার মুখ থমথমে। কিছুক্ষণ আগে মিলির কাছে তিনি বাড়ি ভাড়া দেবার খবর শুনেছেন। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে।

'তুমি নাকি ছাদের ঘর দুটি ভাড়া দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'কাকে দিলে?'

'নামটা মনে আসছে না। ফাজিল ধরনের এক ছোকরা।'

'বাড়ি ভাড়া দেয়া কি খুব দরকার ছিল?'

'না।'

'তাহলে, বাড়ি ভাড়া দিলে কেন?'

'আমার দরকার ছিল না, কিন্তু ঐ ফাজিলের দরকার ছিল।'

'তুমি হুট করে একেকটা কাজ কর আর সমস্যা হয়।'

সোবাহান সাহেবের মেজাজ চট করে খারাপ হয়ে গেল। তিনি থমথমে গলায় বললেন, আমি সমস্যার সৃষ্টি করি ?

মিনু চুপ করে গেলেন। সোবাহান সাহেব চাপা গলায় বললেন, আমার জন্য কারোর কোন সমস্যা হোক তা আমি চাই না।

এই বলেই তিনি নিচে নেমে গেলেন। মিনু গেলেন পেছনে পেছনে।

একতলার বারান্দায় আনিস দাঁড়িয়ে আছে। কাদের তাকে নিয়ে এসেছে। আনিস খানিকটা শংকিত বোধ করছে। বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে আবার ডেকে আনার অর্থ সে ঠিক ধরতে পারছে না। সোবাহান সাহেব তার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং শুকনো গলায় বললেন, এসেছ ?

আনিস বলল, জ্বি। আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সোবাহান সাহেব বললেন, তোমাকে বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে না এটা বলার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

'সেতো একবার বলেছেন।'

'আবার বললাম, আবার বলায় তো দোষের কিছু নেই।'

'জ্বি না নেই। দ্বিতীয়বার বলাটা ভাল হয়েছে। এখন কি আমি যেতে পারি ?'

'হ্যাঁ যাও।'

'স্লামালিকুম।'

আনিস গেটের বাইরে বেরুতেই মিনু বললেন, কাদের যা ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে আয়।

কাদের সোবাহান সাহেবের দিকে তাকাল। তিনি কিছু বললেন না। মিনু বলল, দাঁড়িয়ে আছিস কেন যা। কাদের বিমর্ষ মুখে বের হল। বড় যন্ত্রণায় পড়া গেল।

আনিস বড় রাস্তা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। কাদের সেখানেই তাকে ধরল, নিষ্প্রাণ গলায় বলল, আপনেরে বুলায়।

আনিস বলল, ঠাট্টা করছ ?

'জ্বি না। আবার যাইতে বলছে।'

'আবার যাব ?'

'যাইতে ইচ্ছা না হইলে যাইয়েন না। আমারে খবর দিতে কইছে খবর দিলাম। যাওন না যাওন আফনের ইচ্ছা।'

'নাম কি তোমার ?'

'আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের।'

'সৈয়দ নাকি।'

'জ্বি। বোগদাদী সৈয়দ।'

'বল কি ? বোগদাদী সৈয়দ যখন খবর নিয়ে এসেছে তখন তো যেতেই হয়।'

আনিস তৃতীয়বারের মত নিরিবিলি বাড়ির বারান্দায় এসে উঠল। সোবাহান সাহেব তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, কাদের ভদ্রলোককে তিনতলার ঘর দুটার চাবি এনে দে।

www.BDeBooks.Com

আনিস বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। অনেক ধন্যবাদ।

রাত আটটার মত বাজে।

মিলি বিরক্ত মুখে খাতা কলম নিয়ে বসে আছে। তার সামনে চার পাঁচটা বই। আগামীকাল সকাল নটায় তার টিউটোরিয়েল ক্লাস। এ্যাসাইনমেন্টের কিছুই এখনো করা হয়নি। বিষয়টাই মাথায় ঢুকছে না। এর আগের টিউটোরিয়েলে বি মাইনাস পেয়েছে। এবার মনে হচ্ছে সি মাইনাস হবে। খাতায় প্রথম বাক্যটা লিখে শেষ করবার আগেই কাদের ঘরে ঢুকে বলল, আফা আফানেরে ডাকে।

মিলি রাগি গলায় বলল, কে ডাকে ?

'ডাক্তার সাব। গ্রীন ফার্মেসীর চেংড়া ডাক্তার ?'

'আমাকে ডাকছে কি জন্যে ? আমার কাছে কি ?'

'আমি ক্যামনে কই আফা ? আমি হইলাম গিয়া চাকর মানুষ। আমার সাথে কি আর খাতিরের আলাপ করব ?'

মিলি কঠিন গলায় বলল, তুই কথা বেশি বলিস, কথা কম বলবি।

'অর্ডার দিলে কথাই কমু না। অসুবিধা কি ? কথা কওনের মইধ্যেতো আফা আরাম কিছু নাই।'

'যা আমার সামনে থেকে।'

কাদের গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। পেছনে পেছনে আসছে মিলি, বে-আক্কেল ডাক্তারের জন্যে তার মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে, যদিও তাকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না।

মনসুরের পোশাক-আষাক আজ খুবই পরিপাটি। সার্ট প্যান্ট সবই নতুন কেনা হয়েছে। জুতা জোড়াও নতুন। জুতা জোড়া সাইজে খানিকটা ছোট হয়েছে। কেনার সময় তা ঠিক বোঝা যায়নি। এখন জানান দিচ্ছে। পা টন টন করছে। পায়ের আঙুলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে কি-না কে জানে। মিলিকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। মিলি বলল, কি ব্যাপার ডাক্তার সাহেব ?

'না মানে আপনার বাবার প্রেসারটা চেক করতে এসেছিলাম।'

'আপনাকে কি আসতে বলেছিল কেউ ?'

'জ্বি না। তবে উনার যেহেতু হাই প্রেসারের টেনডেন্সি কাজেই প্রায়ই চেক করা দরকার।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি আপনাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখেই যাই।'

'ভাল করেছেন। বাবা দোতলায় তাঁর ঘরে। আসুন বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

'চলুন।'

মিলি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আপনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন কেন ?

মনসুর লজ্জিত গলায় বলল, নতুন জুতা। সাইজে হয়েছে ছোট। কেনার সময় বুঝতে পারি নি। মনসুর সিঁড়ির শেষ মাথা পর্যন্ত উঠল না। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দিশাহারা গলায় বলল, একটা ভুল করে ফেলেছি।

মিলি বলল, প্রেসার মাপার যন্ত্র ফেলে এসেছেন। তাই না ?

'জ্বি।'

'তাহলে আজ বরংচ চলে যান। বাবার শরীর যদি খারাপ হয় আপনাকে খবর দেব।'

'আমি বরং এক দৌড়ে নিয়ে আসি। যাব আর আসব।'

'তেমন ইমার্জেন্সিতো না। ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। আপনি সিঁড়ি ধরে ধরে নামুন। ঐ দিনের মত হওয়াটা ভাল হবে না।'

মনসুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা ঐ দিনকার ঘটনাটা ভুলতেই পারছে না। সামান্য দুর্ঘটনার বেশিতো কিছু না। দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে না ? সব সময়ই তো ঘটছে।

অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যেই কি না কে জানে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে মনসুরের নতুন জুতা স্লিপ কাটল। অতি সহজেই মনসুর নিজেকে সামলাতে পারত কিন্তু সে কেন জানি মিলির মুখের দিকে তাকাতে গেল আর তখনি রেলিং-এ ধরে রাখা হাত ফসকে গেল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। আজ ঐ দিনের চেয়েও ভয়াবহ শব্দ হল।

সোবাহান সাহেব, ফরিদ, কাদের এবং রহিমার মা ছুটে এল। সোবাহান সাহেব বললেন, কি ব্যাপার ? মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব পড়ে গেছেন।

ফরিদ বিস্মিত গলায় বলল, কোন ডাক্তার ঐ দিনকার পাগলা ডাক্তার ?

মিলিকে ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে হল না। মনসুর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একেবারেই ব্যথা পাইনি।

ফরিদ বলল, আপনি ব্যথা পেয়েছেন কি পাননি এটা আমার জিজ্ঞাসা নয়। আমি জানতে চাচ্ছি আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে 'আছাড়, খাওয়া' রোগ নামে কোন রোগ আছে কি না ? যদি থেকে থাকে তাহলে সেই রোগের চিকিৎসা আছে, না সেটা দুরারোগ্য ব্যধি ?

মনসুরের মনে হল ইনি রসিকতা করছেন। অপমানজনক পরিস্থিতিতে রসিকতা খুবই ভাল জিনিস। সবাই মিলে এক সঙ্গে হেসে উঠলে ব্যাপারটা হালকা হয়ে যায়। সবাই হেসে উঠবে এই ভেবে মনসুর উচ্চস্বরে হাসল। আশ্চর্য অন্য কেউ তার সঙ্গে হাসছে না। বরংচ কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। নির্ঘাৎ তাঁকে পাগল ভাবছে।

ফরিদ বলল, কাদের ইনাকে ধরাধরি করে বাসায় রেখে আয়। আমার ধারণা ভদ্রলোকের ব্রেইন ফাংশান করছে না। এই যে ভাই ডাক্তার সাহেব, আপনি কাদেরের সঙ্গে যান। সপ্তাহ্‌খানেক বেড রেস্টে থাকবেন। বিশ্রামের মত ভাল জিনিস আর কিছু নেই। সব চিকিৎসার সেরা চিকিৎসা হচ্ছে বিশ্রাম।

www.BDeBooks.Com

নিরিবিলি বাড়ির দু'জন সদস্য রাতের খাবার খেতে বসেছে। ফরিদ এবং মিলি। মিনু বেশির ভাগ সময় রাতে খান না। আজও খাবেন না। বাকি শুধু সোবাহান সাহেব। ফরিদ এবং মিলি প্লেটে ভাত নিতে নিতে সোবাহান সাহেব এসে পড়লেন। ফরিদ হাসি মুখে বলল, কেমন আছেন দুলাভাই ?

সোবাহান সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন।

'কথা বলছেন না কেন দুলাভাই ? রাগ করলেন না কি ?'

'চুপচাপ খাওয়া দাওয়া কর। আমাকে বিরক্ত করবে না।'

'খাওয়ার টেবিল হচ্ছে সামাজিকভাবে মেলামেশার একটা স্থান। নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া করে উঠে যাওয়া খাবার টেবিলের উদ্দেশ্য নয়।'

'চুপ কর।'

'এত ভাল যন্ত্রণা হল দেখি— কিছু বললেই চুপ কর। আপনার সমস্যাটা কি ?'

মিনু লেবু দিতে এসে বললেন, চুপচাপ খেয়ে বিদেয় হ ফরিদ। ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। গল্প গুজব করে খাওয়া দাওয়া করতে তার ভাল লাগে। দুলাভাই টেবিলে থাকলে তা সম্ভব হয় না। সোবাহান সাহেব মিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজও ইলিশ ? পর পর তিন দিন ইলিশ হয়ে গেল না ?

'কি করব, বাজারে মাছ নেই। কাদেরকে পাঠালে ইলিশ নিয়ে চলে আসে। মাছের খুব আকাল।'

সোবাহান সাহেব মিলির দিকে তাকিয়ে আফসোসের স্বরে বললেন, এই দেশ মাছে এক সময় ভর্তি ছিল। মেঘের ডাক শুনে ঝাঁক বেঁধে কৈ মাছ পানি ছেড়ে শুকনায় উঠে পড়ত। মাছের জন্যে আমরা কি করতাম জানিস ? নৌকা ডুবিয়ে রাখতাম। কয়েকদিন পর পর সেই নৌকা তুলে পানি সেছা হত। আর তখন—

'দুলাভাই, কিছু মনে করবেন না আপনাকে ইন্টারাপ্ট করি। না করে পারছি না। আমাকে চুপ করে থাকতে বলে নিজে সমানে কথা বলে যাচ্ছেন এটা কেমন হল ? প্রাচীন একটা আপ্ত বাক্য হচ্ছে— আপনি আচারি ধর্ম পড়কে শেখাও। আপনি তা করছেন না।'

সোবাহান সাহেব সরু চোখে ফরিদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফরিদ সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল। মিলি মিনতি মাখা চোখে মামার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ বলছে— মামা, তোমার পায়ে পড়ছি বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিও না। মিলি চোখের ভাষা ফরিদকে কাবু করতে পারল না। সে উৎসাহের সঙ্গে বলে চলল,

'আমাদের প্রফেটের সেই বিখ্যাত গল্পটা কি আপনার মনে আছে দুলাভাই ? এক লোক তাঁর কাছে গিয়ে কাতর গলায় বলল, হুজুর বড় সমস্যায় পড়েছি, আমার মধ্যম পুত্র শুধু মিষ্টি খেতে চায়—'

'এই গল্পটি আমার জানা আছে ফরিদ।'

'আমারও ধারণা আপনার জানা আছে কিন্তু গল্পের মোরাল আপনি হয় ধরতে পারেননি কিংবা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে চাননি।'

মিলি বলল, এই প্রসঙ্গটা থাক মামা। তোমার যদি এতই কথা বলতে ইচ্ছা করে তাহলে অন্য কিছু নিয়ে কথা বল।'

'অন্য কি নিয়ে কথা বলব?'

'ছবি নিয়ে কথা বল। বাবা জান! মামা ছবি বানাবে, শর্ট ফ্লিম। ছবিটা দারুণ একটা কিছু হবে।'

সোবাহান সাহেব বললেন, ভাল। বলেই প্লেট সরিয়ে উঠে পড়লেন। মিলি বলল, বাবার খাওয়াটা তুমি নষ্ট করলে মামা।

'আমি কারো খাওয়া নষ্ট করিনি। পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দুলাভাইকে পরাস্ত করেছি। অবশ্যি তাঁকে পরাস্ত করা সহজ। তাঁর আই কিউ খুবই নিচের দিকে। আমার মনে হয় গাছপালার আই কিউ-এর কাছাকাছি।'

'তোমার আই কিউ বুঝি আইনস্টাইনের মত?'

'আমি কারো সঙ্গে তুলনায় যেতে চাচ্ছি না তবে বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে ১০০র ভেতর আমাকে ৯৩ থেকে ৯৫ দিতে পারিস।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আর তোর বুদ্ধি হচ্ছে ৫৬ থেকে ৬২-র মধ্যে। আর একই স্কেলে দুলাভাইয়ের বুদ্ধি ১৮ থেকে ২২র মধ্যে উঠানামা করে।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ এবং আমি আমার ধারণার কথা বলতে কোন রকম দ্বিধাবোধ করি না। কারণ সত্য হচ্ছে আগুনের মত। আগুন চাপা দেবার কোন উপায় নেই। আমি বুঝতে পারছি দুলাভাইয়ের বুদ্ধি কম বলায় তুই আহত হয়েছিস, কিন্তু উপায় কি যা সত্যি তা বলতেই হবে। আমার মুখ হয়তবা তুই বন্ধ করতে পারবি, কিন্তু পাবলিকের মুখ তুই কি করে বন্ধ করবি? পাবলিক এক সময় সত্যি কথা বলবেই।'

'বকবকানি থামাও তো মামা।'

'থামাচ্ছি। কিন্তু প্রসঙ্গটা যখন উঠলই তখন এই বাড়িতে আমার পরই কার আই কিউ বেশি সেটা জানা থাকা বল। আমার পরই কাছে কাদের। অসাধারণ ব্রেইন।'

চুপ করতো মামা। অসাধারণ ব্রেইন হল কাদেরের!'

'প্রপার এডুকেশন পেলে এই ছেলে ফাটাফাটি করে ফেলত।'

'তুমিতো প্রপার এডুকেশন পেয়েছ। তুমি কি করেছ?'

'করব। সময়তো পার হয়ে যায় নি। দেখবি দেশ জুড়ে একটা হুলুস্থুল পড়ে যাবে। তোদের এই বাড়ি বিখ্যাত হয়ে যাবে। লোকজন এসে বলবে— এটা

www.BDeBooks.Com

একটা বিখ্যাত বাড়ি। তোদের বই লিখতে হবে— 'মামাকে যেমন দেখেছি' কিংবা 'কাছের মানুষ ফরিদ মামা'—।

'কিছু মনে করো না, আমার ধারণা তোমার আই কিউ খুবই কম।'

ফরিদ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল। তার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা তাকে খুব মজা দেয়। এটা হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সাধারণ ট্র্যাজেডি। প্রিয়জনরা তাদের বুঝতে পারে না। আড়ালে হয়তবা হাসাহাসিও করে। করুক। তাদের হাসাহাসিতে কিছু যায় আসে না।

কাদের এসে ঢুকল। গম্ভীর মুখে ঘোষণা করল, নতুন ভাড়াটে চলে এসেছে। সে মুখ কুঁচকে বলল, এক মালগাড়িতে বেবাক জিনিস উপস্থিত। ফকির্যা পার্টি।

বলেই সে আবার বারান্দায় চলে গেল। নতুন ভাড়াটের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। ফুলের গাছ টাছ না ভেঙে ফেলে। এই বাড়িতে তার অবস্থান সম্পর্কেও জানিয়ে দেয়া দরকার। ভাড়াটে যদি তাকে সামান্য একজন কাজের মানুষ মনে করে তাহলে মুশকিল। প্রথম দর্শনে মনে করে ফেললে সারাজীবনই মনে রাখবে। যখন তখন ডেকে বলবে, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাওতো, চিঠিটা পোস্ট করে দাওতো, এক দৌড়ে খবরের কাগজটা এনে দাও।

আনিস রিক্সা করে এসেছে। টগর এবং নিশা দুজনেই গভীর ঘুমে। মিলিদের বসার ঘরের দরজা খোলা। আনিস বাচ্চা দুটিকে বসার ঘরের সোফায় শুইয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল। কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলল, কাদের তুমি স্যুটকেস দুটা উপরে দিয়ে আসতো।

কাদের তৎক্ষণাৎ বলল, কুলীর কাম আমি করি না ভাইজান। সৈয়দ বংশ।

'বখশীস পাবে।'

'এই বংশের লোক বখশীসের লোভে কিছু করে না ভাইজান। আমরা হইলাম আসল সৈয়দ। বোগদাদী সৈয়দ।'

আনিস নিজেই জিনিসপত্র টানাটানি করে তুলতে লাগল। ঠেলাগাড়ির লোক দু'টি উপরে কিছু তুলবে না। দোতলার ছাদে তোলা হবে এই কথা তাদের বলা হয়নি। এখন যদি তুলতে হয় পঞ্চাশ টাকা বাড়তি দিতে হবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে আনিসের হাতে এই মুহূর্তে পঞ্চাশটা টাকাও নেই। এ বাড়িতে সে কপর্দক শূন্য অবস্থাতেই এসে উঠেছে।

মিলি কি করতে জানি বসার ঘরে ঢুকেছিল। সোফাতে দুটি শিশুকে শুয়ে থাকতে দেখে সে এগিয়ে এল। আহ্ কি মায়া কাড়া চেহারা। দুটি দেবশিশু যেন জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। মেয়েটির মাথাভর্তি রেশমি চুল। চোখের ভুরুগুলো যেন কোন চৈনিক শিল্পী সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে এঁকেছে। কমলার কোয়ার মত পাতলা ঠোঁট বার বার কেঁপে উঠছে। বাচ্চাটিকে কোলে নেবার এমন ইচ্ছা হচ্ছে যে মিলি রীতিমত লজ্জা লাগছে। মিলি দোতলার ছাদে উঠে গেল। আনিস খাটের ভারী একটা অংশ টেনে টেনে তুলছে।

মিলি বলল, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন ? আপনার ঠেলাগাড়ির লোকজন কোথায় ?

'ওরা চলে গেছে।'

'দাঁড়ান আমি কাদেরকে পাঠাচ্ছি।'

'না থাক। বেচারা সৈয়দ বংশের মানুষ কুলীর কাজ করবে না। আমার অসুবিধা হচ্ছে না। তুলে ফেলেছি।'

'তাইতো দেখছি। আপনার স্ত্রী কোথায় ?'

'ও আসে নি।'

'আসে নি মানে ?' মা'কে ছাড়াই বাচ্চা দুটি চলে এসেছে ?'

'হুঁ।'

'উনাকে কবে আনবেন ?'

'তাকে আনা সম্ভব হবে না। সে আসবে না।'

'আপনার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'ও মারা গেছে।'

বেশ কিছুক্ষণ সময় মিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এত বড় একটা খবর তার হজম করতে সময় লাগল। মিলি বলল, বাচ্চা দুটির মা নেই শুনে আমার খুব খারাপ লাগছে। এটা নিয়ে আপনি রহস্য করবেন তা ভাবিনি। আপনি হয়ত খুব রসিক মানুষ, সব কিছু নিয়ে রসিকতা করা হয়ত আপনার অভ্যাস কিন্তু এটা অন্যায়।

আনিস বলল, ঠিক এই ভাবে কিছু বলিনি। ওর মৃত্যুর কথা সরাসরি বলতে খারাপ লাগে বলেই অন্য পথে বলতে চেষ্টা করি।

'আর করবেন না।'

'আচ্ছা আর করব না।'

আনিস মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করল মিলি নামের এই মেয়েটি তার ঘর গুছিয়ে দিল। মশারি খাটিয়ে দিল, টগর এবং নিশাকে কোলে করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল। মেয়েরা প্রাকৃতিক নিয়মেই মমতাময়ী, কিন্তু এই মেয়েটির মধ্যে মমতার পরিমাণ অনেক অনেক বেশি।

আনিস বলল, আপনাকে অনেক যন্ত্রণার মধ্যে ফেললাম।

'তা ঠিক। কাল সকালেই আমার টিউটোরিয়াল। কিছুই করা হয় নি।'

'আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন কাজেই আমি আপনার ক্ষুদ্র একটা উপকার করতে চাই। এ গুড টার্ন ফর এ গুড টার্ন।,

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কি উপকার করতে চান ?

'একটা উপদেশ দিতে চাই যা আপনার খুব কাজে আসবে। উপদেশটা হচ্ছে আমার বাচ্চা দুটিকে একেবারেই পাত্তা দেবেন না।'

'সে কি!'

'ওদের একজনই আপনাকে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। দু'জন মিলে কি করবে তার বিন্দু মাত্র ধারণাও আপনার নেই। কাজেই সাবধান।'

www.BDeBooks.Com

মিলি হাসল। আনিস বলল, আপনার হাসি দেখেই বুঝতে পারছি আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। সাবধান করে দেবার দরকার ছিল করে দিয়েছি।

সোবাহান সাহেবকে ডাক্তার বলে দিয়েছেন রাত ঠিক দশটায় বিছানায় চলে যেতে। রাত জাগা পুরোপুরি বারণ। ডাক্তারের উপদেশ মত কিছুদিন তাই করলেন। দেখা গেল রাত দশটার দিকে ঘুমুতে গেলে ঘুম আসে দেড়টা দু'টায় দিকে অথচ বারটার দিকে ঘুমুতে গেলে দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে ঘুম চলে আসে। কিছুদিন হল তিনি তার নিজস্ব নিয়ম চালু করেছেন— রাত বারোটায় ঘুমুতে যান। তবে তিনি জানেন না যে শোবার ঘরের ঘড়ি এক ফাঁকে মিলি একে এক ঘন্টা আগিয়ে রাখে।

শোবার ঘরের ঘড়িতে এখন বারোটা বাজছে। যদিও আসল সময় রাত এগারেটা। মিনু ঘরে ঢুকলেন। হাতে বরফ শীতল এক গ্লাস পানি। বিছানায় যাবার আগে সোবাহান সাহেব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খান। মিনু পানির গ্লাস টেবিলের পাশে রাখতে রাখতে বললেন, ঘুমুবে না ?

সোবাহান সাহেব বললেন, একটু দেরী হবে মিনু। তুমি শুয়ে পড়।

'দেরী হবে কেন ?'

'একটা বিষয় নিয়ে ভাবছি।'

'কি নিয়ে ভাবছ ?'

'দেশে মাছের যে ভয়াবহ সমস্যা ঐটা নিয়ে ভাবছি। কি করা যায় তাই—'

'ঐ সব ভাববার লোক আছে। তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'এই তো একটা ভুল কথা বললে মিনু। দেশের সমস্যা নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। সবাই যদি ভাবে তাহলেই সমস্যার কোন একটা সমাধান বের করা যাবে।'

'বেশতো সকাল বেলা সমাধান বের করবে। বারটা বাজে, এখন শুয়ে পড়। নাও পানিটা খাও।'

সোবাহান সাহেব চোখ থেকে চশমা খুলে রেখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, ঘড়িতে বারটা বাজে না, বাজে এগারোটা। তোমরা এই ঘরের ঘড়ি এক ঘণ্টা আগিয়ে দাও। যেদিন প্রথম করলে সেদিনই টের পেয়েছি। তোমাদের বুঝতে দেই নি। তোমরা যা করছ, আমার প্রতি মমতাবশতই করছ তবু কাজটা ঠিক না। তোমরা ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছ। ধোঁকা দেয়া অন্যায়। যাও শুয়ে পড়।

মিনু কথা বাড়ালেন না, শুয়ে পড়লেন। স্বামীকে তিনি খুব ভাল করে চেনেন। এই মুহূর্তে তাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না।

'মিনু।'

'বল।'

'আচ্ছা বলতো তোমরা কি আমাকে খুব অল্প বুদ্ধির মানুষ বলে মনে কর ?'

'তা মনে করব কেন ?'

'এই যে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা আগিয়ে দিলে, মনটাই একটু খারাপ হল। তোমরা আমাকে নিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার করছ।'

'মিলি করেছে। এই সব মিলির বুদ্ধি। দাও এক্ষুণি ঠিক করে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই। আমার ঘরের ঘড়ি এক ঘণ্টা এগিয়েই থাকুক। আমি মানুষটা অবশ্যি অনেকখানি পিছিয়ে আছি। এই দিক দিয়ে ঠিকই আছে। তুমি ঘুমাও মিনু। বয়সতো শুধু আমার একার বাড়ছে না, তোমারও বাড়ছে। আমার যেমন বিশ্রাম দরকার, তোমারও দরকার। সমাজটাই এমন যে পুরুষের প্রয়োজনটাই বড় করে দেখা হয়। মেয়েদেরটা দেখা হয় না। এই সমস্যা নিয়েও ভাবতে হবে।'

সোবাহান সাহেব নিজেই উঠে ঘরের বাতি নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে চেয়ারে বসলেন। তাঁর সামনে একটা বিশাল খাতা। খাতায় লেখা— মৎস্য সমস্যা।

খাতার প্রথম পাতায় এদেশের সব রকম মাছের নাম লেখা আছে। দেশে কত ধরনের মাছ পাওয়া যায়, কোন অঞ্চলে কোন মাছের কি নাম সব আগে লেখা দরকার। সব জাতের মাছের ব্রিডিং টাইম কি এক— না একেক মাছের একেক সময় তাও জানা দরকার। মাছের খাবার কি ?

সোবাহান সাহেবের মন খারাপ লাগছে, তিনি মাছের দেশের মানুষ অথচ মাছের ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানেন না। শুধু জানেন বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে যখন আকাশ গুড় গুড় করে উঠে তখন কৈ মাছের ঝাঁক পানি ছেড়ে শুকনোয় উঠে আসে। রহস্যময় ব্যাপার। এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কত অদ্ভুত রহস্য চারদিকে দিয়েছেন। তাঁকে চিনতে হবে এইসব রহস্যের মাঝে।

বারান্দায় মিলি হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে গাইছে। মেয়েটার গানের গলা চমৎকার অথচ ভাল করে গান শিখল না। তাঁর ইচ্ছা করল মেয়েকে ডেকে পাশে বসিয়ে গান শুনেন। তা সম্ভব হবে না। গাইতে বললে মিলি গাইতে পারে না। সে না-কি গান করে নিজের জন্যে, অন্য কারো জন্যে না।

মিলি গাইছে—

বলি গো সজনী যেয়ো না, যেয়ো না
তার কাছে আর যেয়ো না।
সুখের সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলো না বোলো না।

সুন্দর গানতো। সোবাহান সাহেবের মন আনন্দে পূর্ণ হল। তিনি খাতা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মিলি রেলিং-এ হেলান দিয়ে আছে। আকাশ ভরা জোছনা। কি অপরূপ ছবি। এমন সুন্দর পৃথিবী ফেলে রেখে তাঁকে চলে যেতে হবে ভাবতেই কষ্ট হয়। স্বর্গ কি এই পৃথিবীর চেয়েও সুন্দর হবে ? তাও কি সম্ভব ?

www.BDeBooks.Com

মিলি গান বন্ধ করে বাবার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বলল, আমার মন অসম্ভব খারাপ হয়ে আছে বাবা।

'কেন ?'

'কাল আমার টিউটোরিয়েল, কিছু পড়া হয়নি। পড়তে ভাল লাগে না, কি-যে করি!'

সোবাহান সাহেব সস্নেহে মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন। মিলি বলল, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা আমরা পড়ালেখা করে নষ্ট করি। কোন মানে হয় না।

৫

নিরিবিলি বাড়ির সবচে সরব মহিলা-রহিমার মার মুখে আজ সারাদিন কোন কথা নেই। মিনু ব্যাপারটা লক্ষ করলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রহিমার মা ?

রহিমার মা থমথমে গলায় বলল, কি হয় নাই। গরিবের আবার হওয়া হওয়ি। গরিবের কিছুই হয় না।

মিনু আর তাকে ঘাঁটালেন না। চুপচাপ আছে ভাল আছে, কথা বলা শুরু করলে মুশকিল।

সন্ধ্যায় চা বানাতে বানাতে রহিমার মা নিজের মনেই বলল, গরিবের দুঃখ কেউ বুঝে না। মাইনষেতো বুঝেই না আল্লায়ও বুঝে না।

খুবই ফিলসফিক কথা। এ জাতীয় কথাবার্তা বলা শুরু করলে বুঝতে হবে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে।

যা ঘটেছে তাকে ভয়াবহ বলা ঠিক হবে না। ঘটনা ঘটেছে গত রাতে। কাদের এবং রহিমার মা এক ঘরে ঘুমোয়। কাজকর্ম শেষ করে রাত এগারোটায় দিকে রহিমার মা ঘুমুতে এসে দেখে কাদের জেগে বসে আছে। কাদেরের চোখে নতুন চশমা। কাদেরকে কেমন ভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে। কাদের বলল, কেমন দেহায় খালাজী ?

রহিমার মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। বিস্ময় সামলাতে সময় লাগল।

'চশমা কই পাইছস ?'

কিনলাম। একশ দশ টেকা দাম। টেকা পয়সার দিকে চাইলেতো হয় না খালাজী। টেকা পয়সা হইল বটপাতা। আইজ আছে কাইল নাই। জেবন তো বটপাতা না। জেবনের সাধ আহ্লাদ আছে। কি কন খালাজী ?'

রহিমার মা জবাব দিল না। কাদের চোখে থেকে চমশা খুলে গম্ভীর ভঙ্গিতে কাঁচ পরিস্কার করতে করতে বলল, জিনিসটার প্রয়োজনও আছে খালাজী। চেহারা সুন্দরের কথা বাদ দিলেও জিনিসটার বড়ই দরকার। চউক্ষে ধুলাবালি পড়ে না। রইদ কম লাগে। চউক্ষের আরাম হয়।

'দাম কত কইলি ?'

'একশ দশ। পাওয়ার দিলে আরো বেশি পড়ত। বিনা পাওয়ারে নিলাম। বুড়াকালে পাওয়ার কিনুম।'

রহিমার মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আটকে রাখতে পারল না। এই কাদের ছোকরা বড়ই শৌখিন। বেতনের টাকা পেলেই এটা ওটা কিনে ফেলে। গত মাসে কিনেছে কলম। কলম কিনে এনে গম্ভীর গলায় বলেছে, কলম কিনলাম একটা খালাজী, চাইনিজ।

রহিমার মা অবাক হয়ে বলেছে, কলম দিয়া তুই করবি কি ? লেহাপড়া জানছ ?

কাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে লেহাপড়া কপালে নাই করমু কি কন ? লেহাপড়া না জানলেও কলম এটা থাকা দরকার। পকেটে কলম থাকলে বাইরের একটা লোক ফট কইরা তুমি বইল্যা ডাক দিব না। বলব, ভাইসাব।

রহিমার মা'রও খুব শখ ছিল একটা কলম কেনার। তাবে কাদের যেমন কলম পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারে সে তা পারবে না জেনে কেনে নি। এখন আবার চশমা কিনে ফেলেছে। ঈর্ষায় রহিমার মা'র চোখ জ্বালা করতে লাগল।

কাদের বলল, দেহায় কেমন খালাজী ?

রহিমার মা বিরক্ত মুখে বলল, যেমুন চেহারা তেমুন দেহায়। ভ্যান ভ্যান করিস না।

আয়নায় অনেকক্ষণ কাদের নিজেকে দেখল। তারপর বারান্দায় একটু হেঁটে আসল। চমশা পরার পর তার হাঁটার ভঙ্গিও বদলে গেছে।

সেই রাতে মনের কষ্টে রহিমার মার ঘুম হল না। তার মেজাজ খারাপের এই হচ্ছে পূর্ব ইতিহাস। মিনু পূর্ব ইতিহাস জানেন না। কাজেই রহিমার মা যখন এসে তাঁকে বলল, "আমার চউক্ষে যেন কি হইছে আম্মা," তখন সঙ্গত কারণেই চিন্তিত হয়ে বললেন, কি হয়েছে ?

'চউখ খালি কড় কড় করে।'

'তাই না-কি ?'

'আবার চিলিক দিয়ে বেদনা হয়।'

'ডাক্তার দেখাও।'

'ডাক্তার লাগতো না আম্মা। চশমা দিলে ঠিক হইব। চশমার দাম বেশি না- একশ দশ। কাদের কিনছে।'

'কাদের চশমা কিনেছে ?'

'জ্বি আম্মা। জেবনের একটা সাধ আহলাদ আছে না ?'

মিনু বিরক্ত হয়ে বললেন, কাদের যা করে তোমাকে তাই করতে হবে ? তুমি বড় যন্ত্রণা কর রহিমার মা।

'কয় দিন আর বাঁচুম আম্মা কন ?"

'আচ্ছা ঠিক আছে যাও চশমা দেয়া হবে।'

www.BDeBooks.Com

রহিমার মা'র চোখে আনন্দে পানি এসে গেল।

চশমা এল তার পরের দিন। রহিমার মা মুগ্ধ। আয়নায় সে নিজেকে চিনতে পারে না। কাদের বলল, ময়লা শাড়িডা বদলাইয়া একটা ভাল দেইখ্যা শাড়ি পরেন খালা। চশমার একটা ইজ্জত আছে।

রহিমার মা তৎক্ষণাৎ শাড়ি বদলে গত ঈদে পাওয়া সাদা শাড়ি পরে ফেলল। নতুন শাড়ি এবং চশমার কারণে ছোট খাট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

মনসুর বিকেলে এসেছে। তাকে খবর দেয়া হয় নি, নিজ থেকেই এসেছে। এ বাড়িতে আসবার জন্যে অনেক ভেবেচিন্তে একটা অজুহাতও তৈরি করেছে। অজুহাত খুব যে প্রথম শ্রেণীর তা নয়, তবে মনসুরের কাছে মনে হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর। সে ঠিক করে রেখেছে মিলিকে বলবে, আজ আমার জন্মদিন। কাজেই এই বাড়ির মুরুব্বীদের দোয়া নিতে এসেছি। জন্মদিনের কথায় সবাই খানিকটা দুর্বল হয়। মিলিও নিশ্চয়ই হবে। যতক্ষণ কথা বলার প্রয়োজন তার চেয়েও কিছু বেশি কথা বলবে। চা নাশতা দেবে। একটা মানুষতো আর একা একা বসে চা খাবে না। মিলি বসবে তার সামনে। কি ধরনের কথা সে মিলির সঙ্গে বলবে তা মোটামুটি ঠিক করা। কয়েকটা হাসির গল্প বলবে মিলিকে হাসিয়ে দিতে হবে। মেয়েরা রসিক পুরুষ খুব পছন্দ করে। হাসির গল্প সে নিজেও পছন্দ করে কিন্তু তেমন বলতে পারে না।

মনসুর দরজার বেল টিপল। দরজা খুলে দিল রহিমার মা। তার চোখে চশমা, পরনে ইস্ত্রী করা ধবধবে সাদা শাড়ি। মিলি সোফায় বসে কি একটা ম্যাগাজিন পড়ছে।

মনসুর রহিমার মার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, আজ আমার জন্মদিন।

রহিমার মা এবং মিলি দু'জনই বিস্মিত হয়ে ডাক্তারে দিকে তাকাল। মনসুর মুখের হাসি আরও বিস্তৃত করে বলল, ভাবলাম জন্মদিনে মুরুব্বীদের কাছে থেকে দোয়া নিয়ে যাই। আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন—

এই বলে মনসুর নিচু হয়ে রহিমার মা-র পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল।

মিলি তার হতভম্ব ভাব সামলে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, রহিমার মা যাওতো ডাক্তার সাহেবের জন্যে চা নিয়ে এসো।

রহিমার মা চলে যেতেই মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, মনে হচ্ছে একটা ভুল হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ কিছুটা হয়েছে। আপনি মুরুব্বীদের দোয়া নিতে এসেছেন। রহিমার মা বয়সে আপনার অনেক অনেক বড় সেই হিসেবে মুরুব্বী— কাজেই এত আপসেট হচ্ছেন কেন ? বসুন। যা হবার হয়ে গেছে।'

'জ্বি না। বসব না। কাইন্ডলি এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি যদি খাওয়ান। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি বসুন। পৃথিবী উল্টে যাবার মত কিছু হয়নি। এ রকম ভুল আমরা সব সময় করি।'

মিলি ভেতর থেকে ঠাণ্ডা পানি এনে দেখল ডাক্তার নেই। এই প্রথম ডাক্তার ছেলেটির জন্যে সে এক ধরনের মায়া অনুভব করল। তার ইচ্ছা করতে লাগল কাদেরকে পাঠিয়ে মনসুরকে ডেকে আনায়। চা খেতে খেতে দু'জনে খানিকক্ষণ গল্প করে। বেচারা বড় লজ্জা পেয়েছে।

৬

দুপুরের খাওয়ার পর ফরিদ টানা ঘুম দেয়। বাংলাদেশের জল হাওয়ার জন্যে এই ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তার ধারণা। এতে মেজাজের উগ্র ভাবটা কমে যায়— স্বভাব মধু হয়। ফরিদের ধারণা জাতি হিসেবে বাঙালি যে ঝগড়াটে হয়ে যাচ্ছে তার কারণ এই জাতি দুপুরে ঠিক মত ঘুমুতে পারছে না।

তার ঘুম ভাঙল বিকেল চারটায়। চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখল সাত-আট বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে এবং চার-পাঁচ বছরের পরীর মত একটি মেয়ে পা তুলে তার খাটে বসে আছে। গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। শিশুদের ফরিদ কখনো পছন্দ করে না। শিশু মানেই যন্ত্রণা। ফরিদের ভুরু কুঞ্চিত। সে গম্ভীর গলায় বলল, তোমরা কে?

ছেলেটি তার চেয়েও গম্ভীর গলায় বলল, আমরা মানুষ।

'এখানে কি চাও?'

'কিছু চাই না।'

ছোট মেয়েটি বলল, আপনি আমাদের ধমক দিচ্ছেন কেন? ধমক দিলে আমরা ভয় পাই না।

'নাম কি তোমার?'

'আমার নাম নিশা, ওর নাম টগর। ও আমার ভাই।'

'আপনার নাম কি?'

'এতো দেখি বড় যন্ত্রণা হলো।'

'আমাদের নাম জিজ্ঞেস করেছেন আমরা বললাম, এখন আপনার নাম জিজ্ঞেস করেছি আপনি বলবেন না কেন?'

'আমার নাম ফরিদ।'

'আপনাকে কি বলে ডাকব?'

'কিছু ডাকতে হবে না।'

'বড়দের কিছু ডাকতে হয়, চাচা, মামা, খালু এইসব।'

'বললাম তো কিছু ডাকতে হবে না।'

'নাম ধরে ডাকব?'

'আরে বড় যন্ত্রণা করছে তো। নামো বিছানা থেকে। নামো।'

টগর এবং নিশা গম্ভীর মুখে নামল। ঘর থেকে বের হল কিন্তু পুরোপুরি চলে গেল না, পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে পর্দা সরিয়ে মুখ দেখায় এবং

www.BDeBooks.Com

জীব বের করে ভেংচি কাটে আবার মুখ সরিয়ে নেয়। রাগে ফরিদের সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। এত সাহস এই দুই বিচ্ছুর! এল কোত্থেকে এইগুলো ? খুব সহজে এগুলোর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এরা তার হাড় ভাজা ভাজা করে দেবে। সে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে শিশুদের সঙ্গে তার এক ধরনের বৈরী সম্পর্ক আছে। শিশুরা তাকে নানান ভাবে যন্ত্রণা দেয়।

ফরিদ ডাকল, কাদের কাদের।

অবিকল ফরিদের মতে করে টগর বলল, কাদের-কাদের।

ফরিদ চেঁচিয়ে বলল, এই বিচ্ছু দুটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে তো কাদের।

ছোট মেয়েটি ফরিদের মত করে বলল, এই বিচ্ছু দুটাকে ঘার ধরে বের করে দেতো।

ফরিদ প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'উফ!'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলল— 'উফ!'

টগর এবং নিশা এখন যে খেলাটা খেলছে তার নাম 'নকল খেলা।' এই খেলা হচ্ছে মানুষকে রাগিয়ে দেবার খেলা। যাকে রাগিয়ে দেয়া দরকার তার সঙ্গে এই খেলা খেলতে হয়। সে যা বলে তা বলতে হয়। অবশ্যি বড়দের সঙ্গে এই খেলা খেলতে নেই। তবে টগর এবং নিশা দু'জনেরই মনে হচ্ছে এই মানুষটা বড় হলে তার মধ্যে শিশু সুলভ একটা ব্যাপার আছে। তার সঙ্গে এই খেলা অবশ্যই খেলা যায়।

ফরিদ বিছানায় উঠে বসল। চাপা গলায় বলল, শিশুরা শোন, আমি কিন্তু প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছি।

নিশা বলল, শিশুরা শোন, আমি কিন্তু প্রচণ্ড রেগে যাচ্ছি।

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। টগর অবিকল তার মত ভঙ্গিতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বোনকে নিয়ে চলে গেল। দুই বিচ্ছু চলে গেছে দেখেও ফরিদের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে এক্ষুনি এই দুইজন ফিরে আসবে।

রাতে রহিমার মা কাঁদো কাঁদো গলায় মিনুকে বলল, আম্মা বড় বিপদে পড়েছি।

মিনু বললেন, কি বিপদ ?

'নতুন ভাড়াইট্যার পুলা আর মইয়া দুইটা বড় যন্ত্রণা করে।'

'কি যন্ত্রণা করে ?'

'আমি যে কথাটা কই হেরাও হেই কথাটা কয়। ভেংগায় আম্মা।'

বলতে বলতে রহিমা মা কেঁদে ফেলল। মিনু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, ছোট দুটা বাচ্চা কি করেছে এতে একেবারে কেঁদে ফেলতে হবে ? বাচ্চারা এরকম করেই। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসবে না।

টগর এবং নিশা যা করছে তাকে ঠিক সামান্য বলে উড়িয়ে দেবার পথ নেই। তারা বারান্দায় রাখা সোবাহান সাহেবের গড়গড়ায় তামাক টেনেছে। গেট

বেয়ে দেয়ালের মাথায় চড়ে সেখান থেকে লাফিয়ে নিচে নেমেছে। মিনুর পানের বাটা থেকে জর্দা দিয়ে পান খেয়ে বমি করে ঘর ভাসিয়েছে। খাবার ঘরের সবগুলো চেয়ার একত্র করে রেলগাড়ি রেলগাড়ি খেলা খেলেছে। মিনু ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারে নি বরং মায়ায় তাঁর মন ভরে গেছে। এই বয়সে বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বেড়ানো বেশ শক্ত তবু তিনি দীর্ঘসময় নিশাকে কোলে নিয়ে বেড়ালেন। নিশা দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রইল। টগর বলল, তুমি আমাকে কখন কোলে নেবে ? আমার ওজন বেশি না, নিশার চেয়ে মাত্র পাঁচ পাউন্ড বেশি।

এরকম বাচ্চাদের উপরে কি কেউ রাগ করতে পারে ?

৭

সোবাহান সহেব তাঁর মাছের সমস্যা নিয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন। মাছ সম্পর্কে জানার জন্যে তিনি ময়মনসিংহের এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির ফিসারি ডিপার্টমেন্টে টেলিফোন করেছিলেন। দেখা গেল তারা আমেরিকার মাছ সম্পর্কে প্রচুর জানেন। দেশি মাছ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। বইপত্রও নেই। সোবাহান সাহেব বললেন, বিদেশি মাছ সম্পর্কে জেনে কি হবে ?

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন, দেশি বিদেশি প্রশ্ন তুলছেন কেন ? আমরা মাছ সম্পর্কে জানি, একটা স্পেসিস সম্পর্কে জানি। দেশি মাছ সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানি না তাওতো না। বই পত্রে লেখা হচ্ছে, গবেষণা হচ্ছে।

'কি গবেষণা হচ্ছে ?'

'কি গবেষণা হচ্ছে তা আপনাকে বলতে হবে না-কি ?'

'কেন হবে না ? আমি একজন নাগরিক। আমাদের টাকায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে। কাজেই আমাদের জানবার অধিকার আছে।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে আগুন হয়ে বললেন, অধিকার ফলাবেন না।

'কেন অধিকার ফলাব না ? আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন ? এ রকম রেগে গেলে ছাত্র পড়াবেন কিভাবে ?

'আমার ছাত্র পড়ানো নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।'

'কেন হবে না ?'

অধ্যাপক ভদ্রলোক খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। সোবাহান সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগেও চেষ্টা করলেন। সেখানেও এই অবস্থা। অধ্যাপকরা অত্যন্ত সন্দেহজনক ভঙ্গিতে জানতে চান— আপনি কে ? মাছ সম্পর্কে জানতে চান কেন ?

সোবাহান সাহেব মৎস্য বিভাগের অফিসে গেলেন। সেখানকার অবস্থা ভয়াবহ। বড় দরের সব অফিসাররাই হয় মিটিং-এ নয় সেমিনারে, কয়েকজন দেশের বাইরে। এরচে ছোটপদের অফিসারা হয় ট্যুরে কিংবা ব্যস্ত। একজনকে

www.BDeBooks.Com

পাওয়া গেল, তিনি তেমন ব্যস্ত না। চা খেতে খেতে চিত্রালী পড়ছেন। সোবাহান সাহেব হুট করে ঢুকে পড়লেন। ভদ্রলোক বিরক্ত মুখে বললেন, কি চান ?

'মাছ সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'কেন ?'

'কারণ আপনারা মৎস্য বিভাগের লোক।'

'বলুন কি ব্যাপার।'

'আপনি পত্রিকাটা আগে পড়ে শেষ করুন তারপর কথা বলব।'

ভদ্রলোক পত্রিকা নামিয়ে কঠিন চোখে তাকালেন। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, বলুন কি বলতে চান ?

সোবাহান সাহেব বললেন, দেশে এই যে মছের তীব্র অভাব তাই নিয়ে ক'দিন ধরে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম।

'আপনাকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছে কে ?'

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি কি দেশের সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারব না ?

'অবশ্যই পারবেন। চিন্তা করে কি পেলেন সেটা যদি অল্প কথায় বলতে পারেন, বলুন। গল্প করলেতো আমাদের চলে না, অফিসের কাজকর্ম আছে।'

'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আমরা যদি এক বছর মাছ না খাই। যদি মাছরা একটা বছর নির্বিঘ্নে বংশ বিস্তার করতে পারে তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'ভাল কথা এটা আমাকে বলছেন কেন ?'

'আপনাকে বলছি কারণ আপনারা যদি জনগণকে বোঝাতে পারেন, মাছ না খাওয়ার একটা ক্যাম্পেইন যদি করেন তাহলে....'

'আপনি একটা কথা বলবেন আর ওম্নি আমরা ঢাক ঢোল নিয়ে সেই কথা প্রচারে লেগে যাব, এটা মনে করলেন কেন ?'

'আমার কথায় যদি যুক্তি থাকে তাহলে আপনারা কেনইবা প্রচার করবেন না ?'

'আপনার কথায় কোনই যুক্তি নেই।'

'যুক্তি নেই ?'

'জ্বি না। প্রথমত দেশে মাছের কোন অভাব নেই। সরকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছেন সেই সব প্রকল্প খুব ভাল কাজ করছে। ফিস প্রোটিনে আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ।'

'স্বয়ংসম্পূর্ণ ?'

'অবশ্যই। বিদেশেও আমরা মাছ রপ্তানি করছি। চিংড়ি মাছ এক্সপোর্ট করে কি পরিমাণ ফরেন এক্সচেঞ্জ আমাদের আসে আপনি জানেন ?'

'জ্বি না।'

'আপনার জানার দরকারও নেই। আজে বাজে জিনিস নিয়ে মাথা গরম করবেন না এবং আমাদের সময় নষ্ট করবেন না।'

সোবাহান সাহেবের মুখ লজ্জায় অপমানে কালো হয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মানে বসা ভদ্রলোক সিনেমা পত্রিকাটি মুখের উপর তুলে ধরতে ধরতে নিজের মনে বললেন, পাগল ছাগলে দেশ ভর্তি হয়ে গেছে।

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, আপনি আমাকে পাগল বললেন ?'

'আরে না ভাই আপনাকে বলি নাই। দেশে আপনি ছাড়াও তো আরো পাগল আছে ? আচ্ছা এখন যান স্লামালিকুম।'

সোবাহান সাহেব ঘরে ফিরলেন প্রবল জ্বর নিয়ে। বাড়ির গেটের সামনে মিলি দাঁড়িয়েছিল, সে বাবাকে দেখে চমকে উঠে বলল, তোমার এই অবস্থা কেন বাবা ? কি হয়েছে ?

সোবাহান সাহেব জড়ালো গলায় বললেন, আমাকে পাগল বলেছে। মুখের উপর পাগল বলেছে।

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কে তোমাকে পাগল বলেছে ?

'কে বলেছে সেটাতো ইম্পর্টেন্ট না। পাগল বলেছে এটাই ইম্পর্টেন্ট।'

'মোটেই না বাবা। পাগল কোন গালাগালি নয়। পাগল আদরের ডাক। পৃথিবীর সমস্ত প্রতিভাবান লোকদের আদর করে পাগল ডাকা হয়।'

মেয়ের কথায় সোবাহান সাহেব খুব যে একটা সান্ত্বনা পেলেন তা নয়। রাতে ভাত খেলেন না। সন্ধ্যার পর পরই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন। মানুষের কুৎসিত রূপ তাঁকে বড় পীড়া দেয়।

ফরিদ রাতে খাওয়া শেষে দুলাভাইকে দেখতে এল। বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, কে নাকি আপনাকে পাগল বলেছে, আর তাতেই আপনি চুপসে গেছেন।

'তোমাকে পাগল বললে কি তুমি খুশী হতে ?'

'আমাকে বললে আমি ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতাম। যদি দেখতাম আমাকে পাগল বলার পেছনে যুক্তি আছে, তাহলে সহজভাবে ট্রুথকে একসেপ্ট করতাম। এখন আপনি বলুন, কেন সে আপনাকে পাগল বলল ? আপনি কি করেছিলেন বা কি বলেছিলেন ?'

'আমি শুধু বলেছিলাম এক বছর যদি আমরা মাছ না খাই তাহলে মাছরা নির্বিঘ্নে বংশ বিস্তার করবে। মাছের অভাব দূর হবে।'

'এই বলায় সে আমাকে পাগল বলল ?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ ভদ্রলোকের উপর আমার রেসপেক্ট হচ্ছে দুলাভাই। আপনাকে পাগল বলার তার রাইট আছে। এর চেয়ে খারাপ কিছু বললেও কিছু বলার ছিল না।

www.BDeBooks.Com

একটা মাছের পেটে কতগুলি ডিম থাকে ? মাঝারি সাইজের একটা ইলিশ মাছে ডিম থাকে নয় লক্ষ সাতষট্টি হাজার। মাছের সব ডিম ফুটে যদি বাচ্চা হয়, মাছের কারণে নদী নালা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রবল বন্যা হবে। মাছ চলে আসবে ক্ষেতে খামারে। ক্ষুধার্থ মাছ সব ফসল খেয়ে শেষ করে ফেলবে। পুরো দেশ চাপা পড়ে যাবে এক ফুট মাছের নিচে। কি ভয়াবহ অবস্থা চিন্তা করে দেখুন দুলাভাই।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। মনে মনে বললেন, গাধার গাধা। ঘর অন্ধকার বলে ফরিদ সোবাহান সাহেবের তীব্র বিরক্তি টের পেল না। সে মহা উৎসাহে বলে চলল, আপনি মনে হয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিংবা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করছেন না। আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি। ধরুন আমাদের দেশে মাছের মোট সংখ্যা একশ কোটি। খুব কম করে ধরলাম মোট সংখ্যা তারচে অনেক বেশি। একশ কোটি মানে টেন টু দি পাওয়ার এইট। টেন বেস লগারিদমে এটা হল আট। এই মাছের অর্ধেক যদি স্ত্রী মাছ হয় তাহলে টেন বেস লগে কি দাঁড়ায় ? আচ্ছা এক কাজ করা যাক, টেন বেস না ধরে নেচারেল লগারিদমে নিয়ে আসি। এতে পরে হিসেবে সুবিধা হবে।

সোবাহন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, বহিস্কার, এই মুহূর্তে বহিস্কার।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, আমাকে বলছেন ?

'হ্যাঁ, তোমাকে বলছি। বহিস্কার, বহিস্কার।'

'আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে চাচ্ছি দুলাভাই যে আপনার আচার-আচরণ পরিষ্কার ইংগিত করছে...'

'আবার কথা বলে, বহিস্কার।'

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে, বেশ খারাপ। অবশ্যি তার মন খারাপ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আজো হল না— নিজের ঘরে ঢোকা মাত্র মন ভাল হয়ে গেল। রাত কাটানোর খুব ভাল ব্যবস্থা করা আছে। ভিডিও ক্লাব থেকে স্পার্টকার্স ছবিটা আবার আনা হয়েছে, এবারে প্রিন্ট বেশ ভাল। আজ রাতে ছবি দেখা হবে। ছবি দেখার ফাঁকে ফাঁকে ডিসকাশন হবে কাদেরের সঙ্গে। ছবির খুঁটিনাটি কাদের এত ভাল বোঝায়ে ফরিদ প্রায়ই চমৎকৃত হয়। যেমন স্পটাকার্স ছবির এক অংশ স্পটাকর্সের সঙ্গে নিগ্রো গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে দু'জন একটা ঘরে অপেক্ষা করছে। উত্তেজনায় স্পার্টাকার্স কেমন যেন করছে। তার অস্থিরতা দেখে নিগ্রো হেসে ফেলল। অসাধারণ অংশ। ফরিদ বলল, দৃশ্যটা কেমন কাদের ? কাদের বলল, বড়ই চমৎকার মামা কিন্তুক বিষয় আছে।

'কি বিষয় ?'

'হাসিটা কম হইছে। আরেকটু বেশি হওনের দরকার।'

'উঁহু, বেশি হলে নান্দনিক দিক ক্ষুণ্ন হবে।'

'কিন্তুক মামা, হাসি যেমন হঠাৎ আইছে তেমন হঠাৎ গেলে ভাল হইত। এই হাসি হঠাৎ যায় না, ঠোঁটের মইধ্যে লাইগ্যা থাকে।'

ফরিদ সত্যি সত্যি চমৎকৃত হল। এ রকম প্রতিভা, বাজার করে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই খারাপ লাগে।

'মামা কি করছ ?'

'কিছু করছি নারে মিলি। আয়।'

মিলি ঘরে ঢুকল। হাসি মুখে বলল, তোমাদের ছবি এখনো শুরু হয় নি ?

'না।'

'আজ কি ছবি ?'

'স্পটাকার্স।'

'স্পটাকার্স না একবার দেখলে।'

'একবার কেন হবে, এ পর্যন্ত পাঁচবার হল। ভাল জিনিস অনেবার দেখা যায়।'

'আচছা মামা এই যে তুমি কিছুই কর না, খাও দাও ঘুমাও, ছবি দেখ, তোমার খারাপ লাগে না ?'

'না তো। খারাপ লাগবে কেন ? তুই যদি পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করিস তালে জানতে পারবি পৃথিবীর জনগষ্ঠির একটা বড় অংশ এভাবে জীবন কাটিয়ে দেয়। জনগষ্ঠির ইকুইলিব্রিয়াম বজায় রাখার জন্যেই এটা দরকার। জনতা এই অকর্মক অংশের কাজ হচ্ছে কর্মক অংশগুলোর টেনশন 'এ্যাবজর্ভ' করা। অর্থাৎ শত এ্যাবজর্ভারের মত কাজ করা।'

'সব ব্যাপারেই তোমার একটা থিওরী আছে, তাই না মামা ?'

'থিওরী বলা ঠিক হবে না, বলতে পারিস হাইপোথিসিস। 'থিওরী আর হাইপোথিসিস কিন্তু এক না—'

'চুপ করতো মামা।'

'তুই দেখি তোর বাবার মত হয়ে যাচ্ছিস। সব কিছুতে চুপ কর, চুপ কর।'

মিলি গম্ভীর গলায় বলল, আজ তোমার থিওরী শুনতে আসিনি মামা। আজ এসেছি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে।

'আমি কি করলাম ?'

'তুমি খুব অন্যায় করেছ মামা।'

'অন্যায় করেছি ?'

'হ্যাঁ করেছ। বাবার স্বভাব চরিত্র তুমি খুব ভাল করেই জান। তুমি জান বাবা কত অল্পতে আপসেট হয়। সব জেনেশুনে তুমি তাকে আপসেট কর। মাছের সমস্যাটা নিয়ে বাবা একদিন ধরে ভাবছে, হতে পারে তার ভাবনাটা ঠিক না। কিন্তু কেউ যেখানে ভাবছে না বাবাতো সেখানে ভাবছে।'

'তা ভাবছে।'

'তাকে আমরা সাহায্য না করতে পারি— ডিসকারেজ করব কেন ?'

'এসব উদ্ভট আইডিয়াকে তুই সাপোর্ট করতে বলছিস ?'

'হ্যাঁ বলছি। এতে বাবা শান্তি পাবে, সে বুঝবে যে সে একা না।'

www.BDeBooks.Com

তুই এমন চমৎকার করে কথা বলা কোত্থেকে শিখলি ?'

'সিনেমা দেখে দেখে শিখিনি —এইটুকু বলতে পারি।'

'তোর কথা বলার ধরন দেখে অবাকই হচ্ছি— ছোটবেলায় তো হাবলার মত ছিলি।'

'কি যে তোমার কথা মামা। আমি আবার কবে হাবলার মত ছিলাম ?'

মিলি উঠে দাঁড়াল। ফরিদ বলল, আচ্ছা যা তোর কথা রাখলাম। স্ট্রং সাপোর্ট দেব।

মিলি বলল, সবকিছুতেই তুমি বাড়াবাড়ি কর মামা, স্ট্রং সাপোর্টের দরকার নেই।

'তুই দেখ না কি করি।'

মিলি চিন্তায় পড়ে গেল। মামার কাজ কর্মের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। কি করে বসবে কে জানে। মামাকে কিছু না বলা বোধ হয় ভাল ছিল। মিলি নিজের ঘরে চলে গেল। মনটা কেন জানি খারাপ লাগছে। মন খারাপ লাগার যদিও কোন কারণ নেই। ইদানিং ব্যাপারটা ঘন ঘন ঘটছে। অকারণে মন খারাপ হচ্ছে।

'আফা ঘুমাইছেন ?'

'মিলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রহিমার মা দাঁড়িয়ে আছে।'

'কি ব্যাপার রহিমার মা ?'

'একটা সমস্যা হইছে আফা।'

'কি সমস্যা।'

'চশমা দেওনের পর থাইক্যা সব জিনিস দুইটা করে দেখি।'

'বল কি ?'

'হ আফা। এই যে আফনে চেয়ারে বইয়া আছেন মনে হইতাছে দুইখান আফা। একজন ডাইনের আফা একজন বায়ের আফা।'

মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রহিমার মা বলল, টেবিলের উপরে একখান গেলাস থাকে তখন আমি দেখি দুইখান গেলাস, এই দুই গেলাসের মাঝামাঝি হাত দিলে আসল গেলাস পাওয়া যায়।

'কি সর্বনাশের কথা। চশমা পরা বাদ দাও না কেন ?'

'অত দাম দিয়া একখান জিনিস কিনছি বাদ দিমু ক্যান ? সমিস্যা একটু হইতাছে, তা কি আর করা কন আফা, সমিস্যা ছাড়া এই দুনিয়ায় কোন জিনিস আছে ? সব ভাল জিনিসের মইদ্যে আল্লাহতালা মন্দ জিনিস ঢুকাইয়া দিছে। এইটা হইল আল্লাহতালার খুদরত। যাই আফা।'

রহিমার মা চলে যাচ্ছে। পা ফেলছে খুব সাবধানে, কারণ সে শুধু যে প্রতিটি জিনিস দুটা করে দেখছে তাই না ঘরের মেঝেও উঁচু নিচু দেখেছে। তার কাছে মনে হচ্ছে চারদিকে অসংখ্য গর্ত। এসব গর্ত বাঁচিয়ে তাকে সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। চশমা পড়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।

মিলির পড়ায় মন বসছে না। সে বাতি নিভিয়ে বারান্দায় এস দাঁড়াল। উপর থেকে টগর এবং নিশির খিলখিল হাসি শোনা যাচ্ছে। এত রাতেও বাচ্চা দুটি জেগে আছে। এদের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোনদিন সন্ধ্যা না মিলতেই ঘুমিয়ে পড়ে আবার কোনোদিন গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। আনিস সাহেব বাচ্চা দুটিকে ঠিকমত মানুষ করতে পারছেন না। সারাদিন কোথায় কোথায় নিয়ে ঘুরেন। আগের স্কুল অনেক দূরে কাজেই তারা এখন স্কুলেও যাচ্ছে না।

ভদ্রলোকের উচিত আশেপাশের কোন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া। তিনি তাও করছেন না।

বাচ্চদের হাসির সঙ্গে সঙ্গে একবার তাদের বাবার হাসি শোনা গেল। কি নিয়ে তাদের হাসাহাসি হচ্ছে জানতে ইচ্ছ করছে— নিশ্চয়ই কোন তুচ্ছ ব্যাপার। এমন নির্মল হাসি সাধারণত তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়েই হয়।

মিলির ধারণা সত্যি। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েই হাসাহাসি হচ্ছে। আনিস তার ছেলেবেলার গল্প করছে, তাই শুনে একেকজন হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আনিসের ছেলেবেলা সিরিজের প্রতিটি গল্পই এদের শোনা, তবু কোন এক বিচিত্র কারণে গল্পগুলো এদের কাছে পুরানো হচ্ছে না।

নিশা বলল, তুমি খুবই দুষ্ট ছিলে তাই না বাবা ?

'না দুষ্ট ছিলাম না। আমর বয়েসী ছিলেদের মধ্যে আমি ছিলাম সবচে শান্ত। তবু কেন জানি সাবই আমাকে খুব দুষ্ট ভাবত।'

'বাবা আমরা কি দুষ্ট না শান্ত ?'

'তোমার খুবই দুষ্ট কিন্তু তোমাদের সবাই ভাবে শান্ত। অনেক রাত হয়ে পড়েছে এসো শুয়ে পরি।'

টগর বলল, আজ ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।

'কি করতে ইচ্ছা করছে ?'

'গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে। তোমাদের বিয়ের গল্পটা কর না বাবা।।'

'এই গল্পতো আনেকবার শুনেছ, আবার কেন ?'

'আরেকবার শুনতে ইচ্ছা করছে।'

'এই গল্প শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুতে যাবে তো ?'

'হ্যাঁ যাব।'

'তোমার মা ছিল খুব চমৎকার একটি মেয়ে...

নিশা বাবার কথা শেষ হবার আগেই বলল, আর ছিল খুব সুন্দর।

'হ্যাঁ খুব সুন্দরও ছিল। তখনো আমি তাকে চিনি না। একদিন নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে বই কিনতে গিয়েছি, একই দোকানে তোমার মাও গিয়েছে...

টগর বলল, মার পরণে আসমানী রঙের একটা শাড়ি।

'হ্যাঁ তার পরণে আসমানী রঙের শাড়ি ছিল।'

নিশা বলল,সে বই কিনতে গিয়েছে কিন্তু বাসা থেকে টাকা নিয়ে যায় নি।

আনিস হেসে ফেলল।

www.BDeBooks.Com

নিশা বলল, হাসছ কেন বাবা ?

'তোমরা দু'জনে মিলেইতো গল্পটা বলে ফেলছ, এই জন্যেই হাসি আসছে। চল আজ শুয়ে পড়া যাক। ঠান্ডা লাগছে।'

তারা আপত্তি করল না। বিছানায় নিয়ে শোয়ানো মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকদিন পর আনিস তার খাতা নিয়ে বসল। উপন্যাসটা যদি শেষ করা যায়। নিতান্তই সহজ সরল ভালবাসাবাসির গল্প। অনেকদূর লেখা হয়ে আছে কিন্তু আর এগুলো যাচ্ছে না। একেই বোধ হয় বলে রাইটার্স ব্লক, লেখক চরিত্র নিয়ে ভাবতে পারেন, মনে মনে কাহিনী অনেক দূর নিয়ে যেতে পরেন কিন্তু লিখতে গেলেই কলম আটকে যায়। যেন অদৃশ্য কেউ এসে হাত চেপে ধরে, কানে কানে বলে— না তুমি লিখতে পারবে না।

আনিস রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে দু'পৃষ্ঠা লিখল। ঘুমুতে যাবার আগে সেই দুই পৃষ্ঠা ছিড়ে কুচি কুচি করে ফেলল।

৮

সকাল। দশটার উপর বাজে।

খাবার টেবিলে ফরিদের নাশতা সাজানো। ফরিদ নাশতা খেতে আসছে না সে বাগানে বসে আছে। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সারারাত ঘুম হয়নি। অঘুমোজনিত ক্লান্তির সঙ্গে এক ধরনের চাপা উত্তেজনাও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মিলিকে খবর পাঠানো হয়েছে। ফরিদ অপেক্ষা করছে মিলির জন্যে। মিলি ইউনিভার্সিটিতে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই নিচে নামল। মামার খোঁজে বাগানে গেল।

একটা ব্যাপার মামা ?'

'সারারাত ঘুম হয়নিরে মিলি।'

'তাতে তো তোমার খুব অসুবিধা হবার কথা না। প্রচুর ঘুম তোমার একাউন্টে জমা আছে। বছর খানেক না ঘুমালেও কিছু হবে না।'

'তোর কি খুব তাড়া আছে ?'

'হ্যাঁ আছে। এগারোটায় ক্লাস, এখন বাজে দশটা দশ।'

'আজকের ক্লাসটা না করলে হয় না ?'

'না হয় না। ব্যাপারটা কি বলে ফেল।'

'অদ্ভুত একটা আইডিয়া মাথায় চলে এসেছে। অন্ধকারে যেন একটা এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠল।'

'তাই না-কি ?'

'দুলা ভাইয়ের মৎস্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম। কি করে তাঁকে সাপোর্ট করা যায় এই সব ভাবতে ভাবতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি হঠাৎ মাথার মধ্যে দপ করে হাজার পাওয়ারের বাতি জ্বলে উঠল। আমি ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠলাম।'

'আইডিয়া পেয়ে গেল ?'

'রাইট। আইডিয়া পেয়ে গেলাম, ছবি বানাব।'

'ছবি বানাবে মানে ?'

'দেশের মৎস্য সম্পদ নিয়ে একটা শর্ট ফ্লিম। মাছের জীবন কথা বলতে পারিস। মাছদের জীবনে আনন্দ-বেদনার কাব্য। ছবির নামও ঠিক করে ফেললাম। ছবির নাম— 'হে মাছ।'

'হে মাছ ?'

'হ্যাঁ— হে মাছ। এই ছবি যখন রিলিজ হবে তখন চারদিকে হৈ চৈ পরে যাবে। মৎস্য সমস্যার 'এ টু জেড' পাবলিক জেনে যাবে। দুলাভাই যা চাচ্ছিলেন তাই হবে তবে অনেক তাড়াতাড়ি হবে। এক গুলিতে যুদ্ধ জয় যাকে বলে।'

'ছবি যে বানাবে টাকা পাবে কোথায় ?'

'কোন মহৎ কাজ কখনো টাকার অভাব আটকে থাকে বল ?'

'মামা যাই, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'একদিন ইউনিভার্সিটিতে না গেলে কি হয় ?'

'অনেক কিছু হয়। তুমি তোমার চিন্তা ভাবনা করতে থাক পরে শুনব।'

ফরিদ সারা দুপুর দরজা বন্ধ করে বসে রইল। কাদেরের কাজ হল কিছুক্ষণ পর পর চা এনে দেয়া। ফরিদ কোথায় যেন পড়েছিল তামাকের নিকোটিন ক্রিয়েটিভিটিতে সাহায্য করে। কাদেরকে দিয়ে সিগারেট আনানো হল। সিগারেটের ধূঁয়া মাথা ঘুরা, বমি ভাব এবং কাশি তৈরি ছাড়া অন্যকোনভাবে সাহায্য করল না। দুপুরে ফরিদ কিছু খেল না— শুধু একটা টোস্ট বিসকিট এবং আধ কাপ দুধ। কারণ ফুল স্টমাকে ক্রিয়েটিভ কাজ কিছু হয় না। জগতে বড় বড় ক্রিয়েটিভ কাজ করছে প্রতিভাবান ক্ষুধার্ত মানুষ। ক্ষুধার সঙ্গে প্রতিভার ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে।

সন্ধ্যা নাগাদ 'হে মাছ' চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি হয়ে গেল। প্রথম পাঠক সৈয়দ মোহাম্মদ কাদের। ফরিদ বলল, কেমন বুঝছিস কাদের ?

কাদের গাঢ় স্বরে বলল, বোঝাবুঝির কিছু নাই মামা— ফাডাফাডি জিনিস হইছে!

'ক্লাইমেক্সগুলো কেমন এসেছে ?'

'কেলাইমেক্সের কথা কইয়া আর কাম কি মামা ? ফলে পরিচয়। এই দেহেন শইলের লোম খাড়া হইয়া গেছে। হাত দিয়ে দেহেন।'

ফরিদ হাত দিয়ে দেখল— যে কোন কারণেই হোক কাদেরের গায়ের লোম সত্যি সত্যি খাড়া হয়ে আছে।

'কাদের!'

'জ্বি মামা।'

'এখনো ফাইন্যাল করিনি তবে মনে হচ্ছে তোকে একটা রোল দেব।'

www.BDeBooks.Com

'কি কইলেন মামা ?'

'নৌকার হতদরিদ্র মাঝির ভূমিকা তোর পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

কাদের স্তম্ভিত। সে মূর্তির মত বসে রইল। নড়াচড়া করতে পারল না।

সোবাহান সাহেবের শরীর আজ বেশ ভাল। জ্বর নেই। ক্লান্তির ভাব ছাড়া তার কোন শারীরিক অসুবিধাও নেই। তিনি যথারীতি বারান্দায় তাঁর ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তার কোলে বিশাল খাতা যার মলাটে লেখা মৎস্য সমস্যা। আজ আবার মৎস্য সমস্যা নিয়ে বসেছেন। বাংলাদেশের মাছের পূর্ণ তালিকা এখনো তৈরি হয়নি। ছোট প্রজাতির মাছগুলোর একেক অঞ্চলে একেক নাম। এও এক যন্ত্রণা।

রহিমার মা সোবাহান সাহেবের সামনে বসে আছে। মাছের নাম বলছে। বেশ কিছু নাম সোবাহান সাহেব তার কাছ থেকে পেয়েছেন।

'কি নাম বললে ?'

'দাড়কিনি মাছ।'

'দাড়কিনি মাছ ? সত্যি সত্যি এই নামে কোন মাছ আছে না বসে বসে বানাচ্ছ ? দাঁড়কাকের কথা জানি। দাড়কিনিতো কখনো শুনিনি।'

'আছে, আফনে লেহেন— পিতল্ল্যা মাছ।'

পিতল্ল্যা মাছ ?'

'জ্বি।'

'সেটা কেমন ?'

'খুব ছোড, লেজ আছে।'

'ফাজলামি করছ না— কি রহিমার মা ? লেজ তো সব মাছেরই আছে। এমন কোন মাছ আছে যার লেজ নেই ?'

'থাকতেও পারে। আল্লাহর কুদরতেরতো কোনো সীমা নাই।'

'আচ্ছা তুমি এখন যাও।'

নামডা লেখছেনতো— পিতল্ল্যা মাছ। পিতলের লাহান রং এই কারণে নাম পিতল্ল্যা মাছ।'

সোবাহান সাহেব পিতল্ল্যা মাছ লিখলেন তবে ব্রাকেটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রাখলেন।

আনিসকে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেল। তার সঙ্গে টগর এবং নিশা। আনিস হাসিমুখে বলল, স্লামালিকুম স্যার।

টগর এবং নিশাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, স্লামালিকুম স্যার, স্লামালিকুম স্যার।

'যাচ্ছ কোথায় আনিস ?'

'কোথাও না। ওদের নিয়ে একটু হাঁটতে বের হয়েছি। আপনি কি করছেন ?'

'আমি মাছের নাম লিখছি। তোমাকে বলেছিলাম না মৎস্য সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। আমাদের দেশ হচ্ছে মাছের দেশ অথচ মাছের কি ভয়াবহ আকাল।'

'তাতো বটেই।'

'দুটা মিনিট দাঁড়াওতে আনিস— আমি নামগুলো তোমাকে পড়ে শুনাচ্ছি। দেখ কোন নাম বাদ পড়েছে কিনা।'

সোবাহান সাহেব পড়তে শুরু করলেন— রুই, কাতল, মৃগেল, পাঙ্গাশ, চিতল, বোয়াল, কালি বাউস, নানিদ, চিংড়ি, কৈ, মাগুর, শিং, পুঁটি, শোল, মহাশোল, রিঠা, ভেটকি, টেংরা, খইলসা, কাঁইক্যা, পাবদা, লাটি, বাতাসী, আইড়, বাইম, তপসে, নলা, ফইল্যা, দাড়কিনি, পিতল্ল্যা— কিছু কি বাদ পড়ল আনিস ?

আনিস কিছু বলার আগেই নিশা বলল— ইলিশ বাদ পড়েছে স্যার। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সত্যি সত্যি 'ইলিশ' বাদ পড়েছে। এটা কি করে হল ? আসল মাছটাই বাদ পড়ে গেল। সোবাহান সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, এটা কেমন করে হল আনিস ? এত বড় ভুল কি করে করলাম ?

আনিস হাসিমুখে বলল, এটা কোন বড় ভুল না, খুবই সাধারণ ভুল—যা আমরা সব সময় করি। যে জিনিস চোখের সামনে থাকে তাকে আমরা ভুলে যাই। যে ভালবাসা সব সময় আমাদের ঘিরে রাখে তার কথা আমাদের মনে থাকে না। মনে থাকে হঠাৎ আসা ভালবাসার কথা।

'ঠিকই বলেছ আনিস।'

'স্যার যাই, স্লামালিকুম।'

তিনি জবাব দিলেন না। টগর বলল, স্যার যাই স্লামালিকুম। নিশাও বলল, স্যার যাই স্লামালিকুম। সোবাহান সাহেব হেসে ফেললেন। হঠাৎ তার কাছে মনে হল এই পৃথিবী বড়ই আনন্দের স্থান। এই পৃথিবীতে বাস করতে পারার সৌভাগ্যের জন্যে তিনি নিজের প্রতিই খানিক ঈর্ষা অনুভব করতে লাগলেন।

খাবার টেবিলে 'হে মাছে'র চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। খেতে বসেছে মিলি এবং ফরিদ। মিলির চিত্রনাট্য বিষয়ক কথাবার্তা শোনার আগ্রহ নেই, কিন্তু ফরিদ শোনাবেই। ফরিদ গম্ভীর গলায় বলছে—

'সব মিলিয়ে চরিত্র হচ্ছে চারটি। জেলে, জেলের স্ত্রী, খেয়া নৌকার মাঝি এবং একটা চোর।'

মিলি বলল, মাছ নিয়ে ছবি এর মধ্যে আবার চোর কেন ?

'পুরোটা না শুনেই কথা বলিস এটাই হচ্ছে তোর বড় সমস্যা। চোরের প্রয়োজন আছে বলেই চোর আছে। একটা হাই ড্রামা স্টোরী। এখানে টেনশান বিল্ড আপ করতে চোর লাগবে। জেলের নিজস্ব কোন নৌকা নেই, সে খেয়া নৌকায় করে মাছ মারতে বের হয়েছে। সেই নৌকায় বসে আছে একজন চোর। ওপেনিং শটে— নৌকা দেখা যাচ্ছে। দিনের অবস্থা ভাল না। ঢেউ উঠেছে। নৌকা টালমাটাল করছে। ফার্স্ট ডায়লগ জেলে দিচ্ছে— ক্যামেরা জুম করে জেলের মুখে চলে গেল, মিলি শুনছিসতো কি বলছি ?'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ শুনছি।'

'জেলে বলল, ও মাঝি ভাই, একখান গীত গান। মাঝি বলল, পেডে যদি ভাত না থাহে, গীত আইব ক্যামনে। জেলে বলল, কথা সত্য। নদীত নাই মাছ। তখন হঠাৎ কি মনে করে যেন মাঝি গান ধরল, ও আমার সোনা বন্ধুরে ও আমার রসিয়া বন্ধুরে। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে জাল ফেলা হবে। ক্যামেরা মাঝির মুখ থেকে কাট করে চলে যাবে জালে। সেখান থেকে কাট করে পানিতে, কাট করে লং শটে নৌকা। কাট মিড ক্লোজ আপে তোর মুখ।'

'আমার মুখ মানে ?'

'জেলের স্ত্রীর ভূমিকায় তুই অভিনয় করছিস। দুঃখ, অভাব অনটনে পর্যুদস্ত বাংলার শাশ্বত নারী। হৃদয়ে মমতার সমুদ্র, পেটে ক্ষুধার অগ্নি।'

'মামা, তোমার এসব ঝামেলায় কিন্তু আমি নেই।'

'আমি কি বাইরে থেকে আর্টিস্ট আনব না-কি ? নিজেদেরই কাজ করতে হবে। আমি পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব— অভিনয়ের 'অ' জানে না এমন মানুষ নিয়েও ছবি হয় এবং এ ক্লাস ছবি হয়। ডায়ালগ মুখস্ত করে ফেলবি, পরশু থেকে রিহার্সেল।'

মিলি বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমার এই পাগলামীর কোন মানে হয় মামা ? মুখে বললেই ছবি হয়ে যাবে ? টাকা-পয়সা লাগবে না ?'

'আমার কি টাকা পয়সার অভাব ? দুলাভাইয়ের কাছে আমার কত টাকা জমা আছে তুই জানিস ? প্রয়োজন হলে মগবাজারের বাড়ি বিক্রি করে দেব। মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত। একবার যখন বলে ফেলেছি— '

'হবে না। শুধু শুধু— '

'আগেই টের পেয়ে গেছিস শেষ পর্যন্ত কিছু হবে না ? জীবন সম্পর্কে এমন পেসিমিস্টক ভিউ রাখবি না। মনটাকে বড় কর।'

'আর কে কে অভিনয় করছে তোমার ছবিতে ?'

'এখানো ফাইন্যাল হয় নি। ডাক্তার ছোকরাকে বলে দেখব, আর দেখি নতুন ভাড়াটে আনিস রাজি হয় কি-না।'

'ওরা ছবিতে অভিনয় করবে কেন ?'

'শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ থেকে করবে। মহৎ কাজে শরিক হবার স্পিরিট থেকে করবে। আনিস ছোকরাকে আজ রাতেই ধরব।'

মিলি তাকিয়ে আছে মামার দিকে। সে যে খুব উৎসাহ বোধ করছে তা মনে হচ্ছে না।

'আনিস আছ না-কি ?'

আনিস দরজা খুলল। ফরিদকে দেখে অবাক হলেও ভাব ভঙ্গিতে তার কোন প্রকাশ হল না। সে হাসি মুখে বলল, স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি করে বললাম। কিছু মনে করনিতো ? আমি মিলির মামা।'

'জ্বি আমি জানি। আসুন ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে যাব না। কাজের কথা সেরে চলে যাব। খুব ব্যস্ত। ছবির স্ক্রীপ্ট করছি, মাছ নিয়ে শর্ট ফ্লিম বানাচ্ছি। নাম হচ্ছে 'হে মাছ।'

'তাই না কি ?'

'হ্যাঁ! তাই। এখন কথা হচ্ছে তুমি কি ছবিতে অভিনয় করবে ? এক গাদা কথা বলার দরকার নেই। বল হ্যাঁ কিংবা না।'

আনিস হকচকিয়ে গেল। কেউ তাকে অভিনয়ের জন্যে ডাকতে পারে তা তার মাথায় কখনো আসে নি। ফরিদ বলল, আমার ছবিতে একটা চোরের ক্যারেক্টার আছে। এই জন্যেই তোমার কাছে আসা নয়ত আসতাম না। তোমার চেহারায় একটা চোর চোর ভাব আছে।

আনিস হতভম্ব হয়ে বলল, আমার চেহারায় চোর চোর ভাব আছে ?

'হ্যাঁ আছে।'

আনিস বিস্মিত গলায় বলল, 'নিজের সম্পর্কে আজে বাজে কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আমার চেহারা চোরের মত এটা এই প্রথম শুনলাম।'

'সত্যি কথা আমি পেটে রাখতে পারি না। বলে ফেলি। তুমি আবার কিছু মনে করনি তো ?'

'জ্বি না, কিছু মনে করিনি।'

'অভিনয় করবে, না করবে না ?'

'করব। এ জীবনে অনেক কিছুই করেছি। অভিনয়টাই বা বাদ থাকবে কেন ?'

ফরিদ হৃষ্টচিত্তে নিচে নেমে এল। এখন ডাক্তার ছোকরা রাজি হলেই কাজ শুরু করা যায়। তবে ছোকরার ব্রেইন বলে কিছু নেই। তার কাছ থেকে অভিনয় আদায় করা কষ্ট হবে। ব্যাটা হয়তো রাজিও হতে চাইবে না। ফরিদের ধারণা ডাক্তার এবং ইনজিনিয়ার এই দুই সম্প্রদায়, অভিনয় কলার প্রতি খুব উৎসাহী নয়। আজ রাতেই ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেললে কেমন হয় ?

ফরিদ কাদেরকে পাঠাল মনসুরকে ডেকে আনতে। মনসুর সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। মনে হল যেন কাপড় পরে এ বাড়িতে আসার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। মনসুরের সঙ্গে ফরিদের নিম্নলিখিত কথোপকথন হল।

ফরিদ — তোমাকে একটি বিশেষ কারণে ডেকেছি। অসুখ বিসুখের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

মনসুর — জ্বি বলুন।

ফরিদ — আচ্ছা স্ত্রী হিসাবে মিলি কি তোমার জন্যে মানানসই হবে বলে মনে হয় ? মিলি আবার একটু বেঁটে, ভেবে চিন্তে বল।

www.BDeBooks.Com

মনসুর (তোতলাতে তোতলাতে) জ্বি মামা, অবশ্যই হবে। বেঁটে কি বলছেন ? পারফেক্ট হাইট। মানে আমার ধারণা-মানে—
ফরিদ মিলি স্বামী হিসেবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে ?
মনসুর অবশ্যই পারব। একশ বার পারব।
ফরিদ তাহলে কাল থেকে রিহার্সেল শুরু করে দাও।
মনসুর (বিস্মিত) কিসের রিহার্সেল ?
ফরিদ মিলি করবে জেলে স্ত্রীর ভূমিকা আর তুমি হচ্ছ জেলে।
মনসুর আমি মামা কিছুই বুঝতে পারছি না।
ফরিদ ছবি বানাচ্ছি। শর্ট ফ্লিম। সেখানে তোমার ভূমিকা হচ্ছে অভাব অনটনে পর্যুদস্ত জেলে, আর মিলি তোমার স্ত্রী।
মনসুর ঃ ছবির কথা বলছেন ?
ফরিদ ঃ অফকোর্স ছবির কথা বলছি। তুমি কি ভেবেছিলে ?
মনসুর ঃ (শুকনো গলায়) একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি খাব।

একগ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেয়ে মনসুর ক্ষীণ স্বরে বলল, মিস মিলি কি আমার সঙ্গে অভিনয় করতে রাজি হবেন ?

'সেতো রাজি হয়েই আছে।'

'তাই নাকি— আরেক গ্লাস পানি খাব।'

'মনসুর দ্বিতীয় গ্লাস পানি খেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় জানাল যে, সে অতি আগ্রহের সঙ্গে মিস মিলির অভিনয় করবে।

'তুমি আগে অভিনয় করেছ ?'

'জ্বি না।'

'অসুবিধা হবে না— আমি শিখিয়ে দেব। অভিনয় কঠিন কিছু না। জাল ফেলতে জান ?'

'শিখে নেবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মাথাটা কাল পরশু কামিয়ে ফেল।'

ডাক্তার হকচকিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে বলল, কি বললেন মামা ?

'মাথাটা কামিয়ে ফেলতে বললাম। জেলেদের মাথায় থাকে কদমছাট চুল। মাথা না কামালে ঐ জিনিস পাব কোথায় ? কোন অসুবিধা আছে ?'

'জ্বি না। কোন অসুবিধা নেই। আপনি যা বলবেন তাই করব।'

'ভেরি গুড।'

'অভিনয় নিয়ে মিস মিলির সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি ?'

ফরিদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'তার সঙ্গে আবার কি কথা ? সে অভিনয়ের জানে কি ? যা জানতে চাইবে আমাকে প্রশ্ন করলেই জানবে।'

ডাক্তার বলল, জ্বি আচ্ছা।

৯

ফজরের নামায শেষ করে সোবাহান সাহেব তসবি হাতে বাগানে খানিকক্ষণ হাঁটেন। আজও তাই করছেন। হঠাৎ মনে হল কে যেন গেটে টোকা দিচ্ছে। এত ভোরে কে আসবে এ বাড়িতে? তিনি বিস্মিত হয়ে গেট খুললেন— বিলু দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা বিশ্বাসই হল না। বিলুর মেডিকেল কলেজ খোলা। ক'দিন পরই পরীক্ষা। এই সময় সে ঢাকায় আসবে কেন? আনন্দ ও বিস্ময়ে সোবাহান সাহেব অভিভূত হয়ে গেলেন।

'আরে তুই? বিলু মা, তুই?'

বিলু বেবীটেক্সী ভাড়া মেটাতে মেটাতে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। ভোরবেলার আলোয় হলুদ রঙের শাল জড়ানো বিলুকে অপ্সরীর মত লাগছে। তার এই মেয়ে বড় সুন্দর। স্বর্গের সব রূপ নিয়ে এই মেয়ে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

ভাড়া মিটিয়ে রাস্তার উপরই বিলু নিচু হয়ে বাবার পা স্পর্শ করল। নরম গলায় বলল, তুমি এতো রোগা হয়েছ কেন বাবা? সোবাহান সাহেবের চোখে পানি এসে গেল। তাঁর বড় মেয়ের সামান্য কথাতেই তাঁর চোখ ভিজে উঠে। তিনি ধরা গলায় বললেন,

'কলেজ ছুটি না-কি মা?'

'ছুটি না— ছাত্ররা মারামারি করে সব বন্ধ-টন্ধ করে দিয়েছে। একমাত্র আমাদের মেডিকেল কলেজটাই খোলা ছিল। ঐটাও বন্ধ হল।'

'একা এসেছিস?'

'না। সব মেয়েরা একসঙ্গে এসেছি। সন্ধ্যাবেলা লঞ্চে উঠলাম, ঢাকা পৌঁছলাম রাত তিনটায়। একটু সকাল হতেই চলে এসেছি।'

'ভাল করেছিস মা। খুব ভাল করেছিস।'

সোবাহান সাহেবের ইচ্ছা করছে চেঁচিয়ে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙাতে, তিনি তা করলেন না। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিলেন। বড় মেয়ের সঙ্গে কিছু সময় একা একা থাকার আনন্দওতো কম নয়।

দুজন চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে। বিলু এক হাতে বাবাকে জড়িয়ে রেখেছে আর এত ভাল লাগছে।

'বাসার খবর বল বাবা।'

'কোন খবরটা শুনতে চাস?'

'মামা নাকি ছবি বানাচ্ছে? মিলি চিঠি লিখেছিল।'

সোবাহান সাহেব মুখ বিকৃত করে বললেন, 'গাধাটা বড় যন্ত্রণা করছে। রিহার্সেল টিহার্সেল কি কি করছে। বিকেলে বাসায় থাকা মুশকিল।'

বিলু আপন মনে হাসল। ফরিদ তার খুবই পছন্দের মানুষ। বিলু হালকা গলায় বলল, মামার পাগলামী কমেনি?

www.BDeBooks.Com

'না বেড়েছে। আমার মনে হয় কিছুদিন পর তালা বন্ধ করে রাখতে হবে।'

'ধরে বেঁধে মামার একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

'ঐ সব কথাই মনে আনবি না। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় ?'

বিলু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘর থেকে ঘরে ঘুরতে লাগল। মাত্র চার মাস পরে সে ফিরেছে অথচ মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পরে ফিরল। সব কেমন যেন অচেনা।

'আরে আফা কোন সময়ে আইলেন ? কি তাজ্জব!'

বিলু প্রথম দেখায় চিনতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চোখে চশমা, মুখ ভর্তি দাড়ি চেনা ভঙ্গিতে কে যেন হাসছে।

'আফা আমি কাদের।'

'তুমি দাড়ি কবে রাখলে কাদের ?'

'সিনেমায় পাট করতাছি আফা— মামার সিনেমা, আমার হিরোর পাট। খেয়া নৌকার মাঝি।'

'তাই নাকি ? খেয়া নৌকার মাঝির বুঝি দাড়ি থাকতে হয় ?'

'ডিরেকটর সাব চাইছে।'

বিলু হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল— 'তোমরা বেশ সুখে আছ বলে মনে হচ্ছে কাদের।'

'আর সুখ। সিনেমা করা কি সোজা যন্ত্রণা ? চিন্তা-ভাবনা আছে না ? এইটা কি পানি-ভাত যে মরিচ দিয়া এক ডলা দিলাম আর মুখের মইদ্যে ফেললাম ?'

বিলু অনেক কষ্টে মুখের হাসি আটকাল। তার খুব মজা লাগছে। কাদেরের মুখও আনন্দে উজ্জ্বল। কাদেরের ধারণা এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হচ্ছে বিলু আফা। এ বাড়ির সবাই তাকে তুই করে বলে, একমাত্র বিলু আফা বলে তুমি করে। এক গ্লাস পানির দরকার হলে বিলু আফা জনে জনে হুকুম দেয় না। নিজের পানি নিজে নিয়ে আসে। একবার কাদেরের জ্বর হল। চাকর-বাকরের জ্বর হলে কে আর খোঁজ করে। ঘরের এক কোণায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে হয়। কাদের তাই করেছে, শুয়ে আছে। জ্বর খুব বেশি। চারপাশের পৃথিবী কেমন হলুদ হলুদ লাগছে। আচ্ছন্নের মত অবস্থা। এমন সময় লক্ষ্য করল কে যেন তার মাথায় পানি ঢালছে। ঠাণ্ডা পানি। বড় আরাম লাগছে। কাদের চোখ মেলে দেখে বিলু। এক মনে পানি ঢালছে এবং রহিমার মাকে কড়া গলায় বলছে, জ্বর এত বেড়েছে, তুমি লক্ষ্য করলে না এটা কেমন কথা রহিমার মা ? একশ চার টেম্পারেচার। কত সময় ধরে এক রকম জ্বর কে জানে।

রহিমার মা বলল, আমারে দেন আফা। আমি পানি ঢালি।

'থাক তোমার আর কষ্ট করতে হবে না। তবে তোমার উপর আজ আমি খুব রাগ করেছি।'

সেই প্রবল জ্বরের ঘোরের মধ্যে কাদের ঠিক করে ফেলল বড় আপার জন্যে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় সে জীবন দিয়ে দিবে। বড় আপার যদি কোন শত্রু থাকে— তাকে খুন করে সে ফাঁসি যাবে।

দুপুর নাগাদ গত তিন মাসে এ বাড়িতে কি কি ঘটেছে বিলু জেনে গেল। কোন কোন ঘটনা তিনবার চারবার করে শুনতে হল। একবার বলল মিলি, একবার মা, একবার কাদের। প্রতিবারেই বিলু ভান করল যে সে ঘটনাটা প্রথম বারের মত শুনছে।

বিলু আসা উপলক্ষে মিলি ইউনিভার্সিটিতে গেল না। সারাক্ষণ বড় আপার পেছনে পেছনে ঘুরতে লাগল এবং অনবরত কথা বলতে লাগল।

'টগর আর নিশার সঙ্গে তোমার এখনো দেখা হয়নি— পৃথিবীতে এরকম দুষ্ট ছেলেপুলে আছে, না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। তবে মুখের দিকে তাকালে তোমার মনে হবে এরা দেবশিশু। ভয়ানক ইন্টেলিজেন্ট। ওদের মা নেই, তোমাকে তো আগেই চিঠি লিখে জানিয়েছি।'

বিলু প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, আচ্ছা তোর ঐ ডাক্তার সাহেবের খবর কি ?

মিলি হকচকিয়ে বলল, আমার ডাক্তার সাহেব মানে ? আমার ডাক্তার সাহেব বলছ কেন ?

'এম্নি বললাম, তোর চিঠিতে ভদ্রলোকের কথা প্রথম জানলাম তো। তুই লজ্জায় এমন লাল হয়ে যাচ্ছিস ব্যাপার কি ? সত্যি করে বলতো— উনাকে কি তোর পছন্দ ?'

মিলি রেগে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কি যে তুমি বল আপা। ঐ 'ছাগল'-কে আমি পছন্দ করব কেন ? আমার তো আর মাথা খারাপ হয় নি।

'তুই রেগে মেগে কেমন হয়ে গেছিস। এটাতো সন্দেহজনক।'

'আমি সত্যি কিন্তু রাগছি আপা।'

'ভদ্রলোককে খবর দে না, আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তাকে খবর দেবার কোন দরকার নেই। দিনের মধ্যে তিনবার করে আসছে। রিহার্সেল করছে। মামার সিনেমায় সেও তো আছে।'

'বাহ ভালতো। তোমরা দু'জন আবার নায়ক-নায়িকা না তো ?'

'রাগিয়ে দিওনাতো আপা। এতদিন পর এসেছ বলে ঝগড়া করলাম না। নয়ত প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যেত। এর মধ্যে আবার নায়ক-নায়িকা কি ?

বিলু হাসি মুখে ফরিদের ঘরে ঢুকল। বাড়ির সবার সঙ্গেই কথা হয়েছে শুধু মামার সঙ্গে কথা হয় নি।

ফরিদ মাথা নিচু করে কি যেন লিখছে। বিলুকে এক নজর দেখেও সে লিখেই যেতে লাগল। যেন বিলুকে সে চেনে না।

'আসব মামা ?'

www.BDeBooks.Com

'না।'

'না বললে তো হবে না। এতদিন পর এসেছি তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাও বলব না ?'

'না। কাজ করছি। আগামীকাল 'হে মাছ' ছবির অন দ্যা স্পট রিহার্সেল। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। লাস্ট মিনিট চেঞ্জ যা করার এখনি করতে হবে।'

'তাই বলে তোমাকে আমি সালামও করতে পারব না ?'

বিলু এগিয়ে এসে ফরিদের পা ছুঁয়ে সালাম করল। ফরিদ বলল, তুই এত ভাল মেয়ে কি করে হলি রে বিলু ? ছোটবেলায় তো এত ভাল ছিলি না। যতই দিন যাচ্ছে ততই ভাল হচ্ছিস।'

'শুনে খুশী হলাম মামা।'

'খুব খুশী হবার কোন কারণ নেই। বুদ্ধি কম মানুষরাই সাধারণত ভাল হয়। আমার ধারণা যত দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি তত কমে যাচ্ছে।'

বিলু খিল খিল করে হেসে উঠল। এমন গাঢ় আনন্দে অনেক দিন সে হাসে নি। এই মানুষটাকে তার বড় ভাল লাগে।

সোবাহান সাহেব তাঁর মনের মত একটা প্রবন্ধ পেয়েছেন। প্রবন্ধের নাম 'থাইল্যান্ডে মাগুর মাছের চাষ'। এই মাছের চাষে বিশাল পুকুর কাটার দরকার নেই— ট্যাংক বা চৌবাচ্চা জাতীয় জলাধার থাকলেই হল। মাছের খাবারের জন্যেও আলাদা ভাবে কিছু ভাবতে হবে না। সঙ্গে হাঁস-মুরগির চাষ করতে হবে। মাছের খাবার হবে... সোবাহান সাহেব থমকে গেলেন। মাছের খাবার হিসেবে যে সব জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না।

'স্লামালিকুম স্যার।'

সোবাহান সাহেব পত্রিকা থেকে মুখ তুলে দেখলেন, আনিস দাঁড়িয়ে আছে। বিব্রত মুখ ভঙ্গি।

'কিছু বলবে ?'

'জ্বি।'

'বল।'

'এই মাসের বাড়ি ভাড়াটা স্যার দিতে পারছি না।'

'বাড়ি ভাড়া কি তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে বিরক্ত করছ কেন ? পড়ার মাঝখানে একবার বাধা পড়লে কনসানট্রেসন কেটে যায়।'

'সরি স্যার। কি পড়ছেন ?'

'থাইল্যান্ডের মাগুর চাষ।'

'আপনি তাহলে মাছের ব্যাপারটা নিয়ে সত্যি খুব ভাবছেন।'

'হ্যাঁ ভাবছি।'

'আপনি বাংলাদেশ মাছে মাছে ছয়লাপ করে দিতে চান তাই না স্যার ?'

'হ্যাঁ চাই।'

'এখন আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি একটা মজার কথা বলতে চাই— শায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলাদেশ খুব সস্তা গন্ডার দেশ ছিল। প্রচুর খাদ্য ছিল, মাছ মাংস ছিল। মূল্য ছিল নাম মাত্র। অথচ তখনো এ দেশের প্রচুর লোক ছিল অনাহারে। নাম মাত্র মূল্যেও খাদ্য কেনার মত অর্থ তাদের ছিল না। যদি আপনিও সত্যি সত্যি এই দেশ একদিন মাছে মাছে ছয়লাপ করে দেন তাতেও লাভ হবে না। যারা এখন মাছ খেতে পারছে না তারা তখনো খেতে পারবে না। তাদের টাকা নেই। মূল সমস্যাটা অন্য জায়গায়।'

'কোথায় ?'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ আমার একটু কাজ আছে। 'হে মাছ ছবির অন লোকেসন রিহার্সেল হবে। আপনি হয়ত জানেন না ঐ ছবিতে আমার একটা রোল আছে। স্যার যাই স্লামালিকুম।'

আনিস চলে গেল। দীর্ঘ সময় সোবাহান সাহেব মূর্তির মত রইলেন। তাঁর মন আনিসের কথায় সায় দিচ্ছে। তিনি আসল সমস্যা ধরতে পারেন নি। নকল সমস্যা নিয়ে মাতামাতি করছেন। দেশের লোক যদি খেতেই না পারে তাহলে কি হবে মাছের চাষ বাড়িয়ে ?

'হে মাছ' ছবির অন লোকেসন রিহার্সেল শুরু হয়েছে। জায়গাটা হচ্ছে বুড়িগঙ্গার পার। বেশ নিরিবিলি। সঙ্গে ক্যামেরা নেই বলে লোকজন জড়ো হয়নি।

ফরিদের মাথায় ক্রিকেট আম্পায়ারদের টুপীর মত সাদা একটা টুপী। সত্যজিৎ রায় না কি এরকম একটা টুপী পরে স্যুটিং করেন। ফরিদের হাতে কালো একটা চোঙ। এই চোঙের মাধ্যমে নৌকায় বসা ডাক্তার এবং কাদেরের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে। ডাঙায় আছে মিলি, বিলু এবং আনিস। আনিসের বাচ্চা দুটিও আছে। এরা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করছে।

নৌকায় ডাক্তারকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। তার হাতে একটা জাল। গোল করে জাল ফেলার প্র্যাকটিস সে ভালই করছে। জাল এখন সে ফেলতে পারে। তবে নৌকা দুলছে, দুলুনির মধ্যে জাল ঠিক মতো ফেলতে পারবে কিনা এই নিয়ে সে চিন্তিত। ডাক্তারের পরনে জেলের পোশাক তবে চুল এখনো ছাটা হয়নি। কাদের বৈঠা নিয়ে বসে আছে। তাকে উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। ফরিদের নির্দেশে তারা নৌকা ছেড়ে দিল। নৌকা মাঝ নদীতে যাবার পর অভিনয় হবে। ডাক্তার ভীত গলায় বলল, কাদের ভয় লাগছে।

কাদের বলল, ভয়ের কি আছে ডাক্তার সাব ? উপরে আল্লাহ নিচে মাডি।

'মাটি কোথায় ? নিচে তো পানি।'

www.BDeBooks.Com

'একই হইল। আল্লাহর কাছে মাডি যা, পানিও তা। আল্লাহর চোউখ্যে সব সমান।'

'সাঁতার জানি না যে কাদের।'

'সাঁতার আমিও জানি না ডাক্তার সাব। মরণতো একদিন হইবই। অত চিন্তা করলে চলবে না। পানিতে ডুইব্যা মরার মজা আছে।'

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে বলল, মরার মধ্যে আবার কি মজা ?

'শহীদের দরজা পাওয়া যায়। হাদিস কোরানের কথা।'

'শহীদের দরজার আমার দরকার নেই কাদের। নৌকা এত দুলছে কেন ?'

ডাঙ্গা থেকে চোঙ মারফত ফরিদের নির্দেশ ভেসে এল— ডাক্তার স্টার্ট করে দাও—রেডি ওয়ান-টু-এ্যাকসান।

'এ্যাকসানে যাবার আগেই দৃশ্য কাট হয়ে গেল। ফরিদ বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল— কাট, কাট, এই হারামজাদা কাদের চশমা পরেছিস কেন ? খোল চশমা।

কাদের চশমা খুলল। সে খুব শখ করে চশমা পরেছিল।

'এ্যাকসান। ডাক্তার তুমি বিষণ্ন চোখে আকাশের দিকে তাকাও। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল। আবার তাকাও আকাশের দিকে। গুড। কাদের তুই কানের ফাঁকে রাখা বিড়ি ধরা। গুড। পানিতে থুথু ফেল। পুরো ব্যাপারটা ন্যাচারেল হতে হবে। ডাক্তার তুমি জালকে তিনবার সালাম কর। গুড। ভাল হচ্ছে। এই বার জাল ফেল।'

ডাক্তার জাল ফেলল। আশ্চার্য কাণ্ড পানিতে শুধু জাল পড়ল না,জালের সঙ্গে খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ডাক্তারও পড়ে গেল। জাল এবং ডাক্তার দুই-ই মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য, ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে।

কাদের বিড় বিড় করে বলল, বিষয় কিছুই বুঝলাম না।

ফরিদ হতভম্ব।

মিলি বলল, মামা ডাক্তার তো ডুবে গেছে।

ফরিদ থমথমে গলায় বলল, তাইতো দেখছি। এই গাধা কি সাঁতারও জানে না ? গরু গাধা নিয়ে ছবি করতে এসে দেখি বিপদে পড়লাম।

ডাক্তারের মাথা ভুস করে ভেসে উঠল। কি যেন বলে আবার ডুবে গেল। আবার ভাসল, আবার ডুবল। ফরিদ বলল, ছেলেটাতো বড্ড যন্ত্রণা করছে।

আনিস চেঁচিয়ে বলল, ডাক্তার মরে যাচ্ছে। আমি সাঁতার জানি না। সাঁতার জানা কে আছেন ? কে আছেন সাঁতার জানা ?

ঝুপঝুপ করে দু'বার শব্দ হল। বিলু এবং মিলি দু'জনই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ডুবন্ত ডাক্তারের দিকে। ফরিদ চমৎকৃত। এই মেয়ে দুটি সাঁতার শিখল কবে ?

আবার ঝুপ ঝুপ শব্দ। টগর এবং নিশাও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওদের তুলে আনার জন্যে আনিস এবং ফরিদকেও পানিতে লাফিয়ে পড়তে হল।

ডাক্তারের জ্ঞান ফিরল হলি ফেমিলি হাসপাতালে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আমি কোথায় ?

মিলি বলল, আপনি হাসপাতালে।

'কেন ?'

ফরিদ বিরক্ত গলায় বলল, উজবুকটাকে একটা চড় লাগাতো। আবার জিজ্ঞেস করে 'কেন ?' ফাজিল কোথাকার।

ডাক্তার ক্ষীণ গলায় বলল, আমি কি এখনো বেঁচে আছি ?

১০

রিকশা এসে থেমেছে নিরিবিলির সামনে। রিকশায় বসে আছে পাকুন্দিয়ার এমদাদ খোন্দকার। সঙ্গে তার নাতনী পুতুল। এমদাদ খোন্দকারের বয়স ষাটের উপরে। অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। মামলা মকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষী দেয়া তাঁর আজীবন পেশা। গ্রামের জমি জমা সংক্রান্ত মামলায় তিনি দুই পক্ষেই শলা পরামর্শ দেন। নিয়ম থাকলে দু'পক্ষের হয়ে সাক্ষীও দিতেন, নিয়ম নেই বলে দিতে পারেন না। জাল দলিল তৈরির ব্যাপারেও তার প্রবাদ তুল্য খ্যাতি আছে।

পুতুলের বয়স পনেরো। এবার মেট্রিক পাস করেছে। ফার্স্ট ডিভিশন এবং দুটো লেটার। রেজাল্ট বের হবার পর এমদাদ খোন্দকার খুব আফসোস করেছে— নাতনী যদি নকল করতে রাজি হত তাহলে ফাটাফাটি ব্যাপার হত, নকল ছাড়াই এই অবস্থা।

পুতুলকে নিয়ে এমদাদ খোন্দকার নিরিবিলিতে কেন এসেছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। পুতুলও কিছু জানে না। তাকে বলা হয়েছে ঢাকায় কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে, উঠবে সোবাহান সাহেবের বাড়ি। সোবাহান সাহেব তাদের কোন আত্মীয় না হলেও অপরিচিত নন। পাকুন্দিয়া গ্রামের কলেজটি তিনি নিজের টাকায় নিজের জমিতে করে দিয়েছেন। মেয়েদের একটি স্কুল দিয়েছেন, মসজিদ বানিয়েছেন। সোবাহান সাহেব তাঁর যৌবনের রোজগারের একটি বড় অংশ এই গ্রামে ঢেলে দিয়েছেন, কাজেই গ্রামের মানুষদের কাছে তিনি অপরিচিত নন। পুতুল তাঁকে চেনে। তাঁর স্কুল থেকেই সে মেট্রিক পাস করেছে।

রিকশা থেকে নামতে নামতে পুতুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, কী বড় বাড়ি দেখছ দাদাজান ?

এমদাদ মুখ বিকৃত করে বলল, পয়সার মা-বাপ নাই বাড়ি বড় হইব না-তো কি। চোরা পয়সা।

পুতুল দুঃখিত গলায় বলল, চোরা-পয়সা ? কি যে তুমি কও দাদাজান। এমন একটা বালা মানুষ। কত টেকা পয়সা দিছে গেরামে....

'টেকা পয়সা দিলেই মানুষ বালা হয় ? এদের শইল্যে আছে বদ রক্ত। এরারে আমি চিনি না ? হাড়ে গোশতে চিনি।'

www.BDeBooks.Com

পুতুল কিছু বলল না। তার দাদাজানের চরিত্র সে জানে, মানুষের ভাল দিক তার চোখে পড়ে না। হয়ত কোনদিন পড়বেও না।

পুতুল।'

'জ্বি দাদাজান।'

এমদাদ গলা নিচু করে বলল, 'সোবাহান সাহেবের দাদার বাপ ছিল বিখ্যাত চোর। এরা হইল চোর বংশ।'

'চুপ করতো দাদাজান।'

'আইচ্ছা চুপ করলাম।'

এমদাদ নাতনীকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। সোবাহান সাহেব বারান্দায় বসে ছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, চিনতে পারলাম নাতো। এমদাদ বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'আমি এমদাদ। পাকুন্দিয়ার এমদাদ খোন্দকার।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা— আমি অবশ্যি এখনো চিনতে পারিনি।'

'চিনবার কথাও না— আমি হইলাম জুতার ময়লা। আর আপনে হইলেন বটবৃক্ষ।'

'বটবৃক্ষ।'

'জ্বি বটবৃক্ষ। বটবৃক্ষে কি হয়— রাজ্যের পাখি আশ্রয় নেয়। আপনে হইলেন আমাদের আশ্রয়। বিপদে পড়ে আসছি জনাব।'

'কি বিপদ ?'

'বলব। সব বলব। আপনেরে বলবনাতো বলব কারে ? পুতুল ইনারে সেলাম কর। ইনারা মহাপুরুষ মানুষ। দেখলেই পুণ্য হয়।'

পুতুল এগিয়ে এল। সোবাহান সাহেব পুতুলের মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বললেন, যাও ভিতরে যাও। হত মুখ ধুয়ে খাওয়া দাওয়া কর। তারপর শুনব কি সমস্যা।

এমদাদ বলল, ভাইসাব আমারে একটু নামাযের জায়গা দিতে হয়। দুই ওক্ত নামায কাজা হয়েছে। নামায কাজা হইলে ভাইসাব আমার মাথা ঠিক থাকে না।

'অজুর পানি লাগবে ?'

'অজু লাগবে না, অজু আছে। আমার সব ভাঙ্গে অজু ভাঙ্গে না। হা হা হা।'

সোবাহান সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। আর তখন ঘরে ঢুকল ফরিদ। এমদাদ বলল, ভাইজান পশ্চিম কোন দিকে ?

ফরিদ বিরক্ত গলায় বলল, পশ্চিম কোন দিকে আমি কি জানি ? আমি কি কম্পাস না কি ?

'বাবাজীর পরিচয় ?'

'বাবাজী ডাকবেন না।'

'রাগ করেন কেন ভাই সাহেব।'

'আপনি কে ?'

'আমার নাম এমদাদ। এমদাদ খোন্দকার।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইসাব ভাল আছেন ?'

ফরিদ বিরক্ত দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল। এমদাদ ধাঁধায় পড়ে গেল। এই মানুষটির চরিত্র সে ঠিক বুঝতে পারছে না। মানুষের চরিত্র পুরোপরি বুঝতে না পাড়া পর্যন্ত তার বড় অশান্তি লাগে।

১১

আনিস বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর লাগছে ছাদটা। টবের ফলগাছগুলোতে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ছাদে আলো-ছায়ার নকশা। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে, নকশাগুলোও বদলে যাচ্ছে। আনিস ভারী গলায় বলল,

আলোটুকু তোমায় দিলাম।

ছায়া থাক আমার কাছে।

আনিসের কথা শেষ হল না তার আগেই নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাওয়া গেল— কে আপনি ? আপনি কে ?

আনিস হকচকিয়ে গেল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে লম্বামত একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। মুখ দেখা যাচ্ছে না। নারী কণ্ঠ আবারো তীক্ষ্ণ গলায় বললে— আপনি কে ?

'আমার নাম আনিস। আমি এ বাড়ির ভাড়াটে। আপনি কি ভয় পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি মানুষ। ভূত কখনো কবিতা বলে না। তাছাড়া ভূতের ছায়া পড়ে না। এই দেখুন আমার ছায়া পড়েছে।'

নারীমূর্তি কিছু বলল না। গায়ের চাদর টেনে দিল। তাতে তার মুখ আরো ঢাকা পড়ে গেল।

আনিস বলল, আপনি কে জানতে পারি কি ?

'আমার নাম বিলু। আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে।'

'ছাদে কি করছেন ?'

'কিছু করছি না। টবের গাছগুলো দেখতে এসেছিলাম। মাঝখানে আপনি ভয় দেখিয়ে দিলেন।'

'সত্যি ভয় পেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলুনতো ?'

বিলু সহজ গলায় বলল, রহিমার মার ধারণা এ বাড়ির ছাদে না-কি ভূত আছে। সে প্রায়ই দেখে। আপনাকে হঠাৎ দেখে... আচ্ছা যাই।

www.BDeBooks.Com

বিলু সিঁড়ির দিকে রওনা হল। আনিস বলল, আপনার টবের গাছ দেখা হয়ে গেল ?

'হ্যাঁ।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে আপনার আরো কিছুক্ষণ ছাদে থাকার ইচ্ছা ছিল, আমার কারণে চলে যাচ্ছেন।'

'আপনার ধারণা ঠিক না। আমার শীত শীত লাগছে। তাছাড়া অনেকক্ষণ ছাদে ছিলাম।'

আনিস সহজ গলায় বলল, আপনাকে ভয় দেখানোর জন্যে দুঃখিত।

বিলু হেসে ফেলল। বেশ শব্দ করে হাসল। আনিস হাসি শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এই হাসি তার পরিচিত। এ জীবনে অনেকবার শুনেছে। রেশমা এম্নি করেই হাসত, কিশোরীদের ঝনঝনে গলা, যে গলায় একই সঙ্গে আনন্দ এবং বিষাদ মাখানো।

বিলু বলল, যাই কেমন ?

আনিস দ্বিতীয়বার চমকাল। রেশমাও কোথও যাবার আগে মাথা কাত করে বলত, যাই কেমন ? যেন অনুমতি প্রার্থনা করছে। যদি অনুমতি পাওয়া না যায় তাহলে যাবে না। বিলু তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির মাথায় মূর্তির মত আনিস দাঁড়িয়ে। সে ফিসফিস করে বলল, আলোটুকু তোমায় দিলাম। ছায়া থাক আমার কাছে ।

তার ভাল লাগছে না। কোথাও কিছু একটা ঘটে গেছে। অনেক অনেক দূরের দেশ থেকে যেমন হঠাৎ রেশমা উঠে এল। এ কেমন করে হয় ? যে চলে গেছে সে আর আসে না। মানুষের কোন বিকল্প হয় না। কি যেন কথাগুলো ? এ পৃথিবী একবার পায় তারে কোন দিন পায় নাকো আর, লাইনগুলো কি ঠিক আছে না ভুল-টুল কিছু হল ?

১২

এমদাদ এবং তার নাতনীকে থাকার জন্যে যে ঘরটা দেয়া হয়েছে সে ঘর এমদাদের খুবই পছন্দ হল। সে তিনবার বলল, দক্ষিণ দুয়ারী জানালা লক্ষ্য করে দেখ। ঘুম হবে তোফা। পুতুল শুকনো গলায় বলল, ঘুম ভাল হইলেই ভাল। আরাম কইরা ঘুমাও।

'খাটও দুইটা আছে। একটা তোর একটা আমার। ব্যবস্থা ভালই। কি কস পুতুল ?'

পুতুল চুপ করে রইল। এমদাদ বলল, ভয়ে ভয়ে ছিলাম বুঝলি। কিছুই বলা যায় না। যদি চাকর বাকরের ঘর দিয়া বসে। দিয়া বসতেও তো পারে। মানী লোকের মানতো সবাই দেখে না। আরে আরে কারবার দেইখ্যা যা। ঘরের লগে পেসাবখানা। এলাহী কারবার।

আনন্দে এমদাদের মুখ ঝলমল করছে। শুধু পুতুল মুখ কাল করে রেখেছে। কিছুতেই তার মন বসছে না। অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হবার কষ্ট ও যন্ত্রণা সে তার ক্ষুদ্র জীবনে অনেকবার ভোগ করেছে। এখন আবার শুরু হল। ইচ্ছা মৃত্যুর ক্ষমতা যদি মানুষের থাকতো তাহলে বড় ভাল হত। এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।

'ও পুতুল।'

'কি দাদাজান ?'

'ঘর ভালই দিছে ঠিক না ?'

'হুঁ।'

'এখন খেয়াল রাখবি সবের সাথে যেন ভাল ব্যবহার হয়। যে যা কয় শুনবি আর মুখে বলবি— জ্বি কথা ঠিক। এই কথার উপরে কথা নাই। গেরাম দেশে লোক বলে মুখের কথায় চিড়া ভিজে না— মিথ্যা কথা, মুখের কথায় সব ভিজে। তোর মুখ এমন শুকনা দেহায় ক্যানরে পুতুল ?'

'এইখানে কদ্দিন থাকবা ?'

'আসতে না আসতেই কদ্দিন থাকবা ? থাকা না থাকা নিয়া তুই চিন্তা করবি না। এইটা আমার উপড়ে ছইড়া দে। যা হাত মুখ ধুইয়া আয় চাইরডা দানাপানি মুখে দেই। এই বাড়ির খাওয়া খাদ্যও ভাল হওনের কথা।'

এমদাদের আশঙ্কা ছিল হয়ত চাকর বাকরদের সঙ্গে মেঝেতে পাটি পেতে খেতে দেবে। যদি দেয় তাহলে বেইজ্জতির সীমা থাকবে না। দেখা গেল খাবার টেবিলেই খেতে দেয়া হয়েছে। বাড়ির কর্ত্রী স্বয়ং তদারক করছেন। চিকন চালের ভাত, পাবদা মাছ, একটা সব্জি, মুগের ডাল। খাওয়ার শেষে পায়েস। তোফা ব্যবস্থা। মিনু বললেন, পেট ভরেছে তো এমদাদ সাহেব ? ঘরে যা ছিল তাই দিয়েছি। নতুন কিছু করা হয়নি।

'কোন অসুবিধা হয় নাই। শুধু একটু দৈ থাকলে ভাল হইত। খাওয়ার পর দৈ থাকলে হজমের সহায়ক হয়। তার উপর আপনার ছোটবেলা থাইক্যা খাইয়া অভ্যাস।'

'ভবিষ্যতে আপনার জন্য দৈয়ের ব্যবস্থা রাখব।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। এখন মা জননী অবস্থা পইড়্যা গেছে। একটা সময় ছিল খোন্দকার বাড়ির সামনে দিয়া লোকজন ছাতা মাথায় দিয়া যাইত না। নিয়ম ছিল না। জুতা খুইল্যা হাতে নিতে হইত বুঝলেন মা জননী।'

'তাই বুঝি!'

'জ্বি। এবার কি হইল শুনেন মা জননী। খোন্দকার বাড়ির সামনে দিয়ে এক লোক যাইতেছে হঠাৎ খক করে কাশ ফেলল। সাথে সাথে দারোয়ান ঘাড় ধরে নিয়া আসল— বলল হারামজাদা এত বড় সাহস। খোন্দকার বাড়ির সামনে কাশ ফেলস। নাকে খত দে। মাটিতে চাটা দে— তারপরে যা যেখানে যাবি।'

পুতুলের এইসব কথা শুনতে অসহ্য লাগে। না শুনেও উপায় নেই। দাদাজান যেখানে যাবে সেইখানেই এইসব বলবে। পুতুলের ধারণা সবই মিথ্যা

www.BDeBooks.Com

কথা। সে খাওয়ার মাঝ পথে উঠে পড়ল। এমদাদের তাতে সুবিধাই হল। সে জরুরি একটা কথা বাড়ির কর্ত্রীর সঙ্গে বলতে চাচ্ছে।

পুতুল থাকায় বলতে পরছে না। এখন সুযোগ পাওয়া গেল।

'মা জননীকে একটা কথা বলতে চাইতেছিলাম।'

'বলুন।'

'বলতে শরম লাগছে। আবার না বলেও পারতেছি না। তারপর ভেবে দেখলাম আপনাদের না বললে কাদের বলল ? আপনারা হইলেন বটবৃক্ষ।'

'ব্যাপারটা কি ?

'ট্রেইন থাইক্যা নামার সময় বুঝলেন মা জননী পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিয়া দেখি পকেট কাটা।'

'পকেট কাটা মানে ?'

'ব্লেড দিয়ে পকেট সাফা করে দিছে। মানিব্যাগে চাইর'শ তেত্রিশ টাকা ছিল, সব শেষ। এখন পকেটে একটা কানা পয়সা নাই। কি বেইজ্জতী অবস্থা চিন্তা করেন মা জননী।'

'আচ্ছা ওর একটা ব্যবস্থা হবে।'

'হবে তাতো জানিই। বটবৃক্ষতো শুধু শুধু বলি না। চাইলতা গাছও তো বলতে পারতাম। পারতাম না।'

'আপনাকে কি মিষ্টি দেব ? ঘরে মিষ্টি আছে।'

'দেন। আমার অবশ্য ডায়াবেটিস। মিষ্টি খাওয়া নিষেধ। এত নিষেধ শুনলে তো আর হয় না। কি বলেন মা জননী ? মিষ্টি খাইতে পারবা না, ভালমন্দ খানা খাইতে পারবা না, সিগ্রেট খাইতে পারবা না— তাইলে খামুটা কি ? বাতাস খামু ?'

দীর্ঘদিন পর এমদাদের খুব চাপ খাওয়া হয়ে গেল। পেট দম সম হয়ে আছে। খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা দরকার। এদের বাড়ি ঘর, লোকজন সবার সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। সে দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে। নাতনীটাকে এ বাড়িতে গছিয়ে যেতে হবে। কাজেই পরিবারে সদস্যদের নাড়ি নক্ষত্র জানা থাকা প্রয়োজন। তার কাছে অবশ্যি বেশির ভাগ সদস্যকেই বোকা কিসিমেরে বলে মনে হচ্ছে। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। যে পরিবারে সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক থাকে বোকা সেই পরিবার সাধারণত সুখী হয়।

এমদাদ ফরিদের ঘরে উঁকি দিলে। ফরিদ চিন্তিত মুখে বিছানায় বসে আছে। ছবির পরিকল্পনা ভেঙে যাওয়ায় তার মন খুবই খারাপ। এমদাদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলর, বাবাজী কি জেগে আছেন ?

ফরিদ কড়া চোখে তাকাল। থমথমে গলায় বলল, আপনি কি এর আগে কাউকে চোখ মেলে বসে বসে ঘুমুতে দেখেছেন যে আমাকে এরকম একটা প্রশ্ন করলেন। দেখেছেন এইভাবে কাউকে ঘুমুতে ?

এমদাদ প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। সহজ গলায় বলল, জ্বি জনাব দেখেছি। চোখ মেলে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঘুমাতে দেখেছি।

'কাকে দেখেছেন ?'

'ঘোড়াকে। ঘোড়া দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ঘুমায়।'

লোকটির স্পর্ধায় ফরিদ হতভম্ব।

'আমাকে দেখে আপনার কি ধারণা হয়েছে যে আমি একটা ঘোড়া ?"

'জ্বি না।'

'আপনি বয়স্ক প্রবীণ একজন মানুষ বলেই আমি এই দফায় আপনাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। ভবিষ্যতে আর করা হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি কখনো আমার ঘরে ঢুকবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন চলে যান।'

'একটা সিগারেটের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাবাজী কি সিগারেট খান।'

'খাই কিন্তু আপনাকে সিগারেট দেয়া হবে না। আপনি যেতে পারেন।'

'জ্বি আচ্ছা। জিনিসটা অবশ্য স্বাস্থ্যের জইন্যেও খারাপ।'

এমদাদ বের হয়ে এল। ফরিদের ঘরের ঘটনা তাকে খুব একটা বিচলিত করল না। বরংচ সে খানিকটা মজাই পেল। বড় ধরনের বেকুব সংসারে থাকা ভাল। যে সংসারে বড় ধরনের কোন বেকুব থাকে সেই সংসারে কখনো ভয়াবহ কোন সমস্যা হয় না। বোকাগুলি কোন না কোনভাবে সমস্যা পাতলা করে দেয়। এমদাদ রাস্তায় বের হল। চা খাওয়ার পর তার একটা সিগারেট দরকার।

অপরিচতি মানুষের কাছে টাকা চাওয়া সমস্যা কিন্তু সিগারেট চাওয়া কোন সমস্যা না। এমদাদ আধ ঘণ্টার মধ্যে ছটা সিগারেট জোগাড় করে ফেলল। তার টেকনিকটা এ রকম— সিগারেট ধরিয়ে কোন ভদ্রলোক হয়ত আসছে— এমদাদ হাসি মুখে এগিয়ে যাবে।

'স্লামালিকুম ভাইসাব।'

অপরিচিত ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, আমাকে কিছু বলছেন ?

'জ্বি।'

'বলুন—'

'আমার হার্টের অসুখ। ডাক্তার সিগারেট বন্ধ করে দিয়েছে। লুকিয়ে চুকিয়ে যে একটা টান দিব সেই উপায় নাই। ঘর থেকে একটা পয়সা দেয় না। ভাই এখন আপনি যদি একটা সিগারেট দেন জীবনটা রক্ষা হয়।'

www.BDeBooks.Com

'ডাক্তার যখন নিষেধ করেছে তখন তো সিগারেট খাওয়া উচিত হবে না।'

'কয়দিন আর বাঁচব বলেন ? এখন সিগারেট খাওয়া না খাওয়া তো সমান।'

এরপর আর কথা চলে না। অপরিচিত ভদ্রলোক পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বের করেন। এমদাদ হাসি মুখে বলে, দু'টা দিয়ে দেন ভাই সাহেব। রাতে খাওয়ার পর একটা খাব।

এমদাদ যখন সিগারেটের সঞ্চয় বাড়াতে ব্যস্ত তখন বাড়ির ভেতর ছোট্ট একটা নাটক হল। মিনু তিনশ টাকা হাতে নিয়ে পুতুলকে বললেন, মা এই টাকাটা তোমার দাদাকে দিও। পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, কিসের টাকা ?

'উনার মানিব্যাগ পকেটমার হয়ে গেল। উনি বলছিলেন।'

'পুতুল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কই দাদাজানের কোন টাকা পকেটমার হয় নাই। ঐতো দাদাজানের মানিব্যাগ।'

'তবু তুমি টাকাটা রাখ।'

'না না— আমি টাকা রাখব না।'

মিনু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন— পুতুলের চোখে পানি এসে গেছে। তিনি বেশ অবাক হলেন। মিনু কোমল গলায় বললেন, কি ব্যাপার পুতুল ? পুতুল ধরা গলায় বলল— দাদাজান মিথ্যা কথা বললে আমার বড় কষ্ট হয়।

'হয়ত মিথ্যা কথা না। হয়ত উনি ভুলে গেছেন।'

'না উনি ভুলেন নাই। উনি সহজে কিছু ভুলেন না।'

পুতুলের কান্নার বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। মিনু পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলেন। এই মেয়েটা মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি নিতান্ত অপরিচিত এই মেয়েটির প্রতি এক ধরনের মমতা অনুভব করলেন।

নিরিবিলি বাড়িতে ক্রাইসিস তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। রাত আটটা দশ মিনিটে একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়ে গেল। অবশ্যি এটা যে একটা ক্রাইসিস শুরুতে তা বোঝা গেল না। রাতের টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। সোবাহান সাহেব হাত ধুয়েছেন। তাঁর প্লেটে বিলু ভাত দিতে যাচ্ছে তিনি বললেন, স্টপ।

বিলু বলল, ভাত দেব না বাবা ?

'না।'

'প্লেট বোধহয় ভাল করে ধোয়া হয়নি তাই না ?'

'ওসব কিছু না।'

সোবাহান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিনু বললেন, শরীর খারাপ লাগছে ? সোবাহান সাহেব অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করলেন। এই শব্দের কোন অর্থ নেই।

রাত সাড়ে ন'টার দিকে জানা গেল ক্ষুধার প্রকৃত স্বরূপ কি তা জানার জন্যে তিনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী দশদিন তিনি পানি ছাড়া কিছুই খাবেন না।

বিলু বাবাকে বোঝানোর জন্যে তাঁর ঘরে গেল। হাইপারটেনসনের রুগীকে অনিয়ম করলে চলে না। বিলুর সঙ্গে সোবাহান সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল।

বিলু ঃ বাবা তুমি ভাত খাবে না।

বাবা ঃ না।

বিলু ঃ ভাত খাবে না কারণ তোমাকে ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে হবে ?

বাবা ঃ হ্যাঁ।

বিলু ঃ কেন বলতো ? ক্ষুধার স্বরূপ বুঝে তোমার হবেটা কি ? তুমি যদি একজন কবি হতে তাহলে একটা কথা হত। ক্ষুধা সম্পর্কে কবিতা লিখতে। গদ্যকার হলে আমরা ক্ষুধার অসাধারণ বর্ণনা পেতাম। তুমি যদি রাজনীতিবিদ হতে তাহলেও লাভ ছিল, গরিব দুঃখীদের কষ্ট বুঝতে— তুমি বলতে গেলে কিছুই না। তাহলে তুমি কেন কষ্ট করছ ?

বাবা তুই ঘর থেকে যা। তুই বড় বিরক্ত করছিস।

বিলু তুমি যদি কিছু না খাও তাহলে মা-ও খাবে না ।

বাবা সেটা তার ব্যাপার। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

বিলু না খেয়ে কতদিন থাকবে ?

বাবা যত দিন পারি।

বিলু অনশনে যাবার এই বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে বাবা ? দোতালার আনিস সাহেব ?

বাবা ঃ হ্যাঁ।

বিলু ঃ আমিও তাই ভেবেছিলাম।

বিলু দোতালায় উঠে এল। তার মুখ থম থম করছে।

আনিসের দুটি বাচ্চাই শুয়ে আছে। দু'জনের চোখই বন্ধ। কোন সাড়াশব্দ করছে না। কারণ আনিস ঘোষণা করেছে সবচে বেশি সময় যে কথা না বলে থাকতে পারবে সে পাঁচ টাকা পুরস্কার পাবে। পুরস্কারের পাঁচটা টাকা খামে ভর্তি করে টেবিলের উপর রেখে দেয়া আছে। আনিসের ধারণা পুরস্কারের লোভে চুপ করে থাকতে থাকতে দু'জনই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। যদিও লক্ষণ তেমন মনে হচ্ছে না। টগর এবং নিশা মুখে কথা বলছে না ঠিকই কিন্তু ইশারায় কথা বলছে। দু'জনই হাত ও ঠোঁট নাড়ছে। এই সব কীর্তিকলাপ বিলুকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল। দু'জনই চোখ বন্ধ করে মরার মত পড়ে রইল। যেন ঘুমুচ্ছে।

বিলু বলল, আনিস সাহেব, আমি কি আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে পারি ?

www.BDeBooks.Com

আনিস হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, অবশ্যই পারেন।

'আপনার সঙ্গে আমার ফরম্যাল পরিচয় হয়নি— আমার নাম....

আনিস বলল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনার হয়ত মনে নেই। আপনার নাম বিলু, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। একবার ছাদে আমাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আপনি বসুন।

'না আমি বসার জন্য আসিনি।'

'ঝগড়া করতে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে সবাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসে। এতদিন পর্যন্ত এ বাড়ি আছি অথচ এখন পর্যন্ত একজন কেউ এসে বলল না, আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।

বিলু আনিসের হালকা কথাবার্তার ধার দিয়েও গেল না। কঠিন গলায় বলল, আপনি কি বাবাকে উপোষ দিতে বলেছেন ?

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'আপনি কি বাবাকে বুঝিয়েছেন ক্ষুধার স্বরূপ বোঝার জন্য না খেয়ে থাকার প্রয়োজন।'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, উনি কি না খেয়ে আছেন না-কি ?

'হ্যাঁ।'

'কি সর্বনাশ। আমি শুধুমাত্র কথা প্রসঙ্গে বলছিলাম যে আমরা যারা সৌখিন সমস্যাবিদ তারা মূল সমস্যা নিয়ে ভাসা ভাসা কথাবার্তা বলি। কারণ মূল সমস্যা আমরা জানি না। ক্ষুধা যে কি ভয়াবহ ব্যাপার তা আমরা অর্থাৎ তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমস্যা বিশারদরা জানি না। কারণ আমাদের কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না। রোজার সময় বেশ কিছু সময় ক্ষুধার্ত থাকি সেও খুবই সাময়িক ব্যাপার। তখন আমাদের মনের মধ্যে থাকে সূর্যটা ডুবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য চলে আসবে। কাজেই ক্ষুধার স্বরূপ....

বিলু আনিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনাকে হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনার এই সব চমৎকার থিওরী দয়া করে নিজের মধ্যেই রাখবেন। বাবাকে এসবের মধ্যে জড়াবেন না। উনি সব কিছুই খুব সিরিয়াসলি নেন। নিজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেন, আমাদের জন্যেও সমস্যা সৃষ্টি করেন। আমি কি বলছি আপনি কি বুঝতে পারছেন ?'

'জ্বি পারছি।'

'সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন আরো একটা কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছি। কথাটা হচ্ছে— আপনি যে আপনার বাচ্চাদের মাধ্যমে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন এতে আমি শুধু অবাক হয়েছি তাই না-দুঃখিত হয়েছি, রাগ করেছি, বিরক্ত হয়েছি। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হৈ চৈ করা আমি পছন্দ করি না বলেই এতদিন চুপচাপ ছিলাম। আজ বলে ফেললাম।'

আনিসেকে একটি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বিলু নিচে নেমে গেল। আনিস ডাকল, টগর টগর। টগর জেগে আছে তবু কথা বলছে না। কথা বললেই বাজিতে হারতে হয়। আনিস বলল, টগর কথা বল এখন কথা বললে বাজির কোন হেরফের হবে না। টগর ।

'জ্বি।'

'বিলু মেয়েটিকে তুমি কি বলেছ?'

'আমি কিছু বলিনি— নিশা বলেছে।'

'নিশা, তুমি কি বলেছে?'

'আমার মনে নেই।'

'মনে করার চেষ্টা কর। তুমি কি বলেছ?'

নিশা কোন শব্দ করল না। টগর বলল, নিশা মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে বাবা। আনিস বলল, তোমার কি মনে আছে নিশা কি বলেছে?

'মনে আছে।'

'বলতো শুনি।'

'নিশা উনাকে বলেছে— আব্বু আপনাকে বিয়ে করবে। তখন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তখন আমরা আপনাকে আম্মু ডাকব।'

আনিস হতভম্ব হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক কষ্টে বলল, ভদ্র মহিলা নিশার কথা শুনে কি বলল? সে তখন বলল, টগর— তোমার বাবা এই সব কথা তোমাদের বলেছেন? আমি বললাম— হুঁ।

'তুমি হুঁ বললে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তো কখনো এ রকম কথা বলিনি— তুমি হুঁ বললে কেন?'

'আর বলব না বাবা।'

নিশা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমিও বলব না বাবা। এতক্ষণ সে জেগেই ছিল! কোন পর্যায়ে কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করবে এইটাই শুধু বুঝতে পারছিল না।

একটা মানুষ ক্ষুধা কেমন এটা জানার জন্যে না খেয়ে আছে এই ব্যাপারটা পুতুলকে অভিভূত করে ফেলেছে। সে কয়েকবার দাদাজানের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল— এমদাদ কোন পাত্তা দিল না। এম্নিতেই তার মেজাজ খারাপ, পকেট মারের ব্যাপারটায় উল্টাপাল্টা কথা বলে মেয়েটা তাকে ডুবিয়েছে। শুরুতেই বেইজ্জত হতে হল। এটাকে যে কোন ভাবেই হোক সামলাতে হবে। কি ভাবে সামলাবে তাই নিয়ে এমদাদ চিন্তা ভাবনা করছে— এর মধ্যে পুতুল ঘ্যান ঘ্যান করছে। সোবাহান সাহেবের না খাওয়া নিয়ে। এই মেয়েটাকে কড়া একটা ধমক দেয়া দরকার। ধমক দিতেও ইচ্ছা করছে না!

'ও দাদাজান ঘুমাইলা?'

www.BDeBooks.Com

'না!'

'কেমন আশ্চর্য মানুষ দেখলা দাদাজান ? ক্ষুধা কেমন জিনিস এইটা জাননের জইন্যে না খাইয়া আছ।'

'দুনিয়াডা ভর্তি বেকুবে — এইডাও বেকুবির এক নমুনা।'

'ছিঃ দাদাজান— এমন কথা কইও না।'

'এই বুড়া বেকুব তো বেকুবই, তুইও বেকুব। তুই আমার সাথে কথা কইস না।'

'আমি কি দোষ করলাম দাদাজান ?'

'চুপ, কোন কথা না।'

বুড়ো বয়সের ব্যধি রাতে ঘুম হয় না। এমদাদ রাত দেড়টায় ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে বসে থাকতেও আরাম। মশা না থাকলে পাটি পেতে বারান্দায় ঘুমানোরই ব্যবস্থা করা যেত কিন্তু বড্ড মশা।

মিনু দরজা বন্ধ করতে এসে দেখেন এমদাদ সাহেব বারান্দার ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে আছেন। হাতে সিগারেট। তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, কে এমদাদ সাহেব না ?

'জ্বি মা জননী।'

'এত রাতে এখানে কি করছেন ?

'মনটা খুব খারাপ। ঘুম আসে না।'

'মন খারাপ কেন ?'

'বাড়ির কর্তা না খেয়ে ঘুমিয়ে আছে এই জন্যেই মনটা খারাপ মা জননী! আমার হইলাম গেরামের মানুষ, ক্ষুধা পেটে কেউ ঘুমাইতে গেছে শুনলে মনটা খারাপ হয় ?'

'ঐসব নিয়ে ভাববেন না। বিলুর বাবার এই রকম পাগলামী আছে। সকালে দেখবেন ঠিকই নাশতা করছে।'

'শুনে বড় ভাল লাগছে মা জননী।'

'আসুন ভেতরে চলে আসুন। আমি দরজা বন্ধ করে দেব।'

এমদাদ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, অরেকটা বিষয় আপনেরে বলা হয় নাই মা জননী— মানিব্যাগের বিষয়ে! মানিব্যাগ ছিল পুতুলের কাছে। মাইয়া খুব সাবধানতো— গুছায়ে রাখছে। এদিকে আমার পাঞ্জাবীর পকেটে ছিল রুমাল। পকেটমার সেই রুমাল নিয়ে চলে গেছে। হা হা হা।

মিনু বললেন, টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে বলবেন। সংকোচ করবেন না।

'আলহামদুলিল্লাহ। কোন সংকোচ করব না— আপনারা হইলেন বটবৃক্ষ।'

'যান ঘুমুতে যান।'

'জ্বি আচ্ছা। ঘুম আসবে না তবু শুইয়া থাকব। বাড়ির আসল লোক দানাপানি খায় নাই— এরপরেও কি ঘুম আসে কন মা জননী ?'

'এইসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। সকাল হলেই দেখবেন খাওয়া দাওয়া শুরু করছে। উদ্দেশ্যে তো আর কিছু না। উদ্দেশ্য হলো আমাকে যন্ত্রণা দেয়া!'

'এই কথা মুখে উচ্চারণ করবেন না মা জননী — ক্ষুধা কি যে বুঝতে চায় সে কি সাধারণ লোক ? সে তো বলতে গেলে আল্লাহর অলি। ঠিক বলছি না— মা জননী ?'

মিনু জবাব দিলেন না। এই লোক কি মতলবে এসেছে কে জানে। বিনা কারণে আসে নি বোঝাই যাচ্ছে। নিশ্চয়ই বড় কোন সমস্যা। সমস্যা টেনে টেনে তিনি এমন ক্লান্ত ও বিরক্ত। আর ভাল লাগে না।

১৩

সোবাহান সাহেব ভোরবেলায় কাপে করে এক কাপ পানি খেলেন। আর কিছুই খেলেন না। মিনু বললেন, তুমি সত্যি সত্যি কিছু মুখে দেবে না ?

'না'

'কেন ?'

'কেনর জবাবতো দিয়েছি। আমি ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে চাই।'

রাগে দুঃখে মিনুর চোখে পানি এসে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ যদি এরকম যন্ত্রণা করে তাহলে কিভাবে হয় ? মিলির ইউনিভার্সিটিতে যাবার খুব প্রয়োজন ছিল সে গেল না। বাসার আবহাওয়া মনে হচ্ছে ভাল না। বাবার প্রেসারের কি অবস্থা কে জানে। ডাক্তারকে খবর দেয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষুনি ছুটে যাওয়ার দরকার নেই। দুপুর পর্যন্ত যাক তারপর দেখা যাবে।

দুপুরে ফরিদ দুলাভাইয়ের অনশনের খবর পেল। তার উৎসাহের সীমা রইল না। কাদেরকে ডেকে বলল, সবজেক্ট পাওয়া গেছে— অসাধারণ সাবজেক্ট— ছবি হবে ক্ষুধা নিয়ে। ক্ষুধা কি একজন জানতে চাচ্ছে। ক্যামেরা তার মুখের ওপর ধরে রাখা। মাঝে মাঝে ক্যামেরা সরে নানান ধরনের খাবার দাবারের উপর চলে যাচ্ছে। আবার ফিরে আসছে তার মুখে। লোকটার অবস্থা দ্রুত খারাপ হচ্ছে। ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃষ্ণা। ক্যামেরা প্যান করে চলে গেল ঝর্ণায়। ঝিরঝির করে ঝর্ণার পানি পড়ছে— অথচ ঐ মানুষটির মুখে এক ফোঁটা পানি নেই। ক্যামেরা চলে গেল আকাশের মেঘে।

কাদের উৎসাহী গলায় বলল, আবার ছবি হইব মামা ?

ফরিদ বলল, ছবি হবে না মানে ? একটা প্রজেক্ট ফেল করেছে বলে সব কয়টা প্রজেক্ট ফেল করবে নাকি ? বলতে গেলে আজ থেকেই ছবির কাজ শুরু হল। ছবির নাম — হে ক্ষুধা।

'কি নাম কইলেন মামা ?'

'হে ক্ষুধা।'

www.BDeBooks.Com

'হে— কাথাডা বাদ দেন মামা। অপয়া কথা। এর আগের বারও 'হে' আছিল বইল্যা ছবি অয় নাই।'

'কথা মন্দ বলিস নি। তাহলে বরং 'হে' টা পেছনে নিয়ে যাই। ছবির নাম -'ক্ষুধা হে' কি বলিস ?'

'মন্দ না।'

'কাগজ কলম দে। ইমিডিয়েট যেসব চিন্তা মাথায় আসছে সেগুলো নোট ডাউন করে ফেলি। দুলাভাইয়ের সঙ্গেও আলাপ দরকার। ছবিটা যখন তাঁকে নিয়েই হচ্ছে।'

কাদের ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার কোন পাট থাকত না মামা ?'

'থাকবে! তবে সাইড রোল। সেন্ট্রাল ক্যারেকটার হচ্ছে দুলাভাই! দেখি আপার সঙ্গে ব্যাপারটা আগে ফয়সালা করে নিই।'

মিনু রাগ করে বিলুর ঘরে শুয়ে আছেন। সকালে তিনিও নাস্তা করেননি। তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে বাড়ি থেকে চলে যাবার কথাও মনে আসছে। রাগারাগী তাঁর স্বভাবে নেই তবু সবাই বেশ কয়েকবার তার কাছে ধমক খেয়েছে। তিনি বলে দিয়েছেন কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। কাজেই ফরিদ যখন বিশাল একটা খাতা হাতে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, আপা আসব ?

তিনি কড়া গলায় বলেন, ভাগ এখান থেকে।

'তুমি যা বলবে তাই হবে কিন্তু তার আগে তোমার কয়েকটা মিনিট সময় আমাকে দিতে হবে। দুলাভাইকে নিয়ে ছবি করছি আপা। ছবির নাম "ক্ষুধা হে।" দুলাভাই সেখানে মানুষ না। দুলাভাই হচ্ছেন ক্যামেরা — যে ক্যামেরা ক্ষুধা কি বুঝতে চেষ্টা করছে। পনেরো মিনিটের ছবি। পনেরো মিনিটই যথেষ্ট। শেষ দৃশ্যটা নিয়েছি সুকান্তের কবিতা থেকে। ঘন নীল আকশে পূর্ণিমার চাঁদ। হঠাৎ সেই চাঁদটা হয়ে গেল একটা আটার রুটি। দুটা রোগা রোগা হাত আকাশ থেকে সেই চাঁদটা অর্থাৎ রুটিটা নামিয়ে এনে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলল। কেমন হবে আপা বলতো ? অসাধারণ না ?'

মিনু একটিও কথা না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। ফরিদের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। সে নিজের মনে বকবক করতে থাকুক।

মানুষের অবহেলা ফরিদকে তেমন বিচলিত করে না। এবারো করল না। আসলে এই মুহূর্তে 'ক্ষুধা হে' ছবির শেষ দৃশ্য তাকে অভিভূত করে রেখেছে। রোগা রোগা দুটা হাত আকাশ থেকে চাঁদটা নামিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে কপ কপ করে খেয়ে ফেলছে। এই দৃশ্যের কোন তুলনা হয় না।

ফরিদ ঘর থেকে বের হয়েই পুতুলের মুখোমুখি পড়ে গেল। ফরিদ কড়া 'গলায় বলল, এই যে মেয়ে দাঁড়াও তো। দেখি হাত দুটা মেলতো। পুতুল ভয়ে ভয়ে হাত মেলল।

হুঁ রোগা রোগা হাত আছে— মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়ে হবে। তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে?'

'কি কাজ?'

'অতি সামান্য কাজ। পারবে কি পারবে না সেটা বল।'

পুতুল ক্ষীণ স্বরে বলল, পারব।

'ভেরী গুড। কাজটা অতি সামান্য। আকাশ থেকে চাঁদটা টেনে নামাবে তারপর ছিঁড়ে কুচি কুচি করে খেয়ে ফেলবে!'

পুতুল অপলক চোখে তাকিয়ে আছে। তার সব চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেছে।

ফরিদ দাঁড়াল না— লম্বা লম্বা পা ফেলে বারান্দায় চলে গেল। ছবিটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার। খুবই ঠাণ্ডা মাথায়। দরকার হলে ছবির লেংথ কমিয়ে পনেরো থেকে দশ মিনিটে নিয়ে আসতে হবে। তবে সেই দশ মিনিটও হবে অসাধারণ দশ মিনিট — গোল্ডেন মিনিটস!

১৪

যতটা কষ্ট হবে বলে ভেবেছিলেন ততটা কষ্ট সোবাহান সাহেবের হচ্ছে না। কষ্ট একটিই, পরিবারের সদস্যরা সবাই বড় বিরক্ত করছে। এদের যন্ত্রণায় বড় কিছু করা যায় না। দৃষ্টিটাকে এরা কিছুতেই ছড়িয়ে দিতে পারে না। কয়েকটা দিন না খেয়ে থাকা যে কঠিন কিছু না এটা তারা বুঝে না।

সোবাহান সাহেব একটা বড় খাতায় তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও লিখে রাখছেন। খুব গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছেন। তেমন গুছিয়ে লিখতে পারছেন না। কিছুক্ষণ লেখালেখি করলেই মাথায় চাপ পড়ছে। তাঁর ডায়েরীর কিছু কিছু অংশ এরকম

বুধবার

রাত দশটা পাঁচ।

অনশন পর্ব শুরু করা গেল। এই অনশন দাবি আদায়ের অনশন নয়। এই অনশন নিজেকে জানার অনশন। আমি ক্ষুধার প্রকৃত স্বরূপ জানতে চাই। আমি এর ভয়াবহ রূপ জানতে চাই। যদি জানতে পারি তাহলে হয়তবা ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ ধারণা হবে। এই যে পৃথিবী জুড়ে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে এর মূল কারণগুলোর একটি নিশ্চয়ই ক্ষুধা। আজকের খবরের কাগজের একটি খবর দেখে অত্যন্ত বিষণ্ন বোধ করেছে। সাভার উপজেলার জনৈক কালু মিয়া অভাবে অতিষ্ট হয়ে তার স্ত্রী, ছয় বছরের পুত্র এবং তিন বছরের কন্যাকে হত্যা করে পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছে। স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিতে বলেছে ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ট হয়ে সে এটা করেছে। হায়রে ক্ষুধা! অথচ এই সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

www.BDeBooks.Com

বৃহস্পতিবার
ভোর এগারোটা।

আমি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছি। আমি একটা পরীক্ষা করছি তাও তারা করতে দেবে না। তাদের ধারণা হয়েছে অল্প কয়েক ঘণ্টা না খেয়ে থাকার কারণে আমি মারা যাব। মৃত্যু এত সহজ নয়। বিয়াল্লিশ দিন শুধুমাত্র পানি খেয়ে জীবিত থাকার রেকর্ড আছে। এরা এই জিনিসটা বুঝতে চায় না। আমার মৃত্যু প্রসঙ্গে এদের অতিরিক্ত সচেতনতাও আমার ভাল লাগছে না। মৃত্যু একটি অমোঘ ব্যাপার। একে নিয়ে এত মাতামাতি কেন ? পবিত্র কোরান শরীফে তো স্পষ্ট উল্লেখ আছে, প্রতিটি জীবিত প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে ধর্মগ্রন্থ পাঠের একটা প্রবল ইচ্ছা বোধ করছি। ক্ষুধার্ত মানুষ কি পারলৌকিক চিন্তা করে ? একটি জরুরি বিষয় লিখে রাখা দরকার বোধ করছি। মিনু বড় কান্নাকাটি করছে। এত কান্নাকাটির কি আছে তাতো বুঝতে পারছি না। বিলু এসে বলে গেল আমি যদি না খাই তাহলে তার মা-ও খাওয়া বন্ধ করে দেবে। এ দেখি আরেক যন্ত্রণা হল।

বৃহস্পতিবার
বেলা একটা দশ মিনিট।

ফরিদের ফাজলামির সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। শুনলাম এই গাধা এখন না-কি আমাকে নিয়ে ছবি করবে। ছবির নাম 'ক্ষুধা হে' এই গাধাটাকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারলে মন শান্ত হত। মিনুর মুখের দিকে তাকিয়ে তা করতে পারছি না। মিনু ফরিদকে বড়ই পছন্দ করে। আমিও করি। কেন করি তা জানি না। ভাল কথা এখন একটু কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে। মাথা ঘুরছে। প্রেসারের কোন সমস্যা কি না কে জানে।

ক্রমাগত ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করার চেষ্টা করছি। পবিত্র কোরান শরীফে যে এত সুন্দর সুন্দর অংশ আছে আগে লক্ষ্য করিনি। মূল আরবিতে পড়তে পারলে ভাল হত। বয়স কম থাকলে আরবি পড়া শুরু করতাম। সেই সময় নেই। এখন ঠিক করেছি কোরান শরীফের পছন্দের কিছু আয়াত লিখে রাখব—

" If it were His will
He could destroy you
O mankind, and create
Another race: for He
Hath power this to do."
(সূরা নিসা, ১৩৪ নং আয়াত)

আল্লাহ তালা নতুন জাতি সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। যদি সত্যি সত্যি তিনি করতেন তাহলে কেমন হত সেই জাতি ? তাদের কি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কামনা থাকত না ? তারা এইসব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হত ?

ফরিদ চোখে চশমা দিয়ে গভীর মনোযোগে খাতায় শট ডিভিসন করছে। হাতে সময় নেই। দুলাভাইয়ের অনশন চলাকালীন সময়েই কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। একটা ফিস আই লেন্স দরকার ট্রিক শটের জন্যে। এই লেন্সটাই জোগাড় হচ্ছে না।

'বাবাজী আসব ?'

ফরিদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকাল। এমদাদ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফরিদ রাগী গলায় বলল, কি চান ?

'কিছু না। আমার নাতনী অর্থাৎ পুতুল চিন্তার মইদ্যে পড়েছে— আফনে না-কি তারে বলেছেন আসমানের চাঁদ ধইরা নামাইয়া ছিড়া কুটি কুটি কইরা খাইয়া ফেলতে।'

'হ্যাঁ বলেছি।'

হতভম্ব এমদাদ দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, খাইয়া ফেলতে বলছেন ?

'হ্যাঁ বলেছি। কেন কোন অসুবিধা আছে ?'

এমদাদ শুকনো গলায় বলল, জ্বিনা অসুবিধার কি ? অসুবিধার কিছুই নাই।

'আপনার কথা শেষ হয়েছে ?'

'জ্বি।'

'তাহলে দয়া করে ঘর থেকে বের হয়ে যান।'

'অবশ্যই অবশ্যই।'

এমদাদ প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বের হয়ে এল। এই লোকটির মাথা যে খানিকটা উলট পালট আছে তা সে শুরুতেই বুঝে গিয়েছিল। সেই উলট পালট যে এতখানি তা বোঝেনি। কিন্তু যে আকাশের চাঁদ ছিড়ে কুচি কুচি করে খেয়ে ফেলার কথা ভাবে তাকে সহজ পাগলের দলে ফেলা ঠিক হবে না। এর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে হবে। পুতুলকেও বলে দিতে হবে যেন এই লোকের ত্রি সীমানায় না আসে।

১৫

মনসুরকে আজ বিকেলে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেবে। সে এখন পুরোপরি সুস্থ। ফুসফুসে পনি ঢুকে যাওয়ার যে জটিলতা দেখা দিয়েছিল তা এখন নেই। আর হাসপাতালে পরে থাকার কোন মানে হয় না। অবশ্যি মনসুর চাচ্ছে আরো কিছু দিন থেকে যেতে। হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে থাকতে তার মন্দ লাগে না। বই পত্র পড়া যায়। আরাম করে ঘুমানো যায়। সবচে বড় কথা প্রায় দিনই মিলি এসে দেখে যায়। সে হাসপাতাল ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই মিলি তাকে দেখতে আসবে না।

হাসপাতালের বিছানায় মনসুরের বেশির ভাগ সময় মিলির কথা ভেবে ভেবেই কাটে। মিলিকে নিয়ে পেনসিল দিয়ে সে কবিতাও লিখেছে। সম্ভবত

www.BDeBooks.Com

কিছুই হয় নি। কাউকে দেখাতে পারলে হত। দেখাতে লজ্জা লাগে। একটা কবিতা এরকম—

একটু আগে এসেছিলেন মিলি
চারদিকে তাই এমন ঝিলিমিলি।
মনটা আমার হল উড়ু উড়ু।
বুকের ভেতর শব্দ দুরু দুরু।
যখন মিলি বিদায় নিতে চান
আমি বলি— একটু বসে যান।
হাত বাড়িয়ে আমার দু'হাত ধরুন

বাকিটা আর পরা যায় নি। ধরুনের সঙ্গে ভাল কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। ধরুন, করুন, মরুন। কোনটাই ভাল লাগে না। আপাতত খাতা বন্ধ রেখে মনসুর গভীর মনোযোগে একটা চটি বই পড়ছে। বইটি ইংরেজিতে লেখা। বইয়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে মেয়েদের পছন্দ অপছন্দ। বইয়ের লেখক পনেরো বছর গবেষণা করার পর এই বই লিখেছেন এবং এই বইয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মেয়েদের বিষয়ে প্রচলিত অধিকাংশ ধারণাই মিথ্যা। আমাদের আগে বিশ্বাস ছিল মেয়েদের রূপের প্রশংসা করলে তার খুশী হন। এই বইয়ের লেখক দেখিয়েছেন যে রূপের প্রশংসায় অধিকাংশ মেয়ে বিরক্ত হয়।

বইটির ব্যাক কভারে প্রকাশক লিখেছেন— নারী চরিত্র বোঝার জন্য বইটি অপরিহার্য। অবিবাহিত যুবক যারা সঙ্গী খুঁজছেন বইটি তাদের জন্য বাইবেল স্বরূপ। মনসুরের কাছেও তাই মনে হচ্ছে। বইটা আরো আগে হাতে এলে উপকার হত।

বইটির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের শিরোনাম— রসিকতা ও মেয়ে মানুষ। এখানে লেখক বলছেন— 'আমাদের একটি ধারণা আছে মেয়েরা রসিকতা পছন্দ করে। ধারণা সঠিক নয়। মেয়েরা রসিকতা একেবারেই পছন্দ করেন না। কারণ কখনো কোন মেয়েকে রসিকতা করতে দেখা যায় না। কেউ যদি মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করে তাহলে মেয়েরা তার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পোষণ করে। এই ধারণা পাঁচশত মেয়েদের মাঝ থেকে জরিপের মাধ্যমে নেয়া।

ধারণা	শতকরা হিসাবে
লোকটা ফাজিল	৬৫%
লোকটা চালবাজ	২০%
লোকটা বোকা	১০%
লোকটা চালাক	২%
	৯৭ %

বাকি তিন ভাগ মহিলা কোন রকম মন্তব্য করতে রাজি হননি। কাজেই প্রিয় পাঠক আপনি যাই করুন মেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করবেন না। যদি করতেই হয় খুব সহজ রসিকতা করবেন যা কোমলমতি শিশুরাও ধরতে পারে। যেসব রসিকতা বুঝতে বুদ্ধির প্রয়োজন ভুলেও সেসব রসিকতা করবেন না। নিম্নে রসিকতার কিছু নমুনা দেয়া গেল। এসব রসিকতা করা যেতে পারে।

(ক)

স্ত্রী স্বামীকে বলছেন, ওগো পাশের বাসার ভদ্রলোক কত ভাল। অফিসে যাবার সময় রোজ তাঁর স্ত্রীকে চুমু দিয়ে যান। তুমি এ রকম কর না কেন ? স্বামী অবাক হয়ে বললেন, আমি কি করে করব ? আমি কি ঐ ভদ্রমহিলাকে চিনি ?

(মন্তব্য ঃ জরিপে দেখা গেছে শতকরা ২৫ ভাগ মহিলা এই রসিকতা বুঝতে পারে না তবু হাসে। কাজেই একটু সাবধান থাকা ভাল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যৌন বিষয়ক রসিকতা মেয়েরা না বুঝলেও খুব পছন্দ করে।)

(খ)

শিক্ষক জিজ্ঞেস করছেন সম্রাট শাহজাহান কোথায় মারা গেছেন ? ছাত্র বলল, ইতিহাস বই-এ সত্তুর পৃষ্ঠায়।

(মন্তব্য ঃ এই রসিকতা শতকরা ৭৮ ভাগ মহিলা বুঝতে পারেন। যারা বুঝতে পারেন না! তাঁরা সাধারণত অবাক হয়ে বলেন, সত্তুর পৃষ্ঠায় মারা গেছে ? আপনি তাহলে বলতে চাচ্ছেন সত্তুর নাম্বারটা আন-লাকি ?)

(গ)

এক পাগলের খুব বই পড়ার নেশা। সব বই সে পড়ে না শুধু নাটকের বই পড়ে। পড়তে পড়তে নাটকের যাবতীয় বই সে পড়ে শেষ করে ফেলল। আরো বই চায়। উপায় না দেখে তখন তাকে এটা টেলিফোন ডিরেক্টরি ধরিয়ে দেয়া হল। সে মহানন্দে দিন দশেক ধরে তাই পড়ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হল— কেমন লাগছে পড়তে ?

পাগল বলল, অসাধারণ— তবে চরিত্রের সংখ্যা বেশি। মনে রাখতে একটু কষ্ট হচ্ছে। (মন্তব্যঃ এই রসিকতা কোন মহিলাই ধরতে পারেন না তবে সবাই খুব হাসেন। কেন হাসেন এটা একটা রহস্য। দেখা গিয়েছে অনেক মহিলা হাসতে হাসতে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে যান। কাজেই এই রসিকতা করার আগে যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল।)

মহিলাদের সঙ্গে রসিকতা করার সময় পাঞ্চ লাইনে যাবার আগেই উচ্চ স্বরে হাসা শুরু করা উচিত। যাতে মহিলারা বুঝতে পারেন কোথায় হাসতে হবে।

মনসুর যখন বইয়ের এই অংশে তখন মিলি ঢুকল। সে ডাক্তারকে বাসায় নিয়ে যেতে এসেছে। কারণ ছাব্বিশ ঘণ্টা পার হয়েছে সোরাহান সাহেব তিন

www.BDeBooks.Com

কাপ পানি ছাড়া কিছুই খাননি। তার শরীরের তাপ নেমে এসেছে। চোখ হয়েছে লালচে। আগে নিজেই বসে লিখতেন এখন তাও পারছেন না।

মিলি মনসুরের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠল। মনসুর হতভম্ব। মিলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, খুব খারাপ খবর আছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

১৬

সোবাহান সাহেব কোন কিছু না খেয়ে ১৬৬ ঘণ্টা পার করেছেন। মোটামুটি হাসি তামাশা হিসাবে যার শুরু হয়েছিল তার শেষটা সে রকম রইল না। মনসুর ঘোষণা করেছে আর বার ঘণ্টার ভেতর যদি কিছু খাওয়ানো না যায় তাহলে হাসপাতালে নিয়ে ফোর্স ফিডিং করা উচিত। রক্তে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে গেছে।

একমাত্র ফরিদকেই পুরো ব্যাপারটায় আনন্দিত মনে হচ্ছে। তার ছবির কাজ এখনো শুরু হয়নি। কারণ চিত্রনাট্যে শেষ মুহূর্তে একটা রদ-বদল করা হয়েছে। ফরিদ ঠিক করে পুরো দৃশ্যটা একটা গানের উপর করা হবে। গানটা এমন যার সঙ্গে ক্ষুধার কোন সম্পর্ক নেই। সেই গানও সিলেক্ট করা হয়েছে— 'হলুদিয়া পাখি সোনার বরণ পাখিটি ছাড়িল কে।' গানের সঙ্গে ছবির যদিও কোন সম্পর্ক নেই তবু ছবিটা এমন ভাবে করা হবে যে একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাবে। খুবই কঠিন কাজ। তবে জীবনের আনন্দতো কঠিন কাজেই। সহজ কাজ সবাই পারে। কঠিন কাজ পারে কয়জনে ?

ছবি নিয়ে মিলির সঙ্গে ছোটখাট ঝগড়ার মতও হল। মিলি চোখ মুখ লাল করে এসে বলল, একটা মানুষ মরে যাচ্ছে আর তুমি আছ ছবি নিয়ে ?

ফরিদ বলেছে, জীবনটাই এরকম মিলি, কারো জন্যে কোন কিছু আটকে থাকে না। Life goes on.

'মামা তুমি পাথরের তৈরি একজন মানুষ।'

'তুই নেহায়েৎ ভুল বলিসনি।'

'একটা মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে আর তুমি কিনা বানাচ্ছ 'ক্ষুধা-হে।' মামা চক্ষু লজ্জারোতো একটা ব্যাপার আছে। আছে না ?'

'শিল্প সাহিত্যের কাছে চক্ষু লজ্জা কিছু না-রে মা, শিল্প সাহিত্য চক্ষু লজ্জার অনেক উপরে।'

'তুমি কিছু মনে করো না মামা। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধিও কম।'

'না আমি কিছুই মনে করছি না। স্বয়ং সক্রেটিসকে লোকে গাধা বলেছে। আর্কিমিডিসকে ছোটবেলায় ডাকা হত সিকি বুদ্ধির মানুষ— বুঝলি ?'

মিলি জবাব না দিয়ে উঠে পড়েছে। মামার সঙ্গে তর্ক করা অর্থহীন।

এ বাড়ির কাণ্ডকারখানা দেখে সবচেয়ে বেশি হকচকিয়ে গেছে এমদাদ। সে কল্পনাও করতে পারেনি সত্যি সত্যি একটা মানুষ না খেয়ে এতদিন পার করে

দেবে। এরকম অবস্থায় কোন কথাবার্তাও বলা যায় না। যে পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল সেই পরিকল্পনা কোন কাজে আসছে না। নাতনীটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দেয়া। গ্রামের বাড়িতে তাকে রাখা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। কিছু গুণ্ডা পাণ্ডা ছেলে পেছনে লেগেছে। এদের মতলব ভাল না। গত বর্ষায় বদি শেখের বৌকে ধরে পাটক্ষেতে নিয়ে গেছে। লজ্জায় এই ঘটনা বদি শেখ কাউকে বলেনি। না বললেও কারোর জানতে বাকি নেই। ঘটনার নায়করাই সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে। এদেরই একজন পুতুলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং আকারান্তরে জানিয়েছে প্রস্তাবে রাজি না হলে পাটক্ষেতে যেতে হবে। এর পর আর গ্রামে থাকা সম্ভব না। এমদাদ নাতনীকে নিয়ে বলতে গেলে পালিয়েই এসেছে। সে জানে ঘটনা শুনলে সোবাহান সাহেব একটা ব্যবস্থা করবেনই কিন্তু ঘটনা শুনানোর সময়ইতো হল না। না খেয়ে মর মর অবস্থা।

সব মন্দ জিনিসের একটা ভাল দিকও আছে। সোবাহান সাহেবের এই অসুখের ফলে মনসুর নামের এই ডাক্তার ছেলেটার সঙ্গে পরিচয় হল। এই ছেলে ঘন ঘন আসছে। পুতুলের সঙ্গে এই ছেলের বিয়ে দেয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? পুতুল দেখতে তো খারাপ না। চোখে কাজল টাজল দিয়ে মাশাআল্লাহ ভাল লাগে। তবে মেয়েটা হয়েছে বদ। যেটা করতে বলা হবে সেটা করবে না।

একটু সেজেগুজে ডাক্তারের সামনে হাঁটাহাঁটি করলে কি কোন অসুবিধে আছে ? এক কাপ চা এনে দিবে। এক গ্লাস পানি আনবে। যাবার সময় বলবে, ডাক্তার সাব ভাল আছেন ? আবার আসবেন। একটু ঢং ঢাং না করলে হয় ? দুনিয়াটাই হচ্ছে ঢং ঢাংয়ের।

অবশ্যি এমদাদ চেষ্টার ত্রুটি করছে না। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলেই গল্প গুজব করছে। একটা সম্পর্ক পাতানের চেষ্টায় আছে। কোনমতে একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেললে নিশ্চিন্ত। সেই সম্পর্কও করা যাচ্ছে না। ডাক্তারকেও একটু বোকা কিসিমের বলে মনে হচ্ছে। এটা একদিক দিয়ে ভাল। স্বামী হিসেবে বোকাদের কোন তুলনা নেই। যত বোকা তত ভাল স্বামী। ডাক্তারটা কত বোকা সেটাও ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তবে এই বাড়ির মিলি মেয়েটির সঙ্গে বড় বেশি খাতির। এটা একটা সন্দেহজনক ব্যাপার। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। গতকাল অবশ্যি ডাক্তারে চেম্বারে গিয়ে কিছু কাজ করা হয়েছে। এইসব কাজ ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। এখন বয়স হয়ে গেছে। মাথা আগের মত ঠান্ডা না। গতকাল ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা যা হল তা হচ্ছে—

এমদাদ — এই যে ডাক্তার ভাই, শরীর ভাল ? চিনছেন তো আমারে ? আমি এমদাদ। পাকুন্দিয়ার এমদাদ। আমার নাতনীটার শরীরটা খারাপ। ভাবলাম একটু অষুধ আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাই।

www.BDeBooks.Com

ডাক্তার	কি অসুখ ?

এমদাদ	মাথার যন্ত্রণা। আরো কি সব যেন আছে। আমি নিয়ে আসবনে আপনের কাছে। দেখে শুনে যাই হোক একটা কিছু দিবেন। আপনের উপরে আবার খুব ভক্তি। আপনাকে খুবই ভাল পায়।

এই কথায় ডাক্তার খানিকক্ষণ খুক খুক করে কাশল। এটা খুব ভাল লক্ষণ। কাজেই কথাবার্তা এই লাইনেই চালানো ভাল। এমদাদ গলার স্বর খানিকটা নিচু করে বলল, মেয়েদের মন বোঝা বড় মুশকিল। ঐ দিন আপনারে নিয়া বিরাট ঝগড়া মিলির সঙ্গে।

ডাক্তার	(খানিকটা উৎসাহী) মিলির সঙ্গে ঝগড়া ?

এমদাদ	জ্বি।

ডাক্তার	কি জন্যে বলুন তো ?

এমদাদ	মেয়েছেলের কারবারতো। মিলি একদিন বলল— ডাক্তার সাহেব বেকুব কিসিমের লোক এই শুইন্যা পুতুল রাগ করল।

ডাক্তার	(হতভম্ব) আমাকে বেকুব কিসিমের লোক বলল ?

এমদাদ	বাদ দেন। বাদ দেন। মেয়েছেলের কারবার, তামশা কইরা বলছে। মেয়েছেলেরা তামশা কইরা অনেক কথা কয়। হে হে হে।

এমদাদ চেষ্টার চূড়ান্ত করছে, কিন্তু একা একা কত করবে ? পুতুলের নিজেরও তো সাহায্য দরকার। সে যদি কাঠের টুকরার মত থাকে তাহলে হবে কিভাবে ? শাড়িটা বদলাতে বললে বদলায় না। চুলটা আঁচড়িয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ক্ষতিতো কিছু নাই ?

তাছাড়া অবস্থা এমন কিছু করারও সময় না। একজন ঝিম ধরে পড়ে আছে। এখন যায় তখন যায় অবস্থা। ক্ষুধা কি জিনিস বুঝতে চায়। আরে বাবা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা না ক্ষুধা কি জিনিস তুমি বোঝ। যদি আল্লাহতালার সেই রকম ইচ্ছা থাকত তোমারে গরিব বানিয়ে পাঠাত। খামাকা ভড়ং।

এ বাড়িতে এমদাদের সব সময় মুখ শুকনা করে থাকতে হয়। ভাব দেখাতে হয় যে চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। এসব কি ভাল লাগে ? আর বুড়া যদি সত্যি সত্যি মরে যায় তাহলে তো সাড়ে সর্বনাশ। সে যাবে কোথায় ?

সন্ধ্যাবেলা আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করল। কালবৈশাখীর প্রথম ঝাপ্টা। হাওয়ায় ঘরের দরজা জানালা উড়িয়ে নিয়ে যাবার মত অবস্থা। টগর এবং নিশার আনন্দের সীমা নেই। বৃষ্টির মধ্যে খুব লাফাচ্ছে। বৃষ্টির জল অসম্ভব ঠাণ্ডা।

শীতে একেকজন থরথর করে কাঁপছে তাতেও আনন্দ বাঁধ মানছে না। আনিস ঘর থেকে এই দৃশ্য দেখছে তবে চুপচাপই আছে। তার মুখে মৃদু হাসি দেখে মনে হচ্ছে সেও বেশ মজাই পাচ্ছে হয়ত সে পানিতে নামবে। টগর বলল, বাবা পানিতে নামবে ?

আনিস হাসি মুখে বলল, ঠাণ্ডা কেমন তার উপর নির্ভর করছে।

নিশা শীতে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, একদম ঠাণ্ডা না বাবা। গরম পানি।

'খুব গরম ?'

'হ্যাঁ খুব গরম।'

আনিসও নেমে পড়ল। শীতে জমে যাবার মত অবস্থা। তবু বাচ্চাদের সঙ্গে হৈ চৈ করে ভিজতে ভাল লাগছে। সবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে বলাই বাহুল্য। নিশা এখনই হাঁচি দিচ্ছে।

আর বোধ হয় মেয়েটাকে পানিতে থাকতে দেয়া উচিত হবে না কিন্তু ওঠে যেতে বলতেও খারাপ লাগছে। করুক, একটু আনন্দ-করুক।

নিশা শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, বাবা আজ সারা রাত আমরা পানিতে ভিজব— কেমন ?

'আমার আপত্তি নেই।'

পানিতে বেশিক্ষণ ভেজা গেল না। শীলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দৌড়ে সবাইকে ঘরে ঢুকতে হল। তিনজনেই শীতে থর থর করে কাঁপছে। নিশার গায়ে সম্ভবত জ্বর উঠেই গেছে। সে একটু পর পরই হাঁচি দিচ্ছে। বিলুর কাছ থেকে অষুধ এনে খাইয়ে দেয়া দরকার। আনিসকে বিলুর কাছে যেতে হল না। বিলু নিজেই এসে উপস্থিত।

বিলু মুখ শুকনো করে বলল, আপনারা মনে হচ্ছে খুব মজা করলেন। আনিস বলল, হ্যাঁ করলাম। অনেকদিন পর পানিতে ভিজলাম। যাকে বলে শৈশবে ফিরে যাওয়া।

'আপনার সঙ্গে একটা কথা বলার জন্যে এসেছিলাম আনিস সাহেব।'

'বলুন।'

'আপনার বাচ্চাগুলোর গা মুছিয়ে শুকনো কাপড় পরিয়ে দিন তারপর আমার সঙ্গে নিচে আসুন, বলছি।'

'মনে হচ্ছে খারাপ খবর।'

'আমাদের জন্যে খারাপ খরব আপনার জন্যে কেমন তা জানি না। বাবার ব্লাড প্রেসার খুব ফল করেছে।'

'বলেন কি ?'

'বাড়ির একটা মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে পড়ে আছে এবং তা পড়ে আছে আপনার উল্টা পাল্টা কথা শুনে অথচ আপনি এদিনও তাঁকে দেখতে যান নি।'

www.BDeBooks.Com

আনিস বলল, 'চলুন যাই দেখে আসি।'

'ঠাট্টা করছেন ?'

'আমি ঠাট্টা করি না। একজন মানুষ ক্ষুধার স্বরূপ বুঝতে চাচ্ছে এটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে বলেই আমি চুপ করে আছি।'

'একজন মানুষ মরে যাবে তারপরও আপনি চুপ করে থাকবেন ?'

আনিস হাসি মুখে বলল, মানুষ এত সহজে মরে না। চলুন যাই অনশন ভাঙিয়ে দিয়ে আসি। বিলু বিস্মিত গলায় বলল, 'আমরা সবাই মিলে যা পারলাম না আপনি তাই করবেন। অনশন ভাঙ্গাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

আনিস সোবাহান সাহেবের সঙ্গে কি কথা বলব কেউ জানল না কারণ ঘরে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু দেখা গেল আনিস ঘর থেকে বেরুবার পর পরই সোবাহান সাহেব বললেন, আমাকে এক গ্লাস দুধ দাও।

খবর শুন হতভম্ব হয়ে গেল ফরিদ। এটা কি কথা ? চিত্রনাট্য এখন কমপ্লিট আর এখনি কি-না অনশন ভঙ্গ। আর দু'দিন পর ভাঙলে অসুবিধাটা কি হত ? এই দু'দিনে ইম্পর্টেন্ট কিছু সট নিয়ে নেয়া যেত! মহৎ কাজে পদে পদে বাধা আসে এটাই হচ্ছে খাঁটি কথা। মহাপুরুষদের যে বাণী— তোমার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় এটাই হচ্ছে আদি সত্য।

রাগ করে রাতে ফরিদ ভাত খেল না। এই রাগ তার নিজের উপর না, দুলাভাইয়ের উপরও না। এই রাগ হচ্ছে প্রকৃতির উপর। যে প্রকৃতি পদে পদে মানুষকে আশাহত করে।

সোবাহান সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। মিলি বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ডাক্তার পাশেই আছে। ডাক্তারের মুখ আনন্দে ঝলমল করছে কারণ এই অনশনের কারণে খুব ঘন ঘন সে এ বাড়িতে আসতে পেরেছে। এখন অনশন ভাঙায় একটু সমস্যা হয়েছে আর হয়ত ঘন ঘন আশা সম্ভব হবে না। তবে ভাগ্য যদি ভাল হয় তাহলে হয়ত তৃষ্ণার্ত মানুষের কষ্ট বোঝানোর জন্যে এই লোক পানি খাওয়া বন্ধ করবেন। সেই সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ মনে হচ্ছে। মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব আপনি এখনো বসে আছেন কেন চলে যান। মনসুর বলল, না আমার কোন অসুবিধা নেই। এগারোটার দিকে প্রেসারটা মেপে তারপর যাব।

'তাহলে আসুন আমাদের সঙ্গে চারটা ভাত খান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মিলি হাসতে হাসতে বলল, কেউ ভাত খেতে বলতেই আপনি বুঝি রাজি হয়ে যান ? এ রকম চট করে রাজি হওয়াটা কি ভাল ? আমাদের হয়ত ভাত খাওয়াবার ইচ্ছা নেই ভদ্রতা করে বলেছি।'

'মিলি হাসতে হাসতে কথাগুলো বলছে। শুনতে কি ভালই না লাগছে। আচ্ছা এই মেয়ের সঙ্গে তার যদি কোনদিন বিয়ে হয় তাহলে সেকি কোনদিন

তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবে ? না করবে না। কোনদিন না। এই মেয়েকে সে কোনদিন কোন কড়া কথা বলতে পারবে না। এই মেয়ের খুব কঠিন কথায়ও সে রাগ করতে পরবে না।

'ডাক্তার সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি আনিস সাহেবের ছোট মেয়েটাকে একবার দেখে যাবেন। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাঁধিয়েছে। আপনি বরং উপর থেকে রুগী দেখে আসুন— আমি ভাত দিতে বলি।

'জ্বি আচ্ছা।'

নিশার জ্বর তেমন কিছু না। একশ'র কিছু বেশি। তাবে লাংস পরিষ্কার না। কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। আনিস বলল, কেমন দেখলেন ?

মনসুর বলল, ভাল।

'সত্যি ভাল তো ? আপনার গলায় তেমন জোর পেলাম না।'

লাংসে কেমন ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে বুকে বোধ হয় কফ জমে গেছে। সকাল পর্যন্ত দেখব তারপর এন্টিবায়োটিক দেব।'

'আপনার ভিজিট কত ডাক্তার সাহেব ?'

মনসুর খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আনিস সাহেব। আমি বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাল মিশতে পারি না। কিছু কিছু মানুষ আছে ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে না। আমি সেই রকম। আমি আপনার বাচ্চা দু'টাকে যে কি পরিমাণ পছন্দ করি তা ওরা জানে না কিন্তু আমি জানি, আমার হৃদয় জানে। আপনি ভিজিটের কথাটা তুলে খুব কষ্ট দিলেন।

আনিস লজ্জিত স্বরে বলল, ভাই কিছু মনে করবেন না।

'না আমি কিছু মনে করিনি।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, আমিও আপনাকে খুব পছন্দ করি। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে খানিক সাহায্য করতে পারি।

মনসুর অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?'

'হ্যাঁ পারি। আমার মনে হয় আপনার কিছু উপদেশের প্রয়োজন আছে।'

মনসুর তাকিয়ে রইল। আনিস বলল, যে কথাটা আপনি বলতে পারেন না, লজ্জা বোধ করেন বা সংকোচ বোধ করেন সেটা বলে ফেলবেন। পেটে জমিয়ে রাখবেন না। এই হচ্ছে উপদেশ।

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'ধরুন আপনি কাউকে ভালবাসেন। রূপবতী কোন এক তরুণীকে। কিন্তু বলার সাহস পাচ্ছেন না। সব সময়ই আপনার মনে এক ধরনের ভয়। এক ধরনের শংকা। ঐ ভয়, ঐ শংকা দূর করে ফেলুন। যখন মেয়েটিকে একা দেখবেন এগিয়ে যাবেন. সহজ স্বাভাবিক গলায় বলবেন, আমি তোমাকে

www.BDeBooks.Com

ভালবাসি। এতে অতীতে কাজ হয়েছে। বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। আমার মনে হয় অনেকদিন থেকেই এ কথাটা আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন। সাহস পাচ্ছেন না।

'আপনি আমাকে এসব বলছেন কেন ?'

'আপনাকে বলছি কারণ আপনি নিতান্তই একজন ভাল মানুষ, আমি আপনার উপকার করতে চাই।'

'আমার উপকার করা নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

মনসুর নিচে নেমে এল কিন্তু আনিসের কথা মাথা থেকে দূর করতে পারল না। ব্যাপারটা তো আসলেই তাই। কাছে যাওয়া এবং এক পর্যায়ে শান্ত গলায় আসল কথাটা বলে ফেলা— আমি তোমাকে ভালবাসি। I love you.

জগতের সবচে পুরাতন কথা আবার সবচে নতুন কথা। এই কথা বলতে এত সংকোচ কেন ? এত দ্বিধা কেন ? সে মিলিকে এই কথা বলার পর মিলি কি করতে পারে ? সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখা যাক।

ক. মিলি মাথা নিচু করে ফেলল। তার ঠোঁট অল্প অল্প করে কাঁপছে। চোখের কোণ আর্দ্র। ক্ষীণ গলায় ছোট্ট করে বলল— তুমি এসব কি বলছ ? যাঃ আমার লজ্জা লাগছে। (মিলির এটা কখনো করবে না। মিলি প্রকৃতি এটা নয়।)

খ. মিলি কড়া চোখে তাকাবে তারপর বলবে, মনে হচ্ছে কয়েক রাত আপনার ঘুম হয়নি। দয়া করে প্রতি রাতে দশ মিলিগ্রাম করে সিডেটিভ খেয়ে ঘুমুবেন। আর যে কথাটা এখন বললেন সেই কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না।
(মিলি এই জাতীয় কিছু বলবে বলেও মনে হয় না। তার হৃদয় এত কঠিন নয়।)

গ. মিলি হো হো করে হেসে উঠবে তারপর যার সঙ্গেই দেখা হবে তাকেই ঘটনাটা বলবে। এই সম্ভাবনাই সবচে বেশি।

খাবার ঘরে প্রায় ফাঁকা। রহিমার মা টেবিলে খাবার দিচ্ছে। মিলি বসে আছে একা একা। অপেক্ষা করছে ডাক্তারের জন্যে। মনসুর খাবার ঘরে ঢোকার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। মিলিকে কি কথাটা বলে ফেলবে ? মন্দ কি ? মানসিক যাতনা ভোগ করার চেয়ে হুট করে বলে ফেললেই হয়।

কখন বললে ভাল হবে ? খাওয়ার আগে খাওয়ার মাঝখানে নাকি খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর ? সবচে ভাল হবে চলে যাবার সময় বললে। মিলি তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসবে তখন সে বলবে সেই বিশেষ কথা। বলেই অপেক্ষা করবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে পগার পার। রাতের টেনশান কমানোর

জন্যে দশ মিলিগ্রাম রিলাক্সেন অবশ্যি খেতে হবে। তাতেও টেনশান কমবে বলে মনে হয় না।

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে মনসুর খাবার ঘরে এল। মিলি টেবিলে সাজাতে ব্যস্ত। তাকে লক্ষ্য করল না। ঘরে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। রহিমার মা পানির জগ বা অন্য কিছু আনতে গেছে। এক্ষুণি হয়ত চলে আসবে। কথাটা বলে ফেললে কেমন হয়? এইতো সুযোগ।

গুছিয়ে কিছু চিন্তা করার আগেই সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, মিলি আমি তোমাকে ভালবাসি।

মনসুর বুঝতে পারছে মিলি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়েছে। মনসুর তার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, অনেকদিন থেকেই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম, বলতে পারছিলাম না। আজ বলে ফেললাম। মিলি আমি তোমাকে ভালবাসি।

'ডাক্তার সাহেব, আমি বিলু। আপনি বসুন। আমি আপনার কথা মিলিকে বলে দেব। মিলি এখানে নেই।'

মনসুরের মনে হল খুব বড় একজন সার্জন, ধারাল ছুরি দিয়ে তার শরীর থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কেটে বের করে নিয়ে গেছে। তার শরীরে এখন কোন বোধ নেই, চেতনা নেই। সে কোন মানুষ না— সে একজন 'জম্বি'। বিলু বলল, 'ডাক্তার সাহেব বসুন।'

মনসুর বসল।

'ঘরে খাবার তেমন কিছু নেই। মিলি কি যেন রাঁধতে গেছে।'

ডাক্তার মাথা নিচু করে বসে রইল। বিলু অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্যে বলল, আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? এ রকম ছোট খাট ভুলতো মানুষ সব সময় করে। করে না?

মনসুর যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল।

মিলি ডিম ভেজে এনেছে। ঘরে ঢুকেই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কি হয়েছে?

'কিছু হয় নি।'

মিলি বলল, ডাক্তার সাহেব আপনার কি হার্ট এ্যাটাক হচ্ছে? এ রকম ঘামছেন কেন?

মনসুর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে মিস মিলি। আজ আমি কিছু খাব না।

ডাক্তার কাউকে কিছু বলার অবকাশ দিল না। দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিলি কিছুই বুঝতে পারছে না। হাসতে হাসতে বিলু ভেঙে পড়ছে। তার বড় মজা লাগছে। মিলি বলল, হচ্ছে কি আপা? এত হাসি কিসের?

বিলু বলল, ডাক্তার চমৎকার করে প্রেম নিবেদন করল তাই দেখে হাসছি।

www.BDeBooks.Com

'প্রেম নিবেদন করল মানে ?'

'ও তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ডুবে মরে যাবার আগে ওকে বিয়ে করে ফেল। ও ভাল ছেলে।'

১৭

দুজনই দেব শিশু।

দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের ছোট্ট ডানা দুটি ঘরের বাইরে রেখে খেলতে বসেছে। এই খেলাও অদ্ভুত খেলা। একজনের হাতে একটা কাঁচি, অন্যজন বিছানার চাদর ধরে আছে। কচ কচ করে চাদর কাটা হচ্ছে। বাচ্চা দু'জনের কারো মুখেই কোন বিকার নেই!

পুতুল অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছে। বাচ্চা দুটিকে সে চেনে তবে এখনো ভাল পরিচয় হয়নি। আজ পরিচয় করার জন্যেই এসেছিল। এসে দেখে এই কাণ্ড। তার বাধা দেয়া উচিত কিন্তু বাধা দেয়ার পর্যায় পার হয়ে গেছে। বাচ্চা দুটি বিছানার চাদর কেটেছে, বালিশ কেটেছে একটা লেপ কেটেছে। ঘরময় তুলা উড়ছে। ভয়াবহ অবস্থা।

পুতুল বলল, এইসব কি ?

নিশা হালকা গলায় বলল, কিছু না।

'তোমরা এইসব কেন করতাছ ?

'কাটাকুটি খেলছি।'

বোনের এই কথা টগরের পছন্দ হল না সে বলল, আমরা দরজি দরজি খেলছি।

'দরজি দরজি খেলতাছ ?'

হুঁ'

বলেই টগর হাসল। অনেকদিন থেকেই এই খেলাটা তার খুব পছন্দ।

রাস্তার ওপাশে নতুন দরজির দোকান হয়েছে— 'ক্যালকাটা স্যুটিং' সেখানে খচ খচ করে রাত দিন কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটা হয়, টগর গভীর আগ্রহে দেখে। আজ অনেক দিন পর এই খেলার সুযোগ পাওয়া গেল। কাঁচি অনেক কষ্টে নিশা মিলির কাছ থেকে জোগাড় করেছে।

পুতুল বলল, তোমাদের আব্বা তোমাদের মারবে না ?

টগর বলল, মারবে।

'তারপরেও এই রকম করতাছ ?'

'হুঁ।'

'কেন ?'

নিশা ছোট্ট করে হেসে বলল, বেশি মারবে না। অল্প মারবে।

'অল্প মারবে কেন ?'

'আমাদের মা মারা গেছেতো। মা মারা গেলে বাচ্চাদের বেশি মারার নিয়ম থাকে না। কম মারতে হয়।'

পুতুল বলল, অনেক খেলা হইছে এখন হাত থাইক্যা কেচিটা নামাও। না হইলে হাত কাটব।

টগর বলল, আপনি এখন যানতো। আপনি আমাদের বিরক্ত করবেন না। পুতুল নড়ল না। এমন মজার একটি দৃশ্যের আকর্ষণ এড়িয়ে সে যেতে পারছে না। বাচ্চা দুটি টুকটুক করে কথা বলছে।

নিশা বলল, আপনি আমার জন্যে এক গ্লাস খাওয়ার পানি আনেন তো। এমন ভাবে বলল যেন কতদিনের পরিচিত। কত দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্টতা। পুতুল পানি আনতে গেল।

পানি এনে দুই দরজির কাউকেই পাওয়া গেল না। তারা অদৃশ্য। ডেকেও সারা পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আনিস ঘরে এসেছে। তার সাড়া পাওয়ার পরই এই অবস্থা।

পুতুল আনিসকে দেখে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, স্লামালিকুম।

আনিস বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। তুমি এমদাদ সাহেবের নাতনী তাই না ? পুতুল তোমার নাম ?

'জ্বি।'

'দেখেছ কি অবস্থা ?'

পুতুল কিছু না বলে মুখ নিচু করে হাসল। আনিস বলল, এদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছি। এরা যা করছে তার নাম দুষ্টুমি না। এ হচ্ছে ইচ্ছা করে আমাকে কষ্ট দেয়া! তোমার পানির গ্লাসটা কি আমাকে দিতে পার ?

পুতুল গ্লাস এগিয়ে দিল। আনিস এক চুমুকে পানি খেয়ে ফেলল। বিষণ্ন গলায় বলল, এই ঘটনা কিন্তু আজ নতুন ঘটছে না। এটা পুরনো ঘটনা। আগেও কাটাকুটি খেলা একবার হয়েছে। তখন তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনদিন খেলবে না। বার বার তো এটা হতে দেয়া যায় না।

পুতুল বলল, বাদ দেন। এরা ছোট মানুষ।

'তুমি ভুল বলছ পুতুল— ওরা ছোট হলেও আমার সঙ্গে যা শুরু করেছে তা বড় মানুষদের খেলা। এক ধরনের দাবা খেলা। তারা একরকম চাল দিচ্ছে আমি এক রকম চাল দিচ্ছি। আমার সংসার টিকে থাকবে কি থাকবে না এটা নির্ভর করছে এই খেলায় জয় পরাজয়ের উপর।'

এই মানুষটার কথাগুলো পুতুলের বড় ভাল লাগছে। কি সহজ সরল ভঙ্গিতেই না পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে। যেন পুতুল তার কত দীর্ঘদিনের চেনা মানুষ অথচ এর আগে একদিন মাত্র কথা হয়েছে। তাও— কি নাম ? দেশ কোথায় ? এ রকম কথা।

'পুতুল।'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি।'

'ওরা কোথায় পালিয়েছে তোমার কোন ধারণা আছে ?'

'জ্বি না,

'আচ্ছা ওদের খুঁজে বের করছি, তার আগে এসো আমরা দু'জন এক কাপ করে চা খাই। না কি তুমি চা খাও না ?'

'খাই।'

'তাহলে বরং চা বানাও। চা খাবার পর ঠিক করব টগর এবং নিশাকে কি শাস্তি দেয়া যায়।'

কত সহজ কত আন্তরিকভাবেই না লোকটা কথা বলছে, শুনতে ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে তারা সবাই একই ছাদের নিচে দীর্ঘদিন ধরে আছে, যে ছাদের উপর ঝড়ে পড়েছে কত বৃষ্টি কত জ্যোৎস্না।

চা বানানোর কেরোসিন কুকার ঘরের এক কোণেই আছে। কোরোসিন কুকার ধরাতে অসুবিধা হল না। চা বানাতে বানাতে ছোট ছোট সব কথা হতে লাগল। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব আনিস খুব মমতার সঙ্গে দিল। যেমন পুতুল বলল, ভাইজান আফনে কি করেন ?

আনিস হাসতে হাসতে বলল, আমি কিছুই করি না, আবার অনেক কিছুই করি।

'সেইটা কেমুন ?'

'আমি লিখি! একজন লেখককে দেখলে কখনো মনে হবে না সে বিশেষ কিছু করছে। হাতে হেলাফেলা করে ধরা একটা কাগজ। একটা কলম বা পেন্সিল। একজন শ্রমিককে বিশাল এক খণ্ড পাথর উপড়ে তুলতে কত না পরিশ্রম করতে হয়। টপ টপ করে তার মাথা বেয়ে ঘাম পড়ে অথচ একজন লেখককে দেখবে কত অনায়াসে লিখছে— অপূর্ব সব লেখা। এইসব লেখা কি তুমি কখনো পড়েছ ?'

পুতুলের কথা শুনতেই ভাল লাগছে, জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না। ওদিকের মানুষটি বোধ হয় তা বুঝতে পারছে। সে বলছে— দেখ পুতুল লেখালেখি কি অদ্ভুত জিনিস মাত্র চার লাইনের একটা কবিতা, মাত্র দু'লাইনের দুটি বাক্যে ধরা দিতে পারে মহান কোন বোধ, জীবনের গভীর ক্রন্দন।

পুতুল চুপি চুপি বলল, একটা বলবেন ?

'হ্যাঁ বলব। আমি টগর ও নিশাকে প্রায়ই বলি। তুমি যদি আস তুমিও শুনবে। আজ না আজ থাক। আজ আমার মনটা খারাপ। বাচ্চা দুটি বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। কি চাচ্ছে কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। পুতুল।'

'জ্বি।'

'তুমি কি আমাকে আরেক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবে ?'

কত সামান্য কথা অথচ পুতুলের এত ভাল লাগল। তার ইচ্ছা করছে আনন্দে একটু কাঁদে। তার কেন এত আনন্দ হল ? এই আনন্দের উৎসব কোথায় ? এইত চোখ ভিজে উঠছে। কেন, চোখ ভিজে উঠল কেন ?

টগর ও নিশা বিলুর পেছনে পেছনে রাত দশটায় শোবার ঘরে ঢুকল এবং কোনদিকে না তাকিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তাদের চোখ বন্ধ। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। যেন ঘুমিয়ে কাদা। বিলু বলল, আনিস সাহেব দয়া করে এবারের মত বাচ্চাদের ক্ষমা করে দিন। ওরা যা করেছে তার জন্যে খুব লজ্জিত, দুঃখিত এবং অনুতপ্ত! ভয়ে এ ঘরে আসতে চাচ্ছিল না। আমি অভয় দিয়ে নিয়ে এসেছি।

আনিস বলল, থ্যাংকস।

'ওরা আমাকে কথা দিয়েছে আর কোনদিন এরকম করবে না ।'

'এই কথা, কথা পর্যন্তই! ওরা আবারো এ রকম করবে এবং আপনার মতো অন্য কাউকে ধরে নিয়ে আসবে যাতে ক্ষমা করা হয়। কাজেই এবার ক্ষমার প্রশ্নই উঠে না।'

বিলু অবাক হয়ে বলল, 'আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি তারপরেও আপনি ক্ষমা করবেন না ? তারপরেও এরকম কঠিন করে কথা বলছেন ?

'হ্যাঁ বলছি। কারণ আপনার আগে আপনার বাবা এদের একবার নিয়ে এসেছেন, আপনার মা নিয়ে এসেছেন, মিলি এনেছে। একবার কাদের প্রটেকসন দিয়ে এনেছে।'

বিলু কঠিন স্বরে বলল, অর্থাৎ আপনি ওদের শাস্তি দেবেন ?

'হ্যাঁ।'

'কি শাস্তি জানতে পারি ?'

'ওরা জানে কি শাস্তি। ওদেরকে আমি বলে রেখেছি যে, আবার যদি তারা কাটাকুটি খেলা খেলে তাহলে ওদের ফেলে রেখে আমি চলে যাব।'

'আপনি ওদের ফেলে রেখে চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ চলে যান। আপনার সংসার আপনি চালাবেন। যেভাবে চললে ভাল হয় সে ভাবে চালাবেন।'

আনিস রাত ১১টা দশ মিনিটে ব্যাগ হাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। বিলু সারাক্ষণই ভাবছিল এটা এক ধরনের ঠাট্টা হয়ত গেট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবে। দেখা গেল ব্যাপার মোটেই ঠাট্টা না। আনিস সত্যি সত্যি চলে গেছে।

১৮

এমদাদ বলল, ভাইসাব এখন তাহলে উঠি ? এগারোটার উপরে বাজে। সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আমার লেখাটা পছন্দ হচ্ছে না ?

এমদাদ চোখ বড় বড় করে বলল, পছন্দ হচ্ছে না এইটা ভাইসাব কি বললেন। জীবনের সারকথা তো সবটাই আপনার লেখার মধ্যে। ক্ষুধা বিষয়টা

www.BDeBooks.Com

যে কি আপনের লেখা পড়ার আগে জানতাম না। উপাষ দিছি ঠিকই কিন্তু ক্ষুধা বুঝি নাই। এখন বুঝলাম।

সোবাহান সাহেব বললেন, তাহলে কি বাকিটা পড়ব ?

'অবশ্যই পড়বেন।'

'দেড়শ পৃষ্ঠার মত লেখা হয়েছে আমি ভাবছি আরো শ' দুই পৃষ্ঠা লিখে ফেলব। মোটামুটি সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার একটা কাজ।'

'ভাইসাব টেনে টুনে এটারে পাঁচশ করেন। একটা কাজ যখন হইতেছে ভাল করেই হোক।'

'পড়তে শুরু করি তাহলে ?'

'আলহামদুলিল্লাহ।'

এমদাদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে চেয়ারে পা তুলে বসল। গত দু'ঘণ্টা যাবত এই জিনিস শুনতে হচ্ছে। এখন মাথা ঘুরছে ভন ভন করে অথচ বলতে হচ্ছে অসাধারণ। এর নাম কপাল।

'এমদাদ সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনি যদি কোন পয়েন্টে আমার সঙ্গে ডিফার করেন তাহলে দয়া করে বলে ফেলবেন। সংকোচ করবেন না। আমি নোট রাখব। কারণ বইটা অনেকবার রিরাইট করতে হবে। শুরু করি তাহলে ?'

'জ্বি আচ্ছা।'

সোবাহান সাহেব শুরু করলেন,

আমি ক্ষুধা সম্পর্কে প্রচুর উক্তি সংগ্রহ করিয়াছি। আগে জানিতে চাহিয়াছি অন্যে ক্ষুধা প্রসঙ্গে কি ভাবিয়াছেন। তাহাদের ভাবনা আপাতত অত্যন্ত মনকাড়া হইলেও আমার কাছে কেন জানি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। ক্ষুধা নিয়া বড় বড় মানুষ রঙ্গ রসিকতা করিয়াছেন মূল ধরিতে পারেন নাই। যেমন ফ্রাংকলিন বলিয়াছেন, না খেয়ে মানুষকে মরতে দেখেছি খুবই কম, অতিরিক্ত খেয়ে মরতে দেখেছি অনেককে।

ইহাকে আমি রসিকতা ছাড়া আর কি বলিব ?

উইল রজার বলিয়াছেন— ক্ষুধার্তরা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের চেয়েও ধারালো।

ইহাও কি একটি সুন্দর মিথ্যা নয় ? ক্ষুধার্তরা তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত ধারালো হইলে দেশে বিপ্লব হইয়া যাইত। যাহা হয় নাই।....

'এমদাদ সাহেব কি ঘুমিয়ে পড়লেন না-কি ?'

'জ্বি না! এই চোখ বন্ধ করে আছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, চউখটা বন্ধ থাকলে শুনতে ভাল লাগে।'

'ঠিক বলেছেন— আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে— ক্ষুধা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মানুষদের ধ্যান ধারণা চিন্তা ভাবনা সঠিক ছিল নয়। ক্ষুধার ভয়াবহ

রূপ তাঁরা ধরতে পারেন নি। তবে সবাই যে পারেননি তা না। যাঁরা নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকেছেন। অভুক্ত থেকেছেন তারা পেরেছেন। যেমন ইংল্যান্ডের চার্লস ডিকেন্স এবং রাশিয়ার ম্যাক্সিম গর্কি। হ্যাংগার বা ক্ষুধা নামক একটা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে নুট হামসুনের লেখা। সেই বইটিতেও ক্ষুধার ভয়াবহ বর্ণনা আছে। যদিও সেই বর্ণনা আমার কাছে যথাযথ মনে হয় নি। এমদাদ সাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন না-কি ?'

'জ্বি না।'

'মনে হচ্ছিল নাক ডাকের মত শব্দ হচ্ছে।'

'জনাব এইটা হইল আমার অভ্যাস। খুব চিন্তাযুক্ত হইয়া যদি কিছু শুনি তখন এই রকম শব্দ হয়।'

'আজ না হয় থাক। অন্য আরেকদিন পড়ব।'

এমদাদ উঠতে উঠতে বলল, এইসব আসলে আমাদের শুনায়ে কোন লাভ নাই। আমরা আছিইবা কয়দিন। এইসব শোনা দরকার অল্প বয়স্ক পুলাপানদের। যেমন ধরেন এই বাড়ির ফরিদ, তারপর ধরেন ডাক্তার। সোবাহান সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন,

'কথাটা ভুল বলেন নি। ডাক্তার অনেকদিন আসছেও না— আচ্ছা দেখি কাল খবর পাঠাব।'

এমদাদ হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষুধা বিষয়ে পড়ার চেয়ে ক্ষুধায় ছটফট করতে করতে মরে যাওয়া ভাল।

'ভাইসাব তাহলে যাই— স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কাল দুপুর থেকে বসে যাব। বাকিটা একটানে পড়ব কেমন।'

এমদাদ শুকনো গলায় বললেন, জ্বি আচ্ছা।

রাতে মশারি ফেলতে এসে মিলি বলল, বাবা আনিস সাহেব যে পালিয়ে গেছেন সেই খবরটা কি শুনেছ ?

সোবাহান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, পালিয়ে গেছে মানে ?

'বাচ্চা দুটিকে রেখে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়েছেন।'

কারণটা কি ?'

'বাচ্চারা তার কথা শুনে না। তিনি বাচ্চা দুটিকে শিক্ষা দিতে চান।'

'ওরা কান্নাকাটি করছে না ?'

'না ওরা সুখেই আছে। বিলু আপার সঙ্গে শুয়েছে। বিলু আপা ক্রমাগত কবিতা আবৃত্তি করছে ওরা শুনছে। এত রাত হয়েছে অথচ ঘুমুবার কোন লক্ষণ নেই।'

'বাচ্চা দুটি তাহলে ব্যাপাটা সহজভাবে নিয়েছে ?'

'হ্যাঁ। এবং মনে হচ্ছে এই নাটকীয় ঘটনায় তারা বেশ আনন্দিত।'

সোবাহান সাহেব অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে পড়লেন। মিলি খুব হালকা গলায় বলল, বাবা বিলু আপা বাচ্চা দুটিকে যে কি রকম পছন্দ করে তা কি তুমি জান ?

www.BDeBooks.Com

'না জানি না।'

'অতিরিক্ত রকমের পছন্দ। এর ফল ভাল নাও হতে পারে বাবা।'

'ফল ভাল হবে না কেন ?'

'সব কিছু আমি তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারব না। আমার লজ্জা লাগবে। শুধু এইটুকু বলি ছোট মেয়েটি বিলু আপাকে আড়ালে ডাকে— 'আম্মি।'

'তাতে অসুবিধা কি ? আমরাতো অনেকই মা ডাকি।'

'তা ডাকি। তবে আড়ালে ডাকি না— এই মেয়েটা ডাকছে আড়ালে।'

'ও।'

'এই নাও বাবা তোমার রিলাক্সিন। খেয়ে ঘুমাও!

'বিলুকে একটু ডেকে আনতো কথা বলি।'

'আজ থাক বাবা। আজ বিলু আপা ওদের কবিতা শোনাচ্ছে।'

'মিলি।'

'জ্বি।'

'ঐ ডাক্তার অনেকদিন আসছে না ব্যাপারটা কি ?'

মিলি। ঈষৎ লাল হয়ে বলল, আমি জানি না কেন আসছে না।'

'ওকে খবর পাঠাস তো।'

মিলি আবার লাল হয়ে বলল, খবর পাঠাতে হবে না। ও এম্নিতেই আসবে।

সোবাহান সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বললেন, ডাক্তার ছেলেটা ভাল। মিলি থমথমে গলায় বলল, বার বার তার প্রসঙ্গ আসছে কেন বাবা ?

'ওকে ক্ষুধা বিষয়ক রচনাটা পড়ে শুনাতে চাই। খবর দিবিতো।'

'আচ্ছা দেব।'

'গোপনে গোপনে আম্মি ডাকছে। এটাও চিন্তার বিষয়।'

'তোমাকে এত চিন্তা করতে হবে না।'

'তোর মা এখন আমার সঙ্গে ঘুমুচ্ছে না। আলাদা ঘুমুচ্ছে এই বিষয়টা কি বলতো ?'

'জানি না বাবা, এটা তোমাদের ব্যাপার তোমরা ফয়সালা করবে। আমি যাচ্ছি। আর কিচ্ছু তোমার লাগবে ?'

'না। খাওয়ার পানি দিয়েছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'যাবার আগে ক্ষুধা সম্পর্কে লাস্ট যে পাতাটা লিখলাম সেটা কি পড়ব, শুনবি ?'

'রক্ষা কর বাবা। ক্ষুধা সম্পর্কে জানার আমার কোন আগ্রহ নেই। তুমি জেনেছ এইতো যথেষ্ট। একটা ফ্যামিলি থেকে একজন জানাই কি অনেক জানা না ? ফ্যামিলির সব মেম্বারদের জানতে হবে ?'

'হ্যাঁ হবে। আমি এই জিনিসটা তোর মা'কে বুঝাতে পারি না।'

'বাবা তুমি ঘুমাও তো...'

টগর এবং নিশা জেগে আছে। জেগে আছে বিলু। সে পড়ছে দেবতার গ্রাস। খুব সহজ কোন কবিতা না কিন্তু টগর এবং নিশা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। টগরের চোখে জল। একটু পর পর তার ঠোঁট কেঁপে উঠছে। বিলু অবাক হয়েছে। একটা বাচ্চা ছেলের মধ্যে এত আবেগ। আশ্চার্য তো!

রাখাল যাইবে সাথে স্থির হল কথা—
অন্নদা লোকের মুখে শুনে সে বারতা
ছুটে আসি বলে, "বাছা কোথা যাবি ওরে!
রাখাল কহিল হাসি, চলিনু সাগরে।
আবার ফিরিব মাসি!" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি, ঠাকুরমশায়,
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে! জন্ম হতে তার
মাসি ছাড়া বেশিক্ষণ থাকে নি কোথাও।

পড়া এইটুকু আসতেই টগর বিলুকে হতভম্ব করে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। নিশাও ঘন ঘন চোখ মুছছে।

বিস্মিত বিলু বলল, এ রকম কাঁদার তো কিছু হয় নি। কাঁদছ কেন টগর? টগর কিছু বলল না। নিশা বলল, টগর এমন করে কাঁদছে কারণ আমাদের আম্মু এই কবিতা আমাদের শুনাতো। আম্মু বই পড়ে বলতো না। পুরোটা মুখস্থ বলতো।

বিলু বলল, এটা ছাড়া আর কোন কবিতা তিনি বলতেন?

'সামান্য ক্ষতি' কবিতাটাও বলতেন।'

'ঐটাও অবিশ্যি খুব সুন্দর।'

টগর লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, এই কবিতাটা আম্মু বলতো নেচে নেচে। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'নেচে নেচে মানে?'

'হাত পা দুলিয়ে নাচত। নেচে নেচে বলত।'

'বাহ চমৎকারতো। তোমাদের তো দেখছি অদ্ভুত একটা মা ছিল।'

'হ্যাঁ ছিল।'

সেই রাতে বাকি কবিতাটা আর পড়া হল না।

রাস্তায় রাস্তায় হাঁটছে আনিস। খারাপ লাগছে না। ভালই লাগছে। বিয়ের আগে এইভাবে হেঁটে হেঁটে কত রাত সে পার করে দিয়েছে। রাতের ঢাকায় কত কি দেখার আছে। রূপহীনা কিছু তরুণী কেমন মাছের মত চোখে তাকায় চলমান পুরুষদের দিকে। যদি কেউ তাকে পছন্দ করে। যদি কেউ এগিয়ে আসে। অর্থ

www.BDeBooks.Com

দিয়ে অল্প কিছু আনন্দ যদি কিনে নিতে চায়। সৃষ্টির কোন এক লগ্নে বিধাতা শরীর দিয়ে মানব এবং মানবী পাঠিয়েছিলেন। সেই শরীরে বপন করেছেন ব্যাখ্যাতিত ভালবাসা। সেই ভালবাসার একটি কদর্য অংশ টাকায় কেনা যায়। আনিস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কেমন অকাতরে মানুষজন ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ জেগে উঠে বিড়ি ধরিয়ে পাশের মানুষের সঙ্গে গল্প করছে। এদের দেখে মনে হচ্ছে এরা কত না সুখী।

আনন্দিত হবার অসাধারণ ক্ষমতা এই মানুষের। আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখলে এরা খুশী হয়। একটি অবোধ শিশুকে হেসে ফেলতে দেখলে এরা খুশী হয়। আম গাছ যখন নতুন পাতা ছাড়ে তখন তাই দেখেও আনন্দে অভিভূত হয়। মানুষ প্রকৃতির এত চমৎকার একটি সৃষ্টি প্রকৃতি তবু নানান শিকলে তাকে বাঁধলেন। ক্ষুধার শিকল, তৃষ্ণার শিকল... প্রকৃতির নিশ্চয়ই তার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন মানুষ নামক এই প্রাণীটাকে নানান দিক থেকে বেঁধে না রাখলে সে শেষ পর্যন্ত একটা ভয়াবহ কাণ্ড করে বসবে। স্বর্গ-মর্ত পাতাল জয় করবে— গ্রহ থেকে গ্রহান্তরকে সে নিয়ে আসবে তার পায়ের নিচে এবং এক সময় প্রকৃতিকেই প্রশ্ন করে বসবে— কে তুমি ? কি তোমার পরিচয় ? কি চাও তুমি মানুষের কাছে ? কেন তুমি আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছ ? কোথায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাও ?

আনিস সিগারেট ধরিয়ে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের দিকে রওনা হল। আজকের রাতটা সে লঞ্চ টার্মিনালেই কাটাবে।

'স্যার।'

আনিস চমকে তাকাল।

'মেয়ে লাগব স্যার ? কলেজ গার্ল। বিশ্বাস না করলে সার্টিফিকেট দেখবেন।'

কি নাম মেয়ের ?'

'মেয়ে তো একটা না। অনেক আছে। নাম দিয়া কি হইবে ? কি রকম চান বলেন। হোটেলে ব্যবস্থা করা আছে। কোন সমস্যা না।'

আনিস হাসি মুখে বলল, এমন কোন মেয়ে যদি আপনার সন্ধানে থাকে যার নাম রাত্রি তাহলে যেতে পারি। আমার স্ত্রীর ভাল নাম রেশমা, ডাক নাম 'রাত্রি'। এই নামের কাউকে পাওয়া গেলে খানিকক্ষণ গল্প করতাম।

লোকটি বিরক্ত চোখে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। রাতের ঢাকায় হেঁটে বেড়ানোর এই হচ্ছে এক সমস্যা— কিছুক্ষণ পর পর দালালদের হাতে পড়তে হয়।

আনিসের মাথায় চট করে কবিতার একটা লাইন চলে এল— 'কিছু ভালবাসা কিনিব অল্প দামে।'

কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে প্রথম লাইনটিই শুধু এসেছে। দ্বিতীয় লাইনটি আর আসবে না। প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে রসিকতা করতে বড্ড পছন্দ করে। একটা

অসাধারণ লাইন পাঠায়। দ্বিতীয় লাইনটা আর পাঠায় না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দ্বিতীয় লাইনটার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। যা আর আসে না।

আচ্ছা রাত্রির মত দ্বিতীয় কোন তরুণী কি আসবে তার জীবনে ? সে গভীর রাতে হঠাৎ অকারণ পুলকে মাথার লম্বা চুল খোঁপা করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সাজবে। বাতি নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে মদির গলায় বলবে এখন আমি নাচব। তুমি বসে বসে দেখবে—

> "সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা।
> চলিল কুসুম কাননে।
> কৌতুকরসে পাগলপরানী
> শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
> সহসা সবারে ডাক দিয়া রাণী
> কহে সহাস্য আননে—
> ওগো তোরা আয়, এই দেখা যায়
> কুটির কাহার অদূরে!"

না রাত্রির মত মেয়েরা বার বার আসে না। এদের হঠাৎ হঠাৎ পাওয়া যায়। আসীম সৌভাগ্যবান কোন পুরুষ হঠাৎ এদের পেয়ে যান। সে যেমন পেয়েছিল। রাত্রির মৃত্যুর সময় সে তার হাতে হাত রেখে বসেছিল। এক সময় আনিস বলল, কষ্ট হচ্ছে ?

রাত্রি বলল, হ্যাঁ।

আনিস সহজভাবে বলল, কষ্টের কিছু নেই রাত্রি আবার দেখা হবে। রাত্রি চোখের পানি মুছে বলল, এই কথাটা ভুল। আর দেখা হবে না। যা দেখার এই বেলা দেখে নাও।

পরকাল আছে কি না এটা নিয়ে আনিস মাথায় ঘামায় না তবে আর কোনদিন দেখা হবে না এই কথা আনিস গ্রহণ করে নি। দেখা হয়েছে। রাত্রির সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। অন্য একটি মেয়ে হঠাৎ হয়ত অবিকল রাত্রির মত করে হাসল। আবার দেখা হল রাত্রির সঙ্গে।

বিটের দু'জন পুলিশ আনিসকে থামাল।

'আপনি কে ?'

'আমার নাম আনিস ?'

'যান কোথায় ?'

আনিস চুপ করে রইল। বিটের পুলিশ বিরক্ত হয়ে তাকাচ্ছে। রাতের শহরে বিটের পুলিশরাও বড় বিরক্ত করে।

'কথা বলেন না কেন ? যান কোথায় ?'

'কোথাও যাই না— হাঁটি।'

'দেখি আপনার ঝুলির মধ্যে কি আছে ?'

www.BDeBooks.Com

ঝুলির মধ্যে তেমন কিছু পাওয়া গেল না— স্কট মমাডের লেখা একটি উপন্যাস House made of down আনিসের জন্মদিনে রাত্রি উপহার দিয়েছিল। গোটা গোটা হরফে লেখা— "আনিস, তুমি এত ভাল কেন ?"

আনিস বিটের পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বইটি আমার স্ত্রী আমার জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন। এইখানে আমার প্রসঙ্গে কি লেখা আছে আপনি পড়ে দেখতে পারেন। আমার স্ত্রীর ধারণা আমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। মেয়েরা অবশ্যি সব সময়ই একটু বাড়িয়ে কথা বলে। তবু...'

পুলিশ আনিসকে ঘাঁটাল না। এগিয়ে গেল। এরকম নিশি পাগলের সঙ্গে তাদের সব সময় দেখা হয়। এদের নিয়ে মাথা ঘামালে তাদের চলে না।

১৯

মনসুর সোফায় আধশোয়া হয়ে আছে।

সোবাহান সাহেবের কারণেই সে এমনভাবে বসা। সোবাহান সাহেব চান যে সে আরাম করে বসে ক্ষুধা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার লেখাটা শুনে। মনসুর একবার শুধু ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার লেখাটা কত পৃষ্ঠা ?

সোবাহান সাহেব বললেন, তিনশ' বাইশ পৃষ্ঠা হয়েছে। এখনো লিখছি। আরো বাড়বে।

মনসুর হতভম্ব হয়ে বলল, 'সবটা আজ শুনাবেন ?'

'হ্যাঁ। নয়তো ফ্লো ঠিক থাকে না। ফ্লো থাকাটা খুব দরকার। একসঙ্গে না শুনলে তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারবে না।'

'তা ঠিক।'

'তুমি আরাম করে পা তুলে বস। খুব মন দিয়ে শুনবে। কিচ্ছু মিস করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আর পড়ার সময় হু হা এই সব কিচ্ছু বলবে না। এতে আমার অসুবিধা হয়। কনসানট্রেসান কেটে যায়।'

'আমি কিছু বলব না।'

'ভেরী গুড।'

সোবাহান সাহেব শুরু করলেন এবং অতি দ্রুত পড়ে যেতে লাগলেন। ঘণ্টা খানিক পার হবার আগেই ঘরে ঢুকল ফরিদ। সোবাহান সাহেবকে থামিয়ে বলল, দুলাভাই আপনার কাইন্ড পারমিশান নিয়ে কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

'কি কথা ?'

'যাকে আপনি লেখা পড়ে শুনাচ্ছেন সেই গাধা ঘুমুচ্ছে। তাকিয়ে দেখুন— করে ঘুমুচ্ছে।'

সোবাহান সাহেব তাকালেন এবং তার মন সত্যি সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেল। আসলে তাই। ডাক্তার ঘুমুচ্ছে। হা করেই ঘুমুচ্ছে।

সোবাহান সাহেব উচ্চস্বরে ডাকলেন, মিলি মিলি। সেই শব্দেও ডাক্তারের ঘুম ভাঙল না। কয়েকবার শুধু ঠোঁট কাঁপল। মিলি পাশে এসে দাঁড়াবার পর সোবাহান সাহেব বললেন, ডাক্তারের মাথার নিচে একটা বালিশ দাও মা ও ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষুধা বিষয়ক আমার এই জটিল লেখা পড়তে পড়তে যে কেউ ঘুমিয়ে পড়তে পারে এটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মিলি ডাক্তারের মাথায় নিচে একটা বালিশ দিয়ে দিল। পাতলা চাদরে গা ঢেকে দিল। এই সামান্য কাজটা করতে তার ভাল লাগল। প্রবল ইচ্ছা করতে লাগল এই ছেলেটার হাতটা একটু ছুঁয়ে দেখতে। মানুষের মনে কেন এরকম ইচ্ছা হয় ? এই ইচ্ছার নামই কি ভালবাসা ? তাহলে ভালবাসা ব্যাপারটা কি শরীর নির্ভর ? কবি যে বলেন প্রতি অঙ্গ লাগি তার প্রতি অঙ্গ কাঁদেরে— এই কথা কি সত্যি ? সত্যি হলে খুব কষ্টের ব্যাপার হবে। ভালবাসার মত এত বড় একটা ব্যাপারকে দেহে সীমাবদ্ধ করা খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়। তবু কেন জানি ভালবাসা শেষ পর্যন্ত দেহেই আশ্রয় করে। বড় রহস্যময় এই পৃথিবী। বড়ই রহস্যময়।

মিলি গায়ে চাদর দিয়ে দিচ্ছে পাশে মুখ বিকৃত করে দাঁড়িয়ে আছে ফরিদ। সে বলল, এত বড় গাধা আমি আমার লাইফে দেখিনিরে মিলি। একটা ভদ্রলোক আগ্রহ করে তোকে একটা লেখা পড়ে শোনাচ্ছেন আর তুই ব্যাটা ঘুমিয়ে পড়লি ? তোর একটু লজ্জাও লাগল না ? আবার দেখনা নাক ডাকাচ্ছে। কষে একটা চড় দেব না-কি ?

মিলি বলল, বেচারাকে ঘুমুতে দাও মামা বিরক্ত কর না।

'আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস ? আমার ইচ্ছে করছে গাধাটাকে ধরাধরি করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গলে একটা শক খাবে। বুঝবে কত ধানে কত চাল।'

'তুমি এ ঘর থেকে যাও তো মামা।'

ঘরে প্রচণ্ড মশা। বেচারাকে মশা বিরক্ত করছে। সোফার উপর মশারী খাটিয়ে দেয়া যায় না। মিলি মসকুইটো কয়েল জ্বালিয়ে দিল।

রাতে ভাত খেতে খেতে সোবাহান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তার কি এখনো ঘুমুচ্ছে ? মিলি লজ্জিত গলায় বলল, হ্যাঁ বাবা।

সোবাহান সাহেব বিস্মিত স্বরে বললেন, খুবই আশ্চার্যের ব্যাপার। ফরিদ বলল, দুলাভাই আমার ধারণা আপনার ক্ষুধা বিষয়ক বইটাতে ঘুম উপদ্রোকারী কিছু একটা আছে। আপনি যখন ডাক্তার ব্যাটাকে পড়ে শুনাচ্ছিলেন তখন আমিও দু'তিন পৃষ্ঠা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমার তিনবার হাই উঠল।

সোবাহান সাহেব কঠিন চোখে তাকালেন, কিছু বললেন না।

www.BDeBooks.Com

ফরিদ বলল, ইনসমনিয়ার ওষুধ হিসেবে এই বই বাজারে ছাড়া যেতে পারে। আমি ঠাট্টা করছি না দুলাভাই। আমি ড্যাম সিরিয়াস।

বিলু বলল, চুপ করতো মামা।

'চুপ কর, চুপ কর এই কথা ইদানীং আমাকে খুব বেশি শুনতে হচ্ছে। আমার এটা শুনতে ভাল লাগছে না। সব মানুষেরই কিছু ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে। এবং সেই মতামত প্রকাশের অধিকারও তার থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। দুলাভাইয়ের বইটি পড়ে আমার ঘুম আসছে এটা বলে দুলাভাইয়ের বইয়ের প্রতি আমি কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করছি না। বইটির নতুন একটি ডাইমেনসনের দিকে আমি ইংগীত করছি।

মিনু বললেন, আর একটা কথা বললে এই ভাতের চামচ দিয়ে তোর মাথায় একটা বাড়ি দেব।

'তা দাও। তবু আমার কথাটা আমি বলবই। সক্রেটিস 'ন্যায় কি' এ কথাটা বোঝাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। তাকে হেমলক নামের তীব্র হলাহল পান করতে হল। আমি ক্ষুধা এবং ঘুমের সম্পর্ক বলতে গিয়ে না হয় চামচের একটা বাড়ি খেলামই।'

সোবাহান সাহেব শান্ত গলায় বললেন, খাওয়া দাওয়ার পর তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ফরিদ।

ফরিদ বলল, জ্বি আচ্ছা।

'কথাগুলো অপ্রিয়। তবু আমি ঠিক করেছি কথাগুলো তোমাকে বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আনিস ছোকরা কি এখনো আসে নি?'

'বিলু বলল, না আসে নি।

'কোথায় আছে? কোন খবর পাঠিয়েছে?'

'না।'

'ওকে যেন আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেয়া না হয়। যে মানুষ তার দুটি বাচ্চা ফেলে উধাও হয়ে যায় তাকে এ বাড়িতে আমি থাকতে দিতে পারি না।'

ফরিদ বলল, আপনার এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি দুলাভাই।

' তোমার সমর্থনের আমি কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'প্রয়োজন বোধ না করলেও সমর্থন করছি। আপনি বোধহয় জানেন না দুলাভাই যে সত্য এবং ন্যায়ের পেছনে আমি সদা সর্বদা হিমালয়ের পর্বতের মতই দাঁড়াই।

'তোমার কি খাওয়া শেষ হয়েছে ফরিদ?'

'জ্বি না। এখন একবাটি ডাল খাব। খাওয়া দাওয়ার পর আমি একবাটি ডাল খাই। ভেজিটেবল প্রোটিন। এটার খুবই দরকার।'

'ডাল খাওয়া শেষ হবার পর তুমি দয়া করে আমার ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

সোবাহান সাহেব নিতান্তই অনুত্তেজিত স্বরে যেসব কথা বললেন, সেগুলো হচ্ছে, ফরিদ আমার ব্লাড প্রেসার হচ্ছে একশ ষাট বাই পঁচানব্বই। আমার বয়সে এটাই স্বাভাবিক। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললেই আমার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।'

'কতটা বাড়ে তা কি জানতে পারি?'

'এ পর্যন্ত দু'বার মেপেছি। দেখেছি উপরেরটা হয় দু'শ নিচেরটা এক'শ দশ।

'বলেন কি কোয়ায়েট ইন্টারেস্টিং।'

'তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে! আমার কাছে ইন্টারেস্টিং নয়। আমি চাই তুমি আর কখনো আমার সামনে না আস।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'আমার শ্বশুর সাহেব তোমার নামে আলাদা করে কিছু টাকা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। এই টাকাটা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। সেই টাকায় বাড়ি টারি কিনে তুমি মোটামুটি রাজার হালে থাকতে পার।'

ফরিদ আগ্রহী গলায় বলল, 'অনেক টাকা না-কি?'

'হ্যাঁ অনেক টাকা। তবে তোমাকে আমি টাকাটা দিতে পারছি না। কারণ শ্বশুর সাহেব বলেছন তোমার মাথাটা ঠিক না হলে যেন তোমার কাছে টাকা না দেয়া হয়। তোমার মাথা ঠিক না।

'আমার মাথা ঠিক না?'

'না।'

'আর আপনারটা হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক?'

'আমার মাথা নিয়ে কথা হচ্ছে না। তোমারটা নিয়ে কথা হচ্ছে।'

ফরিদ হঠাৎ দাঁড়াল। গাঢ় গলায় বলল, দুলাভাই আমি চললাম। আমার কারণে আপনার প্রেসার বাড়বে না।

মনে হচ্ছে ফরিদের নিজের ব্লাড প্রেসারও হু হু করে বাড়ছে। মাথার ভেতর প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। মনে হয় এই অবস্থাতেই কবি নজরুল লিখেছিলেন—

"আমি ভরা তরী করি ভরা ডুবি, আমি টর্নেডো, আমি ভসমান মাইন।
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত, বিশ্ব বিধাত্রীর।"

ফরিদের রাগ অনুরাগ কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না বলে নিজের ঘরে যেতে যেতে নিজেকে অনেকটা সামলে ফেলল। বসার ঘরে সোফায় ডাক্তার হা করে ঘুমুচ্ছে। ব্যাটাকে কষে একটা চড় দেবার ইচ্ছা অনেক কষ্টে দমন করতে হল। চড়টা দিতে পারলে রাগটা পুরোপুরি চলে যেত। রাগ কমানোর অনেকগুলো

www.BDeBooks.Com

পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে অন্যের উপর রাগ ঢেলে দেয়া। কিংবা উল্টো দিক থেকে সংখ্যা গোনা—একশ, নিরানব্বই, আটানব্বই, সাতানব্বই, ছিয়ানব্বই ফরিদ সংখ্যা পদ্ধতি চেষ্টা করল। পদ্ধতি আজ কাজ করছে না। সব দিন সব পদ্ধতি কাজ করে না। চুল ধরে হাঁচকা টান দিয়ে ডাক্তার ব্যাটাকে সোফা থেকে ফেলে দিলে কেমন হয়, ভদ্রতায় বাঁধছে। সমাজে বাস করার এই হচ্ছে সমস্যা। সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। ইচ্ছা করলেও কারোর চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া যায় না।

ফরিদ মেঘ গর্জন করল, এই ব্যাটা উঠ।

ডাক্তার ধড়মড় করে উঠে বসল। তার কাছে সব কিছুই এলোমেলো। এখানে সে কি করছে ? ঘুমুচ্ছে না-কি ? এখানে ঘুমুচ্ছে কেন ? সামনে ফরিদ মামা না ? উনি এমন করে তাকিয়ে আছেন কেন ?

'স্লামালিকুম মামা।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'কি করছেন মামা ?'

'তেমন কিছু করছি না। একটু আগে ভয়ঙ্কর কিছু করার ইচ্ছা করছিল এখন করছে না।'

ডাক্তারকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফরিদ নিজের ঘরে চলে গেল। ঠাণ্ডা পানিতে ঘাড় ভিজিয়ে নিতে হবে তাতে মূল স্নায়ু শীতল হবে। বেশ খানিকটা ক্যাফিনও শরীরে ঢুকাতে হবে।

এতেও স্নায়ুর উত্তেজনা খানিকটা কমবে। কাদেরকে চায়ের কথা বলা দরকার। চিনি দুধ ছাড়া কড়া চা। প্রচুর ক্যাফিন দরকার। শুধু ক্যাফিনে কাজ হবে না, গানও লাগবে। এসব ক্ষেত্র রবীন্দ্র সংগীত খুব কাজ করে। মেঘের পর মেঘ জমেছে এই বিশেষ গানটি রাগ কমানোর ব্যাপারে কোরামিন ইনজেকশনের মত। পরপর দু'বার শুনলেই রাগ-জল। আজ ঐ গানটিরও সাহায্য দরকার। আজকের অবস্থা বড়ই খারাপ।

ডাক্তারের ঘুম এখন পুরোপুরি ভেঙেছে।

সে এই মুহূর্তে বড় ধরনের লজ্জাও বোধ করছে। পুরো ব্যাপারটা এখন মনে পড়ছে। ক্ষুধার উপর লেখা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে। কি অসম্ভব লজ্জার কথা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। মিলি নিশ্চয়ই ঘটনা শুনেছে। না জানি সে কি ভাবছে। তাকে গাধা ভাবছে নিশ্চয়ই।

রাত এখন প্রায় দেড়টা। এত রাতে চুপচাপ সোফায় শুয়ে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই। কিন্তু আবার ক্ষিধেও লেগেছে। ক্ষুধা ব্যাপারটা কত ভয়াবহ তা প্রবন্ধ পড়ে ঠিক বোঝা যায় নি— এখন বোঝা যাচ্ছে। তার মনে পড়ল আজ দুপুরেও তেমন কিছু খাওয়া হয় নি।

ঘুম ভাঙার পর থেকে চোখের সামনে শুধু নানান রকম খাবারে ছবি ভাসছে। এই মুহূর্তে যে ছবিটি ভাসছে সেই ছবিটি বেশ অস্বস্তিকর— বিশাল একটা চিনামটির প্লেট। সেই প্লেটে শিউলি ফুলের মত দেখতে পোলাও। পোলাওয়ের উপর আস্ত একটা ভেড়ার রোস্ট। রোস্টটির বর্ণ সোনালি। এত জিনিস থাকতে চোখের সামনে ভেড়ার রোস্ট ভাসছে কেন সেটা একটা রহস্য। চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর ভেড়া এবং ছাগলে কোন তফাৎ নেই তবু কেন শুধু ভেড়ার কথা মনে হচ্ছে? রোস্টটাতো ছাগলেরও হতে পারে।

খুট করে শব্দ হল।

ঘরে ঢুকল পুতুল। তার ঘুম আসছিল না। সে এসেছিল পানি খেতে। বসার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে কৌতূহলী হয়ে এসেছে। ডাক্তারকে রাতে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সে খুবই অবাক হয়েছে। তবে অবাক হওয়াটা সে প্রকাশ হতে দিল না। সহজ স্বরে বলল, স্লামালিকুম।

মনসুর বলল, ওয়ালাইকুম সালাম। ভাল আছ?

এই মেয়েটির সঙ্গে তার অনেকবার দেখা হয়েছে তবে কখনো তেমন আলাপ হয়নি। মেয়েটা যে এতটা সুন্দর সে আগে লক্ষ্য করেনি। আলাদাভাবে এর নাক মুখ চোখ কোনটাই সুন্দর না তবু সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটাকে দেখতে তো বড় ভাল লাগছে। মনসুর উৎসাহের সঙ্গে বলল, কেমন আছ পুতুল? পুতুল বিস্মিত গলায় বলল,

'ভাল'

'আমি ক্ষুধা বিষয়ক লেখাটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ব্যাপারটা খুবই অন্যায় হয়েছে। জেগে দেখি সোফায় শুয়ে আছি— মাথার নিচে বালিশ।'

'মশার কামড়ে ঘুম ভেঙেছে। আমার মনে হয় ক্ষিধের কারণে। প্রচণ্ড ক্ষিধে লেগেছে বুঝলে পুতুল।'

'পুতুল বলল, আপনি বসুন দেখি ঘরে কি আছে।'

'তোমার কষ্ট করার দরকার নেই পুতুল। তবে ফ্রীজটা খুলে দেখ। ঠাণ্ডা গরমে কোন অসুবিধা নেই।'

'আপনি বসুন আমি দেখি—'

বাহ মেয়েটার কথা থেকে গ্রাম্য ভাবটাওতো দূর হয়েছে। মেয়েটাকে বুদ্ধিমতী বলেও মনে হচ্ছে। মনসুরের মনে হল মেয়েটা কোন একটা ব্যবস্থা করবেই। কিছু না পেলে দুটো ডিম ওমলেট করে নিয়ে আসবে।

মনসুরের চোখে আগের দৃশ্য ফিরে এল। সেই ভেড়ার রোস্ট। তবে তার সঙ্গে নতুন কিছু চিত্র যুক্ত হয়েছে। ভেড়ার রোস্টের উপর এখন মুরগির রোস্টও দেখা যাচ্ছে।

আধ ঘণ্টা পর পুতুল এসে বলল, খেতে আসুন।

খাবার ঘরে খাবার দেয়া হয়েছে। ভাত, রুই মাছের তরকারী, উচ্ছে ভাজা, ডাল। সবই গরম। রীতিমত ধোঁয়া উঠছে। একটা প্লেটে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ দু'টুকরা লেবু।

www.BDeBooks.Com

হতভম্ব মনসুর বলল, সব কি এখন রান্না করলে ?

পুতুল হাসতে হাসতে বলল, এত অল্প সময়ে বুঝি রান্না করা যায়। সবই ফ্রীজে ছিল। আমি শুধু গরম করেছি। আপনি খেতে বসুন।

পুতুল প্লেটে ভাত উঠিয়ে দিল।

মিলির ঘুম আসছিল না। একটা মানুষ সোফায় শুয়ে আছে। হয়ত বেচারাকে মশারা ইতোমধ্যে খেয়ে ফেলেছে। একজনকে এই অবস্থায় রেখে ঘুমুতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সে নিঃশব্দে বসার ঘরে ঢুকল। সেখান থেকে খাবার ঘরে। খাবার ঘরে কি হচ্ছে ? মনসুর খাচ্ছে ? কে খাওয়াচ্ছে তাকে ? তাকে দু'জনের কেউ লক্ষ্য করল না। মিলি পর্দার আড়াল থেকে লক্ষ্য করল দু'জন কি সুন্দর গল্প করছে। এত খাতির দু'জনের মধ্যে ? কই এই খাতিরের কথাতো তার জানা ছিল না ? আবার হাসির শব্দ আসছে। খিলখিল করে নিশ্চয়ই পুতুল মেয়েটাই হাসছে। রাগে মিলির গা জ্বলে যেতে লাগল। যদিও সে খুব ভাল করেই জানে রাগ করার কিছুই নেই। কেন সে রাগ করবে ? তার রাগ করার কি আছে ?

হাসাহাসির কারণ হচ্ছে ঠিক এই সময় ডাক্তার একটা মজার রসিকতা করছিল— রসিকতাটা বানর বিষয়ক। ডাক্তার কখনো রসিকতা করে কাউকে হাসাতে পারে না। এই প্রথম সে একজন গ্রাম্য বালিকাকে মুগ্ধ করল— পুতুল হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ল। কিংবা কে জানে এই গ্রাম্য বালিকাটি হয়ত মুগ্ধ হবার অভিনয় করল। ডাক্তার অভিনয় ধরতে পারল না।

পর্দা ধরে ঈর্ষায় নীল হয়ে গেল মিলি। তার ভেতরে এত ঈর্ষা ছিল তাও সে জানতে না। সে যেভাবে এসেছিল সেইভাবে ফিরে গেল। নিজের উপস্থিতি সে কাউকে জানতে দিল না।

বানর গল্পের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ডাক্তার দ্বিতীয় গল্প শুরু করল। পুতুল এই গল্পটিও চোখ বড় বড় করে শুনল এবং এক সময় হেসে উঠল খিলখিল করে।

ডাক্তার বানর বিষয়ক তৃতীয় গল্প খুঁজতে শুরু করল। তেমন কোন গল্প মনে পড়ছে না। এই মেয়েটি বানর ছাড়া অন্য কোন গল্পে হাসবে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রিস্কটা নেয়া ঠিক হবে না। বানর সংক্রান্ত গল্পই মনে করতে হবে। ডাক্তারের ধারণা মেয়েদের ব্রেইন Unidirectional. যে মেয়ে বানর সংক্রান্ত রসিকতায় হাসে সে অন্য রসিকতায় হাসবে না। তাকে বানর বিষয়ক গল্পই বলতে হবে। অন্য গল্প না। নারী জাতি খুব প্রবলেমের জাতি। এক চক্ষু হরিণীর মত।

২০

নাস্তার টেবিলে সোবাহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, ফরিদ তুমি যাওনি,
ফরিদ তার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাব ?

'তুমি বলেছিলে— এ বাড়িতে থাকবে না।'

ফরিদ টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, ভালমত চিন্তা করে দেখলাম— হুট করে কোন ডিসিসান নেয়া উচিত না।

'তাহলে মিথ্যা কথা বললে কেন ?'

'মিথ্যা কখন বলালাম ?'

'গত রাতেই তো বললে।'

'বলেছি ভাল করেছি। এই নিয়ে আপনি দায়া করে এখন ক্যাট ক্যাট করবেন না। এম্নিতেই রাতে ভাল ঘুম হয়নি।'

ফরিদ তার নাশতার প্লেট নিয়ে নিজের ঘর চলে গেল।

সোবাহান সাহেব, এমদাদ খোন্দকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশটা নষ্ট হচ্ছে কেন জানেন ?

দেশ নষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না এই নিয়ে এমদাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। এমদাদ এই মুহূর্তে রুটিতে পুরু করে মাখন লাগাতে ব্যস্ত। দেশ সম্পর্কে ভাববার ফুসরত কোথায় ?

এমদাদ বলল, আমাকে কিছু বললেন ?

'হ্যাঁ। দেশটা কেন নষ্ট জানেন ?'

'জ্বি না।'

'জানতে হবে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে। শুধু মাখন দিয়ে রুটি খেলে হবে না।'

'অবশ্যই। অবশ্যই ভাবতে হবে।'

সোবাহান সাহেব কঠিন গলায় বললেন, ' দেশটা নষ্ট হবার মূল কারণ হল আমাদের মিথ্যা বলার প্রবণ্তা।'

'তাতো ঠিকই বলেছেন জনাব। একবারে ঠিক।'

'জাতি হিসেবেই আমরা মিথ্যাবাদী।'

'অবশ্যই।'

'আমরা প্রতিজ্ঞা করি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার জন্যে।'

আসল কথা বলেছেন। লাখ কথার এক কথা।'

এমদাদ, সোবাহান সাহেবের প্রতিটি কথায় একমত হতে লাগল। সে সাধারণত করো কোন কথাতেই দ্বিমত পোষণ করে না। এমদাদ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছে যে মানুষের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার একটা পথ হচ্ছে সব কথায় একমত হওয়া।

'এমদাদ সাহেব ?'

'জ্বি।'

'সত্যি কথা বলার প্রবণতা যদি আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায় তাহালে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'অবশ্যই হয়।'

www.BDeBooks.Com

'মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। চারদিকে শুধু মিথ্যা। এটা দূর করতে হবে।'

'সত্যবাদী জাতি হিসেবে আমরা যদি নিজেদের প্রমাণ করতে পারি তাহলে অবস্থাটা কি হবে আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন এমদাদ সাহেব?'

'জ্বি না।'

'আমার গা শিউরে উঠছে। পৃথিবীর লোক জানবে বাঙালি মিথ্যা বলে না। বাঙালি সত্যবাদী। আমাদের আসনটা কি রকম হবে চিন্তা করুন। কত সম্মান কত...

সোবাহান সাহেব আবেগে আপ্লুত হয়ে কথা শেষ করতে পারলেন না। বাঙ্গালী জাতিকে সত্যবাদী কি করে করা যায় তাই নিয়ে ভাবতে লাগলেন। গাঢ় স্বরে বললেন, এমদাদ সাহেব?

'জ্বি।'

'জিনিসটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

'অবশ্যই হবে।'

চা শেষ না করেই সোবাহান সাহেব উঠে পড়লেন। ক্ষুধা অবশ্যই একটি ভয়াবহ ব্যাপার তবে তারো আগে হচ্ছে সত্যবাদিতা। একটি সত্যবাদী জাতি নিশ্চয়ই ক্ষুধায় কষ্ট পাবে না।

এমদাদ নাশতার টেবিলে একা বসে রইল। তার জন্যে ভালই হল। একা থাকলে ইচ্ছামত খাওয়া দাওয়া করা যায়। একটা ডিমের জায়গায় দুটা ডিম নিলে কেউ বলবে না— এই বয়সে দু'টা ডিম খাওয়া ঠিক না। কোলেস্টরল না-কি যেন ঝামেলা হয়। ডাক্তার ছোকরা বলছিল। আরে বাবা আল্লাহতালা তাহলে ডিম দিয়েছেন কি জন্যে? খাওয়ার জন্যেই তো। আল্লাহতালা তো না ভেবে চিন্তে কিছু দেন নাই। তিনি না ভেবে চিন্তে কিছু করবেন তা— কি হয়?

মিলি এসে বলল, বাবার কি নাশতা খাওয়া শেষ হয়ে গেল চাচা?

'হ্যাঁ মা।'

'চা-তো শেষ করেননি।'

'সুখি মানুষ। মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা চিন্তা এসে গেল— খাওয়া দাওয়া বন্ধ।'

মিলি চিন্তিত গলায় বলল, আবার কি চিন্তা?

মিলি চিন্তিত মুখে বাবার ঘরের দিকে এগুলো।

এমদাদ প্লেটে পড়ে থাকা তৃতীয় ডিমটিও নিয়ে নিল। দু'টা খাওয়া গেলে তিনটিও খাওয়া যায়। যাহা বাহান্ন তাহা পয়ষট্টি। এমদাদের মনও আজ খুব প্রসন্ন। কোন প্রসন্ন নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। পুতুলের কাছ থেকে গত রাতের বর্ণনা শোনার পর থেকেই মনটা দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। আশার আলো ডাক্তার ছোকরা প্রসঙ্গে। চেষ্টা চরিত্র করে পুতুলের সঙ্গে এই ছোকরাকে গেঁথে ফেলা খুব কি অসম্ভব? এই জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এই জগতে সবই সম্ভব। চেষ্টা চালাতে হবে। চেষ্টা।

সোবাহান সাহেব 'সত্য দিবস' বিষয়ে চিন্তা করছেন। তাঁর চিন্তার সূত্রগুলো এখনো স্পষ্ট নয় তবু তিনি যা ভাবছেন তা হচ্ছে সপ্তাহের একটি দিনকে কি 'সত্য দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা যায় না? যেমন মঙ্গলবার, কিংবা বুধবার। এই দিনে কেউ মিথ্যা কথা বলবেন না। সবাই সত্য কথা বলবে। সব বড় বড় কাজ ঐ দিনটির জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। প্রয়োজনে এই দিন আরো বড় করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেয়া যায়। যেমন বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ঠিক এই রকম হবে বিশ্ব সত্য দিবস। এই দিনে পৃথিবীর সব মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধুই সত্যি কথা বলবে।

মিলি ঘরে ঢুকে বলল, বাবা তুমি চা না খেয়েই চলে এসেছ?

'টেবিলের উপর রাখ মা, খাব।'

'নতুন কিছু নিয়ে ভাবা শুরু করেছ?'

'হু। সত্য দিবস।'

'ভাল।'

'না শুনেই বলে ফেললি ভাল? আগে জিনিসটা কি জানবি তারপর বলবি ভাল। বোস— বুঝিয়ে বলছি।'

'আজ আমার সময় নেই বাবা। অন্য একদিন শুনব।'

'সেটাও মন্দ না। আমি নিজেও এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হইনি। প্রচুর ভাবনা চিন্তা করতে হবে। দেশটা পড়ে গেছে মিথ্যার খপ্পরে। সত্য আজ নির্বাসিত। সেই নির্বাসিত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

'চা খাও বাবা। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

'দেশটাই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মা। আর চা। আগে দেশটাকে আমাদের চাঙ্গা করতে হবে। দেশটা চলে গেছে কোল্ড স্টোরেজে। সেখান থেকে দেশটাকে বের করে তাকে গরম করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সত্যকে। একবার সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই। আচ্ছা আনিস ছোকরা কি ফিরেছে? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'জ্বি বাবা উনি ফিরেছেন। ডেকে দেব?'

'না থাক। আমি চিন্তাগুলো আরো গুছিয়ে নেই। এখনো সব এলোমেলো আছে। তুই কাজে যা। তোকে দেখে এখন কেন জানি রাগ লাগছে।'

মিলি শুকনো মুখে বাবার ঘর থেকে বের হল। তার নিজের শরীরটা ভাল নেই। জ্বর জ্বর লাগছে। বাবার বকবকানি শুনতে একটুও ভাল লাগছে না।

সোবাহান সাহেব সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাবলেন। মাগরেবের নামাজের পর পারিবারিক সভা ডাকলেন। তিনি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা পারিবারিক সভাতে জানানোই ভাল।

পারিবারিক সভাগুলো সাধারণত রাতের খাবারের পর হয়। এটা জরুরি সভা বলে আগেই শুরু হল। সভার শেষে রাতের খাওয়া হবে।

www.BDeBooks.Com

বসার ঘরে সভা বসছে। পারিবারিক সদস্যদের বাইরেও কিছু মানুষজন আছে যেমন এমদাদ ও তাঁর নাতনী। আনিসের পুত্র কন্য। আনিস আসেনি তার মাথা ধরেছে। সভার শুরুতে উপস্থিত সদস্যদের দস্তখত নেয়া হল। যে কোন পারিবারিক সভার এই অংশটি রহিমার মা'র খুব পছন্দ। আগে সে টিপ সই দিত। এখন দস্তখত দেয়। দস্তখত দেয়া নতুন শিখেছে। দস্তখত দিতে তার বড় ভাল লাগে।

পারিবারিক সভার প্রসিডিংস সাধারণ লিখে মিলি। আজ বিলু লিখছে। কে কি বলছে, কি আলোচনা হচ্ছে সবই লিখিতভাবে থাকার কথা। তা সব সময় সম্ভব হয় না। বিলু মিলির মত দ্রুত লিখতে পারে না।

সভার শুরুতে সোবাহান সাহেব পুরো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি মনে করেন সপ্তাহে অন্তত একটি দিন সত্যি কথা বলার চেষ্টা আমাদের থাকা উচিত ইত্যাদি....। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতার পর তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যদের মতামত চাইলেন। কারো কিছু বলার থাকলে সে বলতে পারে। তবে বলার আগে হাত তুলতে হবে। প্রস্তাবের পক্ষে হলে ডান হাত। প্রস্তাবের বিপক্ষে হলে বা হাত।

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লক্ষ্য করলেন ফরিদ দু'হাত তুলে বসে আছে। সোবাহান সাহেব বললেন, তুমি কিছু বলতে চাও ?

'জ্বি।'

'প্রস্তাবের পক্ষে না বিপক্ষে ?'

'দুটোই।'

'তার মানে ? রসিকতা করছ না-কি ?'

ফরিদ গম্ভীর গলায় বলল, আপনার সাথে রসিকতা করার অধিকার আমার আছে। সম্পর্ক সেই রকম তবে আজ আমি আপনার প্রস্তাব একই সঙ্গে সমর্থন করছি আবার করছি না।

'তার মানেটা কি ?'

'সত্য দিবসে আমরা যেমন সত্য কথা বলব মিথ্যা দিবসে আমরা তেমনি শুধু মিথ্যা কথা বলব। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শুধুই মিথ্যা। ঘরে মিথ্যা বলব, বাইরে মিথ্যা বলব, এমনকি সেদিন যদি মসজিদে যাই সেখানেও মিথ্যা বলব।'

সোবাহান সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফরিদ সেই অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, সমস্ত দিন মিথ্যা কথা বলার ফল কি হবে সেটাও বলে দিচ্ছি মিথ্যা কথা বলতে ইচ্ছা করবে না। পারিবারিক পর্যায়ে যেমন মিথ্যা দিবস থাকবে তেমনি জাতীয় পর্যায়েও মিথ্যা দিবস থাকবে। সেই দিন দেশের সবচে বড় মিথ্যাবাদীকে আমরা পুরস্কার দেব। উপাধিও দেয়া হবে। যেমন — মিথ্যা শ্রেষ্ঠ। কিংবা জাতীয় মিথ্যুক।

'চুপ কর।'

'চুপ করব কেন ? পারিবারিক সভায় আমার কথা বলার পুরো অধিকার আছে। আমি অবশ্যই কথা বলতে পারি। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম— দেশে একটা

মিথ্যা একাডেমী স্থাপিত হবে। সেই একাডেমীর কাজ হবে জাতীয় পর্যায়ের মিথ্যুকরা কে কি ভাবে মিথ্যা বলছেন তার একটা রেকর্ড রাখা। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরুন এক নেতা পত্রিকায় একটা বিবৃতি দিলেন। দু'দিন পর সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা বিবৃতি দিলেন। একাডেমীর কাজ হবে এই সব লক্ষ্য রাখা। এবং প্রয়োজনবোধে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের মত মিথ্যা একাডেমী পুরস্কার প্রচলন করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে একজনের নাম প্রকাশ করতে পারি যিনি সাধারণত মসজিদে মিথ্যা বলেন। সেই মিথ্যা ফলাও করে রেডিও টিভিতে প্রচার করা হয়।'

সোবাহান সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ?'

'জ্বি না। আমার আরো কিছু বলার আছে।'

'তুমি যে একটা গাধা তা কি তোমার জানা আছে ?'

'দুলাভাই পারিবারিক সভায় একজন সদস্যকে গাধা বলাটা ঠিক হচ্ছে না।'

'অবশ্যই ঠিক হচ্ছে। বিলু তুই লেখ পারিবারিক সভায় ফরিদকে গাধা সাব্যস্ত করা হল। কাজগপত্রে রেকর্ড থাকা দরকার। বিলু বলল, তুমি একা গাধা বললেতো বাবা হবে না। সবাইকে একমত হতে হবে। তাছাড়া আমি নিজে মনে করি মামার আইডিয়ার একটা স্যাটায়ারিক্যাল ভ্যালু আছে।'

কাদের এই পর্যায়ে উঠে দাঁড়াল এবং গম্ভীর গলায় বলল, আমার মনে হয় মামার মত বুদ্ধির লোক এই দুনিয়ায় আল্লাহতালা বেশি পয়দা করে নাই। এইটা কাগজে-পত্রে ছাপা দরকার। আফা আপনে আমার মতামত লেখেন।

বিলু সোবাহান সাহেবের মতামতের পাশে কাদেরের মতামতও লিখল। তবে সভায় শুধু মাত্র সত্য দিবসের উপরই সিদ্ধান্ত নেয়া হল। ঠিক হল এই বাড়িতে মঙ্গলবার হবে সত্য দিবস। এই সত্য দিবসে কেউ কোন মিথ্যা বলবে না। কাদের প্রশ্ন তুলল, জীবন রক্ষার জন্যে যদি মিথ্যা বলার দরকার হয় তখন কি করা ? এর উত্তরে সোবাহান সাহেব বলল, চুপ কর গাধা।

কাদের অন্ধকার মুখ করে বলল, বিষয়টার নিন্দা হওয়া দরকার।

গভীর বিস্ময়ে পুরা ব্যাপারটা পুতুল লক্ষ্য করছে। এ রকম একটা ব্যবস্থা যে কোন বাড়িতে চালু থাকতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। জীবনকে আনন্দময় করে তোলার এই সব উপকরণ তাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করল। শুধু এমদাদ খোন্দকার সারাক্ষণ মুখ বিকৃত করে রইলেন এবং রাতে ঘুমুতে যাবার সময় পুতুলকে বললেন, আইজ একটা জিনিস শিখলাম পুতুল।

পুতুল বলল, কি জিনিস ?

'আইজ শিখলাম যে দলের গোদা যদি বেকুব হয় তা হইলে সব কয়টা বেকুব হয়। এই বাড়ির সব কয়টা মানুষ চাপে বোকা এইটা লক্ষ্য করছস ?'

পুতুল মুগ্ধ স্বরে বলল, এসব কাণ্ড কারখানা আমার বড় ভাল লাগছে। এদের নিয়ে কোন মন্দ কথা তুমি বলবা না দাদাজান।

www.BDeBooks.Com

'বেকুবরে বেকুব বলব না ?'

'এরা বেকুব না দাদাজান। এরা...,

পুতুল কথা শেষ করল না। তার অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু দাদাজানকে এসব বলার অর্থ হয় না। দাদাজান বুঝবে না। সবাই সব জিনিস বুঝে না।

পুতুলের ইচ্ছা করছে তার নিজের যখন একটা সংসার হবে সেই সংসারেও এ রকম পারিবারিক সভা বসবে। সেই সভার সব বিবরণও এরকম করে লেখা হবে। আলোচনা হবে। জীবনের একঘেঁয়েমি এইভাবেই দূর করা হবে। একটাইতো আমাদের জীবন। লক্ষ কোটি জীবনতো আমাদের না। কেন আমরা এই জীবনকে সুন্দর করব না।

সত্য দিবস খুব কঠিনভাবে পালিত হতে থাকল।

মঙ্গলবার ভোরে ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা হয় আজ সত্য দিবস। কাদের সেই ব্ল্যাক বোর্ডে বসার ঘরে ঝুলিয়ে দিয়ে আসে। সত্য দিবস শুরু হয়। কাদের এবং রহিমার মা দু'জনই। এই দিবস কঠিন ভাবে মেনে চলে। যে ইলিশ মাছ অন্যদিন পঞ্চাশ টাকায় আনা হয় সেই মাছ মঙ্গলবার কেনা হয় চল্লিশ টাকায়।

মিতু বিস্মিত হয়ে বলেন, আজ মাছ সস্তা নাকি ?

কাদের উদার হয়ে বলে— না।

মিনু বলেন, তাহলে তুই চল্লিশ টাকায় এই মাছ আনলি কি করে ?

কাদের চুপ করে থাকে। কথা বলতে গেলেই সমস্যা। থলের বিড়াল বের হয়ে যাবে। সারাটা দিন তার বড়ই অস্বস্তিতে কাটে। রাত বারটায় হাফ ছেড়ে বাঁচে।

পুতুলও সত্য দিবসের ব্যাপারটা খুব মনে রাখতে চেষ্টা করে। এমনিতেই তার মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না তবু মঙ্গলবারে সে আরো সাবধান থাকে। যেন ভুলেও কোন মিথ্যা বের না হয়। পুতুল খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করল এই মঙ্গলবারেই বেছে বেছে তার দাদাজান বড় বড় মিথ্যা কথাগুলো বলেন। কেন তিনি এমন করেন কে জানে। মিথ্যা কথাগুলো অন্যদিন বললে কি হয় ? এই নিয়ে আনিসের সঙ্গে তার কথা হল। আনিস হেসে বলল, সত্য দিবসের ব্যাপারটা তুমি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ বলে মনে হয়। এটা এমন কঠিন ভাবে গ্রহণ করার কিছু নেই।

পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, নেই কেন ?

আনিস হাসতে হাসতে বলল, 'পুরো ব্যাপারটাই ভুল।'

'ভুল ?'

'হ্যাঁ ভুল। সপ্তাহের একটা বিশেষ দিন সত্য দিবস এর মানে হচ্ছে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে মিথ্যা বলা যাবে।' সত্য বলতে হবে সত্য দিবসে। ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে না ?'

পুতুল কিছু বলল না। সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। এমন ভাবে সে ভাবেনি আনিস বলল, দেখ পুতুল-দিবসের ব্যাপারটাই আমার ভাল লাগে

না— একটা বিশেষ দিনকে করা হচ্ছে বিশ্ব শিশু দিবস। সব দিনইতো শিশু দিবস হওয়া উচিত। উচিত না ?'

'হ্যাঁ তাতো ঠিকই।'

'অবশ্যি এইসব দিবসের একটা উপকারিতাও আছে।'

'কি উপকারিতা ?'

'মনে করিয়ে দেবার একটা ব্যাপার আছে। বছরের একটি বিশেষ দিনকে সত্য দিবস করা মানে ঐ দিনে সত্য কথার প্রয়োজনীয়তার দিকটির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

পুতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি দু'দিকেই যুক্তি দিতে পারেন।'

আনিস হাসতে হাসতে বলল, তা পারি। এই পৃথিবীতে সব কিছুর অভাব আছে কিন্তু যুক্তির অভাব নেই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেমন কঠিন যুক্তি আছে বিপক্ষেও তেমনি কঠিন যুক্তি আছে।

'আপনি আল্লাহ্ বিশ্বাস করেন না কেন ?'

'তুমি কর ?'

'কি আশ্চর্য আমি করব না ? আপনি সত্যি করেন না ?'

'না। রাত্রির সঙ্গে এই নিয়ে প্রায়ই আমাদের ঝগড়া হত। সে তর্কে হেরে যেত। তর্কে হেরে গেলেই আর অসম্ভব মেজাজ খারাপ হত। একবার তর্কে হেরে সে কি করল জান ? আমার খুব দামী একটা পাঞ্জাবী ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলল।

আনিস অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। রাত্রির কথা সে কখনো মনে করতে চায় না। কিন্তু এই মেয়েটির নানান ভঙ্গিতে রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি কি পুতুল ইচ্ছা করেই করে ?

আনিস খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করে। পুতুলের চোখে সে এক ধরনের মুগ্ধতা দেখতে পায়। এই মুগ্ধতা সব সময় থাকে না। হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠে। পরক্ষণেই মেয়েটির মুখ বিষণ্ন হয়ে যায়। আনিস রাত্রির চোখেও এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। এই মুগ্ধতা দেখার একটা আলাদা নেশা আছে। একবার দেখতে পেলে বার বার দেখতে ইচ্ছা করে। আনিস লক্ষ্য করছে সে ইদানিং নিজের অজান্তেই এই মেয়েটিকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। সে জানে ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না একেবারেই ঠিক হচ্ছে না। সাবধান হতে হবে। আরো সাবধান হতে হবে।

এমদাদ সাহেব তাঁর এ বাড়িতে আসার কারণ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার জন্য যে দিনটি বেছে নিল সে দিনটি মঙ্গলবার— সত্য দিবস।

সকাল বেলা সোবাহান সাহেব বাগানে হাঁটছিলেন। এমদাদ সেখানেই তাঁকে ধরল। সোবাহান সাহেব বললেন, কিছু বলবেন ?

এমদাদ বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, অবশ্যই বলব। আপনারে বলবনাতো বলব কারে ? আপনে হইলেন বটবৃক্ষ।

www.BDeBooks.Com

'গৌরচন্দ্রিকার দরকার নেই। কি বলতে চান বলে ফেলুন।'

এমদাদ হাত কচলে বলল, 'নাতনীটার একটা ব্যবস্থা করার জন্য জনাবের কাছে আসলাম। জানি— মুখ ফুটে এবার বলে ফেলতে পারলে সব সমস্যার সমাধান। বলেই ফেললাম। এখন আপনি হইলেন বটবৃক্ষ। যা করবার আপনি করবেন। আমার কাজ শেষ।'

'আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। কার কি ব্যবস্থার কথা বলছেন ?'

'পুতুলের একটা বিবাহ দেয়ার কথা বলতেছি।'

'পুতুলের বিয়ে ? কি বলছেন আপনি ? ওতো বাচ্চা একটা মেয়ে। মেট্রিক পাস করেছে এখন পড়াশোনা করবে।'

'মেয়েছেলে পড়াশোনা করে কি করবে জনাব ? মেয়েছেলেকে তৈরি করা হয়েছে সন্তান পালনের জন্য।'

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, এসব বলছে কে আপনাকে ? মেয়েরা কি সন্তান তৈরির মেশিন না-কি ?

'বলতে গেলে তাই। বুঝতেছি আপনার শুনতে খারাপ লাগতেছে তবে এইগুলো হলো সত্য কথা। আজ মঙ্গলবার সত্য দিবস। মিথ্যা বলে পাপ করব আমি এমন লোক না। তা ছাড়া জনাব আমি বেশি দিন বাঁচব না। মৃত্যুর আগে দেখতে চাই নাতনীটার একটা গতি হয়েছে। এইটা দেখে যেতে পারলে মরেও শান্তি।

সোবাহান সাহেবের চোখের দৃষ্টি থেকে বিরক্ত ভাবটা গেল না। বরং আরো দৃঢ় হল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, এত অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ের পক্ষপাতি আমি না। আমার ফিলসফি হচ্ছে— মেয়েরা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হবার পর বিয়ে করবে। পুতুলের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার এখানে থেকেই সে পড়াশোনা করতে পারে। তাছাড়া তার নিজেরও সে রকম ইচ্ছা। আমাকে কিছু বলেনি তবে আমার স্ত্রীকে বলেছে।

এমদাদের মুখ হা হয়ে গেল। পুতুল তাকে না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে এই কাজ করছে তা সে কল্পনা করেনি। এমদাদ বলল, পড়াশোনার কথা যে বলছেন জবান সেতো বিয়ের পরেও হতে পারে। একটা ভাল ছেলে যদি পাওয়া যায় সে বিয়ের পরেও মেয়ে পড়াবে।

'সে রকম ছেলে পাবেন কোথায় ?'

এমদাদ নিচু গলায় বলল, হাতের কাছে একজন আছে। আপনি মুখে একটা কথা বললে বিয়েটা হয়ে যায়। আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

'সেই ছেলে কে ?'

'মনসুর আমাদের ডাক্তার।'

'ডাক্তার ?'

'জ্বি। পুতুলরে তার খুবই পছন্দ। সব সময় দেখি কুটুর কুটুর গল্প করে।'

'তাই না-কি ?'

'এক রাতে মনসুর এই বাড়িতে ছিল। ঐ রাতে পুতুল নিজেই ভাত টাত বেড়ে খাওয়াল। তার থেকে বুঝলাম পুতুলের নিজেরও ইচ্ছা আছে। এখন আপনি যদি শুধু একটু বলেন তাহলেই দুই হাত এক করে দিতে পারি।'

'কাকে আমি কি বলব ?'

'মনসুরকে বলবেন।'

'আমি বললেই হবে ?'

'অবশ্যই।'

'আচ্ছা দেখি।'

'তাতো দেখবেনই। আপনি না দেখলে কে দেখবে ? আপনি হইলেন বটবৃক্ষ।'

'বটবৃক্ষ শব্দটা আমার সামনে দয়া করে আর উচ্চারণ করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা— তবে সত্য কথা না বলেই বা কি করি ? আজ আবার মঙ্গলবার। সত্য দিবস। বটবৃক্ষকে বটবৃক্ষ না বললে— মিথ্যাচার হয়।'

সোবাহান সাহেব কঠিন চোখে তাকালেন। সেই দৃষ্টির সামনে এমদাদ চুপসে গেল। বটবৃক্ষ বিষয়টা নিয়ে আর আগানো ঠিক হবে না। তবে আজ কাল মন্দ অগ্রসর হয়নি।

২১

আড়ি পেতে কিছু শোনার মত মানসিকতা বিলুর নেই।

তবু সে আড়ি পেতেছে। একে আড়ি পাতা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। সে আনিসের ঘরের বাইরের দরজার পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। ভেতরের কথা-বার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আনিস তার পুত্র-কন্যার সঙ্গে গল্প করছে। এমন কিছু গল্প নয়, তবু শুনতে চমৎকার লাগছে। রাত প্রায় নয়টা। ওরা বাতি জ্বালায়নি। ঘর অন্ধকার করে গল্পের আসর জমিয়েছে। বিলুর ইচ্ছা করছে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলে, আমাকে দলে নিন আনিস সাহেব, আমিও গল্প শুনব। তা বলা সম্ভব নয়। সবাইকে অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। মনের অনেক ইচ্ছা মনে চেপে রাখতে হয়। বিলুদের যে টিচার ফিজিওলজি পড়ান বিলুর খুব ইচ্ছা করে কোন একদিন তাঁকে বলতে— 'স্যার, আপনার পড়ানোর ধরন আমার খুব ভাল লাগে। আমি এই জীবনে আপনার মত ভাল টিচার পাইনি, পাব বলেও মনে হয় না।" এমন কিছু কথা না যা একজন সম্মানিত শিক্ষককে বলা যায় না। অবশ্যই বলা যায়। অবশ্যই বলা যায়। বিলু একদিন সেই কথাগুলো বলার জন্যে স্যারের ঘরে ভয়ে ভয়ে ঢুকতেই স্যার বাঘের মত গর্জন করে উঠলে— কি চাই ? বিলু থতমত খেয়ে বলল, কিছু না স্যার। এইবার তিনি গর্জন করলেন সিংহের মত,— কিছু না, তাহলে বিরক্ত করছ কেন ? গেটআউট।

www.BDeBooks.Com

বিলু কেঁদে ফেলেছিল। কি অসম্ভব লজ্জা। গেট আউট বলে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া। ছিঃ ছিঃ।

বিলুর মনে হচ্ছে আজ যদি সে আনিস সাহেবের ঘরে ঢুকে বলে আপনাদের মজার মজার গল্পে অংশ নিতে এসেছি তাহলে তিনি হয়ত শুকনো গলায় বলবেন, আপনি কিছু মনে করবেন না। এখন আমাদের পরিবারিক সেসন চলছে। বাইরের কেউ আসতে পারবে না। নিয়ম নেই। আবারো বিলুর চোখে পনি আসবে। ইনি অবশ্যি স্যারের মত "গেট আউট" বলবেন না। সবাই সব কিছু পারে না। ঐ স্যারটা ছিল পাগলা। ক্লাসের মধ্যে একবার একটি মেয়ে শব্দ করে হেসে উঠেছিল বলে তিনি চড় মারার ভঙ্গি করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই মেয়ে ভয়ে অস্থির। ঠক ঠক করে কাঁপছে। ভাগ্য ভাল—স্যার সেদিন নিজেকে সামলে নিলেন। চাপা গলায় বললেন, কামিজ পরিহিতা সুদর্শনা তরুণী! তোমার কি ধারণা আমি একজন গোপালভাড় ? আমি তোমার সঙ্গে ভাঁড়ামি করছি ? খবরদার আর যেন হাসতে না দেখি। আরেকবার হাসলে সাড়শি দিয়ে টেনে তোমার উপরের পাটির একটা দাঁত তুলে ফেলব। উইদউট এনেসথেসিয়া। এনেসথেসিয়া দেয়া হবে না।

আনিস সাহেবকে দেখলেই বিলুর ঐ স্যারের কথা মনে পড়ে। কেন পড়ে বিলু ঠিক জানে না। দু'জনের মধ্যে কোনই মিল নেই। তবু যেন কি একটা মিল আছে। বিলু ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আনিস সাহেব বলছেন, আচ্ছা এখন তোমরা বলতো কোন প্রাণী অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায়।

নিশা বলল, অন্ধকারে শুধু বিড়াল দেখতে পায়।

টগর বলল, বাদুর এবং পেঁচা দেখতে পায়।

'এইসব প্রাণীদের মধ্যে সবচে ভাল কে দেখতে পায় ?'

'জানি না বাবা।'

'প্রশ্ন করলেই চট করে জানি না বলা ঠিক না টগর। অনেকক্ষণ প্রশ্নটা নিয়ে ভাববে, তারপরেও যদি না পার তাহলে বলবে বলতে পারছি না।'

নিশা বলল, আমার মনে হয় অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায় বিড়াল। আমারটা হয়েছে বাবা ?

'না হয় নি। অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায় মানুষ। কারণ সে অন্ধকারে বাতি জ্বালানোর কৌশল জানে। অন্য কোন প্রাণী তা জানে না। কাজেই মানুষ অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায়।'

টগর বলল, জোনাকি পোকাওতো অন্ধকারে বাতি জ্বালাতে পারে।

আনিস একটু হকচকিয়ে গেল। টগরের এই উত্তর সে আশা করেনি। আনিস বলল, জোনাকি বাতি জ্বালাতে পারে তা ঠিক। শুধু জোনাকি না অন্ধকারে সমুদ্রের অনেক মাছ যেমন ইলেকট্রিক 'ঈল' বাতি জ্বালাতে পারে। কিন্তু এই বাতি প্রকৃতি তার শরীরে দিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার হলে আপনাতে

জ্বলে উঠে। প্রকৃতি মানুষের শরীরে এমন কিছু দিয়ে দেয় নি। বাতি জ্বালানোর কৌশল মানুষকে বুদ্ধি করে বের করতে হয়েছে। জোনাকি পোকা এবং 'ঈল' মাছের সঙ্গে এইখানেই মানুষের তফাৎ।

নিশা বলল, প্রকৃতি কি বাবা ?

আনিস আবার হকচকিয়ে গেল। প্রকৃতি কি তার উত্তর তিন ভাবে দেয়া যায়। আস্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, নাস্তিকের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এসকেপিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে কোনটা দেবে ? কোনটা দেয়া উচিত ? আনিস বলল, গল্প-গুজব আজকের মত শেষ। বাবারা এবার ঘুমুতে যাবার পর্ব। আমি এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে তোমরা পানি খেয়ে বাথরুম পর্ব শেষ করে ঘুমুতে যাবে। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ -ছয়...

বিলু নিঃশব্দে নিচে নেমে এল। পথে পুতুলের সঙ্গে দেখা। সে ট্রেতে চা বিসকিট নিয়ে উপরে উঠছে। আনিসের চা। মনে হচ্ছে আনিসের সঙ্গে এই মেয়েটির এক ধরনের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রায়ই সে উপরে চা নিয়ে আসে। সহজ সম্পর্কের আড়ালে অন্য কিছু নেইতো ? বিপত্নীক তৃষিত এই পুরুষ, যৌবনের দুয়ারে এসে দাঁড়ানো সরলা একজন তরুণী। প্রকৃতি কি তার নিজস্ব নিয়মে এদের কাছাকাছি নিয়ে আসবে না ?

'পুতুল'

'জ্বি আপা।'

'আনিস সাহেবের জন্য চা নিয়ে যাচ্ছ বুঝি ?'

'জ্বি। আপনে আমারে কিছু বলবেন আফা ?'

'না কিছু বলব না। তুমি যাও।'

বিলু মুখে বলছে কিছু বলবে না কিন্তু তার মন চাচ্ছে অনেক সময় নিয়ে পুতুলকে সে গুছিয়ে নারী-পুরুষ সম্পর্কের জটিল তার কথাগুলো বলে। এই জটিলতা ভয়াবহ জটিলতা। মানুষ তার সবটা জানে না। কিছুটা জানে। ভালবাসার মূল কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে শরীর। ভালবাসায় শরীর ছাড়াও অনেক কিছু আছে। সেই অনেক কিছু কি ? কেউ কি জানে ? আচ্ছা আনিস সাহেব নিজে কি জানেন ? তাঁকে দেখেতো মনে হয় তিনি অনেক কিছু জানেন। অনেক কিছু নিয়ে ভাবেন। এই সব নিয়েও নিশ্চয়ই ভেবেছেন। একদিন হুট করে জিজ্ঞেস করে ফেললেই হয়।

বিলু একতলায় নেমে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে খানিক হাঁটল। তার মন বেশ খারাপ হয়েছে। কোন কিছুতেই মন বসছে না। ফরিদের ঘরে আলো জ্বলছে। বিলু মামার ঘরে উঁকি দিল।

মেঝেতে কাদের গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ফরিদ শুয়ে আছে বিছানায়। দু'জনকেই খুব চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছে। বিলু বলল, কি হয়েছে মামা ?

'কিছু হয় নি।'

www.BDeBooks.Com

'মন খারাপ ?'

'না।'

'ভেতরে এস তোমার সঙ্গে কি খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করা যাবে ?

'ইচ্ছা করলে যাবে।'

বিলু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'আচ্ছা মামা দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি। একটা ধাঁধার জবাব দাও তো। বলতো প্রাণীদের মধ্যে কোন প্রাণী অন্ধকারে সবচে ভাল দেখতে পায় ?'

ফরিদ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'মানুষ আবার কে ? অন্ধকারে মানুষ ফস করে একটা টর্চ লাইট জ্বেলে দেয়। এইসব লো-লেভেল ইন্টেলিজেন্সের কথা-বার্তা আমার সঙ্গে একবারেই বলবি না।'

'তুমি এত রাগ কেন মামা ?'

'রাগ না। মনটা খারাপ।'

'বাবা আবার কিছু বলেছে ?'

'হু।'

'কি বলেছে'

'কি হবে এই সব শুনে।'

'বল না শুনি।'

ফরিদ কিছু বলল না। কাদের ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। বিলু বলল, বাবা কি অন্যায় কিছু বলেছেন ?

অন্যায় তো বটেই। দুলাভাই আমার বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে অতি কুৎসিত মন্তব্য করেছেন। দুলাভাই বলেছেন— আমার মাথায় ব্রেইন বলেই কিছু নেই। ব্রেইনের বদলে আমার মাথায় আছে শুধু ডাবের পানি। শুনে আমার মনটাই খারাপ হয় গেল। একটা লোক যদি ককটিনিডিয়াসলি বলতে থাকে আমার মাথায় কিছু নেই তখন কেমন লাগে বলতো ? তারপরেও কথা আছে— আমার মাথায় কিছু নেই ভাল কথা— তাই বলে ডাবের পানি থাকবে কেন ? এটাতো অত্যন্ত অপমান সূচক কথা। ডাবের পানি বলায় যত মাইন্ড করেছি— মাথাভর্তি গোবর বললে এত মাইন্ড করতাম না।

বিলু হেসে ফেললো। ফরিদ ক্ষিপ্ত গলায় বলল, হাসছিস কেন ? একজন ভাবছে আমি একটা ডাবের মধ্যে হাসি তামাশার কি আছে ? না-কি তোরও ধারণা আমি একটা ডাব ?

বিলু লজ্জিত গলায় বলল, সরি মামা।

'দুই অক্ষরে একটা শব্দ 'সরি' বললেই সব সমস্যার সমাধান ? তুই ভাবিস কি আমাকে ?'

'মামা তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি এবং তুমি নিজেও তা ভাল করেই জান।'

'পছন্দ করিস আর না করিস— কাল ভোর থেকে তোরা কেউ আমাকে দেখবি না। আমি পথে নেমে যাচ্ছি।'

'পথে নেমে যাচ্ছি মানে ?'

'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরব। বাড়িতে বসে এই অপমান সহ্য করব না। যথেষ্ট সহ্য করেছি। মানুষের সহ্য শক্তির একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করা হয়েছে। দেয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেছে বিলু।'

কাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, অখন দেওয়াল ভাঙা বাইর হওন ছাড়া আর উপায় নাই আফা।

'তুইও যাচ্ছিস না-কি ?'

'হু-মামারে একলা ছাড়ি ক্যামনে।'

'ভাল। যা কিছুদিন বাইরে থেকে আয়।'

'ফরিদ পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, এই রাতই এ বাড়িতে আমাদের শেষ রাত। দ্যা লাস্ট নাইট।'

ফরিদের কথায় কোন গুরুত্ব এ বাড়িতে কেউ দেয় না। বিলুও দিল না। কিন্তু পরদিন ভোরবেলা সত্যি সত্যি দেখা গেল ফরিদ এবং কাদের কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছে। সোবাহান সাহেবের সঙ্গে তাদের দেখা হল বারান্দায়। ফরিদ বলল, দুলাভাই চললাম। যদি কোন অপরাধ করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন। যদিও জানি তেমন কোন অপরাধ হয় নি।

সোবাহান সাহেব বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

'রাস্তায় আর কোথায়। আমার ঠিকানাতো দুলাভাই রাজপথে। তবে আপনি যদি এখনো নিষেধ করেন তাহলে একটা সেকেন্ড থট দিতে পারি। থেকে যেতে পারি।'

সোবাহান সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন— তোমাকে যেতে নিষেধ করব কেন ? আমি নিজেইতো তোমাকে যেতে বলেছি।

'তাহলে যাচ্ছি দুলাভাই।'

'আচ্ছা।'

'খোদা হাফেজ।'

'খোদা হাফেজ।'

'সুন্দর সকাল —তাই না দুলাভাই ?'

'হ্যাঁ সুন্দর সকাল।'

'তাহলে রওনা দিচ্ছি ?'

'আচ্ছা।'

কাদের বলল, বাঁম পাটা আগে ফেলেন মামা। চিরজন্মের মত বাইর হইতে হইলে বাম পা আগে ফেলতে হয়।'

www.BDeBooks.Com

ফরিদ বাঁ পা আগে ফেলল। কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডাকছে। এই বাড়ির বাগানে একটা পাগলা কোকিল আছে। বসন্ত কাল ছাড়া অন্য সব সময় সে ডাকে।

কোকিলের ডাকের কারণেই কি-না কে জানে ফরিদের বুক হু হু করতে লাগল। তার মনে হল মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটা উচিত হয়নি। তার উচিত ছিল পাখি হয়ে জন্মানো। সেসব পাখি যারা ঘর বাঁধতে পারে না। যেমন কোকিল। তাহলে ঘর ছাড়ার কষ্টটা পেতে হত না। যার ঘর নেই তার ঘর ছাড়ার কষ্টও নেই। পাগলা কোকিল ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে কুহু কুহু।

আধ ঘণ্টার মতো হয়েছে।

দু'জন হাঁটছে সমান তালে। এক সময় কাদের শুকনো গলায় বলল, আমরা যাইতেছি কই ?

ফরিদ থমকে দাঁড়িয়ে বিস্মত গলায় বলল, কি অদ্ভুত কোইনসিডেন্স। আমিও ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাটাই তোকে জিজ্ঞেস করব বলে ভাবছিলাম।

'আমারে জিগাইলে ফয়দা কি ? আমি হইলাম একটা চাকর মানুষ।'

'এই কথা ভুলে যা কাদের। এখন আমরা দু' জনই সমান। তুই যা আমিও তা। দু' জনই পথের মানুষ। রাজপথে আমাদের দু'জনকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে।'

'জ্ঞানের কথা অখন আর ভাল লাগতেছে না মামা। ক্ষিধা চাপছে।'

'ক্ষুধা-তৃষ্ণা এইসব স্থূল জিনিস এখন আমাদের ভুলে যেতে হবে রে কাদের। ম্যানিব্যাগ ফেলে এসেছি।'

'কন কি —সাড়ে সর্বনাশের কথা।'

'অবশ্যি নিয়ে এলেও কোন ইতর বিশেষ হত না। মানি ব্যাগে টাকা ছিল না। তোর কাছে কিছু আছে ?'

কাদের জবাব দিল না। সে একেবারে খালি হাতে আসেনি। তবে সেই কথা মামাকে বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। ফরিদ বলল, তোর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খালি হাতে আসিস নি। দ্যাটস ভেরি গুড। আয় আপাতত চা খাওয়া যাক।

'চা খাইয়া টেকা নষ্ট করনের সার্থকতা কি মামা ?'

'চা খেতে খেতে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। রাতে কোথায় ঘুমুব এই নিয়েও ভাবতে হবে।'

'চলেন ফেরত যাই।'

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, কি অদ্ভুত কোইনসিডেন্স। আমিও ঠিক এই মুহূর্তে এই কথাটাই বলব বলে ভাবছিলাম। এর ভেতর থেকে যে জিনিসটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হল সেটা কি জানিস ?

কাদের বিরস মুখে বলল, জ্বি না।

'যে জিনিস স্পষ্ট হল তা হচ্ছে— পথের মানুষ সবাই একই ভাবে চিন্তা করে। ব্যাপারটা আমি চট করে বললাম, কিন্তু যা বললাম তা গভীর দার্শনিক চিন্তার বিষয়। চল চা খাই।'

'চলেন।'

চা খেতে খেতে ফরিদ বলল, যাব কি ভাবে তা নিয়েও চিন্তা করা দরকার। রি এন্ট্রি কি ভাবে হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে।

'ভাবনের কিছু নাই। গিয়ে পরও ধরলেই হইব। পাওডাত ধইরা বলতে হইব মাফ চাই।'

'চুপ কর গাধা। পা ধরাধরির কিছুই নেই। গ্রেসফুল এন্ট্রির ব্যবস্থা করছি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে দে। আরেক কাপ চা দিতে বল— চিনি বেশি। রক্তে ক্যাফিনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ক্যাফিন চিন্তার সহায়ক।'

ফরিদকে আরেক কাপ চা দেয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। কাদের বলল, কিছু পওয়া গেছে মামা ?

'অবশ্যই।'

'কি পাইলেন ?'

'পারিবারিক সদস্যদের সাইকোলজি নিয়ে চিন্তা করে বুদ্ধিটা বের করেছি। আমরা চলে আসার পর বাসার পরিস্থিতি কি হয়েছে চিন্তা কর। প্রথমে দুলাভাইয়ের কথা ধরা যাক। উনার অসংখ্য ক্রুটি সত্ত্বেও উনি যে একজন ভালমানুষ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনার মনের অবস্থা কি ? উনার মন হয়েছে খারাপ। খুব খারাপ। মনে মনে বলছেন— এই কাজটা কি করলাম ? কাজটা ঠিক হয় নি। এর মধ্যে বিলু এসে কান্না কান্না গলায় বলেছে— বাবা, তুমি মামাকে বের করে দিলে ? বেচারা এখন কোথায় ঘুরছে কে জানে। বিলু যে এই কথা বলবে তা জানা কথা কারণ মেয়েটা আমাকে খুবই স্নেহ করে। করে না ?'

'জ্বি করে! মিলি আফাও করে।'

'ইয়েস। এনাদার প্লাস পয়েন্ট। মিলিও বলবে— বাবা, মামার জন্যে আমার মনটা খারাপ লাগছে। এতে দুলাভাই আরও বিষণ্ণ হবেন। ক্রমে ক্রমে দুপুর হয়ে গেল খাবার টাইম। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে, আমার অভাব সবাই তীব্রভাবে অনুভব করছে। দুলাভাই, অপরাধবোধে আক্রান্ত। এর মধ্যে তোর অভাবও অনুভব করা যাচ্ছে।'

'সত্যি ?'

'অবশ্যই। দোকান থেকে এটা ওটা আনা দরকার। হাতের কাছে কেউ নেই। দুলাভাই তামাক খাবেন— সেই তামাক সাজার কাজটা তোর চেয়ে ভাল কেউ পারে না।'

কাদের হাসি মুখে বলল, কথা সত্য।

www.BDeBooks.Com

'কি বলছি মন দিয়ে শোন। এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ঘরের কলিং বেজে উঠল-ক্রীং ক্রীং ক্রীং। সবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল। সবাই ভাবছে আমরা বুঝি চলে এলাম। দরজা খুলে দেখা গেল তুই একা দাঁড়িয়ে আছিস।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ তুই। তুই গম্ভীর গলায় বলবি— আমাকে দেখে ভাববেন না যে আমরা ফেরত এসেছি। মামা কঠিন লোক, একবার ঘর থেকে বের হলে সে আর ফেরে না। মামা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি এসেছি মামার একটা বই নিতে। মামা বই ফেলে গেছেন। তোর কথা শেষ হওয়া মাত্র ঘরে খানিক নীরবতা। বিলু তাকিয়ে আছে বাবার দিকে, মিলি তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। তাদের দৃষ্টিতে নীরব অনুনয় ঝড়ে পড়ছে। দুলাভাই তখন বলবেন, যাই আমি ফরিদকে নিয়ে আসি। দুলাভাই বের হয়ে এলেন এবং হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরে ঢুকবেন। যাকে বলে গ্রেসফুল এন্ট্রি। বুঝতে পারলি ?'

'পারলাম। আপনের বুদ্ধির কোন সীমা নাই মামা। আরেক কাপ চায়ের কথা কই ?'

'আচ্ছা বল।'

'কাদের সত্যি সত্যি অভিভূত। এমন অসাধাণ বুদ্ধির একজন মানুষ জীবনে কিছু বলতে পারছে না কেন তা ভেবে এই মুহূর্তে সে কিছুটা বিষণ্ন বোধ করছে।

নিরিবিলি বাড়ির গেটের বাইরে ফরিদ হাঁটাহাঁটি করেছে। কাদের গিয়েছে বই চাইতে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের ফিরে আসতে দেখা গেল। তার মুখ পাংশু বর্ণ।

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যাপার কিরে ?

'ব্যাপার কিছু না।'

'যে ভাবে বলতে বলেছিলাম বলেছিলি ?'

'হু।'

'দুলাভাই কি বললেন ?'

'বললেন— বই নিয়ে বিদায় হ।'

ফরিদ বিস্মিত হয়ে বলল, বলিস কি ?

'যা ঘটনা তাই বললাম। এই নেন আপনের বই।'

কাদেরের হাতে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সবুজ মলাটের আধুনিক কবিতা।

ফরিদ নিচু গলায় বলল, সমস্যা হয়ে গেল দেখছি।

কাদের কিছু বলল না। তার খুবই মন খারাপ হয়েছে। ঐ ফাজিল কোকিলটা এখনো ডাকছে-কুহু কুহু। রাগে গা-টা জ্বলে যাচ্ছে।

ফরিদ বলল, কাদের কি করা যায় বলত ?

কাদের থু করে একদলা থুথু ফেলল। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

'দুপুর এবং রাত এই দু'বেলা খাবারের টাকা কি তোর কাছে আছে ?'

'আছে।'

'তাহলে খামাখা এত দুশ্চিন্তা করছি কেন ? রাতটা আগে পার করি। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে কোন পরিকল্পনা বের করতে হবে। আমি এই মুহূর্তে কোন সমস্যা দেখছি না।'

সমস্যা দেখা দিল রাতে। কোন সস্তা দরের হোটেলে রাতটা কাটানো যায় কিন্তু কাদের টাকা খরচ করতে চাচ্ছে না। কতদিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে কে জানে। হাতে কিছু থাকা দরকার। মামার উপর এখন সে আর বিশেষ ভরসা করতে পারছে না। এখন মনে হচ্ছে তার বুদ্ধিটাই ভাল ছিল— পায়ের উপর পড়ে যাওয়া এবং কান্না কান্না গলায় বলা— মাফ করে দেন।

ঠিক হল রাত কাটানো হবে কমলাপুর রেল স্টেশনে। খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর শুয়ে থাকা। এমন কোন কঠিন ব্যাপার না। তবে মশা একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। পরে বলাটা ঠিক হবে না ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে। চারদিকে মশা। স্ত্রী মশারাই কেবল মানুষের রক্ত খায়। কাজেই ধার নিতে হবে যে মশাগুলো তাকে কামড়াচ্ছে তারা স্ত্রী জাতি ভুক্ত। এদের প্রত্যেককেই বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হচ্ছে। ফরিদের ধারণা ইতোমধ্যে তার শরীর থেকে কোয়ার্টার কেজির মত রক্ত পাচার হয়ে গেছে।

'কাদের।'

'জ্বি মামা।'

'মশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটা বুদ্ধি বের করেছিরে —কাদের।'

কাদের কিছু বলল না। সে অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করছে। মামার কোন বুদ্ধির উপরই সে এখন আর আস্থা রাখতে পারছে না। ফরিদ উৎসাহের সঙ্গে বলল, আমরা কি করব জানিস ? আমরা মশাদের টাইম দেব। আমরা শোব এমন জায়গায় যেখানে অনেক লোকজন শুয়ে আছে। কিন্তু এখন শোব না। এখন শুধু হাঁটাহাঁটি করব। ধর রাত একটা পর্যন্ত। ইতোমধ্যে মশারা তাদের প্রয়োজনীয় রক্ত অন্যদের কাছে থেকে সংগ্রহ করে রাখবে। আমরা যখন ঘুমুতে আসব তখন তাদের ডিনার পর্ব শেষ। বুঝতে পারলি ব্যাপারটা ?

'পারছি।'

'সবই বুদ্ধির খেলা বুঝলি। সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে মাথায়। মশা সমস্যার কি সহজ সমাধান করে দিলাম দেখলি ?'

'দেখলাম।'

'তোর মনটা মনে হচ্ছে খারাপ।'

'ঘরে বিছানা, মশারি, বালিশ থুইয়া মাটির মধ্যে ঘুম।'

'কিন্তু স্টেশনে গণমানুষের সঙ্গে শুয়ে থাকারও তো একটা আনন্দ আছে। ওদের কাতারে চলে আসতে পারছি এটা কি কম কথা ? Have not's দের চোখের সমনে খেতে পাচ্ছি। আশ্রয়হীনদের দুর্দশা দেখছি। ওদের সুখ-দুঃখে অংশ নিচ্ছি— এটাওতো কম না।'

www.BDeBooks.Com

'মামা চুপ করেন তো।'

'তোর মেজাজ মনে হচ্ছে অতিরিক্ত খারাপ। এটাতো ভাল কথা না। জীবনকে দেখতে হবে। জানতে হবে। এদের নিয়ে আমি একটা ছবি করব বলেও ভাবছি। ছবির নাম 'তাহারা'। ছিন্নমূল মানুষদের ছবি। অপেনিং শট থাকবে একটা শিশুর মুখ। ওকি চলে যাচ্ছিস কেন?'

মেঝেতে খবরের কাগজ বিছায়ে ঘুমানো যতটা কষ্টকর হবে বলে ভাবা গিয়েছিল ততটা কষ্টকর মনে হচ্ছে না। মাথা নিচে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ দিয়ে ফরিদ বেশ আরাম করেই শুয়েছে— তারপাশে কাদের। কাদের ঘুমিয়ে পড়েছে। ফরিদের ঘুম আসছে না। সে চোখের উপর কবিতার বইটা ধরে রেখেছে। কবিতা পড়তে নেহায়েত মন্দ লাগছে না।

ফরিদের মাথার কাছে এক বুড়ো শুয়েছে। সে স্টেশনেই ভিক্ষা করে। সেও ফরিদের মতই জেগে আছে। এক সময় বলল ভাইজান কি পড়েন?

ফরিদ বলল, কবিতা।

'এট্টু জোর দিয়ে পড়েন— আমিও হুনি।'

'আপনার সম্ভবত ভাল লাগবে না।'

'লাগব। ভাল লাগব।'

'ভাল লাগলে শুনুন, এই কবিতাটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা।'

'হিন্দু?'

'জ্বি হিন্দু।'

'মালাউনের কবিতা কি ভাল হইব? আইচ্ছা পড়েন।'

'কবিতার নাম, কাক ডাকে—

> খাঁ খাঁ রোদ নিস্তব্ধ দুপুর;
> আকাশ উপুড় করে ঢেলে দেওয়া
> অসীম শূন্যতা,
> পৃথিবীর মধ্যে আর মনে—
> তারই মাঝে শুনি ডাকে
> শুষ্ক কণ্ঠ কা কা!
> গান নয়, সুর নয়,
> প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা— কিছু নয়,
> সীমাহীন শূন্যতা শব্দমূর্তি শুধু।

কবিতা পড়তে পড়তেই ফরিদ ঘুমিয়ে পড়ল। কবিতা পাঠের কারণেই হোক, কিংবা সারাদিনের পরিশ্রমের কারণেই হোক খুব ভাল ঘুম হল। যাকে বলে একঘুমে রাত কাবার।

ঘুম ভাঙল কাদেরের চিৎকারে।

'সব্বনাস হইছে মামা—উঠেন।'

ফরিদ উঠল। তেমন কোন সর্বনাশের ইশারা সে দেখল না। কাদের চাপা গলায় বলল, চোর বেবাক সাফা কইরা দিছে।

'সাফা করে দিয়েছে মানে ?'

'ভাল কইরা নজর দিয়া দেখেন মামা।'

'আরে তইতো!

ফরিদের শান্তিনিকেতনি ব্যাগ নেই। কাদেরের টিনের ট্রাংক নেই। শুধু তাই না, সবচেয়ে যা আশ্চর্যজনক হচ্ছে, চোর ফরিদের গা থেকে পাঞ্জাবী এবং কাদেরের শার্ট খুলে নিয়ে গেছে। এই বিস্ময়কর কাজ চোর কি করে করল কে জানে। অত্যন্ত প্রতিভাবান চোর এটা মানতেই হবে। ফরিদ বলল, ভাল হাতের কাজ দেখিয়েছে রে কাদের, I am impresed.

কাদের শুকনো স্বরে বলল, অল্পের জইন্যে ইজ্জত রক্ষা হইছে মামা। টান দিয়া যদি লুঙ্গী লইয়া যাইত তা হইলে উপায়টা কি হইত চিন্তা করেন।

ফরিদ শিউরে উঠল। এই সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার পরণে প্যান্ট। ব্যাটা নিশ্চয়ই প্যান্ট নিতে পারত না। কি বলিস কাদের ?

'যে শার্ট খুইল্যা নিতে পারে সে প্যান্টও খুলতে পারে।'

'তাওতো ঠিক। মাই গড। আমারতো চিন্তা করেই গায়ে ঘাম দিচ্ছে। কি করা যায় বলতো ? রেলওয়ে পুলিশকে ইনফর্ম করব ?'

কাদের অত্যন্ত বিরক্ত গলায় বলল, চুপ করেন তো মামা ?

জিন্দেগীতে কোনদিন শুনেছেন পুলিশ চোর ধরছে ? আল্লাহতালা পুলিশ বানাইছে ঘুস খাওনের জইন্যে।

'বলিস কি ?'

'দেশ থাইক্যা পুলিশ তুইল্যা দিলে চুরি ডাকাতি অর্ধেক কইম্যা যাইব। গরিব একটা কথা কইছে। কথাটা চিন্তা কইরা দেখবেন।

চোর সবই নিয়ে গেছে তবে কবিতার বই ফেলে গেছে। ফরিদ কবিতার বই হাতে নিল। তবে কবিতার পড়ার ব্যাপারে সে এখন আর কোন আগ্রহ বোধ করছে না। প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। খালি পেটে কাব্য, সংগীত এইসব জমে না কথাটা বোধ হয় ঠিকই।

'কাদের।'

'জ্বি মামা।'

'খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করা যায় বলতো।'

'আর খাওয়া দাওয়া ।'

'নাশতা তো খেতে হবে।'

'দুই গেলাস পানি খান। পানি হইল ক্ষিধার বড় অষুধ।'

ফরিদ পর পর তিন গ্লাস পানি খেল। তার ক্ষিধের তেমন কোন উনিশ বিশ হল না।

www.BDeBooks.Com

সোনালি ফ্রেমের চশমা পড়া প্রফেসর টাইপ এক যাত্রী যাচ্ছে। চিটাগাং থেকে এসেছে মনে হচ্ছে। ফরিদ কবিতার বই হাতে এগিয়ে গেল, নরম গলায় বলল, ভাই শুনুন আমার কাছে চমৎকার একটা কবিতার বই আছে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক কবিতা। নাম মাত্র মূল্যে বইটি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি কি আগ্রহী ?

লোকটি অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল, জবাব দিল না। তবে ফরিদ পরের এক ঘণ্টার মধ্যে বইটি পনেরো টাকায় বিক্রি করে ফেলতে সক্ষম হল। বইটি কিনেছে কাল চশমা পরা রূপবতী একজন তরুণী। কাদের তার হ্যান্ডব্যাগ এগিয়ে দিয়েও পাঁচ টাকা পেল।

২২

বিলু এসে বলল, আনিস সাহেব। আপনাকে বাবা একটু ডাকছেন। আনিস লিখছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বিলু বলল, আপনি আপনার কাজ সেরে আসুন। এমন জরুরি কিছু নয়।

আনিস বলল, আমার কাজটাও তেমন জরুরি কিছু না। পত্রিকায় দেখলাম আপনাদের মেডিকেল কলেজ খুলে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ খুলছে। অল্প কিছুদিন ক্লাস হবে আবার বন্ধ হয়ে যাবে।'

'আপনার, মনে হচ্ছে যাবার খুব একটা ইচ্ছা নেই ?'

'না নেই। তাছাড়া বাসায় এলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। আপনার পুত্র-কন্যা কোথায় ?'

'ওরা খাটের নিচে।'

'ওখানে কি করছে ?'

'জানি না। নতুন কোন খেলা বের করেছে বোধ হয়।'

'বিলু নিচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করল। টগরের হাতে কাঁচি। সে কাটাকুটি করছে বলে মনে হয়। চোখে চোখ পড়তেই টগরের ইশারায় বিলুকে চুপচাপ থাকতে বলল।

বিলু আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি চলে যান। আমি ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করি।

'গল্প করতে হলে খাটের নিচে যেতে হবে। ওরা সেখান থেকে বেরুবে বলে মনে হয় না।'

আনিস সার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল।

সোবাহান শাহেবের শরীর বিশেষ ভাল নয়। তিনি চুপচাপ শুয়ে আছেন। আনিসকে দেখে উঠে বসলেন। আনিস বলল, 'কেমন আছেন স্যার ?'

'ভাল। তুমি কেমন ?'

'আমিও ভাল।'

'বস। ঐ চেয়ারটায় বস। মনটা একটু অস্থির হয়ে আছে।'

'কেন বলুন তো ?

'তিনদিন হয়ে গেল ফরিদ বাড়ি থেকে বের হয়েছে আরতো ফেরার নাম নেই। কোন সমস্যায় পড়েছ কিনা কে জানে। ঝোঁকের মাথায় বের করে দিলাম। ভেবেছিলাম এক দু'দিন বাইরে থাকলে বুঝবে পৃথিবীটা কেমন জায়গা। এক ধরনের রিয়েলাইজেশন হবে।'

'আপনি চিন্তা করবেন না। চিন্তার কিছু নেই। তেমন কোন সমস্য হলে মামা চলে আসবেন।'

'তাও ঠিক। কোথায় আছে জানতে পারলে মনটা শান্ত হত।'

'আপনি বললে আমি খুঁজে বের করতে পারি।'

'বিশ লক্ষ মানুষ এই শহরে বাস করে। এর মধ্যে তুমি এদের কোথায় খুঁজবে ?'

আনিসে হাসতে হাসতে বলল, ঠিকানাহীন মানুষদের থাকার জায়গা কিন্তু খুব সীমিত। ওরা সাধারণত লঞ্চ টার্মিনালে, বাস টার্মিনালে কিংবা স্টেশনে থাকে। এই তিনটার মধ্যে স্টেশন সবচেয়ে ভাল। আমার ধারণা স্টেশনে গভীর রাতে গেলেই তাদের পাওয়া যাবে। যদি বলেন আজ রাতে যাব।

'আমাকে কি নিয়ে যেতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব। তবে আপনার যাবার দরকার দেখছি না।'

'আমি যেতে চাই আনিস। ঠিকানাহীন মানুষ কিভাবে থাকে দেখতে চাই।'

'আপনার দেখতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া আপনার শরীরটাও ভাল নেই।'

'আমার শরীর ঠিকই আছে। তুমি আমাকে নিয়ে চল।'

'জ্বি আচ্ছা।

'তোমাকে আর একটা কাজ দিতে চাই। বলতে সংকোচ বোধ করছি।'

'দয়া করে কোন রকম সংকোচ বোধ করবেন না।'

'বিলুর মেডিকেল কলেজ খুলেছে। তুমি ওকে একটু বরিশাল দিয়ে আসতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব।'

অবশ্যি এর মধ্যে যদি কাদের চলে আসে তাহলে ও নিয়ে যাবে। এই কাজটা সাধারণত কাদেরই করে।'

'স্টীমারের টিকিট কাটা হয়েছে ?'

'না—এই কাজটাও তোমাকেই করতে হবে । আমি খুবই অস্বস্থি বোধ করছি।'

আনিস হাসল। সোবাহান সাহেব বললেন, তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই তবু কেন জানি মনে হয় অনেক খানি অধিকার আছে।

'আপনার যদি এরকম মনে হয়ে থাকে তাহলে ঠিকই মনে হয়েছে। স্নেহের অধিকারের চেয়ে বড় অধিকার আর কি হতে পারে বলুন ? সেই অধিকার আপনার ভাল মতই আছে।'

www.BDeBooks.Com

সোবাহান সাহেব হাসলেন।

আনিস বলল, আমি উঠি ?

সোবাহান সাহেব বললেন— না না বস। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। তুমি কিছু বল, আমি শুনি।

'কি বলব ?'

'যা ইচ্ছা বল। টগর নিশার মা'র কথা বল। বৌমার কথাতো জানি না। জানতে ইচ্ছে করে।'

আনিস কিছু বলল না। তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সোবাহান সাহেব বললেন, আচ্ছা থাক, ঐ প্রসঙ্গ থাক। আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

সেই নিঃশ্বাসে গাঢ় হতাশা মাখা ছিল। সোবাহান সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আনিস বলল, স্যার উঠি ?

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

'রাত বারোটার দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।'

আনিস চলে গেল। সোবাহান সাহেবের আবারো মনে হল, কি চমৎকার একটি ছেলে। শান্ত, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান। পৃথিবীতে এ রকম ছেলের সংখ্যা এত কম কেন ভেবে তাঁর একটু মন খারাপও হল।

আনিস সোবাহান সাহেবকে নিয়ে বের হয়েছে।

রাত প্রায় বারটা, রাস্তাঘাট নির্জন। আনিস বলল, স্যার আমরা কি রিকশা নেব ? না-কি হাঁটবেন ?

সোবাহান সাহেব বললেন, চল হাঁটি। হাঁটতে ভাল লাগছে। কোনদিকে আমরা যাচ্ছি ?

'কমলাপুর রেল স্টেশনের দিকে!'

'চল।'

কমলাপুর রেল স্টেশনের যে দৃশ্য সোবাহান সাহেব দেখলেন তাঁর জন্যে তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন যায়গায় শুয়ে আছে। অতি বৃদ্ধও যেমন আছে, শিশুও আছে। এই তাদের ঘর বাড়ি।

একটা মেয়ের বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চার বয়স সাতদিনও হবে না। বাচ্চটি 'উঁয়া উঁয়া' করে কাঁদছে। মা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সম্ভবত মার শরীর ভাল না। মুখ ফুলে আছে। চোখ রক্তবর্ণ।

সোবাহান সাহেব বললেন, এইসব কি দেখছি আনিস ?

'রাতের ঢাকা শহর দেখছেন।'

'আগে কখনো দেখিনি কেন ?'

'আগেও দেখেছেন— লক্ষ্য করেন নি। আমাদের বেশির ভাগ দেখাই খুব ভাসা ভাসা। দেখে একটু খারাপ লাগে, তারপর ভুলে যাই।'

'আমি ওদের কিছু সাহায্য করতে চাই।'

'অল্প কিছু টাকা পয়সায় ওদের কোন সাহায্য হবে না।'

'জানি। তবু সাহায্য করতে চাই। ঐ যে বাচ্চটা কাঁদছে তার মাকে তুমি এই একশ'টাকা দিয়ে আস।'

আনিস টাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটি টাকা রাখল কিন্তু কোন রকম উচ্ছ্বাস দেখাল না। যেন এটা তার পাওনা টাকা। অনেক দিন পর পাওয়া গেছে।

সোবাহান সাহেব বললেন, আমার আর হাঁটাহাঁটি করতে ভাল লাগছে না আনিস।

'ওদের খুঁজবেন না ?'

'না।'

রিকশায় ফেরার পথে সোবাহান সাহেব বললেন, আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না— আমাদের এই অবস্থা কেন ? চিন্তা করে দেখ জাপানিদের সঙ্গে আমাদের কত মিল— ওরাও ছোটখাট ধরনের মানুষ, আমরাও ছোটখাট। ওরা ভাত খায় আমরাও ভাত খাই। ওদের কোন খনিজ সম্পদ প্রায় নেই, আমাদেরও নেই। ওদের কৃষিযোগ্য জমি যতটুকু , আমাদের তার চেয়েও বেশি। ওদের জনসংখ্যার সমস্যা আছে, আমাদেরও আছে। অথচ ওরা আজ কোথায়, আমরা কোথায় ? আমার মনটা এত খারাপ হয়েছে যে, তোমাকে বুঝাতে পারছি না।

'আমি বুঝতে পারছি স্যার।'

'মনটা খারাপ হয়েছে। খুবই খারাপ হয়েছে।'

রাতে সোবাহান সাহেব ঘুমুতে পারল না। নতুন একটি খাতায় "ভাসমান জনগুষ্ঠি এবং আমরা" এই শিরোনামে প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করলেন। দু'লাইনের বেশি লিখতে পারলেন না। এক সঙ্গে অনেক কিছু মাথায় আসছে। কোনটা ফেলে কোনটা লিখবেন তাই বুঝতে পারছেন না।

২৩

ফরিদের এখন দিন কাটছে চিঠি লিখে। পোস্টাপিসের সামনে সে বল পয়েন্ট নিয়ে বসে। মনি অর্ডার লিখে দেয়, চিঠি লিখে দেয়। মানি অর্ডারে দু'টাকা এনভেলাপের চিঠি এক টাকা, পোস্ট কার্ড আট আনা।

ফরিদ একা নয়। খুব কম করে হলেও পনেরো বিশজন মানুষ এই করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের একটা সমিতিও আছে— 'পত্র লেখক সমিতি।' শুরুতে সমিতির লোকজন মারমুখো হয়ে ফরিদের দিকে এসেছিল। ফরিদের

www.BDeBooks.Com

চেহারা এবং স্বাস্থ্য দেখে পিছিয়ে গেছে। ফরিদ তাদের সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। বরং মধুর স্বরে বলেছে, বেআইনী কোন কাজ আমি করব না ভাইসাহেব। সমিতির সদস্য হব। চাঁদা কত বলুন ?

তারা সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় নি। বরং চোখ গরম করে বলে গেছে এই জায়গায় হবে না। অন্য জায়গা দেখেন। পুরান পাগল ভাত পায় না। নতুন পাগল।

অন্য জায়গা দেখার ব্যাপারে ফরিদ কিংবা কাদের কাউকে তেমন উৎসাহী মনে হল না। এই জায়গাই চমৎকার। কাজটাও ভাল। চিঠি লিখতে তার ভাল লাগে। চিঠি যারা লেখাতে আসে তাদের সঙ্গে অতি দ্রুত ফরিদের ভাব হয়ে যায়। ভাবের একটা নমুনা দেয়া যাক।

খালি গায়ের বুড়ো এক লোক চিঠি লিখাতে এসেছে। বুড়ো বলল— লেহেন পর সমাচার, আমি ভালই আছি।

ফরিদ বলল, পর সমাচার লিখব কেন ? পর সমাচার মানেটা কি ?

'মানেতো বাবা জানি না।'

'যার কাছে লিখছেন তার নাম কি ?'

'লতিফা।'

'আপনার কি হয় ?'

'আমার ছোট মাইয়া।'

'তাহলে এই ভাবে লিখি— মা মনি লতিফা, তুমি কেমন আছ ?'

'জ্বি আচ্ছা বাবা লেহেন। তারপর লেহেন আমি ভালই আছি তবে তোমাদের জন্য বড়ই চিন্তাযুক্ত।'

ফরিদ বলল, 'আমি একটু অন্য রকম করে লিখি ? লিখি— আমার শরীর ভালই আছে তাবে সারাক্ষণ তোমাদের জন্যে চিন্তা করি বলে মন খুব খারাপ থাকে। লিখব ?

'জ্বি জ্বি লেহেন। আপনের মত কইরা লেহেন। এই মেয়ে আমার বড় আদরের।'

'আর কি লিখব বলুন ?'

'আপনার মত কইরা লেহেন— ভাল-মন্দ মিশাইয়া।'

ফরিদ তরতর করে লিখে চলেছে। এক পৃষ্ঠার জায়গায় তিন পৃষ্ঠা হয়ে যায়। সেই চিঠি পড়ে শুনানোর পর বৃদ্ধ বলে, বড় আনন্দ পাইলাম বাবাজী। বড় আনন্দ। মনের সব কয়টি কথা লেহা হইছে।

বৃদ্ধের আনন্দ দেখে ফরিদ আনন্দ বোধ করে। তার কাস্টমারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ে। তবে তার নিয়ম হচ্ছে দিন চলার মত টাকা হয়ে গেলেই লেখালেখি বন্ধ। পার্কের কোন বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা।

এই ব্যাপারটা কাদেরের খুব অপছন্দ। সে চায় লেখালেখি রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত চলুক। মামার অকারণ আলসামী দু'চোখে বিষ। লিখলেই যখন

টাকা আসে তখন এই রকম না লিখে বেঞ্চিতে চুপচাপ শুয়ে থাকবে কেন ? ফরিদের এই বিষয়ে যুক্তি খুব পরিষ্কার যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই উপার্জন করতে হবে তার বেশি না। সাধু সন্ন্যাসীরা যে পদ্ধতিতে ভিক্ষা করতেন সেই পদ্ধতি। যেই এক বেলার মত খাবারের চাল পাওয়া গেল ওম্নি ভিক্ষা বন্ধ।

'আপনের কথার মামা কোন আগাও নাই। মাথাও নাই।'

মহা বিরক্ত হয়ে কাদের সিগারেট ধরায়। ফরিদ ভ্রু কুঁচকে তাকালেই বলে এমন কইরা চাইয়েন না মামা। অখন আপনের সামনে সিগারেট খাইলে দোষের কিছুই নাই। বাড়ির বাইরে আপনেও পাবলিক, আমিও পাবলিক।

'তুই পাবলিক ভাল কথা, আমার ঘারে বসে বসে খাচ্ছিস তোর একটু লজ্জা সরম নেই ? রোজগার পাতির চেষ্টা কর।'

'কী চেষ্টা ?'

'রিকশা চালালে কেমন হয় ? পারবি না ?'

কাদের কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, সৈয়দ বংশের পুলা হইয়া রিকশা চালামু ? আপনে কন কি ? বংশের একটা ইজ্জত আছে না ?

ফরিদ কিছু বলল না। আসলে কথাবার্তা বলার চেয়ে বেঞ্চিতে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেই তার ভাল লাগছে। নীল আকাশে সাদা মেঘের পাল । এই সৌন্দর্য এতদিন চোখের আড়ালেই ছিল। ভাগ্যিস সে পথে নেমেছিল। পথে না নামলে কি এই দৃশ্য চোখে পড়ত ? পড়ত না।

'মামা ?'

'কি '

চুপচাপ আপনের ঘাড়ে বইসা খাইতেও খারাপ লাগে। কি করি কন দেহি।'

'ভেবে কিছু একটা বের কর।'

'ছিনতাই করলে কেমন হয় মামা ?'

'কি বললি ?'

'ছিনতাই।'

'রিকশা চালানোয় আপত্তি আছে। ছিনতাই-এ আপত্তি নেই ?'

'রিকশা চালাইলে দশটা লোকে দেখব মামা। আর ছিনতাই করলে জানব কেডা ? কেউ না।'

'তুই আমার সাথে কথা বলবি না।'

'কি কইলেন মামা ?'

'বললাম যে তুই আমার সথে কথা বলবি না। No talk কথা বললে চড় খাবি।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তুই আমার সঙ্গে হোটেলে খেতেও আসবি না। চোরদের প্রতি আমার কোন মমতা নেই।'

www.BDeBooks.Com

কাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপরই হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। মনে হল বিশেষ কোন কাজে যাচ্ছে। তার প্রায় মিনিট পনেরো পরে তাকে দৌড়তে দৌড়াতে এদিকে আসতে দেখা গেল। তার হাতে নতুন একটা ব্রীফকেইস। পেছনে জনা দশেকের একটি দল। ধর ধর আওয়াজ উঠছে।

ফরিদ ধড়মড় করে উঠে বসল। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ব্যাপার কি রে ? কাদের হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দৌড় দেন মামা।

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে ফরিদ তৎক্ষণাৎ উঠে ছুটতে শুরু করল। ছুটতে ছুটতে বললেন, ব্যাপার কি রে ?

'ছিনতাই করেছি মামা।'

'সে কি ?'

'চাইয়া দেহেন নতুন ব্রীফকেইস। এখন ধরা পড়লে জানে শেষ করব। আরো শক্তে দৌড় দেন।'

ফরিদ হতভম্ব হয়ে বলল, তুই ছিনতাই করেছিস। আমি দৌড়াচ্ছি কেন ?

কাদের দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, পাবলিক বড় খারাপ জিনিস মামা। বড়ই খারাপ। এ দুনিয়ায় পাবলিকের মত খারাপ জিনিস নাই।

বিলু এবং আনিসকে স্টীমারে তুলে দিয়ে এসে সোবাহান সাহেব খবর পেলেন যে থানা থেকে টেলিফোন এসেছে। দু'জন ছিনতাইকারী ধরা পড়েছে। তারা বলছে সোবাহান সাহেব তাদের চেনেন। তিনি যদি থানায় আসেন তাহলে ভাল হয়। একটাকে দেখে মনে হচ্ছে গ্যাং লিডার—ইয়া লাস। সোবাহান সাহেব তৎক্ষণাৎ থানায় ছুটলেন। ফরিদ এবং কাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হল।

স্টীমারে প্রথম শ্রেণীর যে কামরাটা রিজার্ভ করা হয়েছে তাতে দুটি বিছানা। দু'সীটের কামরা দেখে বিলুর মুখ শুকিয়ে গেল। আনিস কি তার সঙ্গে এই কামরাতেই থাকবে ? তা কি করে হয় ? টিকিট আনিস করেছে। এই কাজটা কি ইচ্ছা করেই করা ? ভদ্রলোক কি একবারও ভাবলেন না একজন কুমারী মেয়ের সঙ্গে এক কামরায় সারারাত যাওয়া যায় না। বিলু তার বাবার উপর রাগ করল। বাবার উচিত ছিল, কিভাবে যাওয়া হচ্ছে— এই সব জিজ্ঞেস করা। তিনি তাঁর কিছুই করলেন না। তাদের স্টীমারে উঠিয়ে দিয়ে অতি দ্রুত নেমে গেলেন।

এখন বিলু কি করবে ?

আনিসকে ডেকে বলবে— আমরা দু'জনেতো একসঙ্গে যেতে পারি না। সেটা শোভন নয়। আপনি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করুন। এই কথাও বা কিভাবে বলা যায় ?

মানুষটা তো নির্বোধ নয়।

সে এমন নির্বোধের মত কাজ কিভাবে করল ? না-কি এই কাজ নির্বোধের নয়। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করা ?

স্টীমার পাঁচটায় ছাড়ার কথা, ছাড়ল সাতটায়। আনিস জিনিসপত্র রুমে ঢুকিয়ে সেই যে উধাও হয়েছে আর দেখা নেই। স্টীমারেই কোথাও আছে নিশ্চয়ই। বিলু ইচ্ছা করলেই তাকে খুঁজে বের করতে পারে। ইচ্ছা করছে না।

স্টীমারে বিলু কখনো ঘুমুতে পারে না। আজকের এই বিশেষ পরিস্থিতিতে তো ঘুমানোর প্রশ্নই উঠে না। বিলু তিন চারটা গল্পের বই বের করল। জার্নিতে একটা গল্পের বই কখনো পড়া যায় না। কিছুক্ষণ পর পর বই বদলাতে হয়— এখন যে পড়েছে রেমার্কের 'নাইট ইন লিসবন'। নাটকীয় মুহূর্তে সোর্য়াৎস জার্মানিতে তার স্ত্রীর ঘরে লুকিয়ে আছে। স্ত্রীর বড় ভাই নাৎসী পার্টির সদস্য। আগে সে একবার সোর্য়াৎসকে কনসানট্রেশান ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। আবারো ধরা পড়লে মৃত্যু ছাড়া উপায় নেই। এমন সব নাটকীয় মুহূর্ত তবুও বইয়ে মন বসছে না। চাপা এক ধরনের অস্বস্তিতে মন ঢাকা।

'খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?'

বিলু বই থেকে মুখ তুলল। আনিস দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। বিলু শুকনো গলায় বলল, জ্বিনা, এখনো খাওয়া হয়নি।

'রাত কিন্তু অনেক হয়েছে, খেয়ে নিন। দশটা পাঁচ বাজে।'

'আপনি খাবেন না ?'

'আমি খেয়ে নিয়েছি।'

'কোথায় খেলেন ? স্টীমারে ?'

'জ্বি।'

'আমি কিন্তু সঙ্গে দু'জনের মত খাবার এনেছিলাম।'

'কোন অসুবিধা নেই। আপনি খেয়ে নিন। খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে শুয়ে ঘুম দিন।'

যে চাপা অস্বস্তি বিলুকে চাড়া দিচ্ছিল তা কেটে গেল। ভাগ্যিস যে নিজ থেকে কিছু বলেনি।

বললে খুব লজ্জায় পড়তে হত।

আনিস বলল, এক বেডের কামরা ছিল না বলে দুই বেডের কামরা নিতে হয়েছে। অনেকগুলো টাকা খামাখা বেশি গেল। আপনি খাওয়া দাওয়া সেরে নিন। ওদেরেকে বলেছি এগারোটার সময় আপনাকে চা দিয়ে যাবে।

'চা ?'

'আমি একদিন লক্ষ্য করেছি রাতের খাবারের পর পর আপিনি চা খান, সেই কারণেই বলা।'

'আপনি ঘুমুবেন কোথায় ?

'ট্রেন, বাস এবং স্টীমারে আমি ঘুমুতে পারি না। প্লেনের কথা জানি না। প্লেনে কখনো চড়িনি। আমি তাহলে যাচ্ছি।'

www.BDeBooks.Com

বিলুকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আনিস চলে গেল। আর ঠিক তখন বিলুর মনে হল এই কামরায় গল্প করতে করতে দু'জন রাতটা কাটিয়ে দিতে পারত। তাতে অসুবিধা কি হত ? কিছুই না। আমরা আধুনিক হচ্ছি কিন্তু মন থেকে সংস্কারের বাঘ তাড়াতে পারছি না। কি মূল্য আছে এইসব সংস্কারের ?

বিলু চমকে উঠল, কি সব আজে বাজে কথা সে ভাবছে ? তাহলে সে কি মনের কোন গভীর গোপনে আশা করেছিল আনিস থাকবে এই ঘরে ? রাতটা কাটিয়ে দেবে গল্প করতে করতে ? ছিঃ কি লজ্জার কথা। এমন একটা গোপন বাসনা তার কি সত্যি আছে ? এই লজ্জা সে কোথায় রাখবে ? ভাগ্যিস একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের মনের গোপন জায়গাগুলো দেখতে পায় না। দেখতে পেলে পৃথিবী অচল হয়ে পড়তো।

রাতের খাবার বিলু খেতে পারল না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। টি-পটে করে চা দিয়ে গেল এগারোটার দিকে। তখন বিলুর মনে হলে দু'জন মিলে এক সঙ্গে বসে চা তো খেতে পারে। এর মধ্যে তো অন্যায় কিছু নেই। এটা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রতা। এই সাধারণ ভদ্রতাকে আনিস সাহেব নিশ্চয়ই অন্য কিছু ভেবে বসবেন না।

বিলু দরজা লক করে আনিসের খোঁজে বের হল।

আনিস দোতলায় ডেকে চাদর পেতে চুপচাপ বসেছিল। তার দৃষ্টি অন্ধকার নদীর দিকে। নদীতে টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে মাছ ধরা নৌকা বের হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রের মতো মাছধরা নৌকার আলোগুলো ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে কমছে। আনিসের দৃষ্টিতে আত্মমগ্ন একটা ভাব যা দূর থেকে দেখেতে ভাল লাগে। কি ভাবছে এই মানুষটি ? তার স্ত্রীর কথা ? কতটুকু ভালবাসতো সে তার স্ত্রীকে ? সেই রকম ভাল কি অন্য কাউকে বাসা যায় না ? না-কি এক জীবনে মানুষ একজনকেই ভালবাসতে পারে ?

আচ্ছা সে যদি এখন আনিসের পাশে গিয়ে বসে তাহলে তা কি খুব অশোভন হবে ? সে-কি বসবে তার পাশে ? হালকা গলায় বলবে আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। আপনি কি ভাবছেন ?

আনিস সাহেব নিশ্চয় লজ্জা পাওয়া গলায় বলবেন, কিছু ভাবছি নাতো। সে বলবে, কি দেখছেন ? তিনি বলবেন, কিছু দেখছি না, তাকিয়ে আছি। সে বলবে, আপনাদের এদিকে খুব হাওয়াতো।

ভেবে রাখা কথাবার্তা কিছুই হলো না। আনিস এক সময় হঠাৎ লক্ষ্য করল বিলু দাঁড়িয়ে। সে উঠে এল। বিলু বলল, আপনার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে একটু উঠে আসুনতো। আনিস উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কোন সমস্যা হয়েছে না-কি ?'

'হ্যাঁ সমস্যা হয়েছে।'

'কি সমস্যা ?'

'কেবিনে আসুন তারপর বলব।'

স্টীমারে কেবিনে দু'জন মুখোমুখি বসল। বিলু বলল, আগে চা শেষ করুন তাপর বলছি। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে কি-না কে জানে; অনেকক্ষণ আগে দিয়ে গেছে।

আনিস নিঃশব্দে চা শেষ করল। বিলুর আচার-আচরণ ,ভাবভঙ্গি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তাকে খানিকটা বিভ্রান্ত, খানিকটা উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বারবার শাড়ির আঁচলে সে কপাল মুছছে। আনিস বলল, ব্যাপার কি বলুন তো ?

'বলছি। ব্যাপার কিছু না। আপনাকে চা খাবার জন্যে ডেকেছি। না-কি এক কেবিনে আমার সঙ্গে বসে চা খেতে আপনার আপত্তি আছে ?'

আনিস বিস্মিত হয়ে বলল, আপত্তি থাকবে কেন ?

'আমাকে এখানে রেখে হুট কর পালিয়ে গেলেন সেই জন্যে বলছি।'

আনিস নিজেও এবার খানিকটা বিভ্রান্ত হল। এই মেয়েটি এ রকম কেন ?

বিলু বলল, চুপ করে বসে আছেন কেন ? গল্প করুন।

'কি গল্প করব ?'

'আপনার স্ত্রীর কথা বলুন।'

'তার কোন কথা ?'

'আচ্ছা তাকে কি আপনি খুব ভালবাসতেন।'

'এখনো বাসি।'

'খুব বেশি ?'

'হ্যাঁ খুব বেশি।'

'আচ্ছা আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকতো তাহলে আপনি কি আপনার স্ত্রীর জন্যে তাজমহল জাতীয় কিছু বানাতেন ?'

'না।'

'না কেন ?'

'ভালবাসা খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঢাক ঢোল পিটিয়ে তার প্রচার করার কোন কারণ দেখি না।'

'আচ্ছা আপনাদের বিয়ে কিভাবে হয় ?'

'কোর্টে হয়। ওর বাবা মা আমার মত ভ্যাগবন্ডের কাছে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। এদিকে ও নিজেও খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল কাজেই....

'আপনি কিছু মনে করবেন না একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি— 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই বাক্যটা আপনাদের দু'জনের মধ্যে কে প্রথম ব্যবহার করল ?'

'আমার স্ত্রী।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। বিয়ের প্রসঙ্গ কে প্রথম তুলল, আপনি না উনি ?'

'সেই তুলল! সে খুব লাজুক ধরনের মেয়ে ছিল কিন্তু নিজের কথা বলার ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি।'

বিলু আবারো শাড়ির আঁচল দিয়ে কপাল ঘসল। উদ্বিগ্ন চোখে এদিক ওদিক তাকাল তার পরপরই আনিসকে সম্পূর্ণ হতচকিত করে বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি এবং আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক এটা আমি মনেপ্রাণে চাই। এই

www.BDeBooks.Com

কথাগুলো অনেকদিন আমার মনের মধ্যে ছিল বলতে না পেরে কষ্ট পাচ্ছিলাম। আজ বলে ফেললাম। আপনি যদি আমাকে বেহায়া ভাবেন তাতেও আমার কিছু যায় আসে না।

আনিস কিছুই বলল না।

অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। এত বিস্মিত সে এর আগে কখনো হয় নি।

বিলু মাথা নিচু করে বলল, আপনি যদি এখন চলে যেতে চান চলে যেতে পারেন। আর যদি চান আমরা দু'জনে মিলে সারা রাত গল্প করি তাও করতে পারেন।

আনিস দেখল বিলুর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। এই কারণেই সে মাথা নিচু করে বসে আছে।

আনিস বলল, বিলু তোমার কি দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরিশালে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তাহলে বরিশালে নেমেই আমরা যে কাজটা করব তা হচ্ছে ঐ দু'জনকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্টারের কাছে যাব। কি বল?'

'আচ্ছা।'

'আমার মত অবস্থায় লোকজনকে জানিয়ে পাগড়ি টাগড়ি পরে বিয়ে করার অর্থ হয় না। এইবার তুমি চোখ মুছে আমার দিকে তাকাও তো। কাঁদবার মত কিছু হয় নি। আমার মত একজন অভাজনের জন্যে তোমার মত একটা মেয়ে কাঁদবে তা হতেই পারে না। তাকাও আমার দিকে।'

'না আমি তাকাতে-টাকাতে পারব না।'

বিলু বলল, তাকাতে পারবে না কিন্তু জলভরা চোখে তাকাল। এই কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে বিলুকে কি সুন্দর যে দেখাল তা সে কোনদিন জানবে না।

২৪

সোবাহান সাহেব বারান্দায় বসে আছেন। তার কোলে মোটা একটা খাতা, যে খাতায় গৃহহীন মানুষদের দুঃখ গাঁথা এবং তার দূরীকরণের নানান পদ্ধতি নিয়ে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছেন। এখন অবশ্যি লিখছেন না। এখন ভাবছেন, তবে খাতা খোলা। মাঝে মাঝে চোখ বুলাচ্ছেন। ফরিদ এসে গম্ভীর মুখে পাশে দাঁড়াল। হাজত থেকে বের হয়ে এই প্রথম সে দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে। সোবাহান সাহেব বললেন, কিছু বলবে?

'জ্বি।'

'কোন প্রসঙ্গে?'

'ছিনতাই প্রসঙ্গে। দুলাভাই আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে ঐ দিনের ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত।'

সোবাহান সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি। তোমার প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।

'আপনাকে কথা বলতে হবে না। আমি কথা বলব। আপনি শুনবেন।'

'আমি কিছু শুনতেও চাচ্ছি না।

'ও আচ্ছা।'

ফরিদ বিমর্ষ মুখে ঘরে ভেতর ঢুকল। মিলির সঙ্গে দেখা হল। সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। এখন তাকে কিছু বললেই সে বলবে, মামা আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি। হাতে একদম সময় নেই। অদ্ভুত এই বাঙালি জাতি। হাতে কোন কাজ নেই তবু সারাক্ষণ ব্যস্ত ভঙ্গি। এই ভঙ্গিটা বাঙালি জাতি কোথায় শিখল কে জানে।

'মিলি।'

'জ্বি মামা।'

'খুব ব্যস্ত?'

'জ্বি না।'

'তাহলে তোর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি ঐ ছিনতাইটা প্রসঙ্গে। তোদের সবার হয়ত ধারণা হয়েছে ঐ দিনকার ঘটনার পেছনে আমার হাত আছে। আসলে তা নেই। ব্যাপারটা হল কি...

'মামা আমার তো এখন ক্লাস আছে। ক্লাসে যাচ্ছি।'

'তবে যে বললি— তুই ব্যস্ত না।'

'ব্যস্ত না তা ঠিক, ক্লাস আছে তাও ঠিক।'

'ও আচ্ছা তুই তাহলে আমার কথা শোনায় আগ্রহী না?'

'তুই ঠিকই ধরেছ মামা।'

'ঐদিনকার ঘটনার মূল নায়ক কাদেরকে আমি শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'খুব ভাল করেছো মামা। শাস্তি দাও। আমি এখন যাই?'

'কি শাস্তি দিচ্ছি সেটা শুনে যা। তোর ইউনিভার্সিটিতো পালিয়ে যাচ্ছে না। এক মিনিট লাগবে। আমি অবশ্যি চেষ্টা করব-তোর চেয়েও কম সময়ে কাজ সারতে। ধর পাঁচ পঞ্চাশ সেকেন্ড।'

'বল কি বলবে।'

'কাদেরকে মানসিক শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কঠিন মানসিক শাস্তি। তার গলায় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সেখানে লেখা থাকবে— " আমি চোর"। এই অপমান সূচক বিজ্ঞাপন গলায় ঝুলিয়ে সে এক লক্ষ বার কানে ধরে উঠবে এবং বসবে। প্রতি উঠবোসের সময় উঁচু গলায় বলবে "আমি চোর"।

'বাহ্ চমৎকার শাস্তি।'

'এখানেও শেষ না। প্রতি রাতে তাকে একটা করে শিক্ষামূলক ছবি দেখানো হবে। এটা করা হবে আত্মশুদ্ধির জন্যে।'

'এখন যাই মামা? তোমার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে।'

www.BDeBooks.Com

'শেষ হয়নি।'

'সময়তো শেষ হয়ে গেছে। এক মিনিট চেয়েছিলে, তুমি কথা বলেছ এক মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড। তেত্রিশ সেকেন্ড বেশি নিয়ে নিয়েছ। খোদা হাফেজ।'

মিলি আর দাঁড়ালো না। চট করে চলে এলো বারান্দায়। বারান্দায় পা দিয়েই খানিকটা শংকিত বোধ করল— বাবার হাতে খাতাপত্র। চট করে বলে বসতে পারেন— মা একটু শুনতো কি লিখলাম। মিলি অবশ্যই বলতে পারে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি কিছু শুনতে পারব না। কিন্তু বলা সম্ভব না। কারণ সে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে মনসুরের কাছে। বাবার কাছে মিথ্যা বলা সম্ভব না। মিথ্যা কথাগুলো এই মানুষটার সামনে এলেই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

সোবাহান সাহেব মিলির দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিস ? মিলি হ্যাঁ না কিছুই বলল না। মধুর ভঙ্গিতে হাসল। সোবাহান সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন, দু'দিন হয়ে গেল অথচ আনিস আসছে না। ব্যাপারটা কি বলতো ?'

দু' এক দিন থেকে, দেখে টেখে আসছে আর কি ?'

'তবু চিন্তা লাগেছে। আজ না এলে মনে করিস তো— মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রারের বাসায় একটা টেলিফোন করব।'

'আচ্ছা।'

'তুই যাচ্ছিস কোথায় ?'

'মনসুর সাহেবের ফার্মেসিতে যাচ্ছি বাবা।'

'যাচ্ছিস যখন ওকে বলিস আমার সঙ্গে দেখা করতে। জরুরি দরকার আছে।'

'কি দরকার বাবা ?'

'এমদাদ সাহেব তাঁর নাতনীকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। তাঁর ধারণা আমি বললেই হয়। ভদ্রলোকের যখন এত শখ বলে দেখি।'

'বললে লাভ হবে না বাবা। উনি কিছুতেই পুতুলকে বিয়ে করতে রাজি হবেন না।'

'রাজি হবে না কেন ? পুতুল মেয়েটাতো বড়ই ভাল। দেখতেও সুন্দর। মেয়েটা গরিব। গরিব হওয়াতো দোষের কিছু না। আমি বুঝিয়ে বললেই রাজি হবে।'

মিলি কিছু বলল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, সামান্য মুখের কথায় যদি মেয়েটার একটা গতি হয় তো মন্দ কি ?

'কিছু বলার দরকার নেই বাবা।'

'দরকার নেই কেন তুই আমাকে বুঝিয়ে বল।'

'শেষে রাজি হবে না। মাঝখান থেকে তুমি লজ্জা পাবে।'

'লজ্জার কি আছে ? লজ্জার কিছুই নেই। তাছাড়া আমার ধারণা সে রাজি হবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যদি মনে কর সে রাজি হবে তাহলে বলে দেখ।'

'তুই হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন তাওতো বুঝলাম না।'

মিলি কিছু না বলেই নিচে নেমে গেল। তার মন বেশ খারাপ হয়েছে।

মন আরো খারাপ হল যখন ডাক্তারকে ফার্মেসীতে পাওয়া গেল না। মিলি ঘণ্টা খানিক অপেক্ষা করে একটা চিঠি লিখে এল।

ডাক্তার সাহেব,

আপনাকে না পেয়ে চলে যাচ্ছি। একবার বাসায় আসবেন। বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। তবে দয়া করে বাবার সঙ্গে কথা বলার আগে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। খুব জরুরি।

বিনীতা, মিলি।

মিলি বাসায় ফিরে দেখে কাদেরের শাস্তি পর্ব শুরু হয়েছে। তার গলায় সাইনবোর্ড 'আমি চোর'। সে মহানন্দে উঠবোস করছে। ফরিদ উঠবোসের হিসাব রাখছে। প্রতি পঞ্চাশবার উঠবোসের পর দশ মিনিট বিরতি। মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এইসব ছেলে মানুষির কোন মানে হয়? কিন্তু মামাকে এই কথা কে বুঝাবে? এই বাড়ির সব মানুষ এমন পাগল ধরনের কেন?

মিলি মন খারাপ করে নিজের ঘরে ঢুকল। কেন জানি কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ঘর সংসার সবে ফেলে কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে তার এরকম হয়। ক'দিন ধরে ঘন ঘন হচ্ছে। রহিমার মা ঘরে ঢুকল। তার মুখ ভর্তি হাসি। কাদেরের শাস্তিতে সে বড়ই আনন্দ বোধ করছে।

'আফা আপনেরে বুলায়।'

'কে বুলায়?'

'টগরের আব্বা।'

উনি এসেছেন?'

'হ।'

'তুমি গিয়ে বল এখন যেতে পারব না। পরে এক সময় যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা শোন, ডাক্তার সাহেব এলেই তুমি আমাকে খবর দেবে।'

রহিমার মা ফিক করে হেসেই সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

মিলি তিক্ত গলায় বলল, হাসলে কেন রহিমার মা?

'বুড়ো হইছি তো আফা, মাথার নাই ঠিক। বিনা কারণে হাসি পায় আবার চউক্ষে পানি আয়!'

'ঠিক আছে তুমি যাও।'

রহিমার মা আবার ফিক করে হাসল। তার বড় মজা লাগছে। চোখের সামনে ভাব ভালবাসা দেখতে ভাল লাগে। সে ফরিদের ঘরের দিকে রওয়ানা হল। কাদেরের শাস্তি আরো খানিকক্ষণ দেখা যাক। কাউকে শাস্তি পেতে দেখলেও মন ভাল হয়। কেন হয় কে জানে।

www.BDeBooks.Com

দশ মিনিট শাস্তির পর এখন বিরতি চলেছে। বিমর্ষ মুখে এমদাদ বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরেই সে একটা কথা বলতে চাচ্ছিল। সুযোগের অভাবে বলতে পারছিল না। এখন সুযোগ পাওয়ায় মুখ খুলল।

'ভাইজান একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'এই শাস্তিতে চোরের কিছু হয় না। চোরের আসল শাস্তি হইল মাইর।'

ফরিদ বলল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এ আপনি বুঝবেন না।

'ছোট্ট একটা পরামর্শ দেই ভাইজান ? রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছা।'

'দিন পরামর্শ।'

'দুই হাতে দশটা দশটা কইরা ইট দিয়া রইদে খাড়া করাইয়া দেন, ইট হাতে লইয়া উঠ বোস।'

'আপনার পরামর্শ শুনলাম। দয়া করে আর কথা বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

২৫

তিন তারিখটা মনসুরের জন্যে খুব শুভ।

মিলির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তিন তারিখে। প্রথম যেদিন মিলি তাকে ডাক্তার হিসেবে তাদের বাড়িতে ডাকে ঐ দিনও ছিল তিন তারিখ। নিউম্যারোলজি এই সংখ্যাটি সম্পর্কে কি বলে সে জানে না— তবে কিছু নিশ্চয়ই বলে।

আজ হচ্ছে তিন তারিখ।

সকাল থেকেই মনসুরের মনে হচ্ছিল আজ তার জীবনে বড় কোন ঘটনা ঘটবে। সকালে দাঁত মাজতে মাজতে লক্ষ্য করল দুটি শালিক কিচিরমিচির করেছে। খুবই শুভ লক্ষণ, দুই শালিক মানেই হচ্ছে আনন্দ। আনন্দময় কিছু আজ ঘটবেই। দিনটাও চমৎকার। আকাশ ঘন নীল। বাতাসও কেমন জানি মধুর।

মনসুর নাস্তা খেয়েই মিলিদের বাড়ির দিকে রওয়া হল। সাত সকালে ঐ বাড়িতে উপস্থিত হবার জন্যে কোন একটা অজুহাত দরকার। সেই অজুহাতও তৈরি করা হয়েছে। মনসুর গিয়ে বলবে কয়েক দিনের জন্যে দেশের বাড়িতে যাবার আগে দেখা করতে এলাম ইত্যাদি।

নিরিবিলি বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢোকার সময়ও আরেকটি সুলক্ষণ দেখা গেল। আবারো দুটি শালিক। আনন্দে মনসুরের বুক টিপটিপ করতে লাগল। সে মনস্থির করে ফেলল, যে করেই হোক মিলিকে সেই বিশেষ বাক্যটি বলবে। দরকার হলে চোখ বন্ধ করে বলবে— আমি তোমাকে ভালবাসি। তবে বলার আগে দেখে নিতে হবে কথাগুলো মিলিকেই বলা হচ্ছে, অন্য কাউকে না। রং নাম্বার না হয়ে যায়।

সোবাহান সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তামাক টানছিলেন।

ডাক্তাকে দেখে হাসি মুখে বললেন, কেমন আছ ডাক্তার ?

'স্যার ভাল আছি।'

'অনেক দিন আস না এদিকে।'

'খুব ব্যস্ত থাকি আসা হয়ে উঠে না।'

'তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। বস এখানে।'

মনসুর বসল। তার বুক ধক ধক করছে। কি সেই জরুরি কথা ?

প্রবন্ধ পড়ে শুনাবেন নাতো ? এছাড়া আর কি জরুরি বিষয় থাকতে পারে ? আজও যদি প্রবন্ধ শুনতে হয় তাহলে সাড়ে সর্বনাশ। শালিক দুটি এখনো ঘুরছে। লক্ষণ শুভ। একটি যদি উড়ে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে প্রবন্ধ শুনতে হবে। এখনো উড়ছে না।

'ডাক্তার!'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে যে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি তা কি তুমি জান ?'

মনসুরের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। কথাবার্তা কোন দিকে এগুচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। তার তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে।

'আমি চাই ভাল একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। সুখী হবার জন্যে ভাল একটি মেয়ের পাশে থাকা দরকার।'

মনসুরের হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। কি পরম সৌভাগ্য। স্বপ্ন নাতো আবার ? না স্বপ্ন বোধ হয় না। স্বপ্নে ঘ্রাণ পাওয়া যায় না— এইতো তামাকের কড়া গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

'আমি তোমার বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি। বলতে পারি তো ?'

'অবশ্যই পারেন, অবশ্যই।'

'প্রস্তাবটি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলেই আমি মনে করি। কারণ আমি শুনেছি মেয়েটিকে তুমি পছন্দ কর।'

এসব ক্ষেত্রে চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। মনসুর তা পারল না। মনের উত্তেজনায় বলে ফেলল— স্যার আপনি ঠিকই শুনেছেন।

'বিয়ের ব্যাপারে তোমার তাহলে আপত্তি নেই ?'

জ্বি না।'

'এদেশের ছেলেদের একটি প্রবণতা হচ্ছে বিয়ের পর স্ত্রীকে অবহেলা করা— আশা করি তুমি তা করবে না।'

'অবশ্যই না।'

'স্ত্রীর পড়াশোনার দিকটিও দেখবে। যেন তাকে পড়াশোনা ছাড়তে না হয়।'

'কোন দিন ছাড়তে হবে না।'

'তোমার কথায় খুশী হলাম। তুমি বস আমি এমদাদ সাহেবকে খবরটা দেই। ভদ্রলোক খুশী হবেন। নাতনীকে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছিলেন। মেয়েটি ভাল। তুমি সুখী হবে।'

www.BDeBooks.Com

মনসুরের মুখ থেকে 'কু কু' জাতীয় শব্দ হল। আদি মানুষ গাছের ডালে বসে এই রকম শব্দেই মনের ভাব প্রকাশ করত। প্রাথমিক ধাক্কাটা এই শব্দের উপর দিয়েই গেল। তারপর খুব ঘাম হতে লাগল। সোবাহান সাহেব দ্বিতীয়বার বললেন, তুমি বস আমি সংবাদটা এমদাদ সাহেবকে দিয়ে আসি। উনি খুশী হবেন। মনসুর কিছু বলল না। তার ইচ্ছা করল ছুটে পালিয়ে যেতে তাও সে পারছে না। মনে হচ্ছে পেরেক দিয়ে কেউ তাকে চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে।

ডাক্তার পুতুলকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে এই সংবাদ মিলি শুনল এমদাদ সাহেবের কাছে। ডাক্তারকে সে চিঠি লিখে এসেছিল। গাধা ডাক্তার কি চিঠি পড়েনি ? মিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার রাজি হয়েছে ?

'ষোল আনার উপরে দুই আনা, আঠারো আনা রাজি।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'সত্যি কথা বলতেছি ভইন। আইজ হইল মঙ্গলবার সত্য দিবস। সত্য দিবসে মিথ্যা বলি ক্যামনে ? এখন তুমি ভইন পুতুলরে একটু সাজায়ে দেও।'

'এখন সাজিয়ে দিতে হবে কেন ?'

'ডাক্তার বইসা আছে। পুতুলরে নিয়া ঘুরা ফিরা করবে। একটু রং ঢং আর কি ? এতে দোষের কিছু নাই। দু'দিন পরে বিবাহ। বিবাহ না হইলে অন্য কথা ছিল। ভইন একটা ভাল দেইখ্যা শাড়ি পরায়ে দেও। লাল রঙ্গে পুতুলরে মানায় ভাল।'

ডাক্তার যতটা হতভম্ব হয়েছিল। মিলি তারচে বেশি হতভম্ব হল। তার চোখ জ্বালা করছে। গলার কাছে কি যেন আটকে আছে। নিজেকে সামলাতে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। বাথরুমে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ হাউমাউ করে কাঁদতে পারলে ভাল লাগত। কাঁদতেও ইচ্ছা করছে না। ইচ্ছা করছে ইট ভাঙা মুগুর দিয়ে ডাক্তারের মাথায় প্রচণ্ড একটা বারি দিতে।

এমদাদ বলল, তাড়াতাড়ি কর ভইন। পুতুলের মুখে পাউডার একটু বেশি কইরা দিবা। মাইয়া আবার শ্যামলা ধাঁচের। পাউডার ছাড়া এই মাইয়ার গতি নাই।

'পুতুলকে পাঠিয়ে দিন আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।'

'এক্ষণ পাঠাইতেছি।'

'ডাক্তার তাহলে পুতুলকে নিয়ে বেড়াবার জন্যে বসে আছে ?'

এমদাদ হাসিমুখে মাথা নাড়ল।

ব্যাপারটা সত্যি নয়। ডাক্তার বসে আছে কারণ এমদাদ তাকে বলেছে— একটু বস, তোমার সাথে সোবাহান সাহেবের জরুরি কথা আছে। ডাক্তার বসে আছে জরুরি কথা শোনার জন্যে।

এমদাদ পুতুলকে সাজিয়ে ডাক্তারের সামনে উপস্থিত করল। হাসিমুখে বলল, সোবাহান সাহেব বলছেন পুতুলকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখাইয়া আনতে। এতে তোমাদের পরিচয়টা ভালো হইব। বিবাহের আগে পরিচয়ের দরকার আছে। আমাদের সময় দরকার ছিল না কিন্তু এখন যুগ ভিন্ন। যে যুগের যে বাতাস।

মনসুর যন্ত্রের মত উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল গেটের দিকে। পুতুল তাকে অনুসরণ করল। পুতুলের মুখ হাসি হাসি। তাকে দেখাচ্ছেও চমৎকার। চাপা আনন্দে তা চোখ চিকমিক করছে। মনসুর বলল, 'তুমি চিড়িয়াখানায় যেতে চাও?'

'জ্বি চাই।'

মনসুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। পুতুল বলল, আপনার যেতে ইচ্ছা না করলে যাওয়া লাগবে না।

মনসুর ইতস্তত করে বলল, একটা সমস্যা হয়ে গেছে পুতুল।

পুতুল বলল, আমি জানি।

হতচকিত ডাক্তার বলল, 'তুমি জান?'

'জানব না কেন? আমিতো বোকা না। আমি সবই জানি।'

'কি জান?'

'আমি জানি যে দাদাজানের কথার প্যাচে আপনি রাজি হয়েছেন। আসলে আপনি রাজি না।'

'কি করে বুঝলে?'

পুতুল মুখ নিচু করে বলল, 'আপনি যে এই বাড়িতে মিলি আপারে দেখার জন্য আসেন সেটাতো সবাই জানে।'

'ও আচ্ছা।'

মনসুরের বুকের উপর চেপে থাকা আধমণি পাথর সরে গেল। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। দুই শালিক দেখা তাহলে পুরোপরি বৃথা হয়নি। বড় ভাল লাগল পুতুলকে। চমৎকার মেয়ে। মেয়েটা যে এত চমৎকার তা আগে বোঝা যায় নি।

'পুতুল। চল চিড়িয়াখানায় যাই।'

'কেন?'

'কারণ তুমি খুব ভাল একটা মেয়ে। আচ্ছা পুতুল তুমি যে খুব ভাল মেয়ে তা কি তুমি জান?'

পুতুল হাসতে হাসতে বলল, জানি।

পুতুলের এই কথায়ও ডাক্তার বিস্মিত হল। পুতুলকে সে লাজুক ধরনের গ্রাম্য বালিকা হিসেবেই ধরে নিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সে মোটেই লাজুক নয়। কথাও বলছে চমৎকার ভঙ্গিতে।

'পুতুল।'

'জ্বি।'

'দুপুরে আজ আমরা কোন একটা হোটেল খাব। বিকেলে মহিলা সমিতিতে নাটক দেখব। তোমাকে বাসায় দিয়ে আসব অনেক রাতে।'

'কেন?'

'তোমার দাদাজানকে আমি দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দিতে চাই। তাছাড়া তোমার সাথে আমি আলোচনাও করতে চাই।

www.BDeBooks.Com

'কি আলোচনা ?'

'এই জট থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা।'

বলতে বলতে কি মনে করে যেন মনসুর হেসে ফেলল। সেই হাসি দেখে হাসতে লাগল পুতুল। অনেকদিন সে অকারণে এমন করে হাসেনি। তারা লক্ষ্য করল না যে তাদের অকারণ হাসাহাসি এবং রিকশায় পাশাপাশি বসার পুরো দৃশ্যটি গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে দু'জন। গেটের ফাঁক দিয়ে এমদাদ খোন্দকার এবং দোতলার ছাদ থেকে মিলি। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে এমদাদ খোন্দকারের মুখ চাপা হাসিতে ভরে গেল। মিলির চোখ ভরে গেল জলে। অনেক চেষ্টা করেও সে সেই জল সামলাতে পারল না।

আনিস তার লেখা নিয়ে বসেছিল। নিশা তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, মিলি খালা কাঁদছে। ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বাবা বড়দের কি কাঁদা উচিত ?

আনিস বলল, না উচিত না। তবে মাঝে মাঝে বড়রাও কাঁদে। বড়দের জীবনেও দুঃখ-কষ্ট আসে।

'আমি কি উনাকে জিজ্ঞেস করব কেন কাঁদছে ?'

'না, তা ঠিক হবে না। ছোটরা কাঁদলে জিজ্ঞেস করা যায়। বড়দের যায় না।'

'উনাকে কাঁদতে দেখে আমারো কাঁদতে ইচ্ছা করছে বাবা।'

'কাঁদতে ইচ্ছা করলে কাঁদ।'

'শব্দ করে কাঁদবো না আস্তে আস্তে কাঁদবো ?'

'আমার মনে হয় নিঃশব্দে কাঁদাই ভাল হবে।'

নিশা বিছানায় চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

আনিস ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। আজ অনেকদিন পর সে তার লেখার খাতা নিয়ে বসছে। লেখায় মন বসছে না। এক ঘণ্টায় মাত্র দশ লাইন লেখা হয়েছে। এই দশ লাইনে 'তারপর' শব্দটা তিনবার। তার লেখালেখির ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কি-না কে জানে। হয়ত যাচ্ছে। আনিস প্রাণপণে চেষ্টা করছে মন লাগাতে— অভ্যেসটা যেন পুরোপরি চলে না যায়।

নিশা চোখ মুছে বলল, কি করছ বাবা ?

'লিখছি।'

'গল্প ?'

'হুঁ।'

'বড়দের না ছোটদের ?'

'লেখার মধ্যে বড়দের ছোটদের কিছু নেই মা। লেখা সবার জন্যে।'

নিশা মাথা নেড়ে বলল, বড়দের লেখায় প্রেম থাকে। ছোটদের লেখায় থাকে না। তুমি আসলে কিছু জান না।

আনিস এই প্রসঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে যাবে ঠিক করেও মনের ভুলে জিজ্ঞেস করে ফেলল— প্রেম কি মা ?

নিশা মিষ্টি করে হাসল। তার হাসি দেখে মনে হল প্রেম কি তা সে জানে তাবে এই বিষয়ে বাবাকে কিছু বলবে না। আনিস গল্প লেখা বন্ধ করে চিঠি লিখতে বসল। খুব চমৎকার করে বিলুকে এটা চিঠি লিখতে হবে। খুব দীর্ঘ চিঠি না। সংক্ষিপ্ত চিঠি— বিলু তুমি চলে এস। চলে এস, চলে এস, চলে এস।

ফরিদ দুপুরে খাওয়া শেষ করে দিবানিদ্রার আয়োজন করছে এমন সময় তার ডাক পড়ল। সোবাহান সাহেব জরুরি তলব পাঠিয়েছেন। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। দুলাভাইয়ের এমন কোন জরুরি কথা তার সঙ্গে থাকতে পারে না যার জন্যে দুপুরের ঘুম বাদ দিতে হবে। ট্রপিক্যাল কান্ট্রির মানুষদের জন্যে দুপুরের ঘুম যে কত দরকারী তা কাউকে বুঝানো যাচ্ছে না।

'কি ব্যাপার দুলাভাই ?'

'বস ফরিদ।'

'অফিস খুলে বসেছেন মনে হচ্ছে। কাগজ পত্রের ছড়াছড়ি।'

সোবাহান সাহেব কিছু বললেন না। নতুন একটা ফাইল খুললেন। কাগজপত্রের স্তূপের সঙ্গে আরো কিছু কাগজপত্র যোগ হল। ফরিদ আতংকিত স্বরে বলল, কিছু পড়ে শোনানোর মতলব করছেন নাতো ? আপনার মহৎ কোন রচনা পড়বার বা শুনবার তেমন আগ্রহবোধ করছি না। আশা করি এই সত্য কথাটা বলে ফেলার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

'তোমাকে কিছু পড়ে শোনাব না।'

'ধন্যবাদ।'

'তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি তা বলার জন্যে কিছু ভূমিকা প্রয়োজন।'

'ভূমিকা বাদ দিয়ে মূল প্রসঙ্গে চলে এলে ভাল হয়। আমার ঘুমের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমুতে না গেলে আর ঘুম আসবে না। ঘুম ব্যাপারটা মানব জীবনের একটা আনসলভডমিস্ট্রি।'

সোবাহান সাহেব ফরিদের দিকে একটা সবুজ মলাটের ফাইল এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এটা পড়। মন দিয়ে পড়।

'কিছু পড়তে পারব না দুলাভাই। মন দিয়ে পড়ারতো প্রশ্নই আসে না। কি বলতে চান সংক্ষেপে বলে ফেলুন।'

'ফরিদ, পরতে না চাইলেও এটা তোমার ফাইল। তোমার সঙ্গেই থাকবে। এতদিন আমি হেফাজতে রেখেছি।

'এতদিন যখন রেখেছেন এখনো রাখেন। আমার পক্ষে ফাইল রাখা সম্ভব নয়। একটা ফাইলে আমার যাবতীয় পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং মার্কশীট রেখেছিলাম।

www.BDeBooks.Com

গত চার বছর ধরে ফাইল মিসিং। আমও গেছে ছালাও গেছে। সার্টিফিকেট গেছে যাক। ফাইলটার জন্যে আফসোস হচ্ছে। সুন্দর ফাইল ছিল।'

সোবাহান সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। প্রচণ্ড ধমক দিতে যাচ্ছিলেন নিজেকে সামলে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অতি জরুরি একটা কাজ করবেন—মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা দরকার। সোবাহান সাহেবের শ্বশুর ফরিদের বাবা বেশ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। জামাইকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন টাকাটা যেন গচ্ছিত থাকে। যদি কোন দিন মনে হয় ফরিদের মাথা ঠিক হয়েছে তাহলেই টাকাটা তাকে দেয়া যাবে। সেই টাকা ব্যাংকের নিরাপদ আশ্রয়ে বেড়ে বেড়ে হুলুস্থুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরিদের মাথা ঠিক হয়েছে এ রকম কোন ধারণা সোবাহান সাহেবের হয়নি। তবু তিনি টাকাটা দিয়ে দিতে চান। সে করুক তার যা করতে মন চায়।

'ফরিদ।'

'জ্বি দুলাভাই।'

'পড়।'

ফরিদ নিতান্ত অনিচ্ছায় পড়ল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এখনো সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। কোন লেখাই সে দ্বিতীয়বার পড়ে না। এই লেখাগুলো তাকে দ্বিতীয়বার পড়তে দেখা গেল।

'দুলাভাই, এতো কেলেংকারিয়াস ব্যাপার।'

সোবাহান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, কোলেংকারিয়াস ব্যাপার মানে ?

'একটা স্ল্যাং ব্যবহার করলাম। স্ল্যাংটার মানে হচ্ছে দারুণ ব্যাপার। এই টাকাটা কি সত্যি আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন ?'

'হু'।

'আমি যা ইচ্ছা তা করতে পারি ?'

সোবাহান সাহেব কিছু বললেন না। ফরিদ চিন্তিত গলায় বলল, এত টাকা দিয়ে কি করব তাইতো বুঝতে পারছি না। আপনি বরং অর্ধেক রেখে দিন—নো প্রবলেম।

'তুমি এখন আমার ঘরে থেকে বিদেয় হও।'

'বিদেয় হতে বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'টাকার পরিমাণ এখানে কি ঠিকঠাক লেখা ? মানে দশমিকের ফোটা এদিক ওদিক হয়নিতো ?"

না। তুমি বহিস্কার হও।'

'হচ্ছি। কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হয়ে গেল দুলাভাই। আশা করছি ব্যাপারটা স্বপ্ন হলে যখন ঘুম ভাংবে তখন দারুণ একটা শক পাব।'

ফরিদ ঘর থেকে বের হল। প্রথমেই দেখা রহিমার মার সঙ্গে। ফরিদ হাসি মুখে বলল, কেমন আছ রহিমার মা ?

'জ্বি মামা ভাল।'

'আমার কাছে তোমার যদি কিছু চাওয়ার থাকে চাইতে পার। আজ যা চাইবে— তাই পাবে। Sky is the limit কি চাও ?

রহিমার মা বেশ কিছু সময় ভেবে বলল, পাঁচটা টাকা দেন মামা। ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষের আশা-আকাঙক্ষা কত সীমিত। যা ইচ্ছা তাই চাইতে বলা হয়েছে। সে চেয়েছে পাঁচটা টাকা। বড় কিছু চিন্তা করার মত অবস্থাও এদের নেই। সব চিন্তা ক্ষুদ্র চিন্তা। অভাব অনটন মানুষের কল্পনাশক্তিকেও সম্ভবত খর্ব করে।

এই নাও পাঁচ টাকা। তুমি যে কত বড় ভুল করলে তুমি জান না রহিমার মা। যা চাইতে তাই পাইতে— Sky is the limit.

রহিমার মা দাঁত বের করে হাসল। হাসি না থামিয়েই বলল, তাইলে মামা আরো পাঁচটা টাকা দেন।

ফরিদ আরেকটা পাঁচ টাকার নোট বের করল। রহিমার মা'র মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল।

বসার ঘরে শুকনো মুখে মিলি বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার উপর দিয়ে বড় ধরনের একটা ঝড় বয়ে গেছে। ফরিদ যখন বলল, তুই আমার কাছে কি চাস মিলি ? যা কিছু চাইবার তাড়াতাড়ি চেয়ে ফেল— টাইম নেই।

মিলি কঠিন গলায় বলল, তুমি মামা বড় বিরক্ত কর। এখন যাও।

'কিছু চাইবি না ?'

'না।'

'এই সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে না Once in a life time.

'প্লীজ যাওতো! প্লীজ।'

'যাচ্ছি। তুই এমন মুখ করে বসে আছিস কেন ? মনে হচ্ছে তুই আলফ্রেড হিচককের কোন ছবির নায়িকা।'

এমদাদ খোন্দকারকে যখন জিজ্ঞেস করা হল— আপনার যদি আমার কাছে কিছু চাইবার থাকে তাহলে চাইতে পারেন। যা প্রার্থনা করবেন তাই পাবেন।

এমদাদ খোন্দকার অনেক ভেবে চিন্তে বলল, একখান সিগারেট খাওয়ান বাবাজী, বিদেশী। দেশীটা খাইলে গলা খুসখুস করে।

ফরিদ নিজেই দোকান থেকে এক কাঠি বেনসন এন্ড হেজেস এনে দিল। এমদাদ খোন্দকার গাঢ় স্বরে বলল, বাবাজীর ব্যবহারে প্রীত হইলাম। বড়ই প্রীত হইলাম।

'এমদাদ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আজ আমার মনটা বড়ই প্রফুল্ল। আজ আমি কোন ভিক্ষুককে বড় ধরনের সাহায্য করতে চাই।'

'সাহায্য করলেও লাভ নেই। ভিক্ষুক হইল গিয়া আফনের ভিক্ষুক।'

www.BDeBooks.Com

'সে যেন আর ভিক্ষুক না থাকে সেই চেষ্টাই করা হবে। আমি ঠিক করেছি আগামী এক ঘণ্টার ভেতর যে ভিক্ষুক এই বাড়িতে আসবে তাকে দশ হাজার টাকা দেব।'

'বাবাজী কি বললেন ?'

'আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে যে ভিক্ষুক এ বাড়িতে আসবে তাকে দেয়া হবে দশ হাজার টাকা। আমি বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। দশ হাজার টাকা এখন কোন ব্যাপারই না। এখন বাজছে দু'টা পাঁচ। তিনটা পাঁচের মধ্যে যে আসবে সেই পাবে।'

হতভম্ব ভাব কাটাতে এমদাদ খোন্দকারের অনেক সময় লাগল। পাগল শ্রেণীর অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় আছে— এই রকম পাগল সে দেখেনি।

'বাবাজী একখান কথা বলি ?'

'বলেন।'

'আমিও বলতে গেলে ভিক্ষুক শ্রেণীর। টাকা পয়সা নেই। ঘর বাড়িও নাই। পরান্নভোজী আমি যদি ভিক্ষুক না হই তা হইলে আর ভিক্ষুক কে ?'

'আপনার কথা আসছে না। যারা রাস্তায় থাকে, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা হচ্ছে। ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখুন তিনটা পাঁচ বাজা মাত্রই সময় শেষ।'

অন্যদিন ভিক্ষুকের যন্ত্রণায় ঘরে থাকা যায় না। আজই ব্যতিক্রম হল, ভিক্ষুক এল না। এমদাদ খোন্দকার হাসি মুখে বলল, টাইম শেষ বাবাজী।

ফরিদ বিষণ্নমুখে বলল, তাইতো দেখছি।

রাতে ফরিদ একেবারেই ঘুমুতে পারল না। পুরো রাতটাই বিছানায় জেগে কাটাল। দু'বার মাথায় পানি ঢেলে এল। ছাদে খানিকক্ষণ হেঁটে এল। কোন লাভ হল না। তার মাথায় দু'পাশের শিরা দপদপ করছে, চোখ জ্বালা করছে। বুকে এক ধরনের চাপা ব্যথা অনুভব করছে। ধনী হওয়ার যে এত যন্ত্রণা তা কে জানত ?

মিলিও ঘুমুতে পারল না।

সে লক্ষ্য করেছে পুতুল ফিরেছে হাসি মুখে। তার সারা চোখ মুখে আনন্দে ঝলমল করছে। হাতে বড় একটা চকোলেটের টিন। টিন খুলে সবাইকে সে চকোলেট বিলি করছে। মিলিকে দিতে এসেছিল, মিলি কঠিন স্বরে বলেছে— আমি চকলেট খাই না।

এই কথায় সে ফিক করে হেসে ফেলেছে। সেই হাসি মিলির বুকে শেলের মত বিঁধেছে। এসব কি ? কি হচ্ছে এসব ? বোঝার উপর শাকের আঁটির মত বড় আপার একটি চিঠিও এস উপস্থিত— সেই চিঠির ভাব ভাষা সবই যেন কেমন অদ্ভুত—

মিলি,

আমি ভুল করেছি কি-না তা জানি না। হয়ত করেছি। করলেও এ ভুল মধুর ভুল। সব মানুষই তার জীবনে অনেক ভুল করে। কিন্তু আনন্দময় ভুল প্রায়

কখনোই করে না। আমি করলাম। তার জন্যে কি তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে...

এই রকম চিঠি লেখার মানে কি ? আপা এমন কি ভুল করবে যার জন্যে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর সবাই ভুল করতে পারে, আপা পারে না। তারপরও যদি কোন ভুল করে থাকে তাহলে কি সেই ভুল ? ভুলের ব্যাপারটা সে স্পষ্ট করে বলছে না কেন ?

২৬

নিরিবিলি বাড়ির সামনে দুটি আইসক্রীমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। টগর এবং নিশার জন্যে এই গাড়ি দুটি হচ্ছে ফরিদের উপহার। তারা আইসক্রীম খেতে চেয়েছে— ফরিদ দু'গাড়ি আইসক্রীম এনে বলেছে, 'খাও যত খাবে।' আইসক্রীম খাওয়া চলছে। খানিকটা মুখে দিয়েই— থু করে ফেলে দিতে আরেকটি হাতে নিচ্ছে। সারা মেঝেতে আইসক্রীমের স্তূপ। ঠাণ্ডায় দু'জনেরই মুখে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খাওয়া বন্ধ হচ্ছে না।

পুতুল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল। তার কেন জানি এই দৃশ্য দেখতে বড় ভাল লাগছে। গভীর আনন্দবোধ হচ্ছে। কে জানে কি এই আনন্দের উৎস। তার নিউ মার্কেটে যাবার কথা ছিল তা না গিয়ে সে দোতালায় আনিসের ঘরে চলে গেল। আনিস মাথা নিচু করে একমনে কি যেন লিখছিল। মাথা না তুলেই বলল, ভেতরে এসো পুতুল।

পুতুল ঘরে ঢুকল। বসল খাটের এক প্রান্তে।

'কেমন আছ ?

'ভাল।'

'এমদাদ সাহেব এসেছিলেন, বললেন তোমার না-কি বিয়ে।'

পুতুল কিছু বলল না। আনিস বলল, খবরটার মধ্যে একটা 'কিন্তু' আছে বলে আমার ধারণা। আমি দূর থেকে যতদূর দেখেছি আমার মনে হয়েছে ডাক্তার এবং মিলির বিয়েটাই অবশ্যম্ভাবী। মাঝখান থেকে তুমি কি করে এলে বলতো ?

'আমি আসি নাই।'

'তাই না-কি ?'

আনিস লেখা বন্ধ করে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মাথা নিচু করে বসে থাকা গ্রাম্য বালিকাটিকে আজ কেন জানি আর গ্রাম্য বালিকা বলে মনে হচ্ছে না।

'পুতুল।'

'জ্বি।'

'এসো চা খেতে খেতে দু'জন খানিকক্ষণ গল্পগুজব করি।'

পুতুল সঙ্গে চা বানাতে বসল। আনিস চেয়ারে বসে তাকিয়ে আছে পুতুলের দিকে। সে চায়ের পানি গরম করছে। কেরোসিন কুকারের লালচে আভা এসে

www.BDeBooks.Com

পড়েছে তার মুখে। সুন্দর লাগছে দেখতে। একটা মানুষকেই একেক পরিবেশে একেক রকম লাগে।

'পুতুল, তুমি কি টগর এবং নিশার কাণ্ড দেখেছ? দু'জন দু'গাড়ি আইসক্রীম নিয়ে বসেছে।'

পুতুল কিছু বলল না। মনে হল সে অন্য কিছু ভাবছে। জটিল কিছু যার সঙ্গে টগর নিশার তুচ্ছ কর্মকাণ্ডের কোন মিল নেই। মনে হচ্ছে হঠাৎ করে সে গভীর সমুদ্রে পড়েছে।

'কিছু ভাবছ পুতুল?'

'জ্বি।'

'নিজের ভাবনার কথা কাউকে বলা ঠিক না। তবে তুমি যদি আমাকে বলতে চাও তাহলে বলতে পার।'

'বলতে চাই। আপনাকে অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারি নাই। আজ বলব।'

'হঠাৎ করে আজ কেন?'

পুতুল এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চায়ের কাপ আনিসের সামনে রাখতে রাখতে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি সারাজীবন আপনার সাথে থাকতে চাই। এই কথাটা আমি অনেকদিন বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারি নাই। আজ বললাম। বলে যদি কোন অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করবেন।

পুতুল কিছুক্ষণ সরাসরি আনিসের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। আনিস স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তাকে এই জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে তা সে কখনো কল্পনাও করেনি।

আজকের সকালটা লেখালেখির জন্যে চমৎকার ছিল। বাচ্চারা পাশে নেই, কেউ হৈচৈ করছে না। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। বাতাসেও ফুলের মিষ্টি সৌরভ। সম্পূর্ণ অন্য রকম এটা সকাল অথচ সকালটা এক মুহূর্তেই এলোমেলো হয়ে গেছে।

আনিস ভেবে পেল না কি করা উচিত। সে কি চুপ করে থাকবে? না -কি পুতুলকে ডেকে বুঝিয়ে বলবে? মনে হচ্ছে বুঝিয়ে বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু কি বলবে সে পুতুলকে? অন্ধ আবেগ কোন যুক্তি মানে না। চুপ করে থাকাই বোধ হয় ভাল। বাচ্চা একটি মেয়ে তার প্রতি এ জাতীয় আবেগ লালন করছে তা বুঝতে তার এত সময় লাগল কেন? অনেক আগেই তো ব্যাপারটা তা চোখে পড়া উচিত ছিল। সেও কি অন্ধ?

'আনিস কি ঘরে আছ?'

আনিস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফরিদ মামা ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে কেমন যেন বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে, যেন জীবনের ভীত নড়ে গেছে। সব কিছু ওলাট-পালট হয়ে গেছে।

ফরিদ নিষ্প্রাণ গলায় বলল।

'আশা করি আমার সাম্প্রতিক উত্থানের সংবাদ শুনেছ।'

'জ্বি শুনেছি।'

'এই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নানান ধরনের পরিবর্তন আমার মধ্যে হয়েছে। প্রথম পরিবর্তন কথাবার্তায় প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করছি। কেন করছি সেটাও একটা রহস্য। দ্বিতীয় পরিবর্তন রাতে ঘুম হচ্ছে না।'

'ঘুম হচ্ছে না কেন?'

'জানি না কেন। নির্ঘুম রাত পার করছি। গত রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমালাম তাও ভাল ঘুম হল না। মাঝরাতে স্বপ্নে দেখি আমার ওপর দিয়ে বালু বোঝাই এক ট্রাক চলে গেছে। বাকি রাত আর ঘুম হল না।'

'আপনার মনোজগতে সাময়িক পরিবর্তন হয়েছে। এই তারই প্রভাব। খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে বলে আমার ধারণা।'

'মোটেই কাটবে না। আমি খুব দ্রুত এই টাকার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। তুমি চিন্তা ভাবনা করে একটা ব্যবস্থা কর যাতে এই টাকাটা কাজে লাগে। আমি আগে যেমন দুলাভাইয়ের ঘাড়ে বসে কাটিয়েছি, ভবিষ্যতেও কারো না কারোর ঘাড়ে বসেই কাটিয়ে দেব।

'মিলি আছে বিলুও আছে। ওরা আমাকে পছন্দ করে। আমাকে ফেলবে না।'

'আপনি মানুষটা খুব অদ্ভুত মামা।'

'মোটেই অদ্ভুত না। আমি একজন অপদার্থ। অপদার্থ নাম্বার ওয়ান। তবে তার জন্যে আমার মনে কোন খেদ নেই। আমি একজন সুখী মানুষ। সুখী মানুষ হিসেবেই আমি মরতে চাই।'

'আপনারতো মামা অনেক রকম পরিকল্পনা ছিল, সেই সব পরিকল্পনা কাজে লাগান। ছবি বানান, ক্ষুধা নিয়ে ছবি বানাতে চাচ্ছিলেন, মাছ নিয়ে ছবি বানাতে চাচ্ছিলেন। সেই সুযোগ তো এখন আছে।'

ফরিদ মরা গলায় বলল, আরে দূর দূর। এইসব করতে প্রতিভা লাগে। আমার কোন প্রতিভা নেই। টাকাটা পাওয়ার পর এই ব্যাপারটা টের পেলাম তার আগে টের পইনি।

'চা খাবেন মামা?'

'চা দিলে খাব কিন্তু চায়ে কোন স্বাদ পাব না। জগৎটা আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেছে আনিস। The winter of discontent.

ফরিদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা যাচ্ছে তার এই মানসিক যন্ত্রণা কোন মেকি যন্ত্রণা নয়। আনিস অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল।

পুতুলকে বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক দেখালেও সে যে গত দু'দিন ধরে ক্রমাগত কাঁদছে তা এমদাদ খোন্দকার বুঝতে পারছে কিন্তু রহস্যটা ধরতে পারছে না। তার প্রথম ধারণা হয়েছিল ব্যাটা ডাক্তার বোধ হয় ঐ দিন বেড়াতে

www.BDeBooks.Com

নিয়ে আজে বাজে কিছু বলেছে। পুতুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সে কিছুই বলেনি। অবশ্যি বিয়ের কথাবার্তা ঠিকঠাক হলে মেয়েরা কাঁদতে শুরু করে। এটা সে ধরনের কান্নাও হতে পারে। তা যদি হয় তাহলে অবশ্যি ভয়ের কিছু নেই বরং আনন্দের কথা। পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হবার জন্যে পুতুলকে আড়ালে নিয়ে গেল।

'তুই কি জন্যে কাঁদছিসরে পুতুল ?'

পুতুল চুপ করে রইল।

'ডাক্তার কিছু বলেছে ?'

'না।'

'ডাক্তারকে কি তোর পছন্দ না ?'

'আমার মত মেয়ের আবার পছন্দ অপছন্দ কি ? তুমি যেখানে বিয়ে দিবা সেইখানে বিয়া হইব।'

'এতক্ষণে একটা ভাল কথা বললি। মনে শান্তি পাইলাম।'

'মনে অশান্তি পাইবা এমন একটা কথা তোমারে এখন বলব দাদাজান।'

'কি কথা ?'

'ডাক্তার মিলি আপাকে বিয়ে করবে। তুমি এত বুদ্ধিমান, এই সহজ জিনিসটা তুমি বোঝ না ?'

'আমারেতো বলল অন্য কথা।'

'বিপদে পড়ে বলেছে। তোমার হাতে থেকে বাঁচার জন্য বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

খোন্দকার হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তার হতভম্ব ভাব কিছুতেই কাটছে না। কি বলে এই মেয়ে ?

'তুমি বড় বোকা দাদাজান। তুমি বড়ই বোকা।'

পুতুল তার দাদাজানকে বারান্দায় রেখে নিজের ঘরে চলে গেল। দরজা বন্ধ করে সে এখন কিছুক্ষণ কাঁদবে। পানির কল ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে যাতে কেউ কান্না শব্দ শুনতে না পায়। তার কষ্ট জানবে শুধু বহমান জলধারা। তাই ভাল। তার দুঃখ জলে চাপা থাক।

২৭

সোবাহান সাহেব ঘুমুবার আয়োজন করছিলেন। এই সময় মিলি এসে কিছুক্ষণ বাবার সঙ্গে হালকা গল্প গুজব করে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। পিঠ চুলকে দেয়। আজো সে এসেছে। তাবে আজ তার মুখ পাথরের মত। বসেছে চেয়ারে। তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। মনে হচেছ কঠিন কিছু বলবে। সোবাহান সাহেব তরল গলায় বললেন, কেমন আছিসরে মা ?

'ভাল আছি বাবা।'

'কিছু বলবি ?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল।'

মিলি এবার বাবার চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় বলায়, আমি একজনকে বিয়ে করে ফেলব বলে মন ঠিক করে ফেলেছি বাবা। আমার সব কথা আমি সবার আগে তোমাকে বলি। আজও বললাম। সোবাহান সাহেব চিন্তিত গলায় বললেন,

'ব্যাপারটা কি বলতো ?'

'আমি কষ্ট পাচ্ছি বাবা। আর সহ্য কতে পারছি না।'

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি তোমার চিন্তায়, কাজে - কর্মে কখনো বাধা দেই না। এখনো দেব না। যদি তোমার কোন ছেলেকে সত্যি সত্যি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই বিয়ে করবে। ছেলেটা কে ?'

'ছেলে নিচে বসে আছে।'

'ও আচ্ছা।'

'এখানে নিয়ে আসব ?'

'তার দরকার দেখি না।'

'তাহলে তুমি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিচে আস।'

'তোর হল কি মা বলতো ? তুইতো এ রকম ছিলি না।'

মিলির চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। সে অনেক কষ্টে চোখের পানি সামলে বলল, ছেলেটা সব কিছু জট পাকিয়ে ফেলে বাবা। ভাবে একটা করে আরেকটা। নিজে কষ্ট পায় অন্যকে কষ্ট দেয়। কাজেই আমার মনে হয় বিয়েটা অতি দ্রুত হওয়া দরকার।

'হবে, দ্রুতই হবে।'

'আজ রাতে হলেই ভাল হয় বাবা।'

'তুই কি বলছিস মা ?'

মিলির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সোবাহান সাহেব উঠে এসে মেয়ের হাতে হাত রাখলেন। জ্বরে মিলির গা পুরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে কিভাবে কে জানে। স্বাভাবিকভাইে যে কথা বলছে তা ভাবাও ঠিক না। কথা বলার ভঙ্গি এবং বিষয়বস্তু দুই-ই অস্বাভাবিক। সোবাহান সাহেব মেয়ের হাত ধরে নিচে নেমে এলেন।

ডাক্তার সোফায় বসে আছে। বাড়ির সব সদস্যই উপস্থিত। শুধু তাই না একজন কাজি সাহেবও আছেন। যে কোন কারণেই হোক কাজি সাহেবকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

সোবাহান সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। এত আয়োজন কখন হল, কি ভাবে হল, কেনইবা হল ? তিনি কেন কিছু জানেন না ?

www.BDeBooks.Com

মনসুর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, স্যারের শরীর কেমন ?

'ভাল।'

'ব্যাপার কি মনসুর ?'

'বিয়ে হচ্ছে স্যার।'

'তা তো দেখছি। রহস্যটা কি ?'

মিনু শান্ত গলায় বললেন, তোমাকে রহস্য জানতে হবে না। তুমি চুপ করে বস।

মিনু রহস্য ভাঙ্গাতে চান না। অতি দ্রুত পুরো ব্যাপারটা ঘটার মূলে তাঁর হাত আছে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তিনি কি কারণে মিলির ঘরে গেছেন। দরজা খোলা, ঘর অন্ধকার, মিলি নেই। তিনি ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন। মিলি টেবিলে মুখ বন্ধ করা খাম। খামের উপরে লেখা, বাবা ও মা'কে।

তিনি খাম খুলে আঁৎকে উঠলেন। গোটা গোটা হরফে লেখা— মা আমি কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। বেঁচে থাকা আমার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছে। তোমরা আমাকে বিদায় দাও।

অন্য কোন সুন্দর ভুবনে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। চিঠি পড়ে তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মিনু খোঁজ নিয়ে জানলেন কিছুক্ষণ আগে মিলি ডাক্তারখানায় গেছে মাথা ব্যথার ওষুধ কিনতে। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তারখানায় ছুটে গেলেন। ফিরলেন ডাক্তারকে সঙ্গে করে। কাদেরকে পাঠিয়ে মগবাজারের কাজি সাহেবকে আনলেন। সোবাহান সাহেবকে জানানো হল সবার পরে কারণ তার ধারণা ছিল— সোবাহান সাহেব বেঁকে বসবেন।

কাজি সাহেব বললেন, দেন মোহরানা কত ধার্য হল ?

মনসুর হড়বড় করে বলল, যা ইচ্ছা ধার্য করেন শুধু আমাকে একটা মিনিট সময় দিন। আমি যাব আর আসব। আমার একটা নতুন পাঞ্জাবী আছে— রাজশাহী সিল্ক। ঐটা গায়ে দিয়ে আসি। আমি যাব আর আসব।

কারোর অনুমতির অপেক্ষা না করেই মনসুর উল্কার বেগে বের হয়ে গেল। রাস্তা পার হবার সময় দু'জন পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে নিজে চলন্ত রিকশার সামনে পড়ে গেল। তার জ্ঞান হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। চোখ মেলে তাকানো মাত্র সে শুনল ফরিদের গলা— মিলি, গাধাটার জ্ঞান ফিরেছে মনে হয়, কষে একটা চড় দে তো!

মনসুর তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করে ফেলল। অজ্ঞান হবার ভান করাই ভাল। মিলি পাশেই আছে এই আনন্দই যথেষ্ট। শারীরিক কোন কষ্টকেই এখন আর কষ্ট মনে হচ্ছে না। তবে বাঁ হাত ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে। কম্পাউন্ড ফ্রেকচার কি-না কে জানে। হোক যা ইচ্ছা— মিলি পাশে। দু'টা হাত ভেঙে গেলেও ক্ষতি নেই। এতে বরং মিলির সহানুভূতি বেশি পাওয়া যাবে।

রাত দু'টার দিকে হাসপাতাল থেকে মনসুর ভাল আছে খবর পাবার পর সোবাহান সাহেব ঘুমুতে গেলেন। মিনু ঘুমুতে গেলেন না। তিনি জেগে রইলেন। এতবড় একটা সমস্যাতেও তাঁকে খুব একটা বিচলিত মনে হল না। সোবাহান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, মিনু তোমাকে একটা কথা বলি, রাগ করো না।

'বল।'

'মিলি যেমন নিজের বর নিজে পছন্দ করেছে বিলু কি তাই করবে? তোমার কি মনে হয়?'

মিনু জবাব দিলেন না। সোবাহান সাহেব বললেন, আমার মনে হয় না। বিলু সে রকম মেয়ে না। এই মেয়টাকে আমি আমার পছন্দের একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। আমার ধারণা আমি বললেই সে রাজি হবে।

'ছেলেটা কে?'

'ছেলেটা হল আনিস। বুঝতে পারছি আমার কথা শুনেই তুমি চমকে উঠছ। চমকে উঠারই কথা। বিপত্নীক এটা ছেলে। বয়স বেশি— দু'টা বাচ্চা আছে। তবু— মানে... অর্থাৎ ছেলেটাকে আমার খুবই পছন্দ।'

মিনি চুপ করে রইলেন। তাঁকে খুব বিচলিত মনে হল না। সোবাহান সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে বিলুকে চিঠিতে আমার মতামতটা জানাই।

মিনু সহজ গলায় বললেন,তোমার মতামত জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। বিলু আনিসকে বিয়ে করে বসে আছে।

'সে কি?'

'ভয়ে কাউকে জানায় নি। আমি আজই জানলাম।'

'আজই জানলে?'

'হ্যাঁ।'

'কার কাছ থেকে জানলে?'

'বিলুর কাছ থেকে।'

'বিলু এসেছে না-কি?'

'হু! তোমরা সবাই যখন হাসপাতলে তখন এসেছে। ভয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করছে না।'

'যাও ডেকে নিয়ে আস।'

'ও আনিসের ঘরে আছে। এখন ডাকা ঠিক হবে না।'

'হুঁ! সেটাও কথা।'

'বাতি কি নিভিয়ে দেব? ঘুমুবে?'

'বারান্দায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসি। মিনু আজ কি পূর্ণিমা?'

'জানি না।'

মনে হচ্ছে পূর্ণিমা।

www.BDeBooks.Com

সোবাহান সাহেব বারান্দায় এসে দেখলেন— সত্যি পূর্ণিমা। তিনি মনে মনে বললেন, 'এমন চাঁদের আলো। মরি যদি সেও ভাল। সে মরণও স্বর্গ সমান।' অনেকদিন আগে পড়া এই লাইন দুটি কেন যে তাঁর মনে এল কে জানে।

২৮

ফরিদের টাকা পয়সার একটা বিলি ব্যবস্থা হয়েছে। আনিসের পরামর্শে একটা ট্রাস্টি বোর্ড করা হয়েছে। সেই ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি সোবাহান সাহেব। সদস্য তিনজন— আনিস, ডাক্তার এবং কাদের। কাদেরকে সদস্য করা হয়েছে ফরিদের পিড়াপিড়িতে। সে নিজে ট্রাস্টি বোর্ডে থাকবে না। তবে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কাদেরকে রাখতে চায়। ট্রাস্টি বোর্ড ফরিদের সমস্ত টাকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখা এবং যুদ্ধে নিহত প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকদের নাম ঠিকানা সংগ্রহে ব্যয় করবে। একটি বিশাল মিউজিয়াম তৈরি হবে। মিউজিয়ামের নাম 'স্বাধীনতা মিউজিয়াম'। সেই মিউজিয়ামে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ থাকবে। এই ট্রাস্টের একমাত্র কাজ হবে দেশের মানুষদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

ফরিদ এখন তার আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে। মহানন্দে আছে। তার মাথায় অন্য একটা পরিকল্পনা এসেছে। সে পাঁচটা টিয়া পাখি জোগাড় করে তাদের কথা শেখাচ্ছে। কথাটা হচ্ছে "তুই রাজাকার।" এইসব টিয়া পুরোপুরি কথা শিখে গেলে এদের উপহার হিসেবে বিশেষ বিশেষ মানুষদের কাছে পাঠানো হবে। তাঁরাই পাবেন যারা এক সময় রাজাকার ছিলেন। আজ দেশের হর্তাকর্তাদের একজন হয়ে বসে আছেন।

ফরিদের এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে 'প্রজেক্ট রাজাকার'। তবে প্রজেক্টের কাজ ঠিকমত এগুচ্ছে না। প্রথমত, পাখিগুলোকে কথা শিখতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, টাকা পয়সার অভাব। ফরিদ তার সব টাকা পয়সা ট্রাস্টি বোর্ডে দিয়ে দেওয়ায় খুবই বেকাদায় অবস্থায় পড়েছে। সোবাহান সাহেবের কাছে অনেক ঘুরাঘুরি করেও কিছু আদায় করতে পারেনি। তবে রহিমার মা তার আজীবন সঞ্চয় ভেঙে মামাকে এক হাজার টাকা দিয়েছে। সেই টাকায় আরো বারটি টিয়া কেনা হয়েছে। পাখির খাঁচা বারান্দায় ঝুলছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরিদ সেই পাখিগুলোকে শুনাচ্ছে— 'তুই রাজাকার'। মুখে অবশ্য বলতে হচ্ছে না। টেপ রেকর্ডারে টেপ করা আছে। টেপ বাজানো হচ্ছে। ফরিদকে এই কাজে সাহায্য করছে পুতুল। আজকাল সে বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। কারণ তার দাদাজান সোবাহান সাহেবের সঙ্গে শহীদদের নাম সংগ্রহের জন্যে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরছেন। এই প্রথম তিনি একটি কাজ আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে করছেন। মনে হচ্ছে জীবনের শেষ প্রান্ত এসে তিনি বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পেয়েছেন।

পাখিগুলোর যত্ন করতে পুতুলের খুব ভাল লাগে। খাঁচায় বন্ধ এই পাখি গুলোর সঙ্গে সে হয়ত নিজের জীবনের খানিকটা মিল খুঁজে পায়। মাঝে মাঝে

আনিসের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে ফেলে। আনিস বলেন, কেমন আছ পুতুল?

পুতুল তার জবাব দেয় না। মনে মনে বলে, আপনি ভাল থাকলেই আমি ভাল। আপনি সুখী হলেই আমি সুখী। দিনে একবার হলেও আপনাকে দেখতে পাচ্ছি— এই বা কম কি? এমন সৌভাগ্য ক'জন মেয়ের হয়?

এক মঙ্গলবার ভোরে প্রচণ্ড চিৎকার এবং হৈ চৈ-এ নিরিবিলি বাড়ির সমস্ত নীরবতা ভঙ্গ হল। ফরিদ পাগলের মত চেঁচাচ্ছে। চেঁচানোর কারণ একটি পাখি কথা শিখেছে। পরিষ্কার বলেছে— তুই রাজাকার, তুই রাজাকার।

প্রথম পাখিটি কাকে দেয়া যায়?

www.BDeBooks.Com

আমাদের সাদা বাড়ি

১

আমাদের বাড়িতে সকালের দিকে হইচই একটু বেশি হয়।

আমার মা, বয়সের কারণেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক সকালবেলায় রেগে আগুন হয়ে থাকেন। যাকে দেখেন তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। ঝড়ের প্রবল ঝাপ্টা বেশিরভাগ সময় আমার বড় ভাইয়ের ওপর দিয়ে যায়। বেচারার দোষ তেমন কিছু থাকে না— হয়তো টুথপেস্টের টিউবের মুখ লাগানো হয়নি, কিংবা বাথরুমের পানির কল খোলা— এই জাতীয় তুচ্ছ ব্যাপার। রেগে আগুন হবার মতো কিছু না।

আজো বেচারা বকা খাচ্ছে। মার গলা ক্রমেই উঁচুতে উঠছে। অন্যপক্ষ চুপচাপ। বড় ভাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেও কিছু বলছেন না, কারণ কথা বললেই বিপদ। আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়— নীরবতা। মার একতরফা কথাবার্তা থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে বুনোভাই দাড়ি শেভ করেন নি। বড় ভাইয়ের ডাকনাম বুনো। আমরা সবাই তাঁকে বুনোভাই ডাকি। যার নাম বুনো তাঁর স্বভাব-চরিত্রে বন্যভাব প্রবল হওয়ার কথা। তা কিন্তু না। বুনোভাই খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ। এই যে মা তুফান মেল চালাচ্ছেন তিনি একটা শব্দও করছেন না। মিটিমিটি হাসছেন।

মা হড়বড় করে বলছেন, তুই ভেবেছিস কী? তোর অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছি। গতকালও তুই শেভ করিস নি। আজো না। তোর মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঘরে কি ব্লেড কেনার টাকা নেই? নাকি তোকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দেয়া হয় না? হাসছিস কেন? এত কিছু শোনার পরেও তোর হাসি আসে? হাসি খুব সস্তা হয়ে গেছে?

মার গালাগালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। শব্দটা টিউবওয়েলের। টিউবওয়েলের পাম্প চেপে আমরা দোতলার ছাদে পানি তুলি। ট্যাঙ্কে পানি তোলার জন্য আমাদের কোন ইলেকট্রিক পাম্প নেই। ওয়ান হর্স পাওয়ারে একটা পাম্প কিনলেই কাজ হয়। সেই পাম্প কেনা হচ্ছে না, কারণ আমার বাবার স্বাস্থ্য বাতিক। তিনি ঘোষণা করেছেন সকাল বেলা সবাইকে খানিকক্ষণ টিউবওয়েলে পানি পাম্প করতে হবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। পানি তোলা হবে, স্বাস্থ্যও রক্ষা হবে। শুরুতে আমরা সবাই বেশ উৎসাহ নিয়ে পানি তুলেছি। এখন আর উৎসাহ পাচ্ছি না। এ বাড়ির একমাত্র কাজের ছেলে জিতু মিয়ার জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে হাড় জিরজিরে শরীরে

www.BDeBooks.Com

মিনিট বিশেক পাম্প করে তারপর দু'হাতে বুক চেপে বসে পড়ে। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নেয়। এই দৃশ্য দেখলে যে কোন লোক ভাববে, আমরা বোধহয় হৃদয়হীন। তবে দেখে দেখে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে বলেই এখন আর খারাপ লাগে না। শুধু বুনোভাই এখনো অভ্যস্ত হতে পারেন নি। তিনি রোজই জিতু মিয়াকে সাহায্য করতে যান এবং একনাগাড়ে খুব কম করে হলেও একঘণ্টা ঘটাং ঘটাং করেন। এমন চমৎকার একটি ছেলের উপর মা শুধু শুধু এত রাগ করেন, কে জানে কেন।

অন্যদিন মিনিট দশেকের মধ্যেই মার দম ফুরিয়ে যায়। আজ ফুরুচ্ছে না। এখন বুনোভাইয়ের অকর্মণ্য স্বভাবের ওপর লেকচার দেয়া হচ্ছে। তাঁকে তুলনা করা হচ্ছে অজগর সাপের সঙ্গে। যে অজগর একটা আস্ত হরিণ গিলে এক মাস চুপচাপ শুয়ে থাকে। মার এই উপমা খুব খারাপ না। অজগর সাপের শুয়ে থাকার সঙ্গে বুনোভাইয়ের বিছানায় পড়ে থাকার মধ্যে বেশ মিল আছে। তাকে টেবিল-চেয়ারে বসে কোনদিন পড়তে দেখি নি। যাবতীয় পড়াশোনা তিনি করেন শুয়ে শুয়ে।

'তুই হচ্ছিস অজগর, বুঝলি ? অ-তে যে অজগর, সেই অজগর।'

'ঠিক আছে মা, এখন শান্ত হও। আমাকে বকে বকে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তুমি একটু বিশ্রাম নাও মা। শান্ত হও।'

মা শান্ত হলেন না। আরো কী-সব বলতে লাগলেন। মার চিৎকার প্লাস জিতু মিয়ার ঘটাং ঘটাং-এর সঙ্গে যুক্ত হল আমার বড় আপার দুই কন্যা রিমি ও পলির চিৎকার। এই দুই কন্যা কান ঝালাপালা করে দিতে লাগল। বড় আপা গত চার মাস ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন। আরো দু মাস থাকবেন, কারণ দুলাভাই কী একটা ট্রেনিঙে নিউজিল্যান্ডে গিয়েছেন ছ'মাসের জন্য। রিমি এবং পলি এই চার মাসে চিৎকার করে আমাদের মাথার পোকা নাড়িয়ে দিয়েছে। এদের কিচ্ছু বলার উপায় নেই। কিছু বললেই সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এরা তাদের মার কাছে নালিশ করবে এবং লোক-দেখানো নাকীকান্না কাঁদবে। আমি একবার মহাবিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, এই রিমি, আর শব্দ করলে চড় খাবি। জন্মের মতো চিৎকার করার শখ মিটিয়ে দেব। রিমি চোখ বড় বড় করে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর লাফাতে লাফাতে তার মার কাছে গেল। বড় আপা সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চলে এলেন। তাঁর মুখ থমথমে, গলার স্বর ভারি। মনে হচ্ছে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলবেন। তাঁর কান্নারোগ আছে।

'রঞ্জু, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কী কথা ?'

'দরজাটা বন্ধ কর, বলছি।'

'এমন কী কথা যে দরজা বন্ধ করে বলতে হবে ?'

'বড় আপা নিজেই দরজা বন্ধ করে আমার সামনের চেয়ারে এসে বসলেন এবং চাপা গলায় বললেন, 'আমার মেয়েগুলোকে তুই দেখতে পারিস না কেন ? ওরা কী করেছে ?'

আমি পরিবেশ হালকা করার জন্য হাসতে হাসতে বললাম, 'কী যে বল আপা, ওদের তো আমি খুবই পছন্দ করি। পরীর মতো দুই মেয়ে। দেখতে পারব না কেন ?'

'কেন সেটা তো তুই বলবি। তোর কাছে থেকেই শুনতে চাই। খানিকক্ষণ আগে রিমি কী করছিল ? বল্, কী করছিল ?'

'চিৎকার করছিল।'

'বাচ্চারা চিৎকার করবে না ?'

'করবে। তবে সারাক্ষণ করবে না এবং চিৎকার থামতে বললে থামবে। এদের মুখে কোন ব্রেক নেই।'

'সে চিৎকার করছিল শুধু এই কারণে তুই তাকে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিবি ? আচ্ছা একটা মেয়ে!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'কী বলছ আপা ? চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দেব কেন ?'

'আবার অস্বীকার করছিস ? তোর লজ্জাও লাগে না ? কয়েকটা দিন শুধু আছি তাও সহ্য হচ্ছে না ? আমরা কি জন্মের মতো তোদের ঘাড়ে এসে চেপেছি ? আমরা কি সিন্দাবাদের ভূত যে নামাতে পারবি না ? আর আমাদের যদি তোর এতই অসহ্য হয় সেটা বলে ফেল— চলে যাই। এমন তো না যে যাবার জায়গা নেই। ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে এসেছি— তালা খুলে ঢুকব।'

'আপা, ব্যাপারটা হচ্ছে কী...

'থাক, তোকে ব্যাপার বলতে হবে না। ব্যাপার আমি বুঝতে পারি। আমার কি চোখ নেই ? আমার চোখ আছে। দুই-এ দুই-এ যে চার হয় তা-ও আমি জানি। তোরা কেউ এখন আমাদের সহ্য করতে পারছিস না। বাবা সেদিন পলিকে ধমক দিলেন। আমার সামনেই দিলেন। আমি তো হতভম্ব। আমার সামনে আমার মেয়েকে ধমক দেবেন কেন ?'

বড় আপা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপাতে লাগলেন। তাঁকে নিয়ে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। তাঁর মনে একটা ধারণা ঢুকে গেছে যে এ বাড়িতে আমরা তাঁকে পদে পদে অপমান করছি। অপদস্থ করার চেষ্টা করছি।

একই মায়ের পেট থেকে আমরা পাঁচ ভাইবোন এসেছি। পাঁচজনই সম্পূর্ণ পাঁচ রকম। বড় আপা অসম্ভব সন্দেহপরায়ণ, ঝগড়াটে এবং ছিঁচকাঁদুনে। বুনোভাই চুপচাপ ধরনের। কোনো কিছুতেই তিনি রাগ করেন না। এম.এ. পাস করেছেন চার বছর আগে। এই চার বছরে চাকরির কোনো চেষ্টা করেন নি। আমাদের দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় আছেন— শিল্পমন্ত্রী। তাঁকে ধরাধরি করে নারায়ণগঞ্জের একটা মিলে তাঁর জন্য চাকরি যোগাড় করা হল। ভালো চাকরি, ছ' হাজার টাকার মতন বেতন। কোয়ার্টার আছে। দেড় মাস সেই চাকরি করে একদিন সুটকেস নিয়ে বাসায় চলে এলেন। এই চাকরি নাকি ভালো

www.BDeBooks.Com

লাগে না। তাঁকে ফেরত পাঠানোর জন্য অনেক ঠেলাঠেলি করা হল। কোনোই লাভ হল না। মা যত রাগ করেন বুনোভাই তত হাসেন। বড়দের কোনো ছেলেমানুষি দেখে আমরা যেমন হাসি সে রকম হাসি। মা রাগী গলায় বললেন, 'এই চাকরি তোর পছন্দ না। কী চাকরি তোর পছন্দ ?'

'কোনো চাকরিই পছন্দ না, মা!'

'কী করবি তহলে ?'

'কিছুদিন রেস্ট নেব।'

'রেস্ট নিবি মানে ? রেস্ট নিবি— এর মানে কী ?'

'রেস্ট নেবার মানে হচ্ছে বিশ্রাম করা। কিছুদিন বিশ্রাম করব বলে ঠিক করেছি, মা।'

'বিশ্রাম করবি ?'

'হ্যাঁ। শুয়ে-টুয়ে থাকব। বই-টই পড়ব।'

সত্যি সত্যি বুনোভাই পরের এক মাস শুয়ে শুয়েই কাটালেন। হাতে একটা পত্রিকা কিংবা বই। সেই বই মুখের উপর ধরা। পা নাচাচ্ছেন। মুখ হাসি হাসি। যেন তিনি বড় আনন্দে আছেন। রিমি এবং পলি বেশির ভাগ সময় তাঁর ঘরেই লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করেন। তিনি ফিরেও তাকান না। তাদের চিৎকার, চেঁচামেচি তাঁর কানে ঢোকে বলেও মনে হয় না। সেই তুলনায় আমার মেজোভাই খুব প্র্যাকটিক্যাল। মেজোভাই ইন্জিনিয়ারিং পড়েন— ফাইন্যাল ইয়ার। রাতদিন পড়াশোনা নিয়ে আছেন।

পাস করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বাইরে যেতে পারেন সেই চেষ্টাও আছে। নানান জায়গায় লেখালেখি করছেন। একটা মেয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো ভাব আছে। খুব বড়লোকের মেয়ে। গাড়ি করে এ বাড়িতে আসে। এই গাড়িও মেয়ে নিজেই চালায়। মেয়েটার নাম শ্রাবণী। মেজোভাই ডাকেন বনী বলে। খুব মিষ্টি করে ডাকেন। কাউকে যে এত মিষ্টি করে ডাকা যায় তা আমার ধারণায় ছিল না। মেয়েটা দেখতে বিশেষ ভালো না। চেহারায় কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব। এই মেয়ে ছাড়াও আরো একটি মেয়ে মেজোভাইয়ের কাছে আসে। সেই মেয়েটা দেখতে খুবই সুন্দর। তবে গরিব ঘরের মেয়ে। বেশির ভাগ সময়ই সে হেঁটে হেঁটে আসে। তার নাম শোভা। মেজোভাই তাকে ডাকেন 'শু' বলে। এই মেয়ে বাসায় এলে মেজোভাইয়ের মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখায়। মেয়েটি চলে যাবার সময় মেজোভাই তাকে এগিয়ে দেবার জন্য অনেক দূর যান। হয়তো বাসে তুলে দেন কিংবা রিকশা ঠিক করে দেন। মেজোভাইয়ের মুখের উজ্জ্বল ভাব মেয়েটি চলে যাবার পরেও অনেকক্ষণ থাকে। তবু আমার কেন জানি মনে হয় মেজোভাই বড়লোকে মেয়েটাকেই বিয়ে করবেন। কারণ খাবার টেবিলে একদিন কথায় কথায় বললেন, বাংলাদেশের কিছু কিছু মানুষের অসম্ভব পয়সা হয়েছে। শ্রাবণী বলে যে একটা মেয়ে আমার কাছে আসে ওরা তিন বোন।

তিনজনের নামেই গুলশানে আলাদা আলাদা বাড়ি আছে। তিনজনের আলাদা আলাদা গাড়ি। Can you belive it ? কথাগুলো বলার সময় মেজোভাইয়ের মুখ ঝলমল করতে লাগল। চোখে ঘোর ঘোর ভাব চলে এল। মনে হল তিনি কল্পনায় গুলশানের বাড়ি এবং বাড়ির সামনে কালো রঙের মরিস মাইনর গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন।

আমার সবচে' ছোট বোনের নাম নীতু। নীতু এবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার কারণেই বোধহয় নিজেকে সে বেশ বড় বড় ভাবছে। যদিও সে এখনো পুরোপুরি ছেলেমানুষ। বাসায় সারাক্ষণ আচার খায়। শিবরামের বই পড়ে হি হি করে হাসে। টিভির অতি অখাদ্য নাটকও গভীর আগ্রহে দেখে। করুণ রসের দু'একটা ডায়ালগ শুনলেই তার চোখে ছল ছল করে ওঠে। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে সে নিজের জন্য একটা ঘর নিয়েছে। প্রতিরাতেই নিজের ঘরে ঘুমুতে যায়। একবার ঘুম ভাঙলেই ভয় পেয়ে মার ঘরে চলে আসে। ছোটবেলায় নীতুকে রাগানোর একটা বুদ্ধি ছিল। তার সামনে দঁড়িয়ে বলা— নীতু, আয় তু-তু-তু। নীতুর স্কুল জীবনের বন্ধুরা এখনো তাকে এভাবে ক্ষেপায়। নীতু হচ্ছে আমাদের পরিবারের সবার আদরের মেয়ে এবং হয়তোবা সবচে' ভালো মেয়ে। উঁহু, ঠিক হল না। সবচে' ভলো আমাদের বুনোভাই। মা যাকে অজগর সাপ বলেন।

সব ভাইবোন সম্পর্কেই বললাম, এবার বোধ হয় নিজের কথা কিছু বলা দরকার। মুশকিল হচ্ছে, আমার নিজের প্রসঙ্গে বলার মতো কিছু নেই। তাছাড়া বলতে ইচ্ছে করছে না। বরং মার কথা বলি।

মা এককালে খুব রূপবতী ছিলেন। তাঁর তরুণী বয়সের একটি ছবি আছে। সেই ছবির দিকে তাকালে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। আজকের মোটাসোটা, চুল-পাকা মার সঙ্গে এ ছিপছিপে তরুণীর কোন মিল নেই। ছবিতে মার মুখে এক ধরনের দুষ্টু হাসি। চোখ দু'টাকে অন্য ভুবনের রহস্যময়তা। একবার ছবির সামনে দাঁড়ালে চট করে সরে যাওয়া যায় না। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। মা খুব রাগারগি করেন এটা তো বলেছি। তবে সবার সঙ্গে না। তাঁর রাগের মূল টার্গেট বুনোভাই। দ্বিতীয় টার্গেট নীতু। বড় ভাইয়ের উপর রাগ করার তা-ও একটা অর্থ হয়, নীতুর উপর রাগের আমি কোনো কারণ খুঁজে পাই না। অনেক মানুষের সামনে নীতুকে অপমান করতে পারলে তিনি যেন কেমন আনন্দ পান। আবার একই সঙ্গে নীতুর সামান্য অসুখ-বিসুখে অস্থির হয়ে যান। অবশ্যি বড় আপার সঙ্গে মার খুবই খাতির। দুজনে পান খেতে খেতে বান্ধবীর মতো গল্প করেন। গল্পের এক পর্যায়ে একজন অন্য জনের গায়ে ধাক্কা দেন। দেখতে খুব ভালো লাগে।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা হল না। দোতলা বাড়ির কথা এক ফাঁকে বলেছি, নীতুর আলাদা ঘরের কথা বলেছি। এর থেকে ধারণা

www.BDeBooks.Com

হওয়া বিচিত্র নয় যে, আমরা বেশ মালদার পার্টি। আসলে তা না। সাধু ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়— ইহা সত্য নহে। আমরা মোটেই মালদার পার্টি নই। খুবই দুর্বল পার্টি। আশেপাশে কেউ তা জানে না। তারা দেখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার একটা দোতলা বাড়ি। লাল রঙের বাগানবিলাসের পাতা যখন বাড়িটা ঢেকে ফেলে তখন এই বাড়িকে স্বপ্নের বাড়ি বলে মনে হয়। এই বাড়িতে যারা থাকে তাদের দুর্বল পার্টি মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

কাউকে বাড়ির ঠিকানা দেবার সময় আমরা বলি, রাস্তার ডান দিক মোড় নিলেই দেখবেন চমৎকার, একটা শাদা বড়ি। বাগানবিলাসের ছাওয়া। আমাদের বাড়ির কথা বলতে গেলে 'চমৎকার' বিশেষণ আপনা আপনি চলে আসে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে— এই বাড়ি কিন্তু আমাদের না। আমরা এই বাড়ির কেয়ারটেকার, আসল মালিক হলেন মইনুদ্দিন চাচা— বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁরা দুজন একই সঙ্গে বি. এ. পাস করেন। বাবা ধরাধরি করে চাকরি পেয়ে যান, মইনুদ্দিন চাচা পান না। তিনি ইন্টারভ্যুর পর ইন্টারভ্যু দিতে থাকেন। তাঁর খুবই খারাপ সময় যেতে থাকে। বাবা তখন মোটামুটি সব গুছিয়ে ফেলেছেন। বিয়েও করেছেন। ফ্ল্যাটে ভাড়া করে থাকেন। গোছানো ছিমছাম সংসার।

মইনুদ্দিন চাচার কিছু হচ্ছে না। বাবা সঙ্গে থাকেন। বসার ঘরে সোফায় রাতে ঘুমান, সারাদিন চাকরির চেষ্টা করেন। কিছু হয় না। শেষে কী একটা ব্যবসা শুরু করলেন। ব্যবসা ঠিক না। দালালি ধরনের কাজ, যাতে ক্যাপিটেল লাগে না। এতেই তাঁর কপাল খুলে গেল। হু-হু করে পয়সা আসতে লাগল। দালালি ছেড়ে নানান ধরনের ব্যবসা শুরু করলেন। কয়েটা মার খেল। কয়েকটা দাঁড়িয়ে গেল। বাড়ি করলেন। তারপর চলে গেলেন ইংল্যান্ড। ঐখানে ব্যবসার চেষ্টা দেখবেন, তাছাড়া দেশে বোধহয় ব্যবসা-সংক্রান্ত তাঁর কিছু জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ি চলে এল আমাদের হাতে। ঠিক হল আমরা থাকব, বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করব।

বাবা বললেন, এক শর্তে থাকব— ভাড়া নিতে হবে। যত ভাড়া হওয়া উচিত তা তো দিতে পারব না। যা পারি আলাদা একাউন্ট করে জমা রাখব।

মইনুদ্দিন চাচা বললেন, বেশ। কিছু কিছু টাকা আলাদা একাউন্টে রাখ। ছোটখাটো রিপিয়ারিঙের কাজ এই টাকায় করা যাবে। আমার কোনো আপত্তি নেই। বাড়ি আমি অন্যের হাতে দিতে চাই না। বাড়ি পেছনে তোমরা খরচপাতি করতে চাও করবে।

আমরা কোনো খরচপাতিই করলাম না। মইনুদ্দিন চাচার একাউন্টে এক পয়সাও জমা পড়ল না। আমরা অন্যের বাড়িতে দিব্যি থাকি। খাই, দাই, ঘুমাই। প্রতি মাসে বাড়িভাড়ার টাকাটা বেঁচে যায়।

শুধু তাই না, বাবা চিঠি লিখে মইনুদ্দিন চাচার কাছ থেকে মাঝে মাঝে টাকা আনান। যেমন একবার লিখলেন— দোতালার ছাদে দুটা ঘর করে রাখলে বেশ

ভালো হয় এবং ছাদের চারদিকে রেলিং দেয়া দরকার। বাচ্চারা ছাদে যায়। মুইনুদ্দিন চাচা তার জন্যে আলাদা করে টাকা পাঠালেন। পানির পাম্পের জন্যে লেখা হল। তার জন্যেও টাকা চলে এল। কিছু মাটি দিয়ে উঠোনটা উঁচু করা দরকার। ছয় ট্রাক মাটি হলেই চলে। মইনুদ্দিন চাচা সেই টাকাও পাঠান। এসব টাকার কোনোটাই বাবা কাজে লাগালেন না। ঘর উঠল না। রেলিং হল না। পানির পাম্প কেনা হল না। মইনুদ্দিন চাচা বাড়ির পেছনে দুটা ঘর করার জন্যেও টাকা পাঠালেন। ঐ ঘরে ড্রাইভার, মালী, দারোয়ান ওরা থাকবে। তিনি এই সঙ্গে ইংরেজিতে একটি চিঠি লিখেন যার বিষয়বস্তু আগামী বছরে মাঝামাঝি তিনি দেশে আসবেন। কতদূর কী হল দেখবেন। অথচ কিছুই করা হয় নি। শেষবার পাঠানো টাকা বাবা একটা ব্যবসায় খাটিয়েছিলেন। সেখান থেকে আর পয়সা আসে নি। আমও গেছে, ছালাও গেছে।

এখন বাবার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। আগে স্বাস্থ্যবিধি পালনে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ করতেন, সেই প্রাতঃভ্রমণ আপাতত বন্ধ। অফিস থেকে এসে ঝিম মেরে বসে থাকেন। কলিংবেল বাজলে দারুণ চমকে ওঠেন। বোধহয় ভাবেন— মইনুদ্দিন চাচা চলে এসেছেন। যখন দেখা যায়, না মইনুদ্দিন চাচা না অন্য কেউ, তখন বাবার চোখে আনন্দের একটা আভা খেলে যায়। আমার বড় মায়া লাগে। কয়েক দিন আগে সবাইকে ডেকে একটা মিটিঙয়ের মতো করলেন, শুকনো মুখে বললেন, মইনুদ্দিন চলে আসছে। একটা কিছু তো করতে হয়। বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। কম ভাড়ায় একটা বাসা খোঁজা দরকার। তোমাদের বিষয়টা বলতে আমি কোনো অসুবিধা দেখছি না। বলাই উচিত— আমি এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। Total darkness.

বাবা মার দিকে তাকালেন। এমনিতে মার কথার যন্ত্রণাতে থাকতে পারি না। আজ তাঁর মুখেও কথা নেই। তিনিও সম্ভবত চোখে অন্ধকার দেখছেন।

আমার নিজের বেশ মন খারাপ হল। এই চমৎকার শাদা বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে আবার দুই রুমের ফ্ল্যাটে উঠতে হবে। থাকব কী করে ? দম বন্ধ হয়ে আসবে।

মেজোভাই বললেন, 'ইনি বেড়াতে আসছেন। বাড়ি দখল নেয়ার জন্যে তো আসছেন না। কাজেই আমরা এখন যেমন আছি, পরেও থাকব। আমি তো কোনো সমস্যা দেখছি না।

বাবা শুকনো মুখে বললেন, 'কিন্তু সে যখন দেখবে কাজ-টাজ কিছুই হয়নি। তখন...

মেজোভাই বললেন, 'তখন আবার কী ? রাগারাগি-হইচই করবে। তাই বলে তো বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারবে না ? এভিকশন এত সহজ না, খুব কঠিন।'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'জোর করে অন্যের বাড়িতে থাকব নাকি ?'

'দরকার হলে থাকতে হবে।'

www.BDeBooks.Com

'থানা-পুলিশ করবে। বিশ্রী ব্যাপার।'

'থানা-পুলিশ করলে আমরাও থানা-পুলিশ করব। থানা-পুলিশ কি উনার একার নাকি ? আমাদের রাইট অব পজেশন আছে না ? আইন আমাদের পক্ষে।'

বুনোভাই এই পর্যায়ে বললেন, 'তোর কথাবার্তা তো আমি কিছুই বুঝছি না। বেচারা এতদিন থাকতে দিয়েছে, থেকেছি। এখন চলে যেতে বললে চলে যাব না ? এ কেমন কথা ?'

'যাবে কোথায় তুমি ?'

'যেখানেই হোক যেতে হবে। আমার তো মনে হয় যে টাকাটা ভদ্রলোক পাঠিয়েছিলেন সেটা যোগাড় করে রাখলে... মানে উনাকে টাকাটা দিয়ে যদি বলা হয়...

মেজোভাই তিক্ত গলায় বললেন, 'টাকাটা থাকতে হবে তো ? বাবা, তোমার কাছে কি টাকা আছে ?'

বাবা জবাব দিলেন না। সেই সময় হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। দেখা গেল বাবা দারুণ চমকে উঠেছেন। না, মইনদ্দিন চাচা না— শ্রাবণী এসেছে। মেজোভাই মিটিং ফেলে উঠে গেলেন।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'রঞ্জু, কী করা যায় বল তো ?'

আমি পরিবেশ সহজ করার জন্যে হালকা গলায় বললাম, চল, আমরা সবাই মিলে আলাদীনের চেরাগের সন্ধানে বের হই। রসিকতা হিসেবে এটা যে খুব উচ্চমানের তা না। তবে নীতু হেসে ভেঙে পড়ল। হাসির ফাঁকে ফাঁকে অনেক কষ্টে বলল, ভাইয়া যা হাসাতে পারে। বাবা বেশ কয়েকবার কঠিন দৃষ্টিতে নীতুর দিকে তাকালেন। নীতুর হাসি বন্ধ হল না।

মা উঠে এসে আমাদের সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন নীতুর গালে। নীতু বড় অবাক হল, তবে সম্ভবত পরিস্থিতি গুরুত্ব খানিকটা বুঝল। কারণ কেঁদে ফেলল না বা উঠে চলেও গেল না। শুকনো মুখে বসে রইল।

যাই হোক, বাবার এবং সেই সঙ্গে আমাদের সবার সমস্যার সমাধান হঠাৎ করেই হয় গেল। মইনুদ্দিন চাচার মেয়ের এক রেজিস্টার্ড চিঠি এসে পড়ল। ইংরেজিতে লেখা চিঠি, যার সরল বাংলা— আমার আব্বার শরীর ভালো না। হঠাৎ খুব খারাপ করেছে তাকে চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা নিয়ে যাচ্ছি। কাজেই এখন তিনি আর দেশে যেতে পারছেন না। বাবা আপনাদের তাঁর জন্যে দোয়া করতে বলেছেন। দয়া করে দোয়া করবেন।

ইতি— তানিয়া।

তানিয়া মইনুদ্দিন চাচার বড় মেয়ে। বয়সে নীতুর তিন বছরের ছোট। মইনুদ্দিন চাচা বিয়ে করেন অনেক দেরিতে। নীতুর জন্মেরও বছরখানেক পর।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ আসবেন তখন তাঁকে অন্য বাড়ির লোক মনে হত। তিনি থাকতেন চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়িতে। যে বাড়ির ভাড়া সাত হাজার টাকা। দারোয়ান আছে, মালি আছে। চারটা বাথরুমের তিনটাতেই বাথটাব। হুলস্থুল কাণ্ড। আমরা বেশ কয়েকবার ঐ বাড়িতে গিয়েছি, কখনো স্বস্তি বোধ করিনি। এই বাড়িতে গেলেই মনটা খারপ হয়ে যেতো। ওরা এত বড়লোক, আমরা এত গরিব! মইনুদ্দিন চাচা এক সময় দরিদ্র ছিলেন এবং বাবার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন— এটা বিশ্বাস করতেই আমার কষ্ট হত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলতেন তখন আমার ভয় ভয় করত। মনে হত বাবা খুব একটা ভুল কাজ করছেন। এই ভুলের জন্য সবার সামনে বকা খাবেন।

তানিয়া এবং তার ছোট বোন মুনিয়াও বেশ কয়েকবার আমাদের বাসায় এসেছে। মেয়ে দুটির চেহারা ভালো না, তবে সব সময় সেজেগুজে থাকত বলে দেখতে ভালো লাগত। এই দুই মেয়ে আমাদের বাসায় এলে কখনো কথা বলত না। গম্ভীর মুখে বসে থাকত। নীতু একবার তানিয়াকে হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তানিয়া বিরক্ত গলায় বলেছিল, প্লিজ, আমার হাত ধরে টানাটানি করবেন না। কেউ গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না। এই কথায় নীতু খুবই অপমানিত বোধ করে। সে তখন ক্লাস টেনে পড়ে— অপমানিত বোধ করারই বয়স। সেই বছরই মইনুদ্দিন চাচা ইংল্যান্ডে চলে যান এবং আমরা তাঁদের নতুন বাড়িতে কেয়ারটেকার হিসেবে উঠে আসি।

নীতু কিছুতেই এই বাড়িতে থাকতে রাজি ছিল না। বার বার ঘাড় গোঁজ করে বলছিল, আমরা কেন ওদের বাড়িতে থাকব ? আমরা কি পাহারাদার যে উনার বাড়ি পাহারা দেব ? আমি কিছুতেই ঐ বাড়িতে যাব না। মরে গেলেও না। ওটা তানিয়াদের বাড়ি। ঐ হিংসুটে মেয়ের বাড়িতে আমি থাকব না। না-না-না।

মজার ব্যাপার, মইনুদ্দিন চাচার ঐ হিংসুটে মেয়ের চিঠি পড়ে আমাদের বাসায় শান্তি ফিরে এল। বাবার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে গেল। যদিও সেই চিঠি পড়ে বন্ধুর অসুখের কথা ভেবে তাঁর বিষাদগ্রস্ত হবার কথা ছিল। তিনি তেমন বিষাদগ্রস্ত হতে পারলেন না। তবু মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বললেন, আহা, কী অসুখ হল বল তো ? অসুখ সম্পর্কে যখন কিছু লেখে নি তখন তো মনে হচ্ছে মারাত্মক কিছু। ক্যানসার না তো ? ক্যানসার হলে আমি তো কোনো আশা দেখি না। ভেরি স্যাড। ক্যানসার হ্যাজ নো আনসার।

মা বললেন, বড় কিছুই হবে নয়তো কি আর চিকিৎসার জন্যে আমেরিকা গেছে। বাবা বললেন, দ্যাটস ট্রু। তাছাড়া ও নিজে চিঠি পর্যন্ত লেখে নি। সবার কাছে দোয়া চাচ্ছে— উফ! আমি তো সহ্য করতে পারছি না।

মা বললেন, তুমি মৌলানা সাহেবকে ডেকে একটা মিলাদের ব্যবস্থা কর।

মা জিতু মিয়াকে দিয়ে মুরগি আনিয়ে ছদগা দিলেন। বাসায় একদিন মিলাদও হল। একজন উটকো ধরনের মওলানা এসে নবী-এ করিমের জীবনের যাবতীয়

www.BDeBooks.Com

ঘটনা তুলে দু'ঘণ্টা লাগিয়ে বর্ণনা করলেন। এত বিরক্ত লাগছিল যে বলার না। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপার বিরক্তি প্রকাশ করা যায় না বলে মুখ বুজে সহ্য করেছি।

এক মাস পর আমেরিকা থেকে মইনুদ্দিন চাচার মৃত্যুসংবাদ এল। তাঁর যকৃতে ক্যানসার হয়েছিল। সিরোসিস অব লিভার। বাবা খনিকক্ষণ কাঁদলেন, হয়তো আন্তরিকভাবেই তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। কারণ মইনুদ্দিন চাচা তাঁর একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁদের দুজনের নিশ্চয়ই অনেক সুখস্মৃতি আছে। সবচে'বেশি কাঁদল নীতু। সে কাঁদতে কাঁদতে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলল— কারণ মইনুদ্দিন চাচা নীতুকে খুবই আদর করতেন। নীতু যখন ক্লাস টু-থ্রিতে পড়ত তখন মইনুদ্দিন চাচা তাকে প্রায় স্কুল থেকে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরতেন। তিনি তখন নতুন গাড়ি কিনেছে, নীতুর এই গাড়ি খুব পছন্দ।

মইনুদ্দিন চাচা প্রায়ই নীতুকে বলতেন, মা, তোর গাড়ি এত পছন্দ, তোকে আমি তোর বিয়ের সময় একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করব। তোকে কথা দিলাম রে মা। নীতু কচি কচি গলায় বলত, 'আপনি ভুলে যাবেন না তো চাচা ?'

'না, ভুলব না। আমি কিছুই ভুলি না রে মা। আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।'

বিয়েতে সে গাড়ি পাবে না এই শোকে নীতু নিশ্চয়ই কাঁদে নি— তার দুঃখে কোনো খাদ ছিল না। মইনুদ্দিন চাচা তাকে যেমন পছন্দ করতেন সেও তাঁকে তেমনি পছন্দ করত। আমরা তাঁর মৃত্যুতে সত্যিকার অর্থে ব্যথিত হলাম। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার আর দুমাস পর যখন তাঁর মেয়ে আমেরিকা থেকে জানাল— তার বাবা মৃত্যু সময় বলে দিয়েছেন ঢাকার যে বাড়িতে আমরা আছি— সেই বাড়িটা যেন আমরাই পাই এই ব্যবস্থা করতে। কীভাবে কী করতে হয় তা সে জানে না। তার মার শরীরও ভালো না। তার দেশে এসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করবে।

এই চিঠি পেয়ে সত্যিকার অর্থেই আমরা অভিভূত হলাম। মইনুদ্দিন চাচা তাঁর এক জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। তবে তার মানে এই না যে, তিনি আস্ত একটি বাড়ি ছেলেবেলার বন্ধুকে দিয়ে দেবেন। কেউ তা দেয় না। গল্প, উপন্যাস বা সিনেমায় হয়তো দেয় বাস্তবে না।

২

শুরুতে আমি বলেছিলাম যে, এই বাড়ি আমাদের না, আমরা এই বাড়ির কেয়ারটেকার— এটা আর প্রযোজ্য নয়। এ বাড়ির এখন আমরাই মালিক। দরিদ্র মধ্যবিত্ত এখন আর আমাদের বলা চলে না। আমরা ঢাকা শহরে আস্ত একটা দোতলা বাড়ির মালিক। কাগজপত্রও এখন আমাদের কাছে আছে। দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়েছে। আইনের কোনো ফাঁক নেই। আমার ইন্‌জিনিয়ার মেজোভাই ইতোমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছে এই বাড়ি ভেঙে সাততলা একটি কমপ্লেক্স হবে। পুরো বাড়িটা হবে আরসিসির উপর। একতলায় থাকবে

গ্যারেজ, শপিং মল, লন্ড্রি। অ্যাপার্টমেন্ট। এই বিশাল কমপ্লেক্সের জন্যে বাড়তি কোনো ব্যাংক লোনেরও প্রয়োজন হবে না। কিছু কিছু অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করে দিলেই টাকটা উঠে আসবে। প্রায় এক বিঘা জমির উপর বাড়ি। জমির দামই ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা। আমরা এক ধাক্কায় অনেক দূরে উঠে গেলাম।

দূরে ওঠা মানুষদের কাছে পৃথিবী অনেক ছোট মনে হয়— আমাদেরও সে রকম মনে হওয়া উচিত ছিল। আমাদের সবারই আচার-আচরণ এবং মানসিকতা খানিকটা হলেও বদলানো উচিত। আশ্চার্যের ব্যাপার, তেমন বদলাল না। বড় ভাই আগের মতোই একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে পা নাচাতে লাগলেন। মা সবার সঙ্গে সমানে ঝগড়া করে যেতে লাগলেন। নীতু নিজেকে তরুণী হিসেবে জাহির করার জন্য আগের মতোই ব্যস্ত রইল। তবে কিছুটা পরিবর্তন যে হল না তা না। যেমন, হয়তো দেয়ালে পেরেক পুঁতছি, মা ছুটে এসে বললেন, এসব কী, দেয়াল জখম করছিস কেন? যেন এই বাড়ি এখন আর বাড়ি না— এটা এখন মানুষ। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর দেয়াল জখম করলে এ ব্যথা পায়। অবশ্যি এই বাড়ি মেজোভাইকে বেশ খানিকটা বদলে দিল। একদিন দেখি গজফিতা নিয়ে জমি মাপামাপি হচ্ছে। সঙ্গে বিষণ্ন চেহারার বুড়ো একজন মানুষ। আমি দোতলার জানালা থেকে দেখলাম, মেজোভাই হাত নেড়ে নেড়ে বুড়োকে কী যেন বলছে। একদিন আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে তিনি একটা মিটিংও বসালেন। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হল গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। দরজা ভিড়িয়ে দিলেন। তার গলার স্বর নিচে নেমে গেল। বুনোভাই পা নাচানো বন্ধ করে বিস্মিত স্বরে বললেন, 'তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন? তো কী হয়েছে? এনিথিং রং?'

মেজোভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কিছু হয় নি। আমি কী বলতে চাচ্ছি দয়া করে মন দিয়ে শোন। এই যে প্রপার্টি আমরা পেয়েছি এর ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারে তোমারা কী ভাবছ সেটা প্রথমে আমি জানতে চাই। তারপর আমার কিছু কথা আছে, যা আমি বলতে চাই। বুনোভাই প্রথমে তুমি বল।'

বুনোভাই উঠে বসতে বসতে বললেন, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা একটা ফরম্যাল মিটিং করছি। যদি তাই হয় তাহলে একজন সভাপতি ঠিক করা দরকার। কে হবে সভাপতি? আমি তোর নাম প্রস্তাব করতে পারি করব?' মেজোভাই রাগী স্বরে বললেন, আজেবাজে কথা বলার আমি কোন অর্থ দেখছি না। লেট আস ডিসকাস।

বুনোভাই বললেন, 'ডিসকাস করার আমি তো কিছু দেখছি না। মইনুদ্দিন চাচার মেয়ের কাছ থেকে এই বাড়ি নেয়াই আমাদের উচিত হয় নি। কাজটা ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

'চাচা যা করেছেন, ঝোঁকের মাথায় করেছেন। তাঁর যদি ক্যানসার না হত, মৃত্যু যদি তাঁর সামনে এসে না দাঁড়াত তাহলে তিনি এই কাজ করতেন না।

www.BDeBooks.Com

তিনি ঠিকই বাড়ি দেখতে আসতেন এবং বাড়ির কোনো কাজ হয় নি দেখে বাবার সঙ্গে রাগারাগি করেতেন। হয়তো আমাদের বেরও করে দিতেন। মৃত্যুকে চেখের সামনে দেখে বেচারার সব এলোমেলো হয়ে গেল। তাঁর এই দান গ্রহণযোগ্য নয়।'

মোজোভাই হতভম্ব গলায় বললেন, 'এইসব তুমি কী বলছ ?'

'সত্যি কথা বলছি। পাগল অবস্থায় কেউ উইল করলে সেই উইল গ্রাহ্য হয় না। তিনি পাগল অবস্থায় বাড়ি দান করেছেন। এই দানও গ্রাহ্য নয়।'

'উনি পাগল ছিলেন তোমাকে কে বলল ?'

'কেউ বলে নি— আমি অনুমান করতে পারি। পাগল মানে কী ? পাগল হচ্ছে সেই মানুষ যার পক্ষে র‍্যাশনালি চিন্তা করা যে কোনো কারণেই হোক সম্ভব না।'

'তুমি তাহলে কী করতে বল ?'

'আমি ভাবছি বাবাকে বলব— বাড়িটা ঐ মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে। ঐ মেয়ের হাতেও খুব টাকা-পয়সা আছে বলে মন হল না। আমার ধারণা জমানো সব টাকা বাবার চিকিৎসায় খরচ করে ফেলেছে। ঢাকায় মইনুদ্দিন চাচা আর একখানা বাড়িও করেন নি। কাজেই আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে মেয়েকে বলা— দেখ তানিয়া তোমার বাবা মৃত্যুর আগে একটা কথা বলেছেন। সেই কথা নিয়ে তুমি ছোটাছুটি করছ, এ কথার কোনো মানেই নেই। এই বাড়ি তোমার। তুমি দয়া করে ফেরত নাও।'

'চুপ কর তো।'

'আমি তো চুপ করেই ছিলাম। তুই কথা বলতে বললি বলেই কথা বলছি। আমার এত কী দায় পড়েছে ? তবে ব্যাপরটা নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছি।'

'তোমাকে এত চিন্তা করতে কেউ বলে নি। তুমি দয়া করে অজগর সাপের মতো শুয়ে থাক, আর পা নাচাও।'

'তুই এত রেগে আছিস কেনো ?'

'রেগে আছি কারণ তোমার মধ্যে কোনো ড্রাইভ নেই। উন্নতি করার কোনো ইচ্ছা নেই। আমি চাচ্ছি আমরা তিন ভাই মিলে একটা লিমিটেড কোম্পানি খুলে মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং প্রজেক্ট হাতে নেব। আর তুমি উল্টাপাল্টা কথা শুরু করলে। যেন বিরাট ফিলসফার।'

বড় ভাই শান্ত গলায় বললেন, 'অন্যের জায়গার উপর তুই মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং করবি ? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ?'

'অন্যের জায়গা হবে কেন ?'

'অবশ্যই অন্যের জায়গা। আগেই তো বললাম মইনুদ্দিন চাচার এই বাড়ি আমাদের দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। পুরো ব্যাপারটা একজন অসুস্থ মানুষের ঝোঁকে ঘটে গেছে।'

'তুমি এত বেশি বেশি বোঝ বলেই তো তোমার আজ এই অবস্থা!'

'কী অবস্থা ?'

'দিনরাত বিছানায় শুয়ে পা নাচাতে হয়।'

বুনোভাই হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ফাইন্যাল পরীক্ষা সামনে। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। দিনরাত বাড়ি, প্রপার্টি, ডেভেলপমেন্ট মাথায় ঘুরলে তো তুই ফেল করবি।'

'আমার পরীক্ষা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি তো আর অসুস্থ না, আমি সুস্থ। আমি আমার নিজের ভলোমন্দ বুঝি ?'

মেজোভাই মুখ লাল করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। বুনোভাই আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'রঞ্জু, তুই বোস।'

আমি বসলাম। তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দিতে আগ্রহ নিয়ে বললেন, 'মইনুদ্দিন চাচার মেয়েটাকে দেখেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটাকে তোর কেমন লাগল ?'

'ভালো।'

'শুধু ভালো ?'

'দেখতেও মন্দ না।'

'আর কিছু ?'

'আর কিছু তো মনে পড়ছে না।'

বুনোভাই উঠে বসলেন। তাঁর চেখে-মুখে কৌতূহল এবং আগ্রহ। চাপা গলায় বললেন, 'খুব স্পিরিটেড মেয়ে। আমার মেয়েটাকে খুব পছন্দ হয়েছে। মইনুদ্দিন চাচা মেয়েটাকে মরার সময় একটা অন্যায় কথা বলেছেন— মেয়ে অক্ষরে অক্ষরে সেই কথা পালন করছে। তার আত্মীয়স্বজনরা নিশ্চয়ই অনেক বাধা দিয়েছে, এই মেয়ে কিছুই শোনে নি। ভুল বললাম নাকি, রঞ্জু ?'

'না, ভুল বল নি।'

'একটি জিনিস লক্ষ করেছিস— মেয়েটা তার বাবার কথা, অসুখে কথা, মৃত্যুর কথা আমাদের ইলাবরেটলি বলল। বলতে গিয়ে একবারও কাঁদল না। আমি এই জিনিসটা খুব অবাক হয়ে লক্ষ করলাম। তুই লক্ষ করেছিস ?'

'হুঁ।'

'আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লক্ষ করলাম— শুরুতে মেয়েটাকে আমার মোটেই আকর্ষণীয় মনে হয় নি— চলে যাবার সময় মনে হল, বাহ্, মেয়েটা দেখতে ভালো তো!'

তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হাতে দুদিন আগের পত্রিকা। এটা হচ্ছে তাঁর সিগন্যাল। কথা শেষ হয়েছে — এখন চলে যাও। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম 'বুনোভাই।' তিনি মুখের উপর থেকে পত্রিকা না নামিয়েই বললেন, 'বলে ফেল।'

www.BDeBooks.Com

'তুমি যে জীবনটা শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিচ্ছ তোমার খারাপ লাগে না ?'

'না। পৃথিবীতে প্রচুর লোক আছে যারা দিনরাত পরিশ্রম করে— অল্প কিছু আছে যারা কিছুই করেন না। আমি সেই অল্পের দলে। মাইনরিটি হবার যন্ত্রণা যেমন আছে, আনন্দও আছে।'

'এ রকম কতদিন থাকবে ?'

'বেশিদিন থাকব না। একদিন দেখবি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছি। চাকরি-বাকরি করছি।'

বুনোভাই আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন, যেন আমাকে আশ্বস্ত করতে চান। আমি বললাম, 'বুনোভাই যাই।'

'যা। বাবার দিকে লক্ষ রাখিস।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কার দিকে লক্ষ রাখব ?'

'বাবার দিকে লক্ষ রাখবি। আমার মনে হচ্ছে বাবার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে।'

বুনোভাই মুখের উপর থেকে পত্রিকা নামিয়ে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, এমনি বললাম— তোকে ভয় দেখালাম।

বুনোভাইয়ের কথা আমি পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলাম না। বাবার দিকে খানিকটা লক্ষ রাখলাম। তেমন কিছু চোখে পড়ল না, সহজ স্বাভাবিক মানুষ। তাকে বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গাটায় বেশির ভাগ সময় কাটাতে দেখা গেল। একদিন এগিয়ে গিয়ে বললাম 'এখানে কী করছ ?' তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু না, বসে আছি।'

'রোদে বসে আছ যে ?'

'এমনি। দাঁতে ব্যথা— এই জন্যে।'

'দাঁতে ব্যথা হলে কেউ রোদে বসে থাকে ? চল ডাক্তারের কাছে যাই।'

'বাদ দে।'

'বাদ দেবে কেন চল যাই।'

সেদিন বিকেলই ডেনটিস্টের কাছে নিয়ে গেলাম। ডেনটিস্ট প্রথম দিনেই দুটা দাঁত টেনে তুলে ফেলল। সাধারণত ডেনটিস্টরা তা করে না, প্রথমে কিছু ওষুধপত্র দেয়। মনে হয় এ ডেনটিস্টের ধৈর্য কম।

রিকশায় করে ফেরার পথে তাকিয়ে দেখি বাবার গাল ফুলে ঢোল হয়ে আছে।

'বাবা, ব্যথা করছে।'

'হুঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি তো ব্যথা শুরু হবার কথা না।'

বাবা নিচু গলায় বললেন, 'শরীরের ব্যথা কিছুই না। শরীরের ব্যথার জন্যে ওষুধপত্র আছে। ডাক্তার-কবিরাজ আছে মনের ব্যথার কিছুই নেই।'

'কিছু নেই তাও ঠিক না, বাবা। মনের অসুখের ডাক্তারও আছে।'

'অসুখের কথা তো বলছি না। মনে ব্যথার কথা হচ্ছে। মনের অসুখ আর মনের ব্যথা দুটা দুই জিনিস।'

'তোমার মনে কোনো ব্যথা আছে?'

'থাকবে না কেন? আছে। সবার মনেই অল্পবিস্তর আছে। আমারও আছে।'

'কী নিয়ে ব্যথা?'

'এই যে মইনুদ্দিনের বাড়ি নিয়ে এত বড় অন্যায় কাজটা করলাম। বেচারার কাছ থেকে টাকা-পয়সা এনে খরচ করে ফেললাম। রেলিং দিলাম না, ছাদে ঘর করলাম না। দারোয়ান আর মালির ঘরটাও হল না।'

'উনি তো আর সেই খবর পান নি।'

'যখন বেঁচেছিল তখন পায় নি। এখন পাচ্ছে। মৃত মানুষ সব জায়গায় যেতে পারে। সবকিছু দেখতে পারে। সে তো এখন সব কিছুই দেখছে। এই যে আমরা রিকশা করে যাচ্ছি হয়তো সেও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

বাবা চুপ করে গেলেন।

বুনোভাইয়ের কথা মনে হচ্ছে পুরোপুরি ভুল না। বাবার মনের মধ্যে কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আমরা যারা তাঁর চারদিকে ঘোরাঘুরি তাদের কারো চোখে পড়ছে না। আর যে লোকটি দরজা বন্ধ করে সরাক্ষণ পা নাচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সে সব জেনে বসে আছে, আশ্চর্য তো!

৩

আমি এবং মেজোভাই একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। নীতু এসে ডাকল, 'ভাইয়া।' আমরা দুজন একসঙ্গে বললাম, 'কী?'

নীতু আমাদের দুজনকেই ভাইয়া ডাকে। আমরা দুজন এক সঙ্গে থাকলে খুব মুশকিল হয়। ভাইয়া ডাকলে একসঙ্গে বলি, কী। নীতু হেসে গড়িয়ে পড়ে। আজ হাসল না। মুখ কালো করে বলল— 'বাবা যেন কী রকম করছেন।' আমরা ছুটে গেলাম। বাবা দিব্যি ভালো মানুষের মতো দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। চশমার কাচ পরিষ্কার করছেন। আমাদের হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

মেজোভাই বললেন, 'আপনার শরীর কেমন?'

আমরা সবাই বাবাকে তুমি করে বলি। মেজোভাইও বলেন। তবে তিনি কেন জানি মাঝে মাঝে 'আপনি' বলেন।

বাবা বললেন, 'আমি তো ভালোই আছি। দাঁতের ব্যথা এখন আর নেই।'

মেজোভাই বললেন, 'এখানে বসে কী করছেন?'

'বসে থেকে কী আর করা যায়! চশমার কাচ পরিষ্কার করছি। কেন বল তো?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

www.BDeBooks.Com

'ইস্তিয়াক, তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে ?'

মোজোভাই বললেন, ভালো হচ্ছে।

'পরীক্ষা কবে ?'

'এখনো দেরি আছে।'

'কত দেরি ?'

'ধর মাসখানিক।'

'মাসখানিক আর দেরি কোথায় ? ত্রিশদিন। মাত্র সাত শ বিশ ঘণ্টা। আর সময় নষ্ট করবি না। এখন খানিকটা কষ্ট করলে বাকি জীবন তার ফল ভোগ করবি।'

নিতান্তই সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। বাবারা যেসব কথা ছেলেদের বলেন— সেসব কথা। আমরা দুজন নিচে নেমে নীতুকে খুঁজে বের করলাম। মেজোভাই বিরক্তমুখে বললেন, 'সব সময় ফাজলামি করিস কেন ?'

নীতু মুখ কালো করে বলল, 'ফাজলামি করব কেন ? আমি ঘর পরিষ্কার করছি, বাবা আমাকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। মইনুদ্দিন বসার ঘরে বসে আছে। আমি কোন্ লজ্জায় তার সামনে পড়ব বল ? তুই তোর মাকে নিয়ে যা। বল্ যে আমরা এই বাড়ি ছেড়ে দেব। টাকা-পয়সা যা নিয়েছি সব তো আর একসঙ্গে দিতে পারব না, বাই ইন্সটলমেন্ট দিয়ে দেব। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি বাসায় নেই। বলবি আমি দেশের বাড়ি গিয়েছি। যা, তাড়াতাড়ি যা। তোর মাকে সঙ্গে করি নিয়ে যা।'

মেজোভাই বলেন, 'তুই এসব বসে বসে বানিয়েছিস। বাবা কখনো এরকম কিছু বলে নি।'

নীতু রেগে গিয়ে বলল, 'আমি শুধু আজেবাজে কথা বানাতে যাব কেন ? বাবাকে পাগল বানিয়ে আমার লাভ কী ?'

'লাভ-ক্ষতি জানি না। তুই কথা একটু বেশি বলিস। কথা দয়া করে কম বলবি।'

'কথা তুমিও বেশি বল। তুমিও দয়া করে কথা কম বলবে।'

'আমি কথা বেশি বলি ?'

'হ্যাঁ, বেশি বল। বড় আপাকে কী নাকি বলেছ— বড় আপা আজ চলে যাচ্ছে। বাচ্চাদের নিয়ে একা একা ফ্ল্যাটে থাকবে।'

'আমি তো কিছুই বলি নি।'

'অবশ্যই বলেছ।'

'কী বলেছি ?'

'বলেছ, বসতবাড়ি মুসলিম আইনে মেয়েরা পায় না। পায় ছেলেরা। কাজেই এই বাড়ি তোমরা তিন ভাই পাবে। একটা লিমিটেড কোম্পানি হবে। সেই কোম্পানি সদস্য হবে শুধু ছেলেরা। একজনের কাছে থাকবে পাওয়ার অব এটর্নি, সেই কোম্পানি দেখাশোনা করবে। বল নি এসব কথা ?'

'হ্যাঁ, বলেছি। তাতে অন্যায়টা কী হয়েছে? আইনে যা আছে তাই বলেছি।'

'এই আইন তোমকে কে শিখিয়েছে? কোত্থেকে শিখলে এই আইন?'

'তুই চেঁচাচ্ছিস কেন?'

'তুমি যা শুরু করেছ না চেঁচিয়ে করব কী? একজন ভিক্ষা দিয়েছে সেই ভিক্ষা নিয়ে লাফালাফি শুরু করেছ। ভিক্ষা নিতে লজ্জা লাগে না?'

'চুপ করতো!'

'না, চুপ করব না। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। তোমার বাড়াবাড়ি ঘুচিয়ে দেব।'

'আমার বাড়াবাড়ি ঘুচিয়ে দিবি?'

'হ্যাঁ, দেব। এই বাড়ি আমি ফেরত দেয়াব। ঐ মেয়েকে দেয়াব। আর যদি ঐ মেয়ে নিতে না চায়— তাহলে কোনো একটা এতিমখানাকে কিংবা এইরকম কোনো প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার ব্যবস্থা করব। বাবাকে বললেই বাবা করবেন।'

'বাবা করে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ করবেন।'

'বাবার উপর তোর এত কনট্রোল আছে তা তো জানতাম না।'

'যখন খাঁচা থেকে পাখি উড়ে যাবে তখন জানবে। তার আগে জানবে না। আর তুমি কি ভেবেছ বাবাকে আমি বলি নি? বলেছি। বাবা কী বলেছেন জানতে চাও?'

মোজোভাই চুপ করে রইলেন।

নীতু সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করতে করতে বলল, 'বাবা আমাকে বলেছেন, তিনি তাই করবেন।'

মোজোভাই নীতুর কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন না, আবার পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও পারলেন না। নীতু লোকজনকে ধাঁধায় ফেলার জন্যে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে এটা যেমন সত্যি, আবার কঠিন সত্য কথা অবলীলায় বলে এটাও সত্যি।

নীতু বলল, 'ভাইয়া, তোমার লোভ খুব বেশি। এত লোভ ভালো না। লোভ কমাও। নয়তো কষ্ট পাবে। এই বাড়িতে যখন এতিমখানা হবে কিংবা ফিরিয়ে দেয়া হবে তানিয়াকে, তখন বুনোভাইয়ের কিছুই হবে না। সে এখন যেমন আছে তখনো তেমনি থাকবে। কারণ তাঁর এই বাড়ির উপর কোনো লোভ নেই। মনের কষ্টে মারা যাবে তুমি। কারণ লোভে তোমার সর্বাঙ্গ জড় জড়।'

নীতু মেজোভাইকে স্তম্ভিত করে দোতলায় উঠে গেল। মেজোভাইকে দেখাচ্ছে বাজ-পড়া তালগাছের মতো। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে বললেন, 'নীতু কি পাগল হয়ে গেল নাকি? এসব কী বলছে? আমার তো মনে হয় ওর ব্রেইন পুরোপুরি ডাউন। ও পাগল হয়ে গেছে।'

'বুঝতে পারছি না। হয়তো হয়েছে।'

'বড় আপার কাণ্ডটা দেখ তো। ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি, ওমনি আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে রওনা হয়ে পড়েছে। এমন তো না যে তার টাকাপয়সা নেই।—

www.BDeBooks.Com

প্রচুর টাকা। চৌদ্দ লাখ টাকায় দুলাভাই ফ্ল্যাট কিনলেন। এছাড়াও দুলাভাইয়ের পৈত্রিক বাড়িও আছে। তাঁকে বাদ দিয়ে লিমিটেড কোম্পানি খুলতে তাঁর এত আপত্তি কেন ?'

'ভাইয়া, ঐ প্রসঙ্গ থাক।'

মেজোভাই ইতস্তত করে বললেন, 'তুই যা তো— দেখ আপাকে বুঝিয়ে - সুঝিয়ে শান্ত করা যায় কিনা। আর নীতুকে ঠাণ্ডা করতে হবে। আমাদের বোনগুলোর এমন মাথা গরম হল কেন বল তো ? আমার ধারণা মাথা গরম ভাবটা এরা মার কাছ থেকে পেয়েছে।'

'হতে পারে।'

'ভাগ্যিস মা ঘরে নেই। মা থাকলে হইচই বাঁধিয়ে বিশ্রী কাণ্ড করত।'

'তা ঠিক।'

'মা কোথায় জানিস ?'

'কই। জিতু মিয়াকে নিয়ে যখন গেছে তখন মনে হয় কাঁচা বাজারে।'

'মা আসার আগেই ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলা যায় কিনা একটু দেখ তো।'

'দেখছি।'

বড় আপাকে সামলোনো খুব কঠিন হবে না। এর আগেও তিনি রাগ করে বাড়ি ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে। সুটকেসে কাপড় ভরেছেন, তারপর আবার রাগ পড়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়ই আপনাআপনি তার রাগ পড়ে যায়। আজ তা হবে কিনা কে জানে। নির্ভর করছে মেজোভাই তাকে কতটা রাগিয়েছে তার উপর। আমি বড় আপার ঘরের দিকে রওনা হলাম।

'আপা আসব ?'

বড় আপার চোখ ভেজা। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'না।'

'আমি ঘরে ঢুকলাম।'

বড় আপা সুটকেসে কাপড় গুছাচ্ছেন।

রিমি এবং পলি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। তাদের চোখও ভেজা। সম্ভবত মার খেয়েছে। চুপচাপ থাকলে মেয়ে দুটিকে পুতুলের মতো লাগে। আদর করতে ইচ্ছা হয়। আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জিভ বের করে আমাকে ভেংচি দিল। কেউ কাউকে শিখিয়ে দিল না। দু'জনেই করল এক সঙ্গে। আশ্চর্য কো-অর্ডিনেশন।

বড় আপা বলল, 'কী বলবি বলে চলে যা। বিরক্ত করিস না।'

আমি খাটের উপর বসলাম। বড় আপাকে খুশি করার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মুখ কাঁচুমাচু করে তাঁর কাছে টাকা ধার চাওয়া। কেউ টাকা ধার চাইলে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। মুখে অবশ্যি চূড়ান্ত অখুশির ভাব নিয়ে আসেন। একগাদা কথা বলেন— 'তোরা আমাকে কী ভাবিস ? আমি টাকার গাছ ? আমাকে ঝাঁকি দিলেই হুড়হুড় করে টাকা পড়বে ? ও আমাকে কোনো

হাতখরচ দেয় ? একটা পয়সা দেয় না। বাজার খরচ বাঁচিয়ে দু'একটা জমাই। তাও তোরা ধারের কথা বলে নিয়ে যাস। টাকার দরকার হলেই বড় আপার কথা মনে হয়। অন্য সময় তো মনে হয় না।'

একগাদা কথা বলেন ঠিকই, বলতে বলতেই তার মন ভালো হয়ে যাবে। খুশি খুশি মুখে টাকা বের করবেন।

আমি এই পদ্ধতি কাজে লাগাব বলে ঠিক করলাম। ইতস্তত করে বললাম, 'বড় আপা, একটা কথা বলতে চাচ্ছি সাহসে কুলোচ্ছে না। তুমি রাগই কর কিনা। আজকাল তুমি আবার অল্পতেই রেগে যাও।'

'আমার আবার রাগ। আমার রাগে কার কী যায় আসে ? আমি একটা মানুষ নাকি ? কী ব্যাপার ?'

'এলিফ্যান্ট রোডে একটা শার্ট দেখে এসেছি। আমার খুব পছন্দ হয়েছে আপা। মেরুন কালার।'

'পছন্দ হলে কিনে ফেল।'

'তুমি টাকা না দিলে কিনব কোত্থেকে ? আমার কাছে কি টাকা-পয়সা আছে ?'

'তোরা আমাকে ভাবিস কী ? টাকার বস্তা ?'

'হ্যাঁ।'

বড় আপা খুশি হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ উজ্জ্বল। অনেক চেষ্টা করে তিনি মুখে বেজার ভাব নিয়ে এলেন।

'তোদের এই ধার চাওয়ার অভ্যাসটা গেল না। আমার কাছে কিছু হবে-টবে না। যা, বিরক্ত করিস না।'

'আপা, দিতেই হবে।'

'ধার, ধার আর ধার। কোনোদিন একটা পয়সা ফেরত দিয়েছিস ?'

'এবারেরটা দেব। অনেস্ট। আপা অন গড। অবশ্যই ফেরত দেব।'

'আর দিবি! তোদের আমি চিনি না ? হাড়ে হাড়ে চিনি। কত দাম শার্টের ?'

'তিনশ।'

'মিথ্যা কথা বলছিস। ঠিক করে বল কত ?'

'আড়াই শ!'

'আশ্চর্য তোদের স্বভাব। এর মধ্যেও ট্রিকস করে পঞ্চাশ টাকা হাতিয়ে নেবার মতলব ?'

'তিনশ চাচ্ছে আড়াই শতে দেবে।'

বড় আপা সুটকেস খুলে তিনটা একশ টাকার নোট বের করে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এক্ষুণি পঞ্চাশ ফেরত দিয়ে যাবি। আমি কিন্তু বসে থাকব।'

'সুটকেস গুছাচ্ছিলে, ব্যাপার কী ?'

'ভাবছিলাম ফ্ল্যাটে চলে যাব।'

'কেন ?'

www.BDeBooks.Com

'ইস্তিয়াকের গায়ে চর্বি বেশি হয়েছে। আমাকে আইন দেখায়। মুসলিম আইনে বসতবাড়ি ভাগ হয় না। কে চায় তোর বসতবাড়ি ? আমাকে এসব বলার অর্থ কী ? আমি কি গাছ তলায় আছি ? চৌদ্দ লাখ টাকা নগদ গুনে ফ্ল্যাট কিনেছি। ব্যাংক থেকে একটা পয়সা নেই নি।'

'তা তো ঠিকই।'

'আমাকে অপমান করে আইন দেখায়। ভালো করে বল যে, আপা, এই বাড়িটা আমাদের তিন ভাইয়ের থাকুক। তোমার তো বাড়ি আছেই। তা না, ফারাজী আইন। আইনজ্ঞ এসেছেন।'

'ঠাশ করে গালে একটা চড় লাগালে না কেন ?'

'বড় আপা আরো খুশি হয়ে গেলেন। আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় সবাইকে নিয়েই হবে, পাওয়ার অব এটর্নি থাকবে তোমার কাছে। কারণ তুমি সবার বড়।'

'এই সাধারণ কথা গাধাটার মাথায় ঢুকলে তো কাজই হত।'

বড় আপা মেয়ে দুটির দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, 'তোরা এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?'

'আমরা যাচ্ছি না মা ?'

'না।'

মেয়ে দুটি এক সঙ্গে এমন প্রচণ্ড চিৎকার দিল যে ঘরের জানালা পর্যন্ত কেঁপে গেল। এরকম দুটি মেয়েকে বড় করতে আপার জীবন পানি হয়ে যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'যাই আপা।'

'যা। টাকাটা দিয়ে যাস কিন্তু।'

'দুই-একদিন পরে দেই আপা ?'

বড় আপার খুশিখুশি ভাব আরো প্রবল হল। যদিও বিরক্ত গলায় বললেন, 'একবার তোর হাতে টাকা চলে গেছে, এই টাকা কি ফেরত আসবে ? অভ্যাসটা বদলা। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে যার-তার কাছে টাকা চাইবি। টাকা ধার চাওয়া আর ভিক্ষা চাওয়া একই।

'তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।'

বড় আপার মনের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে গেল। তিনি সুটকেস থেকে কাপড় নামিয়ে রাখছেন। আমি বললাম, 'তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি এটা আবার কাউকে বলবে না।'

'আচ্ছা যা, বলব না।'

আমার শেষ কথাটাও তাকে খুশি করার জন্যে বলা। আপাকে কিছু গোপন করতে বললেও তিনি খুব খুশি হন। এবং কথাটা জনে জনে বলে বেড়ান। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের পরিবারের সব সদস্যই জানবে যে, তিনি আমাকে শার্ট

কেনার জন্যে তিনশ টাকা দিয়েছেন। আসল দাম আড়াই শ। ফাঁকি দিয়ে পঞ্চাশ বেশি নিয়েছি। পুরো ঘটনা বলার পর বলবেন, থাক, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো। বেচারা লজ্জা পাবে। আমাকে বলেছে কাউকে না জানাতে।

৪

আমাদের বাসার একটি অলিখিত নিয়ম হচ্ছে— পুরুষরা আলাদা খাবে, মেয়েরা আলাদা। রাতের খাবার খেতে বসেছি। আমি, বাবা এবং মেজোভাই। বুনোভাই খবর পাঠিয়েছেন তিনি নিজের ঘরেই খাবেন। তাকে যেন খাবার পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভাগ্যিস মা এই হুকুম শুনতে পান নি। শুনতে পেলে হইচই বেঁধে যেত। বাথরুমে পড়ে গিয়ে মা কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। মুখে বলছেন তেমন কিছু না কিন্তু তার ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে অবহেলা করার মতো ব্যথা না।

খাবার-দাবার তদারক করছেন বড় আপা। আজকের সমস্ত রান্না তার। প্রতিটিতেই লবণ কম হয়েছে। এই খবরটা বললে, তিনি কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করবেন। আমরা কিছু বলছি না। শুধু বাবা বলে ফেললেন, বিনা লবণে রাঁধা ব্যাপারটা কী বল তো?

আপা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'ইচ্ছে করে লবণ কম দিয়েছি।'

'ইচ্ছে করে কম দিবি কেন?'

'তোমার জন্যেই কম দিলাম। লবণ খেলে প্রেসার বাড়ে।'

'জিনিসটা মুখে তো দিতে হবে। ভাত খেতে বসেছি, ওষুধ তো খেতে বসি নি।'

বড় আপার মুখ কালো হয়ে গেল। বাবা খাবার রেখে উঠে পড়লেন। এরকম তিনি কখনো করেন না। তাঁর আজ মনটা ভালো নেই। বড় আপা থমথমে গলায় বললেন, 'বস, ডিম ভেজে দিচ্ছি।'

বাবা বসলেন না। হনহন করে চলে গেলেন।

মেজোভাই হাসিমুখে বলল, 'আমার কাছে তো লবণ পারফেক্ট বলে মনে হচ্ছে। এমন চমৎকার একটা তরকারি বাদ দিয়ে ডিম দিয়ে ভাত খাব?' বড় আপা বললেন, 'রঞ্জু, তোর কাছেও কি লবণ কম মনে হচ্ছে?' আমি হাসিমুখে বললাম, 'না, তো। ঠিকই তো আছে।'

'তাহলে বাবা এরকম করল কেন?"

'বাবার শরীর ভালো না।'

বড় আপা চিন্তিত স্বরে বলল, 'আসলেই তাই। কাল রাতে রিমিকে বাথরুম করাতে নিয়ে যাচ্ছি— দেখি বারান্দায় একটা মোড়ার উপর বাবা চুপচাপ বসে আছেন। আমি বললাম, 'এখানে বসে আছ কেন? বাবা বিড়বিড় করে কী-সব বলল, বুঝলামও না। তরকারিটা ভালো হয়েছে?'

www.BDeBooks.Com

'অসাধারণ!'

'রংটা সুন্দর হয়েছে। কেমন টকটকে লাল। কীভাবে হল বল তো?'

'জানি না। কীভাবে?'

'রান্না শেষ হবার পর আধ চামচ ফুড কালার দিয়েছি। তোর দুলাভাই ব্যাংকক থেকে এনেছিল। আধ চামচ দিলেই রক্তের মতো লাল হয়ে যায়।'

আমি বললাম, 'রক্তের মতো লাল হওয়াটা কি ভালো? মনে হবে না রক্ত খাচ্ছি?'

'দূর পাগলা।'

পরিবেশ হালকা হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে নীতু এসে খেতে বসল। বিকেলেই নীতুর সঙ্গে মেজোভাইয়ের কঠিন ঝগড়া হয়েছে— সেই ঝগড়ার কথা এখন আর নীতুর মনে নেই। এই বয়সী মেয়েদের মন নদীর পানি মতো। কোনো কিছুই এরা জমা করে রাখে না। ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নীতু বেশ হাসিমুখে মেজো ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছে।

'ভাইয়া, তোমার এক নম্বর বান্ধবীর সঙ্গে আজ দেখা— শ্রাবণী। ফুটপাতের কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফুটপাতের দোকানগুলোতে ছিট কাপড় দেখছিল।'

'তাই নাকি?'

'আমার একটা অবজারভেশন কি জান ভাইয়া? আমার অবজারভেশন হচ্ছে ফুটপাতে সবচে' বেশি ঘোরাঘুরি করে বড়লোকেরা। এটা এদের এক ধরনের ফ্যাশন।'

'হতে পারে।'

'আমি উনাকে বললাম, কী, ভালো আছেন? মনে হল চিনতে পারল না। বড়লোকদের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল হয়। ইস, কী কুৎসিত রং হয়েছে তরকারিটার! মনে হচ্ছে রেড পেইন্ট খাচ্ছি।'

মেজোভাই চোখের ইশারায় নীতুকে থামিয়ে দিলেন। ভাগ্যিস, বড় আপা সামনে নেই। নীতু নিচু গলায় বলল, 'ভাইয়া, তোমরা এই তরকারি খাচ্ছ কী করে? লবণ তো একেবারেই নেই।

'চুপ করে খা।'

নীতু মুখ বেজার করে খেতে শুরু করল। মেজোভাই বললেন, 'একটা খবর দিয়ে তোদের আজ চমৎকৃত করে দিতে পারি।'

নীতু বলল, 'কোনো খবরেই আমি চমৎকৃত হব না।'

'এটা শুনলে চমকে যাবি। আমি তানিয়াদের বাসায় গিয়েছিলাম।'

নীতু সত্যি সত্যি চমকাল। মেজোভাই বললেন, 'কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে যাই নি, জাস্ট সোস্যাল ভিজিট। ঠিকানাটা ছিল। ঐদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম' ..নীতু হেসে ফেলল।

মেজোভাই বলল, 'হাসলি যে?'

'অন্য অথা ভেবে হেসেছি। তোমার সোস্যাল ভিজিটের সাথে আমার হাসির কোনো সম্পর্ক নেই। তানিয়ার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী কথা জানতে পারি ?'

'তেমন স্পেসিফিক কোনো কথা না— তবে যা বুঝতে পারলাম, তা হচ্ছে এই মেয়ের প্রচুর টাকা। বুনোভাই বলছিল, এদের হাতে টাকা-পয়সা নেই। যা ছিল বাপের চিকিৎসায় সব শেষ হয়েছে। এটা ঠিক না। এই বাড়ি ছাড়াও তাদের আরো একটা বাড়ি আছে— গুলশানে। সেই বাড়ি থেকে ভাড়াই আসে মাসে ত্রিশ হাজার।'

'ভালো কথা।'

'আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে— বুনোভাইয়ের ধারণা ঠিক না। বুনোভাইয়ের ধারণা— এই বাড়ি মেয়েটা তার বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য দিয়েছে এবং দিয়ে কষ্টে পড়েছে। দ্যাটস নট ট্রু।'

'তোমার কি ধারণা মইনুদ্দিন চাচা আমাদের উপহার দেবার জন্যে এ বাড়ি বানিয়েছিলেন ?'

'হতে পারে। সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মতো না। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীর্ঘদিন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। এই সব কথা মনে করে...।'

নীতু হাসল। হাসতে হাসতে বলল— 'বাড়ি বাড়ি করে তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।'

'মাথা এলোমেলো হবে কেন ? পুরো ব্যাপারটা অ্যানালিসিস করছি।'

'তানিয়া কি তোমাকে চা-টা খাওয়াল ?'

'খাওয়াবে না কেন ? চমৎকার মেয়ে। এ দেশে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। গুলশানের বাড়ি বিক্রি করার কথা বলছিল, তার থেকে মনে করছি দেশে থাকবে না। ভদ্রলোকরা আজকাল আর দেশে থাকে না। আমি অবশ্যি সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

'তুমি এক কাজ কর ভাইয়া, শ্রাবণীর পেছনে পেছনে না ঘুরে এই মেয়ের সঙ্গে ভাব কর।'

মেজোভাই রাগী গলায় বললেন, 'ফাজলামি করছিস নাকি ?' নীতু হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ ফাজলামি করছি। চট করে রেগে যাবার মতো কিছু অবশ্যি করি নি। আর তুমি যদি রেগে যাও সেটাও তোমার জন্য খারাপ হবে। আমি এমন সব কথা বলব যে সহ্য করতে পারবে না। আমি যেমন ফাজলামি করতে পারি, তেমনি কঠিন কথাও বলতে পারি।'

আমি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম। তারা দুজনে দুজনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেউ দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে না। এ যেন চেয়ে থাকার একটা প্রতিযোগিতা। যে প্রথম চোখ নামিয়ে নেবে সে হেরে যাবে। মেজোভাই হেরে গেলেন। তিনিই প্রথম চোখ নামিয়ে নিলেন। নীতু বিজয়ীর ভঙ্গিতে বসে আছে।

www.BDeBooks.Com

৫

মেজোভাইয়ের এই বান্ধবীর সঙ্গে আমার আগে কখনো কথা হয় নি। আজ কথা হল। সন্ধ্যার আগে আগে তিনি বাসায় এলেন। আমি দোতলা থেকে দেখলাম। বেচারিকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মনে হয় অনেক দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে। দুপুরে খাওয়া হয় নি।

জিতু মিয়া আমাকে এসে বলল, 'আপনেরে ডাকে।'

'আমাকে ডাকবে কেন ? আমাকে ডাকে না। ভাইয়াকে ডাকে। তুই গিয়ে বল্ উনি নেই।'

'বলছি, আফা আপনের সাথে কথা বলতে চায়।'

মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে বসার ঘরে বসেছিল। আমাকে দেখে আরো যেন জড়োসড়ো হয় গেল। তার পরনে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। সবুজ শাড়িতে মেয়েদের খুব মানায় অথচ এই রঙটা কেন জানি মেয়েরা পছন্দ করে না।

'আপনি কি আমাকে ডেকেছেন ?'

'জ্বি।'

'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

'আমার সঙ্গে একটু বাইরে আসুন। প্লিজ।'

'আমি বিস্মিত হয়ে তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। আমাকে সে একেবারে রাস্তায় নিয়ে এসে নিচু স্বরে বলল, 'আমি যে এসেছি এটা যেন ও না জানে।'

'কেউ জানবে না। অবশ্যি এখন যদি ভাইয়া চলে আসেন তাহলে ভিন্ন কথা। সম্ভবত আসবেন না। কয়েকদিন ধরেই রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে আসেছেন। ব্যাপারটা কী বলুন তো ?'

'পরীক্ষা দিচ্ছে না কেন জানেন ?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পরীক্ষা দিচ্ছে না ! কী বলছেন এসব ?'

'না, দিচ্ছে না। শুধু প্রথম পরীক্ষাটায় বসেছিল। তারপর আর বসে নি।'

'সে কী!'

'আমার বড়ভাই ওর সঙ্গে পড়ে। তার কাছ থেকে শুনেছি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করায় খুব রাগারাগি করল। আমার সঙ্গে সে কখনো রাগারাগি করে না। আমার এত মনটা খারাপ হয়েছে!'

মেয়েটির চোখে সম্ভবত পানি এসে গেছে। সে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বেচারি চোখের পানি লুকানোর চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'ভাইয়া পরীক্ষা দিচ্ছে না, আমরা এটা জানতাম না। আমরা জানতাম, সে ঠিকমতোই পরীক্ষা দিচ্ছে। আপনি কি আরো কিছু বলবেন ?'

'আরেকটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম থাক, সেটা বলব না।'

'চলুন আপনাকে রিকশায় তুলে দিয়ে আসি।'

'না-না, লাগবে না। আমি যে এসেছিলাম এটা দয়া করে বলবেন না।'

'না আমি বলব না।'

'আচ্ছা, ওর কি কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'কোনো সমস্যা হয় নি। যদি হয়েও থাকে কেটে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

'এগার তারিখ আমার জন্মদিন ছিল। ও আসে নি। ওর সঙ্গে তিন বছর ধরে আমার পরিচয়। প্রত্যেক জন্মদিনে সে আসে। এবার আসে নি।'

'এর পরের জন্মদিনে নিশ্চয়ই থাকবেন।'

মেয়েটাকে আমি রিকশায় তুলে দিলাম। তার জন্যে আমার খারাপ লাগতে লাগল। পরীক্ষা না দেয়ার অপরাধ ক্ষমা করা যায় কিন্তু এমন চমৎকার একটি মেয়ের জন্মদিনে উপস্থিত না হওয়ার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

বেচারির নিশ্চয়ই সাদামাটা ধরনের জন্মদিনের উৎসব হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিও হয়তোবা একজনই। এই মেয়ে নিজের হাতে পায়েস রান্না করেছে। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর তার চোখ পানি এসেছে। জন্মদিনে কাউকে কাঁদানোর অপরাধে কোর্টে নালিশ হয় না। কিন্তু হওয়া বোধ হয় উচিত।

মেজোভাইকে পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করতেই তার চোখ-মুখ কঠিন করে বললেন, 'তোকে খবর দিল কে?'

'আমার এক বন্ধুর ছোট ভাই। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'পরীক্ষা দিলে না কেন?'

'কী মুশকিল, তোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'কৈফিয়ত চাচ্ছি না তো। জানতে চাচ্ছি।'

'প্রিপারেশন ভালো ছিল না, কাজেই ড্রপ করে দিলাম। এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না। সামনের বছর দেব।'

'পরীক্ষা ড্রপ করেছ এটাইবা বাসায় বললে না কেন? বলার দরকার না? মা তোমার পরীক্ষার জন্য রোজা রাখছেন।'

'রোজা রাখছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। এটা তো নতুন কিছু না। সবার পরীক্ষার সময়েই মা রোজা রাখেন। আগে রুটিন জেনে নিয়ে সেই রুটিন মতো...।'

রোজা রেখে মা খুবই ক্লান্ত হয়েছিলেন। ইফতারি পর ঘর অন্ধকার করে শুয়েছিলেন। এই অবস্থাতেই মেজোভাই তার পরীক্ষা ড্রপ করার কথা বললেন। মা শান্ত ভঙ্গিতে শুনলেন, তারপর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা যা।

তিনি পরের দিনও রোজা রাখলেন। আগেই মানত করা। কাজেই সবগুলোই নাকি রাখতে হবে।

বাবা পরীক্ষা ড্রপ করার প্রসঙ্গে কিছুই বললেন না। এটাও বেশ আশ্চার্যের ব্যাপার। আগে সবরকম পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে রাতে বসতে হত। কোনটা কী আনসার দেয়া হয়েছে তা বলতে হত।

www.BDeBooks.Com

মেজোভাই সেকেন্ড ইয়ার থেকে থার্ড ইয়ারে উঠার পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবা প্রশ্ন পড়ার জন্য বসে আছেন। মেজোভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রশ্নের তুমি কী বুঝবে ?'

'তুই বুঝিয়ে দে। বুঝিয়ে দিলে বুঝব।'

'বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না। তোমার বোঝার কথা না।'

'তবু কোশ্চেনটা দে। কোশ্চেন দেখতে তো অসুবিধা নেই।'

মোজোভাই মহাবিরক্ত হয়ে কোশ্চেন এগিয়ে দিলেন। বাবা গভীর মনোযোগে কোশ্চেন দেখতে দেখতে বললেন, 'প্রথম প্রশ্নটার আনসার করেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'দু' নম্বর প্রশ্নটা তো অংক। অংক না ?'

'হ্যাঁ।'

'হয়েছে অংকটা ?'

'করে দিয়ে এসেছি। হয়েছে কিনা জানি না।'

'কারো সঙ্গে উত্তর মিলিয়ে দেখিস নি— মানে ভালো ছেলেদের সঙ্গে ?'

'আমি নিজেই তো একজন ভালো ছেলে। আমি আর কার সাথে মিলাব ?'

সেই ভালো ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে না। আর বাবা এই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলছেন না— এটা ভাবাই যায় না। আসলে বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। তাঁর এখন কোনো বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তি আছে বলেই মনে হচ্ছে না। রাতে একেবারেই ঘুমোতে পারেন না। কড়া ঘুমের ওষুধ খাবার পরও তিনি জেগে থাকেন। বসে থাকেন বারান্দায় জলচৌকিতে। বিড়বিড় করে কার সঙ্গে যেন কথা বলেন।

বুনোভাই বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। এই ডাক্তারের ঠিকানা দিয়েছেন আমাদের পাড়ার ডাক্তার। ইনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। ভদ্রলোকের ব্যবহার ভালো, কথাবার্তা ভালো। প্রশ্ন করেন আগ্রহ নিয়ে। ডাক্তার রোগীকে প্রশ্ন করছে এ রকম মনে হয় না। মনে হয় পরিচিত একজন মানুষ অন্যজনের খোঁজ নিচ্ছেন।

'আপনার সমস্যাটা কী বলুন তো ?'

'মনে একটা অশান্তি। বাড়িটা ঠিকমতো বানাতে পারি নি। রেলিং দেয়া হয় নি। ছাদে দুটো ঘর করার কথা ছিল— ড্রাইভার এবং মালীর ঘর।'

'টাকা কম পড়ে গেল ?'

'না, কম পড়ে নি। মইনুদ্দিন টাকা পাঠিয়েছিল। যা দরকার তার চেয়েও অনেক বেশি খরচ করে ফেললাম।'

'ও আচ্ছা।'

'ও এখন মাঝে মাঝে আসে। কিছু অবশ্যি বলে না। বন্ধু মানুষ, কী আর বলবে!'

বুনোভাই বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।'

'আপনাকে কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছি। আপনারা দুইভাই বরং বাইরে গিয়ে বসুন।'

ঘন্টাখানিক পর ডাক্তার আমাদের ডাকলেন। বুনোভাইকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আপনার বাবার মাথায় ইলেকট্রিক শক দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁর যা শরীর এবং বয়স আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না। হিপনটিক ড্রাগ কিছু দিয়েছি। ঐগুলো চলুক এবং আপনারা এক কাজ করুন, ঐ বাড়ি থেকে আপনার বাবাকে সরিয়ে নিন। গ্রাম-ট্রামের দিকে নিয়ে যান। আরেকটা কথা— আপনারা আপনার বাবাকে ডাক্তার দেখাতে এত দেরি করেছেন কেন? আপনাদের উচিত ছিল আরো আগেই তাঁকে নিয়ে আসা।'

ফেরার পথে বাবা খুব স্বাভাবিক আচরণ করলেন। মেজোভাই পরীক্ষা ড্রপ করে কাজটা খুব খারাপ করেছে এই কথাও বললেন। তার মানে আশপাশে কী ঘটছে তা যে একবারেই জানেন না— তা না, জানেন। এক সময় বললেন, 'তোর মা এখন আর আগের মতো চেঁচামেচি করে না। বেচারির শরীর দুর্বল হয়েছে। তার দিকে লক্ষ রাখা দরকার। আমাকে ডাক্তার দেখানোর আগে তোদের উচিত ছিল তাকে ডাক্তার দেখানো।'

'তাঁকেও দেখাব।'

'সে স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই মানে না। স্বাস্থ্যবিধি মানলে এরকম হয় না।'

'তা ঠিক।'

'ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চিরতার পানি আর ইসবগুলের ভূষি এই দু'টা জিনিস কম্পলসারি করে দেয়া উচিত। সপ্তাহে একদিন অর্জুন গাছের ছাল।'

'জ্বি। ঠিকই বলেছেন।'

'সব সময় মনটাও প্রফুল্ল রাখা দরকার। যাবতীয় অসুখের মূলে আছে মনের অবস্থা। অসুখটা প্রথমে তৈরি হয় মনে, তারপর সারা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আগেরকার সাধু-সন্ন্যাসীরা যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেতেন তার কারণ হল তাঁদের মনে কোনো ঝামেলা ছিল না। মন ছিল নির্মল। বুঝতে পারছিস? নির্মল। আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'বাসায়।'

'মইনুদ্দিনের সঙ্গে দেখা হয়ে না গেলে হয়। হয়তো গিয়ে দেখব বসার ঘরে।'

বুনোভাই বললেন, 'তুমি এই একটা ভুল সবসময় করছ। তুমি ভুলে যাচ্ছ উনি জীবিত নেই।'

'ভুলে যাব কেন? আমার খুব ভালো মনে আছে। লিভার ক্যান্সারে মারা গেল। স্বাস্থ্যবিধি না মানার কুফল। বিড়ি খেত বুঝলি? বিড়ির গন্ধে তার কাছে যাওয়া যেত না। কতবার বলেছি বিড়িটা ছাড়।'

www.BDeBooks.Com

'টাকা-পয়সা যখন হয়েছে তখনো বিড়ি খেতেন ?'

'না, তখন কি আর বিড়ি খাওয়া যায় ? এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়িতে চড়ে কেউ কি বিড়ি খেতে পারে ?'

বাসায় পৌঁছে বাবা যে কাজটি করলেন তা দেখে আমরা পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম যে, তাঁর জগৎ-সংসার সত্যি সত্যি উল্টে গেছে। আমরা ঘরে ঢুকছি। বড় আপা দরজা খুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বাবা বড় আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্লামলিকুম। কেমন আছেন ?'

বড় আপা সব জিনিস অনেক দেরিতে বোঝেন। বাবা যে তাকে চিনতে পারছেন না তাও তিনি বুঝলেন না। তিনি আদুরে গলায় বললেন, 'এত দেরি হল কেন ?'

বাবা তখন অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি তো ঠিক.. মানে চিনি ঠিকই, নামটা মনে আসছে না। আপিন কি পাশের বাসা থেকে এসেছেন ?'

বড় আপা চেঁচিয়ে কেঁদে-টেদে একটা হইচই বাঁধিয়ে দিলেন। মা হইচই শুনে নিচে নেমে এসে ধমক দিলেন, 'এসব কী থাম্ তো। থাম।'

বড় আপা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'বাড়িটা অপয়া। এই বাড়ি আমাদের দিয়ে দেবার পর থেকে এতসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এই বাড়ি তোমরা তানিয়াকে বা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।'

মেজোভাই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কীসের সঙ্গে কী ? আপা, তুমি কি দয়া করে চুপ করবে ? শুধু শুধু হইচই, চিৎকার।'

মোটেও শুধু শুধু না। এই বাড়িতে কিছুতেই থাকা যাবে না।'

'আহ্, কী যন্ত্রণা! বাড়ি কী দোষ করলো তা তো বুঝলাম না। মানুষের অসুখ-বিসুখ হয় না ?'

'গাধা,তুই চুপ কর।'

বাবার ঘোর-ভাবটা সম্ভবত কেটে গেছে। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'ঝগড়া হচ্ছে কী নিয়ে ?' বড় আপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাঁদছিস কেন তুই ? এ কী বিশ্রী স্বভাব! কথায় কথায় চোখে পানি। তুই হচ্ছিস সবার বড়। তুই সবাইকে সামলে-সুমলে রাখবি। তা না, কেঁদে অস্থির।'

'তোমার শরীর কি এখন ঠিক হয়েছে, বাবা ?'

'হ্যাঁ , ঠিক আছে।'

বাবা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করেছেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে উঠছেন বড় আপা। বাবা বড় আপার হাত ধরে আছেন। যে মেয়েকে একটু আগেই তিনি চিনতে পরছিলেন না সেই মেয়ের হাত ধরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি এগুচ্ছেন। বড় আপা বললেন, 'বাবা, তোমাকে একটা কথা বলি। মন দিয়ে শোন। আমার তেমন বুদ্ধি নেই। আমি বোকা ধরনের মেয়ে। কিন্তু বাবা, আমি

পরিষ্কার বুঝতে পারছি— বাড়িটা অপয়া। নীতুরও তাই ধারণা। বাবা, তুমি বাড়িটা কাউকে দিয়ে দাও।'

বাবা কী যেন বললে, নিচ থেকে কিছু বোঝা গেল না। আমি তাকালাম মেজোভাইয়ের দিকে। তাঁর মুখ রাগে গনগন করছে। অনেক কষ্টে তিনি রাগ সামলাচ্ছেন। পুরোপুরি সামলাতেও পারছেন না। থু করে ঘরের ভেতরেই একদলা থুথু ফেললেন। সেই থুথু আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মানুষের হাসিরও অনেক রকম অর্থ হয়। এই হাসির অর্থ হচ্ছে— ভাইয়া নিজেকে সামলাও।

মার মুখ করুণ। মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। মার শরীর যে এত খারাপ হয়েছে তা এই প্রথম আমি লক্ষ করলাম। পরিবারের কারোর স্বাস্থ্য ভাঙতে শুরু করলে চট করে তা কারো চোখে পড়ে না। হঠাৎ একদিন পড়ে, তখন চমকে উঠতে হয়।

মা আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় নিজের মনে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে রে, রঞ্জু ? এসব কী হচ্ছে ?'

৬

আজ বিকেলে খানিকক্ষণ বৃষ্টি হল।

বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গে তাকালাম ক্যালেন্ডারের দিকে। কত তারিখ ? দিন তারিখ সব এলোমেলো হয়ে গেছে। এ বাড়িতে কেউ বোধহয় আজকাল আর দিন-তারিখ দিয়ে মাথা ঘামায় না। বড় আপার মেয়ে দুটি পর্যন্ত চুপ। তারাও কোনো-না-কোনোভাবে জেনে গেছে— এ বাড়ির সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। কোথাও ঝামেলা হয়েছে। শিশুদের বাড়তি একটি ইন্দ্রিয় থাকে। তারা অনেক কিছুই টের পায়। না বললেও বুঝতে পারে।

সন্ধ্যাবেলা আমি কী মনে করে যেন ছাদে গেলাম। বৃষ্টি হওয়ায় ছাদ ভিজে আছে। জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা। পিচ্ছিল হয়ে গেছে। যে কোনো সময় পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা। ছাদে রেলিং নেই। পা হড়কালে আর রক্ষা নেই। এই সম্ভাবনা নিয়েও হেঁটে বেড়াতে ভালো লাগছে। অনেকদিন পর এ বাড়ির ছাদে উঠলাম। আমার মধ্যে তেমন কাব্যভাব নেই। ছাদ আমার ভালো লাগে না। তবে মা প্রায়ই আসেন বলে আমি জানি। এই অসুস্থ শরীরেও আসেন। সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে আসেন।

আমি যে আজ ছাদে এসেছি তার কারণ একটিই — মার সঙ্গে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। মা এখনো আসছেন না। হয়তো বেছে বেছে আজই তিনি আসবেন না। মার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলা কোনো সমস্যা নয়। তাঁর ঘরে প্রায় সময়ই কেউ থাকে না। কিন্তু আমি অন্য ধরনের নিরিবিলি চাচ্ছিলাম।

সন্ধ্যা মিলিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশে মেঘ জমছে। আবার বৃষ্টি শুরু হবে।

www.BDeBooks.Com

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি। তখনই মার সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাকে দেখে অসম্ভব চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন।

আমি বললাম, 'কেমন আছ, মা ?'

মা বললেন, 'ও তুই ? চমকে উঠেছিলাম।'

'কী ভেবেছিলে, ভূত ?'

'মা আর জবাব না দিয়ে বললেন, 'তুই কি প্রায়ই ছাদে আসিস ?'

'না। আজ এসেছিলাম।'

'বৃষ্টি-বাদলার সময় আসবি না। পিছল ছাদ। একটা অঘটন ঘটতে কতক্ষণ ?'

'তুমি তো প্রায়ই আস।'

'আমার কথা বাদ দে।'

মা আমাকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠতে যাচ্ছেন। তখন হঠাৎ বললাম, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম।'

'কী কথা ?'

'বাড়ির প্রসঙ্গে একটা কথা। বুনোভাই আমাকে বলেছেন। তিনি শুনেছেন বাবার কাছে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানতে চাই।'

মা কিছু বলতেন না। আমাকে পাশ কাটিয়ে ছাদে উঠে গেলেন। আর তখন বৃষ্টি নামল। আমি দেখলাম, মা ছাদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। সেই চাদরে তিনি মাথা ঢেকে দিলেন।

আমি মার কাছে এগিয়ে গেলাম। কোমল গলায় বললাম, 'বৃষ্টিতে ভিজছ কেন মা ? চল ঘরে যাই।'

'তুই যা।'

মা গলার স্বর কঠিন এবং কান্না-ভেজা ।আমি চলে এলাম। বুনোভাইয়ের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি— বুনোভাইয়ের খাটে বাবা জবুথুবু হয়ে বসে আছেন। বাবার পিঠে হাত রেখে বুনোভাইও বসে আছেন। আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখ বললাম, 'কেমন আছ বাবা ?'

তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জ্বি, ভালো আছি। আপনার শরীর ভালো ?'

বাবা আমাকে চিনতে পারেন নি। ইদানীং কাউকেই প্রথম দর্শনে বাবা চিনতে পারেন না।

আমি বললাম, 'এখানে কী করছ, বাবা ?'

'ও আচ্ছা, তুই! রঞ্জু। অন্ধকারে চিনতে পারি নি। বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে ?'

'হুঁ।'

'ভালো, ভালো। বৃষ্টি হওয়া ভালো।'

'এখানে কী করছেন ?'

'বুনোর সঙ্গে গল্প করছি। আয়, তুইও আয়।'

আমি বাবার পাশে বসলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসলেন। সেই হাসিতে স্নেহ ছিল, প্রশ্রয় ছিল। বাবা নরম স্বরে বললেন, 'রঞ্জু, বাড়িটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

'সমস্যার কী আছে, বাবা ?'

'আছে, সমস্যা আছে। জটিল সমস্যা। তুই ছেলেমানুষ, সমস্যা বুঝবি না। জানালা দিয়ে দেখ তো বৃষ্টি এখনো হচ্ছে কিনা।'

জানালা দিয়ে দেখার কিছু নেই। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। মা কি এখনো ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজছেন ?

৭

ঘটাং ঘটাং শব্দে ঘুম ভাঙল।

একেবারে কাকডাকা ভোর। এত ভোরে জিতু মিয়া পানি তোলা শুরু করেছে ?

কাকদের ঘুমও তো ভালো করে ভাঙে নি। আমি বিস্মিত হয়ে বারান্দায় এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম— বাবা টিউবওলের পাম্প চালাচ্ছেন। তাঁকে বিরত করার চেষ্ট করছে নীতু এবং বড় আপা। মাও আছেন। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু বলছেন না। নীতু তীক্ষ্ণ গলায় বলল,বাবা 'তুমি কাউকে না ধরে দোতলায় উঠাতে পার না— আর তুমি পানি তুলছ ?' বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার। না মানার জন্য মইনুদ্দিনের অবস্থা তো দেখলি। ফট করে চলে গেল। সে বয়সে আমার এক বছরের ছোট।'

'বাবা প্লিজ, বন্ধ কর। প্লিজ।'

নীতু বাবাকে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরল। বড় আপা বাবার কানে কানে কীসব যেন বলছেন। বাবা তার উত্তরে শুধু মাথা নাড়াচ্ছেন।

মেজোভাইও ঘুম ভেঙে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মুখ কঠিন।

মেজোভাই আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বড় আপা বাবাকে কী বলছে ?'

আমি বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

'বাড়ি নিয়ে কিছু বলছে বোধহয়।'

'মনে হয় না।'

'তাই বলছে। এরা দুজন ক্রমাগত বাবাকে জপাচ্ছে— বাড়ি ছেড়ে দাও। বাড়ি ছেড়ে দাও। মেয়েদের বুদ্ধি। ইডিয়টস।'

মেজোভাই থু করে থুতু ফেললেন। ক'দিন ধরেই দেখছি তার থুতু ফেলার রোগ হয়েছে । গর্ভবতী মেয়েদের মতো ক্রমাগত থুতু ফেলেন। থুতু ফেলার সময় তার মুখ ঘৃণায় কুঁচকে যায়। কার উপর এত ঘৃণা কে জানে ?

'রঞ্জু!'

www.BDeBooks.Com

'বল।'

ওরা দুজন ক্রমাগত বাবাকে জপাচ্ছে। ক্রমাগত জপাচ্ছে।'

'তা না, উনার শরীর খারাপ, তাই সারক্ষণ পাশে পাশে থাকে।'

'আমরা সারা জীবন কষ্ট করেছি। এখন একটা সুযোগ পাওয়া গেছে— এরা সবাই সুযোগ নিতে দেবে না। ইন্‌জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার সময় সাতশ টাকা লাগে। সেই টাকা কীভাবে যোগাড় করেছিলাম জানিস ?'

'না।'

শোভাকে বলেছিলাম। সেই বেচারি তার কানের দুল বিক্রি করে টাকা দিয়েছিল। ওদের বাড়িতে জানাজানি হয়ে যেতে একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়।'

'তুমি তার জন্মদিনে যাও নি কেন ?'

'তোকে কে বলল ?'

'আমি আমার এক ফ্রেন্ডের কাছে শুনেছি। অনেক রাত পর্যন্ত বেচারি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছিল। কাজটা ভালো কর নি।'

'মনে ছিল না। খুব আপসেটিং লাগছিল— মানে এখনো লাগছে। আচ্ছা, ও কি এর মধ্যে এসেছিল ?'

আমি মিথ্যা করে বললাম, 'একদিন এসেছিলেন। গেট দিয়ে ঢুকে তারপর হঠাৎ দেখি বের হয়ে চলে যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি ?'

'মেজোভাইয়ের চোখ করুণ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুমি আজ তাদের বাসা থেকে ঘুরে আস না কেন ?'

'যাব। দুএকদিনের মধ্যেই যাব। যেতে ইচ্ছে করে না। মেজাজ এমন খারাপ হয়েছে! সবার সাথে শুধু ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। এখন মনে হচ্ছে বুনোভাই সুখে আছে। দিনরাত শুয়ে বসে... ছিঃ ছিঃ। যে ফ্যামিলির সবচে' বড় ছেলের এই অবস্থা সেই ফ্যামিলি এমন একটা সুযোগ কি ছাড়তে পারে ? পারা কি উচিত ? তোর কী মনে হয়, উচিত ?'

'উচিত না।'

'অফকোর্স উচিত না। এটা হচ্ছে আমাদের সারভাইভেলের প্রশ্ন। আজ যদি এমন হত যে বুনোভাই ভালো একটা চাকরি করছে। —আমি পাস করে জয়েন্ট করেছি, নীতুর বিয়ে হয়ে গেছে...,

'তুমি তো পাস করবেই, আর নীতুরও ভালো বিয়ে হবে। দেখতে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী।'

'আমি পাস -টাস করব না। পড়াশোনাই করব না বলে ঠিক করেছি।'

'কেন ?'

'দূর, বেতনের এই দু'তিন হাজার টাকায় আমার কিছু হবে না। বিজনেস করব।'

'বিজনেস করবে ? টাকা পাবে কোথায় ?'

'টাকা তো আছে। আমাদের এই জায়গাটাই হবে আমার ক্যাপিটেল। বাংলাদেশে কোটিপাতি হওয়া এমন কিছু না। আমি সাত বছরের মধ্যে কোটিপতি হব। তুই কাগজে কলমে লিখে রাখতে পারিস। তখন দশটা পাস করা ইনঞ্জিনিয়ার আমার ফার্মে খাটাব। আমি আমার ফার্মের নামও ভেবে রেখেছি। The Master Builders.'

'যদি বাড়িটা বাবা দিয়ে দেন তাহলেও কি কোটিপতি হতে পারব ?'

'না, তাহলে পারব না।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'বাবা বাড়িটা দিয়ে দিতে পারেন। এই সম্ভাবনা কিন্তু আছে।' মেজোভাই চমকে উঠে বললেন, 'সম্ভাবনা আছে মানে ?'

'গতকাল একজন উকিল এসেছিল। বাবা খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন বলে মনে হয়। দরজা বন্ধ করে কী-সব লেখালেখি হল।'

'মাই গড! কী বলছিস তুই ?'

মেজোভাই আবার থুতু ফেললেন। তাঁর শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। সেই প্রবল উত্তেজনা অনেক কষ্টে দমন করে বললেন, 'বাবা কোনো দলিলপত্র করলেও তা কোর্টে টিকবে না। কারণ তাঁর মাথার ঠিক নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁর চিকিৎসা করছে। অপ্রকৃতিস্থ মানুষ কোনো দলিল করতে পারেন না। 'আমি খুব হালকা গলায় বললামম্ব, 'ভাইয়া, বাড়ির দলিল কিন্তু মার নামে। বাবার নামে না।'

'মার নামে মানে ? মার নামে কেন ?'

'মইনুদ্দিন চাচা মরবার আগে তাই বলে গিয়েছিলেন।'

'মাকে বাড়ি দিতে বলে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তোকে কে বলল ?'

'আমি জানি। বাবা বুনোভাইয়াকে বলেছেন। বুনোভাই আমাকে বলেছেন।'

'মাকে সে কেন বাড়ি দেবে ?'

'আমিও তাই ভাবছি। জীবনের শুরুতে তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন, হয়তো তখন মার সেবাযত্নে খুশি হয়েছিলেন। সেটা মনে রেখেছেন।'

'তুই এসব কী বলছিস ?'

'বন্ধু-পত্নীকে ছোটখাটো উপহার অনেকেই দেয়। এটা দোষের কিছু না। ইনি বড়লোক মানুষ, বড় উপহার দিয়েছেন।'

মেজোভাইয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। হতভম্ব ভাবটা তাঁর মধ্যে যেন আর নেই।

এখন অসম্ভব রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে।

'হারামজাদার এত বড় সাহস! হারামজাদা আমার মাকে অপমান করে ?'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'অপমানের কী দেখলে ভাইয়া ? একজন উপহার হিসেবে একটা জিনিস দিচ্ছে।'

www.BDeBooks.Com

'শুয়োরের বাচ্চা আমার মাকে বাড়ি উপহার দেবে কেন ? শুয়োরের বাচ্চা ভেবেছে কি ?'

'এত অস্থির হচ্ছ কেন ভাইয়া ? তুমি যা ভাবছ হয়তো সেসব কিছু না। বিত্তবান মানুষের খেয়াল।'

'খেয়াল মোটেই না। মোটেই খেয়াল না। আমার মনে পড়ছে। মার যখন অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন হল সে মাকে নিয়ে ভর্তি করলেন সবচে' বড় ক্লিনিকে। সারারাত আমাদের সাথে ক্লিনিকে বসে রইল।'

'এটাতো অন্যায় কিছু না।'

'অন্যায় না মানে ? হারামজাদার এতবড় সাহস! এতবড় সাহস ঐ শুয়োরের বাচ্চার!'

হইচই শুনে বুনোভাই বের হয়ে এলেন। মেজোভাই কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'বুনোভাই, রঞ্জু এসব কী বলছে ?'

বুনোভাই পরম মমতায় বললেন, 'আয়, তুই আমার ঘরে আয়।'মেজোভাই হাইমাউ করে কেঁদে উঠলেন। তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। মেজোভাই কিছুতেই যাবে না। হইচই শুনে মা এলেন। বিস্মিত স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে রে ?'

বুনোভাই বললেন, 'কিছু হয় নি। মা, তুমি যাও তো।'

মেজোভাই চোখ লাল করে বললেন, না, তুমি যেতে পারবে না, তুমি থাক। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

মা শান্ত গলায় বললেন, 'কী কথা ?'

বুনোভাই মেজোভাইকে কোনো কথা বলার সুযোগ দিলেন না। তার মুখ চেপে ধরলেন।

মা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মাথার চুল প্রায় সবই পাকা, তবু আজ হঠাৎ করে মনে হল যৌবনে আমার মা অসম্ভব রূপবতী ছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তেও তিনি সেই রূপের কিছুটা হলেও ধরে রেখেছেন।

নীতু বারান্দায় এসে বলল, 'মেজোভাইয়ের কী হয়েছে ?'

মা বললেন, 'জানি না।'

৮

বড় আপা খুব কাঁদছে।

কাঁদার মূল কারণ দুলাভাই চিঠিতে লিখেছেন তার ফিরতে আরো দুসপ্তাহ দেরি হবে। সেমিনারের শেষ যে পেপার জমা দেয়ার কথা সেই পেপার তৈরিতে একটু সময় লাগছে। যে চিঠিতে তিনি এই সংবাদ দিয়েছেন সেই চিঠির সঙ্গে কয়েকটা ছবিও পাঠিয়েছেন। সেই সব ছবির একটিতে স্কার্ট পরা একটি মেয়েকে দুলাভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বড় আপার মর্মপীড়ার কারণ

এই ছবি। বেহায়া ধরনের একটা মেয়ের গা ঘেঁষে সে ছবি তুলবে কেন ? দু'সপ্তাহ বাড়তি থাকছে কেন ? এই দু'সপ্তাহ সে কি মেয়েটার সঙ্গে ঘুরার পরিকল্পনা করেছে ? আর যদি এ রকম পরিকল্পনা নাও থাকে তাহলেই বা সে থাকবে কেন ? এতে তো এই মেয়েটার সঙ্গে ঘষাঘষির সুযোগ আরো বেশি হবে।

এখন আমাদের পরিবারে একটা ক্রাইসিস পিরিয়ড যাচ্ছে। এর মধ্যে বড় আপা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। তার কাছে লেখা চিঠি তিনি সবাইকে পড়াচ্ছেন। স্ত্রী কাছে লেখা স্বামীর চিঠিতে ভালোবাসাবাসির কথা তেমন থাকে না। তবে দুলাভাইয়ের চিঠিতে সেইসব যথেষ্টই আছে। আপা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কাঁদো কাঁদো মুখে সবাইকে চিঠি দেখাচ্ছেন। আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এখন কী করি বল তো ?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'কিছু করতে হবে না।'

'কিছু করতে হবে না মানে ? ও এসব করে বেড়াবে আর আমি...'

বড় আপার গলা ধরে এল। আমি বললাম, 'তুমি কী করতে চাও ?'

'ওকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করে দে।'

'কী লেখা থাকবে সেই টেলিগ্রামে ?'

'লিখবি আমার খুব অসুখ।'

'এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় আপা ?'

'তোর কাছে ছেলেমানুষি। আমার কাছে ছেলেমানুষি না। ওকে আমি চিনি। ও মেয়ে দেখলেই এলিয়ে যায়।'

'কী যে তুমি বল!'

'ঠিকই বলি। পুরুষ মানুষ চিনতে আমার বাকি নেই। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে দেখলেই পুরুষ মানুষের মন উদাস হয়। তুই টেলিগ্রাম করবি কি করবি না, সেটা বল।'

'করব না।'

আপা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে শান্ত করবার জন্যেই বলতে হল, 'টাকা দাও টেলিগ্রাম করে আসছি।'

'লিখবি অবস্থা খুব সিরিয়াস । ডেথ বেড।'

'ফিরে এসে যখন দেখবেন তুমি দিব্যি ভালো তখন কী হবে ?'

'কিছুই হবে না। ও খুশি হবে।'

টেলিগ্রাম করবার জন্য বড় আপা আমাকে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিলেন। উদার গলায় বললেন, 'টেলিগ্রাম করার পর যদি কিছু টাকা থাকে সেটা ফেরত দিতে হবে না।'

এর মধ্যে বাবার শরীর খুব খারাপ এই খবর পেয়ে তানিয়া বাবাকে দেখতে এসেছিল। অনেকক্ষণ থাকলো। চা খেল না। নীতুর সঙ্গে গল্প করল। কথায় কথায় বলল, বাংলাদেশ তার ভালো লাগে। কিন্তু বেশিদিন থাকতে ইচ্ছা করে

www.BDeBooks.Com

না। বাংলাদেশের মানুষদের কৌতূহল খুব বেশি। বিদেশে কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। যার কাজ তার কাছে। সেই এই মাসের শেষেই ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করবে। আজকাল ভিসা খুব কড়াকড়ি করেছে। তবু তার ধারণা, অসুবিধা হবে না। বেশ কিছু ডলার খরচ করতে হয়— এই যা।

তানিয়া হাসতে হাসতে বলল, 'সবাই আমাদের দেশের বদনাম করে। বলে, টাকা দিলে এই দেশে সবকিছু হয়। আমার নিজের ধারণা টাকায় সব দেশেই কাজ হয়। ঐসব দেশে টাকা বেশি লাগে, আমাদের দেশে কম। এই-ই হচ্ছে তফাত।'

বাচ্চা একটা মেয়ে কিন্তু খুব গোছানো কথাবার্তা । নীতু বলল, 'তোমার বুঝি অনেক টাকা ?'

মেয়েটি একমুহূর্ত ও দ্বিধা না করে বলল, 'হ্যাঁ।'

সে মার সঙ্গে কথা বলতে গেল। মা চাদর গায়ে শুয়েছিলেন। উঠে বসলেন। তানিয়া বিস্মিত গলায় বলল, 'চাচার চেয়ে তো আপনার শরীর বেশি খারাপ। প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন তো এত খারাপ দেখি নি। কী হয়েছে আপনার বলুন তো ?'

মা বললেন, 'কিছু হয় নি।'

'অবশ্যই কিছু হয়েছে। ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'ডাক্তার তো দেখাচ্ছি।'

'দরকার হলে আপনি কোনো ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে যান। যেখানে সর্বক্ষণ হাতের কাছে ডাক্তার থাকবে।'

'আচ্ছা দেখি।'

'না, দেখাদেখি না— আপনি এটা অবশ্যই করবেন।'

'তুমি চা-টা কিছু খেয়েছ ?'

'হ্যাঁ খেয়েছি। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনার অবস্থা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। জানেন, বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর থেকে বাবা আপনার কথা খুব বলতেন।'

মার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি বিব্রতমুখে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসলাম। সেই হাসিতে অভয় দেবার চেষ্টা ছিল, মা বোধহয় তা ধরতে পারলেন না।

তানিয়া বলল, 'বাবার যখন খুব অসহায় অবস্থা, আপনাদের সঙ্গে থাকতেন, তখন তাঁর একবার টাইফয়েড হল। সেই সময় আপনি নাকি তাঁর খুব সেবা করেছেন। একবার সারারাত জেগে তাঁর মাথায় পানিপট্টি দিলেন।'

'এসব কথা থাক, মা।'

তানিয়া থামল না। সহজ স্বরে বলতে লাগলো।

'বাবা এসব কথা আগে কখনো বলেন নি। অসুখ ধরা পড়ার পর খুব বলতেন। ব্যবসার জন্যে আপনি আপনার বিয়েতে পাওয়া গলার হার বিক্রি করে তাঁকে টাকা দিলেন। ঐ দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। বাবা বলতেন, পবিত্র কিছু টাকা নিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করেছিলাম বলে এতদূর আসতে পেরেছি। চাচি, আমরা এসব তো কখনো শুনি নি। যখন শুনলাম আপনার প্রতি খুব গ্রেটফুল বোধ করলাম।'

মা অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'মা, আমার খুব মাথা ধরেছে। তুমি ওদেরকে নিয়ে গল্প কর।'

'আরেকটু বসি। আর কখনো দেখা হবে কিনা কে জানে, আমি চলে যাচ্ছি। আচ্ছা চাচি, আপনি নাকি একবার গল্প করতে করতে বাবাকে বলেছিলেন, আপনার যদি কখনো টাকা হয় তাহলে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ধবধবে শাদা রঙের একটা বাড়ি বানাবেন। বলেছিলেন, তাই না চাচি?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা সেই কথা মনে রেখেছিলেন। এই বাড়িটা ঠিক সেই রকম করে বানানো। আপনি কি কোনোদিন সেটা বুঝতে পারেন নি?'

মা জবাব দিলেন না। নীতু বল, 'চল আমরা ছাদে যাই। ছাদটা খুব সুন্দর। বাগানবিলাস গাছে ছাদটা ঢেকে ফেলেছে। তানিয়া নীতুকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, 'আমরা গোড়া থেকে জানি এই বাড়ি আপনার। আর আপনারা কেউ কিছুই জানতেন না। মজার ব্যাপার না? বাবার অবশ্যি ভয় ছিল আপনারা এই বাড়ি নিতে রাজি হবে না। আপনারা যে রাজি হয়েছেন আমার এত খুশি লাগছে!'

মার মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মেয়েটির উপর আমার খুব রাগ লাগছে। মা কষ্ট পাচ্ছেন— এই বোকা মেয়ে কি তা বুঝতে পারছে না?

'চাচি!'

'কী মা!'

আপনার তরুণী বয়সের অসম্ভব সুন্দর দুটা ছবি আমাদের বাসায় আছে। শাদা-কালো ছবি। স্টুডিওতে তোলা কিন্তু এত সুন্দর। আপনার নাকি ছবি তোলার দিকে কোনো আগ্রহ ছিল না। বাবা জোর করে তুলিয়েছেন। আমি আপনাকে ছবি দুটো পাঠিয়ে দেব।'

'দরকার নেই, মা।'

'আমি পাঠাব। ছবি দেখলে আপনার ভালো লাগবে। আমি এখন উঠি, চাচি?'

'আচ্ছা মা।'

বারান্দায় মেজোভাইয়ের সাথে তানিয়ার দেখা হল। তানিয়া বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

মেজোভাই জবাব দিলেন না, ক্রুদ্ধচোখে তাকিয়ে রইলেন। সেই চোখে আগুন ধকধক করছে।

www.BDeBooks.Com

তানিয়া চলে যাবার পর মেজোভাই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ঐ মেয়েটা চোখ ব্রাউন, তুই লক্ষ করেছিস ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'মইনুদ্দিন চাচার চোখও ব্রাউন।'

'তাতে সমস্যা কী ?'

'সমস্যা কিছুই না। তুই ভালোমতো চিন্তাভাবনা করে বল তো আমাদের পাঁচ ভাইবোনের কারো চোখ ব্রাউন কিনা ?'

'ভাইয়া, তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল ?'

'মাথা খারাপ— ভালো প্রশ্ন না। আমি তোকে একটা প্রশ্ন করেছি, তুই 'হ্যাঁ' বা 'না' বলবি।'

'ছিঃ ভাইয়া।'

মেজোভাই অগ্নিদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। একবার মনে হল হয়তো তিনি ঝাঁপিয়ে পড়বেন আমার উপর। আমি ভয় পেয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম।

রাতে ভয়ংকর একটি দৃশ্যের অবতারণা হল।

রাত তখন প্রায় বারটা, বুনোভাইয়ের ঘর থেকে ক্রুদ্ধ হুংকার শোনা যেতে লাগল। ছুটে গিয়ে দেখি বুনোভাইয়ের মতো মস্ত মানুষ মেজোভাইকে সমানে কিলঘুসি মেরে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে মেরেই ফেলবেন। বুনোভাইয়ের চোখ টকটকে লাল। আমার মনে হয়, যে-প্রশ্ন ভাইয়া আমাকে করেছিলেন সেই প্রশ্ন বুনোভাইকেও করেছিলেন। অসুস্থ শরীরে মা ছুটে এলেন। ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'কী হচ্ছে ?' বুনোভাই বললেন, 'কিছু না মা, তুমি ঘুমাও।'

মা মেজোভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে ?'

মেজোভাই মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'কিছু হয় নি। তোমরা সবাই শুধু শুধু ভিড় করছ।'

৯

আমাদের বাড়িতে দুজন উকিল এসেছেন। মা তাঁদের সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলছেন। উকিলদের একজন স্ট্যাম্পে সঙ্গে এনেছেন। সম্ভবত বাড়ি নিয়ে কিছু হচ্ছে। মা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কী সিদ্ধান্ত, আমরা কেউ জানি না।

বাড়িটা আজ কেন জানি আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। ধবধবে শাদা রঙের বাড়ি। একটু দূরে দাঁড়ালেই আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে বাড়িটা চোখে পড়ে। মনে হয়, নীল আকাশে একখণ্ড ধবল মেঘ। আমাদের শাদা বাড়ি।

নবনী

www.BDeBooks.Com

১

দুপুরে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মা এসে গায়ে হাত দিয়ে ঘুম ভাঙালেন। ব্যাকুল গলায় ডাকলেন, 'নবনী! নবনী!!' আমি চোখ মেলতেই তিনি আমার মুখের কাছে মুখ এনে কাতর গলায় বললেন, 'ওঠ্ মা। ওঠ্!'

আমি হকচকিয়ে উঠে বসলাম। মা এভাবে আমাকে ডাকছেন কেন? কিছু কি হয়েছে? বাবা ভাল আছে তো? খাট থেকে নামতে গেছি, মা হাত ধরে আমাকে নামালেন। যেন আমি বাচ্চা একটা মেয়ে। একা একা খাট থেকে নামতে পারি না। আমি বললাম, কি হয়েছে মা?

মা জবাব দিলেন না, অস্পষ্টভাবে হাসলেন। বারান্দায় এসে দেখি, বাবা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর গায়ে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি। চুল আঁচড়ানো। আজ দুপুরেও গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি ছিল। এখন নেই, গাল মসৃণ, শান্ত পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ! খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মাস দুই হল তিনি শয্যাশায়ী। ডান পা অবশ হয়ে আছে। দেয়াল ধরে হাঁটাহাঁটি করেন। তবে বেশির ভাগ সময় খবরের কাগজ হাতে নিয়ে শুয়ে থাকেন নিজের ঘরে। কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কঠিন এবং তিক্ত গলায় এ বাড়ির সবার সঙ্গে ঝগড়া করেন। যেন তাঁর এই অসুখের জন্যে আমরাই দায়ী। আজ কি হাসি-খুশি লাগছে বাবাকে। আমার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, দুপুরে ঘুম তো খুব খারাপ অভ্যাস রে মা। ব্যাড হেভিট। হাত-মুখ ধুয়ে আয় আমার কাছে।

আমি হাত-মুখ ধুতে রওনা হলাম। বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে। বড় ধরনের কিছু। পুরো বাড়িটা বদলে গেছে। নিশ্চয়ই আনন্দময় কোন ঘটনা ঘটে গেছে। বাবার সুখী সুখী গলা আবার শুনলাম, ওগো, আমাকে আর নবনীকে চা দাও। বাপ-বেটিতে একসঙ্গে চা খাই। এত সুন্দর করে বাবা অনেক দিন কথা বলেন নি।

বাবা আজ আমার সঙ্গে চা খেতে চাচ্ছে কেন? আমার শরীর ঝিম ঝিম করছে।

আমি চাপা উত্তেজনা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

আমাদের বাথরুম সব সময় অন্ধকার। দুপুরবেলায়ও বাতি না জ্বালালে আয়নায় মুখ দেখা যায় না। আশ্চর্য! আমি সুইচটা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার বুক ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। তীব্র এক অজানা ভয়ে মন অভিভূত হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে সামলাবার জন্যে আমি দরজায় হাত রাখলাম, আর তখন ইরা বাথরুমে ঢুকে

বাতি জ্বালাল। ইরার হাতে সাবান, তোয়ালে। সাবানটা নতুন, এখনো মোড়ক খোলা হয় নি।

আমি বললাম, কি হয়েছে ইরা ?

ইরা হাসতে হাসতে বলল, তোমার এত বুদ্ধি, তুমি এখনো বুঝতে পারছ না ?

'না। বুঝতে পারছি না।'

'অনুমান করতে পারছ ?'

ইরা ঝলমলে গলায় বলল, আজ তোমার বিয়ে। রাত দশটার ট্রেনে বর আসবে। রাতেই বিয়ে হবে। কোন উৎসব-টুৎসব কিচ্ছু হবে না। তোমাকে নিয়ে তারা ঢাকা চলে যাবে সকালের ট্রেনে।

আমি একদৃষ্টিতে ইরাকে দেখছি। সে আজ তার সেই প্রিয় শাড়িটা পরেছে। সাদা রঙের শিফন শাড়ি। মা তাকে কখনো এই শাড়ি পরতে দেন না। এই শাড়িতে তাকে না-কি বিধবার মত লাগে। কিন্তু আমি আর ইরা শুধু জানি এই শাড়িতে তাকে কত সুন্দর লাগে। ও বোধহয় ক্রমাগতই কাঁদছে। ওর মুখ শুকনো। চোখ ভেজা। সে হাসতে হাসতে কথা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

ইরা বলল, সবাই খুব খুশি। সবচে' খুশি বাবা। আপা, তুমি মুখটা নিচু কর, আমি সাবান দিয়ে তোমার মুখ ধুইয়ে দেই।

'তোর মুখ ধুইয়ে দিতে হবে না। তুই যা।'

ইরা বলল, আপা শোন— বাবা যে সবচে' খুশি তা না। সবচে' খুশি হয়েছি আমি। খবরটা শোনার পর থেকে আমি আনন্দে শুধু কাঁদছি।

'তুই এখন যা। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

ইরা পুরোপুরি চলে গেল না। বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাকালাম আয়নার দিকে। আয়নায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে! শান্ত সরল চেহারার একটা মেয়ের মুখ। আয়নার মুখ কখনো হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। আমার প্রায়ই আয়নার মুখটাকে ছুঁতে ইচ্ছা করে। আজও করছে। আমি হাত দিয়ে সেই মুখ ছুঁতে গিয়ে আয়নায় সাবানের ফেনা লাগিয়ে ফেললাম।

আজ আমার বিয়ে।

আমার কেমন লাগছে ?

এখনো বুঝতে পারছি না। আমার সমস্ত বোধ অসাড় হয়ে আছে। তবে এক ধরনের শান্তি বোধ করেছি। আমার একটা সমস্যা ছিল, ভয়াবহ ধরনের সমস্যা আজ হয়তো তা মিটে যাবে— এই শান্তি। বাথরুম থেকে বের হয়ে আমি সবার খুশি মুখ দেখব। এ-ও তো কম না।

আমার বিয়ে নিয়ে সবাই খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। সবাই ধরেই নিয়েছিল, আমার কোনদিন বিয়ে হবে না। এমন কোন দোয়া নেই যা মা আমার জন্যে পড়েন নি। আজমীর শরীফ থেকে আনা লাল সুতা এখনো আমার গলায়

www.BDeBooks.Com

ঝুলছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর এই সুতা খুলে ফেলতে হয়। যদি সত্যি সত্যি বিয়ে হয় তাহলে নিশ্চয় বাসর ঘরে ঢোকার আগে ইরা এসে কাঁচি দিয়ে সুতা কাটবে। সুতা কাটতে গিয়ে হয়ত সে কিছুক্ষণ কাঁদবে। ইরা খুব কাঁদতে পারে।

সত্যি কি আজ বিয়ে হবে ? কেন জানি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। স্বপ্ন দেখছি না তো ? গল্পের বই পড়তে পড়তে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয়ত ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখছি। বিয়ের স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। স্বপ্নের মধ্যেই একটা ঝামেলা হয়ে বিয়ে ভেঙে যায়। আমি দেখি একটা সুন্দর ছেলে আমার পাশে বসা। এক সময় সে উঠে চলে যায়। আমি চোখ ভর্তি জল নিয়ে জেগে উঠে খুব লজ্জিত হই। বাস্তব কখনো স্বপ্নের মত নয়। বাস্তব অন্যরকম। বাস্তবে অনেক কথাবার্তার পর বিয়ে ঠিক হয়। আলাপ আলোচনা একটা পর্যায় পর্যন্ত যায়, তারপর তারা সুন্দর একটা চিঠি রেজিস্ট্রি করে পাঠায়—

> *গভীর দুঃখ ও বেদনার সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার মধ্যম পুত্র হঠাৎ বলিতেছে সে এক্ষণ বিবাহ করিবে না। আমি এবং তাহার মাতা তাহাকে বুঝানোর প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। তাহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ মনোমালিন্যও হইয়াছে। যাহা হউক, আপাতত বিবাহ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা ভিন্ন কোন পথ দেখিতেছি না। পুত্র রাজি হইলে ইনশাআল্লাহ আবার ব্যবস্থা হইবে। তবে আপনারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন না। যদি কোন ভাল পাত্রের সন্ধান পান— কন্যার বিবাহ দিবেন। আমাদের দোয়া থাকিবে ইহা জানিবেন। শ্রেণীমত সকলকে সালাম ও দোয়া দিবেন।*

এইসব চিঠি সব সময় সাধু ভাষায় লেখা হয়। হাতের লেখা হয় প্যাঁচানো। চিঠির উপর আরবিতে লেখা থাকে ইয়া রব। প্রতিটি চিঠির ভাষা ও বক্তব্য এক ধরনের হয়। কেউ সাহস করে কথাটা লেখে না। কেউ লেখে না—আপনার মেয়ে খুব সুন্দর। আমাদের পছন্দ হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে যে এত ভয়াবহ একটি গুজব আছে তা জানতাম না। জানার পর বিয়ে নিয়ে এগুতে আমাদের সাহস হচ্ছে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ইরা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, আপা, এত দেরি করছ কেন ? হাত-মুখ ধুতে এতক্ষণ লাগে ?

আমি জবাব দিলাম না। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখছি। আয়নার মানুষটার ভেতর মনে হয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। সে আমাকে অনেক কথা বলতে চাচ্ছে। এমন সব কথা যা আমি এই মুহূর্তে শুনতে চাই না।

'আপা, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

আমি বের হয়ে এলাম। বাবা বললেন, নবু মা'কে বসার কিছু দাও না। ইরা ঘরের ভেতর থেকে মোড়া এনে দিল। বাবার সামনের ছোট্ট সাইড টেবিল দু'কাপ চা। একটা প্লেটে কয়েকটা পাপড় ভাজা। বাবা নিজেই একটা কাপ আমার হাতে তুলে দিলেন। আমার লজ্জা-লজ্জা লাগছে।

বাবা চায়ে চুমুক দিয়ে খুশি-খুশি গলায় বললেন, চা ভাল হয়েছে। ভেরী গুড। কি রে নবু, চা ভাল হয় নি?

আমি হাসলাম। রান্নাঘর থেকে মা গলা বের করে বললেন, তোমরা ধীরে সুস্থে চা খাও— কুমড়া ফুলের বড়া ভাজছি।

কুমড়া ফুলের বড়া আমার জন্যে ভাজা হচ্ছে। আমাদের বাড়ির পেছনে কয়েকটা কুমড়ো গাছ ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে। আমি কবে যেন কথায় কথায় বলেছিলাম— কুমড়ো ফুলের বড়া করতো মা। মা বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, সব ফুল খেয়ে ফেললে কুমড়ো আকাশ থেকে পড়বে?

ইরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মা ইরার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, ইরা, তুই এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? তোকে কি করতে বলেছি?

অর্থাৎ মা ইরাকে সরিয়ে দিলেন। বাবাকে সুযোগ করে দিলেন— যেন তিনি আমার সঙ্গে একা কথা বলতে পারেন। বুঝতে পারছি বাবা ছোটখাট একটা বক্তৃতা দেবেন। এরকম বক্তৃতা তিনি আগেও কয়েকবার দিয়েছেন। এসব ঘরোয়া বক্তৃতার শুরুটা খুব নাটকীয় হয়। বাবা এমন কিছু কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেন যার সঙ্গে মূল বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই। আজও সেই ব্যাপার হবে।

'নবনী!'

'জ্বি বাবা।'

'সক্রেটিসের একটা কথা আছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। সক্রেটিস বলেছেন, মানুষের একটাই সৎ গুণ, সেটা তার জ্ঞান। আর মানুষের দোষও একটা। দোষ হল অজ্ঞানতা— Ignorance. পশুদের কোন গুণ নেই, কারণ তাদের জ্ঞান নেই। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'সক্রেটিসের এই বাণী মনে থাকলে জীবনটা সহজ হয়। জটিলতা কমে যায়। ঠিক না মা?'

'হ্যাঁ।'

আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বাবা কি করে সক্রেটিস থেকে আমার বিয়ের ব্যাপারে আসবেন। তিনি নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছেন। আমি বেশ আগ্রহ নিয়েই বাবার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। বাবা খুব গম্ভীর গলায় কলেজে লেকচার দেবার ভঙ্গিতে বললেন—

'বিয়ে নামক যে সামাজিক বিধি প্রচলিত আছে, তার মূল উদ্দেশ্য হল পূর্ণতা। একজন পুরুষ পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না একজন সঙ্গিনী তার পাশে আসে। এই জ্ঞান পশুদের নেই। মানুষের আছে। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'বিবাহ পশুদের প্রয়োজন নেই, মানুষের প্রয়োজন, কারণ সক্রেটিসের ভাষায় মানুষ সৎগুণসম্পন্ন প্রাণী। অর্থাৎ জ্ঞানী প্রাণী। পরিষ্কার হয়েছে?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি।'

'তোর বড় মামা খবর পাঠিয়েছেন। হাতে-হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিটা পড়লেই তোর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। মিনু, চিঠিটা দিয়ে যাও।'

মা সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। মা রান্নাঘরে চিঠি আঁচলে নিয়েই বসেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর এক হাতে চিঠি। অন্য হাতে প্লেট ভর্তি কুমড়ো ফুলের বড়া। এই খাদ্যদ্রব্যটি আমার একার নয় বাবারও প্রিয়। কোন বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হলে ফুলের বড়া তৈরি হয়। তখন শিশুদের মতই বাবা চোখ চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

বাবা গভীর আগ্রহে বড়া খাচ্ছেন। আমি চিঠি পড়ছি। মামার হাতের লেখা ডাক্তারদের লেখার মত— অপাঠ্য। এই চিঠি যেহেতু তিনি অনেক বেশি যত্ন নিয়ে লিখেছেন সেহেতু কিছুই পড়া যাচ্ছে না— আমি চিঠিতে চোখ বুলাচ্ছি। মা আমার পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অনেকদিন পর মা'র পরনে ইস্ত্রি করা সুন্দর শাড়ি। হাতে আজ দু'গাছা সোনার চুড়িও পড়েছেন। চুড়িতে সোনা সব ক্ষয়ে গেছে। তামা বের হয়ে আছে। তবু চুড়ি পরা হাতে মা'কে সুন্দর লাগছে। মা'র হাত ভর্তি চুড়ি থাকলে বেশ হত। যেখানে যেতেন রিনরিন করে হাতের চুড়ি বাজতো।

দোয়াপর সমাচার,

তোমাদের একটি আনন্দ সংবাদ দিতেছি। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায়— ঢাকার পার্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে খবর পাইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া যাই এবং কথাবার্তা বলি। তাহাদের সহিত অনেক বিষয় নিয়া বিস্তারিত আলাপ হইয়াছে। আলোচনার ফলাফল নিম্নরূপ।

তাহারা নবনী মা'কে পছন্দ করিয়াছে। ছেলে তাহার কিছু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবসহ আগামী পরশু ১২ই আগস্ট রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা পৌঁছিবে। আল্লাহ চাহেত ঐ রাতেই শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। পরদিন প্রাতে তাহারা নববধূ নিয়া ঢাকা যাত্রা করিবে।

আমি এই সংবাদ তোমাদের শেষ সময়ে দিতেছি, কারণ আমি চাহি না তোমরা এই সংবাদ নিয়া হৈ-চৈ শুরু কর।

পাড়া প্রতিবেশী, নিকটজন, পরজন কেহই যেন কিছুই না জানে। শুভকর্ম আগে সমাধা হোক, তখন সবাই জানিবে। দশজনের মত লোকের খাবার আয়োজন করিয়া রাখিবে। মোজাম্মেল সাহেবকে বলিয়া তাঁহার জীপ গাড়িটি ইস্টিশনে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। বিবাহ-সংক্রান্ত কোন আলাপ তাঁহার সঙ্গে করিবার প্রয়োজন নাই। অসীম গোপনীয়তা কাম্য।

বিবাহ পড়াইবার কাজী আমি সঙ্গে নিয়া আসিব। বিবাহ রেজিস্ট্রি হইবে ময়মনসিংহ শহরে।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের মধ্যে পোলাও, কোরমা, ঝাল গোশত, মুরগির রোস্ট রাখিবে। চিকন চালের সাদা ভাত যেন থাকে। মুরব্বী কেহ থাকিলে

সাদা ভাতই পছন্দ করিবেন। আমি বড় মাছ নিয়া আসার চেষ্টা করিব। মেছুনীকে বড় মাছের কথা বলিয়া রাখিয়াছি। ভাত এবং পোলাও বরযাত্রী আসার পর রাঁধিবে। দৈ-মিষ্টি আমি সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিব।

মুখ দেখিবার পর জামাইকে সেলামী হিসেবে এক হাজার টাকা দিলেই চলিবে। আমি একটি স্বর্ণের আঙটি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছি। স্যুটের কাপড় দিতে পারিলে ভাল হইত। আমি সন্ধানে আছি, ভাল কাপড় পাওয়া গেলে নিয়া আসিব।

নবনীকে চোখে-চোখে রাখিবে। যদিও জানি ইহার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাকে ভালভাবে বুঝাইবে। অতীত নিয়া সে যেন চিন্তা না করে। গতস্য শোচনা নাস্তি। আমি নিজেও তাহার সঙ্গে কিছু কথা বলিব। গায়ে-হলুদের একটা ব্যাপার আছে— ইহা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। গায়ে-হলুদ হিন্দুয়ানী ব্যাপার, তবুও যেহেতু ইহা মেয়েদের একটা শখের ব্যাপার সেহেতু নিজেরা নিজেরা গায়ে-হলুদের ব্যবস্থা নিবে। কাহাকেও কিছু জানাইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আসল কথা গোপনীয়তা। কেহ কিছু জানিবার আগেই কার্য সমাধা করিতে হইবে। আল্লাহ সহায়— অসুবিধা হইবে না।

নব-বিবাহিত দম্পতি যেহেতু তোমাদের বাড়িতেই রাত্রিযাপন করিবে সেহেতু তাহাদের জন্যে একটা ঘর আলাদা রাখিবে। খাটে বিছাইবার জন্যে আমি একটা ভেলভেটের চাদর সঙ্গে নিয়া আসিতেছি।

বরযাত্রীরা রাতে কোথায় থাকিবে তা নিয়াও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে না। পাবলিক হেলথের ডাকবাংলোয় আমি তিনটি ঘরের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। শুভ কার্যের পর পরই তাহাদের সেখানে নিয়া যাইব। বাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

অতঃপর তোমাদের সংবাদ কি? আমার স্ত্রীর শরীর ভাল যাইতেছে না। সে বলিতে গেলে শয্যাশায়ী। শরীর খারাপের জন্য মন-মিজাজেরও ঠিক-ঠিকানা নাই। চিৎকার ও হৈ-চৈ করিয়া সবার জীবন সে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে সঙ্গে আনা ঠিক হইবে না। আমি একাই আসিব।

যাহা হউক, শুভ কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সে জন্যে তোমরা আল্লাহপাকের দরবারে ক্রমাগত প্রার্থনা করিতে থাক। আর বিশেষ কি লিখিব। দোয়া গো।

আমি চিঠি মা'র হাতে ফেরত দিলাম। মা আগ্রহ নিয়ে বললেন, সবটা পড়েছিস?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাবা হৃষ্টচিত্তে বললেন, তোর বড় মামার কাজ সব গোছানো। কোন ফাঁক নেই। ভেরী প্রাকটিক্যাল ম্যান। ভেরী ডিপেনডেবল। উনার ব্যবস্থা দেখেছিস? আগে থেকে কিছু বলবে না। সব ঠিকঠাক করে তারপর বলবে। মিনু, আরেক কাপ চা দাও দেখি। আজকের বড়াগুলোও হয়েছে মারাত্মক। মাখনের মত

www.BDeBooks.Com

মোলায়েম। মুখে দেবার আগেই গলে যাচ্ছে। নবনী, তোর জন্যে দু'টা রেখে দিয়েছি, খা। তুই একটা নে, ইরাকে একটা দে।

আমার বড়া খেতে ইচ্ছা করছে না তবু বাবাকে খুশি করার জন্যে বড়া হাতে নিলাম। হাত বেয়ে তেল পড়ছে। বিশ্রী লাগছে। মা চলে গেছেন চা বানাতে। মা যেভাবে ছোটাছুটি করছেন, মনে হচ্ছে তাঁর বয়স অনেকখানি কমে গেছে। তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, ছোটাছুটির ভঙ্গি সব কিছুতেই একটা খুকী-খুকী ভাব চলে এসেছে। বাবা ঝুঁকে এসে বললেন, নবনী, তোর মামা একটা গ্রেট ম্যান, কি বলিস ?

'হ্যাঁ বাবা।'

'বিয়ের মত এতবড় একটা ঝামেলা কিন্তু আমরা কিছুই বুঝতেও পারছি না। সব অটোসিস্টেম হয়ে যাচ্ছে। এই মানুষটা না থাকলে যে কি হত— ভাবতেও পারি না! আই লাইক হিম। অসাধারণ একজন মানুষ।'

বড়মামা অসাধারণ একজন মানুষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাবা তাঁকে পছন্দ করেন এটা ঠিক না। বাবা তাঁকে পছন্দ করেন না। মা'ও করেন না। আমরা কেউই বোধহয় করি না। শুধু আমরা না, তাঁর পরিবারের কেউই তাঁকে পছন্দ করে না। অথচ তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অন্যের উপকার করা। আদর্শ মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তাই। মনে হয়, আদর্শ মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। আদর্শ মানুষ ডিসটিল্ড ওয়াটারের মত— স্বাদহীন। সমাজ পছন্দ করে অনাদর্শ মানুষকে। যারা ডিসটিল্ড ওয়াটার নয়— কোকা কোলা ও পেপসীর মত মিষ্টি কিন্তু ঝাঁঝালো।

আমি উঠে আমার ঘরে চলে গেলাম। ইরা সেখানে কাপড় ইস্ত্রি করতে বসেছে। টেবিল ক্লথ, জানালার পর্দা ইস্ত্রি হচ্ছে। আমাদের একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি আছে। বড় মামা দিয়েছেন। ইলেকট্রিসিটি বেশি খরচ হবার ভয়ে এই ইস্ত্রি আমরা কখনো ব্যবহার করি না। আজ ব্যবহার হচ্ছে।

ইরা আমাকে দেখে ইস্ত্রির প্লাগ খুলে রাখল। ইরাকে কেন জানি খুব কাহিল লাগছে। চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। ওর বোধহয় রাতে ঘুম-টুম হচ্ছে না। ইরা খুব চাপা ধরনের মেয়ে। ওর কি হয়েছে তা সে কাউকেই বলবে না। আমি বললাম, ইরা, তোর কুমড়া ফুলের বড়া পড়ে আছে। খেয়ে আয়।

ইরা বের হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, বাবা খেয়ে ফেলেছেন। শরীর দুলিয়ে ইরা হাসছে—সুন্দর লাগছে দেখতে।

'আপা!'

'কি ?'

'তোমার কেমন লাগছে বলো তো ? এই যে হঠাৎ তোমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলা হল— বিয়ে...।'

'কোন রকমই লাগছে না।'

'সত্যি বলছো আপা ?'

আমি হাসলাম। এই মুহূর্তে আমার কোন রকমই লাগছে না। আমি সত্যি কথাই বলছি। হয়ত এমনও হতে পারে যে, ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। যখন সত্যি সত্যি বরযাত্রীরা চলে আসবে তখন হয়ত অন্য রকম লাগা শুরু হবে। বরযাত্রী কি আসবে শেষ পর্যন্ত ? একবার রাত আটটায় বরযাত্রী আসার কথা। আমি সেজেগুজে অপেক্ষা করছি রাত বারটায় খবর এল— তারা আসবে না। মা খবরটা শোনার পর হঠাৎ মেঝেতে পরে গেলেন। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হতে লাগল। কি বিশ্রী অবস্থা।

ইরা বলল, 'কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পারছো আপা ?'

'না।'

'ভদ্রলোক ছিলেন রোগামত। ফর্সা। চোখে লালচে রঙের ফ্রেমের চশমা। সারাক্ষণ রুমাল দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করছিলেন। বসেছিলেন বেতের চেয়ারে। উঠার সময় পেরেক লেগে তাঁর পাঞ্জাবি খানিকটা ছিঁড়ে গেল। তিনি তখন খুবই অবাক হয়ে ছেড়াটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।'

'তুই এত কিছু দেখেছিস ?'

'যার সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা হয় তাকেই আমি খুব মন দিয়ে দেখি।'

'কেন ?'

ইরা মাথা দুলাতে দুলাতে বলল, 'যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তার একটা ছবি আমার মনে আঁকা আছে। সেই ছবির সঙ্গে আমি মিলিয়ে দেখি।'

ইরা খাটে পা ঝুলিয়ে বসছে। বাচ্চা মেয়েদের মত পা নাচাচ্ছে। সে মনে হয় আরো অনেক কিছু বলতে চায় কিন্তু আমার শুনতে ইচ্ছা করছে না।

'আপা!'

'হুঁ।'

'যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে তার চেহারা কেমন হওয়া উচিত তুমি জানতে চাও ?'

'না।'

'জানতে না চাইলেও আমি বলি তুমি শোন—তোমার নিজেরও নিশ্চয়ই একটা কল্পনা আছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। আমার ধারণা, একশ' ভাগ মিলে যাবে। তোমার বরকে হওয়া উচিত অবিকল শুভ্রের মত।'

'শুভ্র কে ?'

'শুভ্র হচ্ছে উপন্যাসের একটা চরিত্র। সবাই তাকে বলে কানাবাবা। চোখে কম দেখে এই জন্যে কানাবাবা। দেখতে অবিকল রাজপুত্রের মত। অসম্ভব ভদ্র, হৃদয়বান ছেলে। পৃথিবীর সব কিছুই সে বিশ্বাস করে। খুব অসহায় ধরনের ছেলে।'

'অসহায় কেন ?'

'তার পৃথিবীটা একদম অন্যরকম। তার পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে মিল নেই। এই জন্যেই অসহায়। আপা, তোমার কল্পনা কি মিলছে ?'

www.BDeBooks.Com

'না।'

'তোমার কল্পনাটা কি?'

আমি কিছু বললাম না। ইরাও আর কিছু বলল না। কোন কিছু নিয়ে চাপাচাপি করা ইরার স্বভাব না। সে পা দুলাচ্ছে। আমি খানিকটা অসহায় বোধ করছি। অন্যদিন বিকেলে ছাদে হাঁটাহাঁটি করতাম। আজ ছাদে যেতে ইচ্ছা করছে না। ঘরে বসে থাকতেও ভাল লাগছে না।

আমার বিছানার কাছে গল্পের বইটা পড়ে আছে। এই বইটা আর বোধহয় পড়া হবে না। বইটার নাম অদ্ভুত— 'তিথির নীল তোয়ালে'। তবে বইটা অদ্ভুত না। সাদামাটা গল্প। বইয়ের নায়িকা তিথির সঙ্গে একসঙ্গে তিনটি ছেলের প্রেম। তিথি আবার খুব নোংরা নোংরা কথা বলতে ভালবাসে। পড়তে খারাপ লাগছিল না। এখানকার পাবলিক লাইব্রেরির বই। ফেরত পাঠাতে হবে।

'আপা!'

'কি?'

'এসো তোমার স্যুটকেস গুছিয়ে দেই। কি কি জিনিস নিয়ে তুমি ঢাকা যাবে বের করে দাও, আমি গুছিয়ে দেই।'

'আমি কিছুই নেব না।'

'এক কাপড়ে তো তুমি ঢাকায় উঠবে না। তোমাকে অনেক কিছুই নিতে হবে। তুমি জিনিসগুলো বের করে দাও, আমি গুছিয়ে দেই। এতে তোমার লাভ হবে আপা।'

'কি লাভ?'

'তোমার সময় কাটবে। সময় কাটানো এখন তোমার খুব সমস্যা। আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি।'

যে মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি সে স্বামীর কাছে যাবার জন্যে স্যুটকেস গুচ্ছাচ্ছে— এই দৃশ্য ভাবতেও লজ্জা লাগে। আমি চুপ করে রইলাম। ইরা খাটের নিচ থেকে কালো রঙের বিশাল স্যুটকেস বের করে ঝাড়ামোছা করতে লাগল। বড় মামার স্বভাবের খানিকটা ইরার মধ্যে আছে। সেও খুব গোছানো। আমি কিছু বলি আর না বলি সে ঠিকই স্যুটকেস গুছিয়ে দেবে। আমি ঢাকায় পৌঁছে স্যুটকেস খুলে দেখব— আমার যা যা প্রয়োজন সবই সেখানে আছে।

মা এসে ঢুকলেন। তাঁর গা থেকে ভুড় ভুড় করে এলাচের গন্ধ আসছে। মনে হয় পোলাও-কোরমা বসিয়ে দিয়েছে।

'নবনী!'

'জ্বি মা।'

'আয় তোকে গোসল দিয়ে দি। ইরা তুই আয়।'

আমি নিঃশব্দে উঠে এলাম। বাথরুমটা ছোট। দু'জন মানুষেরই সেখানে জায়গা হয় না। তার মধ্যে বড় একটা বালতি রাখায় দাঁড়ানোর জায়গা পর্যন্ত নেই।

ইরা বলল, মা, আপাকে বরং ছাদে নিয়ে যাই।

মা ভীত গলায় বললেন, কেউ যদি আবার দেখে-টেখে ফেলে ?

ইরা কঠিন গলায় বলল, দেখলে দেখবে।

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আচ্ছা যা, ছাদে নিয়ে যা। এই ভারী বালতি কে টেনে তুলবে ? অন্তু তো এখনো এল না। কোন একটা কাজ যদি সে ঠিকমত করে। মোরগ এনেছে কালো হয়ে আছে পায়ের চামড়া। একশ' বছরের বুড়া মোরগ। দশ বছর ধরে জ্বাল দিলেও সিদ্ধ হবে না।

ইরা বলল, মুরগি সিদ্ধ না হলে না হবে। তুমি এত চিন্তা করো না তো মা। দরকার হলে ওরা ছুরতা দিয়ে মাংস কেটে খাবে। তুমি টেনশান ফ্রি থাক। অন্তু ভাইয়া আসুক। সে আসার পর গায়ে-হলুদ হবে।

মা বললেন, আচ্ছা। ইরা বলল, তাহলে সন্ধ্যার পরই গায়ে-হলুদ হবে। সন্ধ্যার পর করলে কেউ কিছু দেখবেও না। ভাইয়াকে বাদ দিয়ে কি আর গায়ে-হলুদ হবে ?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা। কেন জানি মা ইরাকে খুব ভয় পান।

'গোসল করে আপা হলুদ শাড়ি পরবে না ? শাড়ি তো নেই। তুমি টাকা দাও, আমি হলুদ শাড়ি কিনে আনব।'

'তুই কিনে আনবি, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে ?'

'জিজ্ঞেস করলে বলব, আমার বড় আপার বিয়ে। আমি এমন ফকিরের মত আপার বিয়ে হতে দেব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, যা, চিৎকার করিস না। অন্তু আসুক, ওকে নিয়ে দোকানে যাবি। তুই একটু রান্নাঘরে আসবি ? আমাকে সাহায্য করবি ?'

'না, আমি অন্য কাজ করছি।'

মা আবার রান্নাঘরে চলে গেলেন। ভাজা ঘিয়ের গন্ধ আসছে। কি কি রান্না হচ্ছে একবার গিয়ে দেখলে হত। এত কিছু রান্না সব মা'র একা করতে হচ্ছে। আমাদের কাজের মেয়ে দু' দিনের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, এখনো আসছে না। আসবে বলে মনে হয় না। এক দোকানদারের সঙ্গে খুব খাতির ছিল। সেখান থেকে কোন সমস্যা বাঁধিয়েছে কি-না কে জানে। ইরার ধারণা ঘোরতর সমস্যা। তাকে না-কি গোপনে বলছে।

আমি বারান্দায় খানিকক্ষণ একা-একা দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর কোলের উপর রাখা খবরের কাগজ ফর ফর করে বাতাসে উড়ছে। তিনি দুপুরে অনেকক্ষণ ঘুমান। আজ সে সুযোগ হয় নি।

রান্নাঘর থেকে হাঁড়িকুড়ি নাড়ার শব্দ আসছে। আমি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি। আমাদের এ বাড়িটা হিন্দুবাড়ি। আমার দাদা এই বাড়ি জলের দামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিনেছিলেন। বেচারা এত সস্তায় একটিমাত্র কারণেই

www.BDeBooks.Com

বাড়ি বিক্রি করে— দাদাজান যেন তার ঠাকুরঘরটা যে রকম আছে সে রকম রেখে দেন। সেই ঠাকুরঘরটাই আমাদের এখনকার রান্নাঘর।

মা আমাকে দেখেই বলল, তুই এখানে কেন ? যা তো। যা।

আমি বললাম, একা-একা কি করছ ? আমি তোমাকে সাহায্য করি।

'কোন সাহায্য লাগবে না। তুই দরজা বন্ধ ঘরে চুপচাপ খানিকক্ষণ শুয়ে থাক।'

'রান্না-বান্না কদ্দূর করেছ ?'

'দু'টা তরকারি নেমেছে। চেখে দেখবি ?'

'না।'

আমি নরম গলায় বললাম, 'মা, আমি বসি তোমার পাশে ?'

'ধোঁয়ার মধ্যে বসতে হবে না। তুই যা।'

আমি বুঝতে পারছি মা'র প্রচণ্ড পরিশ্রম হচ্ছে। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে পরিশ্রমের ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছে তিনি খুব আনন্দে আছেন। প্রয়োজন হলে আজ সারারাত তিনি রান্না করতে পারবেন।

'নবনী!'

'জ্বি মা।'

'বৃষ্টি হবে না-কি রে মা ?'

'বুঝতে পারছি না। হবে মনে হয়। আকাশে মেঘ জমছে।'

'অবশ্যই বৃষ্টি হবে। শুভদিনে বৃষ্টি হওয়া খুব সুলক্ষণ। তোর বাবা কি করছে ?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'তুইও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। যা এখন। চা খাবি ? বানিয়ে দেখ এক কাপ ? পানি গরম আছে।'

'দাও, বানিয়ে দাও। দু'কাপ বানাও মা। তুমি নিজেও খাও।'

মা কেতলিতে চা-পাতা ছেড়ে দিলেন। মা'র রান্না-বান্না দেখার মত ব্যাপার। অসম্ভব রকম গোছানো ব্যবস্থা। আমি এখন পর্যন্ত কোন মহিলাকে এত দ্রুত এত কাজ করতে দেখি নি।

'মশলা কি তুমিই বাটছ ?'

'গুড়া মশলা আছে, কিছু নিজে বাটলাম। অন্তুকে বললাম, একটা ঠিকা লোক আনতে। কোথায় যে উধাও হয়েছে! কাজের বাড়ি, একজন পুরুষ মানুষ থাকলে কত সুবিধা।'

'কিছু লাগবে ?'

'জিরা কম পড়েছে।'

'আমি এনে দেই মা। রাস্তার ওপাশেই তো দোকান।'

'হয়েছে, তোর গিয়ে জিরা আনতে হবে না। চা নিয়ে চুপচাপ বসে খা।'

'তোমার পাশে বসে খাই মা ?'

'আমার পাশে বসে খেতে হবে না। ধোঁয়ার মধ্যে বসে চা খাবি কি?'

'তোমার পাশে বসেই খাব।'

মা বললেন, আয় আয়, বোস। আমি মা'র পাশে বসলাম। তিনি এক হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসি-খুশি মা হঠাৎ বদলে গেলেন। তিনি শিশুদের মত শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। এই কান্না কোন আনন্দের কান্না না গভীর দুঃখের কান্না। আমাকে নিয়ে মা'র অনেক দুঃখ।

আমি বললাম, মা কান্না থামাও তো। মা কাঁদতে কাঁদতেই উঠে গেলেন। আমি মা'র পেছনে পেছনে যাচ্ছি। মা গিয়ে দাঁড়ালেন বাবার সামনে।

বাবা জেগে উঠে অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না। ইরাও এসেছে বারান্দায়। মা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, এরকম ফকিরের মত চুপি চুপি আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

বাবা হতভম্ব গলায় বললেন, কি বলছ তুমি!

মা ধরা গলায় বললেন, অন্তুকে বল সে যেন ডেকোরেটরকে দিয়ে গেট বানায়। আলোকসজ্জা যেন হয়।

'পাগল হয়ে গেলে না—কি?'

'হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমি এই ভাবে মেয়ে বিয়ে দেব না। ইরা, তুই যা, সবাইকে খবর দে।'

বাবা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছেন। এমনভাবে তাকাচ্ছেন যে, দেখে মায়া লাগছে। তিনি নির্জীব গলায় বললেন, চুলার গরমে থেকে থেকে তোর মা'র ব্রেইন সর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। নিগেটিভ পজিটিভ এক হয়ে গেছে।

মা তীব্র গলায় বললেন, আমার মেয়ে কোন পাপ করে নাই। কেন তাকে আমি চোরের মত বিয়ে দেব?

বাবা ইরার দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, হা করে দেখছিস কি? তোর মা'র শরীর কাঁপছে দেখছিস না? তাকে ধর্। মাথায় পানি ঢাল্। বিছানায় শুইয়ে দে।

আমরা দু'জনেই মা'কে ধরে ফেললাম।

বাবা হতাশ গলায় বললেন, আচ্ছা যাও, হবে। সবই হবে। অন্তু আসুক। গাধাটা গেল কোথায়!

বাড়ির চেহারা পাল্টে গেছে। গিজ গিজ করছে মানুষ। আমাদের যেখানে যত আত্মীয় ছিলেন সবাই চলে এসেছেন। শুনছি অতিথপুরে ছোট খালাকেও খবর দেয়া হয়েছে। তিনিও না-কি আসছেন।

বাড়ির সামনে শুধু যে গেট বসেছে তাই না। আলোকসজ্জা হচ্ছে। কাঁঠাল গাছে লাল, নীল, সবুজ রঙের আলো জোনাকি পোকার মত জ্বলছে নিভছে।

স্টেশন থেকে বর আনার জন্যে দু'টা গাড়ি জোগাড় হয়েছে। ফুল দিয়ে সেই গাড়ি সাজানো হচ্ছে।

www.BDeBooks.Com

ইরার বান্ধবীরা এসেছে। তারা বাসরঘর সাজাচ্ছে। কাউকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমার কোথাও বসার জায়গা নেই। বাবার পিঠের ব্যথা উঠেছে বলে তিনি তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। আমাকে ডেকে পাঠালেন। কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন— তোর মামা এসে কি যে করবে ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চুপি চুপি কাজ সারতে বলেছে, এস দেখবে মচ্ছব বসে গেছে। কেউ কিচ্ছু বুঝতে চায় না। সব নির্বোধ। অন্তু না-কি ব্যান্ডপার্টি আনতে গেছে। শুনেছিস ?

'না।'

'কেউ কারো কথা শুনছে না। সবাই নিজের মত কাজ করছে। এটা কি হিন্দুবাড়ির বিয়ে যে ব্যান্ডপার্টি লাগবে ?'

'তুমি ডেকে নিষেধ করে দাও।'

'আমার নিষেধ কি কেউ শুনবে ? কেউ শুনবে না। যার যা ইচ্ছা করছে। তোর বড় মামা আসার পর দেখবি গজব হয়ে যাবে। পুরোপুরি ইসলামিক কায়দায় আল্লাহু আকবর বলে আমাকে কোরবানী করে দেবে।'

বড় মামা এসেছেন। ব্যান্ডপার্টিও একই সঙ্গে উপস্থিত হয়েছে। তারা এসেই তুমুল বাজনা শুরু করল। মামা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ কাণ্ডকারখানা দেখে বললেন, ঠিক আছে। বিয়েবাড়ি বিয়েবাড়ির মতই হওয়া উচিত। চুপি চুপি বিয়ে দিলে ওরাও সন্দেহ করত। আল্লাহ্ যা করেন ভালর জন্যেই করেন। আল্লাহ্ ভরসা।

মামার এই কথাতেই বাবার পিঠের ব্যথা কমে গেল। তিনি ক্র্যাচে ভর দিয়ে নিজেই গেলেন ব্যান্ডপার্টি দেখতে। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমরা সারাক্ষণ বাজনা বাজাবে না। বর আসার পর খানিকক্ষণ বাজাবে। ব্যস। তারপর কমপ্লিট স্টপ। মুসলমান বাড়ির বিয়ে, বাদ্য-বাজনা ভাল না। দেখি তোমাদের বাজনা কেমন একটু শুনি। স্যাম্পল শোনাও।

আমি আমার বাবাকে চিনি। বাচ্চারা যেমন ব্যান্ডপার্টি ঘিরে থাকে তিনিও থাকবেন বাচ্চাদের সঙ্গে। তাঁর একমাত্র তফাৎ হবে তিনি কিছুক্ষণ পর পর বলবেন— ব্যান্ডপার্টি আনার বেকুবি ক্ষমার অযোগ্য। এই বাক্য বলা ছাড়া ব্যান্ডপার্টি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাদের সঙ্গে তাঁর আর কোন তফাৎ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখ রাত ১১টা দশ মিনিট আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। মেয়েরা নেমে গেল বৃষ্টিতে কাদাখেলা খেলার জন্যে। উঠোন ভর্তি মেয়ে। এ তাকে কাদায় ফেলে দিচ্ছে, ও তাকে ফেলছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

বাবা এক ফাঁকে বিরক্ত গলায় ব্যান্ডপার্টির লোকদের বললেন— আনন্দের একটা সময় যাচ্ছে কাদাখেলা হচ্ছে আর তোমরা চুপচাপ বসে আছ। এখন

বাদ্য-বাজনা না বাজালে কখন বাজাবে ? কেউ মারা যাবার পর ? তোমাদের টাকা দিয়ে আনা হয়েছে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমানোর জন্যে ? যত সব ব্রেইনলেস ক্রিয়েচার। বাজাও!

তুমুল বাদ্য শুরু হয়ে গেল। বাবা হৃষ্টচিত্তে কাদাখেলা দেখতে গেলেন তবে মুখ শুকনো করে বললেন, খবরদার আমার গায়ে কেউ কাদা ছিটাবে না। সব কিছুর বয়স আছে। আমার এখন কাদাখেলার বয়স না। তাছাড়া শরীর দুর্বল। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা।

বাবাকে কেউ কাদা মাখাতে গেল না। তবে তিনি যে মনেপ্রাণে এই জিনিসটি চাচ্ছেন তা আমরা সবাই বুঝলাম। আমি ইরাকে কানে কানে বললাম, কাউকে বল না বাবার গায়ে একটু কাদা মাখিয়ে দিক।

ইরা বলল, ছোটখালা এসে পড়বেন। তিনি খবর পেয়েছেন। খালা এলেই বাবাকে তিনি কাদায় চুবাবেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

বড় মামা এসে আমাকে বললেন, খুকী তুই আমার সঙ্গে একটু আয়তো। তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।

বড় মামা আমাকে খুকী ডাকেন। আমি হচ্ছি বড় খুকী। ইরা ছোট খুকী। তার নিজের চার মেয়ে। তাদেরও নাম বড় খুকী, মেজো খুকী, সেজো খুকী, ছোট খুকী।

নিরিবিলি কথা বলার কোন জায়গা নেই। মামা আমাকে ছাদে নিয়ে গেলেন। আমাদের কথা হল ছাদে উঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ছাদে যাবার উপায় নেই। মুষল ধারে বর্ষণ হচ্ছে। সিঁড়ি অন্ধকার, তবে মামা টর্চ হাতে উঠে এসেছেন। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে নরম গলায় বললেন, বড় খুকী! তোকে কয়েকটা কথা বলা দরকার মা।

'বলুন।'

'টর্চটা নিভিয়ে দেই। খামাখা ব্যাটারি খরচ। অন্ধকারে তোর আবার ভয় লাগবে না তো ?'

'ভয় লাগবে না।'

বড় মামা বাতি নিভিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। সম্ভবত কথা গুছিয়ে নিলেন।

মামা কিছু বলছেন না। টর্চ লাইটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। একবার জ্বালাচ্ছেন একবার নিভাচ্ছেন। তাঁর বোধহয় কাশিও হয়েছে। খুব কাশছেন। আমি বললাম, আপনার কি শরীর খারাপ মামা ?

'হু। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বোধহয় মাইগ্রেন পেইন শুরু হবে। টেনশান হলে এরকম হয়। বয়স হয়ে গেছে এখন টেনশান সহ্য হয় না। বয়সতো মা কম হল না।'

'টেনশানেরতো আর কিছু নেই মামা। বিয়ে হয়ে গেছে।'

www.BDeBooks.Com

'হুঁ।'

'জরুরি কি কথা যেন বলবেন?'

'তেমন জরুরি কিছু না। বিয়েশাদী ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ্ পাক যা ঠিক করে দেন তাই হয়। জোড়া মিলানোই থাকে। আমরা খামাখাই দৌড়াদৌড়ি করি, হৈ চৈ করি। এর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করি তার সঙ্গে ঠিক করি। নিতান্তই পণ্ডশ্রম করা হয়। যার যেখানে হবার সেখানেই হবে। তুই তোর বিয়ে নিয়ে মন খারাপ করিস না।'

'আমি মন খারাপ করছি না মামা।'

'তোর আরো ভাল বিয়ে হতে পারত। হওয়া উচিত ছিল। সম্ভব হল না। চেষ্টা কম করি নাই।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, চেষ্টা করেও তো লাভ হত না। আপনিইতো বললেন, জোড়া আগেই মিলানো।

মামা বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হচ্ছে তিনি নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জোড়া মিলানোর কথা বলছেন, তবে তাঁর বিশ্বাস অন্য।

'বড় খুকী!'

'জ্বি মামা।'

'ছেলে দরিদ্র তবে ছেলে খারাপ না।'

'আমি এসব নিয়ে ভাবছি না। তোমাদের যে আমি মুক্তি দিতে পারলাম এতেই আমি খুশি।'

'আমি নিজে খাস দিলে আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া করেছি। তুই সুখী হবি। সুখটাই বড় কথা। তবে সুখী হবার জেন্য চেষ্টা করতে হয়রে মা। খুব চেষ্টা চালাতে হয়।'

'আমি চেষ্টা চালাব।'

'তুই বুদ্ধিমতী মেয়ে। তোর উপর আমার ভরসা আছে। তোর বরও বুদ্ধিমান। তোদের অসুবিধা হবে না।'

'মামা তুমি কি আমার সমস্যার কথা তাদের বলেছ?'

'পরিষ্কার করে বলি নি। তবে ইঙ্গিত দিয়েছি।'

'পরিষ্কার করে বল নি কেন?'

মামা আবার কাশতে লাগলেন। টর্চের আলো এদিক ওদিকে ফেলতে লাগলেন। আমি বললাম, মামা আমি কি বলব উনাকে?

'এখন বলাবলির দরকার নাই। তোদের দু'জনের মধ্যে ভাব ভালবাসা হোক। তারপর বলবি। তাছাড়া দেখবি বলার দরকারও পরবে না। চল নিচে যাই। সাবধানে নামিস—সিঁড়ি পিছল। ধর আমার হাত ধর।'

আমি মামার হাত ধরে সাবধানে নিচে নামছি। সিঁড়ির গোড়ায় ইরা দাঁড়িয়ে আছে। তার সুন্দর সাদা শাড়ি কাদায় মাখামাখি হয়েছে। ইরা বলল, আপা যে

ক'জন বরযাত্রী এসেছে তাদের সবাইকে কাদায় চুবিয়ে দেয়া হয়েছে। একজন দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল সে নিজেই খাদে পড়ে গেছে। আমাদের কিছু করতে হয় নি। তার অবস্থাই সবচে করুণ। হি-হি-হি।

বড় মামা বললেন, কাজটা ঠিক হচ্ছে না ছোট খুকী। এরা সম্মানিত মেহমান।

'সম্মানিত মেহমানদের অবস্থাটা একটু দেখে আসুন মামা। সম্মানিত মেহমানরা এখন মনের আনন্দেই কাদায় গড়াগড়ি করছেন। হি হি হি।'

২

বাসরঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাত দুটা বেজে গেল। এর মধ্যে কত সমস্যা যে হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। বরযাত্রী একজনের মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। ইরার এক বান্ধবীর কানের দুল খুলে পড়ে গেল। কলেজে পড়ে মেয়ে অথচ আকাশ ফাটিয়ে কান্না। এটা তার মা'র দুল। মা না-কি তাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলবে। আমার বড় মামার শুরু হল মাইগ্রেন পেইন। এই বিশেষ ধরনের মাথাব্যথা যে এমন পর্যায়ে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

বড় মামা মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন, অন্তু প্রবল বেগে তাকে বাতাস করছে এই অবস্থায় আমি বাসর ঘরে ঢুকলাম। ইরার বান্ধবীরা খাট ভালমত সাজাতে পারে নি। কাগজের ফুল দিয়ে জবরজং কি বানিয়ে রেখেছে। মামা যে ভেলভেটের চাদর এনেছেন সেটা সাইজে ছোট হয়েছে। চারদিকে তোশক বের হয়ে আছে। চাদরে গোলাপ ফুল দিয়ে লিখেছে 'ভালবাসা'। তাকালেই লজ্জা লাগে। খাটের পাশে একটা একটা বেতের চেয়ার। রাখলই যখন দুটা বেতের চেয়ার রাখলেই পারত। একটা কেন রেখেছে? সেই বেতের চেয়ারে সে বসে আছে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার নিজেই লজ্জা পেল। ধপ করে বসে পড়ল। ইরার সব বান্ধবীরা জানালার পাশে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। ওরা হেসে উঠল খিলখিল করে। আমি খাটের উপর বসলাম।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমি বসলাম সহজভাবেই। লজ্জায় অভিভূত হলাম না। তার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমার লজ্জা লাগল না। আমি তাকালাম আগ্রহ নিয়ে। এই জীবন যার সঙ্গে কাটাব তাকে ভাল করে দেখতে ইচ্ছা করল। ইচ্ছাটা কি অন্যায়?

বিশেষত্বহীন চেহারার একজন মানুষ। মাথা খানিকটা নিচু করে বসে আছে। এরকম মানুষ পথে ঘাটে, ট্রেনে বাসে কত দেখি। আগ্রহ নিয়ে এদের দিকে কখনো কেউ তাকিয়ে থাকে না। যেহেতু কেউ তাকিয়ে থাকে না সেহেতু তারাও বেশ নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাটা তরমুজ কিনে সারামুখে রস মাখিয়ে খায়। রাস্তায় যেতে যেতে শব্দ করে নাক ঝাড়ে।

ঘরে আলো কম। ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় এরা একটা হারিকেন এবং একটা মোমবাতি দিয়ে গেছে। বাতাসে মোমবাতি যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে

www.BDeBooks.Com

হয় যে কোন মুহূর্তে নিভে যাবে। সে আমাকে দেখছে না। তার হয়তো লজ্জা লাগছে। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে। এক সময় মোমবাতি নিভে গেল। সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মোমবাতি জ্বালালো। যেন বাতি জ্বালিয়ে রাখাই তার প্রধান কাজ। ইরার বান্ধবীরা আবারও হাসছে খিলখিল করে। সে খুব লজ্জা পাচ্ছে। অসহায়ের মত তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি হেসে ফেললাম। কেন হাসলাম নিজেই জানি না। আমি হাসি শাড়ির আঁচলে লুকানোর চেষ্টা করলাম না। মনে হয় সহজভাবে হেসে আমি মানুষটাকে অভয় দিতে চেষ্টা করলাম। সে অন্যদিকে তাকিয়ে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল,

'তোমার মামার মাথাব্যথা কি খুব বেশি ?'

আমার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা। আমি বললাম, হ্যাঁ বেশি।

সে তৎক্ষণাৎ বলল, আমার এক বন্ধুর স্ত্রীরও মাইগ্রেন আছে। ওর নাম অহনা। অকুপাংচারে চিকিৎসা করিয়েছিল, এতে কমেছে।

মানুষটা কথা বলে সহজ হবার চেষ্টা করছে। আমি তাকে সুযোগ করে দেবার জন্যেই বললাম, অকুপাংচার কি ? যদিও আমি খুব ভাল করেই জানি অকুপাংচার কি।

সে নড়েচড়ে বসল। খুব আগ্রহের সঙ্গে বলল, অকুপাংচার হল এক ধরনের চায়নীজ চিকিৎসা। সুচ ফুটিয়ে দেয়।

'ব্যথা লাগে না ?

'লাগে, খুব অল্প।'

তার কথা ফুরিয়ে গেল। সে এখন আবার তাকিয়ে আছে মোমবাতির দিকে। বোধহয় মনে-প্রাণে চাচ্ছে মোমবাতিটা নিভে যাক, তাহলে সে একটা কাজ পাবে, ছুটে গিয়ে মোমবাতি জ্বালাতে পারবে।

আমার বলতে ইচ্ছা করছে—তুমি মোমবাতি নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? তুমি আমার দিকে তাকাও। আমাকে এত লজ্জা পাবার কিছু নেই। তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

আসলেই মানুষটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। সে ইরার নায়ক শুভ্র নয়। সে সাধারণ একজন মানুষ। অস্বস্তি, দ্বিধা এবং খানিকটা লজ্জা নিয়ে সে বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। কোন কথা পাচ্ছে না বলেই অকুপাংচার নিয়ে এসেছে। সেই বিষয়েও বেচারা বোধহয় কিছু জানে না। জানলে আরও কথা বলত।

'সফিকেরও আমার সঙ্গে আসার কথা ছিল। সে হঠাৎ চলে গেল ব্যাঙ্কক।'

'সফিক কে ?'

'যার কথা একটু আগে বললাম— অহনা। তার স্বামীর নাম সফিক। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি ওর অফিসেই কাজ করি। আমার বস।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার বস শুধু না প্রতিষ্ঠানের মালিকও তবে আমার সঙ্গে ব্যবহার বন্ধুর মত। বিরাট বড়লোক। তার বাড়ি দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। ছাদে সুইমিং পুল।'

'খুব সুন্দর ?'

'খুবই সুন্দর। মাঝে মাঝে জোছনা রাতে সুইমিং পুলের পাশে সে পার্টি দেয়। অপূর্ব লাগে।'

সে খুব আগ্রহ নিয়ে কথা বলছে। আমি লক্ষ্য করছি মানুষটার উপর আমার মায়া পড়ে যাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছে, তার কথা শুনতে ভাল লাগছে। শুরুতে তার চেহারা যতটা সাধারণ মনে হচ্ছিল এখন ততটা সাধারণ মনে হচ্ছে না। তার চোখ দু'টা খুব সুন্দর লাগছে। মাথা ঝুকিয়ে কথা বলার ভঙ্গিও সুন্দর।

কেন এত অল্প সময়ে লোকটির উপর আমার মায়া পড়ল ? এই মায়ার উৎস কি ? এই ব্যাপারটা কি সব মেয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে, না শুধু আমার বেলায় ঘটল ? এই লোকটির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হলে তার উপরও কি এত দ্রুত মায়া পড়ে যেত। তার চোখও কি সুন্দর লাগত ?

মোমবাতি আবার নিভে গেছে। সে উৎসাহের সঙ্গে আবার ছুটে গেছে। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে তার মোমবাতি জ্বালানো দেখছি। দেয়াশলাইয়ের কাঠি বার বার নিভে যাচ্ছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের এখানে খুব বাতাস। তোমাদের বাড়িটা কি দক্ষিণমুখী ?

'না।'

'তোমাদের এদিকে বোধহয় খুব বৃষ্টি হয়।'

'হ্যাঁ খুব বৃষ্টি।'

'যে ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, শিওর বন্যা হবে।'

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে। সে আমার দিকে তাকালো। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। কি আশ্চর্য! ছোটখালা। অতিথপুর থেকে ছোটখালা চলে এসেছেন। তিনি খবরই পেলেন কিভাবে, এলেনই বা কিভাবে ? ছোটখালার হাতে ট্রে। ট্রেতে দু'কাপ চা। ছোটখালা হাসি মুখে বললেন— চা দেয়ার অজুহাতে জোর করে ঢুকে পড়লাম। ও নবনী, তোর বরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, উনি আমার ছোটখালা। আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ।

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

ছোটখালা বললেন, ও নবনী, তোর বর যে আমাকে সালাম করল— আমি খালি হাতে এসেছি। যাই হোক, দেখি সকালে ব্যবস্থা করা যায় কি-না। তোরা দু' জন দু' মাথায় বসে আছিস কেন ? বাবা, তুমি নবনীর পাশে গিয়ে বস। ছোটাছুটি করে মোমবাতি জ্বালাতে তোমাকে কে বলেছে ? চা খেয়ে মোমবাতি হারিকেন দু'টাই নিভিয়ে প্রাণভরে গল্প কর। মেয়েরা সব জানালায় ভিড় করে আছে। বাতি নিভিয়ে দিলে কিছু দেখা যাবে না। ওরা ভিড় কমাবে। বুঝতে পারছ ?

www.BDeBooks.Com

ছোটখালা ওকে হাত ধরে আমার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললেন, নবনীর মত সুন্দর মেয়ে কি তুমি এর আগে কখনও দেখেছ ? বল হ্যাঁ কিংবা না।

ও হাসল। ছোটখালা আমাদের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে রইলেন। যাবার সময় বাতি নিভিয়ে গেলেন। ও উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ছিটকিনি লাগাল। খাটের দিকে আসতে গিয়ে চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আমি উঠে এসে তাকে ধরলাম। ও লাজুক গলায় বলল, মোটেও ব্যথা পাই নি। তোমাকে ধরতে হবে না।

আমি হাত ধরে তাকে খাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি— ইরার উপন্যাসের সেই নায়ক শুভ্রকেও কি তার স্ত্রী ধরে ধরে খাটের দিকে নিয়ে যেত ?

'নবনী!'

'উঁ।'

'তুমি খুব বেশি সুন্দর। আরেকটু কম সুন্দর হলে ভাল হত।'

'কম সুন্দর হলে ভাল হত কেন ?'

'এম্নি বললাম, কথার কথা। সফিক তার স্ত্রীকে সবসময় এই কথা বলে।'

'উনার স্ত্রী কি খুব সুন্দর ?'

'হ্যাঁ খুব সুন্দর। কালো কিন্তু সুন্দর। তার নামটাও অদ্ভুত। অহনা। আর কোন মেয়ের এমন নাম শুনেছ ?'

'না।'

'নবনী!'

'কি ?'

'আমি এর আগে কখনও কোন মেয়ের হাত ধরি নি। এই যে তোমার হাত ধরেছি কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে। এই দেখ, আমার শরীর কাঁপছে।'

ওর কথা শুনে আমার কি যে ভাল লাগল! চোখে পানি এসে গেল। বাসররাতে সব মেয়েই বোধহয় কোন-না-কোন উপলক্ষে চোখের পানি ফেলে। আমি ফেললাম। আমার সেই চোখের পানিতে আনন্দ ছিল, সুখ ছিল। সেই সুখ ও আনন্দের তেমন কোন কারণ ছিল না। অকারণ সুখ অকারণ আনন্দও তো মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে আসে।

রাত এখন কত আমি জানি না। আমার হাতে ঘড়ি নেই। একটা ঘড়ি ছিল। ইরার বান্ধবীরা ঘড়ি খুলে নিয়েছে। বাসর ঘরে না-কি ঘড়ি নিয়ে ঢুকতে নেই। ঘড়ি নিয়ে ঢুকলেই কিছুক্ষণ পরপর ঘড়ি দেখতে ইচ্ছে করবে। বাসর রাতটা হবে এমন যেখানে সময় বলে কিছু থাকবে না। আমি ইরার বান্ধবীদের সঙ্গে কোন তর্ক করি নি। ওরা ঘড়ি খুলতে চেয়েছে। আমি খুলে দিয়েছি। ওরা যদি ভাবে ঘড়ি খুলে রাখলেই সময় বন্ধ হয়ে যাবে—ভাবুক।

ও বিছানার একপাশে গুটিশুটি মেরে ঘুমুচ্ছে। খাটের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে গেছে। আমার কেবলই ভয় হচ্ছে এই বুঝি গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। ইচ্ছে

করছে তাকে নিজের কাছে টেনে নেই। ইচ্ছে করলেও সম্ভব না। মানুষের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। তবে আমি বেতের চেয়ারটি খাটের পাশে এনে রেখেছি। গড়িয়ে পড়লেও মেঝেতে পরবে না। চেয়ারের উপর পরবে।

বৃষ্টি কিছু সময়ের জন্যে থেমেছিল। এখন আবার প্রবল বেগে শুরু হয়েছে। বাতাসও দিচ্ছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। এ বাড়ির কেউই বোধহয় ঘুমায়নি। বারান্দায় তাদের হাঁটাহাঁটির শব্দ পাচ্ছি। হাসাহাসির শব্দও হচ্ছে। সবচে বেশি হাসছে ইরা। খিলখিল খিলখিল। হাসছেতো হাসছেই। ইরা বোধহয় আজ হাসির বিশ্ব রেকর্ড করল। কি নিয়ে তাদের এত হাসাহাসি? কাদাখেলা কি শেষ হয় নি? না-কি আজ সারারাতই চলবে?

আমার ঘুম আসছে না। আমি ভোর হবার জন্যে অপেক্ষা করছি। ভোরবেলা একা একা ছাদে খানিকক্ষণ হাঁটব। ও যদি জেগে থাকে— ওকেও সঙ্গে নেব। আমার ধারণা এই পৃথিবীতে অল্প যে কয়টি সুন্দর জায়গা আছে আমাদের বাসার ছাদটা তার একটা। উঁচু রেলিং দিয়ে ছাদটা ঘেরা। শ্যাওলা জমে রেলিং হয়েছে গাঢ় সবুজ। মনে হয় ইট পাথরের রেলিং নয়— সবুজ লতার রেলিং। বাড়ির পেছনের প্রকাণ্ড শিরীষ গাছটা বেঁকে এসে ছাতার মত ছায়া ফেলেছে ছাদের উপর। গাছ ভর্তি টিয়া পাখি। সকাল এবং সন্ধ্যায় ঝাঁক বেঁধে টিয়া পাখি উড়তে থাকে। তীক্ষ্ণ গলায় ডাকে ট্যাঁ ট্যাঁ। টিয়া পাখিগুলো খুব অদ্ভুত এরা মানুষের দেয়া খাবার কখনো খায় না। আমি কতবার ছাদে চাল ছড়িয়ে দিয়েছি— কাক এসে খেয়ে গেছে। টিয়ারা কাছে আসে নি।

ভোরবেলা যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আমি ইরাকে বলব আমাদের দু'জনকে ছাদে চা দিতে। ইরা মনে মনে হাসবে। পরে হয়ত ঠাট্টাও করবে। করুক ঠাট্টা। এমন একটা সুন্দর জিনিস ওকে না দেখিয়ে নিয়ে যাব তা হয় না। তাছাড়া আমি ঠিক করেছি— চা খেতে খেতে ভোরের প্রথম আলোয় ওকে বলব— আমার জীবনের ভয়াবহ সমস্যার কথা। ওকে সমস্যাটা বলে রাখা দরকার। সব শোনার পর সে যদি বলে—নবনী! তুমি এইখানেই থাক। তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব না। তাহলে এখানেই থেকে যাব। বিশাল এই বৃক্ষের ছায়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে আমার খুব খারাপ লাগবে না। সেই মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।

ওকে আমি কি ভাবে কথাটা বলব? শুরু করাটাই সমস্যা। একবার শুরু করলে বাকিটা আমি তরতর করে বলে যেতে পারব। শুরু করব কি ভাবে? এই ভাবে কি শুরু করা যায়?

'এই শোন, আমার এক সময় একজনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল।'

না এভাবে শুরু করা যায় না। পৃথিবীর কোন স্বামীই বিয়ের পরদিন এ ধরনের কোন কথা শুনতে চায় না। কোন স্বামীই গোপন সত্য শুনতে চায় না। তারা শুনতে চায় মধুর মিথ্যা।

www.BDeBooks.Com

একসময় একজনের সঙ্গে খুব ভাব ছিল এটা এমন ভয়াবহ কোন ব্যাপারও নয়। ভাবতো থাকতেই পারে। তবে খুব ভাব ছিল— সমস্যাটা এইখানেই। 'খুব' বলে একটা ছোট্ট বিশেষণ আছে। আমি ইচ্ছা করে বসাই নি। নিজের অজান্তেই চলে এসেছে।

উনার নাম...।

থাক নামটা বাদ থাক। নামের দরকার নেই। উনি ছিলেন আমাদের কলেজের ইতিহাসের শিক্ষক। বয়স অল্প। পাস করে প্রথমেই এই কলেজে এসেছেন। এখানেই তাঁর চাকরি জীবনের শুরু। তাঁকে দেখে আমাদের মেয়েদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পরে গেল। হাসাহাসির প্রধান কারণ তাঁর পরনে জোব্বা ধরনের পোশাক। গোড়ালী পর্যন্ত পায়জামা। থুতনীতে ছাগল দাড়ির মত ফিনফিনে এক গোছা দাড়ি। তিনি চোখে সুরমা দেন। ক্লাসে যখন পড়ান তখন কখনো মেয়েদের দিকে তাকান না। মেঝের দিকে তাকিয়ে পড়ান। হঠাৎ কারো চোখে চোখ পড়ে গেলে লজ্জায় লাল হয়ে যান। তবে পড়ান খুব সুন্দর। এরকম অল্প বয়স্ক একজন মৌলানাকে বেছে বেছে তারা মেয়েদের কলেজে কেন দিল কে জানে। কলেজের সব স্যারদের নাম থাকে। তাঁর নাম হল 'চেংড়া হুজুর'।

আমরা নানাভাবে তাঁকে যন্ত্রণা করি। যেমন তিনি রেজিস্ট্রার খাতা হাতে যখন ক্লাসে ঢুকেন তখন আমরা সব কয়টি মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলি— আসসালামু আলায়কুম। আমাদের এই সমবেত চিৎকারে কলেজ কেঁপে উঠে। তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অসহায় ভঙ্গিতে বলেন— ওয়ালাইকুম সালাম। তাঁকে ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয়। যেমন একদিন ক্লাসের পড়া শেষ করে বললেন, কারো কোন প্রশ্ন আছে। আমাদের ক্লাসের সবচে স্মার্ট মেয়ে মবকুলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জ্বি স্যার আছে।

'বল।'

'আপনি এমন অদ্ভুত পোশাক পরে ক্লাসে আসেন কেন?'

'অদ্ভুত পোশাকতো না। আমাদের নবীজী এই পোশাক পরতেন।'

'নবীজীতো উটে চড়ে ঘোরাফেরা করতেন। আপনি উটে না চড়ে রিকশায় আসেন কেন?'

'উটের প্রচলন এখানেই নেই। থাকলে হয়ত আসতাম।'

হো হো করে আমরা হেসে উঠলাম। স্যার চোখ মুখ লাল করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণ গলায় বললেন, আচ্ছা যাই আসসালামু আলায়কুম।

আমরা সমস্বরে হুংকার দিয়ে উঠলাম— ওয়ালাইকুম সালাম। আমাদের হুংকারে কলেজ বিল্ডিং কেঁপে উঠল।

একদিন বিকেলে ছাদে হাঁটছি, মা এসে বলল, বাইরে এক ভদ্রলোক এসেছেন। তোর বাবা চা চাচ্ছে। চা দিয়ে আয়। আমি দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি— আমাদের চেংড়া হুজুর। আজ তাঁর পোশাক আরো

চমৎকার। মাথায় পাগড়ি পরেছেন। বিয়ের আসরে ছেলেরা পাগড়ি পরে বলে জানি কিন্তু কেউ যে পাগড়ি পরে অন্যের বাড়িতে বেড়াতে আসতে পারে তা জানা ছিল না। ভদ্রলোক কি উন্মাদ ? তিনি আমাকে দেখে মাথা নিচু করে ফেললেন। বাবা বললেন, নবনী উনি মহিলা কলেজের একজন শিক্ষক। আমাদের যে বাড়তি দু'টা ঘর আছে ঐ ঘর দু'টা তিনি ভাড়া নেবেন।

আমি বললাম, বাবা আমি উনাকে চিনি। উনি আমাদের ইতিহাস পড়ান।

'ইতিহাস পড়ান ? বলিস কি। আমিতো ভেবেছি এরাবিকের টিচার।'

স্যার মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনারেল হিস্ট্রীতে এম. এ. করেছি।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ও আচ্ছা। তাহলে তো ভালই হল। গুড। ভেরী গুড। একসেলেন্ট।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, কেমন আছেন স্যার ? তিনি ঠিক আগের মতই মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাল। তুমি ভাল আছ নবনী ?

স্যার যে আমার নাম জানেন তা জানতাম না। আমি চমকে উঠলাম।

'চা নিন স্যার। চুমুক দিয়ে দেখুন চিনি হয়েছে কি-না।'

স্যার আমার দিকে তাকালেন। কি আশ্চর্য এত সুন্দর চোখ! কি শান্ত! কি মায়াকাড়া! না-কি এসব আমার কল্পনা। স্যার চোখ নামিয়ে নিয়েছেন। আমার বলতে ইচ্ছা করছে, আপনি আমার দিকে তাকিয়ে চা খানতো স্যার। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছেন কেন ? মেঝেতে কি আছে দেখার ?

টিয়া পাখির ট্যাঁ ট্যাঁ শোনা যাচ্ছে।

ভোর হয়ে গেছে। বৃষ্টি এখনো থামে নি। আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি আমাদের বিদায়ের আয়োজন চলছে। ভোর বেলা ট্রেন। এক্ষুণি রওনা না হলে ট্রেন ধরা যাবে না। বড় মামা সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন।

আমার সমস্যার গল্প আজ আর বলা হল না।

৩

আমি ঢাকায় ওর বাসায় উঠে এলাম।

সেগুন বাগিচায় অফিসের সাথেই বাসা। একতলা দোতলা জুড়ে অফিস। দোতলার পেছন দিকে ওর বাসা। একটা মোটে ঘর। বারান্দার খানিকটা অংশ আলাদা করে রান্নাঘর। গ্যাসের ব্যবস্থা নেই। কেরোসিনের চুলায় রান্না। বারান্দায় অন্য মাথায় বাথরুম। বাথরুম এবং রান্নাঘরের মাঝের ফাঁকা জায়গাটার আট-দশটা ফুলের টব। সপ্তম আশ্চর্যের মত সেখানে একটা পাখির খাঁচায় ময়না পাখি।

ও খুব আগ্রহ করে বলল, বুঝলে নবনী! এই ময়না মানুষের চেয়ে সুন্দর করে কথা বলে। দু'দিন যাক, দেখবে তোমার গলা হুবহু নকল করবে। ও নকলে খুব ওস্তাদ।

www.BDeBooks.Com

ময়না বেশ আগ্রহ নিয়ে আমাকে দেখছে। কোন কথা বলছে না। আমি বললাম, কই, কথা বলছে না তো ?

'হঠাৎ তোমাকে দেখেছে— এই জন্যে। কয়েকদিন যাক, তারপর দেখবে ওর কথার যন্ত্রণায় থাকতে পারবে না। আমার বাড়ি-ঘর তোমার পছন্দ হয় নি, তাই না নবনী ?'

'হয়েছে।'

'পছন্দ যে হয় নি সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। একা মানুষ তো, বিরাট বাড়ি নিয়ে কি করব ? তাছাড়া বাড়িটা কিন্তু ভাল। খুব হাওয়া। ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। ছাদে যাওয়া যায়। ছাদে যাবে ? আচ্ছা, পরে তোমাকে নিয়ে যাব। টায়ার্ড হয়ে এসেছ, এখন রেস্ট নাও। আমি চা নিয়ে আসি।'

ও ঘর থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নেমে গেল। এই বাসার সব কিছুই ছোট ছোট। সে যে ফ্লাস্কটা নিয়ে বের হয়েছে সেটিও ছোট। এক কাপ চা ধরবে কি-না কে জানে। আমি ঘুরে-ফিরে তার সংসার দেখতে লাগলাম।

শোবার ঘরে একটা খাট। সেই খাটে একটাই বালিশ। আমার জন্যে দ্বিতীয় বালিশ কেনে নি। হয়ত আজ সন্ধ্যাবেলা বালিশ কিনতে যাবে। কিংবা কে জানে হয়তো একটা বালিশেই দু'জনকে ভাগাভাগি করে ঘুমুতে হবে। একটা লেখার টেবিল খাটের সঙ্গে লাগানো। টেবিলের সঙ্গে চেয়ার নিই। কাজই ধরে নেয়া যায় লেখালেখির কাজ খাটে বসে সারা হয়। টেবিলের পাশে মিটসেফের মত আছে। সেখানে নতুন একটা টি-সেট। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এই টি-সেট এখনো ব্যবহার করা হয় নি। কাপড় রাখার আলনা আছে। আলনায় কাপড় নেই। কয়েকটা তোয়ালে এবং গামছা— ভাজ করে রাখা। কে জানে হয়ত তোয়ালে রাখার জন্যেই এই আলনা।

দেয়ালে কিছু বাঁধানো ছবি আছে। একটি তার বাবার ছবি। চেহারার মিল থেকে বলে দেয়া যায়। তার পাশের ছবিটি বোধহয় তার মা'র। এই মহিলা খুব রূপবতী ছিলেন।

ফ্রেম বাঁধানো নজরুল ইসলামের একটা হাতে আঁকা ছবি আছে। ছবির নিচে লেখা Art by Noman Class VIII, Section B. সাহেব তাহলে ছেলেবেলায় শিল্পী ছিলেন।

খাটের নিচে রাজ্যের জিনিস। তার মধ্যে মাটির পালকি এবং পুতুল আছে। এইগুলি কি জন্যে রাখা কে জানে। জিজ্ঞেস করতে হবে।

আমি হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। বাথরুমটা ঝকঝকে। আমাদের নেত্রকোনার বাড়ির বাথরুমের মত অন্ধকার এবং স্যাঁতসেঁতে নয়। সবচে' বড় কথা—বাথরুমের উপরের দিকে ভেন্টিলেটারের মত আছে, যে ভেন্টিলেটার দিকে আকাশ দেখা যায়। গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে আকাশ দেখার মত আনন্দের আর কি আছে ?

মুখে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। হঠাৎ করে মনে হল আমাদের দু'জনের জন্য এরকম একটা ঘরেরই দরকার ছিল।

ও শুধু চা আনেনি, একটা ঠোঙায় কিছু জিলাপী। আরেক ঠোঙায় কিছু নোনতা বিসকিট। সে মিটসেফ থেকে কাপ বের করছে। আমি দেখলাম, দু'টা না, সে একটা কাপ বের করেছে। ঐ কাপটি সে এগিয়ে দিল আমার দিকে। নিজে চা ঢালল ফ্লাস্কের মুখে। যেন আমি খুব সম্মানিত একজন মেহমান। বাইরের কেউ।

'নবনী! টি-সেটটা নতুন কিনেছি। সুন্দর না ?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।'

'সেট হিসেবে কিনলে দাম বেশি লাগে। আমি আলাদা আলাদা কিনে সেট বানিয়েছি অনেক সস্তা পড়েছে।'

'আচ্ছা।'

'বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হতে হবে। টুকটাক অনেক জিনিস কিনতে হবে। তোমার কি কোলবালিশ লাগে ?'

'না।'

'তোমার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল কিনেছি। এগার তারিখ ডেলিভারি দেয়ার কথা ছিল, নিতে গেলাম, বলে— পালিশ হয় নাই। এখন বোধহয় পালিশ হয়ে গেছে, নিয়ে আসব। আরেকটু চা দেই, ফ্লাস্কে চা আছে। তিন কাপ চা আটে।'

আমি ওকে খুশি করার জন্যেই আরেকটু চা নিলাম। শরবতের মত মিষ্টি চা। মুখে দিলেই পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে যায়।

'নবনী শোন, আমি অফিসে যাই। কিছু জরুরি কাজ ছিল। তুমি একা থাকতে পারবে তো ?'

'পারব।'

'গোসল সেরে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়। তুমি টায়ার্ড হয়ে আছ তোমার ঘুম দরকার।'

'ও আচ্ছা।'

'একা-একা ভয় পাবে না তো ?'

'ভয় পাবার কিছু আছে কি ?'

'ভয় পাবার কিছুই নেই। খুব সেইফ জায়গা। অফিসের তিনজন দারোয়ান আছে। এরা সব সময় পাহারা দেয়। আর আমি তো আছিই। আমি মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'খোঁজ নিতে হবে না। আমি ভালই থাকব।'

'ছোট বাসা দেখে তোমার মন খারাপ হয়নি তো নবনী ?'

'না।'

'দিন এরকম থাকবে না। নিজেই এক সময় ব্যবসা শুরু করব। এ্যাড ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপার আমি এখন সবই জানি। সাহস করে শুরু করলেই হয়। আরেকটু চা দেই ? ফ্লাস্কে আছে খানিকটা।'

www.BDeBooks.Com

ও চা ঢেলে দিল। তার মুখ হাসি-হাসি। বারান্দায় ময়নাটার কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলল— কথা বল, এই ময়না, কথা বল। বল দেখি— নবনী! নবনী!

ময়না খাঁচার ভেতর ছট্ফট্ করছে। কথা বলছে না। আমি খাটে বসে দেখছি, ও পকেট থেকে কলা বের করে খোসা ছাড়িয়ে সে ময়নাকে দিচ্ছে। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলছে— কথা বল না রে বাবা। বল— নবনী! নবনী! কি হয় কথা বললে ?

আমাকে শুনানোর জন্যেই বেচারার এই চেষ্টা। এই পৃথিবীতে তার যা কিছু দেখানোর আছে সবই সে আমাকে দেখাতে চায়। আমাকে অভিভূত করাই তার লক্ষ্য। তার প্রয়োজন ছিল না।

আমি বললাম, নজরুলের এই ছবি কি তোমার আঁকা ?

সে লজ্জিত গলায় বলল, হুঁ। ফেলে দেয়া উচিত। ফেলতে পারি না। মায়া লাগে।

'ফেলার দরকার কি সুন্দর ছবিতো। এখনো কি ছবি আঁক ?'

' না না। কিযে তুমি বল। স্কুলে পড়ার সময় খুব আঁকতাম। নবনী আমি যাই। তাড়াতাড়ি চলে আসব।'

সম্পূর্ণ নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। অচেনা ঘরের অচেনা খাটে আমি শুয়ে আছি। ঘরের আলো কমে এসেছে। আবারও মেঘ করেছে। মনে হয় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে। নামুক বৃষ্টি, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক। বৃষ্টি নামলে ময়নাটা ভিজবে। আমি কি ওকে নিয়ে আসব ভেতরে ? না-কি ওর পানিতে ভিজে অভ্যাস আছে ?

নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন না, একটা পাখির কথা ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় ঘুম। ঘুমের মধ্যেই শুনলাম বৃষ্টি পড়ছে। ঘুমের মধ্যেই পাখিটার ছটফটানি কানে গেল এবং একসময় পাখিটা নবনী নবনী বলে আমাকে ডাকতেও লাগল। এটা হয়ত আমার ভুল। হয়ত আমার স্বপ্নের ক্ষুদ্র অংশ। কিছু কিছু সময়ে মানুষের স্বপ্ন ও সত্য মিলে-মিশে এক হয়ে যায়।। পাখিটা আমাকে ক্রমাগত ডাকছে— নবনী, নবনী। কি মিষ্টি, কি সুরেলা তার গলা! বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। বৃষ্টি নেই— চারদিক খটখট করছে। পুরোটাই তাহলে স্বপ্ন ছিল ? আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। নোমানকে দেখা যাচ্ছে— হাতে পলিথিনের দু'টা ব্যাগ। ব্যস্ত ভঙ্গিতে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সে কি অফিস থেকে আবার বাজারে গিয়েছিল ?

বারান্দার দরজা খুলে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি। ঘর অন্ধকার হয়ে আছে। ও আসুক। ও এলেই বাতি জ্বালাব।

'নবনী, খুব দেরি করে ফেললাম। অফিস থেকে বের হতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। নতুন একটা পার্টি এসেছে। কাজ নেই, শুধু বকর বকর করে। অফিস

থেকে বের হয়েই একবার উঁকি দিয়েছি। দরজা বন্ধ কয়েকবার ঠক ঠক করলাম। দরজা খুলল না। বুঝলাম তুমি ঘুমাচ্ছ চলে গেলাম ড্রেসিং টেবিলটার খোঁজে। ওদের সঙ্গেও নানান ঝগড়া।'

'ঝগড়া কেন ?'

'আর বল কেন ? এখনো পালিশ হয় নি। কারিগর না-কি ছুটিতে গেছে। পুরো টাকা অ্যাডভান্স দেয়া, নয়ত অন্যখান থেকে কিনতাম। তোমার ঘুম হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'চল আমরা বের হই। মেলা কাজ। টুকটাক জিনিস কিনব। রাতে আবার দাওয়াত।'

'দাওয়াত খেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা না করলেও যেতে হবে। উপায় নেই। আমার বস দাওয়াত দিয়েছে। সফিক। তোমাকেতো আগেই বলেছি আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। তারই এ্যাড ব্যবসা। সফিকের আমার বিয়েতে যাবার কথা ছিল। যেতে পারল না— ব্যাংকক যেতে হল। ও আজ সকালের ফ্লাইটে এসেছে।'

'তোমার খুব ভাল বন্ধু ?'

'অবশ্যই ভাল বন্ধু। তুই তোকারি সম্পর্ক। আমি যে এত ছোট একটা কাজ করি এটা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। শুধু যে আমার সাথেই এই ব্যবহার তা না, সবার সাথে। অফিসের দারোয়ানের মেয়ের বিয়ে। অফিসের কেউ যায় নি— সফিক গিয়েছিল। তোমাকে নিয়ে এসেছি শুনে তৎক্ষণাৎ সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আসছিল। তুমি ঘুমাচ্ছ ভেবে আনি নি।'

'এলে সমস্যাও হত। তাঁকে বসাতে কোথায় ? শোবার ঘর ছাড়া এখানে আর ঘর কোথায় ?'

'শোবার ঘরেই বসাতাম। সমস্যা নেই। ও পা মেলে মেঝেতে বসে কতদিন চা খেয়েছে। মানুষ হিসেবেও অসাধারণ। দেখলেই বুঝবে। ফ্লাস্কটা দাও তো নবনী। চা নিয়ে আসি। চা খেয়েই বের হয়ে পড়ি।'

'ঘরে চা বানানোর ব্যবস্থা নেই ?'

'না। আজ সব কিনব। আমি চা খাই না তো, এই জন্যে ব্যবস্থা রাখি নি। তুমি তো আবার খুব চা খাও।'

'কে বলল ?'

'বাসররাতে তোমার ছোটখালা চা নিয়ে এলেন, তুমি খুব আরাম করে খেলে— সবটা চা শেষ করলে। সেখান থেকেই বুঝলাম।'

ও হাসছে। সুন্দর করে হাসছে। আমার গোপন রহস্য ধরে ফেলেছে, সেই রহস্যভেদের হাসি। আনন্দ ও তৃপ্তির হাসি।

ফ্লাস্ক নিয়ে যাবার পথে ও আবার ময়নাটার সামনে দাঁড়াল। আবার সেই অনুনয়-বিনয়— বল ময়না, বল, বল— নবনী। বল তো দেখি। সুন্দর করে বল— নবনী। ন-ব-নী। কলা খেতে দেব। কলা।

www.BDeBooks.Com

ময়না কথা বলার সেই আশ্চর্য বিদ্যা গোপন করেই রাখল। একবার ডেকে ফেললে কি হয় ? বেচারা এত চেষ্টা করছে। কে জানে আমার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর থেকেই সে হয়ত 'নবনী' ডাক শেখানোর চেষ্টা করছে।

ও ফ্লাস্ক নিয়ে চলে যাবার পরপরই ময়না ডেকে উঠল। অবিকল ওর মত গলায় ডাকল— নবনী! নবনী! আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। কি অদ্ভুত ব্যাপার!

নোমান গেটের কাছ থেকে আবার ফিরে আসছে। হনহন করে আসছে। পাখির কথা শুনতে পেয়ে আসছে বলে মনে হয় না। পাখির গলা এতদূর যাবে না। অন্য কিছু হবে। হয়ত মানিব্যাগ ফেলে গেছে।

'নবনী!'

'কি ?'

'তোমার জ্বর-টর আসে নি তো ? অফিস থেকে ফিরে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল জ্বর এসেছে।'

'না, জ্বর আসে নি। তুমি কি জ্বরের খোঁজ নেবার জন্যে ফিরে এসেছ ?'

'হ্যাঁ। দেখি কাছে আস তো। জ্বর আছে কি-না দেখি।'

আমি ওর কাছে এগিয়ে এলাম। ও আমার কপালে হাত রাখল। বেচারা আমার শরীর ছুঁয়ে দেখার জন্যে ছুটে এসেছে। জ্বরে মত একটা বাজে অজুহাত তৈরি করেছে। আমার বলতে ইচ্ছা করছে— শোন, তোমার যখনই আমাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে, ছুঁয়ে দেখবে। লজ্জা, দ্বিধা বা সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি তা বলতে পারলাম না। কিছু কথা আছে যা অতি প্রিয়জনদেরও বলা যায় না। তবে ওর এই ছেলেমানুষী কৌশল আমি আমার পরবর্তী জীবনে অনেক অনেকবার কাজে লাগিয়েছি।

যখন আমার নিজের ইচ্ছে করেছে ও আমাকে ছুঁয়ে দেখুক, তখনি বলেছি— এই, দেখ তো আমার জ্বর কি-না। শরীরটা ভাল লাগছে না। ও আমার কপালে হাত রেখে বলেছে— গা পানির মত ঠাণ্ডা, জ্বর নেই তো।

আমি হেসে ফেলেছি। ও আমার হাসি দেখে হকচকিয়ে গেছে তবে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। বড়দের ছেলেমানুষী এক খেলা।

৪

'দেখলে কত বড় বাড়ি ?'

সে এমনভাবে বলল যেন বাড়িটা ওর নিজের। আমি হাসলাম। ওর ছেলেমানুষিগুলো এখন আমার চোখে পড়তে শুরু করেছে। দোকানে কেনাকাটার সময় প্রথম চোখে পড়ল। যা দেখছে তা-ই দাম করছে। জাপানি একটা ডিনার সেট দাম করল। বাহান্ন পিসের সেট— দাম তের হাজার টাকা। সে গম্ভীর গলায় বলল, ফিক্সড্ প্রাইস ? ভাবটা এ-রকম যেন ফিক্সড্ প্রাইস না

হলে সে দরদাম করে কিনে ফেলবে। দোকানদাররা মানুষ চেনে। কে কি কিনবে বা কিনবে না তা চট করে ধরে ফেলে। সে জবাব পর্যন্ত দিল না। নোমান তাতে অপমানিত বোধ করল না বা রাগ করল না, পাশের দোকানে ফুলদানি দরদাম করতে লাগল। এক একটার দাম দু'হাজার টাকা। এমনভাবে দাম করছে যেন দু'হাজার টাকা দামের ফুলদানি কয়েকটা কিনবে।

সফিক সাহেবের বাড়িতে ঢোকার পর থেকে সে আমাকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে এত সুন্দর বাড়ি এই শহরে আর নেই। বাড়িতে কয়টা ঘর, কয়টা বাথরুম সমানে বলে যাচ্ছে। আমরা বসার ঘরে বসে আছি। ঝাড় বাতি টাতি দিয়ে এই ঘর এমন সাজানো যে এখানে বসে থাকতে ভাল লাগে না। মনে হয় সিনেমার একটা বাড়িতে বসে আছি। সফিক সাহেবকে খবর পাঠানো হয়েছে। তিনি এখনো নামছেন না। আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকেই দোতলার সিঁড়ি চলে গেছে। ভদ্রলোক এই সিঁড়ি ধরেই নামবেন। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি। এই সিঁড়িতে কোনদিন হয়ত এক কণা ধূলিও পড়ে থাকে না। আমি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছি।

'নবনী, বল তো এ বাড়ির বৈশিষ্ট্য কি?'

'ঢাকার শহরের সবচে' সুন্দর বাড়ি।'

'তা তো বটেই, এ ছাড়া কি?'

'বলতে পারছি না।'

'এ বাড়ির ছাদে কি আছে বল?'

'ফুলের বাগান?'

'বাগান তো আছেই। রোজ গার্ডেন। এ ছাড়া কি আছে বল তোমাকে আগে বলেছিলাম। বাসর রাতে। মনে নেই?'

'মনে করতে পারছি না।'

'সুইমিং পুল। বিশাল সুইমিং পুল। বাড়ির ছাদে সুইমিং পুল থাকে কখনো শুনেছ?'

'না।'

'সফিকের আছে। চাঁদনী রাতে যে কি সুন্দর দেখা যায়! পানিতে চাঁদের ছায়া পড়ে। তখন বাড়ির সব বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। মেজাজ ভাল থাকলে অহনা ভাবী গান গান। উনি খুব সুন্দর গান জানেন।'

'তাই না-কি?'

'হ্যাঁ উনি টিভির এ গ্রেডের শিল্পী। তবে টিভিতে খুব কম যান। গত মাসে প্রোগ্রাম পেয়েছিলেন যান নি।'

সফিক সাহেব দোতলা থেকে নামছেন না। আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। নোমানের তাতে অসুবিধা হচ্ছে না। সে বাড়ির গল্প করেই যাচ্ছে। আমার অস্বস্তি লাগছে। মনে হচ্ছে খানিকক্ষণ পর দোতলা থেকে একটা কাজের

www.BDeBooks.Com

লোক নেমে এসে বলবে, আজ উনার শরীরটা ভাল না, আরেকদিন আসুন। বুঝতে পারছি না আমরা কতক্ষণ বসে থাকব। নোমানের মনে হয় বসে থাকতে ভালই লাগছে।

'নবনী!'

'উঁ।'

'ছাদের উপর এই যে এত বড় সুইমিং পুল কিন্তু সফিক এখন পর্যন্ত পানিতে নেমে দেখে নি।'

'কেন ?'

'ও না-কি সুইমিং পুল বানিয়েছে পানি দেখার জন্যে। গোসলের জন্যে তার শাওয়ারই ভাল। অন্যের গোসল করা নোংরা পানিতে সে নামবে না। হা হা হা। ওর কথাবার্তার তুমি কোন ঠিক পাবে না। তবে ও যা বলবে মনে হবে সেটাই সত্যি।'

'উনাদের ছেলেমেয়ে কি ?'

'এখানো ছেলেমেয়ে হয় নি। মাত্র দু'বছর আগে বিয়ে করেছে। ভাবী হলেন খুলনার মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'এত সুন্দর বাড়ি কিন্তু সফিকের পছন্দ না। ও তার নিজের ডিজাইনে আরেকটা বাড়ি বানাবে। ডিজাইন না-কি করা শুরু করেছে।'

'উনি কি আর্কিটেক্ট ?'

'আরে না। পড়াশুনা করেছে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে, তবে সে ইচ্ছা করলে বাড়ি ডিজাইন আর্কিটেক্টের চেয়ে অনেক ভাল করবে। যে কোন আর্কিটেক্টের কান কেটে নিয়ে আসবে। ও পারে না এমন জিনিস নেই। এখন কি ঠিক করেছে জান ? ছবি বানাবে। মুভি ক্যামেরা, লাইট ফাইট কিনে এলাহি কারবার করেছে।'

'তাই বুঝি ?'

'মুভি ক্যামেরার দামই পড়েছে ১৪ লাখ টাকা। টাকা অবশ্যি তার কাছে কোন ব্যাপার না। ওর কাছে ১৪ লাখ যা ১৪ হাজারও তা।'

'উনি এখনো আসছেন না কেন ?'

'আসবে। কাজে আটকা পড়ে গেছে আর কি ? তোমার কি বসে থাকতে খারাপ লাগছে ?'

'হ্যাঁ লাগছে।'

'এসো তাহলে সফিকের লাইব্রেরিটা দেখ। লাইব্রেরি দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। দেখার মত জিনিস। হেন বই নাই যা তুমি লাইব্রেরিতে পাবে না। আস তোমাকে লাইব্রেরি দেখাই।'

'লাইব্রেরি দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছা করছে না কেন ?'

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় শরীর খারাপ করেছে।'

'মাথা ধরেছে ?'

'হুঁ।'

'জ্বর না-কি দেখি, কাছে আস তো।'

সে আমার জ্বর দেখল আর তখনি সফিক সাহেব দোতলা থেকে নেমে এলেন।

ফর্সা লম্বা একজন মানুষ। মাথাভরতি কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। তাঁর গায়ে নীল রঙের হাফ হাওয়াই শার্ট। পরনের প্যান্ট ধবধবে সাদা। ভদ্রলোক নামছেন হাসতে হাসতে। পায়ে চটি থাকার জন্যেই সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে ফট্‌ফট্‌ শব্দ হচ্ছে। চটিতে এত শব্দ হবার কথা না। তিনি বোধহয় ইচ্ছে করেই শব্দ করছেন। কিংবা কে জানে বড়লোকরা হয়ত এই ভাবেই নামে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদিনের পরিচিত ভঙ্গিতে বললেন, দাঁড়িয়ে পড়েছ যখন তখন আর বসার দরকার নেই— চল আমরা সরাসরি গাড়িতে উঠবো। আর শোন নবনী, তোমাকে আমি তুমি করে বলছি। নোমানকে তুই করে বলি, তার স্ত্রীকে আপনি করে বলা সেই কারণেই শোভন না। তবু তোমার আপত্তি থাকলে এক্ষুণি বলে ফেল। প্রথমেই ডিসিসান হয়ে যাক। আপনি না তুমি ?

'আপনি আমাকে তুমি করেই বলবেন।'

'আমার ইচ্ছা ছিল এ বাড়িতেই তোমাদের খাওয়াব। আমার স্ত্রী সেই উপলক্ষে রান্নাবান্নাও করেছে। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঝগড়া করে সে বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। কাজেই হোটেল ছাড়া গতি নেই। আমি যে নিচে নামতেই দেরি করেছি তার মূল কারণ অহনাকে টেলিফোনে ট্রেস করার চেষ্টা করছিলাম। ঢাকা শহরে তার একলক্ষ পরিচিত মানুষ। সে কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে।

নোমান বলল, ভাবী নেই! বলিস কি ?

'তুই দেখি আকাশ থেকে পড়লি! ও তো এরকম করেই।'

আমি বললাম, আজ না হয় বাদ থাকুক। আমরা অন্য একদিন আসব।

'অন্য একদিন যে অহনাকে পাওয়া যাবে তোমাকে কে বলল ? হোটেলে রিজার্ভেশন নেয়া আছে। চল যাই।'

ভদ্রলোক এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। অপরিচিত একজন মানুষ যখন এভাবে তাকিয়ে থাকেন তখন অস্বস্তি লাগে। কিন্তু উনি যে তাকিয়ে আছেন— তাতে অস্বস্তি লাগছে না। কেন লাগছে না, তাও আমি বুঝতে পারছি না। তিনি হঠাৎ বললেন, নবনী দাঁড়াও। তোমার একটা ছবি তুলে রাখি। এই মুহূর্তে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সৌন্দর্য কোন ধ্রুব ব্যাপার না। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আজ তোমাকে অপূর্ব লাগছে তার মানে এই না যে কালও লাগবে। সুন্দর যখন লাগছে তখন তা ধরে রাখা যাক। তুমি দাঁড়াও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। নোমান বলল ওর আচার-আচরণ আধা পাগলের মত। তুমি ওর কথায় অস্বস্তি বোধ করছ না তো ?

www.BDeBooks.Com

'না।'

'অস্বস্তি বোধ করবে না। সফিকের স্বভাবই এরকম। ওর মধ্যে লোকাছাপার কোন ব্যাপার নেই।'

এত বড় হোটেলে আমি আগে কখনো আসি নি। পুরোপুরি হকচকিয়ে যাবার মত ব্যাপার। অথচ নোমান খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছে। মনে হচ্ছে ও তার বন্ধুর সঙ্গে আগেও অনেকবার এসেছে। সফিক সাহেব হোটেলে পা দেবার পর থেকে আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না। তিনি তাঁর বন্ধুকেই নিচু গলায় ক্রমাগত কি-সব যেন বলছেন। সেও খুব চিন্তিত মুখে শুনছে। আমি যে তার সামনে আছি এটা বোধহয় সে আর জানে না।

ডাইনিং হলের ঠিক মাঝখানে চারজনের টেবিলে আমরা আছি। আমি এবং নোমান পাশাপাশি বসেছি। সফিক সাহেব বসেছেন আমাদের সামনে। তিনি নোমানের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে হঠাৎ আমাকে বললেন, চারজনের টেবিল কেন নিয়েছি জান নবনী ? চারজনের টেবিল নিয়েছি, কারণ হঠাৎ অহনা এসে উপস্থিত হতে পারে। তার রাগ যেমন চট করে উঠে আবার তেমনি চট করে পড়ে যায়। যদি এ রকম কোন ঘটনা ঘটে তাহলে সে খুঁজে পেতে বের করবে আমরা কোথায় আছি। তারপর হাসিমুখে উপস্থিত হবে। যেন কিছুই হয় নি। এ জন্যেই আমি খাবারের অর্ডার এখনো দিচ্ছি না। অপেক্ষা করছি। তোমার খিদে পায় নি তো ?

'জ্বি না।'

'গুড। খিদেটা জমুক। খিদে ভালমত না জমলে খেতে পারবে না। যে হোটেল যত জমকালো তার খাবার তত খারাপ। নোমান, তুই মৃণালদের বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখ তো। অহনা সেখানেও থাকতে পারে। আমি করেছিলাম, আমাকে 'নো' বলে দিয়েছে। তোকে বোধহয় বলবে না।'

ও উঠে চলে গেল। সফিক সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমার দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ করে বললেন, নবনী শোন! তোমার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হবার পর নোমান আমার কাছে এসেছিল... তোমার অতীত সম্পর্কে কি-সব কথা শুনে ওর মনে বোধহয় কনফিউশন তৈরি হয়েছিল। আমি তাকে বলেছি এসব কথাবার্তায় কান না দিতে। মফস্বল শহরে মোটামুটি যারা রূপবতী তাদের নিয়ে নানা গল্পগাঁথা তৈরি হয়। মেয়েগুলোর জীবন হয় অতিষ্ঠ। তুমিতো আর মোটামুটি রূপবতী না। ভয়ঙ্কর রূপবতী। তোমাকে নিয়ে একশ' একটা গল্প তৈরি হবার কথা। যাই হোক আমি নোমানকে বলে দিয়েছি ও যেন তোমার অতীত নিয়ে কখনোই প্রশ্ন না করে। ওকি কিছু জিজ্ঞেস করেছে ?

'না।'

'একবার যখন না বলে দিয়েছি তখন আর প্রশ্ন করবে না। আর যদি করেও তুমি কিচ্ছু বলবে না।'

'আমার বলার মত কিছু নেই।'

'থাকলেও বলবে না। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামীর সঙ্গে দ্রুত ভাব করার জন্যে গড় গড় করে অনেক কিছু বলে দেয়। পরে সমস্যা হয়। নোমান ভাল ছেলে। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। আমি চাই না— তুচ্ছ সব বিষয় নিয়ে...

সফিক সাহেব চুপ করে গেলেন, কারণ নোমান ফিরে আসছে। আমার বিরক্ত লাগছে। আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপারে উনি কথা বলছেন কেন? তাছাড়া আমার সঙ্গে আজই তাঁর প্রথম কথা হচ্ছে। প্রথম আলাপে এ জাতীয় প্রসঙ্গ তোলার কোন কারণ আছে কি?

সফিক সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন— পাওয়া গেছে?

'না।'

'কোথায় আছে কিছু বলল?'

নোমান মিটিমিটি হাসছে। কোন একটা আনন্দের খবর গোপন করতে গিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেভাবে হাসে সে রকম হাসি। সফিক ওর হাসি দেখেই বললেন, ও কি হোটেলের দিকেই রওনা হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'গুড। তাহলে খাবারের অর্ডার দেয়া যাক। আমি আমার পছন্দেই খাবার দিতে বলি। এদের সব খাবার মুখে দেয়া যায় না। দু'-একটা আইটেম শুধু এরা ভাল করে।'

সফিক সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আমি যে একটা ছবি বানাচ্ছি নোমান কি তোমাকে বলেছে?

'জ্বি বলেছে।'

'সেই ছবির নায়িকাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে। তবে নায়িকার গায়ের রং কালো। কালো রঙের নায়িকা বাংলাদেশে চলবে বলে মনে হয় না। এদেশের নায়িকাদের গায়ের রং হতে হয় দুধে আলতায় এবং ওজন হতে হয় তিন মণের বেশি।'

আমি লক্ষ্য করলাম সফিক সাহেব আনন্দে ঝলমল করছেন। স্ত্রী আসছে এই খবরে কারও মুখ এত আনন্দময় হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। ভদ্রলোককে এখন আমার ভাল লাগছে। অহনা নামের মেয়েটি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী। আমি ভদ্রমহিলার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

তিনি চলে এলেন দশ মিনিটের মাথায়। তাঁর গায়ের রঙ কালো। বেশ কালো। কিন্তু সেই কালো রঙেও একটা মানুষকে যে এত সুন্দর দেখা যায় আমি জানতাম না। হালকা কমলা রঙের সিল্ক শাড়ি পরেছেন। বেণী করা চুলের গোড়ায় ছোট ছোট নীল রঙের ফুল। নিশ্চয়ই প্লাস্টিকের ফুল। সত্যিকার ফুল নীল হয় না। তবে দেখাচ্ছে সত্যি ফুলের মতই। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুমটাও যেন হেসে উঠল।

www.BDeBooks.Com

সফিক সাহেব বললেন, তুমি যে আসবে আমি জানতাম। এই দেখ তোমার জন্যেই ডাইনিং রুমের মাঝখানে টেবিল নিয়েছি। নবনী শোন, এই কালো মেয়েটা কোণার দিকের টেবিলে বসতে পারে না। ও সব সময় বসবে মাঝখানে।

অহনা বললেন, অবশ্যই আমি মাঝখানে বসব। এমনভাবে বসব যেন সবাই তাকায় আমার দিকে। এই দেখ এক্ষুণি তাকানো শুরু করেছে।

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি। ওরা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছেন। আমরা দু'জন যে আছি সেদিকে ওঁদের খেয়াল নেই। সফিক সাহেব একবার বললেন, অহনা, নোমানের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল। ওর নাম নবনী। দেখ কি ভয়ঙ্কর সুন্দর! প্রায় তোমার কাছাকাছি।

'ভয়ঙ্কর বলছ কেন ? সুন্দর কি ভয়ঙ্কর হয় ?'

'মাঝে মাঝে হয়।'

অহনা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। হেসেই অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন— চিংড়ি মাছ খেলে কোলেস্টরেল বাড়ে না কমে এটা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অহনার ধারণা, কোলেস্টরেল কমে যায়। সফিক সাহেবের ধারণা তা না।

সফিক সাহেব বললেন, এত জিনিস থাকতে আমরা চিংড়ি মাছ নিয়ে আলোচনা করছি কেন ?

অহনা এতে খিলখিল করে হাসতে শুরু করলেন। যেন দারুণ মজার কথা। এদের সঙ্গে চুপচাপ বসে থাকতে আমার এত খারাপ লাগছে! নোমানের লাগছে না। ওরা যখন হাসছে নোমানও হাসছে। এরা যখন গভীর কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছে তখন সেও গম্ভীর মুখে কথা শুনছে। অহনা বললেন, নোমান, চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?

'আমার কোন ধারণা নেই ভাবী।'

'চিংড়ি মাছ খাওয়াটা কি মকরু না হালাল ?'

'তাও জানি না।'

'তুমি দেখি কিছুই জান না। আচ্ছা একটা কাজ কর। চট করে হোটেলের শপ থেকে আমার জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসো...মাথা ধরার টেবলেট। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মাথা ধরা না কমলে কিছু খেতে পারব না।'

ও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল। আমার ভাল লাগছে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই মহিলা খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে আমার অবস্থান অনেক নিচে। তাঁদের চাকর-বাকদের কাছাকাছি।

সফিক সাহেব কি বুঝতে পারছেন যে আমি নোমানকে এভাবে উঠিয়ে দেয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করি নি। কারণ তিনি কেমন যেন লজ্জিত ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি কোমল গলায় বললেন, নবনী!

'জ্বি।'

'চিংড়ি মাছ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? এটা খাওয়া কি হালাল, মকরু না নিষিদ্ধ।'

'সামুদ্রিক চিংড়ি যদি হয় তাহলে হালাল। আমার একজন স্যার ছিলেন এই সব ব্যাপার খুব ভাল জানতেন। তিনি বলেছেন কোরান শরীফের একটা আয়াত আছে তাতে বলা হয়েছে— 'সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল।'

'সমুদ্রেতো সাপও আছে। সেই সাপও কি হালাল ?'

আমি কিছু বললাম না। সফিক সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বিশেষ কিছু ধরার চেষ্টা করছেন। উনি কি আমার স্যারের ব্যাপারটা জানেন ? জানলে কতটুকু জানেন ?

অহনা আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, আপনাদের বিয়েতে আমাদের দু'জনেরই যাবার কথা ছিল। ও ব্যাংকক চলে যাওয়ায় যেতে পারি নি।

আমি কিছু বললাম না। অহনা বললেন, আমি ডিনারের সঙ্গে রেড ওয়াইন নেব। এবং ডিনারের শেষে একটা সিগারেট খাব। আশা করি কিছু মনে করবেন না।

'জ্বি না। কিছু মনে করব না।'

খাবার চলে এসেছে। কত পদের খাবার যে আসছে। আমার ভালই খিদে কিন্তু কিছুই খেতে ইচ্ছা করছে না। নোমান ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে। অহনা সেই ওষুধ টেবিলের এক কোণায় ফেলে রেখেছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে না এই ওষুধ তিনি খাবেন।

অহনা বললেন, চিংড়ি মাছ বিষয়ে আমি একটা কথা বলতে পারি। এই কথা শোনার পর নবনী আর চিংড়ি মাছ খাবে না বলে আমার ধারণা। কথাটা হল— চিংড়ি, কাঁকড়া এবং মাকড়শা এরা তিনজনই একই গোত্রের প্রাণী। এদের ডিম থাকে শরীরের বাইরে। চিংড়ি মাছ খাওয়া আর মাকড়সা খাওয়া একই ব্যাপার।

অহনার কথা শোনার পর আমি সতি সত্যি চিংড়ি মাছ খেতে পারলাম না। নোমান কয়েকবার সাধাসাধি করল। মুখ কাচুমাচু করে বলল, খাও না, খাও না। কত বড় বড় চিংড়ি। এগুলো তো আর মাকড়সা না।

অহনা কিছুই বললেন না। শুধু হাসলেন। সেই হাসি আমার ভাল লাগল না।

আমার খুব ক্লান্তি লাগছে। মনে হচ্ছে এই খাবার টেবিলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আমার এ রকম মাঝে মাঝে হয়। হঠাৎ নিজেকে অসহায় এবং খুব ক্লান্ত মনে হয়। আশেপাশে কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে কিছুই বুঝতে পারি না। কারোর কোন কথাবার্তাও তখন কানে আসে না। চারপাশের কোলাহলের শব্দ স্তিমিত হয়ে আসে। মনে হয় আমি একাকী দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। এইত আমার পাশেই নোমান বসে আছে। সে মাঝে মাঝেই হো হো করে হেসে উঠছে। গল্প শুনে হাসছে। হাসির গল্পগুলো যিনি বলছেন তাঁর নাম অহনা। কালো একটি মেয়ে। কালো হয়েও পৃথিবীর সব রূপ যিনি নিজের শরীরে নিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব ভাল গল্প করতে পারেন। কারণ গল্প শুনে শুধু যে নোমান হাসছে তা-না। সফিক সাহেব হাসছেন, অহনা নিজেও হাসছেন।

www.BDeBooks.Com

তাদের হাসির শব্দে আশেপাশের সবাই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। মজার মজার সব গল্প কিন্তু আমার কানে আসছে না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। সফিক সাহেব হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, নবনী তোমার কি শরীর খারাপ ?

আমি বললাম, না।

'তুমি কিছু খাচ্ছ না। খাবার ভাল লাগছে না ?'

'লাগছে।'

চামচ দিয়ে আমি খাবার নাড়াচাড়া করছি। চামচগুলো কি রূপার ? ঝকঝক করছে। সারাক্ষণই ভয় হচ্ছে এই বুঝি হাত থেকে চামচ পড়ে যাবে। রূপার চামচ মেঝেতে পড়লে কেমন শব্দ হয় ? রিনঝিন করে বাজে ?

সফিক সাহেবের গাড়ি আমাদের বাসায় নামিয়ে দিল। নোমান বাসায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, এরা কি রকম অসাধারণ মানুষ লক্ষ্য করলে ? অহঙ্কার বলে এক বস্তু স্বামী-স্ত্রী কারো মধ্যে নেই। ওয়াইন খেতে দেখলে তুমি অস্বস্তি বোধ কর, এই জন্যে অহনা ভাবী কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াইন নেয় নি। সিগারেটও খান নি। অহনা সিগারেট ছাড়া থাকতে পারে না। নবনী! নাও এই খামটা যত্ন করে তুলে রাখ।

আমি বললাম, কি আছে এই খামে ?

নোমান হতভম্ব গলায় বলল, কি আছে তুমি জান না।

'না।'

'কি আশ্চর্য। অহনা নিজের হাতে এই খাম আমাকে দিল। তোমার সামনেই তো দিল। আমাদের বিয়ে উপলক্ষে গিফ্‌ট ?

'আমি লক্ষ্য করি নি ?'

'লক্ষ্য করি নি মানে ?'

'অন্যমনস্ক ছিলাম।'

'সফিক তাহলে ঠিকই ধরেছিল— তোমার শরীর খারাপ।'

'কি আছে এই খামে ?'

'দশ হাজার টাকার একটা চেক আছে। ক্যাশ টাকা দিয়েছে আমরা নিজেরা যাতে নিজেদের পছন্দ মত কিছু কিনতে পারি। এই খাম নিয়ে কত কথাবার্তা হল— তুমি কিছুই শুননি ?'

'না।'

খাম হাতে নোমান বোকা বোকা মুখ করে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল। আমার এই আচরণ সে যেন মিলাতে পারছে না। এক সময় বলল, চল ঘুমুতে যাই।

আমি বললাম, তুমি ঘুমাও আমি একটু পরে যাব।

'তুমি কি করবে ?'

'নিজের হাতে চা বানিয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর ইরাকে একটা চিঠি লিখব। আসার পর ইরাকে কোন খবর দেয়া হয় নি। ও নিশ্চয়ই চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছে।

'চিঠি দিনের বেলা লিখলেই হয়।'

'দিনে আমি চিঠি লিখতে পারি না।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি চা খাবে ? বানাবো তোমার জন্যে ?'

'আমিতো চা একেবারেই খাই না। রাতে খেলে ঘুম হবে না।'

'প্রতি রাতে ঘুমুতে হবে। এমনতো কোন কথা নেই। চা খেয়ে তুমি জেগে থাক। আমি এর মধ্যে চিঠি শেষ করে ফেলি। তারপর দু'জন এক সঙ্গে ঘুমুতে যাব।'

'আচ্ছা।'

আমি চা বানাচ্ছি। ও বসে আছে বারান্দায়। তার মাথার উপর ময়নার খাঁচা। খাঁচাটা এখন আবার কালো কাপড়ে ঢাকা। ময়নার খাঁচা না-কি কালো কাপড় দিয়ে না ঢাকলে ময়না ঘুমুতে পারে না। নোমান মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে আমার দিকে। সম্ভবত আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছে।

ইরা,

এই কিছুক্ষণ আগে আমি আমার সংসার শুরু করেছি। কেরোসিনের চুলায় চা বানিয়েছি দু'জনের জন্যে। আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রান্না। চা তেমন ভাল হয় নি। ও কোত্থেকে যেন সস্তা ধরনের চায়ের পাতা এনেছে। অনেকক্ষণ জ্বাল দেবার পরেও রং আসেনি। পানসে ধরনের চা খেয়ে সে বলেছে— এত ভাল চা সে জীবনেও খায় নি। এখন থেকে সে না-কি রোজ রাতে বারান্দায় বসে চা খাবে।

এখনো সে বারান্দায় বসে আছে। বেচারার বোধহয় ইচ্ছা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমুতে যাবে। যেহেতু আমি চিঠি লিখতে বসেছি সে অপেক্ষা করছে বারান্দায়। একজন আদর্শ স্ত্রীর উচিত এই অবস্থায় চিঠি লেখা বন্ধ করে স্বামীর সঙ্গে ঘুমুতে যাওয়া। আমার মনে হয় আমি কোনদিনও আদর্শ স্ত্রী হতে পারব না— কারণ তোকে চিঠি লিখতেই আমার ভাল লাগছে। ও অপেক্ষা করুক। অপেক্ষায় আনন্দ আছে।

তাছাড়া আমার মনে হয় বারান্দায় বসে থাকতেও তার ভাল লাগছে। অন্তত বসে থাকার ভঙ্গি থেকে তাই মনে হয়। বসে থাকার মধ্যেও সুখী সুখী এবং দুখী দুখী ভঙ্গি আছে। ও বসে আছে সুখী সুখী ভঙ্গিতে।

আমি কেমন আছি এই দিয়ে শুরু করি। ভাল আছি। নিরিবিলিতে শান্তিতে আছি। আমাদের দুজনের ছোট্ট এক কামরার ঘর। দুটি মাত্র প্রাণী। ভুল বললাম, দুটি না তিনটি প্রাণী। একটা পোষা ময়না। ও বলছে ময়না না-কি রাজনীতিবিদদের মত ক্রমাগত কথা বলে। তবে আমি এখনো তার কোন কথা শুনি নি। ও আচ্ছা একবার শোনেছি। ময়নাটা পুরুষের মত গলায় বলেছে নবনী! ঠিক করেছি কাল ভোর থেকে সংসার গুছাব তবে সংসার

www.BDeBooks.Com

গুছানোরও কিছু নেই। সবই গোছানো। আমার কাজ হল এই গোছানো সংসারে নিজের জায়গা করে নেয়া। সেই জায়গা করে নিতে খুব অসুবিধা হয় নি। কোন মেয়েরই বোধহয় হয় না।

নোমান সম্পর্কে বলি (স্বামীর নাম ধরে লিখলাম বলে ভুড়ু কুঁচকাচ্ছিসনাতো ?) মানুষটা ভালই। ওর মধ্যে সরল সরল ব্যাপার আছে। জটিলতা তেমন নেই। নেই বলেই ভয়ে ভয়ে আছি। আমরা মানুষের জটিলতা দেখেই অভ্যস্ত। সারল্যকে আমরা ভয় করি। কারো ভেতর ঐ ব্যাপারটি দেখতে পেলে থমকে যাই এবং আমাদের মনের একটি অংশ বলতে থাকে— নিশ্চয়ই কোন একটা রহস্য আছে।

মানুষটার ভেতর রহস্য তেমন নেই। সাদাসিধা মানুষ। একটু বোধ হয় কৃপণ। প্রতিটি পয়সা হিসেব করে খরচ করে। চা খাব বলে চিনি কিনে এনেছে— ছোট্ট একটা পুটলায় এতটুকু চিনি। তার ময়না পাখিটার জন্যে কলা কিনে এনেছে। একটা কলার অর্ধেকটা কেটে খাইয়েছে বাকি অর্ধেক পলিথিনের ব্যাগে মোড়ে রেখে দিয়েছে। পরে খাওয়াবে।

আমি বাথরুমে গোসল করলাম। সাবানটা মেঝেতে ফেলে এসেছিলাম। পরের বার ঘরে ঢুকে দেখি সেই সাবান সে সোপকেসে তুলে রেখে বাথরুমের মেঝে ন্যাকরা দিয় মুছেছে। যাতে মেঝেটা শুকনো খটখট করে। আমাকে অবশ্যি কিছু বলে নি। পৃথিবীর সব স্বামীই বিয়ের পর পর স্ত্রীদের উপর তাদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার ফলাতে চেষ্টা করে। কেউ কেউ স্থূলভাবে করে কেউ সূক্ষ্মভাবে করে। যেমন ধর হঠাৎ বলবে—এক গ্লাস পানি দাওতো। অথচ হাতের কাছেই হয়ত পানির গ্লাস। এই মানুষটা এখন পর্যন্ত তা করছে না। মনে হয় করবে না। শুরুতে যে করে না সে পরেও করে না। মানুষের চরিত্রের সব দোষ গুণ চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরই ধরা পড়ার কথা।

ইরা, তোকে বসিয়ে রেখে আমি এখন বারান্দায় যাব। দেখে আসব মানুষটা কি করছে। এখনো জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া কলমটাও বদলাতে হবে। এই কলম দিয়ে ভাল লিখতে পারছি না। আরেকটা কলম দরকার। ঘরে আর কলম আছে কি-না জানি না। ওকে বলতে হবে। যদি দেখি ও ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে আজ আর চিঠি শেষ হবে না। তোকে যে কথা দিয়েছিলাম পৌঁছেই চিঠি দেব তা আর সম্ভব হবে না। দেরী হয়ে যাবে। কাল হয়ত আর চিঠি লিখতে ইচ্ছা করবে না।

মানুষটা জেগেই ছিল। আমাকে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলল, চিঠি লেখা কি শেষ ? আমার মায়াই লাগল, আহা বেচারা। কিন্তু মায়াকে প্রশ্রয় দিলাম না। নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম, ঘরে কি আর কলম আছে ? সে বলল, ড্রয়ারে আছে। দাঁড়াও আমি বের করে দি। দুটা কলম টেবিলের উপর রেখে মুগ্ধ

গলায় বলল, তোমার হাতের লেখা এত সুন্দর! তার বলার ভঙ্গিটি এমন যেন আমি আমার মস্তবড় কোন গুণ এতক্ষণ তার চোখের আড়াল করে রেখেছিলাম।

আমি বললাম, তোমার হাতের লেখা কি খুব খারাপ?

সে বলল, না। আমার হাতের লেখাও খুব সুন্দর। দাঁড়াও তোমাকে দেখাই বলেই এক টুকরা কাগজ নিয়ে লিখল— নবনী। নবনী!!

ইরা তোকে বললাম না, লোকটা সরল ধরনের। সরল না হলে কখনোই কাগজ নিয়ে তার হাতের লেখার পরীক্ষা দিতে বসতো না। বুদ্ধিমানরা এই কাজ কখনো করে না।

আমি বললাম, তোমার হাতের লেখা আমার চেয়েও সুন্দর। এখন এক কাজ কর বিছানায় শুয়ে থাক। আমার চিঠি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর মাত্র দশ পনেরো মিনিট। চিঠি শেষ করেই আমি চলে আসব। ও বাধ্য ছেলের মত ঘুমুতে গেল। আমি চিঠি নিয়ে বসলাম।

অনেক কিছুই তোকে লিখতে ইচ্ছা করছে। যেমন ধর আমরা যে আজ ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল তাঁর কথা। সেই ভদ্রলোকের নাম সফিক। তিনি ওর অফিসের প্রধান ব্যক্তি। অফিসটাই তাঁর। মানুষের কি পরিমাণ টাকা যে থাকতে পারে তা তাঁকে না দেখলে বোঝা যাবে না। ভদ্রলোক ওর ছেলেবেলার বন্ধু। এতে আমার আনন্দিত হওয়া উচিত কিন্তু আনন্দিত হতে পারছি না। আকাশের সঙ্গে পাতালের বন্ধুত্ব হয় না। হওয়া বোধহয় ঠিকও নয়। ভদ্রলোকের ব্যবহার চমৎকার, কথাবার্তা চমৎকার কিন্তু তবু আমার ভাল লাগল না। কেন লাগল না তাও বুঝতে পারছি না। ভদ্রলোকের স্ত্রীর নাম হল অহনা। আমি প্রথম ভেবেছিলাম— নাম গহনা। পরে শুনি অহনা। নামটা সুন্দর তাই না? এই ভদ্রমহিলার গায়ের রঙ কালো। কালো রঙ্গের মেয়ে যে এত রূপবতী হতে পারে কে জানত? ইনাদের সম্পর্কে তোকে আরো লিখব। আপাতত এইটুক।

তোদের কথা আমি কিছুই জানতে চাচ্ছি না। জানি তুই নিজ থেকেই সব লিখবি। কিছুই বাদ দিবি না।

তোকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার। স্যুটকেস খুলে দেখি লাইব্রেরি থাকে আনা উপন্যাসটা 'তিথির নীল তোয়ালে'। তুই স্যুটকেসে দিয়ে দিয়েছিস। বই পড়ার সময় পাচ্ছি না। কাহিনী কি তাও ভুলে গেছি। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। তোর চোখ কান এতটা খোলা তা বুঝতে পারি নি। তোর এত বুদ্ধি কেন?

ভাল থাকিস। ইতি তোর আপা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দু'টা দশ। ও বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। বারান্দায় দরজা খোলা। তাকে যতটা সাবধানী এবং গোছানো বলে মনে হচ্ছিল আসলে সে ততটা না। বারান্দার দরজা খোলা রেখে সে ঘুমাতো না।

www.BDeBooks.Com

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলো পড়েছে বারান্দায়। সরল ধরনের আলো। আমাদের বাড়ির ছাদে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে যেমন আলো আসত সে রকম জটিল নকশাদার আলো নয়। ও জেগে থাকলে তাকে নিয়ে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসা যেত। এমন চট করে ঘুমিয়ে পড়বে তা ভাবি নি। ওকে কি ডেকে তুলব ?

আমি এসে তার গায়ে হাত রাখলাম। সে পাথরের মত হয়ে আছে। ঘুমন্ত মানুষের গা স্পর্শ করলে সে একটু না একটু নড়ে উঠবেই। নোমান নড়ল না। সমান তালে তার নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। আমরা দু'জন পাশাপাশি হয়ে আছি। ওর গায়ের পুরুষ পুরুষ ঘামের গন্ধে আমি কি অভ্যস্ত হয়ে গেছি ? আজতো তেমন খারাপ লাগছে না। বরং ইচ্ছা করছে ওর গা ঘেঁসে ঘুমুতে। একটা হাত ওর শরীরে তুলে দিলে ওকি জেগে উঠবে ? না-কি ঘুমের ঘোরে সে হাত সরিয়ে দেবে ? দীর্ঘদিন ধরে সে নিশ্চয়ই একা একা ঘুমুচ্ছে। একা ঘুমিয়েই সে অভ্যস্ত। শরীরের উপর একটা বাড়তি হাতের চাপ কি সে সহ্য করবে ?

জানালা গলে চাঁদের আলো আমাদের হাঁটুর উপর এসে পড়েছে। শরীরের একটি অংশ আলোকিত হয়ে আছে। নোমান বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। দুঃস্বপ্ন দেখছে কি ? বারান্দায় কালো কাপড়ে ঢাকা ময়নাটাও ছটফট করছে। কে জানে হয়ত এরা দু'জন একই সঙ্গে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। পাখিদের স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন বলে কি কিছু আছে ?

আমি ওর গা থেকে হাত সরিয়ে নিজের মত শুয়ে পড়লাম। শাড়ির আঁচলে শরীর ঢেকে শোয়া। পাশ ফিরতেই খাট নড়ে উঠল। এই খাটের পায়াগুলো সমান না, বড় ছোট আছে। একটু নড়লেই খট খট শব্দ হয়। আমি একটা হাত ওর গায়ে রাখলাম ও ধড়মড় করে উঠে বসে ভয়ার্ত গলায় বলল, কে ?

আমি বললাম, কেউ না। তুমি ঘুমাও।

সে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। আবার তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। সে যে উঠে বসে, কে বলে চেঁচিয়েছে তা ঘুমের মধ্যেই করেছে। ঘুমন্ত মানুষের আচার-আচরণ আমার মত ভাল কেউ জানে না। রাতের পর রাত আমি অঘুমো কাটিয়েছি। আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়েছে ইরা। আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি— ঘুমন্ত মানুষ কি করে। ঘুমন্ত মানুষের আচার আরণের ব্যাপারে আমাকে একজন এক্সপার্ট বলা যেতে পারে।

আজো ঘুম আসছে না। প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে ওকে ডেকে তুলে বলি—এই শোন আমার ঘুম আসছে না। আমার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ আছে। আমার রাতে ঘুম হয় না। একা একা জেগে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি এসে আমার সঙ্গে বারান্দায় খানিকক্ষণ বস। আমার জীবনের ভয়াবহ একটা গল্প আছে। গল্পটা এখনো তোমাকে বলা হয় নি— আজ খানিকটা বলব।

চাঁদের আলো ওর হাঁটুর উপর থেকে সরে গেছে। এখন আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। যেন টর্চ ফেলে ফেলে কেউ বিছানাটা পরীক্ষা করছে।

আমি উঠে বসলাম। খাটটা আবার ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠল। ও বলল, কে ? আমি এবার কোন জবাব দিলাম না। ও আবারো গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ল। খাঁচার ময়না পাখি খচ খচ শব্দ করছে—

আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের স্যারেরও একটা পাখি ছিল। তিনি একটা কাক পুষেছিলেন। তাঁর কোন খাঁচা ছিল না। কাকটা এসে প্রায় সারাদিনই রেলিং-এ বসে থাকত। কাকটার বোধহয় বয়স হয়ে গিয়েছিল। খাবার খুঁজে বেড়াবার সামর্থ্য ছিল না। কিংবা কে জানে হয়ত স্যারকে তার পছন্দ হয়েছিল।

স্যার যখন আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন তখন ব্যাপারটা আমার তেমন পছন্দ হয় নি। মৌলানা টাইপের একজন লোক বাসায় থাকবে। নানা ধরনের উপদেশ দেবে। কি দরকার ? বাড়ি ভাড়া দিয়ে আমাদের যে টাকা পেতে হবে এমনও না। কিন্তু বাবার তাঁকে খুব পছন্দ হয়ে গেল। তিনি দরাজ গলায় বললেন, সুফি টাইপের একজন মানুষ থাকছে। থাক না। অসুবিধা কি ? পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। আল্লাহ্ বিল্লাহ্ করবে। এই বাড়ি থেকেতো আল্লাহ্ খোদার নাম উঠেই গেছে।

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, বাইরের একজন মানুষ!

বাবা বিরক্ত গলায় বললেন, সেতো আর তোমার বিছানায় এসে শুয়ে থাকবে না। সে থাকবে তার মত। উত্তরের দরজাটা পার্মানেন্ট বন্ধ করে দিলেই সে আলাদা হয়ে যাবে। নিজের মত থাকবে। নিজে রান্না করে খাবে।

উত্তরের দরজা আমরা ভেতর থেকে বন্ধ করে স্যারকে থাকতে দিলাম। তিনি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে একদিন দুপুর বেলা দু'টা রিকশা করে উপস্থিত।

প্রথম কিছুদিন আমি শঙ্কিত ছিলাম— হয়ত যখন স্যারকে দেখা যাবে আমাদের বসার ঘরে বসে আছেন। হয়ত ছাদে গিয়েছি দেখব জায়নামাজ হাতে তিনিও ছাদে উঠে এসেছেন নামায পড়ার জন্যে। কিংবা কলেজে দেখা হলে তিনি পরিচিত ভঙ্গিতে বলবেন, এই যে নবনী খবর কি ? আর ক্লাসের সব ছাত্রী আমাকে ক্ষেপাবে।

বাস্তবে তার কিছুই হল না। স্যার কলেজে যান। কলেজ থেকে ফিরে বাসায় আসেন। আর তার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। আমাদের বাড়ির একটা অংশে যে একজন মানুষ বাস করে তা মনেই হয় না। শুধু ছাদ থেকে আমি মাঝে মাঝে দেখি তিনি বারান্দায় রান্না চড়িয়েছেন। একদিন তাঁর পোষা কাকটাকে দেখলাম। শুরুতে কাকটা রেলিং-এ বসেছিল। তারপর রেলিং থেকে নেমে গম্ভীর ভঙ্গিতে হেঁটে স্যারের পাশে বসে থাকল। ভাবটা এ রকম যেন সেও রান্নাবান্না তদারক করছে। এরকম মজার দৃশ্য আমি আমার জীবনে আর দেখি নি।

আমি যখনই ছাদে উঠতাম কিছুটা সময় কাটাতাম কাকটাকে দেখার জন্যে। কি করে সে এ বাড়ির একজন সদস্যের মত চলাফেরা করে। গম্ভীর তার ভাবভঙ্গি।

www.BDeBooks.Com

একদিন ছাদে গিয়ে যথারীতি উঁকি দিয়েছি— দেখি বাঁশের চাটাই দিয়ে বারান্দার অংশটা ঢাকা। ছাদ থেকে বারান্দা দেখার কোনই উপায় নেই। আমার খুব মেজাজ খারাপ হল। কাণ্ডটা নিশ্চয়ই স্যার করেছেন। যাতে বারান্দা থেকে তাঁকে একজন তরুণী মেয়ের মুখ দেখতে না হয়। ধর্মে বাধা নিষেধ আছে। আমার কাছে মনে হল তিনি ইচ্ছা করে আমাকে অপমান করলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মা তালের পিঠা করেছেন। ইরাকে বললেন, মাস্টার সাহেবকে কয়েকটা পিঠা দিয়ে আয়তো ইরা। বেচারা একা একা থাকে। কি খায় না খায় কে জানে? ইরা বলল, আমি পারব না। আপাকে পিঠা নিয়ে যেতে বল। ওর কলেজের স্যার। ওরই নিয়ে যাওয়া উচিত।

আমি আপত্তি করলাম না। স্যারকে কিছু কঠিন কথা শুনাতে ইচ্ছা করছিল। পিঠা দিতে গিয়ে সেই কথাগুলো শুনিয়ে আসা যাবে।

স্যার আমাকে দেখে এতই অবাক হলেন যে বলার কথা নয়। যেন এ রকম অস্বাভাবিক ঘটনা এর আগে তাঁর জীবনে কখনো ঘটে নি। আমি বললাম, স্যার মা আপনার জন্যে কিছু তালের পিঠা পাঠিয়েছেন।

তিনি হড়বড় করে বললেন, শুকরিয়া। শুকরিয়া। তোমার মা'কে হাজার শুকরিয়া।

স্যার আমাকে বসতে বলছেন না। আমি যে কথাগুলো বলব বলে ভেবে এসেছি সেগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে চলে যাওয়া যায় না। আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসতে হবে। আমি বললাম, স্যার আমি কি কিছুক্ষণের জন্যে আপনার এখানে বসতে পারি?

'অবশ্যই পার। বোস। বোস।'

তিনি অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেই ছুটে গিয়ে বারান্দা থেকে চেয়ার নিয়ে এলেন। আমি বসলাম না। কঠিন গলায় বললাম, স্যার বসতে ভয় লাগছে। আমারতো বোরকা পরা নেই। এইভাবে আপনার সামনে আসাই হয়ত ঠিক হয় নি। মা পিঠা দিয়ে যেতে বললেন বলেই এসেছি। নয়ত আসতাম না। আপনাকে বিব্রত করার আমার কোন ইচ্ছা নেই।

'আমি বিব্রত হচ্ছি না।'

'অবশ্যই হচ্ছেন। বিব্রত না হলে বারান্দায় চাটাইয়ের বেড়া দিতেন না। এই কাণ্ডটা করেছেন কারণ চাটাইয়ের বেড়াটা না দিলে বোরকা নেই এমন একটা মেয়েকে মাঝে মাঝে আপনার দেখতে হয়। বিরাট একটা পাপ হয়। এত বড় পাপের শাস্তি হল দোজখ। আমাকে দেখার কারণে আপনি দোজখে যাবেন তা-কি হয়? দোজখে সুন্দর সুন্দর পরী অপেক্ষা করছে।'

আমি এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করলাম। কঠিন কিছু কথা বলার ছিল বলতে পারলাম না, কারণ আমি দেখলাম তিনি খুবই দুঃখিত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি বললাম, স্যার যাই।

তিনি বললেন, একটু বোস। এক মিনিট। আমার উপর এরকম রাগ করে চলে গেলে আমার খারাপ লাগবে। একটু বসে যাও।

আমি বসলাম।

তিনি বললেন— চাটাইয়ের বেড়াটা আমি আমার জন্যে দেই নি। তোমার জন্যে দিয়েছি। আমার মনে হয়েছিল— তোমার একা একা ছাদে হাঁটার অভ্যাস— আমার জন্যে স্বাধীনভাবে তা করতে পারছ না। তোমাকে এই সমস্যা থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই এটা করেছি। তুমি যে এমন রেগে যাবে বুঝতে পারি নি। তোমর রাগ কি একটু কমেছে ?

আমি কিছু বললাম না। তিনি যেন নিজের মনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন— বোরকা নিয়ে তোমার মনে বড় ধরনের ক্ষোভ আছে বলে মনে হয়। এরকম থাকা উচিত না। আমাদের প্রফেটের সময়ের যুগটা ছিল আলমে জাহিলিয়াতে যুগ। মানুষের প্রবৃত্তি ছিল পশুদের কাছাকাছি। মেয়েরা রাস্তায় বের হলে মানুষেরা নানাভাবে তাদের উত্যক্ত করত। মেয়েরাও যে ছেলেদের চেয়ে আলাদা ছিল তা না। তারাও এতে মজা পেত। তারাও চাইতো যেন পুরুষরা তাদের উত্যক্ত করে, তাদেরকে দেখে অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করে। কারণ যুগটাই হচ্ছে পশুত্বের যুগ। কাজেই আমাদের নবী এমন একটা ব্যবস্থা করলেন যাতে সবাই বুঝতে পারে— মুসলমান মেয়েরা অন্যদের মত না। তারা পবিত্র। তারা আলাদা। তাদেরকে নিয়ে এসব করা যাবে না। তারা তা চায়ও না। কাজেই নবী আদেশ দিলেন মেয়েরা যেন চাদরে তাদের শরীর ঢেকে নিজেদের অন্যদের চেয়ে আলাদা করে ফেলে। চাদরে ঢাকা একটা মেয়ে দেখলে সবাই যেন বোঝে এই মেয়ে আর দশটা মেয়ের মত না। এর সঙ্গে ভদ্র আচরণ করতে হবে। তুমি কি বুঝতে পারছ নবনী ?

আমি কিছু বললাম না। স্যার বললেন, বেহেশতে পরী পাওয়া সম্পর্কে তুমি যা বললে সেটা নিয়েও কথা আছে। তুমি যেমন স্থূলভাবে বললে তা কিন্তু না। পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলব।

'আমাকে বুঝিয়ে বলার কোন দরকার নেই। আপনি বুঝলেই হল।'

আমি দাঁড়ালাম। স্যার হেসে ফেললেন। এত সুন্দর করে আমি বোধহয় কাউকে হাসতে দেখি নি। আমার সারা শরীর ঝনঝন করে উঠল। ঘণ্টা বেজে উঠার মত শব্দ। এই ঘণ্টা সর্বনাশের ঘণ্টা। আমি প্রায় ছুটে চলে এলাম। মেয়েরা ঠিক কিভাবে ছেলেদের প্রেমে পড়ে ? একজনের প্রতি অন্যজনের তীব্র আকর্ষণটা কিভাবে তৈরি হয়। গল্প উপন্যাসের ব্যাপার আর বাস্তবের ব্যাপার কি এক রকম না আলাদা ? প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা তার ভালবাসও কি আলাদা ?

একজন আরেকজনকে দেখেই পাগলের মত হয়ে গেল এমনকি সত্যি কখনো হয়েছে ? না-কি এগুলি শুধু কথার কথা ?

আমার কি হয়েছে ? আমি কি এই মানুষটির প্রেমে পড়ে গেছি ? প্রেমের মত কি আছে এই মানুষটার ? মানুষটি যদি বিবাহিত হত, তাঁর কয়েকটা ছেলেমেয়ে থাকতো তাহলেও কি আমি ঠিক এইভাবেই আকর্ষিত হতাম।

www.BDeBooks.Com

সারারাত আমার ঘুম হল না। জীবনে এই প্রথম আমার ঘুমহীন রাত্রি যাপন। কি যে এক ভয়ঙ্কর কষ্ট। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি আর ভাবছি ভোর হচ্ছে না কেন ? ভোর হোক। মনে হচ্ছে ভোর হলে আমার কষ্টটা কমবে।

সূর্য উঠার আগে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখি মা ফজরের নামাযের জন্যে অজু করছেন। আমাকে দেখে বললেন, কিরে আজ এত সকালে ঘুম ভাঙলো যে।

'একবার ভোরবেলা উঠে দেখলাম কেমন লাগে।'

'রোজ ভোরে উঠে ছাদে ঘোরাঘুরি করবি দেখবি শরীরটা কেমন ভাল লাগে।'

'তুমি তাই কর না-কি মা ?'

'হুঁ। তোরা ছাদে যাস সন্ধ্যাবেলায় আমি যাই ভোরবেলায়।'

মা আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসছেন। আমি ছাদে চলে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় মনে হতে লাগল আচ্ছা ছাদে উঠে যদি দেখি স্যার ছাদে হাঁটাহাঁটি করছেন। তাহলে কি হবে ? ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। খুবই স্বাভাবিক। উনি নিশ্চয়ই নামায পড়ার জন্যে ভোরবেলায় উঠেছেন। একবার উঠলে ছাদে কি আর যাবেন না। এত সুন্দর একটা ছাদ।

ছাদে কাউকে পেলাম না। আশাভঙ্গের তীব্র কষ্টে প্রায় কান্না পাওয়ার মত হয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল— এক্ষুণি ছুটে গিয়ে উনার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি— স্যার আমাদের ছাদটা খুব সুন্দর। আসুন আপনাকে দেখাই। এখন থেকে রোজ ভোরবেলা ছাদে বেড়াতে আসবেন। এতে আপনার শরীর খুব ভাল থাকবে।

সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। উনি কি আসছেন ছাদে ? অবশ্যই আসছেন। উনি ছাড়া আর কে হবে ? আমি আমার শাড়িটার দিকে তাকালাম। বেছে বেছে আজকের দিনে আমি এমন একটা বাজে শাড়ি পরেছি। আচ্ছা আমার চোখে ময়লা জমে নেইতো ? আমার বুক ধ্বক ধ্বক করছে। কি বলব আমি স্যারকে ?

না স্যার না। মা এসেছেন। মা'র হাতে দু'কাপ চা। আমার জন্যে চা এনেছেন। এত ভাল আমার মা কিন্তু সেদিন ভোরবেলায় মা'কে দেখে মনটা ভেঙে গেল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল, তুমি এসেছ কেন মা ? কেন তুমি এসেছ ? কে তোমাকে আসতে বলেছ ?...

চাঁদের আলো খাট থেকে নেমে গেছে। নোমানের ঘুম ভেঙে গেছে। সে উঠে বসতে বসতে অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে ?

আমি বললাম, কিছু হয় নি ?

'ঘুমুচ্ছ না ?'

'না আমার ঘুম আসছে না।'

'শরীর খারাপ করেছে না-কি ? জ্বর ?'

সে হাত বাড়িয়ে আমার কপাল স্পর্শ করল। আহ্ তার হাতটা কি ঠাণ্ডা।

৫

অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে।

আমাদের বাসায় কলিংবেল নেই। কেউ এলে কড়া নাড়ে। বিশ্রী খটাং খটাং শব্দ হয়। আমি বাথরুমে গায়ে পানি ঢালছি আর কড়া নাড়ার শব্দ শুনছি। কে এসেছে ভর দুপুরে ? আমি কি করব ? ভেজা গায়ে দরজা খুলব ? কে হতে পারে ?

তাড়াতাড়ি গায়ে কোনমতে একটা শাড়ি জড়িয়ে দরজা খুলে দেখি বড়মামা। বড়মামার পেছনে ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক হাতে নয় দশ বছর বয়েসী একটা মেয়ে। আমি চেঁচিয়ে বললাম, বড়মামা আপনি ?

'কেমন আছিস মা ?'

'ভাল।'

'সাথে এটা কে ?'

'তোর জন্যে কাজের মেয়ে নিয়ে এসেছি। তুই ইরার কাছে চিঠি লিখেছিস। চিঠি পড়ে বুঝলাম ঘরে কাজের লোক নেই। তাই নিয়ে এসেছি। এর নাম মদিনা। তুই কাপড় বদলে আয় ভেজা গায়ে ঠাণ্ডা লাগাবি। জামাই কোথায় ?'

'ও ঢাকার বাইরে আছে।'

'তুই একা ?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যা কাপড় বদলে আয়। পরে কথা বলব।'

বড়মামা বেশিক্ষণ থাকলেন না। দুপুরে কিছু খেলেনও না। রোজা রেখে এসেছেন। সন্ধ্যাবেলা ইফতার করবেন। অফিসের কাজ নিয়ে এসেছেন। এখন কাজ সারতে যাবেন। রাতে আমার সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে উঠবেন।

'চিঠি লেখার থাকলে লিখে রাখিস। হাতে হাতে নিয়ে যাব। জামাই ক'দিন ধরে বাইরে ?'

'চার দিন।'

'আসবে কবে ?'

'ঠিক নেই মামা। সপ্তাহ খানিক লাগবে বলেছিল ছবির কি একটা কাজ করছে।'

'একা ফেলে চলে গেল। এটা ঠিক হয় নাই। আমাকে খবর দিলে তোকে এসে নিয়ে যেতাম।'

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না মামা। রাতে দারোয়ানের বউটা এসে বারান্দায় শুয়ে থাকে।'

মামা কৌতূহলী চোখে আমার সংসার দেখছেন। খাটের নিচটাও এক ফাঁকে দেখলেন। চেয়ারে বসেছিলেন, চেয়ার ছেড়ে খাটে বসলেন। খাটটা নড়ে উঠল। ব্যাপারটা বোধহয় পছন্দ হল না। তিনি নিঃশ্বাস ফেললেন।

'এখানকার খবরাখবর সব ভালতো ?'

'জ্বি ভাল।'

www.BDeBooks.Com

'জামাইয়ের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

'কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ও আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।'

'ওরা আসে না ?'

'জ্বি না।'

'তোর আগের ব্যাপার ট্যাপার কিছু জানতে চায় নি তো ?'

'জ্বি-না।'

'নিজ থেকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'বাবার শরীর কেমন আছে মামা ?'

'কিছু বুঝতে পারছি না। কখনো বলে ভাল। কখনো বলে মন্দ।'

'ইরার খবর কি ?'

'ভাল। ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। জামাই মংলা পোর্টের ইনজিনিয়ার। দেখে গেছে। পছন্দ হয়েছে বলেইতো মনে হয়। দেখি আল্লাহ্ আল্লাহ্ করছি। বিয়ে শাদীর ব্যাপার কলমা না পড়ানো পর্যন্ত কিচ্ছু বলা যাবে না। তোর বাসাটা বড় থাকলে তোর এখানে এনে রাখতাম। বিয়ের কোন আলাপ-আলোচনায় নেত্রকোনা হওয়া উচিত না। ফট করে কেউ কান ভাঙানি দিবে। তোর বাসাওতো ছোট।'

'জ্বি।'

'জামাই কি বলে ? বড় বাসা নেবে না। এইখানেই থাকবে ?'

'এই নিয়ে কথা হয় নি মামা।'

'তুই কিছু বলতে যাবি না। চাপ দেয়া ঠিক না। শুরুতে একটু কষ্ট করাই ভাল। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না। সংসারে ভালবাসা থাকলে আর কিছু লাগে না। চাঁদের আলো ঢোকে ভাঙা ঘরে।'

'পাকা দালানের জানালা খুলে দিলেও আলো ঢোকে মামা।'

'তার জন্যে জানালা খুলতে হয় রে বড় খুকী। কয়জন আর জানালা খুলে ? কেউ খুলে না।'

বড়মামা শুধু যে মদিনাকে নিয়ে এসেছেন তাই না। কয়েক ধরনের আচার এনেছেন। আমের আচার, তেঁতুলের আচার, চালতার আচার। একটিন মুড়ি এনেছেন। হরলিক্সের কৌটায় এক কৌটা গাওয়া ঘি। একটা প্যাকেট খুলে দেখি ঘরে পরার দুটা শাড়ি। একটা গামছা।

'বড় খুকী!'

'জ্বি মামা।'

'জামাইয়ের জন্যে স্যুটের কাপড় কিনে দেব বলে ঠিক করেছিলাম। ওকে সাথে নিয়েই কেনার ইচ্ছা ছিল। স্যুট কিনে দোকানে দিয়ে দরজির খরচটাও দিয়ে দেয়া। নয়ত খাজনার থেকে বাজনা বড় হয়ে যায়। এখন কি করি বলতো।'

'স্যুটের কাপড় লাগবে না মামা। ও স্যুট পরে না। ছোট চাকরি করে। এই চাকরিতে স্যুট পরলে লোকে হাসবে।'

'ওর ছোট চাকরির জন্যে মন খারাপ করিস না মা।'

'এম্নি বললাম আমার মন খারাপ না।'

'আলহামদুলিল্লাহ্ শুনে ভাল লাগল। আচ্ছা পরের বার যখন আসব তখন বানিয়ে দিয়ে যাব।'

'মামা আপনার শরীর কেমন ?'

'আছে ভালই আছে। মাথা ব্যথাটা হয়। টিউমার হয়েছে কি-না কে জানে। আমাদের এখানে একজন ডাক্তার আছেন ওয়াদুদ সাহেব— বন্ধু মানুষ। তিনি বলছিলেন টিউমারের টেস্ট ফেস্ট করাতে। কাগজে কি সব লিখেও দিয়েছেন।'

'করাবেন না ?'

'করাব। পরের বার করাব। ও আচ্ছা ভুলে গেছি— ছোট খুকীর চিঠিটা নে। জবাব লিখে রাখিস। বার বার বলে দিয়েছে জবাব নিয়ে যেতে। জবাব ছাড়া গেলে খুব রাগ করবে। আর মদিনাকে কিছু খেতে দে। ওর বোধহয় ক্ষিধে পেয়েছে। এদের কিন্তু পেটের আন্দাজ নেই। যা দিবি তাই খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধাবে। হিসেব করে দিস। আমি এখন উঠি রে মা...

মদিনাকে খেতে দিয়ে আমি ইরার চিঠি নিয়ে বসলাম। ইরা লিখেছে—

আপা,

তোমার চিঠি লিখতে এত দেরী হল কেন ? তোমার এত কি কাজ ? তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি নিজে প্রতিদিন একবার পোস্টাপিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি— চিঠি এসেছে কি-না।

এর মধ্যে এমন এক কাণ্ড হল— বাবা গভীর রাতে চেঁচামেচি শুরু করলেন— নবনী এসেছে। নবনী এসেছে। সে কি হৈ চৈ। আমরা দরজা খুললাম। কেউ নেই। আসলে বাবা স্বপ্ন-টপ্ন দেখে এই কাণ্ড করেছেন।

বাবার শরীর আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। হলে কি হবে চিকিৎসা করাবেন না। এখন কোন ওষুধ খাচ্ছেন না। একজন জ্বীন সাধকের খোঁজ পাওয়া গেছে। তার কাছ থেকে ওষুধ নিচ্ছেন। সেই ওষুধ না-কি জ্বীনরা এনে দিচ্ছে কোহকাফ নগর থেকে। গাছের কি সব শিকড় বাকড়। মা সেসব হামানদিস্তায় পিষে পিষে দিচ্ছেন। আমি খানিকটা চোখে দেখেছি— বিশ্রী দুর্গন্ধ। খানিকটা মুখে দিলে মুখ আঠা আঠা হয়ে থাকে।

ভাল কথা— মা স্বপ্নে দেখেছেন তোমার ছেলে হয়েছে। ছেলের নামও স্বপ্নে দেখেছেন। ছেলের নাম জুলহাস। আমি মা'কে বললাম— ছেলে হওয়া স্বপ্নে দেখেছ ভাল কথা। ছেলের নাম কিভাবে স্বপ্নে দেখলে ? আর দেখলেই যখন একটু ভাল নাম দেখতে পারলে না ?

অন্তু ভাইয়ারও খবর আছে। সে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছে।

লোকজন বল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পায়। ভাইয়ার সবই উল্টা সে চোট পেয়েছে মাথায়। তোমার ঘরটা এখন ভাইয়ার দখলে। এত সুন্দর ঘরটা সে

www.BDeBooks.Com

যে কি করেছে তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। তার উপর একদিন তার ঘরে ঢুকে দেখি— না থাক এখন বলব না। খুবই মজার ব্যাপার মুখোমুখি বলতে হবে।

আপা তুমি কবে আসছে? আমি দুলাভাইকে তার অফিসের ঠিকানায় খুব করুণ একটা চিঠি লিখেছি। এত করুণ যে চিঠি পড়ার পরপরই অন্তত কিছুদিনের জন্যে দুলাভাই তোমাকে আমাদের এখানে রেখে যাবেন।

আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে তা নিশ্চয়ই এর মধ্যে বড় মামা তোমাকে বলেছেন। ছেলে নিজেই আমাকে দেখতে এসেছে। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল—রবীন্দ্রনাথ কবে নবেল পুরস্কার পান বলতে পারেন?

আমার এমন রাগ লাগছিল যে ইচ্ছা করল বলি— রবীন্দ্রনাথ কে? নাম শুনিনিতো? এরকম বলতে পারি নি। শুধু বলেছি কবে নবেল পুরস্কার পেয়েছেন জানি না।

আপা তুমি কি জান? আমার মনে হয় এখন আমার একটা সাধারণ জ্ঞানের বই দরকার। নয়ত কখন কি প্রশ্ন করবে— জবাব দিতে পারব না। বিয়ে আটকে যাবে।

তবে জবাব দিতে না পারলেও ঐ লোক আমাকে পছন্দ করেছে। সেটা আমি ঐ লোকের ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকা থেকেই বুঝেছি। বড় কোন সমস্যা না হলে এই শীতে বিয়ে হয়ে যাবে।

আপা কিছু ভাল লাগছে না। তুমি আস।

মামা বিকেলে একটা ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে জ্বর। বেশ জ্বর। ইফতার কিছু খেতে পারলেন না। আমি বললাম, চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকুন। কাল যাবেন। মামা রাজি হলেন না। রাজি হবেন না জানতাম। তাঁকে ফেরানো মুশকিল। নিজে যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। অন্যের কোন কথাই শুনবেন না।

'বড় খুকী!'

'জ্বি মামা।'

ছোট খুকীর বিয়েটা মনে হয় হয়েই যাবে। ওরা মুখে অবশ্যি কিছু বলে নাই। ছোট খুকীকে কি সব প্রশ্ন ট্রশ্ন করেছে উত্তর দিতে পারে নাই। তারপরেও মনে হয় পছন্দ হয়েছে বিয়েটা হয়ে গেলে দায়িত্ব শেষ হয়। একটু দোয়া করিস মা।'

'দোয়ায় কি কাজ হয় মামা?'

'অবশ্যই হয়। হবে না কেন?'

'আপনাকে লেবুর সরবত বানিয়ে দেব?'

'দে। লেবুর সরবত বলকারক। ঘরে কি লেবু আছে?'

'আছে।'

আমি লেবুর সরবত বানিয়ে এনে দেখি দরজায় হাতুড়ি পেটার শব্দ হচ্ছে। বড়মামা ঘরে ঢোকার মূল দরজায় হাতুড়ি দিয়ে কি যেন করছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি করছেন মামা ?

'ছিটকিনি লাগাচ্ছি। ডাবল প্রটেকশান থাকা দরকার। আগের ছিটকানিটা দুর্বল।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম মামা হাতুড়ি, ছিটকিনি সব কিনে এনেছেন। একটা স্ক্রু ড্রাইভারও আছে। কি আশ্চর্য মানুষ।

'হাতুড়ি টাতুড়ি সব কিনে নিয়ে এসেছেন ?'

'হুঁ। কাজ ফেলে রাখলেতো হয় নারে মা। যখনকার কাজ তখন করতে হয়।'

মামা ছিটকিনি ফিট করে খাটটা ঠিক করলেন। খাটের পায়ার নিচে কাগজ দিয়ে পাগুলি সমান করলেন। লেবুর সরবত খেলেন। মদিনাকে দশটা টাকা দিয়ে নানান উপদেশ দিলেন। বিড়বিড় করে দোয়া পড়ে আমার মাথায় ফুঁ দিয়ে বললেন, এবার তাহলে যেতে হয় রে বড় খুকী। একটা চিঠি আন। জামাইকে দু' লাইনের চিঠি লিখে যাই।

দু' লাইনের চিঠি লিখতে মামার অনেক সময় লাগল। টপ টপ করে মাথা থেকে ঘাম ঝড়ছে। পানি চেয়ে পানি খেলেন।

'আপনার শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে মামা ?'

'না। ঘাম হচ্ছে জ্বর ছেড়ে দিচ্ছে বলে মনে হয়।'

চিঠি শেষ করে মামা উঠে দাঁড়ালেন। দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়ার পর্ব আবার হল। আমি বললাম, মামা আমার ধারণা আপনার শরীর বেশি খারাপ আপনি রাতটা থেকে যান।

'না রে বেটি না। জামাই এলেই চিঠিটা দিবি।'

'আমি কি পড়তে পারব মামা।'

'অবশ্যই পারবি। না পারার কি আছে ?'

ঘর থেকে বের হবার ঠিক আগে মামা বাথরুমে ঢুকে বমি করলেন। আমি মাথা মুছিয়ে দিলাম। মামা বললেন, বমি হয়ে যাওয়ায় ভাল হয়েছে। শরীরটা ফ্রেশ লাগছে। তুই আমাকে নিয়ে শুধু শুধু চিন্তা করিস না।

'কি হয় একটা রাত থেকে গেলে।'

'খালি বাসা ফেলে এসেছি। না গেলে হবে না।'

'খালি বাসা কেন ? মামী কোথায় ?'

'আর বলিস না। খামাখা ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। কয়েকবার আনতে গেছি আসে না। ঝগড়া করে জীবনটা শেষ করল। বড়ই আফসোস। ঝগড়া দিয়ে জীবন শুরু করলে— ঝগড়া দিয়ে শেষ করতে হয়। এটাই নিয়তি।'

মামা সিঁড়ি দিয়ে নামছেন আমি তাকিয়ে আছি। আমার খুব খারাপ লাগছে। বিচিত্র একটা মানুষ, সবার সমস্যাই তাঁর সমস্যা। কিন্তু কেউ জানতে চায় না— এই মানুষটার নিজস্ব কোন সমস্যা কি আছে।

নোমানের কাছে লেখা চিঠিটা পরলাম। মামা লিখেছেন—

www.BDeBooks.Com

বাবা নোমান,

দোয়াপর সমাচার এই যে, ঢাকায় কার্যোপলক্ষে আসিয়াছিলাম। তোমার সহিত সাক্ষাত হয় নাই। বড় খুকীর নিকট সমস্ত বিস্তারিত জানিয়া সুখী হইয়াছি। এক্ষণে আমার একটি আবদার। বড় খুকীকে নিয়া এক দুই দিনের জন্য হইলেও নেত্রকোনা যাইবা। বড় খুকীর মাতা তাহার কন্যার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে। তাহাছাড়া ছোট খুকীরও বিবাহের কথাবার্তা হইতেছে। এমতাবস্থায় দুই বোন কিছু দিন একত্র থাকিলে বড় ভাল হয়। বিবাহ সম্পন্ন হইলে কে কোথায় যাইবে কেহই বলিতে পারে না। হয়ত দীর্ঘদিন আর দুই বোনের সাক্ষাত হইবে না। কাজেই বাবা এই বৃদ্ধের প্রস্তাব একটু বিবেচনা করিবে।

আমি দেখলাম বড়মামা চিঠিতে নাম সই করতে ভুলে গেছেন। তাঁর শরীরটা তাহলে সত্যি সত্যি খারাপ করেছে। এত বড় ভুল মামা কখনোই করবেন না। পরিষ্কার করে নাম লিখবেন। তারিখ দেবেন, ঠিকানা দেবেন। নাম তারিখ এবং ঠিকানা ছাড়া চিঠি আমিও লিখেছি। দুটা চিঠি। দুটাই স্যারকে লেখা। প্রথমটা যখন লিখি তখন থর থর আমার হাত পা কাঁপছে। কি লিখছি নিজেই জানি না। কাউকে চিঠি লিখতে হলে গুছিয়ে লিখতে হয় সুন্দর করে লিখতে হয় এসব কিছুই আমার মাথায় নেই। তাঁকে চিঠি লিখছি এই আনন্দেই আমার তখন শরীর কাঁপছে। প্রথম চিঠিতে তাঁকে কি লিখেছিলাম আমার কিছুই মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল। সবকিছুই আমার মনে থাকে। কিন্তু ঐ চিঠিটির কথা কিচ্ছু মনে নেই। শুধু মনে আছে রোলটানা কাগজে চিঠিটা লেখা। যে বল পয়েন্টে লিখছিলাম সেই বল পয়েন্টটা ঠিকমত কালি ছাড়ছিল না। অনেকগুলো অক্ষর ছিল অস্পষ্ট। চিঠি শেষ করে আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমি পোস্টআপিস থেকে নিজেই খাম কিনলাম। খাম কেনার সময় মনে হল যিনি খাম দিচ্ছেন তিনি সব বুঝে ফেলেছেন। তিনি জেনে গেছেন— এই চিঠি আমি কাকে দিচ্ছি। কি আছে চিঠিতে।

ইকনমিক্সের একটা বাইয়ের ভেতর খামটা লুকিয়ে আমি যাচ্ছি চিঠি পোস্ট করতে পথে বাবার সঙ্গে দেখা। বাবা বললেন, কই যাচ্ছিস রে ? আমার শরীর কেঁপে উঠল। আর মনে হল বাবা বুঝে ফেলেছেন আমি কোথায় যাচ্ছি। তিনি জানেন আমার এই বইটার ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা খাম আছে।

'কি রে কথা বলছিস না কেন ? কি হয়েছে তোর ?'

'বন্ধুর বাসায় যাচ্ছি।'

'এখন কলেজ আছে না ? কলেজ বাদ দিয়ে বন্ধুর বাসায় কি ?'

'ওখান থেকে কলেজে যাব।'

'আচ্ছা যা। তোর কি শরীর খারাপ ?'

'না বাবা শরীর ভাল।'

'আচ্ছা আচ্ছা।'

চিঠি পোস্ট করে আমি কলেজে গেলাম। থার্ড পিরিয়ডে স্যারের ক্লাস। আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। স্যার ক্লাসে ঢুকলেন সব মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। আমি দাঁড়াতে পারলাম না। মনে হচ্ছে আমার হাত-পা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে।

স্যার রোল কল করছেন। মেয়েরা নানান রকম ফাজলামি করছে। ইয়েস স্যার না বলে সবাই বলছে হাজির হুজুর। একজন বললো— বান্দা হাজির হুজুর। হাসির হল্লা শুরু হল। স্যার রোল কল বন্ধ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। মনে হল কিছু বলবেন। বললেন না। রোল কল করে যেতে লাগলেন। আমার রোল তিপান্ন। যখন তিনি ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রী। আমি চুপ করে রইলাম। কোন শব্দ করলাম না। স্যার আবার ডাকলেন রোল ফিফটি থ্রী। আমি চুপ করে রইলাম। স্যার কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি মাথা নিচু করে আছি। আমার ধারণা হয়েছে স্যার আমার চোখের দিকে তাকালেই সব জেনে যাবেন। তখন আমি কি করব। এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব ?

স্যার সেদিন পড়ালেন সম্রাট বাবরের সিংহাসনের আরোহণ পর্ব। ক্লাসের হৈ চৈ একসময় থেমে গেল। তিনি ভারী এবং খানিকটা কাঁপা গলায় গল্প বলার ভঙ্গিতে কথা বলছেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়ছেন—

বাবরের মা'র নাম হযরত খানম।

দেখেছ কি অদ্ভুত নাম। এই নাম মনে রাখা সহজ না ? খুব সহজ। আবার শোন বাবরের মা হযরত খানম। ৯১০ হিজরীর কথা। রবিউস-সানি। রবিউস সানি কি আগে একবার বলেছি। আজ আর বলব না।

এই সময় কি হল ? হযরত খানম জ্বরে পড়লেন। মাত্র ছয় দিনের জ্বরে তিনি মারা গেলেন। বাবরের বয়স তখন কত ? কে বলতে পারে কত ? নবনী তুমি বলতে পার।

আমার শরীর কেঁপে উঠল। স্যার কি সুন্দর করে ডাকলেন নবনী। আর কেউ কি কোনদিন এত সুন্দর করে আমার নাম ডাকবে ?

'নবনী তুমি জান তখন বাবরের বয়স কত ?'

আমি চুপ করে আছি। আমার পেছন থেকে বেনু উঠে দাঁড়িয়ে বলর, স্যার নবনী জানে কিন্তু বলবে না।

ক্লাসের সবাই হাসছে। স্যার সবার হাসি অগ্রাহ্য করে পড়াতে শুরু করলেন— হযরত খানমের মৃত্যুর চার দিনের দিন আরেকটি ঘটনা ঘটল...

ঘটনা সামান্য হলেও মুঘল সাম্রাজ্যে তার ফল ছিল সুদূর প্রসারী। আজ সেই সামান্য ঘটনা এবং তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তোমাদের বলব...। ইতিহাস থেকে আমাদের অনেক কিছু শিখতে হবে। আপাতত তুচ্ছ ব্যাপার যে এক সময় সাম্রাজ্য পরিবর্তনের মত বড় ব্যাপারে রূপান্তরিত হতে পারে। এই শিক্ষা বার বার ইতিহাস আমাদের দেয়।

প্রথম চিঠিটি পাঠাবার এক সপ্তাহ পর আমি দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠালাম। কোন চিঠিতে নাম ঠিকানা ছিল না। তবু স্যার ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। একদিন

www.BDeBooks.Com

কলেজে রওয়ানা হচ্ছি। ওনার সঙ্গে দেখা। ওনি বললেন, নবনী শোন। তোমার তো পরীক্ষা এসে গেলো। এখন মন দিয়ে পড়াশুনা করা উচিত তাই না ?

'জ্বি।'

'তোমার হাতের লেখা সুন্দর। তবে হাতের লেখা সুন্দর হলেই তো হয় না— বানানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। মুহূর্ত বানানে হ-য়ের নীচে আছে দীর্ঘ উকার।'

আমি স্যারের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললাম— আমাকে এসব কেন বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি সেদিন কলেজে গেলাম না। বাড়িতে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে সারাদিন কাঁদলাম। সন্ধ্যাবেলা ছাদে উঠে মনে হল— ছাদ থেকে যদি নিচে লাফিয়ে পড়তে পারতাম তাহলে কি সুন্দর হত। কেন মানুষ শুধু শুধু পৃথিবীতে বেঁচে থাকে ?...

৬

সাতদিনের জায়গায় দশদিন পার করে নোমান ফিরল। রোদে পুড়ে চেহারা এমন হয়েছে যে তাকানো পর্যন্ত যায় না। এর সঙ্গে আছে কাশি। খুক খুক, খুক খুক কাশি লেগে আছে। ঘরে ঢোকার পর থেকেই কাশছে।

'খুব পরিশ্রম হচ্ছে নবনী। ছবি তৈরি যে কি কঠিন কাজ তুমি ধারণাই করতে পারবে না। একটা সাধারণ দুই মিনিটের দৃশ্য করতে লাগল সারাদিন। দৃশ্যটা কি জান ? দৃশ্যটা হল— নায়িকা পুকুর ঘাটে গোসল করতে গিয়েছে। একটা সবুজ কচুপাতায় তার গায়ে মাখা সাবানটা রাখা। হঠাৎ বাতাস লেগে সাবানটা পানিতে পড়ে গেল। নায়িকা পানিতে ডুব দিয়ে সাবান খুঁজছে।'

'অহনা তোমাদের নায়িকা ?'

'হুঁ। আমাদের ছবিতে ওর নাম হল জাহেদা। গ্রামের মেয়ে হিসেবে তাকে যে কি মানিয়েছে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। স্টিল ছবি নেয়া আছে, তোমাকে দেখাব। এখন ভাল করে চা কর দেখি, চা খাব। আউট ডোরে থেকে থেকে চায়ের অভ্যাস হয়েছে।'

আমি চা বানিয়ে এনে দেখি খাটে পা ঝুলিয়ে সে ভোস ভোস করে সিগারেট টানছে। তার শুধু যে চায়ের অভ্যাস হয়েছে তাই না। সিগারেটের অভ্যাসও হয়েছে।

'নবনী!'

'উঁ।'

'গোসলের পানি দাও। গোসল করে বেরুব। অহনার খোঁজে যেতে হবে। ও রাগারাগি করে কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছে। আমরাতো কিছুই জানি না। সন্ধ্যাবেলা স্যুটিং। জাহেদা হাতে এক মুঠি পাঠখড়ি নিয়ে যাচ্ছে। পাটখড়ির মাথায় আগুন, সেই আগুনের আভায় পথ চলছে... দারুণ দৃশ্য। লাইট ফাইট করতে রাত দশটার মত বেজে গেল। সফিক আমাকে বলল, যা অহনাকে নিয়ে

আয়। আমি আনতে গিয়ে শুনি সে সন্ধ্যাবেলা ব্যাগ গুছিয়ে স্টেশনের দিকে গেছে। বোঝ অবস্থা।

'তোমাদের স্যুটিং হল না ?'

'কিভাবে হবে ? রাতে যে ফিরে আসব সেই উপায়ও নেই... ট্রেন হল পরদিন ভোর সাতটায়।'

নোমান প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে গোসল করল।

মাথায় পানি ঢালে আর কাশে। কি বিশ্রী কাশি। এর মধ্যে এত ঠাণ্ডা লাগানো কি উচিত হচ্ছে ? বাথরুম থেকে বের হয়ে সে কেমন জবু থবু হয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে কিছুতেই উৎসাহ নেই। বাসায় যে নতুন একটা কাজের মেয়ে আছে সেদিকে তার চোখ পড়ল না। তার পোষা ময়না সম্পর্কেও সে তেমন উৎসাহ দেখালো না। একবার শুধু বলল, ময়নাটাকে ঠিকমত খাওয়া দাওয়া দেয়া হয়েছে নবনী ? ব্যাস এই পর্যন্তই।

নোমান বলল, আরেক কাপ চা দাও নবনী। গোসল করে শরীরটা ফ্রেস হয়ে গেছে। তোমার একা একা অসুবিধা হয়নিতো ?

'না।'

'সফিক একবার বলছিল, তুই তোর বৌকে নিয়ে আয়— সে একা আছে।'

'নিয়ে গেলেই পারতে।'

'অহনা রাজি হল না।'

'রাজি হলেন না কেন ?'

'অহনাকে বোঝা মুশকিল। ও কখন কি করে খুব স্ট্রেঞ্জ মেয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। অনার্স, এম. এ. দুটাতেই ফার্স্টক্লাস। ইউনিভার্সিটিতে চাকরি পেয়েছিল— বলল চাকরি করবে না। ঘর সংসার করবে। বছর বছর বাচ্চা দিয়ে— ঘর ভর্তি করে ফেলবে, ছেলেপুলেয়... হা হা হা। এই যুগের কোন মেয়ের মুখে এই জাতীয় কথা শুনেছ ?'

'না।'

'ওর আরো অদ্ভুত ব্যাপার আছে। এক সময় বলব। কই চা দিলে না ?'

আমি চা এনে দিলাম। নোমান চা শেষ করেই বের হয়ে গেল। তার চোখ টকটকে লাল। কে জানে হয়ত জ্বর এসেছে। মদিনা বলল, আম্মা লোকটা কে ?

আমি বললাম, কেউ না।

ইচ্ছা করে বলা না। মুখ ফসকে বলে ফেলা।

নোমান জ্বর গায়ে রাত নয়টার দিকে ফিরল। চোখ লাল, জ্বরের ঘোরে শরীর কেঁপে উঠছে। আমি বললাম, অহনাকে পাওয়া গেল ?

'দেখা হয় নি, তবে খোঁজ পাওয়া গেছে। চলে গেছে রাজশাহী। তোমাকে বলেছি না— অদ্ভুত মেয়ে।'

'এসো শুয়ে থাক। তোমার জ্বর বাড়ছে। ঘরে কি থার্মোমিটার আছে ?'

'আছে তবে কাজ হয় না।'

www.BDeBooks.Com

'কাজ হবে না কেন ?'

'থার্মোমিটারের মাথাটা ভাঙা।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, মাথা ভাঙা থার্মোমিটার রেখে দিয়েছ কেন ?

'ফেলতে মায়া লাগে।'

রাতে সে কিছু খেল না। মাঝরাতের দিকে তার জ্বর খুব বাড়ল। আমি তার মাথায় জলপট্টি দিচ্ছি। সে বিড়বিড় করে নানান কথা বলছে—। জ্বরের ঘোরে বলছে বলেই আমার ধারণা।

'কোটিপতি হওয়া কঠিন কিছু না। ইচ্ছা করলে হওয়া যায়। দরকারটা কি বল ? কোন দরকার নাই। অহনার কথাই ধর— অহনাও কিন্তু কোটিপতি। গরিব ঘরের মেয়ে ছিল। কি যে ভয়ঙ্কর গরিব চিন্তাই করতে পারবে না। অথচ এমন ভাল ছাত্রী। পড়াশোনার এত আগ্রহ। ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়ত তখন হলের সীটরেন্ট দেয়ার পয়সা নেই। সফিক আমার হাত দিয়ে টাকা পাঠাতো। সফিক একটা কথা বলে— 'নো ফ্রী লাঞ্চ'। এই পৃথিবীতে সব কিছুই নগদ অর্থে কিনতে হবে। হো হো হো। বুঝতে পারছ কিছু ?'

'বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না।'

'টাকা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে সফিক কিনেছে। এখন চাকা ঘুরে গেছে মেয়েটা কিনে নিয়েছে সফিককে। ঢাকা শহরে যত প্রোপার্টি সফিকের আছে সব কিন্তু ঐ মেয়ের নামে। এখন একবার যদি এই মেয়ে সফিককে ছেড়ে যায়— সফিক পথে বসবে। আজিমপুর কবরস্থানে বসে ভিক্ষা করতে হবে। সুর করে গান গাইতে হবে— আল্লাহুম্মা, সাল্লেআলা সাইয়াদেনা, মৌলানা মোহম্মদ!'

'প্লিজ চুপ করে থাক। ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

'আহা কথা বলতে ভাল লাগছে তো। শোন না কি বলি— দারুণ ইন্টারেস্টিং। আমি করতাম কি মাসের দুই তিন তারিখে টাকা নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। হল গেইট থেকে স্লীপ পাঠাতাম— জাহেদা খাতুন, সেকেন্ড ইয়ার অনার্স— রুম নাম্বার...।

'উনার নামতো অহনা।'

'অহনা পরে হয়েছে— তখন তার নাম ছিল জাহেদা খাতুন। বিয়ের পর হল অহনা। বুঝলে নবনী। খামে ভর্তি করে টাকা নিয়ে যেতাম। সব নতুন চকচকে নোট। জাহেদা টাকাগুলো হাতে নিত। আমি সঙ্গে করে মনিঅর্ডার ফরম নিয়ে যেতাম। এইখানে বসেই সে মনিঅর্ডার ফরম পূরণ করত। দেশে টাকা পাঠাতো। মনিঅর্ডার ফরমে লিখত— মা, তোমাকে কিছু টাকা পাঠালাম। এখানে দু'টা মেয়েকে প্রাইভেট পড়িয়ে যা টাকা পাই তাতে আমার চলে গিয়েও কিছু থাকে।

'পানি খাব নবনী। পানি দাও।'

আমি পানি এনে দিলাম। দু'চুমুক খেয়েই রেখে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, একটা ফ্রিজ কেনা দরকার। জ্বর জ্বারি হলে ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে। একটা

ফ্রিজ কিনতে হবে। ফ্রিজ কেনার টাকা আছে। কালই একটা ফ্রিজ কিনে ফেলব। কি বল ?

'আচ্ছা।'

'আর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। তুমি একা একা থাক গান শোনার একটা কিছু থাকলে সময় কাটবে।'

'আচ্ছা কেনা হবে।'

'ড্রেসিং টেবিলটা এখনো দিয়ে যায় নি ?'

'না।'

'কি রকম হারামজাদা চিন্তা করে দেখতো। ইচ্ছা করছে পিটায়ে লাশ বানায়ে ফেলি। জ্বর কমলে কাল সকালে একবার যাব— এমন পিটন দিব। অবশ্যি অহনাকে আনার জন্যে কাল রাজশাহীও যেতে হতে পারে। আমি হলাম তার চড়নদার। বুঝতে পারছ ?'

'পারছি।'

'সপ্তাহের ছুটি যখন হত তখন অহনাকে আমি সফিকের কাছে পৌঁছে দিতাম। যেতাম রিকশা করে। ওর আবার সেই সময় পেট্রোলের গন্ধ সহ্য হত না। প্রথম প্রথম রিকশা করে যাবার সময় খুব কাঁদতো। এই মেয়ে যে কি পরিমাণ কাঁদতে পারে তুমি বিশ্বাসও করবে না। আচ্ছা নবনী তুমি কি রকম কাঁদতে পারো ?'

আমি জবাব দিলাম না। জ্বরের ঘোরে ও ঝিমিয়ে পড়ল। আমি পাশেই জেগে বসে আছি। একটু দূরে হাতপা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে মদিনা। মেয়েটা খুবই শান্ত। দোষের মধ্যে একটাই হঠাৎ দেখা যায় কাজ কর্ম বন্ধ রেখে কাঁদতে বসে। আমি যখন জিজ্ঞেস করি— কাঁদছিস কেনরে ? সে দু'হাতে চোখ মুছে কান্না বন্ধ করে ফিক করে হেসে ফেলে বলে, 'এম্নেই কান্দি। অভ্যাস।'

ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি কাঁদি কি-না। না আমি কাঁদি না। অতি বড় দুঃসময়েও না। কি হবে কেঁদে ? প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে সে পড়ে আছে। আমি চুপচাপ বসে আছি তার মাথার কাছে। মানুষ কি আশ্চর্য প্রাণী। আজ আমি যার মাথার পাশে বসে আছি তার বদলে অন্য একজনের মাথার পাশেও বসতে পারতাম। পারতাম না ? বিয়ে নামের একটা ব্যাপার দু'জন অচেনাকে একসঙ্গে করে দিয়েছে। আমিতো স্যারের মাথার পাশেও বসে থাকতে পারতাম।

স্যারের কথা এই মুহূর্তে ভাবটা কি ঠিক হচ্ছে। মুহূর্তে বানান কি যেন ? হয়ের নীচে দীর্ঘ উকার। শুনুন স্যার, এই বানান আমি আর কোন দিন ভুল করিনি। করবও না শব্দটা মনে হলেই আপনাকে মনে পড়ে।

একজন মানুষ কি তার প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা করতে পারে ? আমি পারি। স্যারের সঙ্গে মুহূর্তগুলি আমি পারি। যদিও তাঁর সঙ্গে আমার তখন দেখাই হয় না। চাটাইয়ের যে ঢাকনি তিনি দিয়েছেন তা তিনি সরান নি। একদিন দেখি উত্তরের দরজাটাও তিনি তাঁর দিকে থেকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তখন তাঁর ঘরে যেতে হলে বাইরে দিয়ে যেতে হবে।

www.BDeBooks.Com

আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেছে। দরজা বন্ধ করে রাত দিন পড়ার ভাণ করি। বই এ একেবারেই মন বসে না। চিঠি লেখার একটা খাতা করেছি। রোজ একটা করে চিঠি লিখি। মজার মজার সব চিঠি। কোনটাতে হাসির কথা থাকে। কোনটাতে রাগের কথা থাকে। কোন কোন চিঠি লিখে নিজেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। ঠিক করে রেখেছি এক বছরে ৩৬৫টা চিঠি লিখব। চিঠি লেখা শেষ হলে একদিন খাতা নিয়ে স্যারের কাছে যাব। তাঁকে বলব— স্যার দেখুন তো এখানে কি কি বানান ভুল আছে।

অতিথপুরে আমার ছোটখালার ননদের বিয়ে। খালা খবর পাঠিয়েছেন আমি যেন অবশ্যই যাই। মেয়েকে সাজিয়ে দিতে হবে। মা বললেন— নবনী যাবি ?

আমি বললাম পাগল হয়েছ ? আমার পরীক্ষা না ? ইরাকে পাঠিয়ে দাও। ইরা যাক।

'যা না মা এত করে লিখেছে। তোকে তোর খালা কত পছন্দ করে। না গেলে মনে কষ্ট পাবে।'

আমার যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু যাব কি করে ? যদি যাই তাহলে কি আর রোজ একটা করে চিঠি লিখতে পারব ? তাছাড়া স্যারকে ফেলে রেখে আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় না। রোজ দেখাও হয় না তবুওতো আমরা পাশাপাশি আছি। উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়ালে তাঁর হাঁটার শব্দ কানে আসে। এটাই বা কম কি ?

ঠিক হল ইরা যাবে। বাবা তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। যেদিন যাবার কথা সেদিন দেখি বাবা যাচ্ছেন না। ঠিক হয়েছে ইরাকে পৌঁছে দেবেন আমাদের স্যার। আমার বুক ধ্বক করে উঠল। আমি মা'কে গিয়ে বললাম— মা শোন, ইরা থাক। আমি যাব। আমি না গেলে ছোটখালা মনে কষ্ট পাবেন।

মা বললেন, ইরা সব কাপড় গুছিয়ে রেখেছে— এখন তুই যাবি কি ?

আমি বললাম, আমার কাপড় গোছাতে এক মিনিট লাগবে।

'না না তুই থাক, পড়াশোনা করছিস কর।'

ইরা স্যারের সঙ্গে চলে গেল। আমার মনে হল আমি যদি একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ইরাকে ফ্যালাফ্যালা করে ফেলতে পারতাম। আমার জীবনের সবচে কষ্টের মুহূর্ত কি যদি কেউ জানতে চায় আমি বলব—স্যারের সঙ্গে ইরার অতিথপুরে যাবার সময়টা।

তখন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাবা একটা রিকশা ডেকে এনেছেন। ইরা রিকশায় উঠে বসেছে। স্যার বললেন, আমি আরেকটা রিকশা নিয়ে আসি। বাবা ধমকের স্বরে বললেন, আরেকটা রিকশা লাগবে কেন ? তুমি এইটাতেই উঠতো মাস্টার। তোমাদের বড় বাড়াবাড়ি।

তারা দু'জন একটা রিকশায় করে চলে যাচ্ছে। আমি পাথরের মত মুখ করে তাকিয়ে আছি।

ইরা ফিরে এসে কত গল্প, আপা জান তোমার স্যার কিন্তু দারুণ রসিক লোক। এম্নিতে বোঝা যায় না। কিন্তু এমন সব রসিকতা করেন যে হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে হয়। একদিন কি হয়েছে শোন, ছোটখালা স্যারকে খেতে দিয়েছেন। পাংগাশ মাছের বড় একটা পেটি দেয়া হল। তখন স্যার...

আমি বললাম, চুপ করতো ইরা। কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করিস না। পড়ার চেষ্টা করছি দেখছিস না?

একদিন খুব কষ্ট লাগল। বড় মামা একটা টাঙ্গাইলের শাড়ি পাঠিয়েছেন। সবুজের উপর কালো ডোরা। শাড়ি পরার পর মা বললেন, ও আল্লা তোকে তো পরীর মত সুন্দর লাগছে রে। ইরাকে নিয়ে যা তো স্টুডিও থেকে একটা ছবি তুলে আয়। বিয়ের কথাবার্তায় কাজে লাগবে।

আমি ছবি তুলতে গেলাম না। তবে আমাদের বাড়ির সামনের বাগানে হাঁটতে গেলাম। বাগান থেকে স্যারের ঘরের ভেতরটা দেখা যায়। আমার মন বলছিল ভেতর থেকে স্যার আমাকে দেখতে পাবেন এবং অবশ্যি বাইরে বের হয়ে আসবেন।

সে রকম কিছুই হল না। আমি দেখলাম গভীর মনযোগে তিনি কি যেন পড়ছেন। জানালার সামনে দিয়ে আমার বার বার যাওয়া আসা তার মনযোগ নষ্ট করতে পারল না। আমার ইচ্ছা করছে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকি। তীব্র গলায় বলি— বেহেশতে আপনি যেসব পরী পাবেন তারা কি আমার চেয়েও সুন্দর? আপনি দিনের পর দিন আমাকে অগ্রাহ্য করবেন তা হবে না। না না না।

এই সময় স্যার অসুখে পড়লেন। বাসার কেউ বুঝতে পারল না। কিন্তু আমি বুঝলাম। বুঝেই বা কি করব? আমি তাঁকে ঘর থেকে বের হতে দেখি না। তিনি কলেজেও যান না। আমি কলেজের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম অসুস্থতার জন্যে তিনি ছুটির দরখাস্ত করেছেন। আমার ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে। একটা মানুষ অসুখ হয়ে পড়ে আছে এ বাড়ি কেউ সেটা বুঝতে পারছে না কেন? এ বাড়ির সবাই কি অন্ধ? মা'র কি উচিত না খোঁজ-খবর করা? আমি নিজ থেকে কাউকে কিচ্ছু বলব না। মরে গেলেও না।

একদিন মা বললেন, কিরে তোর স্যারের কি অসুখ বিসুখ করল না-কি? একজন ডাক্তারকে মনে হয় ঢুকতে দেখলাম।

আমি বললাম, অসুখ বিসুখ করেছে কি-না জানি না। করতেও পারে। আল্লাহর পিয়ারা বান্দাদেরওতো অসুখ বিসুখ হয়।

'খোঁজ নিয়ে আয়তো।'

'আমি খোঁজ নিতে পারব না, মা। আমার এত মাথা ব্যথা নেই। অন্তুকে পাঠাও।'

অন্তু খোঁজ নিয়ে এল— চোখ বড় বড় করে হাসি মুখে বলল, মওলানা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে বুঝলে মা— ছয়দিন ধরে বিছানায় শোয়া। কথা বলে চিঁচিঁ করে।

মা বললেন, তাতে হাসির কি হল। হাসছিস কেন?

www.BDeBooks.Com

'উনি কেমন চিঁচিঁ করে কথা বললেন ঐ জন্যেই হাসছি। উনার কথা শুনলে মনে হবে মানুষ কথা বলছে না। চিকা কথা বলছে। কথা শুনলে তুমিও হাসবে।'

মা তৎক্ষণাৎ তাঁকে দেখতে গেলেন। পৃথিবীর সমস্ত মা'দের মত তিনিও খুব দুঃখিত হলেন। একটা লোক দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে তিনি বলতেও পারেন না এই লজ্জাতেই মা অস্থির। মা বললেন, কেন তুমি আমাদের কোন খবর দেবে না ? তুমি রান্না করে কিছু খেতে পার না, আমাদের বলবে আমরা ব্যবস্থা করব। না-কি ইসলাম ধর্মে এরকম নিয়ম নেই ?

তিনি মিনমিন করে বললেন, আপনাদের কষ্ট দিতে চাই নি। ভেবেছি সেরে যাবে।

এখন থেকে তোমার সব খাওয়া দাওয়া এ বাড়ি থেকে যাবে। বুঝতে পারছ ? কি খাও তুমি ?

'বার্লি আর সাগু এই দু'টা ছাড়া আর কিছু খেতে পারি না।'

'তোমার হয়েছে কি ? ডাক্তার কি বলল ?'

'ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করতে দিয়েছেন। এখনো কিছু বলতে পারছেন না।'

দুপুরে আমি খাবার নিয়ে গেলাম।

মামার পাঠানো সেই সবুজ শাড়িটা পরলাম। চোখে কাজল দিলাম। হাতে একটা ট্রে। ট্রেতে এক বাটি বার্লি এক গ্লাস দুধ। স্যার আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনাটা তিনি যে ঘটতে দেখলেন। বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, স্যার আপনি উঠবেন না। চুপ করে শুয়ে থাকুন। আপনার খাবার নিয়ে এসেছি।

'শুকরিয়া। অশেষ শুকরিয়। রেখে দাও।'

'আপনি নিজে নিজে খেতে পারবেন ? না-কি আমি চামচ দিয়ে খাইয়ে দেব ?'

'না না পারব। আমি পারব।'

'স্যার আমার চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে কিন্তু অসুবিধা নেই। আপনি যদি অস্বস্তি বা লজ্জা বোধ না করেন আমি খাইয়ে দিতে পারি। যদি পাপ হয় আমার হবে। আপনার হবে না। আপনি ঠিকই বেহেশতে যাবেন।'

তিনি দুঃখিত গলায় বললেন, তুমি আমার ধর্ম কর্মটাকে এমন কঠিন দৃষ্টিতে দেখ কেন ? আমিতো কারো কোন ক্ষতি করছি না। আমি নিজের মতো থাকি। এই নিজের মতো থাকতে গিয়ে তোমাকে যদি কোন কারণে কষ্ট দিয়ে থাকি তুমি কিছু মনে রেখ না।

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, আপনি কষ্ট দেবেন কেন ? আমি কথার কথা বললাম। স্যার আমি যাই।

একটু বোস নবনী। বসতে ইচ্ছা না হয়— দাঁড়িয়ে থাক। আমি কয়েকটা কথা বলব। এই কথাগুলো তোমার জানা খুব জরুরি। আমি মানুষ হয়েছি এতিমখানায়। এতিমখানার জীবনটাতো আদর ভালবাসার জীবন না। কষ্টের জীবন। আমাদের একজন হুজুর ছিলেন আমরা ডাকতাম মেজো হুজুর। তিনি

আমাদের সবাইকে অত্যন্ত স্নেহ্ করতেন। ধর্ম কর্মের প্রতি আমার এই অনুরাগ তাঁর কাছ্ থেকে পাওয়া। আমি মনে করি না এটা ভুল। মাদ্রাসা থেকে উলা পাস করে আমি কলেজে ভর্তি হ্ই। আমার ভাগ্য ভাল ছিল, ইন্ডিয়া সরকারের একটা স্কলারশীপ পেয়ে যাই। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. করার একটা সুযোগ ঘটে। এম. এ. পাস করি।

আমি বললাম, স্যার আমাকে এত কথা বলার দরকার নেই।

তিনি খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, দরকার আছে। দরকার আছে বলেই বলছি— তোমরা আজ যে পোশাকে আমাকে দেখছ সব সময় এই পোশাকেই আমি সারা জীবন পরেছি। মেজো হুজুর সেই নির্দেশ আমাকে দিয়েছেন।

'কেন দিলেন ?'

'কারণ আমাদের নবী এই লেবাস পরতেন।'

'নবী আরবে জন্মেছিলেন বলে এই লেবাস পরতেন। তিনি যদি তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মাতেন তাহলে নিশ্চয়ই এই লেবাস পরতেন না। তখন গায়ে পরতেন সীল মাছের চামড়ার পোশাক। এই অবস্থায় আপনি কি করতেন ? আপনিও কি সীল মাছের চামড়ার পোশাক জোগাড় করতেন ?'

'নবীজী যেহেতু তুন্দ্রা অঞ্চলে জন্মাননি কাজেই সেই প্রশ্ন আসে না। তাছাড়া নবীজীর পোশাক পরার অন্য একটা অর্থ হ্ল— তাকে সম্মান দেখানো। সম্মান দেখানোয়তো দোষের কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথকে সম্মান দেখাতে গিয়ে এক সময় অনেকে লম্বা দাড়ি রাখত বাবড়ি চুল রাখতো।'

আমি চুপ করে গেলাম। স্যার সহজ ভঙ্গিতে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যুক্তিতে পারবে না নবনী। বোধহয় তোমার ধারণা ছিল এই জাতীয় পোশাক পরা টুপীওয়ালা লোক সব অল্প বুদ্ধির হয়। এই রকম মনে করার কোন কারণ নেই। আমার বুদ্ধি ভালই আছে। আমার পড়াশোনাও অনেক। তোমাকে এত কথা বললাম কারণ... কারণ...।

'কারণটা কি বলুন ?'

'আরেকদিন বলব। আজ একদিনে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছি।'

'আপনি গুছিয়ে কথা বলতে পারেন।'

'না নবনী আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তবে খুব গুছিয়ে চিন্তা করতে পারি।'

'একটা কাক যে আপনার কাছে আসতো সেটা কি আর আসে না ?'

'আসে। বিকালের দিকে আসে। একা আসে না— তার কয়েকটা বন্ধুবান্ধব জুটেছে। সব ক'টাকে নিয়ে আসে। এরা কেউই আমাকে ভয় পায় না।'

'আপনাকে বোধহয় কাক মনে করে।'

'করতে পারে। পশুপাখির মনের কথা বোঝা বড়ই দুষ্কর। তবে কাক আমার খুব প্রিয় পাখি। এতিমখানায় যখন ছিলাম তখনও আমার কয়েকটা পোষা কাক ছিল।'

www.BDeBooks.Com

'কাক আপনার প্রিয় পাখি ?'

'হুঁ।'

'কেন ?'

'কাকই একমাত্র পাখি যে মানুষের কাছাকাছি থাকে, অন্য কোন পাখি কিন্তু মানুষের কাছে আসে না। তারা দূরে দূরে থাকে ?'

'আপনার কি ধারণা আমাদের সবার কাক পোষা উচিত ?'

উনি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠলেন। কোন মানুষকে এত আনন্দিত ভঙ্গিতে আমি হাসতে শুনি নি। আমার ইচ্ছা করতে লাগল আমি আরো কিছু হাসির কথা বলে স্যারকে হাসিয়ে দি।

স্যার হাসি থামিয়ে বললেন, এক হাসিতে আমার অসুখ অনেকখানি কমে গেছে। এখন ঘরে যাও নবনী।

'না আমি ঘরে যাব না।'

'তোমার পড়াশোনা আছে। পড়াশোনা কর। রুগীর পাশে এতক্ষণ থাকা ঠিক না।'

'আমার ঠিক অঠিক আমি বুঝব আপনাকে এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

তিনি একটু যেন ভয়ে ভয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে কি চাও বলতো নবনী।

'আমি কিছু চাই না।'

স্যার অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে ক্লান্ত গলায় বললেন, আমার কাছে দুটি চিঠি কি তুমি লিখেছিলে ?

'জানি না। লিখতেও পারি।'

'শোন নবনী, তুমি একটা অসম্ভব ভাল মেয়ে। আমি চাই না আমার কারণে তোমার কোন ক্ষতি হোক।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, ক্ষতির কথা আসছে কেন ? কি আবোল তাবোল কথা বলছেন ? স্যার আরেকটা কথা আমি কোন চিঠি ফিঠি কাউকে লিখিনি— আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। মৌলবীকে চিঠি লিখব। অসুখে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে।

স্যার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আমি আর আপনার কাছে খাবার নিয়ে আসব না।

সেদিন রাতে খুব বৃষ্টি। আমি আবার তাঁর খাবার নিয়ে গেলাম। স্যারের ঘরে পা দেয়া মাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। স্যার ব্যস্ত গলায় বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও মোমবাতি আছে। মোমবাতি জ্বালাচ্ছি।

আমি অদ্ভুত গলায় বললাম— না মোমবাতি জ্বালাতে হবে না। অন্ধকারই ভাল।

স্যার চমকে উঠে বললেন, নবনী ঘরে যাও। প্লীজ ঘরে যাও।

আমি বললাম, না।

কি প্রচণ্ড ঝড় হল সে রাতে। আমাদের শিরীষ গাছের একটা ডাল প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ে গেল। হোক যা ইচ্ছা হোক। আজ আমার আর কিছুই যায় আসে না। প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। হোক বর্ষণ। সারা পৃথিবী তলিয়ে যাক।

৭

আমাদের ড্রেসিং টেবিলটা চলে এসেছে। গাবদা ধরনের একটা জিনিস। আয়নাটাও বোধহয় সস্তা— মুখ কেমন বাঁকা দেখা যায়। যে পালিশের জন্যে এতদিন দেরী হল সেই পালিশে ড্রেসিং টেবিলের কোন উন্নতি বলে মনে হল না। ম্যাট ম্যাটে রং।

নোমান হাসি মুখে বলল, কি জিনিসটা সুন্দর না?

আমি বললাম, সুন্দর। খুব সুন্দর।

'সস্তায় পেয়ে গেছি। সেগুন কাঠ। ঘুণ ধরবে না। দু'শ বছর পরেও কিচ্ছু হবে না।'

আমি বললাম, দু'শ বছর পর্যন্ত আমাদের কোন ড্রেসিং টেবিল কিনতে হবে না। এটা দিয়েই চালিয়ে দেব।

সে তাকিয়ে রইল। তার চোখে মুখে অস্বস্তি। আমার রসিকতটা বোধহয় বুঝতে পারছে না। এটা দোষের কিছু না। অধিকাংশ মানুষই রসিকতা বুঝতে পারে না। আমার বাবাও পারেন না। অথচ তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

নোমানকেও আমার বুদ্ধিমান মনে হয়। সরল ধরনের বুদ্ধি। এই জাতীয় বুদ্ধির মানুষ রসিকতা করতেও পারে না। রসিকতা বুঝতেও পারে না। এরা খুব কর্মঠ হয়। বিশ্বস্ত হয়। এরা যে প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্যেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে তাদের কোন উন্নতি হয় না। নিজের অবস্থার উন্নতির জন্যে এদের মাথা ব্যথা থাকে না। এরা অল্পতেই তুষ্ট।

ড্রেসিং টেবিলটা ঘরে আসার পর থেকে তার হাসিমুখ দেখে আমার খুব মজা লাগছে। এর মধ্যে গামছা দিয়ে সে দু'বার এটা মুছল। কাছ থেকে, দূর থেকে নানান ভঙ্গিমায় নিজেকে দেখল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কায়দা করে চুল আঁচড়াল তার চুল আঁচড়ানোই ছিল— দুই হাতে সেই চুল আউলা ঝাউলা করে আবার আঁচড়াল। আশ্চর্য ছেলেমানুষী।

'নবনী।'

'বল।'

'ড্রেসিং টেবিলের জন্যে একটা ঢাকনি বানানো দরকার। নয়ত ধুলা পড়ে পালিশ নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ড্রেসিং টেবিলে ঢাকনি থাকে না।'

'কে বলল থাকে না। ড্রেসিং টেবিলে ঢাকনি বেশি দরকার। রাতের বেলা আয়না ঢেকে রাখতে হয়। রাতের বেলা আয়নায় মুখ দেখা খুবই অলক্ষণ। তুমি বোধহয় এসব বিশ্বাস কর না?'

www.BDeBooks.Com

'না।'

'পামিস্ট্রি বিশ্বাস কর ? হাত দেখা।'

'না।'

'অহনা আবার এসব খুব বিশ্বাস করে। কেউ হাত দেখতে জানে বললেই হল সে হাত মেলে দিবে।'

'ও আচ্ছা।'

'একবার সে খবর পেয়েছে হ্নীলা বলে একটা জায়গা আছে সেখানে খুব বড় একজন পামিস্ট্র থাকেন। যুগানন্দ আচার্য। স্কুলের সংস্কৃতের টিচার। সে সেখানে যাবেই। সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, নোমান তুই ওকে নিয়ে যা। ঝামেলা চুকিয়ে আয়।'

'তুমি নিয়ে গেলে ?'

'না নিয়ে উপায় আছে ?' অহনা মুখ দিয়ে যা বলবে তা করে ছাড়বে। সে বিরাট ইতিহাস। জায়গাটা হল টেকনাফের কাছাকাছি। অতি দুর্গম। আমি মাইক্রবাস নিয়ে আগে চলে গেলাম। অহনা প্লেনে করে গেল কক্সবাজার। সেখান থেকে ওকে নিয়ে মাইক্রবাসে করে রওনা হলাম। রাস্তা গেছে পানিতে ডুবে। রাস্তার দুই ধারে লাল ফ্ল্যাগ পুঁতে রেখেছে। ফ্ল্যাগ দেখে দেখে যাওয়া। এর মধ্যে টায়ার গেল পাংচার হয়ে।'

'শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যুগান্দ আচার্যকে ?'

'মজাতো এই খানেই। কেউ এই লোকের নামও শুনে নাই। স্কুলই নেই। স্কুল টিচার কোত্থেকে আসবে ?'

'তোমরা কি করলে ফিরে এলে ?'

'ফিরে আসব কি করে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঐ সব অঞ্চলে সন্ধ্যার পর গাড়ি ঘোড়া চলে না। ডাকাত পড়ে। তারচেয়ে বড় কথা কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে বুনো হাতি নেমেছে, তিনটা মানুষ মেরেছে। আমারতো মাথায় বাড়ি। কি করব কিছুই বুঝত পারছি না। হোটেল নেই রেস্ট হাউস নেই। কিছুই নেই। গেলাম টেকনাফ। সেখানে বনবিভাগের একটা রেস্ট হাউস পাওয়া গেল। একটাই রুম। অহনাকে সেখানে রেখে আমি মাইক্রবাসের ভেতর শুয়ে আছি। খবর পাওয়া গেছে রাস্তায় হাতি নেমে গেছে। সব বাতি টাতি নিভিয়ে দিতে বলেছে। বাতি দেখলেই না-কি হাতি ছুটে আসে। কত কাণ্ড! চা করতো নবনী।

চা খাই! আর তুমি এক কাজ কর পাউডার টাউডার এইসব দিয়ে ড্রেসিং টেবিলটা সুন্দর করে সাজাও অহনা দেখতে আসবে।

'উনি এই ড্রেসিং টেবিল দেখতে আসবেন ?'

'হ্যাঁ। তাঁকেও বলেছি।'

'ভাল করেছ।'

আমি চা বানাতে গেলাম। নোমান একটা মোড়া নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে রইল। আনন্দিত মুখ, সুখী সুখী চেহারা।

আজ তার অফিস আছে অথচ সারাদিন দিব্যি অফিস বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছে। অফিসে তার কাজটা কি আমি জানি না। আমার ক্ষীণ সন্দেহ তার প্রধান কাজ বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে থাকা। ফুট ফরমাশ খাটা। একদিন জিজ্ঞেসও করেছিলাম— অফিসে তোমার কাজটা কি বলতো ?

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। যেন খুব বোকার মত প্রশ্ন করেছি। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, যখন যে কাজ দেয় সেটাই করতে হয়। ধরা বাধা কিছু না। এড ফ্রিম করার জন্যে আর্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের আনা নেয়া— কাজের কি শেষ আছে ? প্রয়োজনে লাইটবয়ের কাজও করতে হয়।

'সেটা কি ?'

'আর্টিস্টের উপর লাইট ফেলা।'

'ও আচ্ছা। খুব কঠিন কাজ ?'

'দেখে মনে হবে খুব সহজ কাজ আসলে তা না। কঠিন আছে। টেকনিক্যাল কাজ সবই কঠিন।'

'তুমি যে কাজটা কর সেটার নাম কি ?'

'তোমার কথাই বুঝতে পারছি না— নাম আবার কি ?'

'অফিসে কত রকম পোস্ট আছে— কেউ ম্যানেজার, কেউ সুপারভাইজার, কেউ ক্যাশিয়ার, হেড ক্লার্ক... তুমি কি ?'

ও আমার অজ্ঞতায় হো হো করে কিছুক্ষণ হেসে বলল— আমাদের এসব কিছু নেই। তবে আমার বেতন হয় অহনার পি এ এই খাতে।'

'তুমি অহনার পি এ ?'

'কাগজে কলমে তাই। আসলে অফিসের কাজ করে ফুরসুত পাই না।'

'আজ অফিসে গেলে না ?'

'আমার হল স্বাধীন চাকরির মত— ইচ্ছা হল গেলাম ইচ্ছা হল গেলাম না। আজ ছুটি নিলাম। চল বিকালে তোমাকে নিয়ে বের হব মিরপুরের দিকে যাব।'

'তুমি না বললে— অহনা আসবেন।'

'সে এলেও আসবে রাত ন'টার পরে। তার লেডিস ক্লাবের মিটিং আছে।'

'অহনার সঙ্গে তার স্বামীর যে সমস্যা ছিল সেটা মিটে গেছে ?'

'হুঁ মিটে গেছে। এখন আবার গলায় গলায় ভাব।'

'তোমাদের ছবির স্যুটিং শুরু হবে না ?'

'হবে। এইবার তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমার অবশ্যি ভাল লাগবে না। খুবই বিরক্তিকর কাজ। ছবি মানে ধৈর্য পরীক্ষা আর কিছু না।'

চা খেতে খেতে নোমান বলল, কাপড় পরে নাও চল ঘুরে আসি।

'কোথায় যাবে চিড়িয়াখানায় ?'

'হ্যাঁ। আর কোথায় ?'

এই পর্যন্ত আমরা ছ'বার বাইরে গেছি। এই ছ'বারের মধ্যে পাঁচবারই গিয়েছি চিড়িয়াখানায়। খানিকক্ষণ ঘুরেই সে এসে দাঁড়াবে বাদরের খাঁচার

www.BDeBooks.Com

সামনে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলবে— কি আজিব জানোয়ার। সে অবাক হয়ে "আজিব জানোয়ার" দেখে, আমি দেখি তাকে। বাদরদের সঙ্গে সে নানা কথাবার্তা বলে সেইসব শুনতেও মজা লাগে।

'এই লাফ দে। লাফ দে... কিচ কিচ কিচ... ঐ লম্বুটার ল্যাজ ধরে টান মার না। দেখছিস কি ? আবার দেখি হাসে... কিচ কিচ কিচ...'

আমাদের চিড়িয়াখানায় যাওয়া হল না। কাপড় চোপড় পরে বেরুবার মুখে অহনা এসে উপস্থিত হলেন। চোখ ধাঁধানো উগ্র পোশাক। শাড়ি এমন পাতলা যে এই শাড়ি গায়ে থাকা না থাকা অর্থহীন। ব্লাউজটিও ভিন্ন ধরনের কাঁচুলী জাতীয়— নাচের মেয়েরা বোধহয় এরকম পরে। ঠোঁটে তিনি এমন লিপিস্টিক মেখেছেন যে দেখে মনে হয় ঠোঁটে আগুন লেগে গেছে। এমন আগুন রঙা লিপিস্টিক আমি আগে দেখি নি। অহনা এসেছেন নোমানের ড্রেসিং টেবিল দেখতে। তিনি নানা দিক থেকে ঘুরে ফিরে ড্রেসিং টেবিল দেখলেন। মুগ্ধ স্বরে বললেন, অপূর্ব!

নোমান বলল, অরিজিনাল সেগুন কাঠ দু'শ বছরেও কিছু হবে না।

অহনা বললেন, সেগুন কাঠ ছাড়া এত ভাল পালিশ হত না। অদ্ভুত সুন্দর। আয়নাটায় একটু ঢেউ ঢেউ ভাব আছে। এটা এমন কিছু না।

অহনা আমাদের খাটে পা ঝুলিয়ে বসলেন। পা দুলাতে দুলাতে বললেন, নোমান জিলাপী খাব। তোমার সেই বিখ্যাত জিলাপী নিয়ে এসো। ভাল কথা তোমরা কি কোথাও বেরুচ্ছিলে ?

'হুঁ। আরেকদিন যাব অসুবিধা নেই।'

'যাচ্ছিলে কোথায় ? বাঁদর দেখতে নিশ্চয়ই। বাঁদর দেখা মোটেই জরুরি নয়। আমি খুব জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি। গোরানে একজন পামিস্ট আছে। আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। পারবে না ?'

'অবশ্যই পারব।'

অহনা আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আপনার স্বামীকে কিছুক্ষণের জন্যে ধার নিচ্ছি। পামিস্টের কথা শুনলে আমার আবার মাথায় ঠিক থাকে না। আমার পামিস্ট প্রীতির কথা নোমান আপনাকে বলে নি ?

'বলেছে।'

'পামিস্ট নিয়ে আমার অসংখ্য গল্প আছে। কিছু কিছু বোধহয় শুনেছেন। হ্নীলাতে পামিস্টের খোঁজে গিয়ে যে পাগলা হাতির খপ্পরে পড়েছিলাম সেই গল্প শুনেছেন ?'

'শুনেছি।'

অহনা পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। জিলাপী খেলেন চা খেলেন। মদিনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন, ময়নাটার সঙ্গেও কিছু কথা বললেন। খাচাটাকে দোলা দিয়ে বললেন, এই ময়না বল দেখি, অহনা! অহনা! অহনা।

ময়না সঙ্গে সঙ্গে বলল, অহনা! অহনা! অহনা!

যাবার সময় তিনি মদিনাকে একটা পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে গেলেন। মদিনা সারা সন্ধ্যা এই নোট হাতে বারান্দায় স্থানুর মত বসে রইল।

মদিনা তার পাঁচশ' টাকার নোট নিয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে বারান্দায় বসে আছে। আমি চলে এসেছি ছাদে। এই বাড়িটার ছাদটায় ওঠা এক সমস্যা। খানিকটা অংশ দেয়ালের গায়ে আটকানো খাড়া লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। শুরুতে এই ছাদটা আমার পছন্দ হয় নি। এখন পছন্দ। খুব নিরিবিলি। হঠাৎ কেউ ছাদে উঠে আসবে সে সম্ভাবনা নেই। কেউ আসবে না। তাছাড়া বাড়ির চারদিকে পুরানো পুরানো গাছ আছে বলেই ছাদটায় এক ধরনের আব্রু আছে।

ইরার গল্পের বইটা এক হাতে নিয়ে বেশ ঝামেলা করে ছাদে উঠলাম। গল্পের বই পড়ার জন্য ছাদে আমি সুন্দর একটা জায়গা বের করেছি। পশ্চিম দিকের ছাদে পানির ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসলেই হয়। খুব সুন্দর জায়গা। মজার ব্যাপার হচ্ছে বই পড়ার এত সুন্দর জায়গা থাকলেও আমি এখন এখন পর্যন্ত একটা বইও পড়ে শেষ করতে পারি নি। তিথির নীল তোয়ালে বইটা কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই হাই উঠে। বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকি। হাতে একটি বই থাকার সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে সব সময় মনে হবে আমি অকারণে বসে নেই। আমার একটা কাজ আছে।

আমি পানির ট্যাঙ্কে হেলান দিয়ে বসে আছি। গাছের মাথায় রোদ এখনো ঘণ্টা খানিক সময় আছে। বইটা খুলতেই ইরার চিঠি বের হয়ে এল। অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে প্রতিদিনই একটা করে চিঠি দিচ্ছে। এটা সর্বশেষ চিঠি কি-না বুঝতে পারছি না। ইরা চিঠিতে তারিখ থাকে না।

আপা,

তোমার কি হয়েছে বল তো ? তোমাকে এত করে আসতে লিখলাম, আসলে না। বড় মামা প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে তোমার ওখান থেকে গেলেন। খুব ভুগলেন। প্রায় যমে-মানুষে টানাটানি। তুমি মামাকেও চিঠি দাও নি। আমাকে সেই যে প্রথম একটা চিঠি লিখলে তারপর আর না। বাবাকে দায়সারা গোছের একটা চিঠি দিয়েছ। বড় মামার ধারণা— তুমি সবার উপর রাগ করে আছ, কারণ তোমাকে গরিব ধরনের একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছে। আসল কারণটা কি আপা বল তো ? আমি ভাইয়াকে বলেছি আমাকে তোমার ওখানে নিয়ে যেতে। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ব্যাপারটা কি। ভাইয়া প্রতিবারই বলে— আচ্ছা। আচ্ছা। ফুটবল খেলতে গিয়ে সে মাথায় চোট পেয়েছে বলেছিলাম না ? এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার কোমরে কি না-কি হয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়। বাঁকা হয়ে হাঁটে। ঐ দিন বাবা কি কারণে ভাইয়ার উপর রাগ করে বললেন, 'এই যে বক্রবাবু, শুনে যাও।' এতে ভাইয়ার খুব লেগেছে। সে

www.BDeBooks.Com

বিছানা-বালিশ নিয়ে চলে গেছে। তার এক বন্ধু আছে— সজল। এখন তাদের বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে বাঁকা হয়ে আমাদের দেখতে আসে। আমার বিয়ের ব্যাপারে যে কথাবার্তা হচ্ছিল তা আরো কিছুদূর এগিয়েছে। জামালপুর থেকে বরের বোন আমাকে দেখতে এলেন। ওজন পাঁচ মণের কাছাকাছি। আমাদের খাটে বসলেন। খাটে মট্‌মট্‌ শব্দ হতে লাগল। আমি ভাবছি সর্বনাশ! এখন উনি যদি খাট ভেঙে পড়েন তাহলে আমাদের খাটও যাবে বিয়েও যাবে।

যাই হোক, খাট ভাঙে নি তবে বিয়ে ভেঙে গেছে। ভদ্রমহিলার আমাকে পছন্দ হয় নি। কাজেই, আপা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার মন খারাপ। তোমার পায়ে পড়ি, আমার মন ঠিক করার জন্যে হলেও এসো।

ইতি
ইরা।

পুনশ্চঃ আপা, তুমি আসার সময় অবশ্যি লাইব্রেরির বইটা নিয়ে আসবে। অনেক ফাইন হয়ে গেছে।

ইরা বিয়ে ভেঙে গেছে— এটা বড় ধরনের দুঃসংবাদ। বিয়ে একবার ভাঙতে শুরু করলে শুধু ভাঙতেই থাকে। তখন বিয়ের কোন সম্বন্ধ এসেছে শুনলেই আতঙ্ক লাগে।

ইরার বিয়ে কি আমার জন্যে ভাঙল ? সে যদিও কিছু লিখে নি তবু আমার তাই ধারণা। তবে আমার বড় মামা যতদিন আছেন ততদিন কোন চিন্তা নেই। তিনি একের পর এক সম্বন্ধ আনতেই থাকবেন এবং এক শুভলগ্নে দেখা যাবে ইরারও বিয়ে হয়ে গেছে। মামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবেন, যাক, দায়িত্ব শেষ হয়েছে।

এই পৃথিবীতে কেউ কেউ প্রচুর দায়িত্ব নিয়ে জন্মায়, আবার কেউ কেউ জন্মায় কোন রকম দায়-দায়িত্ব ছাড়া। যেমন আমার বাবা। তাঁর জীবনের একমাত্র দায়িত্ব সম্ভবত খবরের কাগজ পড়া। এই দায়িত্বটি তিনি খুব ভালভাবে পালন করেন। ইলেকশনের সময় এলে হঠাৎ দেখা যায় তিনি স্বতন্ত্র দল থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বাবার যুবক বয়সের কালো চশমা-পরা একটা ছবির পোস্টারে সারা নেত্রকোনা শহর ঢেকে ফেলা হয়। গুণ্ডা-পাণ্ডা ধরনের কিছু ছেলেপুলে এই সময় আমাদের বাড়িতে চা-নাশতা খেতে থাকে এবং হাতখরচ নিতে থাকে। তারা প্রত্যেকেই না-কি বিরাট অর্গানাইজার। এতসব অর্গানাইজার চারপাশে নিয়েও বাবা যথারীতি ফেল করেন। বেশির ভাগ সময়ই তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। ইলেকশনের রেজাল্টের পর তিনি দরজা বন্ধ করে ঘণ্টা দুই-তিনেক শুয়ে থেকে গম্ভীর মুখে মা'কে ডেকে বলেন, বুঝলে মিনু, এই দেশে রাজনীতি করে লাভ নেই, বরং ছাতা সেলাই করাতেও লাভ। রাজনীতি আর করব না। হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম— No more politics. যে দেশের মানুষ সৎ-অসৎ বুঝে না সেই দেশে কিসের পলিটিকস্‌ ?

মা জানতেন, আমরাও জানতাম, এগুলো বাবার কথার কথা। আবার কোন নির্বাচন চলে আসবে। বাবার চারপাশে কিছু লোকজন জুটে যাবে, যারা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বাবাকে বলবে— আরে চৌধুরী সাহেব, আপনি না দাঁড়ালে কে দাঁড়াবে! একটা-দু'টা সৎ মানুষ তো থাকা দরকার, যাদের পিছনে আমরা থাকব। সৎ মানুষের সঙ্গে হারতেও আনন্দ।

বাবা বলবেন, না না, ইলেকশনের নাম আমি শুনতে চাই না। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি কানে ধরেছি।

'চৌধুরী সাহেব, আপনার শিক্ষা হলে তো হবে না। দেশবাসীর একটা শিক্ষা হওয়া দরকার। এইবার আমরা জিতে এই শিক্ষাটা দিব।'

'না না, টাকাপয়সাও নেই।'

'টাকাপয়সা নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। দশের লাঠি একের বোঝা। এইবার আমরা পকেট থেকে পয়সা খরচ করে ইলেকশন করব। আপনাকে ঘর থেকে বের হতেও হবে না। আপনি দরজা বন্ধ করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান। দেখেন আমরা কি করি।'

বাবা তখন খানিকটা নরম হয়ে জিজ্ঞেস করেন— দাঁড়াচ্ছে কে কে কিছু খবর পেয়েছ ?

'যাঁরা দাঁড়াচ্ছে তারা কেউ আপনার নখের কাছাকাছিও না। আপনার সামনে চেয়ারে বসার যোগ্যতাও তাদের নেই। তারা একটা জিনিসই পারে— রিলিফের গম বেচে দেয়া। একজনের তো নামই পড়ে গেল আবদুল মজিদ গমচোরা।'

'মজিদ ইলেকশন করছে ? চক্ষুলজ্জাও দেখি নাই।'

'তবে আমরা আপনাকে বলছি কি ?'

বাবা নড়েচড়ে বসেন। গলা উঁচিয়ে আমাকে ডাকেন, নবু কইরে, তোর মা'কে বল চা বানাতে।

আমরা বুঝে ফেলি— আবারও বাবা কিছু ধানী জমি বিক্রি করবেন।

আমার দাদাজান মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানুষিক পরিশ্রম করে যে সম্মানজনক বিষয়-সম্পত্তি করে গিয়েছিলেন আমার বাবা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার সর্বনাশ করে যাচ্ছিলেন। সবই শেষ করে দিতেন, বড় মামার জন্যে পারলেন না। নেত্রকোনায় আমাদের একটা বড় ফার্মেসী, একটা রাইস কল এবং দু'টা বাড়ি বাবা অনেক চেষ্টা করেও বিক্রি করতে পারলেন না। পারলেন না মূলত বড় মামার জন্যে। মামা এইসব যক্ষের ধনের মত আগলে রাখতেন। বাবা ভীরু ধরনের মানুষ ছিলেন। বড় মামাকে যমের মত ভয় পেতেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করার মত সাহস তিনি কোনদিনই সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি।

আমার এই সরল ধরনের রাজনীতি পাগল বাবার কাছে এক সকাল বেলা আমার স্যার উপস্থিত হলেন। বাবা তখন বারান্দায় চায়ের এবং আগের দিনের বাসি কাগজ নিয়ে বসেছেন। স্যার বাবার সামনে বসলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।

www.BDeBooks.Com

বাবা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বল। বল।

'আমি আপনার বড় কন্যাকে বিবাহ করতে চাই।'

বাবার মুখ হা হয়ে গেল। তাঁর কোল থেকে খবরের কাগজ মাটিতে পড়ে গেল। এই সম্ভাবনা হয়ত তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বাবা বললেন, কি বললে ?

'আমি ওকে অত্যন্ত পছন্দ করি। সেও করে...।'

'কি বললে তুমি ? নবনী পছন্দ করে। নবনী নবনী...'

বাবা চটি ফটফট করে আমার খোঁজে এলেন। আমি তখন পড়তে বসেছি। বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মৌলনা এসব কি বলছে ?

আমি শঙ্কিত গলায় বললাম, কি বলছেন ?

'তোকে বিয়ে করার কথা বলছেন কেন ?'

'আমিতো জানি না বাবা কেন ?'

'এই হারামজাদার কথায় তো আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। বলে কি নবনী আমাকে পছন্দ করে। ব্যাটা তুই কোথাকার রসোগোলা যে আমার মেয়ে তোকে পছন্দ করবে ? তুই নিজেকে ভাবিস কি ? চাল নাই চুলা নাই। মানুষ হয়েছিস এতিমখানায় তুই কোন সাহসে এত বড় কথা বললি ?

বাবার চিৎকারে মা ছুটে এলেন, ইরা ছুটে এল। আমাদের কাজের মেয়ে বিন্তি এল। মা সব শুনে ভীত গলায়— ও এসব কেন বলছেরে নবনী ?

আমি বিড় বিড় করে বললাম, আমি জানি না মা।

ইরা বলল, আপা যে উনার কাছে রোজ দু'বেলা করে খাবার নিয়ে যায় এই জন্যেই বোধহয় তাঁর ধারণা হয়েছে আপা তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

বাবা বললেন, হাবুডুবু খাওয়া আমি বের করছি। কত বড় সাহস। কানে ধরে আমি তাকে চর্কি ঘুরান ঘুরাব।

আমি ভীত গলায় বললাম, এইসব করার কোন দরকার নেই বাবা— তুমি উনাকে বড় মামার কথা বল। বলে দাও বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার সব বড়মামা জানেন।

মা বললেন, এইটাই ভাল। লোক জানাজানি করার কোন দরকার নেই। আজেবাজে কথা ছড়াবে।

বাবা হুংকার দিলেন, ছড়াক কথা। আমি কি কাউকে ভয় পাই ?

নির্বোধ মানুষরা কাউকে ভয় পায় না। যা মনে আসে করে ফেলে। বাবাও তাই করলেন। স্যারের জিনিসপত্র নিজেই ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলতে লাগলেন। চারদিকে লোক জমে গেল। স্যার বললেন, আপনি অকারণে বেশি রকম উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি শান্ত হয়ে আমার দুটা কথা শুনুন।

বাবা হুংকার দিলেন, চুপ যথেষ্ট হয়েছে।

স্যার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘটনা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমন মুখরোচক ঘটনা মফস্বল শহরে সচরাচর ঘটে না। লোকজনদের উৎসাহের সীমা রইল না। সন্ধ্যা বেলায় চলে এল বাবার অতি পেয়ারের লোকরা। তারা গম্ভীর মুখে বলল, এইসব কি শুনছি চৌধুরী সাহেব ?

বাবা ফ্যাকাশে হাসি হেসে বললেন, কিছু না। কিছু না।

'শুনলাম আপনার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছে। অশ্লীল প্রস্তাব দিয়েছে।'

'না না এসব কিছু না। অন্য ব্যাপার।'

'জারজ সন্তানের কাছ থেকে এরেচে বেশি কি আশা করা যায়? এখন বলুন কি করব?'

'কিছু করার দরকার নেই। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। আর কি?'

'আপনি ক্ষমা করলেতো হবে না। আমাদের একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে না?'

'বাদ দেন। ঘটনা যা ভাবছেন তা না। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। ভদ্র ভাবেই দিয়েছিল।'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কোন দরকার নাই চৌধুরী সাহেব। ঘটনা সবই জানি। আপনি কাটান দেয়ার চেষ্টা করলেও লাভ হবে না। উচিত শিক্ষা দেয়া হবে।'

লোকজন বাড়তেই লাগল। সবাই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। মা আমাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখলেন। অন্তুকে পাঠানো হল পোস্টাপিস থেকে বড় মামাকে টেলিফোন করার জন্যে। তিনি যেন এক্ষুণি চলে আসেন।

রাত দু'টার দিকে হাজার হাজার মানুষ গিয়ে স্যারকে ধরে নিয়ে এল। আমি কাঁদছি এবং সমুদ্রের গর্জনের মত মানুষের গর্জন শুনছি। কি হচ্ছে বাইরে? সব কোলাহল ছাপিয়ে স্যারের গলা শুনলাম— আতংকে অস্থির হয়ে তিনি চিৎকার করে ডাকছেন— নবনী! নবনী।

তাঁকে তখন রাস্তায় ছুড়ে ফেলা হয়েছে। একদল মানুষ চেষ্টা করছে ইট দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিতে। মা ছুটে গেলেন স্যারকে বাঁচানোর জন্যে। ইরাও ছুটে গেল।

স্যারের মৃত্যু হয় সীমাহীন অপমান ও সীমাহীন যন্ত্রণায়। প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নেত্রকোনা হাসপাতালে। সেখানের ডাক্তাররা জবাব দেবার পর তাঁকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহে। পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে স্যারকে যে ট্রেনে ময়মনসিংহ নেয়া হচ্ছিল আমিও সেই ট্রেনেই বড় মামার সঙ্গে ময়মনসিংহ যাচ্ছি। অথচ আমি কিছুই জানতাম না। আমাকে বলা হয়েছে স্যার নেত্রকোনা হাসপাতালে আছেন। মাথায় চোট পেয়েছেন তবে এখন ভাল হওয়ার পথে। ভয়ের কিছু নেই।

সে বছর আমার পরীক্ষা দেয়া হয় নি, কারণ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে অসুখ বিচিত্র এবং ভয়াবহ। আমি মাঝে মাঝেই কাউকে চিনতে পারতাম না। পরিচিত কারো সঙ্গে হয়ত কথা বলছি, হঠাৎ এক সময় অস্বস্তি এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, যার সঙ্গে কথা বলছি তাকে চিনতে পারছি না। ভয়ে শরীর যেন কেমন করতে থাকে। আমি কথা বলা বন্ধ করে দেই, আর তখনি দেখি দু'-তিনটা কাক অপরিচিত মানুষটার চারদিকে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। এদের মধ্যে একটা কাককে আমি চিনি— বুড়ো কাক। কাকগুলো হাঁটে অবিকল মানুষের মত। যেন এরা কাক

www.BDeBooks.Com

না। ছোট ছোট মানুষ যারা কালো রঙের চাদর গায়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আমি স্যারকেও দেখতাম—। তাঁকে দেখে মোটেও ভয় লাগত না। বরং ভরসা পাওয়া যেত। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন এমনভাবে যেন তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। আমরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত খুব ঘরোয়া ধরনের। যেমন, তিনি এসে বললেন, নবনী, পেন্সিলটা কোথায় রাখলাম দেখেছ ?

আমি বললাম, না তো। কলম আছে। কলমে হবে ?

'না, হবে না। আমার দরকার পেন্সিল। একটু আগে কাজ করছিলাম। হঠাৎ কোথায় গেল! বাবু নিয়ে যায় নি তো ?'

'নিতে পারে।'

'ছেলে তো বড় দুষ্ট হয়েছে। ডাক তো দেখি। আজ একটা ধমক দেব।'

'না না, ধমকাতে পারবে না। ছেলেমানুষ।'

'অতিরিক্ত আদর দিয়ে তুমি ওকে নষ্ট করছ।'

'নষ্ট করছি ভাল করছি। আরো নষ্ট করব।'

'এ কি! রেগে গেলে কেন ?

'রেগেছি ভাল করেছি। আরো রাগব...'

আমাদের সঙ্গে সব সময় একটা শিশু থাকত। কখনো সে ছেলে, তার নাম বাবু; কখনো-বা মেয়ে, নাম টিনটিন। এদের অবশ্যি আমি কখনো দেখি নি।

আমি কতদিন অসুখে ভুগেছি আমি নিজেও জানি না। কেউ আমাকে কখনো পরিষ্কার করে কিছু বলে নি। আমি শুধু অস্পষ্টভাবে জানি, আমার এই অসুখ দীর্ঘদিন ছিল। বড় মামা আমাকে চিকিৎসা করান। আমার পেছনে টাকা খরচ হয় জলের মত। তিনি তাঁর চাকরি টাকরি বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকতেন। কেউ যেন অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বিরক্ত করতে না পারে সে জন্যে ঐ বাসার ঠিকানাও তিনি কাউকে দেন নি। বাবা-মা, ইরা, অন্তু কেউই আমাকে দেখতে যেতে পারত না। এক সময় আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বড় মামা আমাকে ফিরিয়ে দেন বাবা-মা'র কাছে।

বড় মামা সব সময়ই কম কথার মানুষ। আমাকে সুস্থ করে বাবা মা'র কাছে রেখে যাবার সময় হঠাৎ তাঁর কি হল, তিনি বললেন, বড় খুকী, আয় তোকে আদর করে যাই। আমি এগিয়ে গেলাম। বড় মামা গম্ভীর গলায় বললেন, শোন্ বড় খুকী, তুই নিশ্চিন্ত মনে থাকবি। তোর অসুখটা পুরোপুরি সেরে গেছে। আর কোনদিন হবে না। ডাক্তাররা আমাকে বলেছেন। তারচেয়েও বড় কথা, আমি খাস দিলে আল্লাহ্পাকের কাছে দোয়া করেছি। আমার দোয়া আল্লাহ্পাক কবুল করেছেন। বুঝলি বড় খুকী, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন মাগরেবের ওয়াক্তে শুধুই তোর জন্যে দু'রাকাত নফল নামায পড়ব। আচ্ছা এখন যা।

আমি বললাম, আদর করবার জন্যে ডাকলেন— কই আদর তো করছেন না।

বড় মামা হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন না বা মাথায়ও হাত রাখলেন না। তিনি যেভাবে বসেছিলেন সেভাবেই বসে রইলেন। শুধু দেখা

গেল, তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে বললেন, ট্রেনের সময় হয়ে গেল, চলি রে।

৮

প্রায় ন' মাস পর বাড়িতে গিয়েছি।

নিখুঁত হিসাব হল আট মাস সতেরো দিন। নোমান আমার সঙ্গে আসতে পারে নি। তার ছবির কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের না-কি দু' মাসের মধ্যে ছবি শেষ করতে হবে। চল্লিশ মিনিটের ছবি। তারা চেকোস্লোভাকিয়ায় শর্ট ফ্লিম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাবে। সময় পেলে ইংরেজিতে ডাব করবে। সময় না পেলে সাব টাইটেল করা হবে।

নোমানের উৎসাহ এবং ব্যস্ততা দেখার মত। মনে হচ্ছে সে-ই ছবির পরিচালক, সে-ই নায়ক এবং সে-ই ক্যামেরাম্যান। যদিও আমার ধারণা তার মূল কাজ ছোটাছুটি করা এবং অন্যদের ধমক খাওয়া। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই মনে হয় এদের ধমক দিলে এরা রাগ করবে না। এদের ধমক দেয়া যায়। শুধু ধমক না, অতি তুচ্ছ কাজও এদের দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়। নোমান সেই জাতীয় একজন মানুষ।

আমাদের সঙ্গে মদিনাও দেশের বাড়িতে যাচ্ছে। তার গায়ে নতুন জামা। পায়ে নতুন রবারের জুতা। তার আনন্দ চোখে দেখার মত। মনে হচ্ছে এই মেয়েটির জীবনে এমন আনন্দময় মুহূর্ত আর আসে নি।

আমাদের নিয়ে যাচ্ছে অন্তু। নোমান স্টেশনে তুলে দিতে এসেছে। ট্রেন আজ এক ঘণ্টা লেট আমরা অনেক আগে ভাগে এসে পড়েছি। নোমানের মুখ শুকনো। বুঝতে পারছি তার মন খারাপ লাগছে। সে এই মন খারাপ ভাবটা লুকাতে পারছে না। সে অন্তুকে বলল, তোমাদের টিকিট দুটা দাওতো অন্তু।

অন্তু বলল, টিকিট দিয়ে কি করবেন ?

'আহা দাও না।'

অন্তু টিকিট দিল। সে টিকিট নিয়ে হন হন করে চলে গেল। অন্তু বলল, আপা দুলাভাই টিকিট দিয়ে কি করবে ?

আমি বললাম, জানি না।

'দুলাভাই সঙ্গে গেলে খুব ভাল হত সবাই আশা করে আছে, তোমরা দু'জন একসঙ্গে যাবে।'

'ছবি নিয়ে ব্যস্ত। ছবি না থাকলে যেত।'

'কি ছবি ?'

'ওর বন্ধু একটা শর্ট ফ্লিম বানাচ্ছে।'

'তাতো জানি। গল্পটা কি ?'

'নির্দিষ্ট কোন গল্প নেই। গ্রামের একটা মেয়ে পুকুরে গোসল করতে করতে একসময় ঠিক করল সে তার স্বামীকে খুন করবে। ঠিক করার পর থেকে খুন করার আগ পর্যন্ত মেয়েটার মনের অবস্থা।'

www.BDeBooks.Com

'স্বামীকে খুন করবে কেন?'

'সেটা কখনো বলা হয় না। ছবির জন্যে এটা না-কি অপ্রয়োজনীয়।'

'অভিনয় কারা করছে?'

'একজনই অভিনেত্রী। সফিক সাহেবের স্ত্রী অভিনয় করছেন। তাঁর নাম অহনা।'

'ছবিটা কি ভাল হচ্ছে?'

'নোমানের ধারণা অসাধারণ হচ্ছে। এই ছবি দেখলে না-কি মৃণাল সেনের ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে যাবে। সত্যজিৎ রায়ের মাইন্ড স্ট্রোক হবে।'

নোমান আসছে। তার হাতে একগাদা ম্যাগাজিন। দু' প্যাকেট বিসকিট। পানির বোতল। অন্তু বলল, টিকিটগুলো কি করলেন দুলাভাই?

'চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছি। ফার্স্টক্লাস করে আনলাম। আরাম করে যাও। তোমরা চা খাবে না-কি?'

অন্তু বলল, না।

'ট্রেন ছাড়তেতো এখনো দেরী আছে চল না যাই। এখানে ভাল রেস্টুরেন্ট আছে।'

অন্তুর যাবার তেমন ইচ্ছা নেই। আমি বললাম, অন্তু তুই জিনিসপত্র নিয়ে এখানে বসে থাক। আমি চা খেয়ে আসি, আমার চা খেতে ইচ্ছা করছে।

আমরা চা খেলাম। ও একটা সিগারেট ধরিয়ে শুকনো মুখে টানতে লাগল। আমি বললাম, তুমি কি ছবি বানানোর এক ফাঁকে চলে আসতে পারবে?

'মনে হয় না। আমি চলে এলে কাজ কর্মের খুব ক্ষতি হবে।'

'ক্ষতি হলে থাক।'

'এদিকে অহনাকে আবার সামলে সুমলে রাখতে হয়। ওর মেজাজেরতো কোন ঠিক নেই।'

'তুমি ছাড়া আর কেউ ওকে সামলাতে পারে না?'

'তা না। ও আমার কথা শুনে। অনেকদিন থেকে দেখছি তো।'

'ও আচ্ছা।'

'তারপর ধর হঠাৎ তার মাথায় এসে গেল কোন একজন পামিস্টের কাছে যাবে তখন তাকে সেখানে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে?'

'সেটা বিরাট সমস্যাতো বটেই। তাহলে তুমি একটা কাজ কর তাঁকে বল নেত্রকোনায় বড় একজন পামিস্ট আছে তাহলে দেখবে সব ছেড়ে ছুড়ে তোমাকে নিয়ে নেত্রকোনায় চলে আসবে।'

সে কিছু বলল না। চুপ করে রইল। আমি বললাম, ট্রেন ছাড়তে কত দেরি?

'এখনো কুড়ি মিনিট। আরেক কাপ চা খাবে?'

আমি বললাম, খাব। আর দেখতো আমার জ্বর কি-না কেমন জানি জ্বর জ্বর লাগছে। সে আমার আমার কপালে হাত রেখে বলল, জ্বর নাতো!

আমি হেসে ফেললাম। সেও হাসল। জ্বর দেখার আমাদের এই পুরানো এবং একান্ত গোপন কৌশল ব্যবহার করতে এত ভাল লাগে। রেস্টুরেন্ট ভর্তি মানুষ— এরা কেউ কিচ্ছু ভাববে না। সবাই জানবে একজন অসুস্থ মানুষের জ্বর পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ও প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে। ওর দিকে তাকাতে আমার খুব কষ্ট লাগছে। আমি ব্যস্ত হয়ে ম্যাগাজিনের ছবি দেখছি। শুধু অন্তু গলা বের করে খুব হাত দুলাচ্ছে। হঠাৎ অন্তু বিস্মিত গলায় বলল, আপা দেখ দেখ দুলাভাই কাঁদছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ও সত্যি সত্যি পাঞ্জাবীর হাতায় চোখ মুছছে। আমাকে দেখে সে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আমি অন্তুকে বললাম, তোর দুলাভাইকে এইভাবে হাঁটতে নিষেধ কর— পরে হুমড়ি খেয়ে ট্রেনের চাকার নিচে পড়বে।

বলতে বলতে আমার গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। ট্রেনের গতি বাড়ছে আমার মনে হচ্ছে আমি এই পৃথিবীর সব প্রিয়জন ছেড়ে—অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। ট্রেনের চাকায় ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। ট্রেনটা যেন তালে তালে বলছে— ভালবাসি। ভালবাসি।

আমাকে দেখে বাড়িতে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন, মরা কান্না জুড়ে দিলে কেন? বড়ই যন্ত্রণা হল তো। ইরা তোর মা'কে নিয়ে যাতো। মা আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

কেউ আমাকে ছাড়ছে না। সবারই মনে অসংখ্য কথা জমা হয়ে আছে। সবাই আমাকে একসঙ্গে সব কথা শুনাতে চায়।

ইরা চাচ্ছে আমাকে নিয়ে ছাদে চলে যেতে। তার নাকি অসম্ভব জরুরি কিছু কথা এক্ষুণি না বললেই না। তার জরুরি কথার আভাস পেয়েছি। মা কাঁদতে কাঁদতেই এক ফাঁকে আমাকে বলে ফেলেছেন। ইরার ভাঙা বিয়ে আবার জোড়া লেগেছে। ইরার ভাবি বর না-কি বলেছে, এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। প্রয়োজন হলে সবার অমতে সে কোর্টে বিয়ে করবে।

এদিকে বাবারও অনেক কথা বলার আছে— তিনি আবার ইলেকশন করবেন বলে স্থির করেছেন। তবে এবার স্বতন্ত্র না। আওয়ামী লীগের টিকিটে। নমিনেশন পাওয়া যাবে এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

'বুঝলী নবনী ময়মনসিংহের যে কুদ্দুস সাহেব আছেন এডভোকেট। উনি হলেন বঙ্গবন্ধুর ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। শেখ হাসিনা তাঁকে দেখলে ছুটে এসে কদমবুচি করেন। কুদ্দুস সাহেবই বললেন, নমিনেশনের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। এটা কোন ব্যাপারই না।'

আমি বললাম, আওয়ামী লীগের টিকিট পেলেতো মনে হয় জিতে যাবে।

www.BDeBooks.Com

'জেতাটা বড় কথা না। ইলেকশনে জেতা আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য এই দেশের জন্যে কিছু করা। বড়ই অভাগা দেশ।'

'তুমি এবার তাহলে খুব জোড়ে সোড়ে ইলেকশন করছ ?'

'মানুষের চাপে পড়ে করতে হচ্ছে। সবাইতো চায় সৎ লোক পাস করে আসুক। চাওয়াটাতো অন্যায় না।'

'তাতো বটেই।'

'এদিকে তোর বড় মামা চিঠি লিখেছে আমি যেন ইলেকশন নিয়ে মাথা না ঘামাই। কঠিন ভাষায় লেখা চিঠি। আশ্চর্য কথা আমি কি করব না করব এটা বাইরের একজন এসে বলে দেবে কেন ?'

'বড় মামাতো বাইরের কেউ না বাবা।'

'অবশ্যই বাইরের। আর বাইরের না হলেও আমার স্বাধীন চিন্তায় তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। ফার্মেসি থেকে এক পয়সা আয় হয় না— বিক্রি করে দিতে চাচ্ছি বিক্রি করতে দেবে না। এই সম্পত্তিগুলো আমার না তাঁর তাইতো বুঝলাম না।'

সবচে ভাল লাগছে ইরাকে দেখতে। সে খুব সুন্দর হয়েছে। মনে হচ্ছে এই আটমাসে সে খানিকটা লম্বাও হয়েছে। ইরা ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছে। গা ধুতে বাথরুমে গিয়েছি সে তোয়ালে হাত বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এত কথাও থাকে একটা মানুষের পেটে ? তার সব কথাই তার বিয়ে নিয়ে। সব নদী যেমন সমুদ্রে পড়ে তার সব কথাই তেমনি বিয়েতে গিয়ে শেষ হয়।

'বুঝলে আপা একদিন সন্ধ্যাবেলা ছাদে হাঁটছি— নতুন কাজের মেয়েটা এসে বলল, "একটা লোক আসছে আপনারে ডাকে।" আমিতো অবাক! এই সন্ধ্যাবেলা আমাকে কে ডাকবে। নিচে নেমে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ও বসে আছে।'

'ও টা কে ?'

'ওটা কে তুমিতো বুঝতেই পারছ। আমি স্তম্ভিত। বিয়েতো ভেঙেই গেছে। এখন আমার সঙ্গে কি কথা ? রাগও লাগছে। এদিকে দেখি বাবু আবার খুব সেজে গুজে এসেছেন। গায়ে সেন্ট দিয়েছেন। সেন্টের গন্ধে চারদিক ভুড় ভুড় করছে। আমি ভাণ করলাম যেন চিনতে পারছি না। বললাম, আপনি কাকে চাচ্ছেন ? হি হি হি...'

স্যার যে ঘরে থাকতেন সেখানে দেখি একজন কে। অল্প বয়সী একটা ছেলে। ব্যাংকে চাকরি করে। একদিন তাঁকে দেখতে গেলাম। আপা বসুন, আপা বসুন বলে সে খুব খাতির যত্ন করল। আমি বললাম, আপনার কাছে কি একটা বুড়ো কাক আসে ?

সে বিস্মিত হয়ে বলল, কাক আসবে কেন ?

আমি বললাম, এম্নি বলেছি। ঠাট্টা করছি।

রাতে ঘুমের সময় খুব অসুবিধা হতে লাগল। মা আমার সঙ্গে ঘুমাতে চান। ইরা কিছুতেই দেবে না। সে আমার সঙ্গে শুবে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবে। আমাকে চোখের পাতা এক করতে দিবে না।

মা একদিন সুযোগ পেলেন। গভীর রাতে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেন, কোন খবর আছে রে মা ?

'কি খবর জানতে চাও মা ?'

'নতুন কোন খবর। খোকা খুকুর খবর।'

'চুপ করতো মা।'

'বল না রে মা। আছে কোন খবর ?'

'তুমিতো বড্ড বিরক্ত করছ মা। সেদিন মাত্র বিয়ে হল এখনই কিসের খবর।'

'আমি যে স্বপ্নে দেখলাম।'

'রাখতো তোমার স্বপ্ন। ঘুমাও।'

মা ক্লান্ত গলায় বললেন, তোর একটা খোকা খুকু হলে বেশ হয়। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত বিয়েকে বিয়ে বলে মনে হয় না।

'মা চুপ করবে ?'

'নবনী তোর অসুখটা তো আর হয় না ?'

'না।'

'আর হবে না। আচ্ছা শোন জামাই কি তোর স্যারের ব্যাপারে কোনদিন কিছু জানতে চেয়েছে ?'

'না।'

'এতদিন যখন চায় নি আর চাইবে না।'

'মা ঘুমাও।'

মা ঘুমালেন না। অনেক রাত পর্যন্ত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সাতদিনের জন্যে বাড়ি গিয়েছিলাম। সাতদিনের জায়গা দশদিন কাটিয়ে ফিরছি। রওনা হবার সময় মার কাছে একটা চিঠি লিখে গেছি। শর্ত হচ্ছে এই চিঠি মা ট্রেন ছাড়ার আগে পড়তে পারবে না।

চিঠিতে লিখেছি—

মা, তুমি খবর জানতে চেয়েছিলে। হ্যাঁ খবর আছে। তুমি ঠিকই স্বপ্নে দেখেছ। মুখে বলতে লজ্জা লাগল। তোমার পায়ে পড়ি মা— আর কাউকে জানিও না।

৯

মানুষের চরিত্রের একটা অংশ উদ্ভিদের মত।

উদ্ভিদ যেমন মাটিতে শিকড় ছেড়ে দেয়, মানুষও তাই করে। কিছু দিন কোথাও থাকা মানে সেখানে শিকড় বসিয়ে দেয়া। মাটি যদি চেনা হয় আর নরম হয় তাহলেতো কথাই নেই।

www.BDeBooks.Com

দশদিন মা'র কাছে ছিলাম। এই দশদিনে শিকড় গজিয়ে গেল। সেখান থেকে উঠে আসা মানে শিকড় ছেড়ে উঠে আসা। কি তীব্র কষ্ট। পুরুষরা এই কষ্টের স্বরূপ জানে না। এই কষ্ট আরো অনেক কষ্টের মত একান্তই মেয়েদের কষ্ট।

আমি এসেছি একা। অন্তুর আমাকে নিয়ে আসার কথা ছিল। সে হঠাৎ জ্বরে পড়ায় তাকে রেখে এসেছি। বাবা তাঁর একজন চেনা লোককে বলে দিয়েছিলেন। তিনিও ঢাকায় আসছেন। তাঁর উপর দায়িত্ব আমার দিকে লক্ষ্য রাখা। ভদ্রলোক শুধু যে লক্ষ্য রাখলেন তাই না। একেবারে আমাদের বাসার দরজায় নামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, চাচা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখন আপনি চলে যান।

উনি বললেন, মা তুমি দরজা খুলে ভেতরে ঢোক তারপর যাব। কড়া নাড়তেই নোমান এসে দরজা খুলে দিল। সে অপ্রসন্ন মুখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি ভদ্রতা করে বললাম, আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন ? চা খেয়ে যাবেন ?

তিনি বললেন, না। আমি পরশুদিন নেত্রকোনা চলে যাব। তোমার বাবাকে বলব তুমি ঠিক মত পৌঁছেছ।

'জ্বি আচ্ছা।'

নোমান আমার স্যুটকেস, ব্যাগ ভেতরে এনে রাখছে। তার মুখ এমন অন্ধকার হয়ে আছে কেন কিছু বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, তুমি ভাল ছিলে ?

সে বলল, হ্যাঁ।

'সাত দিনের জায়গায় দশদিন থেকে এলাম। রাগ করনিতো ? তারা কিছুতেই ছাড়বে না। অতিথপুর থেকে আমার ছোটখালা এসেছিলেন উনি আবার একদিনের জন্যে অতিথপুর নিয়ে গেলেন।'

'মদিনা। মদিনাকে আনলে না ?'

'ও আসল না। ওর না-কি এখানে থাকতে ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগালাগির কি আছে ? থাকবে বেতন পাবে।'

'তুমি এমন রেগে আছ কেন ?'

'রেগে আছি কোথায় ?'

'চোখ মুখ শক্ত করে আছ। জ্বর-টর নাতো— দেখি কাছে আসতো ?'

ও কাছে এল না। ভুরু কুচকে তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। চুলার কাছে যেতে ভাল লাগছে না। ফ্লাস্কে করে একটু চা এনে দেবে ?

সে কিছু না বলে ফ্লাস্ক হাতে বের হয়ে গেল। আমার কাছে সব কেমন যেন অন্য রকম মনে হতে লাগল। ঘরের সাজ-সজ্জাও পাল্টানো। খাটটা জানালার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। জানালার কাছে এখন দু'টা বেতের চেয়ার।

ড্রেসিং টেবিলটার জন্যে ঢাকনি বানানো হয়েছে। কোন জানালার আগে পর্দা ছিল না। পর্দার প্রয়োজনও ছিল না। বাইরে থেকে কিছু দেখা যেত না।

এখন দেখি সব কয়টা জানালায় বেগুনি রঙের পর্দা। এমন কি বাথরুমের জানালায় পর্দা ঝুলছে।

সবচে যেটা আশ্চর্যের ব্যাপার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। ও ফ্যান কিনেছে। শুধু ফ্যান না ওয়ার্ড ড্রোবের উপর একটা ক্যাসেট প্লেয়ার।

নোমান চা নিয়ে ফিরে এলো। চায়ের সঙ্গে গরম জিলিপী। আমি দেখলাম তার মুখের কঠিন ভাবটা আর নেই। সে চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আগে চা খাও। চা খেয়ে তারপর জিলাপী খাও। আগে জিলাপী খেলে চায়ের স্বাদ পাবে না। তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে নবনী। বাপের বাড়িতে খুব আরামে ছিলে, তাই না?'

'হুঁ। তুমি কি কষ্টে ছিলে?'

'কষ্ট মানে— দোজখের ভেতর ছিলাম। সফিক আর অহনার মধ্যে এমন ঝামেলা বেঁধে গেল। স্যুটিং ফুটিং কিছুই হয় নাই।'

'তুমি মিটমাটের চেষ্টা চালাচ্ছ না?'

'চালাচ্ছি। কাজ হবে কি-না বুঝতে পারছি না। সফিক এখন আমাকেও ঠিক বিশ্বাস করে না। অবশ্যি বিশ্বাস না করার কারণ আছে। অহনা করল কি সফিকের সঙ্গে ঝগড়া করে রাত দুপুরে আমার এখানে এসে উপস্থিত। আমার বাসায় না-কি লুকিয়ে থাকবে। লুকিয়ে থাকার জন্যে এইটাই না-কি আদর্শ জায়গা। সফিক সব জায়গায় খুঁজবে এইখানে খুঁজবে না।'

'তুমি রাজি হলে?'

'রাজি না হয়ে উপায় আছে? অহনাকে তুমি এখনো চিনলে না।'

'ক'দিন ছিল?'

'দু' রাত ছিল। দু' রাতের জন্যে পর্দা দিতে হয়েছে। ফ্যান লাগাতে হয়েছে। রাতে গান না শুনলে তার ঘুম আসে না। শেষে একটা ক্যাসেট প্লেয়ার কিনে আনতে হল। অহনা টাকা দিল। এতটুকু একটা জিনিস দাম নিয়েছে ন' হাজার টাকা।'

'গান শুনবে নবনী?'

'শুনব।'

নোমান খুমি মনে ক্যাসেট চালু করে দিল। নিচু গলায় গান হতে লাগল—

আমি কেবলই স্বপন
করেছি বপন বাতাসে
তাই আকাশ কুসুম
করিনু চয়ন হতাশে ॥

'নবনী!'

'কি?'

'অহনার সঙ্গে থেকে থেকে আমারো বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে। রাতে গান না শুনলে ঘুম আসে না। এসব বড়লোকী অভ্যাস কি আর আমাদের মত গরিবের পোষায়?'

www.BDeBooks.Com

'অহনা যে তোমার এখানে ছিলেন সফিক সাহেব টের পান নি ?'

'পাগল কোত্থেকে টের পাবে ? সফিক চলে পাতায় পাতায় অহনা চলে শীরায় শীরায়। তবে দু'রাত ছিল বলে রক্ষা। এরচে বেশি থাকলে ধরা পড়ে যেত। থার্ড নাইটে রাত একটার সময় সফিক এসে উপস্থিত। অহনার একটা খোঁজ না-কি পাওয়া গেছে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি মনে মনে বলি আল্লাহ্ রক্ষা করেছে।

'এখন উনি কোথায় আছেন ?'

'জানি না কোথায়। আমি জানি না, সফিকও জানে না তবে সফিকের বোধহয় ধারণা হয়েছে আমি জানি তার কাছে লুকাচ্ছি।'

রাতের খাবার জন্যে ভাত রাঁধতে বসেছি নোমান পাশে এসে বসল। নরম গলায় বলল, জার্নি করে এসেছ এখন চুলার কাছে বসতে হবে না। চল বাইরে কোথাও যাই খেয়ে আসি। চাইনিজ খাবার আমার অসহ্য লাগে— তবু চল যাই।

আমরা বাইরে খেতে গেলাম। ও খাবারের মেনু অনেকক্ষণ চোখের সামনে ধরে রেখে বলল, শালার দাম কি রেখেছে। খেয়ে না খেয়ে দাম। একবাটি স্যুপ তার দাম একশ কুড়ি টাকা। পানি ছাড়া এর মধ্যে আর কি আছে। নবনী চল এক কাজ করি এক বাটি স্যুপ খেয়ে চলে যাই। টাকা পয়সা এখন খুব সাবধানে খরচ করতে হবে। আমার ধারণা সফিক আমার চাকরি নট করে দেবে। গেট আউট করে দেবে।

নোমান চিন্তিত মুখে স্যুপ খাচ্ছে। আমার খুব মায়া লাগছে। আহা বেচারা। শুধু স্যুপে কি তার পেট ভরবে ?

'নবনী!'

'কি ?'

'অচেনা একটা লোককে নিয়ে বাসায় এসেছিলে রাগে আমার গা জ্বলে গেছে। ঐ দিন অফিসে এক লোক এসে উপস্থিত। তোমাদের ওদিকে বাড়ি। তোমাদের সবাইকে চেনে। আমি যত্ন করে বসায়েছি—চা খাইয়েছি তারপর ব্যাটা বলে কি নবনীর প্রথম পক্ষের সন্তানটি কি আপনার সঙ্গে থাকে ?'

'তুমি কি বললে ?'

'আমিতো হতভম্ব। সফিক আমার সঙ্গে ছিল সে বল, হ্যাঁ ওর সঙ্গেই থাকে। কেন দেখা করতে চান ? শুধু যে এই একজন তা না। আগেও আরেকজন এসেছে আমাকে পায় নাই অফিসের লোকজনের সঙ্গে গল্প করে গেছে বিশ্রী সব কথাবার্তা।'

আমি চুপ করে আছি। নোমান বলল, স্যুপ খেয়ে ক্ষিধে আরো বেড়ে গেল। একি যন্ত্রণা বল দেখি। একটা ফ্রায়েড চিকেন নিয়ে নিই ?

'না।'

নবনী তুমি আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছ। এত সুন্দরী বৌ পাশে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে অস্বস্তি লাগে। লোকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি

তোমাদের বাড়ির দারোয়ান। তুমি বাইরে বেরুবার সময় সাজগোজ একেবারেই করবে না।

'আচ্ছা যাও করব না।'

'এত ভাল লাগছে তোমাকে দেখে।'

আমি বললাম, আমাকে দেখে এত ভাল লাগছে তাহলে আজ আমাকে দেখে মুখটা এমন কাল করে ফেলেছিলে কেন ?

মন মেজাজ অসম্ভব খারাপ। সফিক চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে খাব কি ? একা থাকলে অসুবিধা ছিল না। এখন আমরা দু'জন।

আমি চাপা গলায় বললাম, বাড়তেও পারে। কিছু দিন পর হয়ত দেখা যাবে তিনজন।

নোমান বলল, হ্যাঁ তাতো হবেই। চাকরি চলে গেলেতো ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

'ভিক্ষা করতে হলে করব। এই দেশে ভিক্ষা করা এমন অন্যায় কিছু না। সবাই ভিক্ষা করছে। আমরাও না হয় করব। তুমি এখন আরাম করে খাওতো। শুধু শুধু চিকেন খাবে কি করে কিছু ভাত নাও।'

নোমান হাসি মুখে বলল, যা থাকে কপালে চল খাই। খাওয়া দাওয়ার পর আইসক্রীম খাব। আইসক্রীম খেতে ইচ্ছা করছে। যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন খরচ হচ্ছে যখন হোক।

রাতে দু'জন ঘুমাতে গেছি। নোমান গান দিয়ে দিয়েছে। আমি বললাম, গান থাক। এসো তোমাকে দারুন আরেকটা খবর দেই।

'কি খবর ?'

'দিচ্ছি এত তাড়া কিসের ? তুমি আগে আমাকে একটু আদর কর। তারপর খবর শুনবে। আচ্ছা আমি যে কিছুদিন পাগল ছিলাম তা-কি তুমি জান ?'

'জানব না কেন। জানি।'

'কে বলেছে ?'

'অহনা বলেছে।'

'উনি কি ভাবে জানেন ?'

'অহনা সব জানে। তোমার সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হল তখনি সব খোঁজ খবর করেছে। তারপর বলেছে— মেয়েটা বেশ কিছুদিন মাথা খারাপ অবস্থায় ছিল। এখন সুস্থ, তুমি বিয়ে করতে পার, ভাল মেয়ে। বেশ ভাল।'

'আমি কঠিন গলায় বললাম, তিনি অনুমতি দিলেন। তারপর তুমি বিয়ে করলে ?'

নোমান জবাব দিল না। আমি ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তৃপ্তির ঘুম।

www.BDeBooks.Com

১০

ক্রিং ক্রিং করে করিং বেল বাজছে।

আমাদের বাসায়তো কলিংবেল ছিল না। কলিং বেল কোত্থেকে এল ? নতুন কলিং বেল লাগিয়েছে না-কি ? আমি অবাক হয়েই দরজা খুললাম। কে এসেছে সেটা দেখার চেয়ে কলিং বেলটা দেখার জন্যেই আমার আগ্রহ বেশি।

দরজা খুলে দেখি সফিক সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আজো তাঁর গায়ে নীল হাফ সার্ট। তিনি কি নীল রঙের সার্ট ছাড়া আর কিছু পরেন না ? তিনি চোখের সানগ্লাস খুলতে খুলতে বললেন, কেমন আছ নবনী!

আমি বললাম, ভাল।

'কর্তা কোথায় ?'

'ও বাজারে গেছে। কাচা বাজারে।'

'আমি কি অপেক্ষা করব তার জন্যে ?'

'জ্বি বসুন। ওর আসতে মনে হয় দেরি হবে। হেঁটে গেছে। হেঁটে ফিরবে।'

সফিক সাহেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, হোক একটু দেরি। এই ফাঁকে আমি বরং তোমার হাতের চা খাই। নোমানের ধারণা এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে ভাল চা আর কেউ বানাতে পারে না।

তিনি সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলেন। বসলেন বারান্দায়। আমি বললাম, আপনি ভেতরে গিয়ে বসুন। বারান্দায় বসেছেন কেন ?

'কারো শোবার ঘরে ঢুকতে ভাল লাগে না। শোবার ঘর হচ্ছে খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত না। তোমাদের বারান্দাটা সুন্দর।'

আমি চা বানিয়ে দিয়েছি। একটু অস্বস্তি লাগছে কারণ শুধু চা দিতে হয়েছে। ঘরে কিচ্ছু নেই। একটা কিছু থাকলে ভাল হত। আমি দেখেছি খুব যারা বড়লোক তারা সাধারণ খাবার বেশ আগ্রহ করে খায়। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, নবনী! আমি নোমানের কাছে আসি নি। আমি আসলে তোমার কাছেই এসেছি। অফিস থেকে দেখলাম নোমান বাজারের ব্যাগ হাতে বেরুল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে চলে এসেছি। যাতে ওর সঙ্গে দেখা না হয়।

আমি শঙ্কিত গলায় বললাম, আমাকে কিছু বলবেন ?

'হ্যাঁ। লম্বা বক্তৃতা দেব। ধৈর্য ধরে তোমাকে শুনতে হবে। কথার মাঝখানে হাই তুলতে পারবে না। দেখ নবনী, আমি নোমানকে খুব পছন্দ করি। সে হচ্ছে জটিলতা বিহীন একজন মানুষ এবং ইন্টারেস্টিং মানুষ। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি তারপর আর কোন যোগাযোগ ছিল না। একদিন গাড়ি কিনতে বিজয় নগরের একটা শো রুমে গিয়েছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক গম্ভীর ভঙ্গিতে লেটেস্ট মডেলের গাড়ির দরদাম করছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, নোমান না ? এখানে কি করছিস ?

সে লজ্জিত গলায় বলল, কিছু করছি না।

'আমাকে চিনতে পারছিস তো ?'

'পারছি সফিক।'

'চাকরি বাকরি কি করছিস ?'

'কিছু করছি না।'

'বেকার ?'

'হুঁ বেকার।'

'গাড়ি দাম করছিস কি জন্যে ?'

সে হাসল। আমি বললাম, দে তুই পছন্দ করে একটা গাড়ি কিনে দে। আজ তোর পছন্দেই কিনব।

সেই থেকে সে আমার সঙ্গে আছে। Unconditional loyalty বলে একটা ব্যাপার আছে যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী কুকুরের মধ্যে খানিকটা আছে। সেই শর্তহীন আনুগত্য আছে নোমানের মধ্যে। পাশবিক গুণ হলেও এটা অনেক বড় গুণ। নোমানকে পছন্দের আমার এই একটা কারণ।

সম্প্রতি তার মধ্য আমি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সে আমার কাছে অনেক কিছু গোপন করছে। যেটা আমার একেবারেই পছন্দ না। আমি খুব রাগ করেছি। অসম্ভব রাগ করেছি।'

সফিক সাহেব থামলেন। সিগারেট ধরালেন।

আমি বললাম, আপনি কি ওকে বিদেয় করে দিচ্ছেন ?

'হ্যাঁ দিচ্ছি। সে জানে আমি অহনার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি। তারপরেও সে তাকে তার বাসায় লুকিয়ে রাখে অথচ আমাকে কিছুই বলে না। সে আমাকে বোকা ভাবে। মনে করে আমার বুদ্ধিও তার স্তরে। অথচ আমি তার ঘরে পা দিয়েই বুঝেছি অহনা এখানেই ছিল। বেগুনি ওর প্রিয় রঙ। বেগুনি রঙের পর্দা নোমানের ঘরে ঝুলবে আর আমি কিছুই বুঝব না ?'

আমি বললাম, সফিক ভাই আপনি এসব কথা ওকে সরাসরি না বলে আমাকে বলছেন কেন ?

'তোমাকে বলছি তার কারণ আছে। অহনা একটা ভয়ঙ্গর খেলা খেলার চেষ্টা করছে। এই খেলায় নোমানের একটা ভূমিকা আছে। সে তা জানে না। সে কিছুই বুঝতে পারে না। সে জানে না যে অহনা তার ভ্যানিটি ব্যাগে ইদানীং একটি ছোট পিস্তল রাখে। এই পিস্তলটা সে কেন রাখে ? সেলফ প্রটেকসনের জন্যে না। তার উদ্দেশ্য অন্য।'

'উদ্দেশ্যটা কি ?'

'আমি পরিষ্কার জানি না। একটা অনুমান আমার আছে। অনুমানটা স্পষ্ট নয়। অস্পষ্ট। ওকে ওর জীবনের শুরুতে আমি নানানভাবে ব্যবহার করেছি। আমি ফেরেশতা না— আমার অনেক দোষ ত্রুটি আছে। অহনার উপর কিছু

www.BDeBooks.Com

অন্যায় আমি শুরুতে করেছি। পরবর্তী সময়ে সে অন্যায় আমি দূর করার চেষ্টা করেছি। ওকে বিয়ে করেছি। ভালবাসায় ভালবাসায় ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। তুমি বোধহয় জান না— আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ওর নামে লিখে দেয়া হয়েছে। সবটা অবশ্যি ভালোবাসা থেকে করা না টেক্স ফাঁকি দেয়াও একটা উদ্দেশ্য।

বুঝলে নবনী! অহনা হচ্ছে পারদের মত, যত তাঁকে ধরতে যাওয়া যায় ততই সে পিছলে যায়। আঙুলের ফাঁক দিয়ে সহস্র খণ্ড হয়ে ঝড়ে পড়ে। আমি অঞ্জলি পেতেই তাকে ধরতে চেয়েছিলাম। সম্ভব হল না। সে এখন যেটা চাচ্ছে তা হচ্ছে আমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া। কিভাবে সে তা দেবে আমি জানি না। নোমান জানে, সে আমাকে বলবে না। অহনা নোমানের উপরও পুরোপুরি ভরসা করছে না। তার আরো লোক আছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ধরনের লোকজন। ওরা আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে। শুধু যে আমার পেছনে ঘুরছে তাই না— তারা আরো কিছু কাণ্ড কারখানা করছে যার কারণ আমি ধরতে পারছি না। যেমন তারা এতিমখানায় এতিমখানায় ঘুরছে। শুনতে পাচ্ছি আমার ধানমণ্ডির বাড়িটায় অহনা একটা মহিলা দুঃস্থ কেন্দ্র করবে। এটা কি অদ্ভুত পাগলামি না ?

সফিক সাহেব চুপ করলেন। হাতের আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরালেন। তাঁকে খুব অস্থির লাগছে। আমি বললাম, আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন ?

'হ্যাঁ খাব।'

আমি চা ঢেলে দিলাম। তিনি বললেন, থ্যাংকস— রাগের মাথায় হড়মড় করে তোমাকে অনেক কথা বলে ফেললাম।

'এখন কি আপনার রাগ কমেছে ?'

'আমার স্বভাব অহনার মত না। আমি যেমন চট করে রাগী না, তেমনি চট করে আমার রাগ পড়েও না। যাই হোক নবনী শোন— আমি নোমানকে আমার কাছে আর রাখব না। তোমার জন্যে সবচে ভাল হবে তুমি যদি ওকে নিয়ে দূরে কোথায় চলে যাও। অহনার Sphere of Influence এর বাইরে। আমি কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেব যাতে ও ছোটখাট ব্যবসা ট্যাবসা করে খেতে পারে।'

সফিক সাহেব ওঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আমি কি নোমানকে আপনার সিদ্ধান্তের কথা আজই বলব ?

'না আজ না। আমার ছবির অল্প কিছু কাজ বাকি আছে। কাজটা শেষ হোক। তারপর বলবে। নবনী যাই। ভাল কথা তোমার যে ছবি তুলেছিলাম সেই ছবি খুব সুন্দর এসেছে। আমি বাঁধিয়ে রেখেছি— আজ সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দেব। আরেকটা কথা অহনা এখন আমার বাসায়। কাল তাকে নিয়ে স্যুটিং এ যাব। নোমানকে বলবে যেন যায় এবং আমি চাচ্ছি তুমিও থাক। ছবি শেষ করাটা আমার জন্য খুব জরুরি। এই জীবনে আমি কোন কাজই আধাআধি করে রাখি নি। তোমার চা খুব ভাল হয়েছে। মেনি মেনি থ্যাংকস!'

যাই বলেও সফিক সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে এতগুলো কথা বলার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। বলার পর বিব্রত বোধ করছেন। আমার স্তরের একটি মেয়েকে তাঁর এত কথা বলার প্রয়োজনও নেই। তিনি ইতস্তত করে বললেন, নবনী একটা শেষ কথা না বললে তুমি অহনাকে ভুল বুঝতে পার। তুমি ভাবতে পার অহনা বোধহয় পিস্তল নিয়ে ঘুরছে আমাকে মারার জন্যে।

'আমি এ রকম কিছু ভাবছি না।'

'না ভাবাই ঠিক। ঘৃণা থেকেও ভালবাসা জন্মায়। আমার প্রতি ওর যে প্রবল ভালবাসা তা উঠে এসেছে ঘৃণা থেকে। সমস্যা এইখানেই। এই পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষ খুন হয়। প্রবল ঘৃণার মানুষ এবং প্রচণ্ড ভালবাসার মানুষ। কাজেই অহনা যদি আমাকে মেরেও ফেলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, উল্টাটাওতো হতে পারে। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, হতে পারে। অবশ্যই হতে পারে।

১১

নোমান বলছিল ছবির স্যুটিং খুব বিরক্তিকর। আমি দেখছি ব্যাপারটা মোটেই সে রকম না। আমার বিরুক্তিতো লাগছেই না বরং মজা লাগছে। আমি ছবির কিছুই জানি না তবু বুঝতে পারছি সফিক সাহেব ছবির কাজ খুব ভালই বুঝেন।

একেবারে এলাহি কারবার। দিনের বেলা কাজ হচ্ছে অথচ মাঠের মাঝখানে মাঝখানে লাইট জ্বলছে। বড় বড় রাংতা মোড়া বোর্ড হাতে লোকজন ছোটাছুটি করছে। এই বোর্ডগুলো রিফ্লেকটর।

ক্যামেরাম্যান একজন বিদেশী, কলিন্স বোধহয় নাম। অসীম ধৈর্য এই সাহেবের। ঝাঁঝাঁ রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

সারাদিন ধরে একটা দৃশ্য হচ্ছে। জাহেদা ছুটতে ছুটতে বনে ঢুকে গেল।

সফিক সাহেব বললেন, দৃশ্যটা এমনভাবে নিতে হবে যেন দর্শকের মনে ভয়ের ছাপ পড়ে। মেয়েটা যখন দৌড়ে যাবে তখন মাঠে কয়েকটা ছাগল থাকবে। মেয়েটার দৌড়ে যাওয়া দেখে ছাগলগুলো উল্টো দিকে ছুটতে থাকবে। এতে দৃশ্যটি অন্য রকম হয়ে যাবে। মেয়েটা যখন বনে ঢুকবে তখন বনের পাখিরা কিচকিচ করে উঠবে। এতে ভয়টা আরো বাড়বে।

উনার কথাগুলো আমার ভাল লাগল। বলতে ইচ্ছা করল বাহ্ বেশতো। অহনা অভিনয়ও করছে এত সুন্দর। ছাগলগুলো যখন তাকে দেখে ছুটছে তখন সে এক পলকের জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল ছাগলগুলোর দিকে তারপর আবার ছুটতে শুরু করল। দাঁড়ানোর কথা সফিক তাঁকে বলেন নি। এটা সে করেছে নিজ থেকে।

সফিক বললেন, তোমার দাঁড়িয়ে পড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে। ওয়ান্ডারফুল।

ক্যামেরাম্যান সাহেব বললেন, Well done!

www.BDeBooks.Com

অহনা হাসতে হাসতে বলল, থ্যাংকস।

সফিক বললেন, আজকের মত প্যাক আপ। কাল সকাল থেকে আবার স্যুটিং। আশা করছি কাল দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলব।

অহনা বললেন, আমি আজ আরো খানিকক্ষণ কাজ করতে রাজি আছি। আজ আমার কাজ করতে খুব ভাল লাগছে।

সফিক বললেন, আজ থাক। আমি টায়ার্ড। কলিন্সের দিকে তাকিয়ে দেখ রোদে টমেটোর মত লাল হয়ে গেছে। নোমান বেচারাও টায়ার্ড। ছাগলের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে তার অবস্থা কাহিল। এসো নৌকায় বসে সবাই চা খাই।

অহনা বললেন, চল যাই।

সফিক বললেন, আজ চাঁদনী আছে। রাতের খাবার পর আমরা কিছুক্ষণ নৌকায় করে ঘুরব। কি বল অহনা ?

'আচ্ছা যাও ঘুরব।'

'রাতের নৌকায় গানের আসর হবে। অহনা দু' একটা গান কি আজ আমাদের শুনাবে ?'

অহনা হাসতে হাসতে বললেন, খুব ভালমত অনুরোধ করলে শুনাতেও পারি।

'অনুরোধ মানে তুমি চাইলে আমি সবার সামানে দূর থেকে ক্রলিং করে এসে তোমার পায়ে ধরতে পারি।'

সফিক হাসছেন। অহনা হাসছেন। কে বলবে এদের মধ্যে কোন সমস্যা আছে। এদের হাসি কৃত্রিমও নয়। সহজ সরল হাসি। এই হাসির উৎস ভালবাসা। অন্য কিছু নয়। সেই ভালবাসার জন্য যদি ঘৃণাতে হয় তাতে কিছু যায় আসে না।

রাতে অনেকক্ষণ গান হল। নৌকা ঘাটে বাঁধা। বেশ বড় নৌকা। ছাদ খোলা। পাটাতনে তিরপল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা চারজন শুধু আছি। সাহেব গান শুনতে আসেন নি। তিনি নাকি একা একা গাঁজা খাবেন। বাংলাদেশে এসেছেন আরাম করে গাঁজা খাবার জন্যে। নোমান আজকের দিনের পরিশ্রমের জন্যেই বোধহয় পাটাতনে কাত হয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বেশ কয়েকটা তাকিয়া আছে। বেচারার মাথার নিচে একটা দিয়ে দিলে আরাম করে ঘুমাতে পারত। আমার দিতে লজ্জা লাগছে।

সফিক সাহেব বসেছেন অহনার পাশে। আমি অন্য দিকে। অহনা পরপর তিনটি গান করলেন। সবার শেষে গাইলেন—

নিশীথে কী করে গেল মনে কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে, সে কি জাগরণে কী জানি, কী জানি ॥

গাইতে গাইতে টপ টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। চাঁদের আলোয় কান্নাভেজা মুখ এত সুন্দর দেখায় ? আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। মনে

মনে ভাবছি এমন একটি গুণী মেয়েকে ভালবেসে কষ্ট পাওয়াতেও আনন্দ আছে। এদেরতো অঞ্জলি পেতেই ধরে রাখতে হয়।

অহনা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে হঠাৎ কঠিন স্বরে বললেন, রাত একটার সময় এখান থেকে একটা ট্রেন যাবে ঢাকায়। আমি ঐ ট্রেনে চলে যাব। নোমান যাবে আমার সঙ্গে।

সফিক অবাক হয়ে বললেন, তার মানে ?

অহনা বললেন, মানে টানে জানি না। আমার ভাল লাগছে না। এই নোমান উঠতো। ওঠ। তুমি আমাকে নিয়ে ঢাকা যাবে।

সফিক বললেন, তোমার যদি যেতেই হয় তুমি যাবে কিন্তু একা যাবে কেন ? আমরা সবাই যাব। তুমি চলে গেলে আমরা এখানে থেকে করব কি ?

'না আমি একা যাব। তোমরা পরে আসবে। শুধু নোমান আমার সঙ্গে যাবে।'

সফিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, দেখ অহনা— নোমানের স্ত্রী এখানে আছে। সে তার স্ত্রীকে ফেলে চলে যাবে এটা তুমি কেন ভাবছ ? হঠাৎ করে তোমার কি হয়েছে। আমি জানি না তবে তুমি পাগলের মত আচরণ করছ।

'মোটেই পাগলের মত আচরণ করছি না। যা করছি ঠাণ্ডা মাথায় করছি।'

'নোমান তোমার সঙ্গে যাবে। আর তার স্ত্রী এখানে থাকবে ?'

অহনা তীব্র গলায় বলল, হ্যাঁ এতে তেমন কোন সমস্যা হবার কথা না। আশা করা যেতে পারে গভীর রাতে তুমি তার ঘরের·দরজায় ধাক্কা দেবে না। আর যদি দাও তাতেও ক্ষতি নেই এই মেয়ের অন্য পুরুষের সঙ্গে শুয়ে অভ্যাস আছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কি বলছে এই মেয়ে ? সে কি সত্যি এসব বলছে না আমি ভুল শুনছি ?

সফিক চিৎকার করে বললেন— চুপ কর। You are out of your mind.

'তুমি চেঁচিও না। I am not out of my mind. I never was. যা বলছি ঠিকই বলছি। এই দারুণ রূপবতী এবং পুণ্যবতী মহিলার একটি অবৈধ মেয়ে আছে। এতিমখানায় বড় হচ্ছে।'

আমি মূর্তির মত বসে রইলাম। নোমানের ঘুম বোধহয় ঠিকমতো ভাঙেনি। সে হতভম্ব হয়ে একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে একবার অহনার দিকে। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমি কি পানিতে পরে যাচ্ছি ? সফিক ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেললেন। শান্ত স্বরে বললেন— নোমান তুই অহনাকে নিয়ে যা। আমি নবনীকে দেখব। তুই চিন্তা করিস না। যা প্লীজ যা।

নোমান অহনার সঙ্গে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য সে একবারও পেছনের দিকে তাকাচ্ছে না। সফিক বললেন, নবনী তুমি কিচ্ছু মনে করো না। ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ও এরকম করে। আমি হাত জোড় করে ওর হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

www.BDeBooks.Com

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, সফিক ভাই! আপনি কি আমাকে আমার বড়মামার কাছে পৌঁছে দেবেন ?

'অবশ্যই দেব। তুমি যেখানে আমাকে নিতে বলবে আমি সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাব। অহনার ব্যবহারে আমি যে কি পরিমাণ লজ্জিত তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনার লজ্জিত হবার কিছু নেই। আমি দীর্ঘদিন মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলাম। আমার জীবনের একটা অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট। আমার ধারণা অহনা ভাবী সত্যি কথাই বলেছেন।'

আমার এমন লাগছে কেন ? শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। আমি নৌকার উপর বসে আছি। নৌকাটা খুব দুলছে। এত দুলছে কেন নৌকাটা ? নৌকার পাটাতনে এটা কি কাক না ? ঐ বুড়ো কাকটা না ? আবার কতদিন পর কাকটাকে দেখলাম— আমি বললাম, এই এই আয়।

তলপেটে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। আমার শরীর একটি শিশু বাস করছে। ওর কোন ক্ষতি হচ্ছে নাতো ? ও ভাল থাকবে তো ? প্রচণ্ড মানসিক যাতনায় না-কি আপনা আপনি এবোরসান হয়ে যায়। এটা যেন না হয়। সব কিছুর বিনিময়ে আমি তার মঙ্গল চাই।

'নবনী তোমার কি খারাপ লাগছে ? এক কাজ কর এই পাটাতনে শুয়ে পর। তাকিয়াটা মাথার নিচে দাও।'

সফিক ভাইয়ের কথা খুব অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। তিনি আমাকে শুইয়ে দিলেন। চাঁদটা এখন ঠিক আমার চোখের উপর। চাঁদের আলো এত তীব্র হয় ? আমার চোখ ঝলছে যাচ্ছে।

নদী থেকে পানি নিয়ে তিনি আমার চোখে মুখে দিচ্ছেন। শান্তি শান্তি লাগছে। নদীর পানি এত ঠাণ্ডা।

'নবনী শোন, হা করে নিঃশ্বাস নাও। হা করে নিঃশ্বাস নিলে ভাল লাগবে।'

আমি নিজের জন্যে না আমার বাচ্চাটির জন্যে হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। এই পৃথিবীতে তাকে আসতেই হবে।

আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। আমি প্রায় ফিসফিস করে বললাম, সফিক ভাই। আমার পেটে তিন মাসের একটা শিশু আছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এবোরসান হয়ে যাবে। প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।

'তুমি নড়বে না। যেভাবে আছ সেই ভাবে শুয়ে থাক। একটুও নড়বে না।'

তিনি দৌড়ে চলে যাচ্ছেন। একটু বাতাস নেই তারপরেও নৌকাটা এত দুলছে কেন ? মনে হচ্ছে আমি গড়িয়ে পানিতে পড়ে যাব। নৌকার পাটাতনে বুড়ো কাকটা গুটি গুটি পায়ে আসছে আমার দিকে। আমি বললাম, এই যাঁ যা। কাউকেই এখন আমার কাছে আসতে দেয়া যাবে না। নিজেকে রক্ষা করতে হবে। শিশুটির জন্যেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

আধো ঘুম আধো জাগরণে বুঝতে পারছি— আমার শরীরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা শিশুটিকে রক্ষা করার যে প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছি, এরকম তাগিদ আগেও একবার অনুভব করেছিলাম। আমার আজকের অনুভূতি নতুন নয়। আরো একবার জীবন বাজি রেখেছিলাম একটি শিশুর জন্যে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত স্মৃতি, গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা। বড় মামা আমাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। যেন কেউ আমার খোঁজ না জানে। মামা কেন এই কাণ্ডটি করেছিলেন এখন স্পষ্ট হচ্ছে।

কেমন আছে আমার ঐ বাচ্চাটা ? কত বড় হয়েছে ? ওকি ওর বাবার মত হয়েছে ? পরিচয়হীন ঐ মেয়েটির মাথায় ভালবাসার মঙ্গলময় হাত কেউ কি ফেলবে না ?

চাঁদটা মনে হচ্ছে আকাশ থেকে নেমে আসছে। কি তীব্র তার আলো ? চাঁদের আলোয় কাকটার একটা দীর্ঘ ছায়া পড়েছে।

রক্তে আমার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে। এত রক্ত মানুষের শরীরে থাকে ?

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এত রক্ত পায়ের শব্দ। নোমান কি আসছে ? সে যদি আসে তাহলে তাকে একটা কথা বলে যেতে চাই। কথাগুলো বলার মত শক্তি আমার থাকবেতো ? আমি বলব, এই দেখ আমি মরে যাচ্ছি। যে মানুষ মরে যাচ্ছে, তার উপর কোন রাগ কোন ঘেন্না থাকা উচিত না। আমি অনেককাল আগে একটা মানুষকে যে ভাবে ভালবেসেছিলাম তোমাকেও ঠিক সেই ভাবেই ভালবেসেছি। ভালবাসার দাবি আছে। সেই দাবি খুব কঠিন দাবি। ভালবাসার সেই দাবি নিয়ে তোমার কাছে হাত জোড় করছি। আমার একটা মেয়ে আছে। কোন একটা এতিমখানায় বড় হচ্ছে তুমি কি ওকে তোমার কাছে এনে রাখবে ? প্রথমে হয়ত তাকে ভালবাসতে পারবে না। কিছুদিন পর অবশ্যই পারবে। ওতো আমারই একটি অংশ। আমিতো তোমাকে ভালবেসেছি।

এক খণ্ড বিশাল মেঘ চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছে। চাঁদের আলো এখন আর চোখে লাগছে না। চারদিকে কি সুন্দর লাগছে। কি অসহ্য সুন্দর। হতাশা, গ্লানি, দুঃখ ও বঞ্চনার পৃথিবীকে এত সুন্দর করে বানানোর কি প্রয়োজন ছিল কে জানে ?※

※ নবনীর প্রতিটির চরিত্র কাল্পনিক।

www.BDeBooks.Com

বাঘবন্দি মিসির আলী

১

যখন যা প্রয়োজন তা হাতের কাছে পাওয়া গেলে কেমন হত— এ রকম চিন্তা ইদানীং মিসির আলি করা শুরু করেছেন। এবং তিনি খানিকটা দুঃশ্চিন্তায়ও পড়েছেন। মানুষ যখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে দুর্বল হয় তখনি এ ধরনের চিন্তা করে। তখনি শুধু মনে হয়— সব কেন হাতের কাছে নেই। তিনি মানসিক এই অবস্থার নাম দিয়েছেন— বেহেশত কমপ্লেক্স। এ ধরনের ব্যবস্থা ধর্মগ্রন্থের বেহেশতের বর্ণনায় করছে। যা ইচ্ছা করা হবে তাই হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আঙুর খেতে ইচ্ছা আছে, আঙুরের থোকা ঝুলতে থাকবে নাকের কাছে।

মিসির আলি খাটে শুয়ে আছেন। পায়ের কাছের জানালাটা খোলা। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। গা শিরশির করছে। এবং তিনি ভাবছেন— কেউ যদি জানালাটা বন্ধ করে দিত। ঘরে কাজের একটা ছেলে আছে ইয়াসিন নাম। তাকে ডাকলেই সে এসে জানালা বন্ধ করে দেবে। ডাকতে ইচ্ছা করছে না। তাঁর পায়ের কাছে ভাঁজ করা একটা চাদর আছে। ভেড়ার লোমের পশমিনা চাদর। নেপাল থেকে কে যেন তাঁর জন্যে নিয়ে এসেছিল। ইচ্ছা করলেই তিনি চাদরটা গায়ে দিতে পারেন। সেই ইচ্ছাও করছে না। বরং ভাবছেন চাদরটা যদি আপনা আপনি গায়ের ওপর পড়তো তাহলে মন্দ হত না। নেপাল থেকে চাদরটা কে এনেছিল ? নাম বা পরিচয় কিছুই মনে আসছে না। উপহারটা তিনি ব্যবহার করছেন, কিন্তু উপহারদাতার কথা তাঁর মনে নেই। এই ব্যর্থতা মানসিক ব্যর্থতা।

রাত কত হয়েছে মিসির আলি জানেন না। এই ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। বসার ঘরে আছে। সময় জানতে হলে বসার ঘরে যেতে হবে, ঘড়ি দেখতে হবে। ইয়াসিনকে সময় দেখতে বললে লাভ হবে না। সে ঘড়ি দেখতে জানে না। অনেক চেষ্টা করেও এই সামান্য ব্যাপারটা ইয়াসিনকে তিনি শেখাতে পারেন নি। কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে শিক্ষক হিসেবে তিনি ব্যর্থ। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যর্থতাটাও তিনি নিতে পারছেন না। এটাও মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। মানসিকভাবে দুর্বল মানুষ ব্যর্থতা নিতে পারে না। মানসিকভাবে সবল মানুষের কাছে ব্যর্থতা কোনো ব্যাপার না। সে জানে সাফল্য এবং ব্যর্থতা দুই সহোদর বোন। এরা যেকোনো মানুষের চলার পথে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সাফল্য নামের বোনটি দেখতে খুব সুন্দর। তার পটলচেরা চোখ, সেই চোখের আছে জন্ম কাজল। তার মুখে প্রথম প্রভাতের

www.BDeBooks.Com

রাঙা আলো ঝলমল করে। আর ব্যর্থতা নামের বোনটি কদাকার, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে অল্প বয়সে ছানি পড়েছে। সবাই চায় রূপবতী বোনটির হাত ধরতে। কিন্তু তার হাত ধরার আগে কদাকার বোনটির হাত ধরতে হবে এই সহজ সত্যটা বেশির ভাগ মানুষের মনে থাকে না। মানুষের মন যতই দুর্বল হয় ততই সে ঝুঁকতে থাকে রূপবতী বোনটির দিকে। এটা অতি অবশ্যই মানসিক জড়তার লক্ষণ।

'স্যার ঘুম পাড়ছেন ?'

মিসির আলি উঠে বসলেন। দাঁত কেলিয়ে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স বার তের। হাবাগোবা চেহারা। কিন্তু হাবাগোবা না। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। শুধু বুদ্ধির ছাপ চেহারায় আসে নি। ঠোঁটে গোঁফের ঘন রেখা জাগতে শুরু করেছে, এতে হঠাৎ করে তাকে খানিকটা ধূর্তও মনে হচ্ছে। যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানেন ইয়াসিন ধূর্ত না। ইয়াসিনকে অনেকবার বলা হয়েছে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকে যেন কখনো জিজ্ঞাসা করা না হয়— "তিনি ঘুম পাড়ছেন না পাড়েন নি।" কোন লাভ হয় নি। বরং উল্টোটা হয়েছে, তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলেই ইয়াসিন তাঁকে ডেকে তোলাকে তার দায়িত্বের অংশ বলে মনে করা শুরু করেছে। এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যে তাকে বেশ আনন্দিতও মনে হচ্ছে।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, ক'টা বাজে দেখে আয় তো। ইয়াসিন উৎসাহের সঙ্গে রওনা হল। তার যাবার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে হয়তো আজ সে সময়টা বলতে পারবে। গতকাল রাতেও তিনি ছবি-টবি এঁকে ঘড়ির সময় বোঝানোর চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। ইয়াসিনের ঘন ঘন মাথা নাড়া দেখে মনে হয়েছে সে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। দেখা যাক।

ইয়াসিন হাসি মুখে ফিরে এল। মিসির আলি বললেন, ক'টা বাজে ?

ইয়াসিনের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল। আনন্দময় গলায় বলল, বুঝি না। আউলা ঠেকে।

ছোট কাঁটা ক'টার ঘরে ?

'তিনের ঘরে।'

'আর বড়টা ?'

'ছোটজন যে ঘরে। বড় জনও একই ঘরে।'

মিসির আলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। দশটার বেশি রাত হয় নি। ছোট কাঁটা তিনের ঘরে থাকার প্রশ্নই উঠে না। ছোট কাঁটা বড় কাঁটার ব্যাপারটাই হয়তো ইয়াসিন বুঝে নি। গোড়াতেই গিট্টু লেগে আছে।

'স্যার চা খাইবেন ?'

'না।'

'দরজা বন কইরা দেন। কাইল সক্কালে আমুনে।'

'আজ না গেলে হয় না?'

'হয়। না গেলেও হয়। যাই গা। কাইল সক্কালে আমু।'

মিসির আলি উঠলেন। ইয়াসিন একবার যখন বলেছে যাবে তখন সে যাবেই। ইয়াসিনের বাবা— ফার্মগেট এলাকায় ভিক্ষা করে। ভিক্ষুক বাবার খোঁজ খবর করার জন্যে সে প্রায়ই যায়। মাঝে মধ্যে নিজেও ভিক্ষা করে। ইয়াসিনরা তিন পুরুষের ভিক্ষুক। তার দাদাও ভিক্ষা করতেন। মিসির আলি ব্যাপক চেষ্টা করছেন পুরুষানুক্রমিক এই পেশা ভাঙার। ইয়াসিনকে এনে কাজ দিয়েছেন। লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা— মানুষ পৃথিবীতে দু'টা হাত নিয়ে এসেছে কাজ করার জন্যে ভিক্ষা করার জন্যে না। আল্লাহ যদি চাইতেন মানুষ ভিক্ষা করবে তাহলে তাকে একটা হাত দিয়েই পৃথিবীতে পাঠাতেন। ভিক্ষার থালা ধরার জন্যে একটা হাতই যথেষ্ট। মনে হচ্ছে না শেষ পর্যন্ত উপদেশমূলক বক্তৃতায় কোনো লাভ হবে। ইয়াসিনের প্রধান ঝোঁক ভিক্ষার দিকে। মিসির আলি নিশ্চিত আজ সে ভিক্ষা করার জন্যেই যাচ্ছে। বিষ্যুদবার রাতে বাবার সঙ্গে সে আজিমপুর গোরস্থানের গেটে ভিক্ষা করতে যায়।

মিসির আলি বললেন, ভিক্ষা করতে যাচ্ছিস?

ইয়াসিন জবাব দিল না। উদাস দৃষ্টিতে তাকাল।

'সকালে কখন আসবি?'

'দেখি।'

'সকাল দশটার পর এলে কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারবি না। আমি তালা দিয়ে চলে যাব। এগারোটার সময় আমার একটা মিটিং আছে। তাই অবশ্যি দশটার আগে চলে আসবি।'

'দেখি।'

মিসির আলি লক্ষ্য করলেন, ইয়াসিন তার ট্রাঙ্ক নিয়ে বের হচ্ছে। ভালো সম্ভাবনা যে সে আর ফিরবে না। নিজের সব সম্পত্তি নিয়ে বের হচ্ছে। এই ট্রাঙ্কটা সম্পর্কে মিসির আলির সামান্য কৌতূহল আছে। ইয়াসিন ট্রাঙ্কে বড় একটা তালা ঝুলিয়ে রাখে। গভীর রাতে শব্দ শুনে মিসির আলি টের পান যে তালা খোলা হচ্ছে।

'তুই কি সকালে সত্যি আসবি?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রাঙ্ক নিয়ে যাচ্ছিস কেন?'

'প্রয়োজন আছে।'

'আচ্ছা যা।'

ইয়াসিন পা ছুঁয়ে তাকে সালাম করল। এটা নতুন কিছু না। ইয়াসিন বাইরে যাবার আগে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি বিছানা থেকে নামলেন। দরজা বন্ধ করে ঘড়ি দেখতে বসার ঘরে গেলেন। ঘড়ির দু'টা কাঁটা তিনের ঘরে এই কথাটা ইয়াসিন মিথ্যা বলে নি। তিনটা পনেরো মিনিটে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাটারি শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই। ঘরে একটা মাত্র ঘড়ি। তাঁর নিজের হাতঘড়িটা মাস তিনেক হল হারিয়েছেন। কাজেই রাতে আর সময় জানা যাবে না।

মিসির আলি সূক্ষ্ম অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হল সময় জানাটা খুবই দরকার। ঘরে খাবার পানি না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে পানির পিপাসা পেয়ে যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে আসে। ঘরে পানি থাকলে কখনো এত তৃষ্ণা পেত না।

সময় জানার জন্যে মিসির আলি উসখুস করতে লাগলেন। যদিও সময় এখন না জানলেও কিছু না। তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথা। শরীর ভালো যাচ্ছে না। বুকে প্রায় সময়ই চাপ বোধ করেন। রাতে হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে হয় বুকের উপর কেউ যেন বসে আছে। সেও স্থির হয়ে বসে নেই নড়াচড়া করছে। তিনি উঠে বসেন। বিছানা থেকে নামেন। বুকের উপর বসে থাকা বস্তুটা কিন্তু তখনও থাকে। টিকটিকির মত বুকে সেঁটে থাকে। এসব লক্ষণ ভালো না। এসব হচ্ছে ঘণ্টা বাজার লক্ষণ। প্রতিটি জীবিত প্রাণীর জন্যে ঘণ্টা বাজানো হয়। জানিয়ে দেয়া হয় তোমার জন্যে অদৃশ্য ট্রেন পাঠানো হল। এ তারই ঘণ্টা। ভালো করে তাকাও দেখবে সিগন্যাল ডাউন হয়েছে। ট্রেন চলে আসার সবুজ বাতি জ্বলে উঠেছে। ট্রেন থামতেই তুমি টুক করে তোমার কামরায় উঠে পড়বে। না তোমাকে কোন স্যুটকেস বেডিং নিতে হবে না। ট্রেনটা যখন তোমাকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তখন যেভাবে এসেছিলে। যাবেও সেইভাবে। ট্রেন থামতে থামতে যাবে, নানান যাত্রী উঠবে— সবার গন্তব্য এক জায়গায়। সে জায়গাটা সম্পর্কে কারোরই কোনো ধারণা নেই।

মিসির আলি দরজা খুললেন বারান্দায় এসে বসলেন। বুকে চাপ ব্যথাটা আবারো অনুভব করছেন। ফাঁকা জায়গায় বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললে আরাম হবার কথা। সেই আরামটা হচ্ছে না। মিসির আলির দু'কামরার এই বাড়িটার আবার একটা বারান্দাও আছে। গ্রিল দেয়া বারান্দা। বারান্দাটা এত ছোট যে দু'টা চেয়ারেই বারান্দা ভর্তি। মিসির আলি এই বারান্দায় কখনো বসেন না। গ্রিল দেয়ার কারণে বারান্দাটা তাঁর কাছে জেলখানার গরাদের মতো লাগে। বারান্দা থাকবে খোলামেলা। এবং অতি অবশ্যই বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যাবে। জানালা মানে যেমন আকাশ, বারান্দা মানেও আকাশ। গ্রিল দেয়া এই বারান্দা থেকে আকাশ দেখা যায় না।

বারান্দা থেকে বাড়িওয়ালা বাড়ির খানিক অংশ, এবং নর্দমাসহ গলি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। মিসির আলি খুব ইচ্ছা অন্তত জীবনের শেষ কিছু দিন তিনি এমন একটা বাড়িতে থাকবেন যে বাড়ির বড় বড় জানালা থাকবে। জানালার

পাশ থেকে আকাশ দেখা যাবে। জীবনের শেষ সময় এসে পড়েছে বলেই তার ধারণা— জানালাওয়ালা বারান্দার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি। তবে তাঁর ধারণা তাঁর শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ হবে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা অবশ্যই তাকে কোন একটা ভালো ক্লিনিকে ভর্তি করবে। সেই ক্লিনিকের ভাড়া তিনি দিতে পারবেন কি পারবেন না তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

ক্লিনিকে তাঁর বিছানাটা থাকবে জানালার কাছে। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে পারবেন। ডাক্তার এবং নার্সরা মিলে তাঁর জীবন রক্ষার জন্যে যখন ছোটাছুটি করতে থাকবেন, তিনি তখন তাকিয়ে থাকবেন আকাশের দিকে। মৃত্যুর আগে আগে শারীরবৃত্তির সকল নিয়মকানুন এলোমেলো হয়ে যায়। কাজেই তিনি হয়তো তখন আকাশের কোনো অদ্ভুত রঙ দেখবেন। নীল আকাশ হঠাৎ দেখা গেল গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে। কিংবা আকাশ হয়েছে বেগুনি। বেগুনি তাঁর প্রিয় রঙ।

'স্যার স্লামালিকুম।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের ভাগ্নে ফতে মিয়া। আপন ভাগ্নে না। দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। ফতে মিয়া মিসির আলির ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি তাকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে দেখেন নি। যখন চোখ বন্ধ করেছিলেন তখন এসেছে। ফতে মিয়ার চলাফেরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ। মানুষটা মনে হয় বাতাসের উপর চলে। মানুষটা বাতাসের উপর দিয়ে চলাফেরা করার মতো ছোটখাটো না। তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো। শুধু শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট। দেখে মনে হয় খুব রোগা কোনো মানুষের মাথা একজন কুস্তিগীরের শরীরে জুড়ে দেয়া হয়েছে। ফতে মিয়ার গলার স্বর পরিষ্কার। ঝনঝন করে কথা বলে।

'ফতে মিয়া কেমন আছ ?'

'স্যার আপনার দোয়া।'

'সঙ্গে ঘড়ি আছে ? 'ক'টা বাজে বলতে পার ?'

'দশটা চল্লিশ।'

মিসির আলি লক্ষ্য করলেন সময় বলতে গিয়ে ফতে ঘড়ি দেখল না। এটা তেমন কোনো ব্যাপার না। ঘড়ি হয়তো সে একটু আগেই দেখেছে। তারপরেও মানুষের স্বভাব হল সময় বলার আগে ঘড়ি দেখে নেয়া। ফতে মিয়া সময় বলেছে দশটা বিয়াল্লিশ। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে এ ভাবে সময় বলা সম্ভব না। মিসির আলির মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞেস করেন ঘড়ি না দেখে এমন নিখুঁতভাবে সময়টা সে বলছে কি ভাবে। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ফতে মিয়া বলল, 'স্যার যাই ?'

'আচ্ছা।'

'ঠাণ্ডা পড়েছে। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকেন। রেস্টনেন। আশ্বিন-কার্তিক মাসের ঠাণ্ডাটা বুকে লাগে। পৌষ-মাঘ মাসের ঠাণ্ডায় কিছু হয় না।

www.BDeBooks.Com

ফতে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল সে রকম নিঃশব্দেই চলে গেল। নিশাচর পশুরাই এমন নিঃশব্দে চলে। নিশাচরদের সঙ্গে ফতে মিয়ার কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে। মিসির আলি বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের হৈচৈ চিৎকার শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বদরুল সাহেব তার ভাগ্নেকে গালাগালি না করতে ঘুমুতে যাবেন তা হবার না। ছ'মাসের ওপর হল মিসির আলি এ বাড়িতে আছেন। ছ'মাসে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখেন নি। বদরুল সাহেবের মেজাজ এম্নিতেই চড়া। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন, হৈচৈ চিৎকার গালাগালির মধ্যেই থাকেন। নিজের ভাগ্নের ক্ষেত্রে সব সীমা অতিক্রম করে। তিনি শুরুই করেন— "শুয়োরের বাচ্চা পাছায় লাথি মেরে তোমাকে আমি..." দিয়ে। মাঝে মধ্যে চড় থাপ্পড় পর্যন্ত গড়ায়। বদরুল সাহেব ছোটখাটো রোগা পটকা মানুষ। তাঁর নানান অসুখ বিসুখ আছে। চুপচাপ যখন বসে থাকেন তখন বুকের ভিতর থেকে শাঁ শাঁ শব্দ আসে। এরকম একজন মানুষের ফতে মিয়ার মতো বলশালী কাউকে চড় মারতে সাহস লাগে। সেই অর্থে বদরুল সাহেবকে সাহসী মানুষ বলা যায়।

আশ্রিত মানুষকে নানান অপমানের মধ্যে বাস করতে হয়। সেই অপমানেরও একটা মাত্রা আছে। ফতে মিয়ার ব্যাপারে কোনো মাত্রা নেই। মিসির আলি একবার তাকে দেখলেন ঠোঁট অনেকখানি কাটা। স্টিচ দিতে হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে ফতে?

সে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, মামা রাগ করে ধাক্কার মতো দিয়েছিলেন। সিঁড়িতে পড়ে গেলাম। তেমন কিছু না। মামা প্রেসারের রোগী, রাগ সামলাতে পারেন না। তার ওপর মেয়েটা অসুস্থ। মেয়েটার জন্যে মন থাকে খারাপ।

বদরুল সাহেবের একটাই মেয়ে। ছ'বছর বয়স— নাম লুনা। মেয়েটার মানসিক কোনো সমস্যা আছে। চুপচাপ একা বসে তাকে। তার একটাই খেলা— হাতের মুঠি বন্ধ করছে, মুঠি খুলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই খেলা খেলে পার করে দিতে পারে। মেয়েটা পরীর মতো সুন্দর।

মিসির আলি প্রায়ই মেয়েটাকে সিঁড়ির গোড়ায় বসে থাকতে দেখেন। একমনে হাতের মুঠি বন্ধ করছে, খুলছে। দৃশ্যটা দেখে মিসির আলির মন খুবই খারাপ হয়।

আজ অনেকক্ষণ বসে থেকেও ফতে মিয়ার প্রেসারের রোগী মামার কোনো হৈচৈ শোনা গেল না। আজ হয়তো তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন। বাড়িওয়ালার চিৎকারটাও রুটিনের অংশ হয়ে গেছে। কোনোদিন যদি শোনা যায় তাহলে মনে হয় দিনটা ঠিকমতো শেষ হয় নি। কোথাও ফাঁক আছে।

মিসির আলি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। রাত কত হয়েছে বোঝার উপায় নেই। ঘড়ি বন্ধ। বিছানায় যাবার আগে এক কাপ গরম চা খেলে হত। বেশির ভাগ মানুষই কফি অথবা চা খেলে ঘুমাতে পারে না। অথচ গরম চা তাঁর জন্যে

ঘুমের ওষুধের মতো কাজ করে। ইয়াসিন থাকলে চা এক কাপ খাওয়া যেত। তাঁর নিজের এখন আর চুলার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

খুব হালকা ভাবে কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। ইয়াসিনই ফিরে এসেছে কি না কে জানে। বাবাকে হয়তো খুঁজে পায় নি, কিংবা ভিক্ষা করে আজ তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

'কে ?'

'স্যার আমি ফতে।'

'কি ব্যাপার ?'

'আপনার জন্যে মোমবাতি নিয়ে এসেছি স্যার।'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। মোমবাতির কথা কি তিনি ফতে মিয়াকে বলেছেন ? না বলেন নি। মোমবাতি নিয়ে তার উপস্থিত হবার কোনোই কারণ নেই।

ফতে আলি শুধু মোমবাতি আনে নি। ফ্লাস্কে করে চা এনেছে। আজকাল দু'টা বিস্কিটের ছোট ছোট প্যাকেট পাওয়া যায়। এক প্যাকেট বিস্কিটও এনেছে। সে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের মুখে চা ঢেলে মিসির আলির দিকে এগিয়ে দিল। প্যাকেট খুলে বিস্কিট বের করল। দু'টা বড় বড় মোমবাতি সামনে রাখল। মোমবাতির পাশে রাখল দেয়াশলাই। কাজগুলি করল যন্ত্রের মতো। যেন প্রতিদিনই এ রকম কাজ সে করে। যে কোনো অভ্যস্ত কাজ করায় যে যান্ত্রিকতা থাকে তার সবটাই ফতের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মিসির আলি বললেন, তোমাকে কি মোমবাতি আনতে বলেছিলাম ?

ফতে লজ্জিত গলায় বলল, জ্বি না বলেন নাই। দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে। লোড শেডিং হবে। অন্ধকারে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না, এই জন্যে মোমবাতি নিয়ে এসেছি।

'দশ মিনিটের ভেতর লোড শেডিং হবে ?'

'জ্বি। চা খান। আমি নিজে বানিয়েছি। চিনি ঠিক হয়েছে কি না একটু দেখেন।'

মিসির আলি চায়ে চুমুক দিলেন। তিনি চায়ে যতটুকু চিনি খান, ঠিক ততটুকু চিনিই আছে। তিনি কড়া একটু তিতকুট ধরনের চা পছন্দ করেন— এই চা কড়া এবং তিতকুট ধরনের।

'ফতে।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার চা খুব ভালো হয়েছে। আমি কোন ধরনের চা খাই তা তুমি জান ?'

'ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

'এখন ক'টা বাজে ?'

'এগারোটা পাঁচ।'

'তোমার হাতে ঘড়ি আছে ?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি না।'

'আমার এখানে আসার আগে কি ঘড়ি দেখে এসেছ ?'

'জ্বি না।'

'তাহলে কি করে বলছ— এগারোটা পাঁচ বাজে ?'

'ঘড়ি না দেখেও আমি সময় বলতে পারি। ছোটবেলা থেকেই পারি। মৃত্যুঞ্জয় হাই স্কুলে যখন পড়ি তখন স্কুল পরিদর্শনে ইন্সপেক্টার সাহেব এসেছিলেন, তাঁকে ঘড়ির খেলা দেখিয়েছিলাম। উনি খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন আমাকে একটা ভালো ঘড়ি পাঠিয়ে দেবেন। পাঠান নাই। ভুলে গেছেন হয়তো।'

'ঘড়ির খেলাটা কি ?'

'ঘড়ি না দেখা বলা সময় কত।'

'ও আচ্ছা।'

'স্যারের শরীর কি খারাপ ?'

'সামান্য খারাপ।'

'শরীরের যত্ন নিবেন স্যার। যত্ন বিনা কোনো কিছুই ঠিক থাকে না। এই আমাকে দেখেন সকালে ফজরের নামাজ পড়ে হাঁটতে বের হই। চাইর থেকে পাঁচ মাইল হাঁটি। এই কারণে আমার কোনো অসুখ বিসুখ হয় না। আপনে যদি অনুমতি দেন সকালে হাঁটতে যাবার সময় আপনাকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'কোনো দরকার নেই ফতে মিয়া। হাঁটাহাঁটি ব্যাপারটা আমার পছন্দ না। দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ নানান কষ্টকর পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যায়— ব্যায়াম করে, হাঁটাহাঁটি করে। আমার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার কোনো বাসনা নেই।'

কথা শেষ করার আগেই কারেন্ট চলে গেল। ফতে মিয়া বলেছিল দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে। তাই হয়েছে। চমকানোর মতো কোনো ঘটনা না। ঢাকা শহরে রাতে পাঁচ-ছ'বার করে ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে কেউ যদি বলে দশ মিনিটের মধ্যে লোডশেডিং হবে তার কথা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশি। মিসির আলি ভেবেছিলেন ফতে বলবে, দশ মিনিটের মধ্যে কারেন্ট চলে যাবে বলেছিলাম দেখলেন স্যার কারেন্ট চলে গেছে।

ফতে তা করল না। সে সাবধানে মোমবাতি জ্বালাল। পাশাপাশি দু'টা মোমবাতি। তার মুখ হাসি হাসি। কোনো একটা বিষয় নিয়ে সে আনন্দিত। ফ্লাক্স থেকে নিজের জন্যে চা ঢালতে ঢালতে বলল, স্যার আজ আমার মনটা খুব ভালো।

'ভালো কেন ?'

'আমি একটা দোকান নিয়েছি। সেলামীর টাকা ছাড়াই দোকান পেয়েছি। আঠারো হাজার টাকা শুধু দিতে হয়েছে।'

'কিসের দোকান ?'

'দরজির দোকান। আমি দরজির কাজ কিছু জানি না। ইনশাল্লাহ শিখে ফেলব। তবে একজন কর্মচারী আছে। কাজ ভালো জানে। দোকান নেয়ার খবরটা স্যার আপনাকেই প্রথম দিলাম। আপনি নাদান ফতের জন্যে খাস দিলে একটু দোয়া করবেন।'

ফতের চোখ চকচক করছে। গলার স্বর ভারি হয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদেই ফেলবে। ফতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, দোকানের টাকাটা খুবই কষ্ট করে যোগাড় করেছি। মামার সঙ্গে দু'বছর ধরে আছি। এই দু'বছরে মামার বাজার করতাম। রোজ কিছু কিছু টাকা সরাতাম। কোনোদিন দশ টাকা কোনোদিন পনেরো টাকা। এতেই অনেক টাকা হয়ে গেল— ঐ কবিতাটা পড়েছেন না স্যার, বিন্দু বিন্দু বালিকণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তুলে সাগর অতল। দৈনিক পনেরো টাকা সরালে দুই বছরে হয় দশ হাজার নয়শ পঞ্চাশ টাকা। আমার হয়েছে সাড়ে নয় হাজার টাকা। কিছু টাকা খরচ করে ফেলেছি। আমার আবার সিগারেট খাওয়ার বদঅভ্যাস আছে। নেশার মধ্যে সিগারেট আর জর্দা দিয়ে পান। স্যার নিন আমার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নেন। বাংলা ফাইভ।

মিসির আলি সিগারেট নিলেন। ফতে আবারো কথা শুরু করল— একবার করলাম কি স্যার বেশ কিছু টাকা এক সঙ্গে সরিয়ে ফেললাম। পঁচিশ হাজার টাকা। আমাকে ব্যাংকে পাঠিয়েছে জমা দিতে, আমি ফিরে এসে বললাম টাকা হাইজ্যাক হয়ে গেছে। মামা-মামী দু'জনই আমার কথা বিশ্বাস করল। বিশ্বাস না করে উপায়ও নাই— আমার হাত-পা কাটা সারা শরীর রক্তে মাখামাখি।

'নিজেই নিজের হাত-পা কেটেছ?'

'জ্বি স্যার। একটা ব্লেড কিনে, ব্লেড দিয়ে কেটেছি। নিজের হাতে নিজের শরীর কাটাকুটি করা খুবই কষ্টের কিন্তু কি আর করা এতগুলো টাকা। এত রক্ত বের হচ্ছিল যে আমার মামী পর্যন্ত মামার উপরে রেগে গিয়ে বলল— কেন তুমি তাকে একা একা এতগুলো টাকা দিয়ে পাঠালে। একে তো মেরেই ফেলত। স্যার আমার কথা শুনে কি আপনার খারাপ লাগছে।'

মিসির আলি কিছু বললেন না। তিনি আগ্রহ নিয়ে কথা শুনছেন। ফতের গল্প বলার ক্ষমতা ভালো। গলার স্বরের উঠানামা আছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কথা বন্ধ করে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে। এতে গল্পটা আরো জমে যায়।

'স্যার বোধহয় আমাকে খুব খারাপ মানুষ ভাবছেন। স্যার আমি খারাপ না। মামার কাছ থেকে আমি কত টাকা নিয়েছি সব একটা খাতায় লিখে রেখেছি। ইনশাল্লাহ সব টাকা একদিন আমি ফিরত দেব।'

'দরজির দোকান দেয়ার ব্যাপারটা তোমার মামা জানে?'

'জ্বি স্যার আজ বিকালে বলেছি।'

'উনি জিজ্ঞেস করেন নাই এত টাকা কোথায় পেয়েছ?'

'উনাকে বলেছি যে আমার এক বন্ধু আমাকে টাকাটা ধার দিয়েছে।'

www.BDeBooks.Com

'বন্ধুর কথা উনি বিশ্বাস করেছেন ?'

'জ্বি করেছেন। উনি জানেন আমার এক বন্ধু কুয়েতে কাজ করে। বাবুর্চি। সে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এটা মামাকে অনেকদিন থেকেই বলছিলাম। মামা এটা নিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা মশকরাও করতেন। প্রায়ই বলতেন— কই তোর বন্ধুর টাকা কবে আসবে ?

আজ সন্ধ্যায় মামাকে পা ছুঁয়ে বলেছি টাকা এসেছে। মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছি। মামা খুশি হয়েছে। দরজির দোকানের কথা মামাকে বলেছি। মামা বলেছেন প্রয়োজনে তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা নিতে। এটা অবশ্য মামার মুখের কথা। মামা মুখে অনেক কথা বলে।'

'ফতে।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি আমাকে যে সব কথা বললে তার সবই তো গোপন কথা। প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমার সমস্যা। কথাগুলো আমকে কেন বললে ?'

'আপনার কাছ থেকে কোনো কথাই প্রকাশ হবে না। আপনি গাছের মতো। গাছের কাছ থেকে কোনো কথা প্রকাশ হয় না।'

'আমাকে কথাগুলো বলার কারণ কি ?'

'কাউকে বলার ইচ্ছা করছিল। আমার স্যার কথা বলার লোক নাই। বাবা-মা শৈশবে গত হয়েছেন। একটা বোন আছে মাথা খারাপ। বন্ধু-বান্ধব কেউ নাই।'

'কাউকে বলতে হয় বলেই কি তুমি আমাকে কথাগুলো বললে ?'

'জ্বি স্যার।'

কারেন্ট চলে এসেছে। ফতে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, স্যার যাই। আমার জন্যে একটু দোয়া রাখবেন স্যার। গরিবের ছেলে যদি দোকানটা দিয়ে কিছু করতে পারি। আরেকটা ছোট্ট অনুরোধ। যদি রাগ না করেন তাহলে বলি।

'বল।'

'দরজির দোকানের একটা নাম যদি দেন। সুন্দর কোনো নাম। আগে নাম ছিল বোম্বে টেইলারিং হাউস। আমি স্যার সুন্দর একটা নাম দিতে চাই। বাংলা নাম।'

'নাম-টাম আমার ঠিক আসে না।'

'আপনি যে নাম দিবেন সেটাই আমি রাখব। আপনি যদি খারাপ নামও দেন কোনো অসুবিধা নাই। আপনি যদি নাম দেন— "গু-গোবর টেইলারিং শপ" আল্লাহর কসম সেই নামই রাখব।'

'কেন ?'

'এটা আমার একটা শখ। মানুষের অনেক শখ থাকে। আমার শখ আমার দরজির দোকানের নামটা আপনি দিবেন।'

'আচ্ছা দেখি মাথায় কোনো নাম আসে কি না।'

'এত চিন্তা ভাবনা করার কিছু তো নাই স্যার। এখন আপনার মাথায় যে নামটা আসছে সেটা বলেন।'

'এখন মাথায় কিছু নেই।'

'যা ইচ্ছা বলেন।'

'সাজঘর।'

'আলহামদুলিল্লাহ। আমার দোকানের নাম সাজঘর। স্যার উঠি?'

'আচ্ছা।'

ফতে বিনীত গলায় বলল, দু'টা মোমবাতি আর একটা দেয়াশলাই-এর দাম পড়েছে পাঁচ টাকা। আপনার কথা ভেবে কিনেছিলাম। ভাংতি পাঁচ টাকা কি আছে স্যার?'

মিসির আলি ড্রয়ার খুলে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করলেন। ফতের সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে তিনি যতটা না অবাক হয়েছেন তারচে' অনেক বেশি অবাক হয়েছেন পাঁচ টাকার ব্যাপারটায়।

ফতে চলে গেল। যাবার আগে অতি বিনয়ের সঙ্গে মিসির আলিকে কদমবুসি করল। মিসির আলির মনে হল তিনি ছোট্ট একটা ভুল করেছেন। চলে যাবার আগে ফতেকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ছিল— ক'টা বাজে? ঘুমুতে যাবার আগে সময়টা জানা থাকা দরকার। আধুনিক মানুষ যন্ত্র নির্ভর হয়ে গেছে। মানুষ যেমন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে, যন্ত্রও মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে।

মিসির আলি দরজা বন্ধ করে ঘুমুতে গেলেন। ভালো শীত লাগছে। কোল্ড ওয়েভ হচ্ছে কি না কে জানে। কোল্ড ওয়েভের বাংলাটা ভালো হয়েছে— শৈত্য প্রবাহ। কিছু কিছু শব্দ এমন আছে যে বাংলাটা সুন্দর— ইংরেজি তত সুন্দর না। যেমন Air condition বাংলা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ। বায়ু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না— তাপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। তিনি পায়ের ওপর চাদরটা দিয়ে দিলেন— তখনি মনে পড়ল চাদরটা যে তাকে উপহার দিয়েছিল তার নাম তিনি মনে করতে পারছেন না। শুধু নাম না, মানুষটার পরিচয়ও তাঁর মনে নেই। মস্তিষ্ক মানুষটার পরিচয় মুছে ফেলেছে। মস্তিষ্ক মাঝে মাঝে এ ধরনের কাজ করে। খুব ঠাণ্ডায় মাথার বিশেষ বিশেষ কিছু স্মৃতির দরজা বন্ধ করে দেয়। মস্তিষ্ক মনে করে এই কাজটি করা প্রয়োজন, দরজা বন্ধ না করলে মস্তিষ্কের ক্ষতি হবে। এমন কোনো পদ্ধতি কি আছে যাতে এই বন্ধ দরজা খোলা যায়?

কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের কিছু কিছু ফাইল হঠাৎ হারিয়ে যেতে পারে। সেই সব ফাইল উদ্ধারের প্রক্রিয়া আছে। মানুষের মস্তিষ্ক তো অবিকল কম্পিউটারের মতোই। স্মৃতি তো কিছু না সাজিয়ে রাখা ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল। কাজেই যে পদ্ধতিতে কম্পিউটারের হারোনো ফাইল খোঁজা হয়— সেই পদ্ধতিতেই বা তার কাছাকাছি পদ্ধতিতে হারানো স্মৃতি খোঁজার চেষ্টা কেন হচ্ছে না?

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে বই নিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর মন যে কোনো কারণেই হোক কিছুটা বিক্ষিপ্ত। মনকে শান্ত করতে না পারলে রাতে ভালো ঘুম হবে না। মন শান্ত করার একটি পদ্ধতিই মিসির আলি জানেন। বই পড়া। সেই বইও হালকা গল্প উপন্যাস না, থ্রিলার না, জটিল কোনো বিষয় নিয়ে লেখা বই। তিনি যে বইটি হাতে নিলেন তার নাম— Dark days. অন্ধকার দিন। লেখক এই পৃথিবীর ভয়াবহ কয়েকজন অপরাধীদের একজন, নাম— David Bertzowitz. তাঁর লেখা আত্মজীবনী। তিনি লিখেছেন—

I have often noticed just how unobservant people are. It has been said that parents are the east to know. This may be true in my case, for I wonder how I at the ages of nine, eleven, thirteen manged to do so many negative things and go unnoticed. It is puzzling in-deed. And I think it is sad.

"আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভালো না। বলা হয়ে থাকে— বাবা-মা'রা সবার শেষে জানতে পারেন। আমার জন্যে এটা সত্যি। আমি খুবই অবাক হই যখন ভাবি ন' বছর, এগারো বছর এবং তের বছরে যে সব অন্ধকার কর্মকাণ্ড আমি করেছি তা কি করে কারোর চোখে পড়ল না। চোখে না পড়ার বিষয়টা রহস্যময় এবং অবশ্যই দুঃখের।"

মিসির আলি লক্ষ্য করলেন তাঁর মন শান্ত হয়েছে। মন নানান দিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি পথে হাঁটছিল— এখন একটি পথে হাঁটছে। বইটির বিষয় বস্তুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। David Berkowitz ঠিকই লিখেছে মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা নিম্ন মানের। সে দেখেও দেখে না।

ফতের মামার কথাই ধরা যাক। ফতের মামা বদরুল সাহেব নিশ্চয়ই কখনো ফতেকে ভালোভাবে দেখেন নি। তিনি নিশ্চয়ই ফতের মানসিকতা তার চিন্তা ভাবনা কিছুই বলতে পারবেন না। ফজরের নামাজ শেষ করে ফতে মর্নিং ওয়াক করতে যায় এই তথ্য তিনি জানেন। কিন্তু কোথায় যায় তা কি জানেন? তিনি কি জানেন যে ফতের অনিদ্রা রোগ আছে সে মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে হাঁটে। এই কাজটা যখন করে সে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। ফতের মামা কি জানেন যে ফতে বাজারের ভারি ব্যাগ নিয়ে যখন ঢুকে তখন ব্যাগটা থাকে তার বাঁ হাতে। বাঁ হাতি মানুষরা এই কাজ করে। ফতে বাঁ-হাতি না। তারপরেও ভারি কাজগুলো সে বাঁ হাতে করে। ডানহাত ব্যবহার করে না।

মিসির আলি চিন্তা বন্ধ করে হঠাৎ নিজের ওপর খানিকটা বিরক্ত বোধ করলেন। ছেলেমানুষী এই কাজটা তিনি কেন করছেন? কেন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ভালো। এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যার পড়াশোনার বিষয় মানুষের মন তাকে তো মানুষ পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। মানুষের দিকে তাকিয়ে তার আচার আচরণ বিশ্লেষণ করে পৌঁছতে হবে মন নামক অধরা বস্তুকে। আচ্ছা মন কি?

মিসির আলি ভুরু কুঁচকালেন। উত্তরটা তাঁর জানা নেই। গত পঁচিশ বছর এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন। উত্তর পান নি। এখন বয়স হয়ে গেছে। যে কোনো একদিন অদ্ভুত ট্রেনে উঠে পড়তে হবে। ট্রেনে উঠার আগে কি উত্তরটা জেনে যাওয়া যাবে না ?

বাড়িওয়ালা বদরুল সাহেবের মেয়েটা কাঁদছে। শিশুরা ব্যথা পেয়ে যখন কাঁদে তখন কান্নার আওয়াজ এক রকম, আবার যখন মনে কষ্ট পেয়ে কাঁদে তখন অন্য রকম। লুনা মেয়েটার কান্না শুনে মনে হচ্ছে সে গভীর দুঃখে কাঁদছে।

মেয়েটা প্রায়ই এ রকম কাঁদে। তখন কিছুতেই তার কান্না থামানো যায় না। বদরুল সাহেব কোলে নিয়ে হাঁটেন। তার স্ত্রী হাঁটেন। আদর করেন, ধমক দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। একটা পর্যায়ে তারা মেয়েকে ফতের কাছে দিয়ে দেন। ফতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত করে ফেলে।

অনেকক্ষণ ধরেই মেয়েটা কাঁদছে। মিসির আলি বই বন্ধ করে বসে আছেন। বাচ্চা একটা মেয়ে গভীর দুঃখে কাঁদবে আর তিনি তা অগ্রাহ্য করে স্বাভাবিকভাবে ঘুমুতে যাবেন— তা কি ভাবে হয় ?

তিনি বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। লুনাকে নিয়ে তার মা দোতলার বান্দায় রেলিং ঘেঁষে হাঁটছেন। এত দূর থেকেও ভদ্রমহিলাকে ক্লান্ত এবং হতাশ মনে হচ্ছে।

মিসির আলি বারান্দা ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন। লুনার কান্নাটা সহ্য করা যাচ্ছে না। তাঁর বিরক্তি লাগছে। কেন মেয়েটার বাবা-মা ফতেকে ডাকছেন না। ফতে নিমিষের মধ্যেই বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

বাচ্চা মেয়েটা কেঁদেই যাচ্ছে। কেঁদেই যাচ্ছে।

২

লুনাকে সামলে রাখার দায়িত্ব পড়েছে ফতের ওপর।

প্রতিমাসে এক-দু'দিন ফতেকে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। কারণ প্রতিমাসে এই এক-দু'দিন তসলিমা খানম যাত্রাবাড়িতে তার বোনকে দেখতে যান। বোনের ক্যান্সার হয়েছে। বাঁচার কোনো আশা ডাক্তাররা দিচ্ছেন না, আবার দ্রুত মরে গিয়ে অন্যদের ঝামেলাও কমাচ্ছে না।

তসলিমার অনুপস্থিতিতে ফতে লুনার দিকে লক্ষ্য রাখে। তাকে বলা আছে একটা সেকেন্ডের জন্যেও যেন মেয়েকে চোখের আড়াল না করে। ফতে তা করে না। সে লুনার আশপাশেই থাকে। লুনা এমনই লক্ষীমেয়ে যে কোনো কান্নাকাটি করে না। খাবার সময় হলে শান্ত হয়ে ভাত খায়। সে শুধু রাতে কাঁদে। মেয়েটির আঁধার ভীতি আছে।

লুনা বারান্দায় বসে আপন মনে খেলছে। হাতের মুঠি বন্ধ করছে, খুলছে। খুব ক্লান্তিকর খেলা কিন্তু ফতের দেখতে ভালো লাগছে।

www.BDeBooks.Com

ফতে ডাকল, লুনা। এই লুনা।

লুনা ফতের দিকে তাকিয়ে হাসল। আবার খেলা শুরু করল। ফতে বলল, লুনা কি কর।

লুনা তার হাতের মুঠি থেকে চোখ না তুলেই বলল, খেলি।

'এই খেলার নাম কি ?'

'জানি না।'

'মা কোথায় গেছে লুনা ?'

'জানি না।'

'মা কোথায় গেছে আমি জানি। সে প্রতি মাসে দুই-তিন দিন কোথায় যায় সেটা আমি জানি। বোনকে দেখতে যাবার নাম করে যায়। বোনকে দেখতে ঠিকই যায়। বোনের কাছে দশ পনেরো মিনিট, খুব বেশি হলে আধঘণ্টা থাকে। বাকি সময়টা কোথায় থাকে আমি জানি।'

লুনা ফতের দিকে তাকিয়ে আছে। সে মিষ্টি করে হাসল।

ফতে বলল, তোমার মা কোথায় যায় আমি জানি। কি ভাবে জানি বলব ?

লুনা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ফতে হতাশ মুখে বলল, কিভাবে জানি বললে তুমি বুঝবে না। এই জন্যে বলব না। অবশ্যি বুঝতে পারলেও বলতাম না।

ফতে লুনার মতো খেলা নিজেও খেলতে শুরু করল। লুনা তাতে খুব মজা পাচ্ছে। খিলখিল করে হাসছে।

'আইসক্রিম খাবে ?'

লুনা খুশি হয়ে মাথা নাড়ল।

ফতে বলল, চল আইসক্রিম খেয়ে আসি।

লুনা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ফতে বলল, চিড়িয়াখানায় যাবে ?

লুনা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তার চোখ চকচক করছে। এর আগেও সে ফতের সঙ্গেই কয়েকবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। লুনাকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এক পাও যাবার অনুমতি নেই। তারপরেও ফতে লুনাকে নিয়ে পাঁচ থেকে ছ'বার চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। কেউ কিচ্ছু ধরতে পারে নি। কাজের মেয়েটা কিছু বলে দেয় নি, আবার দারোয়ানও নালিশ করে নি। ফতে নিশ্চিত আজও কেউ কিছু ধরতে পারবে না। চিড়িয়াখানা যাওয়া, চিড়িয়াখানা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টার মামলা।

ফতে লুনাকে শুধু যে চিড়িয়াখানা দেখাল তা-না—এয়ারপোর্ট নিয়ে গিয়ে প্লেন ওঠা নামা দেখাল। এটা ফতের নিজের খুব পছন্দ। বিরাট একটা জিনিস কেমন করে শাঁ করে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

'লুনা কেমন লাগল ?'

লুনা হাসল, কিছু বলল না।

'শুধু হাসলে হবে না, মুখে বল ভালো।'

'ভালো।'

'এখন বল আমি লোকটা কেমন?'

লুনা আবার হাসল।

'আরেকটা আইসক্রিম খাবে?'

'হুঁ।'

ফতে দু'টা আইসক্রিম কিনল। একটা তার জন্যে একটা লুনার জন্যে। লুনা নিজে আইসক্রিম খেলে যত খুশি হয় বড় কাউকে আইসক্রিম খেতে দেখলে তার চেয়েও বেশি খুশি হয়। লুনাকে খুশি রাখা ফতের প্রয়োজন। খুশি রাখা না পোষ মানিয়ে ফেলা। এই কাজটা মনে হয় খুব সহজ— আসলে খুব কঠিন। বড়দের পোষ মানানো সহজ, শিশুদের পোষ মানানো কঠিন। ভয়ঙ্কর কঠিন। কারণ শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে— বড়রা পারে না।

লুনার ব্যাপারটা ভিন্ন। সে শিশু হলেও জড়বুদ্ধির কারণে অনেকটাই পশুর মতো। খাবার দিয়ে, মিথ্যা মমতা দিয়ে পশুদের পোষ মানানো যায়। যে কসাই গরু জবেহ্ করবে সে যদি গরুটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় গরু তাতে আনন্দ পায়। চোখ বন্ধ করে লেজ নেড়ে আদর নেয়। আদরের সত্যি-মিথ্যা ধরতে পারে না।

'লুনা আরেকটা আইসক্রিম খাবে?'

লুনা আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। আবার তার চোখ চকচক করে উঠল।

ফতে আবারো আইসক্রিম কিনল। এই মেয়েটা পোষ মেনেই আছে। পোষ মানানোটা আরো বাড়াতে হবে। মেয়েটাকে নিয়ে তার কিছু পরিকল্পনা আছে।

'লুনা বাসায় যাবে?'

'না।'

'চল আজ বাসায় চলে যাই। খুব তাড়াতাড়ি আবার বেড়াতে আসব। তখন আর বাসায় ফিরব না। আচ্ছা?'

লুনা মনের আনন্দে ঘাড় কাত করল।

ফতে যে তিন ঘণ্টা লুনাকে নিয়ে ঘুরে এসেছে ব্যাপারটা প্রকাশিত হল না। তসলিমা বেগমের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে ফতে নিজের কাজে বের হল। দোকানটা ঠিক করতে হবে। সাইনবোর্ড বানাতে দিতে হবে। হঠাৎ হঠাৎ দোকানে থাকতে হতে পারে। তার জন্যে বিছানা বালিশ লাগবে। মশারি লাগবে। তার নিজের জন্যও বাসা ভাড়া করা দরকার।

বুড়িগঙ্গায় বাড়ি ভাড়ার মতো নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। নৌকার ভেতর ঘুমানোর ব্যবস্থা। নৌকার ভেতরই রান্নাঘর, বাথরুম। দু'মাস, তিন মাসের জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করে ফেলা। স্থায়ী বাড়ির চেয়ে, নৌকা বাড়ি অনেক ভালো। যেখানে সেখানে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায়। কয়েকটা নৌকাওয়ালার সঙ্গে ফতের আলাপ হয়েছে। পছন্দই নৌকা পাচ্ছে না। তাড়াহুড়া করে একটা

www.BDeBooks.Com

নৌকা নিয়ে নিলেই হবে না। কোনো কিছু নিয়েই তাড়াহুড়া করা ঠিক না। আল্লাহকে কোরান শরীফেও বলেছেন— "হে মানব সন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।" ফতে তাড়াহুড়ায় বিশ্বাস করে না।

রাত এগারটা বাজে। ফতে বসে আছে তাদের বাসার পেছনে মিউনিসিপালিটির ফাঁকা জায়গাটার ভেতরে কংক্রিটের এক চেয়ারে। জায়গাটার নাম— শিশু বিনোদন পার্ক। এই নামে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জায়গার উদ্বোধন করেছেন। শ্বেত পাথরের একটা ফলকে এই বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্বোধনের দু'দিন আগে তড়িঘড়ি করে কয়েকটা লম্বা চেয়ার বসানো হয়েছে। একটা স্লাইড, এবং দুটা সি-সো একটা দোলনা আনা হয়েছে, বসানো হয় নি। যেহেতু উদ্বোধন হয়ে গেছে এখন আর বসানোর তাড়া নেই। জিনিসগুলি রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। দোলনাটা অবশ্যি কিছু কাজে লাগছে। দোলনার খুঁটিতে দড়ি লাগিয়ে পলিথিন ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে আসা একটা পরিবার সুন্দর সংসার পেতে ফেলেছে।

ফতে এই পরিবারটিকে শুরু থেকেই লক্ষ্য করছে। বাবা-মা তের-চৌদ্দ বছরের একটা বড় বড় চোখের রোগা মেয়ে। এরা দিশাহারা ভঙ্গিতে একদিন পার্কে ঢুকল, ফতে তখন বেঞ্চিতে বসে বাদাম খাচ্ছে। লক্ষ্য রাখছে পরিবারটি কি করে। স্বামী-স্ত্রী নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলল। লোকটি এগিয়ে এল ফতের দিকে। ভিক্ষা চাইতে আসছে না এটা বোঝা যাচ্ছে। গ্রাম থেকে যারা আসে তারা এসেই ভিক্ষা করা শুরু করতে পারে না। সময় লাগে।

'ভাইসাব এইটা কি সরকারি জায়গা?'

লোকটা খুবই বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করছে। তার স্ত্রী ও কন্যা আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ফতে বলল, হ্যাঁ এটা মিউনিসিপালটির জায়গা।

'সরকারি জাগাত আমরা যদি থাকি কোনো অসুবিধা আছে?'

'কোনো অসুবিধা নাই— থাকেন?'

'আমরা এই পরথম ঢাকা শহরে আসছি। কাজের ধান্দায় আসছি।'

'ভালো করেছেন।'

'এই জায়গাটা কি নিরাপদ?'

'আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্যে নিরাপদ। আপনাদের মেয়ের জন্য নিরাপদ না। একদিন দেখবেন মেয়ে নাই।'

লোকটা ভীত মুখে তাকিয়ে রইল। ফতে বলল, মেয়ের নাম কি?

'মেয়ের নাম দিলজান।'

'দিলজানকে বাকির খাতায় ধরে সংসার পাতেন কোনো সমস্যা নাই। আপনার দেখাদেখি আরো অনেকে উঠে আসবে। সুন্দর একটা বস্তি তৈরি হয়ে যাবে। আপনাদের সাহায্যের জন্যে এনজিওরা আসবে। সুন্দর সুন্দর স্মার্ট মেয়েরা ভিটামিন এ ট্যাবলেট দিয়ে যাবে। বয়স্করা স্কুলে ভর্তি হবে। নানান রকম পরীক্ষা হবে।'

'কি বলতেছেন কিছু বুঝতাছি না জনাব।'

'বোঝবার কিছু নাই। সংসার পাততে চান— পাতেন। নেন সিগারেট নেন।'

লোকটা একবার সিগারেটের দিকে তাকাচ্ছে একবার তার কন্যার দিকে তাকাচ্ছে। অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে সিগারেট নেয়া ঠিক হবে কি-না বুঝতে পারছে না আবার আস্ত সিগারেটের লোভও ছাড়তে পারছে না। শেষ পর্যন্ত লোভ জয়ী হল— সে সিগারেট নিয়ে চলে গেল।

ফতে ফজলু মিয়ার পরিবারের পরবর্তী কর্মকাণ্ডে প্রায় মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা অতি দ্রুত সংসার সাজিয়ে ফেলল। প্রথম দিনেই লোকটির স্ত্রী চুলা বানিয়ে ফেলল— চুলার আশপাশের কিছু অংশ লেপে ফেলল। সেখানে একটা মোড়া এবং কাঠের গুঁড়ি চলে এল। এক রাতে দেখা গেল চুলার উপরে কাপড় শুকানোর মতো করে লম্বা তার টানানো হয়েছে। সেই তারে মাছ শুকানো হচ্ছে। লোকটিও চালাক— ঠেলা চালানোর কাজ যোগাড় করে ফেলল। দিনের বেলা ঠেলা চালায়, রাতে এক চায়ের দোকানের এসিসটেন্ট। মেয়েটিকে নিয়ে এখনো তাদের কোন সমস্যা হয় নি। তবে তারা এখন একা না, আরো চার-পাঁচটি পরিবার চলে এসেছে। এখন নিশ্চয়ই তাদের খানিকটা জোর হয়েছে।

ফজলু রান্না চড়িয়েছে। তার কাছেই দিলজান। বাবার সঙ্গে নিচুগলায় গল্প করছে, মাঝে মাঝে চুলার খড়ি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছে। রান্না আজ অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে ফজলুর স্ত্রী অসুস্থ। ফতে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফজলুর দিকে এগিয়ে গেল, আগুনের পাশে বসে সিগারেটটা শেষ করলে ভালো লাগবে।

'ফজলু কেমন আছ ?'

ফতে নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। ফজলু বুঝতে পারে নি বলে ভয়ঙ্কর চমকে গেল। ফতেকে দেখে সে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। চোখে মুখে ভয়ের ভাবটা থেকে গেল। শুকনো গলায় বলল, "জে ভাল আছি। আপনের শইল ভাল।" এই বলেই সে ফতে যাতে দেখতে না পায় এমন ভঙ্গিতে মেয়েকে চোখের ইশারা করল— যার অর্থ তুই এখানে থাকিস না। ঘরে ঢুকে যা। মেয়ে বাবার আদেশ পালন করল। ফতে পুরো প্রক্রিয়াটি দেখল। তার চেহারায় কোনো ভাবান্তর হল না। দিলজান যে মোড়ায় বসেছিল ফতে সেই মোড়াতে বসতে বসতে বলল— কি রান্না হচ্ছে ?

ফজলু বিনীত গলায় বলল, গরিবের খাওয়া খাদ্য।

গরিবের খাওয়া খাদ্যটা কি ? আমার তো মনে হচ্ছে মাংস রান্না হচ্ছে। ভালো ঘ্রাণ বের হচ্ছে।

'দিলজান মাংস খাইতে চায়। কয়েক দিন ধইরা বলতেছে। দুই দিন পরে বিবাহ কইরা শ্বশুর বাড়িতে যাইব। আমার কাছে যে কয়দিন আছে শখ মিটিয়ে দেই।'

'বিয়ে ঠিক হয়েছে না-কি ?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বে না, তবে এইটা নিয়া চিন্তা করি না। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ আল্লাপাকের ঠিক করা। উনি যেখানে ঠিক করেছেন সেইখানেই হবে।'

'রোজগার পাতি কেমন হচ্ছে ?'

'খারাপ না। আল্লা মেহেরবান— রোজই কাজ পাই। গতর খাটনি কাম— তয় গাছপালার কাম পাইলে ভালো হইত।'

'গাছপালার কামটা কি ?'

ফজলু উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বসল। আগ্রহের সঙ্গে বলল,— ঢাকা শহরে দেখছি রাস্তায় রাস্তায় গাছপালা বেচে। ফুলের গাছ, ফলের গাছ। গাছ বেচতে পারলে ভালো হইত। গাছপালা আমার হাতে খুব হয়।

ফতের সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সে সিগারেটের টুকরাটা দূরে ফেলে আরেকটা ধরাতে ধরাতে বলল— নার্সারির কাজ খারাপ না, কোনো ফুটপাত দখল করে বসে পড়লেই হয়। তবে ব্যবসাটা কি ভাবে হয় জানতে হবে। গাছপালা যোগাড় করতে হবে। আমি এক নার্সারির মালিককে চিনি তার সাথে আলাপ করে দেখতে পারি।

ফজলুর চোখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে চোখের সামনে দেখছে অসংখ্য গাছপালা সাজিয়ে সে বসে আছে। শহরের লোকজন বড় বড় গাড়ি নিয়ে আসছে। চকচকে নোট বের করে গাছ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফতে বলল— সিগারেট খাবে ? ফজলু আনন্দের সঙ্গে বলল, দেন একটা টান দেই।

ফতে সিগারেট দিল। ফজলু চুলা থেকে জ্বলন্ত লাকড়ি বের করে সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল— গাছের ব্যবসার খোঁজ খবর নিয়েন। আমি কলমের কামও খুব ভালো জানি।

'তাই নাকি ?'

'জ্বি। আমরার গেরামের যত তিতকুট বরই গাছ আছে— কলম দিয়া সব বরই মিষ্টি বানায়ে দিছি। আমরার গেরামে আমারে কি ডাকত জানেন ভাইজান ? আমারে ডাকত গাছ ডাকতর।'

'তোমার গ্রামের নাম কি ?'

'শুভপুর। বড়ই সৌন্দর্য জায়গা। কপালে নাই বইল্যা থাকতে পারলাম না।'

ফতে উঠে পড়ল। রাত বারটার আগে তাকে বাড়িতে পৌঁছতে হবে। রাত বারটার সময় মূল গেট বন্ধ হয়ে যায়। দারোয়ান গেটে তালা লাগিয়ে গেটের পাশে বেঞ্চিতে বসে ঘুমাবার আয়োজন করে। তার ওপর নির্দেশ আছে বারটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যাবে। তখন গেট খুলতে হলে মালিকের অনুমতি লাগবে। গেট খোলার সময় তিনি উপস্থিত থাকবেন।

ফতের বেলায় হয়ত এটা হবে না। দারোয়ানের সঙ্গে তার ভালই খাতির আছে, তারপরেও রিস্ক নেবার দরকার কি ? মামা যদি জেগে থাকে গেট খোলার শব্দে অবশ্যই বারান্দায় এসে দাঁড়াবে। চিলের মতো গলায় বলবে— কে আসল ? ও আচ্ছা, বাংলার ছোট লাট সাহেব।

ফতে থাকে তার মামার বাড়ির গ্যারাজে।

মামা গাড়ি কেনেন নি বলে তাঁর গ্যারাজ খালি। তিনি কখনো গাড়ি কিনবেন এরকম মনে হয় না। দরিদ্র লোকজন যখন টাকা-পয়সা করে তখন জমি কেনে বাড়ি বানায়। কেউ কেউ এক পর্যায়ে গাড়ি কেনার মত সাহস সঞ্চয় করে ফেলে আর কেউ কোন দিনই তা পারে না। বদরুল সাহেব দ্বিতীয় দলের। গাড়ি না কিনলেও তিনি একটা বেবিটেক্সি কিনেছেন। "প্রাইভেট" সাইনবোর্ড লাগানো বেবিটেক্সিতে করে তিনি ঘুরে বেড়ান, তাঁর ব্যবসা বাণিজ্য দেখেন।

গ্যারাজে দুটো চৌকি আছে। একটায় ফতে ঘুমায় পাশেরটায় বেবিটেক্সির ড্রাইভার বাদল। তবে বেশির ভাগ সময় বাদল তার বাড়িতে চলে যায়। হঠাৎ হঠাৎ বেবিটেক্সির চালানোর প্রয়োজন পড়লে ফতে চালায়। তার লাইসেন্স নেই কিন্তু বেবিটেক্সি সে ভালই চালাতে পারে। যদিও বদরুল সাহেব তার ভাগ্নের বেবিটেক্সি চালনোয় কোনো ভরসা পান না। সারাক্ষণ টেনশনে থাকেন সারাক্ষণ উপদেশ দিতে থাকেন— এই গাধা আস্তে চালা। এই গাধা তোর ওভারটেক করার দরকার কি ? তোর কি হাগা ধরেছে ? হর্ন দেস না কেন ? হর্ন না দিলে রিকশাওয়ালা বুঝবে কি করে তার পিছনে বেবিটেক্সি ? রিকশাওলার মাথার পিছনে কি চক্ষু আছে ?

বাসায় পৌঁছেই ফতে দেখে উঠানে জটলা। তার মামা ব্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। ফতেকে দেখেই তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন— রাত বারটা বাজে তুই ছিলি কোথায় ? মদ ধরেছিস নাকি ? মদের আখড়ায় ছিলি ? গা দিয়ে তো মদের গন্ধ বের হচ্ছে। মাল টেনে এসেছিস ?

ফতে জবাব দিল না। উত্তপ্ত মুহূর্তে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকতে হয়। মামা অতি উত্তপ্ত।

'বেবিটেক্সি বের কর। তোর মামীকে হাসপাতালে নিতে হবে। হঠাৎ তার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। ব্যথায় হাত পা নীল হয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম না কি ব্যাপার।'

ফতে বলল, কোন হাসপাতালে যাবেন মামা ?

'আরে গাধা গাড়ি বের কর আগে। বেহুদা কথা বলে সময় নষ্ট।'

ফতে বলল, ব্যথা থাকবে না মামা। কমে যাবে।

বদরুল ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, তুই কি গনক এসেছিস ? গণা গুনে বলে দিলি ব্যথা কমে যাবে। কথা বলে সময় নষ্ট। গাড়ি স্টার্ট দে।

ফতে গাড়ি স্টার্ট দিল। বদরুল তাঁর স্ত্রীকে হাত ধরে নিচে নিয়ে এলেন। তারা গাড়িতে উঠার পরপরই ফতের মামি বলল, ব্যথা কমে গেছে।

বদরুল বললেন— কতটুকু কমেছে ?

'অনেক কম। বলতে গেলে ব্যথা নাই।'

'একটু আগে কাটা মুরগির মত ছটফট করছিলে এখন বলছ ব্যথা নাই।'

'হাসপাতালে যাব না।'

www.BDeBooks.Com

'আবার যদি শুরু হয়?'

'শুরু হলে তখন যাব।'

বদরুল স্ত্রীকে হাত ধরে নামালেন। ফতের দিকে তাকিয়ে বললেন— তুই ঘুমাবি না। তোর মরণ ঘুম। একবার ঘুমালে কার সাধ্য তোকে ডেকে তুলে। তুই জেগে বসে থাকবি। তোর মামির ব্যথা আবার উঠবে বলে আমার ধারণা।

ফতে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। এবং ফজরের আজান না পড়া পর্যন্ত জেগে বসে রইল। অনেকের রাত জাগতে কষ্ট হয় ফতের কখনো হয় না। বরং রাত জাগতে তার ভালো লাগে। রাতে নানান চিন্তা করতে তার ভালো লাগে। এই চিন্তা দিনে কখনো করতে ভালো লাগে না। দিনে অবশ্যি চিন্তাগুলি মাথায় আসেও না। চিন্তাগুলি রাতের। রাত যত গভীর হয় চিন্তাগুলিও গভীর হয়।

ফতের আশপাশের সব মানুষকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কাকে কিভাবে শাস্তি দেয়া যায়— এই নিয়ে চিন্তা। যেমন মামা বদরুল আলম। তাঁকে নানান ভাবে শাস্তি দেয়া যায়— নরম শাস্তি, নরমের চেয়ে একটু বেশি— কঠিন শাস্তি। তবে মামার মানসিক অবস্থা এইরকম যে— যে কোনো শাস্তিই তার জন্যে কঠিন শাস্তি। ফতে একেক সময় একেক ধরনের শাস্তির কথা ভাবে। গতরাতে ভেবেছে সে তার মামিকে নিয়ে কিছু আজেবাজে কথা লিখে বেনামে মামার কাছে একটা চিঠি লিখবে। এই শাস্তিটা হবে খুবই কঠিন। কারণ তার মামার অসংখ্য দোষ থাকলেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাগলের মতো ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলেই সন্দেহের চোখে দেখেন। স্ত্রীকে একা কোথাও যেতে দেবেন না। সব সময় নিজে সঙ্গে যাবেন। তাঁর স্ত্রীকে কেউ টেলিফোন করলে তিনি তৎক্ষণাৎ এক তলায় চলে যাবেন। অতি সাবধানে একতলার টেলিফোন রিসিভার কানে নিয়ে শুনবেন কে টেলিফোন করেছে। একতলার টেলিফোন এবং দোতলার টেলিফোন প্যারালাল কানেকশান আছে। তাঁর স্ত্রীর নামে যে সব চিঠি আসে তার প্রত্যেকটা তিনি আগে পড়ে তারপর স্ত্রীর হাতে দেন! এই যখন অবস্থা তখন যদি তার কাছে একটা চিঠি আসে যার বিষয়বস্তু ভয়াবহ তখন কি হবে? চিঠিটা এ রকম হতে পারে—

জনাব বদরুল আলম সাহেব,

সালাম, পর সমাচার, আমি আপনাকে কিছু গোপন বিষয় জানাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। বিষয়টি অত্যধিক গোপন বলিয়া আমি আমার নিজের পরিচয়ও গোপন রাখিলাম। এই ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন— ইহাই আমার কামনা। যাহা হউক এখন মূল বিষয়ে আসি— আপনার স্ত্রী তসলিমা খানম বিষয়ে কিছু কথা। তসলিমা খানম যখন বিদ্যাসুন্দরী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখন জনৈক তরুণের সঙ্গে তাহার অতীব ঘনিষ্ঠতা হয়। যে ঘনিষ্ঠতার কথা ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। উক্ত তরুণ দুষ্ট

প্রকৃতির ছিল, সে তসলিমা খানমের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কিছু ছবি গোপনে তাহার আরেক দুষ্ট বন্ধুর সহায়তায় তুলে। ছবির সর্বমোট সংখ্যা একুশ। এই একুশটি ছবির মধ্যে পাঁচটি ছবি এতই কুরুচিপূর্ণ যে যেকোনো মানুষ শিহরিত হইবে। জনাব আপনাকে উত্তেজিত এবং ছবির কারণে ভীত হইতে নিষেধ করিতেছি। কারণ আমি সমুদয় ছবির নিগেটিভসহ সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছি। কাজেই উক্ত ছবি দেখাইয়া কেহই অর্থ সংগ্রহের জন্যে আপনাকে চাপ দিতে পারিবে না। আপনাকে এই তথ্য জানাইয়া রাখিলাম। এখন কেহ যদি ব্লেক মেইলের মাধ্যমে ছবির কথা বলিয়া আপনার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করে আপনি ইহাকে মোটেই আমল দিবেন না।

হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন জাগিতেছে আমি এই কাজটি কেন করিলাম ? আমি কাজটি করিলাম কারণ আমার কাছে মনে হইয়াছে ইহা একটি সৎকর্ম। ইহকালে আমি সৎকর্মের কোনো প্রতিদান আশা করি না। কিন্তু পরকালে আমি এই সৎকর্মের প্রতিদান অবশ্যই পাইব।

এখন জনাব আপনার নিকট আমার একটি আবদার— আমি আপনার মঙ্গলের জন্যে একটি কঠিন কর্ম করিয়াছি। আমি আশা করি তাহার প্রতিদানে আপনি আমার একটি আবদার রক্ষা করিবেন। আবদারটি হইল— এই বিষয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কোনো আলোচনা করিবেন না। উঠতি বয়সে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন— সেই ভুল ক্ষমা করিবেন। আল্লাহপাক ক্ষমা পছন্দ করেন।

আরজ ইতি,
আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী জনৈক নাদান।

এই এক চিঠিতেই চৌদ্দটা বেজে যাবার কথা। শাস্তির শুরু। তারপর আস্তে আস্তে শাস্তির ডোজ বাড়াতে হবে।

ফতে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। মিথ্যা চিঠি মানুষ বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কখনো টিকে না। খুব বেশি সাত দিন। মিথ্যার আয়ু অল্প। শাস্তি দিতে হলে— সত্যি দিয়ে শাস্তি দিতে হবে। সেই ধরনের 'সত্য' কিছু বিষয় ফতে জানে। অন্যভাবে জানে। এমনভাবে জানে যার সম্পর্কে ধারণা করা মানুষের জন্যে কঠিন। বেশ কঠিন। ফতে ক্ষমতাধর মানুষ। তার ক্ষমতা অন্য রকম ক্ষমতা।

ফতে সিগারেট ধরাল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। গলা থেকে মাফলার খুলে সে কান ঢাকল। মিসির আলি সাহেবের ঘরে বাতি জ্বলছে। বুড়ো এখনো জেগে গুটুরগুটুর করে বই পড়ছে। একটা মানুষ দিন রাত বই পড়ে কি ভাবে কে জানে ? এত জ্ঞান নিয়ে কি হবে ? মৃত্যুর পর সব জ্ঞান নিয়ে কবরে যেতে হবে। যে মাথায় গিজগিজ করত জ্ঞান সেই মাথার মগজ পিঁপড়া খেয়ে ফেলবে। শরীরে ধরবে পোকা। ফতে সব মানুষকে চট করে বুঝে ফেলে এই

www.BDeBooks.Com

মানুষটাকে এখনো বোঝো যাচ্ছে না। কখনো মনে হয় মানুষটা বোকা। শুধু বোকা না— বোকাদের উজির-নাজির। আবার কখনো মনে হয় লোকটা মহাচালাক। সে আসলে চালাকদের উজির-নাজির। তার কাজের একটা ছেলে আছে তার সাথে যে ভাবে কথা বলে মনে হয় নিজের ছেলের সঙ্গে কথা বলে। একদিন সে বাড়িতে উঁকি দিয়ে দেখেছে দু'জন পাশাপাশি বসে ভাত খাচ্ছে। আরেক দিনের কথা ফতের স্পষ্ট মনে আছে। সে গিয়েছে বাড়ি ভাড়া আনতে। মিসির আলি সাহেব তখন নিজেই চা বানাচ্ছিলেন। ফতেকে বাড়ি ভাড়া আনতে। মিসির আলি সাহেব তখন নিজেই চা বানাচ্ছিলেন। ফতেকে বললো, চা খাবে ? ফতে বলল, না। এখন কাজের ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়াসিন চা খাবি ? ইয়াসিন গম্ভীর গলায় বলল, হ। চিনি বেশি দিয়েন। ফতে অবাক হয়ে দেখল মিসির আলি কাজের ছেলের জন্যে চা বানিয়ে আনছেন।

লোকটা না-কি অনেক জটিল বিষয় জাগে। কি জানে কতটুক জানে তা ফতের দেখার ইচ্ছা। জটিল বিষয় ফতে নিজেও জানে। তাকে কেউ চিনে না কারণ সে বলতে গেলে— এক বাড়ির কাজের লোক, বেবিটেক্সির ড্রাইভার। তার কথা কে বিশ্বাস করবে ? সে যদি বলে এই দুনিয়ার জটিল বিষয় আমি যত জানি— আর কেউ এত জানে না। তাহলে কেউ কি তা বিশ্বাস করবে ? কেউ বিশ্বাস করবে না। কারণ সে মিসির আলির মত জ্ঞানী না। সে ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো দূরে থাকুক— নিজে ইউনিভার্সিটির ধারে কাছে কোনদিন যায় নাই। যাওয়ার ইচ্ছাও নাই। সে যা শিখেছে নিজে নিজে শিখেছে। সবার ওস্তাদ থাকে তার কোনো ওস্তাদ নাই।

ফতের ইচ্ছা করে মিসির আলিকেও শাস্তি দিতে। জ্ঞানী লোকের জন্য জ্ঞানী শাস্তি। মনে কষ্ট দেয়া শাস্তি। এই লোকটা কিসে কষ্ট পাবে তা আগে বের করতে হবে। মানুষ হল মাছধরা জালের মত। মাছধরা জালে দুই একটা সুতা ছেঁড়া থাকে। মানুষের জালেও সে রকম ছোঁড়া সূতা আছে। সুতার ছেঁড়া জায়গাটা হল তার দুর্বল জায়গা। আক্রমণ করতে হয় দুর্বল জায়গায়। ফতের ধারণা মিসির আলির দুর্বল জায়গা তার জ্ঞান। ধাক্কাটা দিতে হবে তার জ্ঞানে। প্রমাণ করে দিতে হবে এত আগ্রহ করে যে জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে সেই জ্ঞান ভুল। কাজটা কঠিন, তবে খুব কঠিন না।

ফজুল মিয়াকেও শাস্তি দিতে হবে। আজ সে চোখের ইশরায় তার মেয়েকে সরে যেতে বলল। যেন ফতে কোন দুষ্ট লোক। দুষ্ট লোকের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করার চেষ্টা। ফজলু ঠিকই ভেবেছে ফতে মিয়া দুষ্ট লোক। কিন্তু কি কি রকম দুষ্ট লোক তা সে জানে না। জানার কথাও না। ফতে নিজেই জানে না, সে কিভাবে জানবে ? ফজলু ভেবেছে ফতে তার চোখের ইশারা দেখতে পায় নি। ফতে ঠিক দেখেছে। কাজেই ফজলু মিয়াও শাস্তি পাবে। তার শাস্তি আবার হবে অন্য রকম। শাস্তি হল জামার মতো। সাইজ হিসাঁবে জামা বানাতে হয়।

কাঁধের পুট ঠিক থাকতে হয়, হাতার মুহুরি ঠিক থাকতে হয়, কলার ঠিক থাকতে হয়। যে কোনো শাস্তিই হতে হয় মাপ মতো।

ফতে সিগারেট ধরাল। শীত আরো বেড়েছে। কুয়াশা বাড়ছে। কুয়াশায় মাথার মাফলার ভিজে যাচ্ছে। তার জেগে বসে থাকার কথা— সে নিজের ঘরে জেগে বসে থাকতে পারে। তা না করে সে আগের জায়গাতেই বসে রইল। সে হালকাভাবে শিস দিচ্ছে এবং পা নাচাচ্ছে। তাকে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

লুনা কাঁদতে শুরু করেছে। কেঁদেই যাচ্ছে। কেঁদেই যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফতের ডাক পড়বে। ফতে অপেক্ষা করতে লাগল। এখনো ডাক আসছে না। মেয়ের মা মেয়েকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। লাভ হচ্ছে না। আচ্ছা এমন কি হবে যে বিরক্ত হয়ে লুনাকে কোলে নিয়ে তার মা বারান্দায় এল তারপর বিরক্ত হয়ে দোতলা থেকে মেয়েকে ফেলে দিল ?

হওয়া বিচিত্র কিছু না। এই দুনিয়ায় অনেক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে।

৩

বদরুল সাহেবের হাতে দাওয়াতের একটা কার্ড। দাওয়াতের কার্ডটা মিসির আলির। বদরুল সাহেবের ঠিকানায় এসেছে, তিনি নিজেই কার্ড দিতে এসেছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র। মিসির আলি বললেন, আপনার আসার প্রয়োজন ছিল না। কার্ডটা কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হত।

বদরুল সাহেব বললেন, আপনার সঙ্গে তো কথা হয় না, ভাবলাম এই সুযোগে দু'টা কথা বলে আসি। ঢাকা শহরে ভাড়াটে আর বাড়িওয়ালা মধ্যে সুসম্পর্ক হয় না। আমি চাই সুসম্পর্ক।

মিসির আলি বললেন, আপনি বসুন।

বদরুল সাহেব বললেন, বসব না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যাব। নানান ব্যস্ততায় থাকি। বসে গল্প গুজব করার মতো সময় কোথায় ? আমার বাড়িতে আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

'জ্বি না।'

'অসুবিধা হলে সরাসরি আমাকে বলবেন। আগে ফতেকে বললেই হত। এখন আবার ফতে দোকান দিয়েছে। আলাদা বাসা নিবে।'

'আমার কোনো সমস্যা হলে আমি আপনাকেই বলব।'

'আপনার কাজের ছেলেটাকে এক কাপ চা দিতে বলুন। চা খেয়েই যাই। নিজের বাড়ির চায়ের চেয়ে অন্যের বাড়ির চা খেতে সব সময়ই ভালো লাগে।'

মিসির আলি খানিকটা শংকিত বোধ করলেন। খুব যারা কাজের মানুষ তারা মাঝে মাঝে গা এলিয়ে দেয়। এই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে গা এলিয়ে দিতেই এসেছেন। মিসির আলির হাতে কোনো কাজকর্ম নেই— তারপরেও আজ তিনি সামান্য ব্যস্ত। ঢাকা মেডিকেল এসোসিয়েশনের একটা সেমিনারে যাবেন বলে

www.BDeBooks.Com

ঠিক করেছেন। সব কিছু থেকে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। এই কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

বদরুল সাহেব চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, আপনি কি করেন এটাই এখনো জানলাম না। আপনি করেন কি ?

মিসির আলি বললেন, কিছু করি না।

'রিটায়ার করেছেন তাই তো ?'

'রিটায়ারও করি নি। মাস্টারি করতাম। চাকরি চলে গিয়েছিল।'

'বলেন কি আপনার চলে কি ভাবে ?'

'কয়েকটা বই লিখেছিলাম— সেখান থেকে রয়েলটি পাই। এতে কষ্ট টষ্ট করে চলে যায়।'

'বই বিক্রি বন্ধ হয়ে গেলে কি করবেন ?'

'তখন খুব সমস্যায় পড়ব।'

'ফতের কাছে শুনলাম, বিয়েও করেন নি।'

ঠিকই শুনেছেন। এতে একদিকে দিয়ে সুবিধা হয়েছে— টাকা-পয়সার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে রাস্তায় নেমে পড়ব। একা মানুষের জন্যে বিরাট শহরে বাসস্থান ছাড়া বাস করা তেমন কঠিন না।

বদরুল সাহেব বিস্মিত গলায় বললেন, রাতে ঘুমাবেন কোথায় ? বাথরুম করবেন কোথায় ?

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বদরুল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, ইতস্তত করে বললেন— বাড়ি ছাড়ার আগে আমাকে এক মাসের নোটিশ দিতে হবে।

মিসির আলি বললেন, নোটিশ অবশ্যই দেব। আপনি চা না খেয়ে উঠে যাচ্ছেন।

'চা খাব না।'

মিসির আলির মনে হল এই ভদ্রলোক তার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি এখন মিসির আলিকে ভাড়াটে হিসেবে দেখছেন না— একজন ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে দেখছেন। ছিন্নমূল মানুষের সঙ্গে কোনো বাড়িওয়ালা কখনো গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করবে না। মিসির আলির মনে হল— খুব শিগগিরই তিনি বাড়ি ছাড়ার নোটিশও পাবেন। যে ভাড়াটের টাকা পয়সার সাপ্লাইয়ের ঠিক নেই তাকে কোনো বাড়িওয়ালা রাখবে না।

বদরুল সাহেব চলে যাওয়ায় মিসির আলির জন্যে খানিকটা সুবিধা হল। সেমিনারে যাওয়া যাবে। শুধু সেমিনার না, তিনি ঠিক করলেন— বিয়ের যে নিমন্ত্রণটি পেয়েছেন, সেখানেও যাবেন। প্লেট ভর্তি করে পোলাও নেবেন। হাতাহাতি করে রেজালা নেবেন। একগ্লাস বোরহানি থাকা সত্ত্বেও আরো একগ্লাস নিতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে গ্লাস ফেলে পাশের জনের জামা-কাপড়

ভিজিয়ে দেবেন। নগরে বাস করতে হলে নাগরিক মানুষ হতে হয়। মিসির আলি ঠিক করলেন, তিনি পুরোপুরি নাগরিক মানুষ হবার একটা চেষ্টা চালাবেন।

সেমিনারের বিষয়বস্তু বয়োসন্ধিকালিন মানসিক জটিলতা। গেস্ট স্পিকার অধ্যাপক স্টাইনার এসেছেন আমেরিকা থেকে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি সস্ত্রীক দশদিনের জন্যে এসেছেন। বাংলাদেশে একদিন থেকে চলে যাবেন নেপালের পোখরায়। দু'দিন ছুটি কাটিয়ে যাবেন নয়াদিল্লি। নয়াদিল্লির আরেকটি সেমিনার শেষ করে ইজিপ্ট হয়ে দেশে ফিরবেন। প্রফেসার স্টাইনারের মূল স্পনসর দিল্লির মেডিকেল এসোসিয়েশন। বাংলাদেশ ফাঁকতালে ঢুকে পড়েছে। যেহেতু নেপাল যাবার পথে বাংলাদেশের ঢাকায় একদিনের জন্যে ট্রানজিট নিতেই হবে কাজেই তাঁকে ধরা হল একটা দিন বাংলাদেশকে দিতে হবে। সেমিনারে গেস্ট স্পিকার হবার বিনীত অনুরোধ। তাঁকে সামান্য সম্মানি দেয়া হবে। ঢাকায় একরাত তাঁকে রাখা হবে ফাইভ স্টার হোটেলে।

বিদেশি বিশেষজ্ঞরা এই জাতীয় প্রস্তাবে সহজেই রাজি হয়ে যান। প্রফেসার স্টাইনারও সানন্দে রাজি হলেন। আরেকটা দেশ দেখা হলে মন্দ কি ? প্রফেসর রাজি হওয়া মাত্রই ঢাকা মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্তা ব্যক্তিরা ছোটাছুটি শুরু করলেন। বিদেশি বিশেষজ্ঞ এলেই হবে না, প্রধানমন্ত্রীকে আনতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মানেই পাবলিসিটি। টিভিতে বিরাট কভারেজ। প্রধামন্ত্রীর আগমনের কারণে মেডিকেল এসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ঘোরাঘুর বাড়তি সুযোগ। মোটামুটি নিরুত্তাপ ডাক্তারদের জীবনে কিছু উত্তাপ। সেমিনার উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া। যেহেতু বিদেশি বিশেষজ্ঞ গেস্ট আসছেন তাঁর সম্মানে রাতে একটা এক্সক্লুসিভ ককটেল পার্টি। প্রধান বিষয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন। মানের ক্রম অনুসারে ককটেল পার্টি, সেমিনারের খাওয়া-দাওয়া, বিদেশি বিশেষজ্ঞকে নিয়ে শহরে পর্যটন। সেমিনারটা ফাউ।

প্রায় এক সপ্তাহ কর্মকর্তারা ছোটাছুটি করলেন। তাঁরা পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেলেন যখন জানা গেল এই সময় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। এই তারিখে প্রেসিডেন্টকেও পাওয়া যায় কি-না সেই চেষ্টা চলতে থাকল। চারটা কমিটি করা হল। একটা হল এন্টারটেইনমেন্ট কমিটি। এই কমিটি সন্ধ্যাবেলায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে, আরেকটি কমিটি হল ফুড কমিটি। এই কমিটির দায়িত্ব সেমিনারের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। তৃতীয় কমিটি দেখছে ককটেল পার্টি। খুবই সেনসেটিভ বিষয়। কাকে দাওয়াত দিতে হবে কাকে দাওয়াত হবে না এটা চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করতে হবে। নানান ধরনের ড্রিংকের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বোতলের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য দেখে অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পত্নীর চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। মূল সেমিনার বিষয়ে কোনো কমিটি হল না। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। প্রফেসর স্টাইনারকে পাওয়া গেছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। সেমিনারে বাংলাদেশ থেকে দু'টা পেপার পড়া হবে। পেপার দু'টা তৈরি আছে— ব্যস আর কি।

www.BDeBooks.Com

সেমিনার শেষ হয়েছে। দু ঘণ্টার সেমিনারে শেষে অতিথিদের জন্যে লাইট রিফ্রেসমেন্ট। সাংবাদিক এবং অতিথিরা খাবারের টেবিলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাদের দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘ দিন তাঁরা অনশনে ছিলেন। আজ অনশন ভঙ্গ করেছেন। কে কার আগে প্লেট নেবেন তা নিয়ে ধাক্কাধাক্কি চলছে। খাবার ভালো। ফাইভস্টার হোটেলের খাবার, পাঁচশ টাকা প্লেটের রিফ্রেসমেন্ট খারাপ হবার কারণ নেই।

এ ধরনের সেমিনারে মিসির আলি প্রথমে এক কাপ কফি নিয়ে নেন। শুরুতে চা এবং কফির টেবিল খালি থাকে। কোনো রকম ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই চা কফি নিয়ে নেয়া যায়। নাশতার টেবিলের ভিড় যখন কমে তখন সেখানে নাশতা থাকে না।

আজ ঘটনা অন্য রকম হল। মিসির আলি কফি নিয়ে এক কোনায় বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে জায়গাটা স্মোক ফ্রি কি-না বুঝতে পারছে না। এসট্রে চোখে পড়ছে না। এই সময় মিসির আলির পেছনে প্রফেসর স্টাইনার এসে উপস্থিত হলেন। বিশুদ্ধ বিস্ময় নিয়ে সাউথের উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন— প্রফেসর মিসির আলি না ? আমার কথা মনে আছে ?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ মনে আছে।

'আপনি বাংলাদেশের ধারণা ছিল না। আমি জানতাম আপনি শ্রীলংকান।'

মিসির আলি বললেন, আপনি তেমন ভাবে আমার খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন নি। ভাসা ভাসা খোঁজ নিয়েছেন কাজেই ভাসা ভাসা তথ্য পেয়েছেন।

প্রফেসর স্ট্রাইনার খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিসির আলির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। তিনি মিসির আলির হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে। মুগ্ধ গলায় বললেন— কেরোলিন ইনি হচ্ছে— প্যারাসাইকোলজির গুরু। উনার কিছু প্রবন্ধ নিয়ে কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটি একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটির নাম দি থার্ড কামিং। আমি বইটি তোমাকেও পড়তে দিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত তুমি পড় নি। না পড়লেও পৃথিবী নামক এই গ্রহের কয়েকটি শুদ্ধতম ব্রেইনের অধিকারীদের একজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক কর। এই ঘটনার পর মিসির আলির আর নাশতার জন্যে চিন্তা করতে হল না। বিশিষ্ট মেহমানদের সঙ্গে খাবার জন্যে তাঁকে আলাদা করে নেয়া হল। কর্মকর্তাদের একজন ফাঁকে গলা নিচু করে বলল, মিসির আলি সাহেব সন্ধ্যার পর ফ্রি থাকবেন। এক্সক্লুসিভ ককটেল পার্টি। হুইস্কির মধ্যে ব্লু লেভেল যোগাড় হয়েছে।

মিসির আলি বললেন, আমি তো হুইস্কি খাই না।

'লাইটার ড্রিংকসও আছে— খুব ভালো ওয়াইন আছে।'

'আমি মদ্যপান করি না।'

'কোক-পেপসিও আছে। কোক-পেপসি খাবেন।'

মিসির আলি সহজ গলায় বলবেন, মদের আসরে পেপসি-কোকওয়ালাদের না থাকাই ভালো।

'আপনার যে বই আছে তা জানতাম না। বইয়ের কপি কি আছে— একটা কপি আমাকে দেবেন তো।'

'আমার কাছে কোনো কপি নাই। নিজের কপিও নাই।'

আচ্ছা ঠিক আছে— আমি বই যোগাড় করে নেব। আমার জন্যে আমেরিকা থেকে বই আনা কোনো ব্যাপার না। আমার মেয়ে জামাই থাকে আমেরিকায় ইন্টারনেটে জানিয়ে দিলে নেক্সট উইকে বই এসে যাবে। আপনার জন্যে কি একটা কপি আনাব ?

'না আমার জন্যে কোনো কপি লাগবে না।'

মিসির আলি ভরপেট খাবার খেলেন। আরো এক কাপ কফি খেলেন প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী কিশোরীদের মতো কিছু আহ্লাদি তাঁর সঙ্গে করল— "আমি কিন্তু এই বিখ্যাত মানুষটার সঙ্গে ছবি তুলব এবং তাঁর অটোগ্রাফ নেব। ছবি সেসান এবং অটোগ্রাফ সেসানও শেষ হল। ফটোগ্রাফারদের ফ্ল্যাশ একের পর এক জ্বলতেই থাকল। মিসির আলি তাঁর মুখ হাসিহাসি করে রাখলেন। যে পূজার যে মন্ত্র। ফটো সেসান পূজার মন্ত্র হল— মুখ ভর্তি হাসি। মুখ হাসি হাসি করে রাখা যে এমন এক ক্লান্তিকর ব্যাপার তিনি জানতেন না। সেমিনার হলে মিসির আলি যতটা বিরক্ত হয়েছিলেন তারচে' অনেক বিরক্ত হলেন সেমিনার পরবর্তী কর্মকাণ্ডে।

হোটেল থেকে বের হয়ে তাঁর বিরক্তি কেটে গেল। আকাশে মেঘ করেছে। কার্তিক মাসের ঘোলাটে পাতলা মেঘ না, আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। মেঘ দেখেই মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। বর্ষাকালের বৃষ্টির এক ধরনের মজা, শীতের অপ্রত্যাশিত বৃষ্টির অন্য ধরনের মজা।

"বৃষ্টি দেখলে মানুষ উতলা হয় কেন ?" এ রকম চিন্তা করতে করতে মিসির আলি হাঁটতে শুরু করলেন। বৃষ্টি দেখে মন উতলা হবার তেমন কোনো বাস্তব কারণ নেই। ব্যবস্থাটা প্রকৃতি করে রেখেছে। সমস্ত প্রাণীকুলের জিনে কিছু তথ্য দিয়েছে। এই তথ্য বলছে— আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায় তখন তোমরা উতলা হবে। শুধু প্রাণীকুল না বৃক্ষকুলের জন্যেও একই তথ্য। এর কারণ কি ? প্রকৃতি কি আমাদের বিশেষ কিছু বলতে চাচ্ছে যা আমরা ধরতে পারছি না। প্রকৃতি কি চায় বর্ষা বাদলায় আমরা বিশেষ কিছু ভাবি ? অন্য ধরনের চিন্তা করি। বর্ষা বাদলার সঙ্গে সৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু কি জড়িয়ে আছে ? প্রকৃতি মানুষকে সরাসরি কিছু বলে না। সে কথা বলে ইঙ্গিতে। সেই ইঙ্গিত বোঝাও কঠিন।

বাসায় ফিরে মিসির আলি স্বস্তি পেলেন। ইয়াসিন চলে এসেছে। বাসায় তালা খুলে ঢুকে পড়েছে। তালা খোলার ব্যাপারে এই ছেলেটির দক্ষতা ভালো। মিসির আলি সদর দরজার জন্যে তিনশ' টাকা খরচ করে একটা আমেরিকান তালা লাগিয়েছিলেন। তালার প্যাকেটে লেখা ছিল— "বার্গলার প্রুফ লক।" সেই কঠিন তালা এগারো-বার বছরের একটা ছেলে মাথার ক্লিপ দিয়ে খুঁচিয়ে কি ভাবে খুলে ফেলে সেটা এক রহস্য। একই সঙ্গে চিন্তারও বিষয়।

www.BDeBooks.Com

-ইয়াসিন যখন কাজ করে— মন লাগিয়ে কাজ করে এবং অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে। ঘর ঝাঁট দেয়া হয়েছে। পানি দিয়ে মোছা হয়েছে। বিছানার চাদর বদলে নতুন চাদর টানটান করে বিছানো হয়েছে। দেয়াল ঘড়িতে ব্যাটারি লাগানো হয়েছে এবং ঘড়ি চলছে। ঠিক টাইম দিচ্ছে। ইয়াসিন যেহেতু ঘড়ির টাইম দেখতে পারে না কাজেই ধরে নেয়া যায়— ঘড়ি নিয়ে দোকানে গিয়ে ব্যাটারি লাগিয়ে এনেছে। মিসির আলি সাহেবের পড়ার টেবিলও গোছানো। টেবিলের উপর চকচকে পাঁচশ টাকার একটা নোট— কলম দিয়ে চাপা দেয়া।

গত সপ্তাহে এই টেবিল থেকেই পাঁচশ টাকার একটা নোট হারিয়েছে। সেই নোটও কলম দিয়ে চাপা দেয়া ছিল। তিনি যখন ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করলেন, একটা পাঁচশ টাকার নোট রেখেছিলাম নোটটা কোথায় রে ?

ইয়াসিন বলল, জানি না।

'তুই নিয়েছিস নাকি ?'

'না।'

'ভালো করে মনে করে দেখ নোটটা নিয়ে মনের ভুলে পকেটে রেখেছিস কি-না।'

ইয়াসিন আবারো বলল, না। তারপর থমথমে মুখে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মিসির আলির সামান্য মন খারাপ হল— ছেলেটা কি চুরি করা শিখছে ? এবং এই চুরি শেখার জন্যে নানান জায়গায় টাকা পয়সা ছড়িয়ে রেখে তাকে সাহায্য করছেন ? তিনি এই বিষয়ে ইয়াসিনকে আর কিছু বলেন নি। ভেবে রেখেছিলেন, সময় সুযোগমতো নানান ব্যাখ্যা দিয়ে চুরি যে গুরুতর অপরাধের একটি তা বুঝিয়ে দেবেন। সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে আর যাওয়া হয় নি। তারপর ঘটনাটা ভুলেই গেছেন। আজ টেবিলে পাঁচশ টাকার নোট পড়ে থাকতে দেখে মনে পড়ল। তিনি ইয়াসিনকে ডাকলেন। শান্ত গলায় বললেন, টেবিলের উপর পাঁচশ টাকার নোট কে রেখেছে তুই ?

ইয়াসিন হ্যাঁ-না, কিছুই বলল না।

মিসির আলি বললেন, যে নোটটা হারিয়েছিল, এটা কিন্তু সেই নোট না। হারানো নোটটা ছিল ময়লা। আর এই নোটটা চকচক করছে।

ইয়াসিন তার পরেও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুই এখন করছিস কি ?'

'রান্ধি।'

'কি রাঁধিস ?'

'হুকনা মরিচের ভর্তা, ডাইল আর ডিমের সালুন।'

রান্না শেষ করার পর আমার কাছে আসবি— পাঁচশ টাকার নোটের বিষয়ে কথা বলব। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি কখনো কাউকে শাস্তি দেই না। তুই কি আমাকে ভয় পাস ?

'না।'

ইয়াসিন রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। আসন্ন বিচার সভা নিয়ে তাকে তেমন চিন্তিত মনে হচ্ছে না। তাঁর পেট থেকে কোনো কথা বের করা যাবে এটাও মিসির আলির মনে হচ্ছে না। মানুষ হয় দু'শ্রেণীর— এক শ্রেণীর মানুষ কিছুতেই ভাঙবে না তবে মচকাবে। আরেক শ্রেণীর মানুষের চরিত্রে মচকানোর ব্যাপারটি নেই। সে ভেঙে দু'টুকরা হবে, কিন্তু কিছুতেই মচকাবে না। ইয়াসিন দ্বিতীয় শ্রেণীর। পাঁচশ টাকার নতুন নোট প্রসঙ্গে তার মুখ থেকে একটি বাক্যও বের করা যাবে না। সে পাথরের মতো মুখ করে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকবে। বিড়াল যেমন গড়গড় শব্দ করে, মাঝে মাঝে এই ধরনের শব্দ করবে।

বিজ্ঞান দ্রুত এগুচ্ছে— এমন যন্ত্র হয়তো খুব শিগগিরই বের হয়ে যাবে যার সামনে কাউকে বসালে তার মাথায় কি আছে সব পর্দায় পরিষ্কার দেখা যাবে। মস্তিষ্কে জমা স্মৃতি ভিডিওর মতো পর্দায় চলে আসবে। কোনো অপরাধী বলতে পারবে না— এই অপরাধ সে করে নি। মস্তিষ্ক থেকে স্মৃতি বের করে পর্দায় নিয়ে আসা খুব কঠিন কোনো প্রযুক্তি বলে মিসির আলির মনে হয় না। আগামী বিশ পঁচিশ বছরেই গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে মিসির আলি কাগজে পড়েছেন— দুই ভাড়াটে খুনির ফাঁসি হয়ে গেছে। যারা তাকে ভাড়া করেছে তাদের কিছু হয় নি। তারা বেকসুর খালাস পেয়েছে। কারণ প্রমাণ নেই। নতুন পৃথিবীতে প্রমাণের জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না। আদালতের নির্দেশে মাথা থেকে স্মৃতির টেপ সরাসরি নিয়ে নেয়া হবে। নতুন পৃথিবীতে নির্দোষ মানুষ কখনো শাস্তি পাবে না।

মিসির আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। মেঘ আরো ঘন হয়েছে। শীতের ধূলি ধূসরিত শুকনো শহর তৃষিতের মতো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এখন যদি কোনো কারণে বৃষ্টি না হয় তাহলে কষ্টের ব্যাপার হবে।

'স্যার গো।'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। দরজা ধরে ইয়াসিন দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে দুঃশ্চিন্তার লেশ মাত্র নেই। বরং মুখ হাসিহাসি।

'কি ব্যাপার ইয়াসিন?'

'একটা মেয়ে ছেলে আসছে। আপনেরে চায়।'

মিসির আলি বসার ঘরে চলে এলেন। খুবই আধুনিক সাজ পোশাকের একজন তরুণী। গায়ে বোরকা জাতীয় কালো পোশাক যা ঠিক বোরকাও না। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। স্কার্ফের উজ্জ্বল রঙ। সাধারণ মরুভূমির মেয়েরা এমন উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করে। মেয়েটি রূপবতী। তাকে দেখেই মিসির আলির মনে যে উপমা এল তা হল জ্বলন্ত মোমবাতী। মিসির আলি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না। মেয়েটি মিসির আলিকে দেখেই চট করে উঠে দাঁড়াল। এবং তিনি কিছু বুঝতে পারার আগেই তাকে এসে সালাম করে ফেলল।

www.BDeBooks.Com

'স্যার আমাকে চিনতে পারছেন ?'

'না।'

ভালো করে আমার দিকে তাকান। ভা্লো করে না তাকালে আপনি আমাকে চিনবেন কি করে। আপনি তো কখনো কোন মেয়ের দিকে ভালো করে তাকান না।

মিসির আলি ভালো করে তাকালেন। লাভ হল না। তিনি তখনো চিনতে পারছেন না।

মেয়েটি বলল, আমার নাম প্রতিমা। হিন্দু নাম। কিন্তু আমি মুসলমান মেয়ে এখন চিনতে পেরেছেন ?

'না।'

'মাথায় স্কার্ফ আছে বলে আপনি হয়তো চিনতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে কখনোই মাথায় স্কার্ফ ছিল না। মাথা ভর্তি চুল ছিল। এখন স্কার্ফ থাকায় হয়তো অচেনা লাগছে।'

মেয়েটি মাথার স্কার্ফ খুলে মাথায় ঝাঁকুনি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মিসির আলি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন রূপবতী একজনকে দেখতে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।

'স্যার আমাকে এখন কি চিনতে পেরেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন আমার নাম প্রতিমা, এটা মনে পড়েছে ?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে। তোমার মা এক দুপুর বেলায় গান শুনছিলেন। প্রতিমা নামের একজন গায়িকার গান— "একটা গান লিখ আমার জন্যে।" এই গান শুনতে শুনতে তোমার মা আবেগে দ্রবীভূত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তার কিছুক্ষণ পর তোমার মা'র ব্যথা শুরু হল। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আট ঘণ্টা পর তোমার জন্ম হল। এই আট ঘণ্টা তীব্র ব্যথার মধ্যে তোমার মায়ের মাথায় "একটা গান লিখ আমার জন্যে" ঘুরতে লাগল। যখন তিনি শুনলেন, তাঁর মেয়ে হয়েছে— গায়িকার নামে মেয়ের নাম রাখলেন, প্রতিমা।'

এই তো আপনার সব কিছু মনে পড়েছে। আপনার জন্যে আমি নেপাল থেকে একটা চাদর এনেছিলাম। চাদরটা আপনি ব্যবহার করছেন দেখে ভালো লাগছে। স্যার এখন বলুন আমি কবে থেকে কাজ শুরু করব ?

মিসির আলি থমকে গেলেন। তিনি যে যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, এই যন্ত্রণা আবার শুরু হয়েছে।

প্রতিমা বলল, আপনি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন— ভেবেছিলেন আপনার ঠিকানাটা আমি খুঁজে বের করতে পারব না। দেখলেন, কি ভাবে খুঁজে বের করেছি ?

'দেখলাম।'

প্রতিমা বসতে বসতে বলল, স্যার আপনি আমাকে ভয় পান কেন ? আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি আপনাকে নিয়ে একটা বই লিখব। আপনার জীবনের বিচিত্র সব ঘটনার নোট নেব। ব্যস ফুরিয়ে গেল।

মিসির আলি কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন— প্রতিমা নামের এই মেয়েটি ভয়াবহ একটা সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি সেই সমস্যার দ্রুত সমাধান করেছিলেন। তারপরই মেয়েটির মাথায় ঢুকে গেছে মিসির আলি তাঁর জীবনে যত সমস্যার সমাধান করেছেন সেগুলো সে লিখে ফেলবে।

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, স্যার আপনি এমন হতাশ চোখে তাকাচ্ছেন কেন ? আমি বাঘ ভালুক কিছু না। আমিই খুবই সাধারণ একটা মেয়ে। সাধারণ হলেও ভালো মেয়ে। আমি নানানভাবে আপনাকে সাহায্য করব। মনে করুন সকাল বেলা আপনার কাছে এলাম। আপনি কিছুক্ষণ কথা বললেন, আমি নোট নিলাম। তারপর আপনার ঘরের কাজকর্ম গুছিয়ে দিলাম। আমি রান্না করা শিখেছি। আপনার জন্যে রান্না করলাম।

'তোমার এখনো বিয়ে হয় নি ?'

'না। আমি তো আগেই বলেছি— আমি কখনো বিয়ে করব না।'

প্রতিমা খিলখিল করে হাসছে। মিসির আলি বললেন, হাসছ কেন ?

প্রতিমা বলল, আপনি হতাশ চোখে তাকাচ্ছেন। আপনাকে দেখে খুবই মায়া লাগছে! এই জন্যে হাসছি।

'চা খাবে ?'

'না চা খাব না। আমি চলে যাব। আপনি প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিন। তারপর আমি আসব। স্যার, ভালো কথা আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিবরণ আমি গুছিয়ে লিখে ফেলেছি। কপি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। কপি আপনি পড়বেন— এবং বলবেন কিছু বাদ পড়েছে কি-না। স্যার ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

'আজই পড়বেন। স্যার, আপনি ঘুম থেকে কখন উঠেন।'

'রাত করে ঘুমুতে যাই তো, ঘুম ভাঙতে ন'টা দশটা বেজে যায়।'

'আমি যখন চার্জ নেব, আপনাকে ঠিক রাত দশটায় ঘুমুতে যেতে হবে। ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে তুলে দেব। এক ঘণ্টা আপনাকে হাঁটতে হবে। এক ঘণ্টা পর মর্নিং ওয়াক সেরে এসে দেখবেন— ব্রেকফাস্ট রেডি।'

মিসির আলি চিন্তিত গলায় বললেন, তুমি এখানে থাকবে নাকি ?

প্রতিমা বলল, হ্যাঁ। তবে এ বাড়িতে না। বারিধারায় আমার পাশাপাশি দু'টা ফ্ল্যাট আছে— একটায় আপনি থাকবেন, অন্যটায় আমি থাকব। আমি একজন ইনটেরিয়ার ডিজাইনারকে খরব দিয়েছি— সে আপনার ফ্ল্যাটটা আপনার প্রয়োজন মতো সাজিয়ে দেবে। লাইব্রেরি থাকবে, লেখার টেবিল থাকবে।

'আমাকে গিয়ে তোমার ফ্ল্যাটে উঠতে হবে ?'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ। স্যার এ রকম শুকনা মুখ করে তাকালে হবে না। আমি আগামীকাল সকলে ন'টার সময় আসব। ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন-হরতাল যাই হোক না কেন সকাল ন'টায় আমি উপস্থিত হব।'

'ঠিক আছে।'

'এর মধ্যে আমার লেখাটা পড়ে ফেলবেন। লেখার কিছু কিছু অংশ ভালো মত দেখে দেবেন আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।'

'তুমি কি এখন চলে যাচ্ছে ?'

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ— তবে কাল দেখা হবে। ঠিক সকাল ন'টায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লাভ নেই— আপনি নিশ্চয়ই এক দিনের মধ্যে বাড়ি বদলাতে পারবেন না ?

মিসির আলি মনে হল মেয়েটা পুরোপুরি সুস্থ না। কিছু সমস্যা তার এখনো রয়ে গেছে।

মিসির আলি দুপুরের খাওয়া শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালেন, দু'টা পঁচিশ বাজে। বিছানায় এসে কিছুক্ষণ গড়াগড়ি করা যায়। দুপুরের খাবার শেষ করে বই হাতে বিছানায় কাত হবার মধ্যে আনন্দ আছে। শরীর ভরা আলস্য, চোখ ভর্তি ঘুম— হাতে চমৎকার একটা বই। আজ অবশ্যি হাতে বই নেই— প্রতিমা নামের জ্বলন্ত মোমবাতীর লেখা বাহান্ন পৃষ্ঠার খাতা। হাতের লেখা না, কম্পিউটারে কম্পোজ করা হয়েছে, স্পাইরেল বাইন্ডিং করা হয়েছে। হাতের লেখা হলে ভাল হত। মানুষ তার চরিত্রের অনেকখানি হাতের লেখায় প্রকাশ করে। কারো লেখা হয় জড়ানো একটা অক্ষরের গায়ে আরেকটা অক্ষর মিশে থাকে। কেউ কেউ লেখে গোটা গোটা হরফে। কেউ প্রতিটি অক্ষর ভেবে চিন্তে লেখে। কেউ অতি দ্রুত লেখে। লেখা দেখেই মনে হয় তার চিন্তা করার ক্ষমতা দ্রুত। সে মাথার চিন্তাকে অনুসরণ করছে বলে লেখাও দ্রুত লিখতে হচ্ছে। তবে কেউ কেউ লেখে ঢিমেতালে।

কম্পিউটার মানুষকে অনেক কিছু দিচ্ছে, আবার অনেক কিছু কেড়েও নিচ্ছে। কম্পিউটারের লেখায় কোনো কাটাকুটি নেই। হাতের লেখায় কাটাকুটি থাকবেই। সেই কাটাকুটিই হবে মানুষ চরিত্রের রহস্যের প্রতিফলন। হাতের লেখার যুগ পার হয়েছে। এখন শুরু হয়েছে কম্পিউটার লেখার যুগ। এই যুগ শেষ হয়ে নতুন যুগ আসবে। কি রকম হবে সেটা ? মানুষ চিন্তা করছে আর সেই চিন্তা লেখা হয়ে বের হয়ে আসবে ? সে রকম কিছু হলে মন্দ হয় না। তাহলে সেই যুগ হবে হাতের লেখায় যুগের কাছাকাছি। কারণ চিন্তার মধ্যেও কাটাকুটি থাকবে।

প্রতিমার লেখার ওপর মিসির আলি চোখ বুলাতে শুরু করলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে তিনি কোন গল্পের বই পড়ছেন। মেয়েটা সে রকম ভঙ্গিতেই লেখার চেষ্টা করছে। লেখার ভঙ্গিটা জার্নালিস্টিক হলে ভাল হত। প্রতিমা লিখছে—

আমার নাম প্রতিমা। এটা কিন্তু কাগজে পত্রের নাম না। কাগজে পত্রে আমার নাম আফরোজা। যেহেতু আমার মা খুব শখ করে প্রতিমা নাম রেখেছিলেন, এবং আমার বয়স এক বছর পার হবার আগেই মারা গেছেন সে কারণে মা'র প্রতি মমতাবশত সবাই আমাকে ডাকা শুরু করল প্রতিমা। মুখে মুখে নাম ডাক এক ব্যাপার, কাগজপত্রে নাম থাকা অন্য ব্যাপার।

আকিকা করে আমার মুসলমানী নাম রাখা হল তবে সেই নামে কেউ ডাকত না। শুধু বাবা মাঝে মধ্যে ডাকতেন। তখন আমি জবাব দিতাম না।

আমার বাবা আমাকে অতি আদরে মানুষ করতে লাগলেন। তিনি আদর্শ পত্নী প্রেমিকদের মত দ্বিতীয় বিয়ে করেন নি। বাড়িতে মাতৃস্থানীয় কেউ না থাকলে তাঁর কন্যার অযত্ন হবে ভেবে তিনি সার্বক্ষণিক একজন নার্স রাখলেন। ছোটবেলায় এই নার্সকেই আমি মা ডাকতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন কি একটা কারণে যেন এই নার্স মহিলাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। শৈশবের এই স্মৃতিটি আমার মনে আছে। এই মহিলা হাউ মাউ করে কাঁদছেন এবং বাবার পা জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছেন। বাবা বলছেন— ডোন্ট টাচ মি। ডোন্ট টাচ মি। তোমাকে যে আমি কানে ধরে ওঠবোস করাচ্ছি না এই কারণেই তোমার সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

যে মহিলাকে আমি মা বলে জানতাম সেই মহিলার এমন হেনস্তা দেখে আমি খুবই অবাক হয়ে গেলাম। ভয়ে আমার হাত পা কাঁপতে লাগল। আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। নার্স মা'কে আমি এর পরে আর কোনদিন দেখি নি। বাড়িতে এই মহিলার কোনো ছবি ছিল না বলে কিছুদিনের মধ্যেই আমি তার চেহারাও ভুলে গেলাম। শুধু মনে থাকল— শ্যামলা একটি মেয়ে— যার মুখ গোলাকার এবং তিনি ঠোঁট গোল করে শিস দিতে খুব পছন্দ করতেন।

শৈশবের ভয়াবহ স্মৃতি এই একটাই। এই স্মৃতির ব্যাপারটা আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টদের কাছে বার বার বলতে হয়েছে। বাবা আমাকে অনেক বড় বড় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের প্রথম প্রশ্নই হল— শৈশবে কোনো দুঃখময় স্মৃতি আছে Painful memory ?

মিসির আলি সাহেবও এই প্রশ্ন করলেন। তবে অন্য সাইকিয়াট্রিস্টরা যেমন এই ঘটনা শুনে ঝাঁকের পর ঝাঁক প্রশ্ন করেছিলেন। মিসির আলি তা করলেন না। তিনি শুধু বললেন— ঐ মহিলার গলার স্বর কেমন ছিল ?

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম গলার স্বর দিয়ে কি হবে ? উনার গলার স্বর কেমন জানতে চাচ্ছেন কেন ?

মিসির আলি বললেন, এম্নি জানতে চাচ্ছি।

আমি বললাম, গলার স্বর মিষ্টি ছিল। খুব মিষ্টি। উনার বিষয়ে আমার আর কিছু মনে নেই শুধু মনে আছে উনি ঠোঁট গোল করে শিস দিতেন।

মিসির আলি বললেন, আরেকটি জিনিস নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে। উনি যে তোমাকে বিশেষ নামে ডাকতেন সেটা তো মনে থাকার কথা।

www.BDeBooks.Com

'উনি আমাকে বিশেষ নামে ডাকতেন এটা আপনাকে কে বলেছে ?'

'কেউ বলে নি। আমি অনুমান করছি।'

'এ রকম অনুমান কেন করছেন ? কেন ?'

'তোমার কথা থেকে মনে হচ্ছে এই মহিলা তোমায় খুবই আদর করত। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে অতি আদরের কাউকে বিশেষ নামে ডাকা। যে নামে অন্য কেউ ডাকবে না। এই থেকেই অনুমান করছি তোমাকে বিশেষ কোনো নামে ডাকতেন। সেই বিশেষ নামটা কি ?'

উনি আমাকে ডাকতেন মাফু। মা বলার ফু বলে লম্বা টান দিতেন— এ রকম করে মাফু...।

মিসির আলি হাসলেন এবং প্রায় সেই মহিলার মত করে ডাকলেন, মাফু...। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জ্বী। তিনি বললেন, মাফু তুমি কেমন আছ ?

আমি বললাম ভাল নেই। আপনি আমাকে সারিয়ে দিন।

তিনি আবারো হাসলেন। এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল— ইনি আমাকে সারিয়ে দেবেন। উনার সেই ক্ষমতা আছে।

এখন আমি আমার অসুখের ঘটনাটা বলি— আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন বাবার শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। হার্টের সমস্যা, ডায়াবেটিস, এজমার এটাক সব একসঙ্গে। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে বললেন— মা, তোর কি পছন্দের কোনো ছেলে আছে ?

আমি বললাম কেন ?

বাবা বললেন, তোর কোনো পছন্দের ছেলে থাকলে বল। আমি তোর বিয়ে দিতে চাই। আমার শরীর ভাল না। যে কোনো সময় যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। তার আগেই আমি দেখে যেতে চাই তোর সংসার হয়েছে। যার ওপর ভরসা করতে পারিস এমন একজন কেউ তোর আশপাশে আছে।

আমি বললাম, আমার পছন্দের কেউ নেই।

বাবা বললেন, আমি দেখে শুনে তোর জন্যে একজন ছেলে নিয়ে আসি ?

বাবার হতাশ মুখ দেখে আমার খুবই মায়া লাগল। তখন তাঁর এজমার টান উঠেছে। বুকের ভেতর থেকে শাঁ শাঁ শব্দ আসছে। মনে হচ্ছে তাঁর ফুসফুসে ছোট কোন বাঁশি কেউ রেখে দিয়েছে— যেই তিনি লম্বা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন এম্নি সেই বাঁশিতে শব্দ উঠছে। তখন আমার বিয়ে করার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না। বাবার অবস্থা দেখে বললাম, তুমি যা ভাল মনে কর— করতে পার।

বাবা অতি দ্রুত একটা ছেলে যোগাড় করে ফেললেন। ছেলের বাবা মফস্বলের কোনো এক কলেজের অধ্যাপক। বাবা মা'র একমাত্র ছেলে। মেডিকেল কলেজে ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সুন্দর চেহারা। ছেলের সঙ্গে বাবা আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম ছেলে খুব লাজুক। কথা বলার সময় সে সরাসরি আমার দিকে তাকায় না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আমি

তাকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। সেখানে কথা যা বলার আমিই বললাম সে শুধু হ্যাঁ হুঁ করল। বিয়ে উপলক্ষ্যে ছেলের বাবা মা ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকায় তারা দু'মাসের জন্যে একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। সব যখন ঠিকঠাক তখন বাবা বললেন— এখন বিয়ে হবে না। ছেলেটার কিছু সমস্যা আছে। কি সমস্যা বাবা তা ব্যাখ্যা করলেন না।

বিয়ে বাতিল হয়েছে শুনে ছেলের বাবা-মা দু'জনই খুব আপসেট হয়ে পড়লেন। বাবার সঙ্গে নানান কথাবার্তা বলতে লাগলেন। আমার সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করলেন। আমি কথা বললাম না। শুধু যে ছেলের বাবা-মা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন তা না, ছেলেও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। বার বার টেলিফোন— সে শুধু পাঁচ মিনিটের জন্যে কথা বলতে চায়।

সেই পাঁচ মিনিট তাকে দেয়া হল না। তারপরই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। ছেলেটা রিকশা করে যাচ্ছিল। পেছন থেকে একটা মাইক্রোবাস এসে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল। লোকজন ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। হাসপাতালে নেবার পথেই সে মারা গেল।

ছেলেটির সঙ্গে আমার কোনো মানসিক বন্ধন তৈরি হয় নি, কাজেই তার মৃত্যু আমার জন্যে ভয়ঙ্কর রকম আপসেট হবার মত কোনো ঘটনা না। তারপরেও কয়েকদিন আমার মন খারাপ গেল। বেচারা পাঁচ মিনিট আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল কি হত পাঁচ মিনিট কথা বললে?

আমার সমস্যাটা শুরু হল ছেলেটার মৃত্যুর ঠিক ছ'দিন পর। আমি আমার ঘরে ঘুমাচ্ছি। টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমার হাতের কাছে টেলিফোন। টেলিফোন ধরার আগে ঘড়ি দেখলাম। রাত তিনটা বাজে। রাত তিনটায় কে টেলিফোন করবে? কোনো ট্র্যাংক কল নিশ্চয় এসেছে। টেলিফোন ধরলেই জড়ানো গলায় কেউ নোংরা কোনো কথা বলবে। ধরব না ধরব না করেও টেলিফোন ধরলাম। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে লাইন কেটে দিল। আমি বিরক্ত হয়ে টেলিফোন রেখে বাথরুমে গেলাম। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার খুব সমস্যা হয়। ঘুম আসতে চায় না। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি— আমার বিছানায় পা তুলে ছেলেটা বসে আছে। যে বইটা পড়তে পড়তে রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই বইটা তার হাতে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেই বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতেই সে বই রেখে বলল, পাঁচটা মিনিট তোমার সঙ্গে কথা বলব। এর বেশি না।

আমি চিৎকার করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। শুরু হল আমার দুঃস্বপ্নের দিনরাত্রি।

এইটুকু পরেই মিসির আলি খাতা নামিয়ে রাখলেন। মেয়েটির চিকিৎসা কি ভাবে করা হয়েছে তা তাঁর মনে পড়েছে। লেখা পড়ে নতুন কিছু জানা যাবে না। মিসির আলির ঘুম পাচ্ছে। বরং কিছুক্ষণ ঘুমানো যেতে পারে। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টি

www.BDeBooks.Com

নামলে চমৎকার হয়। বৃষ্টির শব্দটা কোন না কোন ভাবে ঘুমন্ত মানুষের মাথায় ঢুকে যায়। ঝমঝম শব্দে আনন্দময় বাজনা মাথার ভেতর বাজতে থাকে। মানুষের অবচেতন মন— বৃষ্টির গান খুবই পছন্দ করে। কেন করে তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণটা একদিন ভেবে দেখতে হবে।

৪

মিসির আলির দিন শুরু হয়েছে রুটিন মতই। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখেছেন— মশারির ভেতর দিয়ে খবরের কাগজটা ঢুকিয়ে দেয়া। এক সময় বাসিমুখে খবরের কাগজ পড়তে তিনি আনন্দ পেতেন, এখন পান না, কিন্তু অভ্যাসটা রয়ে গেছে। অভ্যাস সহজে যান না। খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ইয়াসিন চা নিয়ে আসে। মশারির ভেতরে ঢুকিয়ে গলা খাকাড়ি দেয়। সেই চা, চা— না অতিরিক্ত চিনির কারণে সিরাপ জাতীয় ঘন তরল পদার্থ। ইয়াসিনকে অনেক বলেও চিনি কমানোর ব্যবস্থা মিসির আলি করতে পারেন নি। এখন মিসির আলির গরম সিরাপ খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যায়— ইয়াসিন আরেক চামচ চিনি দে। ইংরেজি প্রবচনটা এতই সঠিক— Old habit die hard. পুরানো অভ্যাস সহজে মরে না।

মিসির আলির হাতে খবরের কাগজ। তিনি খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন— হঠাৎ এমন কোনো খবর চোখে পড়ে কি-না যা মনে গেঁথে যায়। এমন কিছু চোখে পড়ছে না। হত্যা, ধর্ষণ ছাড়া তেমন কিছু নেই। মিসির আলির মনে হল সব পত্রিকার উচিত এই দুটি বিষয়ে আলাদা পাতা করা উচিত। খেলার পাতা, সাহিত্য পাতার মত ধর্ষণ পাতা, হত্যা পাতা। যারা ঐ সব বিষয় পড়তে ভালবাসে তারা ঐ পাতাগুলো পড়বে। যারা পড়তে চায় না তারা পাতা আলাদা করে রাখবে। বিশেষ বিশেষ দিনে হত্যা এবং ধর্ষণ বিষয়ে সচিত্র ক্রোড়পত্র বের হবে।

পত্রিকায় নতুন একটি বিষয় চালু হয়েছে— জন্মদিনের শুভেচ্ছা। মামণির এক বছর বয়সপূর্তি উপলক্ষে পিতা-মাতার শুভেচ্ছা। মিসির আলী বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়ছেন।

অনিক

পৃথিবীতে আজ যত গোলাপ ফুটেছে সবই তোমার জন্যে।

তোমার বাবা ও মা

অনিকের ছবি। দুই হাতে ভর দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত গোলাপের মালিক হা করে বসে আছে। তার জিব দেখা যাচ্ছে।

শিপ্রা,
আজ আমাদের শিপ্রার শুভ জন্মদিন
পৃথিবীর সব দুঃখ করবে সে বিলীন।

শিপ্রার,

নানা নানু ছোট মামা, ছোট মামি ও রনি।

পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ যে বিলীন করবে সেই শিপ্রার ক্রন্দনরতা একটা ছবি। শিপ্রার হাতে চকবার।

মিসির আলি ছবিটির দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। মেয়েটি কাঁদছে কেন ? চোখে মুখে কি চকবারের কাঠির খোঁচা লেগেছে ?

জন্মদিনের শুভেচ্ছায় শুধু ছোট মামা, ছোট মামি আছেন। যেহেতু ছোট মামার উল্লেখ করা আছে অবশ্যই ধরে নিতে হবে বড় মামাও আছেন। বড় মামা মামি কি আলাদা বাণী দেবেন ? তিনি কি পরিবারের সঙ্গে থাকেন না ? না- কি বড় মামা মারা গেছেন। শুভেচ্ছা বাণীতে বড় মামা নেই কেন ? আরেকটা নাম আছে রনি। এই রনিটা কে ? কাজিন ? মামাতো ভাই। শিপ্রা মেয়েটির কি কোনো খালা নেই।

ইয়াসিন চায়ের কাপ মশারির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে । যথারিতি গরম সিরাপ। মিসির আলি চায়ের চুমুক দিলেন— তাঁর কাছে মনে হল মিষ্টি সামান্য বেশি তবে খেতে খারাপ না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিসির আলি শিক্ষার্থীর পাতা উল্টালেন। শিক্ষার্থীর পাতা বলে আরেকটা জিনিস খবরের কাগজে চালু হয়েছে। আজ আছে ক্লাস সিক্সের বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে আলোচনা। অগ্রণী গার্লস হাই স্কুলের ফার্স্ট গার্লের ইন্টারভ্যু। ভিকারুননেসা নুন স্কুলের একজন শিক্ষিকার বৃত্তি পরীক্ষার ওপর কিছু '—টিপস'। মিসির আলি প্রথম পড়তে শুরু করলেন ফার্স্ট গার্ল নাজনিন বেগমের ইন্টারভ্যু—

"তুমি দৈনিক কত ঘণ্টা পড়াশোনা কর ?"

আমি দৈনিক পাঁচ থেকে ছ'ঘণ্টা পড়াশোনা করি।

"তুমি অবসর সময়ে কি কর ?"

আমি অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ি। টিভি দেখি।

"তোমার পড়াশোনার পেছনে কার অনুপ্রেরণা সবচে' বেশি কাজ করে ?"

আমার পিতা-মাতা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা।

"তোমার কি কোনো গৃহ শিক্ষক আছে ?"

দু'জন গৃহশিক্ষক আছে।

"তুমি কি কোনো কোচিং সেন্টারে যাও ?"

আমি একটি কোচিং সেন্টারে সপ্তাহে তিনদিন যাই।

"তোমার সাফল্যের রহস্য কি ?"

আমি দিনের পড়া দিনে তৈরি করে রাখি।

"তোমার বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তোমার কি উপদেশ ?"

'তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা কর।'

www.BDeBooks.Com

ফার্স্ট গার্ল নাজনিন বেগমের ইন্টারভ্যু শেষ করে মিসির আলি ভিকারুননেসা নুন স্কুলের শিক্ষিকার কঠিন উপদেশগুলো পড়তে শুরু করলেন। তাঁর খানিকটা মন খারাপ হতে শুরু করেছে— তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সবাই বাচ্চাগুলোর পেছনে লেগেছে। শিশুর স্বপ্ন, শিশুর আনন্দ কেড়ে নেবার খেলা শুরু করেছে। শিশুদের শিশুর মত থাকতে দিলে কেমন হয়। বৃত্তি পরীক্ষা উঠিয়ে দিলে কেমন হয় ? পরীক্ষার ব্যাপারটা কি উঠিয়ে দেয়া যায় না। পরীক্ষা নামের ব্যাপারগুলো রেখে অতি অল্পবয়সেই শিশুদের মাথায় একটা জিনিস আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি— তোমাদের মধ্যে কেউ ভালো, কেউ খারাপ। তোমাদের মধ্যে একদল বৃত্তি পায়, একদল পায় না। তোমাদের মধ্যে একজন হয় ফার্স্ট গার্ল নাজনিন। আরেকজন খুব চেষ্টা করেও দশের ভেতর থাকতে পারে না। যেদিন স্কুলে রেজাল্ট দেয় সেদিন সে কান্না কান্না মুখে বাড়ি ফেরে। এবং তার মা মেয়ের ওপর প্রচণ্ড রাগ করেন। এই মা-ই আবার মেয়েকে গান শেখান— আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

আমরা যে সবাই রাজা না, কেউ কেউ রাজা কেউ কেউ প্রজা, পরীক্ষা নামক ব্যবস্থাটা তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

মিসির আলি পত্রিকা ভাঁজ করে রাখলেন। মশারির ভেতর থেকে বের হলেন না। সকালে মশারির ভেতর থেকে তিনি বেশ আয়োজন করে বের হন। যেন তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন, সারাদিন কাজ কর্ম করবেন আবার রাত এগারোটা বারটায় জেলখানায় ঢুকবেন।

কলিংবেল বাজাছে।

মিসির আলি মশারির ভেতর থেকে দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। কাঁটার কাঁটায় ন'টা বাজে। প্রতিমা এসে পড়েছে। সে ন'টায় আসবে বলেছিল— ঠিক ন'টায় এসেছে। পাঁচ ছ'মিনিট আগেই হয়তো এসেছে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ন'টা বাজার অপেক্ষা করেছে। এ ধরনের মানুষ খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়। মিসির আলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষের সঙ্গ তাঁর কাছে খুব আনন্দদায়ক কোনো ব্যাপার না। তিনি একা থেকে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। অন্যরা ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

মিসির আলির ধারণা সেব মানুষ দীর্ঘদিন একা থাকে এবং বই পড়ে সময় কাটায় তারা অন্য রকম। মানুষকেও তারা বই মনে করে। যে বই তার পছন্দ সে লাইব্রেরি থেকে সেই বই টেনে নেয়। ঠিক একইভাবে যে মানুষটি তার পছন্দ সেই মানুষকে সে ডেকে নিয়ে আসে। কোনো মানুষ নিজে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এটা তাদের পছন্দ না।

মিসির আলি অপ্রসন্ন মুখে মশারির ভেতর থেকে বের হলেন। বসার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন প্রতীমা আসে নি। বেতের চেয়ারে ফতে মিয়া বসে আছে।

'স্যার কেমন আছেন ?'

মিসির আলি বললেন, ভালো আছি।

ফতে বলল, চলে যাচ্ছি তো স্যার, এইজন্যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। একটু দোয়া রাখবেন।

'কোথায় যাচ্ছ ?'

'গতকাল আপনাকে বললাম না আমি একটা দর্জির দোকান দিচ্ছি। এখন থেকে দোকানেই থাকব।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনাকে একদিন আমার দোকানে নিয়ে যাব।'

মিসির আলি ফতের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ঠিক আছে।

'আমার একটা আবদার আছে স্যার। যদি রাখেন খুব খুশি হব।'

'কি আবদার ?'

'আমার দোকানের প্রথম দর্জির কাজটা আপনাকে দিয়ে করাব। আপনার জন্যে একটা পাঞ্জাবি বা ফতুয়া দিয়ে দোকানের শুরু। আপনাকে কখনো ফতুয়া পরতে দেখি নাই। আপনি কি ফতুয়া পরেন।'

'পোশাক নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। পোশাক নিয়ে আমি তেমন ভাবি না।

'স্যার আপনি কি নাশতা করেছেন ?'

'না।'

'আমিও নাশতা করি নাই। ইয়াসিনকে বলেছি আপনার দু'জনের নাশতা দিতে। শুধু পরোটা ভাজতে বলেছি। আমি বিরিয়ানী হাউস থেকে মুরগির লটপটি নিয়ে এসেছি। মুরগির লটপটি জিনিসটা কখনো খেয়েছেন ?'

'না।'

হোটেলে অনেক মুরগি রান্না হয়তো। সেই সব মুরগির গিলা কলিজা, পাখনা, এইগুলো কি করবে ? ফেলে তো দিতে পারে না— হোটেলওয়ালারা এইগুলা দিয়ে একটা ঝোলের মত বানায়। এটাকে বলে লটপটি। পরোটা দিয়ে লটপটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

'ও আচ্ছা।'

ফতে মিয়া হাসতে হাসতে বলল, সকাল বেলা এসে আপনার সঙ্গে বকবক শুরু করেছি, আপনার খুব বিরক্ত লাগছে তাই না স্যার ?

মিসির আলি বললেন, খুব বিরক্তি লাগছে না, তবে কিছুটা যে বিরক্ত হচ্ছি না— তা না। অকারণ কথাবার্তা বলতে আমার ভালো লাগে না।

ফতে বলল, আমি তো চলেই যাচ্ছি স্যার। এরপর আর রোজ রোজ এসে আপনাকে বিরক্ত করব না। যান হাত মুখ ধুয়ে আসুন, একসঙ্গে নাশতা খাই। আমি স্যার গজফিতা নিয়ে এসেছি— আপনার ফতুয়ার মাপ নিব। আমি মাপ নেওয়া শিখেছি। আপনাকে দিয়ে বিস্‌মিল্লাহ্‌ করব।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি অপ্রসন্ন মুখে বাথরুমের দিকে রওনা হলেন। ফতে মিয়া ঘন্টা খানিক সময় নষ্ট করবে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই প্রতিমা চলে আসবে। সে তো আর সহজে যাবে না। বাজার টাজার নিয়ে আসবে। মহা উৎসাহে মাছ ভাজতে শুরু করবে। ঘর ধোয়া মুছা করবে। প্রতিমার কর্মকাণ্ড এখানেই শেষ হবে না। সেই অবশ্যই চেষ্টা করবে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে। বাড়াবাড়ি এই মেয়ে করবেই। মানুষের জিনের মধ্যে এমন কিছু কি আছে যা তাকে দিয়ে 'বাড়াবাড়ি' করায়। ডি এন এ অণুতে প্রোটিনের এমন কোনো বিশেষ অবস্থান যা বাড়াবাড়ি করতে বিশেষ বিশেষ মানুষকে প্রেরণা দেয়। সেই মানুষ যখন ঘৃণা করে বাড়াবাড়ি ধরনের ঘৃণা করে। যখন ভালবাসে বাড়াবাড়ি ভালবাসে। অনেক অসুখের মত এটাও যে একটা অসুখ তা-কি মানুষ জানে? এখন না জানলেও একদিন জানবে। কোন ওষুধ কোম্পানি ওষুধ বের করে ফেলবে। যেসব মানুষের বাড়াবাড়ি করার রোগ আছে তারা ট্যাবলেট খেয়ে রোগ সারাবে। এক সময় হোপিংকফ, পোলিওর মত 'বাড়াবাড়ি' রোগেরও টিকা বের হবে। শিশুদের বয়স ছয় মাস হবার আগেই তাদের 'বাড়াবাড়ি প্রবণতা' রোগের টিকা দেয়া হবে। রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার দেখা যাবে।

আপনার শিশুকে কি "বাড়িবাড়ি প্রবণতা"র টিকা দিয়েছেন?

বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিসির আলি বিরক্ত মুখে নিজের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করছে। তাঁর যদি প্রচুর টাকা থাকতো তিনি সমুদ্রের কোনো জনমানব শূন্য দ্বীপে একটা ঘর বানাতেন। আলেকজান্ডিয়ার লাইব্রেরি মতো— সেখানে তাঁর বিশাল লাইব্রেরি রাখত। তিনি দ্বীপে ঘুরে ঘুরে বই পড়তেন। ঘুম পেলে বালির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। রবিনসন ক্রুশোর আনন্দময় জীবন।

মিসির আলির চোখে মুখ জ্বালা করছে। তিনি মুখে ঠাণ্ডা পানির ছিটা দিচ্ছেন তাতেও জ্বলুনি কমছে না। হঠাৎ তাঁর খুব মেজাজ খারাপ লাগছে। এতটা মেজাজ খারাপ হবার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নি। তিনি সমাজে বাস করছেন। সমাজের আর দশটা মানুষের মতই তাকে থাকতে হবে। সামাজিকতা করতে হবে। কেউ তাঁর সঙ্গে গল্প করতে চাইলে গল্প করতে হবে। কেউ লটপটি নামক বস্তু নিয়ে এসে তার সঙ্গে নাশতা খেতে চাইলে নাশতা খেতে হবে। কোনো উপায় নেই। তিনি সমাজে বাস করছেন— বাস করার মূল্য তাঁকে দিতেই হবে।

মিসির আলি বাথরুম থেকে বের হয়ে ইয়াসিনকে গরম পানি দিতে বললেন। গোসল করবেন। সকালে গোসল করার অভ্যাস তার নেই। এখন গোসলে যাওয়ার অর্থ কিছুটা সময় নিজের করে পাওয়া। ফতে তার গজফিতা নিয়ে থাকুক একা একা। একা থাকার অভ্যাস করাটাও জরুরি।

ফতে সিগারেট ধরিয়েছে। পা নাচাচ্ছে। সে আনন্দেই আছে। তার মুখ হাসি হাসি। সে ঠিক করেই এসেছে আজ মিসির আলি সাহেবকে সে চমকে দেবে। ছোটখাটো চমক না, বড় ধরনের চমক। ছোটখাটো চমকে এই লোকের কিছু হবে না। ছোটখাটো চমকে সে দিয়ে দেখেছে। ঘড়ি না দেখে ঘড়ির সময় বলেছে। আজ তার চেয়ে বেশি কিছু করবে। সকালবেলা মিসির আলি সাহেব যখন তার সামনে এসে বসেছিলেন তখন ফতে পরিষ্কার বুঝতে পারছিল উনার মাথায় ঘুরছে রনি নামের একজনের নাম। রনিটা কে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। রনির সঙ্গে শিপ্রার সম্পর্ক কি তা নিয়ে তিনি চিন্তিত। ফতে ইচ্ছা করলে এই কথাটা বলেও তাকে চমক দিতে পারত। কিংবা সে সকাল ন'টায় যখন এসেছে তখন বলতে পারত— ন'টার সময় অন্য একজনের আসার কথা। সে আসে নি আমি এসেছি। যার আসার কথা তার নাম প্রতিমা।

ফতে জানে সে ক্ষমতাধর একজন মানুষ। অন্যের মাথার ভেতর সে ঢুকে পড়তে পারে। ছোটবেলা থেকেই পারে। তার ধারণা ছিল সব মানুষই এটা পারে। ব্যাপারটা যে অন্যরা পারে না শুধু সে একা পারে এটা ধরতে তার অনেক সময় লেগেছে। ক্লাস ফাইভে যখন পড়ে তখন তার হঠাৎ চিন্তা হল— সে কি ভাবছে অন্যরা তা বুঝতে পারছে না কেন ? অন্যদের তো বুঝতে পারা উচিত।

ক্লাসের স্যার যখন তাকে প্রশ্ন করলেন, ফতে বল তিব্বতের রাজধানী কি ?

ফতে খুবই অবাক হল। প্রশ্ন করার দরকার কি ? স্যার কেন তার মাথা ভেতর ঢুকে পড়ছেন না। মাথার ভেতর ঢুকলেই তো স্যার জানতে পারতেন। তিব্বতের রাজধানীর নাম ফতে জানে না। তবে এই মুহূর্তে জানে— কারণ স্যারের মাথায় নামটা ঘুরছে। তিব্বতের রাজধানী— লাসা। এই প্রশ্নের পরে স্যার কি প্রশ্ন করতেন এটাও সে জানে। স্যারের পরের প্রশ্ন— ভুটানের রাজধানীর নাম কি। উত্তরও স্যারের মাথাটা আছে— থিম্পু।

মানুষের মাথার ভেতর ঢুকতে পারার অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে ফতের কোনো লাভ হয় নি। সে কিছুই করতে পারে নি। এই ক্ষমতার কারণে স্কুল জীবনটা তার মোটামুটি ভালো কেটেছে— স্যারদের মার খেতে হয় নি। প্রশংসা শুনেছে—। ইতিহাসের স্যার তো গর্ব করে বলতেন— ইতিহাসের সন তারিখ সব ফতের মুখস্থ। তার সমস্যা একটা পরীক্ষায় খাতায় কিছু লিখতে পারে না।

ক্ষমতা পাওয়ায় ফতের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে। তাকে সারাক্ষণ চিন্তার ভিতর থাকতে হয়— "অন্য কেউ কি আমার মাথার ভিতর ঢুকে পড়ছে। ঢুকে পড়লে ভয়ংকর হবে। কারণ আমার মাথার ভেতর ভয়ংকর সব জিনিস আছে।" ফতে তার জীবনটাই কাটাল আতংক নিয়ে। কেউ অন্য রকমভাবে তার দিকে তাকালেই তার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠে। সর্বনাশ কি হয়ে গেল।

কেউ তার মাথার ভিতর ঢুকতে পেরেছে এ রকম কোনো প্রমাণ তার হাতে নেই— তবে মাঝে মাঝেই সে লক্ষ্য করেছে তার দিকে তাকানোর সময় কেমন

www.BDeBooks.Com

করে যেন তাকাচ্ছে। তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করছে। শিশুদের ব্যাপারে এই ঘটনাটা বেশি ঘটে। বেশির ভাগ শিশুই তাকে দেখলে কাঁদতে শুরু করে। সাধারণ কান্না না। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করে ফেলার মতো কান্না। তখন ফতের ভয়ংকর রাগ লাগে। ইচ্ছা করে আছাড় দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলতে।

আরো একজনের সঙ্গে ফতের দেখা হয়েছিল যাকে দেখে সে নিজে আতংকে অস্থির হয়েছিল। ঘটনাটা এ রকম— ফতের মামা ফতেকে দোকানে পাঠিয়েছিলেন— টুথপেস্ট আনতে। ফতে টুথপেস্ট কিনল। স্টেশনারি দোকানের পাশের সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কেনার সময় হঠাৎ পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি ?

অপরিচিত কোনো মানুষ হঠাৎ এ ধরনের কথা বলে না। ফতে হকচকিয়ে গেল। তার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। ঘটনা কি ? লোকটা কি সব বুঝে ফেলেছে। ফতে বলল, আমার নাম ফতে।

'আপনি কোথায় থাকেন ?'

ফতে ক্ষীণ স্বরে বলল, কেন ?

'আপনার বিষয়ে আমার কৌতূহল হচ্ছে এই জন্যেই জানতে চাচ্ছি।'

ফতে খুবই নার্ভাস হয়ে গেল। তার বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়ে গেল। সে ইচ্ছা করলে লোকটার মাথার ভিতর ঢুকতে পারে। লোকটা কেন এ রকম প্রশ্ন করছে তা জানতে পারে— সমস্যা হচ্ছে ফতে যখন ভয় পেয়ে যায় তখন তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। তখনো হল। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক। রোগা। থুতনীতে সামান্য দাড়ি আছে। শান্ত ভদ্র চেহারা। লোকটা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ চোখে। ফতে নিজেকে শান্ত করার জন্যে সিগারেট ধরাল। লোকটা বলল, আপনি কি করেন জানতে পারি।

ফতে নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিন গলায় বলল, আমি কি করি তা দিয়ে আপনার প্রয়োজন কি।

লোকটা বলল, প্রয়োজন নেই। শুধুই কৌতূহল।

ফতে বলল, এত কৌতূহল ভালো না।

এই বলেই সে আর দাঁড়াল না। হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর পেছন ফিরে দেখে লোকটা তার পেছনে পেছনে আসছে। ফতের বুক আবার ধড়ফড় করতে শুরু করল। সে দৌড়াতে শুরু করল। তখন ঐ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল, তবে তাকিয়ে রইল ফতের দিকে। দৃশ্যটা মনে পড়লেই ফতের বুক কাঁপে।

মিসির আলির ব্যাপারটা ফতে ঠিক ধরতে পারছে না। ফতের যে ক্ষমতা এই মানুষটার কি সেই ক্ষমতা আছে ? মাঝে মাঝে মনে হয় আছে— আবার মাঝে মাঝে মনে হয় নেই। মিসির আলির মাথায় বেশির ভাগ সময়ই ফতে ঢুকতে পারে না। সন্দেহটা সেই কারণেই হয়। যে কতবার ফতে মিসির আলির মাথার ভিতর ঢুকেছে ততবারই সে ধাক্কার মতো খেয়েছে। লোকটা একসঙ্গে

অনেক কিছু চিন্তা করছে। তিনটা-চারটা চিন্তা কোনো মানুষ একসঙ্গে করছে— এমন কারোর সঙ্গেই ফতের এর আগে দেখা হয় নি। ফতে মিসির আলির ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে চায়। পুরোপুরি জানতে চায় এই মানুষটার ও কি তার মতো ক্ষমতা আছে?

ফতের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে তার ক্ষমতার ব্যাপারটা মিসির আলিকে খোলাখুলি বলে। কিন্তু তার মন সায় দেয় না। লোকটাকে এটা বলে লাভ কি। এমন তো না যে এটা কোনো অসুখ সে অসুখ থেকে মুক্তি চায়। আগবাড়িয়ে বললে— একজন তার গোপন ব্যাপারটা জেনে ফেলবে। একজন জানা মানেই অনেকের জানা। কি দরকার।

মিসির আলির গোসল শেষ হয়েছে। তিনি এসে ফতের সামনের চেয়ারে বসেছেন। ফতে খুবই হতাশ বোধ করছে। মিসির আলির মাথার ভেতর সে ঢুকতে পারছে না। ইয়াসিন এসে পরোটা এবং বাটিতে করে মুরগির লটপটি দিয়ে গেল। ফতে বলল, স্যার খান এর নাম মুরগির লটপটি।

মিসির আলি কোনো কথা না বলে খেতে শুরু করলেন। ফতে বলল, খেতে কেমন স্যার?

মিসির আলি বললেন, ভালো।

'আপনার কি শরীর খারাপ।'

'না শরীর খারাপ না। মেজাজ সামান্য খারাপ। কোনো কারণ ছাড়াই খারাপ।'

'আমি বেশিক্ষণ থাকব না স্যার। নাশতা খেয়ে আপনার ফতুয়ার মাপটা নিয়ে কাপড় কিনতে যাব। কি রঙের কাপড় আপনার পছন্দ?'

মিসির আলি বললেন, কাপড়ের রঙ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। শুধু কটকট না করলেই হল।

'হালকা নীল রঙ কিনব স্যার?'

'কিনতে পারে।'

'কপড়ের দামটা স্যার আমি দিব। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। শুধু দরজির খরচটা আপনি দিবেন। প্রথম ব্যবসা— বিনা টাকায় করা ঠিক না।'

মিসির আলি বললেন, আমি দরজির খরচ দেব। কোনো অসুবিধা নেই।

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফতুয়া দোকানে গিয়ে ডেলিভারি নিবেন। এই কষ্টটা আপনাকে করতে হবে।'

'আচ্ছা করব। ঠিকানা রেখে যাও, আমি সন্ধ্যার পর পর যাব।'

মিসির আলির নাশতা খাওয়া শেষ হয়েছে। তিনি চা খাচ্ছেন। ফতে কয়েকবার চেষ্টা করেও মিসির আলি মাথার ভেতর ঢুকতে পারল না। সে পরিকল্পনা বদলাল। লোকটাকে চমকে দেবার কোনো দরকার নেই। পরে হয়ত দেখা যাবে চমকে দিতে গিয়ে এমন কিছু ঘটল যে উল্টা সে নিজেই চমকাল। লোকটির বিষয়ে আগে সে পুরোপুরি জানবে। তারপর অন্য ব্যবস্থা।

www.BDeBooks.Com

ফতে মাপ নেবার জন্যে ফিতা বের করল। দরজিদের মতোই উঁচু গলায় মাপ বলতে বলতে কাগজে লিখে নিল।

লম্বা	২৯
বুক	৩৪
পুট	৬
হাত	১২
মুহরি	১৬
গলা	১৩$^{১}/_{২}$

ফতে বলল, একটু দোয়া রাখবেন স্যার দরজির কাজটা যেন তাড়াতাড়ি শিখতে পারি। খবরের কাগজে নকশা করে, খবরের কাগজ কেটে কেটে কয়েকদিন চেষ্টা করেছি আউলা লেগে যায়।

মিসির আলি বললেন, সব কাজ সবার জন্যে না।

ফতে সমান চমকাল মিসির আলি এই কথাটা কেন বললেন। তিনি কি কিছু বুঝতে পারছেন ? না এটা শুধুই কথার কথা। ফতে বলল, স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। যদি কিছু মনে না নেন।

'জিজ্ঞেস কর।'

ফতে মিনমিনে গলায় বলল, আমার বিষয়ে আপনার কি ধারণা ?

'তোমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না। আরো পরিষ্কার করে বল।'

'আমাকে দেখলে আপনার কি মনে হয় ?'

'মনে হয় তুমি সব সময় আতংকে আছ। সবাইকে ভয় পাচ্ছ।'

ফতে মুখ শুকনা করে ফেলল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। এই লোক কি করে বুঝল, সে সবাইকে ভয় পায়। তার ভয় তো সে প্রকাশ করে না। নিজের ভিতর লুকিয়ে রাখে। লুকানো জিনিস সে জানল কি ভাবে ?

'স্যার আমি যাই ?'

ফতুয়ার কাগজটা ফেলে গেছ। মাপ্টা নিয়ে যাও। লম্বার মাপে ভুল আছে— লম্বা বাইশ। তুমি মাপ নিয়েছে বাইশের বলেছ ঊনত্রিশ, লিখেছও ঊনত্রিশ।

মিসির আলি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরেই থাকলেন। প্রতিমা এল না। এতে তার টেনশান কমল না— যে কোনো সময় চলে আসবে এই টেনশান থেকেই গেল।

সন্ধ্যায় ফতুয়া আনতে গেলেন। দর্জির দোকান ফতে সুন্দর সাজিয়েছে। ঝলমলে বাতি জ্বলছে। টাকা দিয়ে মিসির আলি ফতুয়া নিলেন। দোকানের মালিক ফতে ছিল না। মিসির আলি কেমন যেন স্বস্তি বোধ করলেন। স্বস্তি বোধ করার কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট না।

মিসির আলি মাথা নিচু করে হাঁটছেন। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। তার মনে ক্ষীণ সন্দেহ— বাসায় ফিরে দেখবেন প্রতিমা বসেছে। দেড়টনি একটা

ট্রাক নিয়ে এসেছে। সে ট্রাকে মিসির আলির জিনিসপত্র তুলে অপেক্ষা করছে কখন মিসির আলি আসবেন।

এতটা এই মেয়ে নিশ্চয়ই করবে না, আবার করতেও পারে। অস্বাভাবিক মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। কাউকে চট করে অস্বাভাবিক বলা ঠিক না। মানুষ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক সীমারেখায় বাস করে। একজন স্বাভাবিক মানুষ মাঝে মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ করে, আবার খুবই অস্বাভাবিক মানুষ হঠাৎ স্বাভাবিক আচরণ করে। এখানেও কথা আছে— কোন আচরণগুলোকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ বলব। স্বাভাবিকের মানদণ্ড কে ঠিক করে দেবে ? মিসির আলি যে আচরণকে স্বাভাবিক ভাবছেন— ফতে মিয়া কি তাকে স্বাভাবিক ভাববে ?

ভ্রূ কুঁচকে মিসির আলি ফতের কথা ভাবতে শুরু করলেন। ফতেকে কি খুব স্বাভাবিক মানুষ বলা যায়।

মিসির আলি মাথা নেড়ে নিজের মনে বললেন, হ্যাঁ বলা যায়।

মিসির আলি আবারো নিজেকে প্রশ্ন করলেন, ফতেকে কি অস্বাভাবিক বলতে চাইলে বলতে পারে ?

প্রশ্ন এবং উত্তরের খেলা চলতে লাগল। কিছু দাবা খেলোয়াড় আছে সঙ্গী না পেলে নিজেই নিজের সঙ্গে দাবা খেলে— মিসির আলিও ইদানীং তাই করেন। নিজেই প্রশ্ন করেন। নিজেই উত্তর দেন। কাজটা বেশির ভাগ সময় করেন পথে যখন হাঁটেন। এটাও বয়স বাড়ার কোনো লক্ষণ কি-না তিনি জানেন না। একটা বয়সের পর সবাই কি এ রকম করে ? করার কথা।

মিসির আলির নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার নমুনা এ রকম—

প্রশ্ন : ফতের কোন আচরণটা সবচে' অস্বাভাবিক ?

উত্তর : সে ভীতু প্রকৃতির মানুষ। ভয়ে সে অস্থির হয়ে থাকে। ভীতু মানুষেরা কারো চোখের দিকে সরাসরি তাকায় না। আর তাকালেও খুব অল্প সময়ের জন্যে তাকায়। এ ধরনের মানুষ বেশির ভাগ সময় মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফতে সবসময় চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রশ্ন সে কেন চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে ?

উত্তর : হয়তোবা চোখের ভাষা পড়তে চায়। হয়তো সে চোখের ভাষা সহজে বুঝতে পারে।

প্রশ্ন তোমার এই হাইপোথিসিস কি ভাবে প্রমাণ করা যাবে ?

উত্তর খুব সহজেই প্রমাণ করা যায়। চোখে সানগ্লাস পরে তার সামনে বসতে হবে। সানগ্লাসের কারণে তার চোখ দেখা যাবে না। কাজেই ফতে আর চোখের দিকে তাকাবে না।

প্রশ্ন : আর কোনো পদ্ধতি আছে ?

www.BDeBooks.Com

উত্তর একজন জন্মান্ধের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দিয়ে দেখা যেতে পারে।
প্রশ্ন তার অস্বাভাবিকতার আর কোনো উদাহরণ কি আছে ?
উত্তর হ্যাঁ আছে। বড় একটা উদাহরণ আছে।
প্রশ্ন বল শুনি।
উত্তর : না এখন বলব না। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিই।
প্রশ্ন কি আশ্চর্য তুমি যা বলার আমাকেই তো বলছ। আমি তো বাইরের কেউ না।
উত্তর : যে প্রশ্ন করছে এবং যে উত্তর দিচ্ছে তারা একই ব্যক্তি হলেও আলাদা সত্তা। একটি সত্তার থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চাইতে পারে।

মিসির আলি ঘড়ি দেখলেন সাড়ে সাতটা বাজে। প্রায় দেড় ঘণ্টা তিনি হেঁটেছেন— কোনো এক চিপা গলির ভেতর ঢুকে পড়েছেন। জায়গাটা চিনতে পারছেন না। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন— "ভাই এই জায়গাটার নাম কি ?" সে এমন ভাবে তাকাল যেন খুব গর্হিত কোনো প্রশ্ন তিনি করে ফেলেছেন। জবাব না দিয়ে সে চলে গেল। আরেকজনকে একই প্রশ্ন করলেন, সে নিতান্তই বিরক্ত গলায় বলল, জানি না।

অদ্ভুত এক গলি, তার চোখের সামনে দিয়ে কালো রঙের প্রকাণ্ড এক শূকর কয়েকটা বাচ্চা নিয়ে চলে গেল। মেথর পট্টিতে শূকর পোষা হয় এই জায়গাটা নিশ্চয় মেথর পট্টি না। তিনি কোথায় এসে পড়েছেন ?

রাত ন'টা।

ফতে মিয়াকে নিউ মার্কেটের কাঁচা বাজারে ঘোরাফিরা করতে দেখা যাচ্ছে। সে এসেছে মুরগি কিনতে। সে চারটা রোস্টের মুরগি কিনবে। ফতের মামির কিছু বান্ধবী কাল দুপুরে খাবে। মামি রাতেই রোস্ট রেঁধে ফেলতে চান।

ফতে দাঁড়িয়ে আছে— বড় মাছের দোকানের সামনে। বিশাল চকচকে বটি দিয়ে মাছ কাটা হয়— বটির গা বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে কি অসাধারণ দৃশ্য! ফতের দেখতে ভালো লাগে। দৃশ্যটা দেখার সময় মেরুদণ্ড দিয়ে শিরশির করে কি যেন বয়। শরীর ঝনঝন করতে থাকে। ফতের বড় ভালো লাগে। মাছটা যদি জীবিত হয় তখন তার আরো ভালো লাগে। আজ একটা কাতল মাছ কাটা হচ্ছে। মাছটা জীবিত ছটফট করছে। আহা কি দৃশ্য!

মাছ কাটা দেখে ফতে গেল মুরগি কিনতে। ফতে মনের ভেতর চাপা আনন্দ অনুভব করছে। জীবিত মুরগিগুলোকে জবে করা হবে। জবেহ করার ঠিক আগে মুরগিগুলো আতংকে অস্থির হয়ে ছটফট করতে থাকে— তখনো ফতের ভালো লাগে। ফতে ঠিক করেছে মুরগি জবেহ করার সময় সে বলবে মাথাগুলো যেন পুরোপুরি শরীর থেকে আলাদা করা হয়। খুব ছোটবেলায় একবার সে এই দৃশ্য দেখেছিল। বাড়িতে মেহমান এসেছে— মুরগি জবেহ হচ্ছে। ধারাল বটি দিয়ে টান দিতেই মুরগির মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়ে

গেল। যে মুরগি ধরেছিল সে হাত ছেড়ে দিল। কি আশ্চর্য মাথা ছাড়া মুরগিটা তিন চার পা এগিয়ে গিয়ে ধপ করে পড়ে গেল। এই দৃশ্য এরপরে ফতে আর দেখে নি। যতবারই মুরগি কাটা হয়— ফতে আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্য দেখার জন্যে বসে থাকে। সে নিশ্চিত এক সময় না এক সময় সে দৃশ্যটা দেখবে। কে জানে কপালে ভালো হলে হয়তো আজই দেখবে। আজ তার জন্যে শুভদিন। নিজের দোকান চালু হয়েছে।

ফতে মুরগি কাটতে দিয়ে নিচু গলায় বলল, মুরগির মাথা পুরাটা আলগা করে ফেলেন।

মুরগি কাটার লোক বলল, বুঝলাম না কি কন।

ফতে বলল, এক পোচ দিয়ে মাথা আলাদা করে ফেলেন।

লোকটা আপত্তি করল না। যা বলা হল তাই সে করল। ছোটবেলার ঘটনাটা ঘটল না। মাথাবিহীন কোনো মুরগি দৌড় দিল না। ফতে আফসোসের ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। এ ধরনের মজাদার ঘটনা রোজ রোজ ঘটে না। হঠাৎ হঠাৎ ঘটে।

মুরগির কাটা মাথাগুলো ফতে আলাদা করে পলিথিনের ব্যাগে নিয়ে নিল। কাটা মাথাগুলো নিয়ে একটা মজা করা যাবে। যে বেবিটেক্সিতে করে সে বাড়িতে ফিরবে— মুরগির কাটা মাথাগুলো সেই বেবিটেক্সির সিটে রেখে। সিটের উপর রক্তমাখা মাথা রেখে ফতে নেমে যাবে। পরে যে যাত্রী উঠবে সে বসতে গিয়ে ভয়ে ভিমরি খাবে। চিৎকার চেঁচামেচি করবে। ফতের ভাবতেই ভালো লাগছে। এই সময় সে কাছে থাকবে না এটাই একটা আফসোস।

ফতে বেবিটেক্সি বাড়ি পর্যন্ত নিল না, বাড়ির কাছাকাছি এসে ছেড়ে দিল। বেবিটেক্সিওয়ালাকে বাড়ি চেনানো মোটেই ঠিক হবে না। কেন সে মুরগির মাথা সিটে রেখেছে তা নিয়ে দরবার করতে পারে। এই সব সূক্ষ্ম কাজ খুব ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়। সামান্য উনিশ বিশও করা যায় না। ফতে এই কাজগুলো ঠাণ্ডা মাথায় করে বলেই এখনো টিকে আছে। কেউ তাকে ধরতে পারে নি। কোনোদিন পারবেও না।

চারটা মুরগি নিয়ে ফতে রওনা হয়েছে। তার বেশ মজা লাগছে। সে কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে তার পরে বেবিটেক্সিতে যে উঠবে তার দশাটা কি হবে। ধরা যাক স্বামী-স্ত্রী উঠেছে। প্রথমে উঠল স্ত্রী। সে বসতে গিয়ে বলল, কিসের উপর বসলাম গো ? স্বামী বলল, তুমি সব সময় যন্ত্রণা কর। স্ত্রী বলল, হাতে যেন রসের মতো কি লাগল। এর মধ্যে স্বামী, এসে উঠেছে। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আঁৎকে উঠেছে— হতভম্ব গলায় বলছে সর্বনাশ শত শত মুরগির মাথা। কোত্থেকে আসল ?

চারটা মুরগির মাথাই তখন তাদের কাছে শত শত মুরগির মাথা বলে মনে বে। ভয় পেলে এ রকম হয়।

ফতে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল মুরগির মাথা না হয়ে যদি মানুষের মাথা হত তখন কেমন হত। চারটা মাথার তখন প্রয়োজন নেই। একটা কাটা মাথাই

www.BDeBooks.Com

যথেষ্ট। সিটের এক কোনায় কাটা মাথাটা পরে আছে। অন্ধকার বলে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। যাত্রী উঠল। বেবিটেক্সি চলা শুরু করেছে। যাত্রী বলল, কে যেন ব্যাগ না কি ফেলে গেছে। বলেই সে হাত দিয়ে জিনিসটা তুলল। এরপর যে নাটক হবে তার কোনো তুলনা নেই। এই নাটক কল্পনায় দেখলে হবে না। এই নাটক দেখতে হবে বাস্তবে। বেবিটেক্সি নিয়ে ফতেকেই বের হতে হবে। যাত্রী যখন কাটা মাথাটা হাত দিয়ে তুলে ধরে হতভম্ব গলায় বলবে— "এটা কি ?" তখন ফতে খুব স্বাভাবিক গলায় বলবে, "এটা একটা ছোট বাচ্চার কাটা মাথা। সাইডে রেখে দেন।"

ভাবতেই গা যেন কেমন করছে। মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। শরীর ঝলঝল করছে।

কাজটা করতে হবে। একটা কাটা মাথা নিয়ে বের হতে পারলে অনেক মজা করা যাবে। হয়তো আত্মভোলা টাইপ কোন যাত্রী উঠেছে। সিটের কোনায় কি পড়ে আছে সে তাকিয়েও দেখছে না। তাকে সে বলল, স্যার সিটের কোনায় ছোট বাচ্চার একটা কাটা মাথা আছে। একটু খেয়াল রাখবেন মাথাটা যেন পড়ে না যায়।

কিংবা ধরা যাক খুব সাহসী কোনো যাত্রী এসেছে। সে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, এই বেবি থামাও। গাড়ির ভেতর মানুষের মাথা কেন ? কোত্থেকে এসেছে। চল থানায় চল।

সে তখন খুবই বিনীত গলায় বলবে, মাথাটা স্যার আমি এনেছি। শুক্রাবাদ থেকে আরেকটা মাথা তুলে ডেলিভারি দিতে হবে। মাল দু'টা ডেলিভারি দিয়ে আপনার সঙ্গে থানায় যাব। কোনো সমস্যা নেই।

ফতের চোখ চকচক করছে। কল্পনা করতেই এত আনন্দ। আসল ঘটনার সময় না-জানি কত আনন্দ হবে।

আসল ঘটনার খুব দেরিও নেই। নকল ঘটনা ঘটতে ঘটতে আসল ঘটনা ঘটে। তার জীবনে সব সময় এ রকমই হয়েছে। অতীতে যেহেতু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কোনো এক বর্ষার রাতে দেখা যাবে মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে সে বেবিটেক্সি নিয়ে বের হয়েছে। সেই বেবিটেক্সির 'প্রাইভেট' লেখা সাইনবোর্ড সে খুলে ফেলেছে। এখন তারটা সাধারণ ভাড়ার বেবিটেক্সি। ফার্মগেট থেকে যাত্রী তুলেছে, যাবে উত্তরায়। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা। স্বামী-স্ত্রী এবং ছোট একটা বাচ্চা। বাচ্চাটাই প্রথম দেখল। সহজ গলায় মাকে বলল— মা এটা কি ?

ফতের মামি তসলিমা খানম, ফতেকে দেখেই রেগে উঠলেন। ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চারটা মুরগি কিনতে এতক্ষণ লাগে ? তুমি কি ডিমে তা দিয়ে মুরগি ফুটিয়ে এনেছ ?

ফতে কিছু বলল না। বলার কিছু নেই। সে যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে চলে আসত— তাহলেও তসলিমা খানম চেঁচামেচি করতেন। অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে চেঁচামেচি। তখন হয়ত বলতেন— বুড়া মোরগ কোত্থেকে এনেছ ? এটা কি রোস্টের মুরগির সাইজ। রোস্টের মুরগির যে মিডিয়াম সাইজ হয় তুমি জান না। না-কি জীবনে কখনো রোস্ট খাওনি। তোমাকে কি রোস্ট কোনোদিন দেওয়া হয় না। আবার বেয়াদবের মতো চোখে চোখে তাকিয়ে আছ কেন ?

মামির চেঁচামেচিকে ফতে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু ভাব করে যেন খুব গ্রাহ্য করছে। ভয়ে বুক কাঁপছে। এই অভিনয় সে ভালোই করে শুধু একটাই সমস্যা তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়। চোখের দিকে না তাকালে সে মাথার ভেতর ঢুকতে পারে না। সমস্যা হচ্ছে চোখের দিকে তাকালেই লোকজন মনে করে সে বেয়াদবি করছে।

তসলিমা খানমের মাথার ভেতর ঢোকা ফতের জন্যে খুব সহজ। হুট করে ঢুকে যাওয়া। তবে খুব সাধারণ একটা মাথা। ঢুকে কোনো আনন্দ নেই। এই মহিলার সমস্ত চিন্তা ভাবনা— সংসার নিয়ে। আজ কি রান্না হবে। ঘর কোথায় নোংরা। ধোপাখানা থেকে কাপড় আনতে হবে। সবুজ রঙের বিছানার চাদরটা কি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেল। কাজের বুয়া চুরি করে নি তো। এই মহিলার চিন্তা ভাবনার মধ্যে শুধু একটাই মজার ব্যাপার আছে— খায়রুল কবির নামের একজন আধবুড়া মানুষ। এই আধবুড়া লোকটাকে এই মহিলা ডাকেন— বড়দা। আধবুড়াটা তাকে ডাকে পুটুরানী। আধবুড়া শয়তানটা বিয়ে করে নি। সে বাসাবোর একটা দোতলা বাড়িতে থাকে। ফতে কোনোদিন সে বাড়িতে যায় নি তবে বাড়িটা কোথায়— কেমন সব জানে। কোন ঘরে কি ফার্নিচার তাও সে বলতে পারবে। কারণ ঐ বাড়িটা তসলিমা খানমের মাথায় খুব পরিষ্কারভাবে আছে। তসলিমা খানম স্কুলে পড়ার সময় থেকে ঐ বাড়িতে যেতেন। বিয়ের পরেও যান। আধবুড়া শয়তানটা তখন তাকে পুটুরানী, পুটুরানী করে খুবই নোংরাভাবে আদর করা শুরু করে। এক সময় পুটুরানী বলে, বড়দা এ রকম করলে আমি কিন্তু আর আসব না। তুমি একা একা থাক বলে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে আসি তুমি এসব কি কর। বুড়োটা বলে— আচ্ছা যা আর আসতে হবে না। পুটুরানী তখন বলে, দরজাটা বন্ধ করে। দরজা তো খোলা। বুড়োটা বলে, তোর বন্ধ করতে ইচ্ছা হলে তুই কর। পুটুরানী বলে, “কে না কে দেখবে।” বুড়ো বলে, দেখুক যার ইচ্ছা।

ফতের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করেছে বুড়োর কথা বলে হঠাৎ সে তার মামিদের চমকে দেয়। যেমন সে খুব সহজ গলায় বলল, মামি বুধবার যে আপনার বড়দার কাছে যাওয়ার কথা, আপনি যাবেন না ?

এটা করা ঠিক হবে না। তখন তার আশ্রয় নষ্ট হয়ে যাবে। মামি তৎক্ষণাৎ তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তবে এখন যদি সে চায় তাহলে এই

www.BDeBooks.Com

কাজটা করতে পারে। এখন বাড়ি থেকে বের করে দিলেও তার থাকার জায়গা আছে। সাজঘরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকবে। এখন 'পুটুরানীর' বিষয়টা নিয়ে মজা করা যায়। মজাটা এমনভাবে করা যেন কেউ ধরতে না পারে মজার পেছনে সে আছে।

ফতেকে আবার বাজারে যেতে হচ্ছে। গরম মশল্লা এনে বাসায় ঢোকা মাত্র মামি বলবেন, টক দৈ আন নি কেন ? তিনটা মাত্র জিনিস আনতে পাঠালাম এর মধ্যে একটা ভুলে গেলে। তখন ফতে যদি বলে, টক দৈ-এর কথা আপনি বলেন নি তাহলে মামি খুবই রেগে যাবে। আবার ফতে যদি নিজ থেকে টক দৈ নিয়ে আসে তাহলেও মামি রাগ করবেন। গলার রগ ফুলিয়ে বলবেন, আগবাড়িয়ে তোমাকে কে দৈ আনতে বলেছে ? সব সময় মাতাব্বরি কর কেন ? আলগা মাতাব্বরি করবে না।

বাজারে যাবার সময় ফতে দেখল— সিঁড়ির গোড়ায় লুনা বসে আছে। একা একা খেলছে। হাতের আঙুল একবার খুলছে একবার বন্ধ করছে। এটা লুনার বিশেষ ধরনের খেলা এবং খুবই পছন্দের খেলাটা সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলতে পারে।

ফতে তার কাছে গিয়ে বলল— পুটুরানী পুটুরানী।

লুনা চোখে তুলে তাকাল। মিষ্টি করে হাসল। ফতে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল— পুটুরানী, পুটুরানী, পুটুরানী।

এইবার লুনা ফিসফিস করে বলল, পুটুরানী।

ফতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাজ হয়েছে। এখন লুনা নিজের মনেই পুটুরানী পুটুরানী করতে থাকবে। ফতের মামি ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নিতে পারবেন না। লুনার কপালে আজ দুঃখ আছে। চড় থাপ্পড় অবশ্যই খাবে। ভাবতেই ফতের মজা লাগছে। লুনার চড়-থাপ্পড়ের চেয়ে মজার দৃশ্য হবে পুটুরানী পুটুরানী শুনে তসলিমা খানম কি করেন সেটা। এই মজার দৃশ্য ফতে দেখতে পাবে না কী আফসোস।

৫

'স্যার কেমন আছেন ?'

প্রশ্নের জবাব দেবার আগে মিসির আলি দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। সকাল ন'টা। দেয়াল ঘড়িটা আধুনিক ইলেকট্রিক্যাল ঘড়ি না হয়ে পুরনো। দিনের পেন্ডুলাম ঘড়ি হলে ঢং ঢং করে ন'টা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করত। মিসির আলি শুকনো গলায় বললেন, ভালো আছি। প্রতিমা তুমি কেমন আছ ?

'যাক নাম তাহলে মনে আছে। আমি ভাবলাম আবার বোধহয় প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আমার পরিচয় দিতে হবে। কেন আমার নাম প্রতিমা ব্যাখ্যা করতে হবে।'

মিসির আলি মনে মনে ভাবলেন— মেয়েটা আগে এত কথা বলত না। এখন বলছে কেন ?

প্রতিমা বলল, স্যার এখন বলুন আমাকে দেখে কি রাগ লাগছে ?

'না।'

'বিরক্তি লাগছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

প্রতিমা বলল, আমাকে দেখে আসলে আপনি খুশি হয়েছেন। আপনি বুঝানোর চেষ্টা করছেন যে বিরক্ত হয়েছেন— আসলে তা-না। স্যার ঠিক বলেছি ?

আনন্দে এবং উৎসাহে প্রতিমা ঝলমল করছে। আজ তাকে আরো সুন্দর লাগছে। মিসির আলি তাকিয়ে দেখলেন। বসার ঘরে দু'টা বড় বড় স্যুটকেস। এই স্যুটকেস প্রতিমাই নিয়ে এসেছে। স্যুটকেস কেন এনেছে কে জানে। মিসির আলি বললেন, যেদিন আসার কথা ছিল সেদিন আসনি। আসনি কেন ?

প্রতিমা বলল, আপনি বলুন কেন আসিনি। আপনি হচ্ছেন দ্য গ্রেট মিসির আলি। আমার দিকে তাকিয়েই আপনার বলে দেয়া উচিত কেন আসিনি। বসার ঘরে দু'টা স্যুটকেস কেন এনেছি বলুন তো ? দেখব আপনি আগের মিসির আলি আছেন না বয়স হবার কারণে আপনার আগের ডিকেটটিভ ক্ষমতা কমে গেছে।

মিসির আলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ছটফট করছ কেন ? বস।

প্রতিমা বলল, আপনিইবা আমাকে দেখে এত অস্থির হচ্ছেন কেন ? আপনিও বসুন।

মিসির আলি বসলেন। প্রতিমা বলল— আমি বলেছিলাম ন'টার সময় আসব। আমি ঠিকই এসেছিলাম। ন'টা বাজার আগেই গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক ন'টার সময় ঢুকব এই হচ্ছে আমার প্ল্যান। ন'টা বাজতেই প্ল্যান বদলালাম। ঠিক করলাম— আপনার কাছে যাব না, যাতে সারাদিন আপনি মনে মনে অপেক্ষা করেন। তাই করেছিলেন না ?

'হ্যাঁ।'

'তার পরদিন এলাম না। তার পরদিনও না। এটা করলাম— যাতে অপেক্ষা করতে করতে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বলুন আপনি ক্লান্ত হয়েছেন না ?'

'খানিকটা হয়েছি।'

'এবং এক সময় আপনার নিশ্চয়ই মনে হওয়া শুরু হয়েছে— আচ্ছা মেয়েটা আসছে না কেন— ওর কি হয়েছে। বলুন এ রকম হয়েছে না ?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'আমি এই অবস্থাটা আপনার ভেতর তৈরি করার চেষ্টা করেছি। সত্যি করে বলুন, পেরেছি কি না।'

'হ্যাঁ পেরেছ।'

প্রতিমা হাসি হাসি মুখে বলল— ঐ দিন আমার উপর আপনি খুবই বিরক্ত হচ্ছিলেন। আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব এটা ভেবে আপনি আতঙ্কে অস্থির হয়েছিলেন। আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। তখনি ঠিক

www.BDeBooks.Com

করেছিলাম আমি এমন অবস্থা তৈরি করব যাতে আপনি খুব আগ্রহ নিয়েই আমার সঙ্গে থাকতে আসেন।

'তোমার কি ধারণা সে রকম অবস্থা তৈরি করতে পেরেছ ?'

'না এখানো পারি নি। তবে এখন আর আপনি আমাকে আগের মতো অপছন্দ করছেন না।'

'স্যুটকেসে কি ?'

স্যুটকেসে কিছু না। খালি স্যুটকেস। আপনার বইগুলো আজ আমি স্যুটকেসে ভরে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। প্রথম দিন বই, তারপর জামা কাপড়, তারপর বাসন-কোসন এইভাবে ঘর খালি করব। সব শেষের দিন আপনি যাবেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাব না, আপনি নিজ থেকে যাবেন।

'বল কি ?'

প্রতিমা খিলখিল করে হাসছে। মনে হচ্ছে সে খুবই মজা পাচ্ছে। মেয়েটার হাসি শুনে মিসির আলির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এই মেয়ে হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে যা করবে বলছে তা সে করবে।

প্রতিমা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, স্যার শুনুন,— আপনার শোবার ঘরে যেখানে আপনার বিছানা করেছি সেখানে বিশাল একটা জানালা আছে। আপনি সারাক্ষণ আকাশ দেখতে পারবেন।

'আমি সারাক্ষণ আকাশ দেখতে চাই এটা তোমাকে কে বলল ?'

'কেউ বলেনি। আমি জানি। আপনার একটা ইচ্ছা হল— মৃত্যুর সময় আপনি আকাশ দেখতে দেখতে মারা যাবেন।'

'আমি আকাশ দেখে মরতে চাই তোমাকে কে বলল ?'

'কেউ বলেনি। আমি বুঝতে পেরেছি।'

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, কিভাবে বুঝতে পেরেছ ?

প্রতিমা হতাশ গলায় বলল, স্যার আপনার হয়েছে কি ? আমি যে মনের কথা বুঝতে পারি আপনি তো সেটা জানেন। খুব ভালো করে জানেন। এই নিয়ে আপনি অনেক পরীক্ষা-টরীক্ষাও করেছেন— এখন মনে করতে পারছেন না কেন ?

'বুঝতে পারছি না, কেন মনে করতে পারছি না।'

'আপনার কি আলজেমিয়ারস ডিজিজ হয়েছে ? আমার ধারণা তাই হয়েছে। নেপাল থেকে আমি আপনাকে পশমি চাদর এনে দিলাম। আপনাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলাম— সব সময় এই চাদর ব্যবহার করবেন। আপনি ঠিকই এই চাদর ব্যবহার করছেন। কিন্তু আমি যে চাদরটা দিয়েছি এটা ভুল মেরে বসে আছেন। কেন স্যার ?'

মিসির আলি জবাব দিলেন না। মেয়েটা সত্যি কথাই বলছে— এর বিষয়ে তাঁর কিছুই মনে নেই। মেয়েটি সম্পর্কে যাবতীয় স্মৃতি মস্তিষ্ক মুছে ফেলেছে।

ব্যাপারটা রহস্যময়। প্রতিমা সম্পর্কে জানার জন্যে তিনি তাঁর পুরনো ফাইল ঘেঁটেছেন। প্রতিটি কেইস হিস্ট্রির ফাইল তাঁর আলাদা করা। সেখানে প্রতিমার কেইস হিস্ট্রি থাকার কথা— অথচ নেই। পাঁচটি পাতা ফাইল থেকে ছেড়া হয়েছে। যে ছিড়েছে সে যে খুব সাবধানে গুছিয়ে ছিড়েছে তাও না— টেনে ছিড়েছে।

প্রতিমা বলল, স্যার এই মুহূর্তে আপনি কি ভাবছেন বলি ?

'বল।'

'এই মুহূর্তে আপনি ভাবছেন— পাতাগুলো কে ছিড়ল ?'

মিসির আলি চমকে উঠলেন। প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, আপনি এত চমকে গেলেন কেন ? আমি যে মনে কথা ধরতে পারি তার প্রমাণ অনেকবার আপনাকে দিয়েছি। অথচ আপনি এমনভাবে চমকেছেন যেন প্রথমবার দেখলেন।

ইয়াসিন দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকেছে। প্রতিমা তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, তুমি চা বানিয়ে নিয়ে এসেছ কেন ? আমি না তোমাকে বললাম তুমি পানি গরম করে আমাকে খবর দেবে আমি চা বানিয়ে দেব। বলেছি কি বলিনি ?

'বলছেন।'

'আর কখনো এই ভুল করবে না।'

ইয়াসিন মুখ ভোতা করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা কড়া গলায় বলল, যা হাঁদারামের মতো দাঁড়িয়ে থাকবি না।

ইয়াসিন চলে গেল। প্রতিমা এমনভাবে কথা বলছে যেন সে এ বাড়ির কর্তা। বাড়ির দেখাশোনা, সংসার চালানোর সব দায়িত্ব তার একার। মিসির আলি চায়ে চুমুক দিলেন। প্রতিমা বলল, স্যার আপনি কি নিজের হাতের লেখা চিনতে পারবেন ? না কি নিজের হাতের লেখাও ভুলে গেছেন।

মিসির আলি বললেন, হাতের লেখা চিনব।

'পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্পে আপনাকে দিয়ে কিছু কথা লিখিয়ে নিয়েছিলাম। মনে আছে ?'

'না।'

'দলিল সঙ্গে নিয়ে এসেছি। চা শেষ করে দলিলটা দেখুন। চা খেতে খেতে দলিল দেখলে সমস্যা আছে।'

'কি সমস্যা ?'

'আপনি বিষম খাবেন। চা শ্বাসনালী দিয়ে ঢুকে সমস্যা তৈরি করবে।'

'ভয়ঙ্কর কিছু কি লিখেছি ?'

'আপনার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে। নিন দেখুন। শুধু পড়ার সময় চায়ে চুমুক দেবেন না।'

মিসির আলি দলিল পড়ছেন। হাতের লেখা তার। কালির কলমে লেখা। লেখা দেখে কোন কলমটা ব্যবহার করেছেন সেটাও মনে পড়েছে। ওয়াটারম্যান

www.BDeBooks.Com

কলম। ইয়াসিনের আগে যে ছেলেটা কাজ করতো সে অনেক জিনিসপত্রের সঙ্গে তার এই শখের কলমটাও চুরি করে নিয়ে যায়। দলিল গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

আমি মিসির আলি

সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে নিম্নলিখিত অঙ্গিকার করছি।

ক. আমার চিকিৎসাধিন রোগী প্রতিমার (ভালো নাম আফরোজা বানু) সঙ্গে জীবনের একটি অংশ কাটবে। সে যখন আমাকে তার সঙ্গে থাকতে ডাকবে তখনই আমি তাতে রাজি হব।

খ. প্রতিমার (আফরোজা বানু) সঙ্গে বিবাহ নামক সামাজিক প্রথার ভেতর দিয়ে যেতেও আমার কোনো আপত্তি নেই।

অঙ্গিকারনামার শেষে ইংরেজি ও বাংলায় মিসির আলির দস্তখত। তারিখ দেয়া আছে। ছ'বছর আগের একটা তারিখ।

প্রতিমা দলিলটা মিসির আলির হাত থেকে নিয়ে হ্যান্ডব্যাগে রাখতে রাখতে বলল— দলিল পড়ে আপনি কি চমকেছেন ?

মিসির আলি জবাব দিলেন না।

প্রতিমা বলল, দলিলটা যে আপনার হাতেই লেখা, এ বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে ?

মিসির আলি বললেন, সন্দেহ নেই।

প্রতিমা মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলল, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে— আপনি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন ? এই মুহূর্তে আমি আপনাকে বিয়ের জন্যে চাপ দেব না। এক সঙ্গে এতটা টেনশান আপনার সহ্য হবে না। আপাতত আমার সঙ্গে থাকলেই হবে।

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

প্রতিমা বলল— কথা বলুন। মুখ পুরোপুরি সীল করে রাখলে হবে কিভাবে ? বইগুলি বের করে দিন, আমি ব্যাগে গুছাতে থাকি।

মিসির আলি বললেন, আমাকে কিছু দিন সময় দাও।

প্রতিমা শান্ত গলায় বলল, কতদিন সময় চান ?

'সাত দিন।'

'সাত দিন সময় চাচ্ছেন কি জন্যে ?'

'চিন্তা করার জন্যে।'

'কি চিন্তা করবেন ?'

'আমি আমার মতো করে চিন্তা করব।'

'ঠিক আছে সাত দিন চিন্তা করুন। সাত দিন পর আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

'তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না। তুমি তোমার ঠিকানা রেখে যাও। সাত দিন পর আমি নিজেই উপস্থিত হব।'

'প্রতিমা শান্ত গলায় বলল, না আমি আপনাকে নিয়ে যাব। ব্যাগ থাকল, আমি উঠলাম। ভুলে যাবেন না, আগামী সোমবার।

ইয়াসিন দরজা ধরে চোখ গোল করে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি মিসির আলির দিকে। মানুষটা ছটফট করছে। কেন ছটফট করছে সে বুঝতে পারছে না, তবে তার ধারণা একটু আগে যে মেয়েটা এসেছিল তার সঙ্গে এর কোন যোগ আছে। ব্যাপারটা ইয়াসিনের ভালো লাগছে না। সে তার ছোট জীবনে লক্ষ্য করেছে নিরিবিলি সংসারে কোনো একটা মেয়ে উপস্থিত হলেই সব লণ্ডভণ্ড হতে শুরু করে। তার নিজের বাবার সংসারেও একই ঘটনা ঘটেছে। সে এবং তার বাবা সুখেই ছিল। একসঙ্গে ভিক্ষা করত। রাতে ঘুমানোর জন্যে সুন্দর একটা জায়গাও তাদের ছিল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে সে ঘুমাত। বাবা গুটুর গুটুর করে কত মজার গল্প করত। তার বাবার ভিক্ষুক জীবন বড়ই রোমাঞ্চকর। হঠাৎ তাদের সংসারে এক কমবয়েসী ভিখিরিনী উপস্থিত হলো। সেও তাদের সঙ্গে ভিক্ষা করা শুরু করল। এরপর থেকে বাবা আর তার ছেলেকে দেখতে পারে না। কারণে অকারণে ধমক। একদিন তাকে এমন এক ধাক্কা দিল যে সে একটু হলেই ট্রাকের নিচে পড়ত।

এই সংসারেও একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। মেয়েটা ঢুকে পড়েছে। এখনই কেমন মাতবরী শুরু করেছে— "পানি গরম করে আমাকে ডাকবি। চা বানাবি না। চা আমি এসে বানাব।" শখ কত। তুমি চা বানাবে কেন? আমি কি বানাতে পারি না? এই মেয়েকে শিক্ষা দেবার ক্ষমতা ইয়াসিনের আছে। মেয়েকে শিক্ষা দেবার জিনিস তার ব্যাগেই আছে। শিক্ষা দেবার ভয়ংকর জিনিসটা সে আসলে জোগাড় করেছিল তার বাবার সঙ্গে যে মেয়েটা ঘুরে তাকে শিক্ষা দেবার জন্যে। সেই সুযোগ তার খুব ভালই আছে। তুব সে কাজটা করে নি। কারণ কাজটা করলে তার বাবা মনে কষ্ট পাবে। বাবা মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ ইয়াসিন কোনদিন করবে না। আসমান থেকে ফেরেশতা নেমেও যদি বলে— "ইয়াসিনরে কাজটা কর। তোর আখেরে মঙ্গল হবে।" তবু সে কাজটা করবে না। তার বাবার মনে কষ্ট হয় এমন কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব না।

মিসির আলি নামের মানুষটার মনে কষ্ট হয় এমন কিছুও সে করতে পারবে না। এই মানুষটাও পেয়ারা মানুষ। তবে প্রতিমা নামের মেয়েটার কিছু হলে মিসির আলির যাবে আসবে না। কারণ উনি মেয়েটাকে পছন্দ করেন না। উনি যে ছটফট করছেন— মেয়েটার কারণেই ছটফট করছেন। মেয়েটা উনাকে নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছে। উনি যেতে চাচ্ছেন না। মেয়েটার ক্ষতি হলে উনি খুশিই হবেন।

ইয়াসিনের ট্রাংকে একটা বোতল আছে। বোতলে ভয়ংকর জিনিস আছে। ভয়ংকর জিনিসটা দেখতে পানির মতো। গ্লাসে ঢাললে মনে হবে পানি ঢালা

www.BDeBooks.Com

হয়েছে। সেই পানি মুখে দিলে জ্বলে পুড়ে সব ছাড়খার হয়ে যাবে। জিনিসটার নাম এসিড। এর আরেকটা নাম আছে— ভোম্বল। ভোম্বল নামটা ফিসফিস করে বললেই— যার বোঝার সে বুঝে নিবে।

ইয়াসিন বলল, স্যার চা খাইবেন ?

মিসির আলি কিছু বললেন না। ইয়াসিন আবার বলল, স্যার চা খাইবেন ?

মিসির আলি সেই প্রশ্নেরও জবাব দিলেন না। ইয়াসিনের মনটা খারাপ হয়ে গেল— আহারে লোকটা কি কষ্টে পড়েছে। দুনিয়াদারিই তার মাথায় নাই। লোকটার মাথায় মেয়েটা ঘুরছে। লোকটাকে মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বাঁচানোর সরঞ্জাম তার হাতেই আছে— এক নম্বুরী ভোম্বল। এই ভোম্বল লোহা হজম করে ফেলে। এই ভোম্বল সহজ ভোম্বল না।

ইয়াসিন চা বানাতে গেল। মিসির আলি না চাইলেও সে সুন্দর করে চা বানিয়ে সামনে রাখবে। মনে মনে বলবে— "এত চিন্তার কিছু নাই। আমি আছি না। আমি একবার যারে ভালো পাই তারে জন্মের মতো ভালো পাই।"

মিসির আলি বেতের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর হাতে সিগারেট। সামনে চায়ের কাপ। চায়ের কাপের চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে— তিনি খালি কাপেই চুমুক দিচ্ছেন। হাতের সিগারেটের ছাইও সেইখানেই ফেলছেন। তাঁর মুখের কাঠিন্য কমে আসছে। দলিলের রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। তিনি এগুচ্ছেন সহজ লজিক দিয়ে। সহজ লজিক তাঁকে যেখানে পৌঁছে দিচ্ছে সেই জায়গাটা তাঁর পছন্দ না। তিনি এই জায়গাটায় পৌঁছতে চাচ্ছেন না।

মিসির আলি লজিকের সিঁড়িগুলো এই ভাবে দাঁড়া করিয়েছেন—

১. দলিলের লেখাগুলো তার হাতের। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

২. কোন নেশার বস্তু খাইয়ে ঘোরের মধ্যে এই লেখা আদায় করা হয় নি। কারণ লেখা স্পষ্ট, পরিষ্কার।

৩. মানুষকে হিপনোটাইজ করে কিছু লেখা লেখানো যায়— সেই লেখাও হবে নেশাগ্রস্ত মানুষের হাতের লেখার মতো। ছোট কোন বাক্যও সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব। নেশাগ্রস্ত এবং হিপনোটিক ইনফ্লুয়েন্সের লেখা হবে কাঁপা কাঁপা। এই সময় ভিশন ডিসর্টটেড হয় বলে কেউ সরল রেখা টানতে পারে না, এবং সরল রেখায় লিখতেও পারে না। কাজেই তিনি দলিলের লেখাগুলো ঠাণ্ডা মাথায় এবং অবশ্যই সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে লিখেছেন।

৪. প্রতিমা তাকে দলিল দেখাবার সময় খুব মজা পাচ্ছিল এবং হাসাহাসি করছিল। কাজেই দলিলের ব্যাপারটা মেয়েটার কাছে সিরিয়াস কোন ব্যাপার না— মজার কোন খেলা। এই খেলা সে প্রথম খেলছে না। আগেও খেলেছে।

তাহলে ব্যাপার এই দাঁড়াচ্ছে যে মেয়েটি মজা করার জন্যে মিসির আলিকে দিয়ে লেখাগুলো লিখিয়ে নিয়েছে। এবং মেয়েটি জানে এই লেখার বিষয় মিসির আলির মনে নেই। মনে থাকলেতো খেলাটার মজা থাকত না।

তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে মেয়েটা মিসির আলিকে দিয়ে কাগজে লেখার মতো জটিল কাজটি করিয়ে নিয়েছে এমন ভাবে যে মিসির আলি কিছু বুঝতেই পারেন নি। যার স্মৃতি পর্যন্ত মস্তিষ্কে নেই। অর্থাৎ মিসির আলির মস্তিষ্কের পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি কোন এক অস্বাভাবিক ক্ষমতায় মানুষের মাথার ভেতর সরাসরি ঢুকে যেতে পারছে। এই ক্ষমতা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। তবে এ ধরনের ক্ষমতার উল্লেখ বারবারই প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায়। আমেরিকার ডিউক ইউনিভার্সিটি এই বিষয়ের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছে যে, এই ক্ষমতার কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি শুধুমাত্রই লোকজ বিশ্বাস।

মিসির আলি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। বুক শেলফ থেকে সাইকোপাথিক মাইন্ড বইটি হাতে নিলেন— কিন্তু পাতা উল্টালেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি আগের মতো নেই— তার পরেও এই বইটির প্রতিটি পাতা তার প্রায় মুখস্ত।

পৃথিবীর ভয়ংকর সব খুনীদের মানসিক ছবি বা সাইকোলজিক্যাল প্রফাইল এই বইটিতে দেয়া আছে। প্রতিটি ভয়ংকর অপরাধীর ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে— অপরাধীর একটি অস্বাভাবিক ক্ষমতার কথা— অন্যকে বশীভূত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার উৎস কি ? অপরাধী কি অন্যের মাথার ভেতর ঢুকে পড়ছে ? তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে ?

এই ক্ষমতা শুধু যে ভয়ংকর অপরাধীদের আছে তা না— মহান সাধু সন্তদেরও আছে বলে বলা হয়ে থাকে। তারাও মানুষের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারতেন। একজনের নিয়ন্ত্রণ আলোর দিকে— অন্যজনের নিয়ন্ত্রণ অন্ধকারের দিকে।

'স্যার চা খাইবেন ?'

মিসির আলি চমকে তাকালেন। ইয়াসিন তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টিটা যেন কেমন। যেন অশুভ কিছু সেখানে আছে।

মিসির আলি বললেন, না চা খাব না। আমি রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটব।

'স্যার আপনের শইল কি খারাপ ?'

'না আমার শরীর ভালো।'

ফজলু খুব লজ্জিত বোধ করছে। ফতে নামের এমন একজন ভালো মানুষের ব্যাপারে সে এত খারাপ ধারণা করেছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। প্রথম থেকেই তার মনে হয়েছিল— লোকটা খারাপ। লোকটার ভেতর মতলব আছে। লোকটার নজর দিলজানের দিকে। লোকটা যখন তাকে সিগারেট দিত— তার কাছে মনে হত

www.BDeBooks.Com

সে কোন মতলবে সিগারেটটা দিচ্ছে। তার নিতে ইচ্ছা করত না, লোভে পরে নিত। লোভ খুব খারাপ জিনিস।

ফজলু দিলজানকে বলে দিয়েছে যেন কখনো ফতের কাছে না যায়। ফতে যদি তাকে ডাকে সে যেন ঘরে ঢুকে পড়ে। ফজলু নিশ্চিত ছিল— ফতে দিলজানকে ডাকবে। ফতে ডাকে নি। কোনদিনও ডাকে নি। তারপরেও ফজলুর সন্দেহ দূর হয়নি। আজ সন্দেহ পুরোপুরি দূর হয়েছে। ফতে তাকে নার্সারিতে কাজ জোগাড় করে দিয়েছে। প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কাজ করবে। গাছে পানি দিবে— গোবর আর মাটি মিশিয়ে মশলা তৈরি করবে। বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা পাবে।

কাজটা শেখা হয়ে গেলে সে নিজেই একটা নার্সারী দিবে। কোন একটা রাস্তার ফুটপাত দখল করে বসে পড়বে। সে টাকা জমাতে শুরু করেছে। বন্দকি বসতবাড়ি ছাড়িয়ে এনে স্ত্রী কন্যাকে গ্রামে পাঠিয়ে দেবে। মেয়ের বিয়ে দেবে।

ফজলু গাঢ় স্বরে বলল, আপনি আমার বড় একটা উপকার করলেন।

ফতে বলল, এটা কোন উপকার হল না-কি। এটা কোন উপকারই না। নাও একটা সিগারেট নাও।

ফজলু আনন্দে অভিভূত হয়ে সিগারেট নিল। এমন একটা ভালমানুষের বিষয়ে সে কি খারাপ ধারণাই না করেছিল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

ফতে বলল, চা খাবে না-কি? চল এক কাপ চা খাই।

ফজলু বলল, চলেন। চায়ের দাম কিন্তু আমি দিমু। এইটা আমার একটা আবদার।

ফতে চা খাচ্ছে। রাস্তার পাশের দোকানের টুলের উপর সে একা বসে আছে। ফতের এটা দ্বিতীয় কাপ। প্রথম কাপের দাম ফজলু দিয়ে চলে গেছে। দ্বিতীয় কাপে সে একা বসে চুমুক দিচ্ছে।

তার হাতে সময় বেশি নেই। বড় ঘটনা আজ রাতেই ঘটবে। এই ভেবে তার মনে আলাদা কোন উত্তেজনা নেই বরং শান্তি শান্তি লাগছে। ঘটনাগুলো সে সাজিয়ে রেখেছে। সাজানোর কোন ভুল নেই। তারপরেও প্রতিটি ঘটনায় একবার চোখ বুলিয়ে নেয়া দরকার। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করা।

ফতের মাথা ঠাণ্ডাই আছে। যে কোন বড় ঘটনা ঘটাবার আগে তার মাথা ঠাণ্ডা থাকে। বড় ঘটনা এর আগে সে চারবার ঘটিয়েছে তিনবার গ্রামে, একবার শহরে। কোনবারই তার মাথা এলোমেলো ছিল না। চারটা বড় ঘটনার বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। এবারো কেউ কিছু জানবে না। এবারেরটা আরো বেশি গোছানো।

আজ বুধবার তার মামী গিয়েছেন তার আদরের বুড়া ভাইয়ার কাছে। সেই ভাইয়া মনের সুখে পুটুরানী পুটুরানী করে আদর করেছে। আদর-টাদর খেয়ে মামী বাসায় ফিরবে। তার আগেই বাড়ির গেটের কাছে ফতে বসে থাকবে

লুনাকে নিয়ে। লুনা তার মা'কে দেখে আনন্দে হাততালি দিয়ে বলবে— পুটুরানী পুটুরানী। এটা লুনা বলবে কারণ ফতে তাকে শিখিয়ে দেবে। এই ঘটনার ফলাফল কি হবে ফতে জানে না। হয়ত মা মেয়েকে চড় থাপ্পড় দেবে। কিংবা হাত ধরে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবে। যাই করুক না কেন ফতের কিছু যায় আসে না। সে জানে মামী তাকে অকারণে কিছুক্ষণ ধমকাধমকি করবে। তারপর পাঠাবে কোন একটা কিছু দোকান থেকে কিনে আনতে। কাপড় ধোয়ার সাবান, সোয়াবিন তেল, কিংবা কাচামরিচ বা ধনেপাতা।

ফতে গায়ে চাদর জড়িয়ে বাজার আনতে যাবে। চাদরের নিচে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকবে লুনা। গেট দিয়ে যখন ফতে বের হবে তখন কেউ বুঝতেও পারবে না, ফতের চাদরের নিচে কি আছে।

ফতে কিছুক্ষণের জন্যে লুনাকে রাখবে ফজলুর কাছে। লুনা খুব স্বাভাবিক ভাবেই থাকবে— হৈ চৈ করবে না, কান্নাকাটি করবে না। নিজের মনে মুঠি বন্ধ করা এবং মুঠি খোলার খেলা খেলতে থাকবে। লুনাকে রেখে ফতে অতি দ্রুত বাজার শেষ করে বাড়ি ফিরবে। তখন ফতের মামী আতংকিত গলায় ফতেকে জিজ্ঞেস করবেন— লুনা কোথায়। ওকে পাচ্ছি না। ফতে বলবে, আপনার সঙ্গেই তো ছিল। মামী তখন কাঁদো কাঁদো গলায় বলবেন, দেখছি নাতো। ফতে তৎক্ষণাৎ লুনার খোঁজে রাস্তায় বের হবে। চলে যাবে ফজলুর কাছে। সেখানে থেকে লুনাকে নিয়ে যাবে— বুড়িগঙ্গায়। যে নৌকাটা সে থাকার জন্যে ভাড়া করেছে সেই নৌকায়। আসল ঘটনা নৌকায় ঘটানো হবে।

তারপর সে আবার বাড়ি ফিরে আসবে। ততক্ষণে পুলিশ চলে এসেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি হচ্ছে। ফতে আবারো লুনার খোঁজে বের হবে। এবার বের হবে বেবিটেক্সি নিয়ে। তার চাদরের নিচে বড় কালো পলিথিনের ব্যাগে সযত্নে রাখা মাথাটা বের করে সে যাত্রীদের সীটের এক কোনায় রেখে দেবে। আসল খেলা শুরু হবে তখন।

লুনা মেয়েটাকে নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। এই মেয়েটা বড় হয়ে বাবা মা'র জন্যে যন্ত্রণা ছাড়া কিছু নিয়ে আসবে না। সব যন্ত্রণার সমাধান। এক অর্থে ফতে তার মামা মামির উপকারই করছে।

পুরো ব্যাপারটা ভাবতে ফতের খুব মজা লাগছে। হাসি চাপতে পারছে না। চায়ের দোকানী অবাক হয়ে বলল, ভাইজান একলা একলা হাসেন ক্যান ?

ফতে হাসি না থামিয়েই বলল, আমার মাথা খারাপ এই জন্যে একা একা হাসি। দেখি আরেক কাপ চা দেন। চিনি বেশি করে দেবেন। সব পাগল চিনি বেশি খায়।

ফতে শরীর দুলিয়ে শব্দ করে হাসছে। তার কাছে মনে হচ্ছে কালো পলিথিনের ব্যাগে মোড়া জিনিসটা একবার এই দোকানদারকে দেখিয়ে দিলে হয়। এই সব চায়ের দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। রাত একটা

www.BDeBooks.Com

দেড়টার দিকে দোকান খোলা থাকার কথা। বেবিটেক্সি দোকানের সামনে রেখে সে চা খেতে আসতে পারে। তখন দোকানীকে বলতে পারে— ভাইসাব আমার বেবিটেক্সির সীটে একটা জিনিস আছে। দেখলে মজা পাবেন। দেখে আসেন।

৬

বদরুল সাহেবের বাড়ির সামনে জটলা। হৈ চৈ হচ্ছে। বদরুল সাহেবের স্ত্রীর তীক্ষ্ণ গলা শোনা যাচ্ছে। মিসির আলি ইয়াসিনকে বললেন, কি হয়েছে রে ?

ইয়াসিন বলল, জানি না। মনে হয় চোর ধরছে।

সন্ধ্যার দিকে ঐ বাড়িতে রোজই হৈ চৈ হয়। এত গুরুত্ব দেবার কিছু নেই। কিন্তু মহিলার তীক্ষ্ণ গলার স্বর কানে লাগছে।

মিসির আলি ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার জন্যে মাথা ধরার ট্যাবলেট নিয়ে এসো। খুব মাথা ধরেছে।

ইয়াসিন বলল, মাথা বানায়া দেই।

মিসির আলি বললেন, মাথা বানাতে হবে না। মাথা বানানোই আছে। তুমি মাথা ধরার ট্যাবলেট কিনে এনে— খুব কড়া করে এক কাপ চা বানিয়ে দাও।

ইয়াসিন চলে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফতে ঘরে ঢুকল। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আপনার ঘরে কি লুনা লুকিয়ে আছে ?

মিসির আলি অবাক হয়ে বললেন, নাতো।

ফতে বলল, মেয়েটারে পাওয়া যাচ্ছে না। চুপি চুপি এসে খাটের নিচে হয়ত লুকিয়ে আছে। স্যার একটু খুঁজে দেখি।

হ্যাঁ দেখ।

ফতে সবগুলো ঘর খুঁজল। বাথরুমে উঁকি দিল। খাটের নিচে দেখল। ফতের সঙ্গে সঙ্গে মিসির আলিও খুঁজলেন।

ফতে বলল, নাহ এদিকে আসে নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে তোমাকে একটা কথা বলি শোন। তুমি মেয়েটাকে খুঁজতে এসেছ— খাটের নিচে উঁকি দিয়েছ— কিন্তু তুমি কিন্তু মেয়েটাকে খুঁজছিলে না।

ফতে শান্ত গলায় বলল, স্যার এটা কেন বললেন ?

মিসির আলি বললেন, আমার খাটের নিচে দু'টা বই ভর্তি ট্রাংক আছে। সত্যি সত্যি মেয়েটাকে খুঁজলে তুমি অবশ্যই— ট্রাংকের ওপাশে কি আছে দেখার চেষ্টা করতে। তাছাড়া তুমি বাথরুমে উঁকি দিয়েছ ? বাথরুমের ভেতরটাও তুমি দেখনি। বাথরুমের দরজা খুলে তুমি তাকিয়েছিলে আমার দিকে।

ফতে বলল, স্যার আপনি ঠিক ধরেছেন। আমি আসলে খুঁজি নাই। কারণ আমি জানি লুনা এইদিকে আসে নাই। সে নিজে নিজে কোনদিকে যায় না। তার

মা'র মনের শান্তির জন্যে আমি এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেছি। ছাদে গিয়েছি দুইবার। ছাদের পানি টাংকির মুখ খুলে ভিতরে দেখেছি।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি একটু বসতো। এই চেয়ারটায় বস।

ফতে বসল।

মিসির আলি বললেন, বাচ্চা একটা মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের মা কান্নাকাটি করছে— আমি কিন্তু তোমার ভেতর কোন উত্তেজনা লক্ষ্য করছি না। তোমাকে খুবই স্বাভাবিক লাগছে।

ফতে বলল, সব মানুষতো এক রকম না স্যার। আমি যে রকম, আপনি সে রকম না। কিছু কিছু মানুষ উত্তেজিত হলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। স্যার কি করে বুঝলেন যে আমি খুব স্বাভাবিক আছি। আমার কপাল ঘামে নাই, আমার কথাবার্তা জড়ায়ে যায় নাই এই জন্যে।

'না তা না। তুমি খুব স্বাভাবিক আছ এটা বুঝেছি সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার থেকে। তুমি লেফট হ্যান্ডার। বাঁ হাতি মানুষ। বাঁ হাতি মানুষ উত্তেজিত অবস্থায়— ডান হাত ব্যবহার করতে শুরু করে। তুমি তা করছ না। তুমি বাঁ হাতই ব্যবহার করছ। অথচ তোমাদের বাড়িতে আজ ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে।'

ফতে মনে মনে বল সাবাস বেটা। তুই মানুষের মাথার ভিতর ঢুকতে পারিস না। তারপরেও তুই অনেক কিছু বুঝতে পারিস। তোর সাথে পাল্লা দিতে পারলে খারাপ হয় না। আমি তোকে চিনে ফেলেছি, তুই কিন্তু এখনো আমাকে চিনস নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে শোন তুমি এতই স্বাভাবিক আছ যে আমার সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটা কোথায় আছে তুমি জান। এবং আমার ধারণা মেয়েটাকে তুমিই সরিয়েছ।

ফতে আবারো মনে মনে বলল, সাব্বাস। সাব্বাস। আয় দুইজনে একটা খেলা খেলি। বাঘবন্দি খেলা। তুই একটা চাল দিবি। আমিও একটা চাল দিব।

মিসির আলি বললেন, ফতে কিছু একটা বল। চুপ করে আছ কেন? মেয়েটাকে তুমি সরাও নি?

ফতে বলল, গেটে দারোয়ান আছে। লুনাকে নিয়ে গেট থেকে বের হলে দারোয়ান দেখত না?

মিসির আলি বললেন, তোমার গায়ে ভারী চাদর। এই চাদর দিয়ে ঢেকে মেয়েটাকে সরিয়ে নিলে কারোর সন্দেহ করার কিছু নেই। চাদরের নিচ থেকে মেয়েটাও কোন শব্দ করবে না। কারণ সে তোমাকে খুব পছন্দ করে। তাকে চাদরের নিচে ঢুকিয়ে তুমি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছ এই দৃশ্য আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি।

ফতে মনে মনে বলল, তুই বাঘবন্দি খেলা খেলতে চাস, আয় খেলি। তুই তিনচারটা ভালো ভালো চাল দিয়ে ফেলেছিস। আমি কোন চাল দেই নাই। এখন দিব।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি বললেন, ফতে কথা বল। চুপ করে থেক না। বাচ্চা মেয়েটাকে তুমি সরিয়েছ ?

'জ্বি।'

'মেয়েটা কোথায় আছে ?'

'খুব ভালো জায়গায় আছে, স্যার কোন সমস্যা নাই। আপনি এত দুঃশ্চিন্তা করেন না স্যার। নেন একটা সিগারেট খান।'

'তুমি এই কাজটা কেন করলে ?'

ফতে হেসে ফেলে বলল, মামা করতে বলেছে। এই জন্যে করেছি।

'বদরুল সাহেব বলেছেন ?'

'জ্বি। মামার হুকুমে লুনাকে এক বাসায় রেখে এসে এমন ভাব করতেছি যেন আমি খুব পেরেশান হয়ে খুঁজতেছি।'

মিসির আলি বললেন, তোমার মামা এই কাজটা কেন করছেন ?

ফতে হাই তুলতে তুলতে বলল, মামিকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে কাজটা করেছেন। মামি এই বাচ্চাটাকে মাঝে মাঝে মারে। এটা মামার ভালো লাগে না। অসুস্থ একটা বাচ্চা একে তার মা মারবে কেন ? এই জন্যে মামা ঠিক করেছে লুনাকে তিন চার ঘণ্টা লুকিয়ে রাখবে— যাতে মামি বুঝতে পারে সন্তান কি জিনিস। ঘটনাটা কি এখন বুঝেছেন স্যার ?

'হ্যাঁ বুঝেছি। বাচ্চাটা আছে কোথায় ?'

'বুড়িগঙ্গা নদীতে— নৌকার ভিতরে। সে খুব মজায় আছে। স্যার একটা কাজ করবেন ?'

মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, বল কি কাজ ?

ফতে বলল, আপনি আমার সঙ্গে চলেন। নৌকা থেকে দু'জনে মেয়েটাকে নিয়ে আসি।

মিসির আলি বললেন, চল যাই।

ফতে বলল, দু'জন এক সঙ্গে বের হলে মামি সন্দেহ করবে। স্যার আপনি আগে চলে যান। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনেলের সামনে চায়ের দোকান আছে। ঐখানে বসে চা খান— আমি মামিকে বলি লুনাকে খোঁজার জন্যে বের হচ্ছি। এই বলে চলে আসব। আমার পৌছতে দশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না। স্যার যাবেন ?

মিসির আলি বললেন, হ্যাঁ।

একঘণ্টার বেশি হয়েছে মিসির আলি অপেক্ষা করছেন। ফতের কোন দেখা নেই। তিনি দুঃশ্চিন্তা করা শুরু করেছেন। ফতে লুনা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে মিসির আলির কাছে মনে হয়েছে এই ব্যাখ্যা ঠিক না। ফতে তাৎক্ষণিকভাবে একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়েছে। মানসিকভাবে অসুস্থ একটা মেয়েকে রাতের

বেলা বুড়িগঙ্গায় নৌকার উপর রাখার কোন যুক্তি নেই। মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখলে তার বাবা তাকে খুব কাছাকাছি কোথাও রাখবে। বুড়িগঙ্গায় নৌকার উপর পাঠাবে না। মিসির আলির মনে হল লুনা মেয়েটি বিপদে আছে। সহজ কোন বিপদ না। জটিল ধরনের বিপদ। বিপদ ঘটতে খুব দেরিও নেই। মিসির আলি ইয়াসিনের দিকে তাকালেন। ইয়াসিন কি মনে করে যেন তাঁর সঙ্গে এসেছে। ইয়াসিনকে কি লুনার বাবার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাবেন? তিনি অপেক্ষা করবেন ফতের জন্যে— ইয়াসিন চিঠি নিয়ে চলে যাবে বদরুল সাহেবের কাছে। চিঠিতে লেখা থাকবে— আপনার মেয়ের মহা বিপদ। পুলিশে খবর দিন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কী তাঁর মাথায় আসছে না। মাথায় এলে সেটাও চিঠিতে লিখে দিতেন।

স্যার অনেক দেরি করে ফেলেছি?

মিসির আলি চমকে দেখলেন ফতে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'জামে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম— এমন জাম শেষে বেবীটেক্সি রেখে হেঁটে চলে এসেছি। স্যার চলেন যাই—।'

মিসির আলি কিছু বললেন না, নিঃশব্দে ফতেকে অনুসরণ করলেন। ফতে বলল, সঙ্গে সিগারেট আছে স্যার? না থাকলে নিয়ে নেই। নদীর মাঝখানে সিগারেটে টান দিতে বড়ই মজা।

'সিগারেট সঙ্গে আছে?'

মিসির আলি ক্লান্ত গলায় বললেন, সিগারেট সঙ্গে আছে।

ইনজিন লাগানো নৌকা। বেশ বড় সড়। অনেকটা বজরার মতো দরজা জানালা আছে। নৌকায় কোন মাঝি নেই। ফতে নিজেই ইনজিন চালু করে নৌকা ছেড়ে দিয়ে বলল— স্যার আপনি ভিতরে যান। লুনা ভেতরে আছে। এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিল— এখন মনে হয় জেগেছে।

মিসির আলি বললেন, মেয়েটা একা ছিল না-কি?

ফতে বলল, একাই ছিল। তার কাছে একা যে কথা দোকা তিকাও সেই কথা। যান স্যার মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেন— এর মধ্যে আমি নৌকা ঐ পাড়ে নিয়ে যাই।

'নৌকা ঐ পাড়ে নেবার দরকার কি?'

'দরকার আছে স্যার। ফতে বিনা প্রয়োজনে কোন কাজ করে না। ঐ পাড়ে ভীড় নাই।'

মিসির আলি দরজা খুলে নৌকার ভেতরে ঢুকলেন। লুনা বসে আছে। তার সামনে লজেন্সের দু'টা প্যাকেট। সে প্যাকেট থেকে সব লজেন্সের খোসা ছড়িয়ে এক পাশে রাখছে। কাজটায় সে খুবই আনন্দ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। মিসির আলির দিকে তাকিয়ে লুনা হাসল। একটা লজেন্স মিসির আলির দিকে বাড়িয়ে দিল।

www.BDeBooks.Com

মিসির আলি বললেন, খুকি তুমি কেমন আছ ?

লুনা বলল, ভালো।

'কি কর ?'

'খেলি।'

'এই খেলার নাম কি ?'

'জানি না।'

লুনা আরেকটা লজেন্স ইয়াসিনের দিকে বাড়িয়ে দিল। ইয়াসিন লজেন্স নিল না। লুনা হাত বাড়িয়েই থাকল। মিসির আলি বুঝতে পারছেন লজেন্স হাত থেকে না নেয়া পর্যন্ত এই মেয়ে হাত নামাবে না। মেয়েটা খুবই অসুস্থ। তার মস্তিষ্কের কোন একটা অংশ জট পাকিয়ে গেছে। এই জট কে খুলতে পারে ? এমন কোন বুদ্ধি যদি থাকত মাথার ভেতর ঢুকে জট খোলা যেত। মিসির আলির হঠাৎ করে প্রতিমার কথা মনে পড়ল। প্রতিমা কি এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে পারে।

নৌকার ইনজিন বন্ধ হয়ে গেছে। ফতে দরজা খুলে নৌকায় ঢুকেই দরজা বন্ধ করে মিসির আলির দিকে তাকিয়ে হাসল। মিসির আলির বুক ধ্বক করে উঠল। এই হাসিতো মানুষের হাসি না। এই হাসি পিশাচের হাসি। ফতে মিসির আলির চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় বলল— স্যার আপনারতো খুবই বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটায়ে বলেনতো— লুনা মেয়েটাকে নিয়ে আমি মাঝ নদীতে কেন এসেছি। বলতে পারলে আমি আপনাকে একটা প্রাইজ দিব।

মিসির আলি এখন জানেন ফতে কেন লুনাকে মাঝ নদীতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন তার সেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তিনি ফতের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ইয়াসিনকে বললেন, "ইয়াসিন তুমি মেয়েটার হাত থেকে লজেন্সটা নাও। লজেন্স না নেয়া পর্যন্ত সে হাত উঁচু করে রাখবে।" ইয়াসিন লজেন্স নিল। লুনা মিষ্টি করে হেসে আবারো লজেন্সের খোসা ছড়ানোয় মন দিল।

ফতে সিগারেট ধরিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, স্যার যে কাজটা করতে যাচ্ছি এই কাজ এর আগে আমি আরো চারবার করেছি।

মিসির আলি বললেন, কেন করেছ ?

'করতে খুব মজা লাগে স্যার। আমার হাতের কাজ যে দেখে সে খুবই ভয় পায়। কেউ ভয় পেলে আমি খুব সহজে তার মাথার ভিতর ঢুকে পড়তে পারি। অনেক দূর যেতে পারি। তার মাথা লণ্ডভণ্ড করে ফেলতে পারি। তখন কি যে আনন্দ হয়।'

'ফতে তুমি যে খুব অসুস্থ একজন মানুষ তা-কি তুমি জান ?'

'জানি। তার জন্যে আমার খারাপ লাগে না। আল্লাই আমাকে অসুস্থ করে পাঠিয়েছেন। আমি কি করব।'

'এক অর্থে তোমার কথা ঠিক তোমার জিনে কোন গণ্ডগোল আছে। যে কারণে ভয়াবহ কাণ্ডগুলো হাসিমুখে করছ। তোমার সুস্থ হবার কোন সুযোগ আছে বলেও আমার মনে হয় না।'

'আপনার ভয় লাগছে না ?'

'না ভয় লাগছে না। যে ভয়ংকর ঘটনা তুমি ঘটাবে বলে ভাবছ সেই ঘটনা তুমি ঘটাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

ফতে সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, স্যার আমার ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। আমি যে কোন মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে পারি। এখন আপনার এই কাজের ছেলের মাথার ভেতর আমি ঢুকে বসে আছি। এর পকেটে একটা কাচের বোতল আছে। বোতল ভর্তি নাইট্রিক এসিড। আমি যখনি তাকে বলব— ইয়াসিন বোতলের জিনিসটা মিসির আলি সাহেবের গায়ে ঢেলে দে— সে গায়ে ঢেলে দেবে।

ফতে ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে ইয়াসিন ঢালবি না ? যে মেয়েটার গায়ে ঢালার জন্যে বোতল ভর্তি এসিড নিয়ে ঘুরছিস সে যখন নেই তখন স্যারের গায়ে ঢালবি। পারবি না ?

ইয়াসিন হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। ক্ষীণস্বরে বলল, পারব।

ফতে বলল, তাহলে বোতলটা পকেট থেকে বের করে মুখটা খুলে রাখ।

ইয়াসিন তাই করল। ফতে হাসতে হাসতে বলল, একটু ভয় ভয় লাগছে না স্যার ?

মিসির আলি বললেন না।

'একটুও লাগছে না ?'

'না।'

মিসির আলি নিজেও বিস্মিত হচ্ছেন। ভয়ংকর একজন মানুষ তাঁর সামনে বসে আছে অথচ তিনি বিচলিত হচ্ছেন না। প্রচণ্ড ভয়ের কোন কারণ ঘটলে রক্তে এড্রেলিন নামের এনজাইম প্রচুর পরিমাণ চলে আসে। ভয় কেটে যায়। সে রকম কিছু ঘটেছে। তিনি ইয়াসিনের দিকে তাকালেন। এসিডের বোতল হাতে সে শক্ত হয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি পুরোপুরি ফতের দিকে। ফতে তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে। মিসির লক্ষ্য করলেন ফতে যখনই তার দৃষ্টি মিসির আলির দিকে দিচ্ছে— ইয়াসিন তখনি নড়ে উঠছে। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ফতে যে দাবি করছে সে মানুষের মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে পারে— মাথার ভেতর ঢুকতে তার কি চোখ নামক পথের প্রয়োজন হয়। ইয়াসিন যদি চোখ বন্ধ করে ফেলে তাহলেও কি ফতে তার মাথার ভেতর ঢুকে বসে থাকতে পারবে।

মিসির আলিকে অতি দ্রুত যে কাজটা করতে হবে তা হল ইয়াসিনের হাত থেকে এসিডের বোতলটা নিয়ে নিতে হবে। মিসির আলি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে, ডাকলেন— ইয়াসিন।

www.BDeBooks.Com

ইয়াসিন তাঁর দিকে তাকাল না। ফতের দিকেই তাকিয়ে রইল। ফতের ঠোঁটের কোণায় ক্ষীণ হাসির রেখা। মিসির আলি দ্রুত চিন্তা করছেন। ফতেকে এক্ষুণি বিভ্রান্ত করতে হবে। চমকে দিতে হবে। মিসির আলি হালকা গলায় বললেন, ফতে শোন তুমি যে ক্ষমতার কথা বলছ এই ক্ষমতা যে আমার নেই তা কি করে বুঝলে?

ফতে চমকে তাকাল।

মিসির আলি বললেন, এসো আমার মাথার ভেতর ঢুকে দেখ।

ফতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তার মুখ হা হয়ে আছে। ঠোঁট বেয়ে লালার মতো কিছু গড়িয়ে পড়ল। ফতে মিসির আলির মাথার ভেতর ঢুকার চেষ্টা করছে। অনেকক্ষণ থেকেই করছে। পারছে না। তার নিজেরই সামান্য ভয় ভয় লাগছে। ভয় পাওয়া ঠিক হবে না। সে ভয় পেলে মাথায় ঢুকতে পারে না। খুব বেশি ভয় পেয়ে গেলে হয়ত উল্টো ব্যাপার ঘটবে। মিসির আলিই তার মাথায় ঢুকে পড়বেন। ফতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

মিসির আলি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে যে খেলা খেলতে চেয়েছ এই খেলাটা খেলতে পারবে না। আমি খেলায় কয়েকটা দান এগিয়ে আছি।

ফতে বলল, কি ভাবে?

'আমি এক ঘণ্টা লঞ্চঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলাম না। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি।'

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।'

ফতে আমিতো বোকা না। তুমি আমাকে বোকা ভাবলে কেন? তোমার মতো ক্ষমতা আছে এমন একজন রোগীর আমি চিকিৎসা করেছিলাম, সেও আমাকে ভাবত। এখনও ভাবে। এজাতীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের প্রধান দুর্বলতা হল এরা অন্য সবাইকে বোকা ভাবে। তুমি কি এখনো আমাকে বোকা ভাবছ?

ফতে শীতল গলায় বলল, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, আপনি পুলিশকে খবর দেন নাই।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি ইয়াসিনের হাতে যে বোতলটা ছিল— সে বোতলটা এখন আমার হাতে। পুলিশের বাঁশির আওয়াজ তুমি এক্ষুণি শুনবে।

মিসির আলির কথা শেষ হবার আগেই— পরপর দু'বার বাঁশি বেজে উঠল। নৌকা দুলে উঠল। ফতে ভয়ংকরভাবে কেঁপে উঠল।

মিসির আলি বললেন, এটা পুলিশের বাঁশির শব্দ না। লঞ্চ ছাড়ছে— ভেঁপু দিচ্ছে। ফতে তুমি ভয়ংকর ভয় পেয়েছ।

ফতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি পুলিশে খবর দেন নাই।

মিসির আলি বললেন, তুমি ঠিকই বলছ। আমি পুলিশে খবর দেই নি। পুলিশের কথা বলেছি তোমার ভিতর ভয়ের বীজ ঢুকিয়ে দেবার জন্যে। ভয়ের বীজ ঢুকে গেছে। সত্যি করে বল ফতে তোমার ভয় লাগছে না।

'না।'

মিথ্যা কথা বলার দরকার নেই ফতে। আমি যেমন সত্যি কথা বলছি। তুমিও সত্যি কথা বল। তীব্র ভয়ে অস্থির হলে মানুষের যে সব শারীরিক পরিবর্তন হয় তার সবই তোমার হচ্ছে। তোমার শরীর কাঁপছে। তোমার চোখের মনি বড় বড় হয়ে গেছে। পুলিশকে তো আমি খবর দেই নি। তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ?

'আপনাকে।'

আমার হাতে এসিডের বোতল এই জন্যে ভয় পাচ্ছ? শোন ফতে আমার পক্ষে কোন অবস্থাতেই কারো গায়ে এসিড ছুঁড়ে ফেলা সম্ভব না। এই দেখ বোতলটা আমি পানিতে ফেলে দিচ্ছি। তাতেও কিন্তু তোমার ভয় কমবে না।

ফতে ঢোক গিলল। মিসির আলি নামের মানুষটা সত্যি সত্যি বোতলটা ফেলে দিয়েছে। মানুষটার দুর্দান্ত সাহস। এত সাহস সে পেল কোথায়। ফতে যেখানে বসেছে তার নিচেই বড় একটা ধারালো ছুরি আছে। হাত নামিয়ে সে কি ছুরিটা নেবে।

'ফতে!'

'জ্বি।'

'তুমি ভয়ংকর অসুস্থ একজন মানুষ। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার। প্রতিমার সাহায্য নিয়ে আমি তোমার চিকিৎসা করার চেষ্টা করতে পারি। তুমি কি চাও আমি তোমার চিকিৎসা করি?'

'না।'

'তোমাকে তো ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না ফতে। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি ভয়ংকর সব অপরাধ করবে। আমি তা হতে দিকে পারি না।'

লুনা আরেকটা লজেন্সের খোসা ছড়িয়ে ফতের দিতে ধরে আছে। মিসির আলি বললেন, ফতে লজেন্সটা ওর হাত থেকে নাও। লজেন্স না নেয়া পর্যন্ত সে হাত উঁচু করেই রাখবে।

ফতে লজেন্স নিল।

মিসির আলি বললেন, চল নৌকার পাটাতনে গিয়ে দাঁড়াই। তুমি বলেছিলে মাঝ নদীতে সিগারেট টানতে খুব মজা— দেখি আসলেই মজা কি না। ফতে কোন রকম আপত্তি করল না, মিসির আলির সঙ্গে নৌকার পাটাতনে এসে দাঁড়াল।

মিসির আলি বললেন, ফতে তুমি কি পানিতে ঝাঁপ দেয়ার কথা চিন্তা করছ?

ফতে চমকে উঠে বলল, আপনি কি ভাবে বললেন?

মিসির আলি বললেন, অনুমান করে বলছি। আমার কারো মাথায় ঢোকার ক্ষমতা নেই। তবে আমি খুব ভালো অনুমান করতে পারি। সেই অনুমানটা

www.BDeBooks.Com

মাথায় ঢোকার মতোই। ফতে তুমি পানিতে ঝাঁপ দিও না। পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হবার কথা।

আর স্রোতও বেশি তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মিসির আলি সিগারেট ধরালেন। ফতে ঠিকই বলেছে মাঝ নদীতে সিগারেট ধরাবার আনন্দই আলাদা। আনন্দের সঙ্গে তিনি গাঢ় বিষাদও অনুভব করছেন। বিষাদের কারণটা তিনি ধরতে পারছেন না। নৌকার ভেতরে লুনা মেয়েটা খিলখিল করে হাসছে। আশ্চর্য প্রতিমাও ঠিক এ রকম করেই হাসে।

কালো যাদুকর

www.BDeBooks.Com

১

পৌষের শুরু।

জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সবাই বলাবলি করছে— গত বিশ বছরে এমন শীত পড়ে নি। এ বছর বুড়ো মরা শীত পড়েছে, এই শীতে দেশের বুড়োবুড়ি মরে যাবে।

প্রতি শীতেই এ-জাতীয় কথা লোকজন বলে। তবে এবারের কথাটা বোধ হয় সত্যি। নেত্রকোনা বিউটি বুক সেন্টারের মালিক মবিন উদ্দিনের তাই ধারণা।

মবিন উদ্দিনের গায়ে ফুল-হাতা সোয়েটার। লাল রঙের মাফলারে মাথা কান সব ঢাকা। তারপরেও "বাড়তি সাবধানতা" হিসেবে ট্রাঙ্ক থেকে পুরানো একটা শাল বের করে তিনি গায়ে দিয়েছেন। শাল থেকে ন্যাপথলিনের বিকট গন্ধ আসছে। গন্ধ আগে টের পাওয়া যায় নি, রাস্তায় নেমে টের পেলেন। তাঁর গা গুলাতে লাগলো। তাঁর গন্ধ বিষয়ক সমস্যা আছে। কড়া কোন গন্ধই সহ্য হয় না। শুরুতে গা গুলাতে থাকে, তারপর মাথা ধরে, বমি বমি ভাব হয়। একবার কী মনে করে কাঁঠাল চাঁপা ফুলের গন্ধ শুঁকছিলেন। গন্ধটা সাঁই করে মাথার ভিতর ঢুকে গেলে। তারপর কী যে অবস্থা। তিনি বমি করতে শুরু করলেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আটবার বমি করে চোখ-টোখ উল্টো বিছানায় পড়ে গেলেন। ডাক্তার আনতে হলো, স্যালাইন দিতে হলো। হুলুস্থুল ব্যাপার।

শাল থেকে এক কড়া ন্যাপথলিনের গন্ধ আসবে জানলে তিনি ভুলেও শাল গায়ে দিতেন না। বড় বড় ভুল মানুষ জেনেশুনে করে না, নিজের অজান্তে করে। গন্ধওয়ালা শাল গায়ে দেয়া তাঁর জন্যে বড় ধরনের ভুল। শুরুতে ভুলটা ধরা পরে নি, কারণ তাঁর নাক ঢাকা ছিল মাফলারে। নাকে গন্ধ যেতে পারছিল না। রাস্তায় নেমে বড় গাঙ্গের বাঁধের উপর নতুন রাস্তায় ওঠার পর নাক থেকে মাফলার সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সাঁই করে ন্যাপথিলিনের গন্ধ তাঁর নাকের ভেতর দিয়ে একেবারে মগজে ঢুকে গেলো। তিনি কী করবেন ভেবে বের করতে পারলেন না। অর্ধেকের বেশি পথ চলে এসেছেন। আবার বাসায় ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। শালটা খুলে রাস্তায় ফেলে দেয়া যায় না। তিনি দরিদ্র মানুষ। তাঁর অল্প কিছু দামী জিনিসপত্রের একটা হচ্ছে এই শাল। উনিশ বছর আগে বিয়েতে তাঁর এক মামাশ্বশুর দিয়েছিলেন। উনিশ বছরেও শালটার কিছু হয় নি। পৌষের এই প্রচণ্ড শীতে শাল গায়ে দেয়ার জন্যেই তাঁর মোটামুটি গরম লাগছে। শুধু গন্ধটা কষ্ট দিচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করা শুরু হয়েছে। গা এখনো

গুলতে শুরু করে নি। তবে শুরু করবে। কে জানে রাস্তার পাশে বসেই হয়তো বমি শুরু করতে হবে। এটা নিশ্চয়ই কোন রোগ। হাস্যকর কোন রোগ। তবে হাস্যকর হলেও এই রোগের চিকিৎসা হওয়া উচিত। রোগটা সারাজীবন তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

মবিন উদ্দিন দ্রুত হাঁটছেন। সূক্ষ্ম চেষ্টা চালাচ্ছেন গন্ধকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে। লাভ হচ্ছে না, গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে আসছে। নাক বন্ধ করে তিনি এখন মুখে শ্বাস নিচ্ছেন। কাজটা ভুল হচ্ছে, এতে বুকে দ্রুত ঠাণ্ডা লেগে যায়। তিনি যাচ্ছেন নেত্রকোনা রেল স্টেশনের উত্তরে বৈদ্যহাটা— তাঁর ছোট বোন রাহেলার বাসায়। রাহেলার বড় মেয়ে মিতুর বিয়ের কথা হচ্ছে। পাত্র পক্ষের কয়েকজন আসবে। চা-টা খাবে, পাকা কথা হবে। তাঁর উপস্থিত থাকা অত্যন্ত জরুরি। জরুরি না হলে তিনি বেরুতেন না। কয়েক দিন ধরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। রোজ সন্ধ্যার দিকে গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। মনে হয় ম্যালেরিয়া। লোকজন যে বলছে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া চলে গেছে এটা ঠিক না। কিছুই পুরোপুরি চলে যায় না, সবকিছু ফিরে ফিরে আসে। ম্যালেরিয়া আবার ফিরে এসেছে এবং তাঁকে শক্ত করে ধরেছে।

মবিন উদ্দিন বাঁধের রাস্তা ছেড়ে মাছ-পট্টি দিয়ে বাজারে ঢুকে গেলেন। বাজার থেকে রিকশা নেবেন। তাঁর হাঁটতে ভাল লাগছে না, ভাল লাগলে হাঁটতে হাঁটতেই যেতেন। কিছু একসারসাইজ হত। তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো। এই বয়সে হাঁটাহাঁটির মতো একসারসাইজ অত্যন্ত জরুরি। হাঁটাহাঁটি একেবারেই হচ্ছে না। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত বইয়ের দোকানে বসে বসে শরীর ধসে গেছে। তাও যদি বিক্রিবাট্টা হত একটা কথা ছিল, কোন বিক্রি নেই। বইয়ের দোকান না দিয়ে একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকান দিলে হত। রমরমা ব্যবসা। একেক জিনিসের সময় একেক সিজন আসে, এখন ভিডিও ক্যাসেটের সিজন।

রাত আটটার মতো বাজে। প্রচণ্ড শীতের কারণেই বোধ হয় বাজারের বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। নিধু সাহার কাপড়ের দোকানটা খোলা। ক্যাশ বাক্সের সামনে নিধু সাহা বিরস মুখে বসে আছে। বিক্রিবাটা মনে হয় ভাল না। মাছ-পট্টির সামনে চায়ের স্টলটা খোলা। সেখানে হিন্দি গান হচ্ছে— "মেরা বাচপান চলা গিয়া।" কয়েকজন কাস্টমার বসে বসে বিরক্ত মুখে চা খাচ্ছে। হিন্দি গান তাদের বিরক্তি দূর করতে পারছে না।

চায়ের স্টলে হিন্দি গান ছাড়া অন্য গান বাজানো হয় না কেন ভাবতে ভাবতে রিকশার খোঁজে মবিন উদ্দিন এদিক ওদিক তাকালেন। কোন রিকশা নেই। চারদিক পুরোপুরি ফাঁকা। এই শীতে কোন রিকশাওয়ালাই বোধ হয় রিকশা বের করেনি। সবাই কাঁথামুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

মবিন উদ্দিনের মনে হল মাছ-পট্টিতে ঢুকে তিনি অনেকটা বড় ভুল করেছেন। তীব্র ও বিকট মাছের গন্ধে তাঁর প্রায় দম আটকে আসছে। মাছ-

www.BDeBooks.Com

পট্টিতে মাছ নেই, কিন্তু মাছের গন্ধ রয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ গন্ধের একটা হল কাঁচা মাছের গন্ধ। এই গন্ধ নাকে নিয়ে লোকজন চা খাচ্ছে কী করে তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি মাথার মাফলার খুলে নাকে চেপে দ্রুত হাঁটছেন। মাছ-পট্টি ছাড়ালেই দরজি-পট্টি। আর একটু এগুলেই বড় রাস্তায় পড়বেন। বড় রাস্তায় রিকশা পাওয়া যাবে। রিকশা নিয়ে নেত্রকোনা বড় স্টেশনে চলে যাবেন, সেখান থেকে বিশ পঁচিশ গজ গেলেই রাহেলার বাসা।

দরজি-পট্টির মোড়ে এসে মবিন উদ্দিন থমকে দাঁড়ালেন। বেশ কিছু লোকজন একটা লাইট পোস্টের কাছে ভিড় করে আছে। বাজারের ভেতর কয়েকটা লাইটপোস্ট, কিন্তু কোনোটাতে আলো নেই। এই এটাতেই টিউব লাইট জ্বলছে। সেই আলোয় মজাদার কিছু বোধ হয় হচ্ছে। মজা ছাড়া এই শীতে এতগুলো মানুষ জড় হবে না। লোকজন বেশি থাকলে হৈ চৈ সাড়াশব্দ হয়। এখানে কোন শব্দ নেই। মনে হচ্ছে সবই নিঃশ্বাস বন্ধ করে কী যেন দেখছে। তিনিও উঁকি দিলেন।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখার মতো কিছু না। একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। বিস্ময়কর কোন ম্যাজিকও না। বেদেরা যেমন ফালতু ধরনের ম্যাজিক দেখায় সেরকম, হাতে একটা বল থাকে, একটা বল থেকে দুটা হয় তিনটা হয় আবার সব বল শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই লোকের ম্যাজিকও সেরকমই। শুধু তার হাতে বল নেই। আছে পুতুল। ছোট ছোট পুতুল। পুতুলগুলো দেখতে খুব সুন্দর। একেবারে ঝকঝক করছে। একটা পুতুল থেকে দুটা হচ্ছে, তিনটা হচ্ছে আবার একটা হয়ে যাচ্ছে। এই হল খেলা। খুবই ফালতু।

এতগুলো মানুষ হাড় কাঁপানো শীতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ম্যাজিক দেখছে কেন মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না। এমন না যে এরা কোনদিন ম্যাজিক দেখে নি। নেত্রকোনা বেশ বড় শহর। নানান ধরনের রং তামাশা এই শহরে দু'দিন পর পর হচ্ছে। এইতো কয়েকদিন আগে মৃত্যু কূপ বলে একটা ব্যাপার হয়ে গেল। এটা ছেলে কুয়া কেটে তার ভেতর চোখ বেঁধে মোটর সাইকেল চালিয়েছে। খুবই নাকি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তিনি দেখতে পারেন নি। পাঁচ টাকা করে টিকেট করেছিল। অকারণে পাঁচটা টাকা খরচ করতে মায়া লাগলো। পথের উপর ম্যাজিক দেখার একটা সুবিধা হল টিকিট কাটতে হয় না। এই লোকের পুতুলের খেলা তিনিও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন।

মবিন উদ্দিন ম্যাজিক দেখার জন্যে দাঁড়ালেন। আবার ঠিক যে ম্যাজিক দেখার জন্যে দাঁড়ালেন, তাও না। দ্রুত হেঁটে আসায় বুকে হাঁপ ধরে গিয়েছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন খানিকটা বিশ্রামের জন্যে। লোকটার ম্যাজিক শুরুতে যতটা খারাপ ভেবেছিলেন ততটা খারাপ না। বেদেরা একটা বল দুটা করার সময় হাতের মুঠি বন্ধ করে। এই লোক তা করছে না। তার খোলা হাতের তালুতে পুতুলটা বসানো। সেখানেই একটা পুতুল দুটা হচ্ছে, তিনটা হচ্ছে। যা ঘটছে চোখের সামনেই ঘটছে। কীভাবে ঘটছে কে জানে! তিনি কোথায় যেন

পড়েছিলেন, যে ম্যাজিক যত বিস্ময়কর সে ম্যাজিকের ভেতরের কৌশল তত সহজ। এই লোকের পুতুলের ম্যাজিকের কৌশলও হয়ত খুব সহজ। অন্য পুতুল দুটা নিশ্চয়ই হাতের তালুর পেছনেই লুকানো, দেখা যায় না এমন কোন সুতা দিয়ে বাঁধা। একটা পুতুল চোখের সামনে দুটা হয়ে যাচ্ছে, তিনটা হয়ে যাচ্ছে। লোকটা হাতের মুঠি পর্যন্ত বন্ধ করছে না। আশ্চর্য তো! মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। হিপনোটিজম ! চোখের ধান্ধা ?

ম্যাজিশিয়ান রোগা এবং লম্বা। গায়ের রং কালো , বেশ কালো। মাথার চুল নিগ্রোদের চুলের মতো কোঁকড়ানো। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে পৌষ মাসের এই প্রচণ্ড শীতে লোকটা বলতে গেলে বিনা কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে গোলাপি রঙের পাতলা একটা সুতির সার্ট। পরনে পায়জামা। খালি পা। এই পোশাকে কার্তিক মাসের শীত মানার কথা না, পৌষ মাঘের শীত কি মানবে ? বেচারা কষ্ট পাচ্ছে। তিনি নিজে ফুল হাতা সোয়েটারের উপর শাল চাপিয়েও শীত মানাতে পারছেন না। শালের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দরিদ্র হওয়ার কী কষ্ট। এই প্রচণ্ড শীতে বেচারাকে প্রায় খালি গায়ে ম্যাজিক দেখাতে হচ্ছে। ম্যাজিক শেষ হবার পর সে সবার কাছে হাত পাতবে। ভিক্ষা চাইবে। কষ্ট করে খেলা দেখানোর পরেও তাকে ভিক্ষুকদের মতো নতজানু হয়ে কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। মবিন উদ্দিন তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন। দুটা পাঁচ টাকার নোট খচখচ করে উঠল। না পাঁচ টাকা দেয়া যায় না। এক টাকা দু'টাকা হলে দেয়া যেত, পাঁচ টাকা অনেক টাকা। মবিন উদ্দিনের একটু মন খারাপ হল। বেশির ভাগ লোকই তাঁর মতো আচরণ করবে। খেলা শেষ হবার পর কিছু না দিয়েই চলে যাবে। তার জন্যে লজ্জিতও বোধ করবে না। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে দেখে সবই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অন্যের কষ্টে এখন আর কেউ লজ্জিত বোধ করে না। মবিন উদ্দিন লজ্জা ও অস্বস্তি নিয়ে ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকালেন।

আশ্চর্য ! ম্যাজিশিয়ানও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। চোখে পলক পর্যন্ত ফেলছে না। তার চোখ বড় বড় এবং হাসি হাসি। যেন সে মবিন উদ্দিনকে দেখে খুব মজা পাচ্ছে। মবিন উদ্দিন যে তাকে পাঁচটা টাকা দিতে গিয়েও দিচ্ছেন না তা বুঝে ফেলেছে। মবিন উদ্দিনের একটু অস্বস্তি বোধ হল। একদল লোকের সামনে কেউ যখন ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখায় তখন সে বিশেষ কারোর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে না। সবার দিকেই তাকায় কিংবা কারোর দিকেই তাকায় না। যখন বিশেষ কারোর দিকে তাকায় তখন ধরেই নিতে হয় ম্যাজিশিয়ানের কোন বদ মতলব আছে। এমন কোন ম্যাজিক তাকে নিয়ে সে করবে যা আপমানের চূড়ান্ত হবে। অন্যরা সেই অপমান দেখে খুব মজা পাবে। এই বিষয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। বছর দশেক আগে কী এটা কাজে গৌরীপুর গিয়েছিলেন। দিনে দিনে কাজ শেষ করে রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা ফেরার জন্য স্টেশনে এসে বসে আছেন। রাত বারোটায় ট্রেন, বাজছে মাত্র ন'টা। সময় আর কাটতেই চাচ্ছে না। সময় কাটানোর জন্যে তিনি

www.BDeBooks.Com

গৌরীপুর জংশনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করছেন। হঠাৎ দেখলেন এক জায়গায় ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে। চেংড়া মতো এক ম্যাজিশিয়ান তাসের খেলা, পিংপং বলের খেলা দেখাচ্ছে। খুব হাততালি পড়ছে। তিনিও কৌতূহলী হয়ে দাঁড়ালেন। সেই দাঁড়ানোই কাল হল। চেংড়া ম্যাজিশিয়ান তাঁর দিকে তাকিয়ে মধুর গলায় বলল, ভাইজান একটু সামনে বাড়েন। তিনি এগুলেন। ম্যাজিশিয়ান তাঁর হাত ধরে বলল, ভাইজানের নাম কি ?

তিনি তখন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন, তাকে নিয়ে রসিকতা শুরু হয়ে গেছে। তাঁর বিব্রত ভঙ্গি দেখে দর্শক হাসতে শুরু করেছে। কোন বুদ্ধিমান ম্যাজিশিয়ানই দর্শকদের হাসানোর এই সুযোগ নষ্ট করবে না। চেংড়া ম্যাজিশিয়ানও করল না। মধুর গলায় বলল, বলেন ভাইজান বলেন। নাম বলেন। বুলন্দ আওয়াজে বলেন।

তিনি নাম বললেন। ততক্ষণে তাঁর কপাল ঘামতে শুরু করেছে। পা কাঁপছে। একী বিপদে পড়া গেল!

'আচ্ছা ভাইজান, সত্যি কইরা বলেন দেহি আপনি মানুষ না মুরগি ?'

এই অপমানকর, হাস্যকর প্রশ্নের তিনি কী জবাব দেবেন ? ভয় এবং আতঙ্কে তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। ম্যাজিশিয়ান ফিসফিস করে বলল, মুরগি হইলে কোঁকর কোঁ কাইরা ডাক দেন। দেন ডাক দেন।

কোঁকর কোঁ করে ডাক দেবার বদলে তিনি কপালের ঘাম মুছলেন। ম্যাজিশিয়ান তার হাত ধরল, কানের কাছে মুখ নিয়ে গানের মতো করে বলল,

মুরগি বলে কোঁকর কোঁ
মোরগ বলে কী গো ? তোমার হইছে কী ?

দর্শক হেসে প্রায় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহ তুমি আমাকে একী অপমানের মধ্যে ফেললে!

'অপমানের তখন মাত্র শুরু।' এরপর যা আরম্ভ হল তা ভাবলে তিনি এখনো শিউরে ওঠেন। চেংড়া ম্যাজিশিয়ান তাঁর পাঞ্জাবির পেছনে হাত দিয়ে একটা ডিম বের করে নিয়ে এল। তারপর ডিম আনতেই শুরু করল। একসময় গম্ভীর গলায় বলল, ভাইজান দেহি বিলাতী মুরগি। ডিম পাড়তেই আছে পাড়তেই আছে।

পুতুল হাতে এই যাদুকর চেংড়া ম্যাজিশিয়ানের মতো না। সে তাঁর দিকে এখনও তাকিয়ে আছে। সেই তাকানোয় মমতা আছে। তার চোখের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে—সে কাউকে অপমান করবে না। কয়েকটা পুতুল নিয়ে মজার কিছু খেলা দেখাবে। সম্ভবত টাকা পয়সাও চাইবে না। কেউ দিলে দেবে, না দিলে না।

ম্যাজিশিয়ানদের নিয়মই হচ্ছে বকবক করা। অকারণে কথা বলে লোকজনদের বিভ্রান্ত করা। এই লোক তাও করছে না। মবিন উদ্দিন অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছেন এখন পর্যন্ত তিনি ম্যাজিশিয়ানের কোন কথা শোনেন নি। এই যাদুকরের গলার স্বর নিশ্চয়ই গৌরীপুরের চেংড়া ম্যাজিশিয়ানের মতো

কর্কশ না। তার গলার স্বর শুনতে পারলে ভাল লাগতো। যাদু দেখানো শেষ হলে সে এক সময় কথা বলবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আরে আরে একী! পুতুলগুলো দেখি বেলী ফুল হয়ে গেছে। ম্যাজিশিয়ানের হাত ভরতি বেলীফুল। আর কী গন্ধ ফুলের। তিনি এতদূর থেকেও গন্ধ পেলেন।

মবিন উদ্দিন বড় রাস্তার দিকে রওয়া হলেন। তাঁর মন খুঁত খুঁত করতে লাগলো, যাদুকরকে পাঁচটা টাকা দিয়ে এলেও পারতেন। এই প্রচণ্ড শীতে বেচারা শুধু পাতলা একটা সার্ট গায়ে দিয়েছিল। আহারে।

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার মবিন উদ্দিন লক্ষ্য করলেন না। তাঁর গন্ধ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তিনি ন্যাপথলিনের কড়া গন্ধ পাচ্ছেন না। তাঁকে নর্দমা টপকে যেতে হল। যেখানে একটা কুকুর মরে গলে পড়ে আছে। তার পচা শরীর থেকে বিকট গন্ধ আসছে। তিনি সেই বিকট গন্ধও পেলেন না। তাঁর নাকে বেলী ফুলের মিষ্টি সৌরভ লেগে রইল।

বিয়ের আলাপ শেষ হল রাত এগারোটায়। মবিন উদ্দিনের বিরক্তির সীমা রইল না। একই কথা ছ'বার সাত বার করে বলা হচ্ছে। সামান্য একটা তারিখ ঠিক করা নিয়ে এত কথা বলারই বা কী আছে?

বিয়ের তারিখ ঠিক হল মাঘ মাসের ৯ তারিখ, শুক্রবার। জুমার নামাজের পর এজিন কাবিন হবে। চল্লিশ হাজার টাকা কাবিন, অর্ধেক জেওরপাতিতে উসুল। ছেলেকে দিতে হবে একটা মোটর সাইকেল আর কিছু না। মোটর সাইকেলের তার নাকি খুব শখ। মোটর সাইকেলের বাইরে যাদি মেয়ের বাবা-মা শখ করে কিছু দিতে চায় দিবে। তবে পাত্র পক্ষের কোন দাবি নাই।

আলোচনার শেষে খাওয়া দাওয়া। কোরমা, পোলাও, গোসত, ফিরনি। প্রচুর আয়োজন। রাহেলার রান্না ভাল। মবিন উদ্দিন আরাম করে খেলেন। ঘরে ফেরার জন্যে যখন উঠলেন তখন রাত বাজে বারোটা।

রাহেলা বলল, ভাইজান রাতটা থেকে যান। শীতের মধ্যে কোথায় যাবেন?

মবিন সাহেব থেকে যেতে পারতেন। বাসায় বলেও এসেছেন বেশি দেরী হলে থেকে যাবেন। থেকে গেলে তাকে নিয়ে বাসায় কেউ দুঃচিন্তা করবে না। কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করছে না। কেন জানি অস্থির লাগছে।

এত রাতে রেল স্টেশন ছাড়া কোথাও রিকশা পাওয়া যাবে না। মবিন উদ্দিন রেল স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

বাইরে কনকনে হাওয়া বইছে। মবিন উদ্দিনের মনে হল গত কুড়ি বছরে না, চল্লিশ বছরেও নেত্রকোনায় এত শীত পড়ে নি। রাহেলার বাড়িতে রাতটা থেকে গেলেই হত। এত রাতে বের হওয়া বোকামি হয়েছে। এই বয়সে বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে সমস্যা হবে।

মবিন উদ্দিন কোন রিকশা পেলেন না। একজন বুড়ো রিকশাওয়ালা পাওয়া গেলো সে এত দূরের পথে যাবে না। তিনি যখন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন

www.BDeBooks.Com

রাতটা রাহেলার বাসাতেই কাটাবেন তখনই কোলো যাদুকরকে দেখলেন। টিকিট ঘরের সিঁড়িতে বসে আছে। হাসিমুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকেই। তাকে ঠিক আগের মতো লাগছে না। একটু যেন অন্য রকম লাগছে। আগে গায়ে গোলাপি রঙের সার্ট ছিল। এখন সার্টের রঙ মনে হল নীল। মাথার চুল ছিল কোঁকড়ানো। এখন সেরকম মনে হচ্ছে না। বয়সও অনেক কম মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী ? মবিন উদ্দিন কালো যাদুকরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইতস্তত করে বললেন,

সে হ্যাঁ সূচক মাথা নেড়ে হাসল।

'তোমার নাম কি ?'

সে আবারো হাসল।

আচ্ছা ছেলেটাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে গেলে কেমন হয় ? বাসায় নিয়ে চারটা গরম ভাত খাইয়ে দেয়া। তাকে বললে সে কি যাবে ? মনে হচ্ছে যাবে। মবিন উদ্দিন ইতস্তত করতে লাগলেন।

অচেনা একজন মানুষকে দুপুর রাতে হুট করে বাড়িতে নিয়ে আসা যায় না। তাছাড়া পথে ঘাটে যারা ম্যাজিক দেখায় তারা খুব সুবিধার মানুষ হয় না। ধান্ধাবাজ মানুষই ম্যাজিশিয়ান হয়। এরা দিনে ম্যাজিক দেখায় রাতে চুরি চামারি করে। ছেলেটাকে অবশ্যি ধান্ধাবাজ মনে হচ্ছে না। ধান্ধাবাজ মানুষ কথা বেশি বলে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হড়হড় করে কথা বলে। এই ছেলে কথা বলছেই না। বোবা-কালা নাতো ? নিশ্চিত হবার জন্যে মবিন উদ্দিন আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

সে জবাব দিল না। মাথা নিচু করে হাসল। মবিন উদ্দিন বললেন, কথা বলতে পার না ?

'পারি।'

'পার তাহলে কথা বলছ না কেন ?'

সে আবারো হাসল। ছেলেটার হাসি সুন্দর। ধান্ধাবাজ মানুষ সুন্দর করে হাসতে পারে না তাদের হাসির মধ্যেও একটা কিন্তু থাকে। আচ্ছা ছেলেটাকে বইয়ের দোকানে একটা চাকরি দিয়ে দিলে কেমন হয়। সেলসম্যান। পেটে ভাতে থাকবে। মাঝে মধ্যে কিছু হাত খরচ। না বইয়ের দোকানের চাকরি দেয়া যাবে না। বইয়ের দোকানে চাকরি করতে হলে পড়াশোনা জানতে হয়। পথে ঘাটে যারা ম্যাজিক দেখায় তারা পড়াশোনা জানে না। তারা ক অক্ষর শুকর মাংস টাইপ হয়।

'তুমি কি লেখাপড়া কিছু জান ? বই পড়তে পার ?'

ছেলেটা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মবিন উদ্দিনের মনটা ভাল হয়ে গেল। তিনি হাসি মুখে বললেন, তোমার ম্যাজিক দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি। ভাল ম্যাজিক। যাই হোক তুমি কী খাওয়া দাওয়া কিছু করেছ ?

ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়ল। মবিন উদ্দিনের মনে হল প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। একটা মানুষ এত রাত পর্যন্ত না খেয়ে বসে আছে এটা জানার পর তাকে

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যায় না। সারা পৃথিবীতে বহু লোক রাতে না খেয়ে ঘুমুতে যায়। তাতে আমাদের খারাপ লাগে না, কারণ আমরা কাউকে জিজ্ঞেস করি না সে খেয়েছে কি না।

'তোমার শীত লাগছে না?'

সে না সূচক মাথা নাড়ল। এই প্রচণ্ড শীতে হাফসার্ট গায়ে দিয়ে সে বসে আছে আর বলছে, 'শীত লাগছে না।' এটা একটা কথা হল। শীত অবশ্যই লাগছে। স্বীকার করছে না। গায়ের শালটা কি তাকে দিয়ে দেবেন? এটা কি ঠিক হবে? না ঠিক হবে না। সুরমা জানতে পারলে হৈ চৈ করে বাড়ি মাথায় তুলবে। বরং তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যায়। বাড়িতে নিয়ে পুরানো চাদর টাদর কিছু দিয়ে দিলেই হবে। চারটা ভাত খাইয়ে, একটা চাদর দিয়ে বিদায়। সেলসম্যানের চাকরি দিয়ে বাড়িতে রেখে দেয়া ঠিক হবে না। এমনিতেই সংসার চলে না। আরেকটা বাড়তি মুখ।

মবিন উদ্দিন গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন, তুমি চল আমার সঙ্গে।

ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। দেরি করল না। যে সে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই বসেছিল।

'তোমার নাম কী তাতো এখনো জানা হল না।'

'টুনু।'

'কি বললে নাম?'

'টুনু।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

মবিন উদ্দিন বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। টুনু তাঁর বড় ছেলেন নাম, পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। পাঁচ বছর দীর্ঘ সময়— প্রায় অর্ধযুগ, তবু মনে হয় এইতো সেদিন। সবকিছু ছবির মতো ভাসছে।

টুনু নেত্রকোনা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়তো। হঠাৎ খবর এল তার প্রচণ্ড পেটে ব্যথা। কলেজ থেকে তাকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তখন সন্ধ্যা। তার নিজের শরীর ভাল লাগছে না বলে আগে ভাগে দোকান বন্ধ করে ঘরে ফেরার কথা ভাবছেন। তখনি খবরটা এল। তিনি হাসপাতালে ছুটে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হল না। তাঁকে বলা হল কিছুক্ষণ আগে এপেনডিক্স অপারেশন হয়েছে। সে আছে পোস্ট অপারেটিভ রুমে। জ্ঞান ফেরেনি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে। পোস্ট অপারেটিভ রুমে কারোর প্রবেশ নিষেধ। তিনি হাসপাতালের বারান্দায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন ডাক্তার এসে সান্ত্বনা দিলেন—আপনি এত নার্ভাস হয়ে গেছেন কেন। এপেনডিক্স অপারেশন কোন ব্যাপারই না। ফোঁড়া কাটার মতো। পার্থক্য একটাই—এই ক্ষেত্রে ফোঁড়াটা শরীরের ভেতরে। যান এক কাপ চা খেয়ে এসে খোঁজ নিন। ততক্ষণে ছেলের জ্ঞান ফিরে আসবে। তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তিনি চা খেতে গেলেন।

www.BDeBooks.Com

ফিরে এসে শুনলেন ছেলে মারা গেছে। মৃত্যুর আগে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে ফিসফিস করে বলেছিল, বাবা আসেনি ? বাবা ?

চা খেতে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হতো। সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য ছেলের সঙ্গে তার শেষ দেখা হল না।

এরপর থেকে তিনি চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আজ প্রায় ছয় বছর হল তিনি চা খান না।

যাদুকরের নামও টুনু। এটা কি বিস্মত হবার মতো কোন ঘটনা ?

না বিস্মিত হবার মাতো কোন ঘটনা না। টুনু খুব কমন নাম—অনেকেরই থাকে। টুনটুনি থেকে টুনু। এই যাদুকরের বাবা-মা ছেলের নাম টুনু রেখেছেন। তাহলে তিনি এত অস্বস্তি বোধ করেছেন কেন ? সমস্যাটা কী ?

মবিন উদ্দিন রিকশায় উঠে সমস্যা ধরতে পারলেন। তিনি বুকের ভেতর এক ধরনের কাঁপন অনুভব করলেন। যাদুকরের সঙ্গে কোথায় যেন টুনুর একটা মিল আছে। মিলটা কোথায় ? টুনুর গায়ের রং ছিল ধবধবে সাদা। রূপকথার বই-এ দুধে আলতা রং বলে একটা কথা পাওয়া যায় অবিকল সেই ব্যাপার। নজর লাগবে বলে তার মা অনেক বয়স পর্যন্ত তার কপালে এত বড় একটা কাজলের টিপ দিয়ে রাখতো। যাদুকরের গায়ের রং কুচকুচে কালো। টুনু সারাক্ষণ বকবক করতো তার কথার যন্ত্রণায় তিনি নিজে কতবার বলেছেন—একজন জুতা সেলাইওয়ালা ডেকে টুনুর মুখটা সেলাই করে দেয়া দরকার। আর এদিকে যাদুকর ছেলেটা কথাই বলে না। যে কোন প্রশ্ন দু'তিন বার করে করতে হয়। চেহারায় কি কোন মিল আছে ? না চেহারাতেও মিল নেই। টুনুর মুখ ছিল লম্বাটে। এই ছেলেটির মুখ গোলাকার। টুনুর চুল ছিল কোঁকড়ানো। এর চুল কোঁকড়ানো না। তাহলে ছেলের সঙ্গে মিলের ব্যাপারটা মাথায় আসছে কেন ? কেন মনে হচ্ছে এই ছেলের সঙ্গে টুনুর মিল আছে ? মবিন উদ্দিন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন।

'তোমার দেশ কোথায় ?'

সে হাসল। প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছা না হলে মানুষ যে ভঙ্গিতে হাসে সেই রকম হাসি।

'তোমার দেশ কোথায় বলতে চাচ্ছ না ?'

সে না সূচক মাথা নড়ল।

'বলতে কী তোমার কোন অসুবিধা আছে ? অসুবিধা থাকলে বলার দরকার নেই।'

মবিন উদ্দিন চিন্তিত মুখে সিগারেট ধরালেন। নতুন এক দুঃশ্চিন্তায় তিনি এখন আক্রান্ত হয়েছেন। অচেনা অজানা একটা ছেলেকে দুপুর রাতে বাসায় নিয়ে তুলছেন। সুরমা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে কে জানে। খুব ভালভাবে নেবার কথা না। সুরমা অল্পতেই রেগে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্নেহ মমতা কমতে থাকে, রাগ বাড়তে থাকে। সুরমার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে অন্যের তুলনায় বেশি ঘটেছে।

ফাঁকা রাস্তায় রিকশা খুব দ্রুত চলছে। বাতাসের কারণে শীতটা দশগুণ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস নাক মুখ আর কানের ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। তিনি থরথর করে কাঁপছেন, অথচ ছেলেটা চুপচাপই বসে আছে। গায়ের গরম শালের একটা অংশ কী ছেলেটাকে দিয়ে দেবেন ? মন ঠিক করতে করতে রিকশা বাসার সামনে এসে থামল।

ছেলেটাকে নিয়ে সরাসরি বাসায় ঢোকার সাহস তাঁর হল না। সুরমা কী জাতীয় হৈ চৈ শুরু করবে কে জানে। রেগে গেলে তার কথাবার্তারও কিছু ঠিক থাকে না।

ছেলেটাকে তিনি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। শুকনো গলায় বললেন, একটু দাঁড়াও আমি ডেকে নিয়ে যাব। তিনি ভয়ে ভয়ে দরজার কড়া নাড়লেন, দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করলেন, সুরমাকে ব্যাপারটা কীভাবে বলবেন। আসলে বড় ভুল হয়ে গেছে রিকশাতেই ভেবে টেবে ঠিক করে রাখা দরকার ছিল। রিকশায় সারক্ষণ তিনি তাঁর ছেলের কথা ভেবেছেন।

তৃতীয়বার কড়া নাড়তেই তাঁর মেয়ে সুপ্তি দরজা খুলে দিল। সুপ্তির দিকে তাকিয়ে মবিন উদ্দিনের মন খারাপ হয়ে গেল। আহারে কী সুন্দর তাঁর এই মেয়েটা। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর চোখ আল্লাহ্ তার এই মেয়েকে দিয়েছেন। কী ঘন কোলো চোখ। দীর্ঘ পল্লব। অথচ সুপ্তির এই চোখ কোন কাজে আসে না। সুপ্তি চোখে দেখে না।

মবিন উদ্দিন বললেন জেগে আছিস নাকি মা ?

সুপ্তি বললো, না ঘুমাচ্ছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দরজা খুললাম।

সুপ্তির বয়স বারো। সে চাদরে শরীর ঢেকে মাথাটা এমন ভাবে বের করেছে যে তাকে অনেক বড় বড় লাগছে। মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না, মেয়েটা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে কেন, অবশ্যি জেগে থাকায় ভালই হয়েছে—শুরুতেই তাঁকে স্ত্রীর মুখোমুখি হতে হয়নি। নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পাওয়া গেছে। তাছাড়া সুপ্তি তার বাবাকে অনেকবার মা'র রাগ থেকে উদ্ধার করেছে। হয়তো এবারো করবে। মবিন উদ্দিন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মা জেগে আছে ?

'হুঁ। এত রাত হয়েছে আমরা ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।'

'তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে আছিস কেন ?'

সুপ্তি জবাব দেবার আগেই সুরমা চলে এলেন, কঠিন গলায় বললেন, রাত দুপুরে আসার দরকার ছিল কী ? থেকে গেলেই পারতে। খেয়ে এসেছ তো ?

'হুঁ।'

'দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? এটা আবার কী রকম ঢং, ভেতরে আস।'

মবিন উদ্দিন ইতস্তত করে বললেন, আমার সঙ্গে একটা ছেলে আছে। ও চারটা ভাত খাবে।

সুরমা গলার স্বর তীক্ষ্ণ করে বললেন, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ছেলে আছে মানে কী ? তুমি ছেলে পেয়েছ কোথায় ?'

www.BDeBooks.Com

'রাস্তায় ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। সারাদিন কিছু খায় নি। ভাবলাম চারটা ভাত খাইয়ে দেই।'

'ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখানো লোকজন তুমি রাত একটার সময় বাসায় নিয়ে আসছ এর মানে কী ? হঠাৎ এত দরদ উথলে উঠল কেন ?

'একটা ছেলে না খেয়ে আছে।'

'কত জনেই তো না খেয়ে আছে। তাদের কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতে হবে ?'

মবিন উদ্দিন অসহায় দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। সুপ্তি বাবার সাহায্যে এগিয়ে এল। সে মা'র দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, বাবার ভাততো বাড়াই আছে দিয়ে দাও খেয়ে চলে যাক। আচ্ছা থাক তোমাকে দিতে হবে না আমি এনে দিচ্ছি। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি পারবো। মা তুমি গিয়ে শুয়ে পড়।

সুরমা মুখ গম্ভীর করে চলে গেলেন। সুপ্তি বলল, তোমার ম্যাজিশিয়ান কোথায় বাবা ?

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কেন ?'

'তোর মা'র ভয়ে আমিই দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তোর মা হ্যাঁ বললে বাসায় নিয়ে আসব। এই ছিল পরিকল্পনা।'

'ডেকে নিয়ে এসো।'

মবিন উদ্দিন টুনুকে ডাকতে গেলেন। দরজা ধরে সুপ্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার বাবা রাত একটার সময় ম্যাজিশিয়ান ধরে নিয়ে এসেছেন এই ব্যাপারটা তার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। খাওয়ার পর ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক কী দু'একটা ম্যাজিক দেখাবেন ? দেখাবেন হয়ত। গায়কদের গান গাইতে বললে তারা নানান অজুহাত তোলে, গলা ঠিক নেই, ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে, মুড নেই। ম্যাজিশিয়ানদের ম্যাজিক দেখাতে বললে তারা সঙ্গে সঙ্গে দেখায়। না বললেও দেখায়। ইনিও নিশ্চয়ই দেখাবেন, দেখালেও সে দেখতে পারবে না। তাতে অসুবিধা নেই। কী ম্যাজিক হচ্ছে তা বলে দিলেই সে কল্পনা করতে পারবে। সুপ্তির ধারণা তার কল্পনার ম্যাজিক—আসল ম্যাজিকের চেয়ে ভালো।

ছেলেটি খেতে বসেছে। বসার ঘরের টেবিলে তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। ভাত তরকারী সবই ঠাণ্ডা। রাস্তার এটা ফালতু মানুষ খাবে তার জন্যে ভাত তরকারী গরম করার প্রশ্ন ওঠে না। ছেলেটা ঠাণ্ডা খাবারই খাচ্ছে। বেশ আরাম করে খাচ্ছে। তার খাওয়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্ত। প্লেট থেকে একবার শুধু মুখ তুলে সুপ্তিকে দেখলো তার চোখে সামান্য হলেও বিস্ময় ঝিলিক দিল। মবিন উদ্দিন বললেন, এ হল সুপ্তি, আমার মেয়ে। আমার একটাই মেয়ে। আর সুপ্তি এই ম্যাজিশিয়ানের নাম—টুনু।

ম্যাজিশিয়ান বললো, তুমি ভাল আছ ? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে খেতে শুরু করলো।

সুপ্তির সারা শরীর কেঁপে উঠল। এই ম্যাজিশিয়ানের গলার স্বর অবিকল তার ভাইয়ার মত। মনে হচ্ছে অনেকদিন পর টুনু ভাইয়া ফিরে এসেছে। তাকে জিজ্ঞেস করছে—তুমি ভাল আছ ?

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের সামনের একটা চেয়ারে বসে আছেন। তিনি সিগারেট ধরিয়েছেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। কারণ ছেলেটিকে এখন আর কালো লাগছে না। মনে হচ্ছে তার গায়ের রং ফর্সা। শুধু ফর্সাই না বেশ ফর্সা। তিনি কী এতক্ষণ ভুল দেখেছিলেন ? ম্যাজিশিয়ান ছেলে কোন রকম ম্যাজিক-ট্যাজিক করছে না তো ? ম্যাজিশিয়ানরা অনেক সময় চোখে ধান্ধা লাগিয়ে ফেলে সে রকম কিছু।

বাড়ির ভেতর থেকে সুরমা বিরক্ত গলায় ডাকলেন, সুপ্তি। এই সুপ্তি।

সুপ্তির ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না। সে অপেক্ষা করছে ম্যাজিশিয়ান যদি আর কোন কথা বলে। কতো কথাইতো বলার আছে— "রান্না ভালো হয়েছে। কিংবা আজ খুব শীত পড়েছে।" অথচ সে আর কিছুই বলছে না। নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। সুরমা আবারো ডাকলেন— এই সুপ্তি! ডাকছি কানে যাচ্ছে না ? সে নিতান্ত অনিচ্ছায় ভেতরে গেল। সুরমা বললেন, তুই ওখানে বসে আছিস কেন ?

সুপ্তি ফিসফিস করে বলল, ম্যাজিশিয়ানের কথা শুনছি মা।

'কথা শোনার কী আছে ?'

সুপ্তি বলল, মা তুমি ওনার গলার স্বরটা একটু শুনে যাও। তুমি খুব চমকে যাবে। তোমার বুকে একটা ধাক্কার মতো লাগবে।

'আজগুবি কথা বলিস কেন ? রাস্তার একটা ফালতু লোকের গলার স্বর শোনার কী আছে ?'

'শোনার একটা জিনিস আছে মা । না শুনলে বুঝবে না। জানালার পাশে এসে একটু দাঁড়াও।'

সুরমা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুখ তুলে তাকাল। সুরমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল— টুনু বসে আছে। অবিকল টুনু। এতে কোনরকম সন্দেহ নেই। সুরমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করতো এই ছেলের নাম কী ?

সুপ্তি ফিসফিস করে বলল, মা উনার নাম টুনু। বাবা তাই বলল।

সুরমা তাকিয়ে আছেন। তিনি তার চোখের দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না।

২

বারান্দার তোলা উনুনে ভাপা পিঠা বানাতে বসেছেন। এটি একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই কারণে যে এ বাড়িতে গত ছয় বছরে ভাপা পিঠা হয় নি। এই পিঠা টুনুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শীতকাল এলেই টুনু রোজ ঘ্যান ঘ্যান করবে মা পিঠা কর— ভাপা পিঠা। খুব যখন ছোট ছিল কখন সে পিঠা হাতে নিয়ে বারান্দায় রোদে বসে থাকতো। গরম পিঠা— গা থেকে ভাপ উঠছে। টুনু এটু পরপর সেই

www.BDeBooks.Com

পিঠা নাকের কাছে নিয় খেজুর গুড়ের গন্ধ নিচ্ছে এটা ছিল শীতকালের সাধারণ দৃশ্যের একটা।

সুপ্তি চুলার পাশে এসে বসল। আগুনের উপর হাত মেলতে মেলতে বলল, ভাপা পিঠা বানাচ্ছ তাই না-মা ? নারিকেল দাওনি কেন ?

সুরমার বুকে মোচড় দিয়ে উঠল। কী আশ্চর্য এই মেয়ে চোখে কিছু দেখছে না অথচ এমনভাবে কথা বলছে যেন সব দেখছে। পিঠায় নারিকেল দেয়া হয় নি এটাও ধরতে পারছে।

'হঠাৎ করে ভাপা পিঠা কেন মা ?'

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, তাতে অসুবিধা কী হয়েছে। ঘরে চালের গুড়া ছিল, খেজুর গুড় ছিল।

সুপ্তি ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বলল, তুমি ভাপা পিঠা কর না তো, আজ হঠাৎ করলে।

'বাড়িতে একজন মেহমান এসেছে। পিঠা চিড়া করব না ?'

'মেহমান কে ? কার কথা বলছ ?'

'বাবলু।'

সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলল, বাবলু ? বাবলু কে ?

সুরমা একটু যেন লজ্জা পেলেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার তিনি নতুন নাম দিয়েছেন— বাবলু। তাকে টুনু নামে ডাকতে ইচ্ছা করছে না। এমনিতেই টুনুর সঙ্গে ছেলেটার খুব মিল। তার উপর যদি নামও হয় টুনু তাহলে অনেক সমস্যা।

আজ ফযরের সময় নামাজের অজু করতে উঠে দেখেন—টুনু সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে জবুথুবু হয়ে বসে আছে। সুরমা বললেন, "তুই এত সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস কেন ?" বলেই মনে হল— কী সর্বনাশ ! কাকে কী বলছেন ? এতো টুনু না। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা। ছিঃ ছিঃ কী হল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, বাবা তুমি কিছু মনে করো না। আমি আসলে—

ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা বলল, আমি কিছু মনে করি নি। আমার সঙ্গে আপনার বড় ছেলের চেহারার মিল আছে এটা আমি বুঝতে পারছি। এই জন্যেই আপনি ভুলটা করেছেন।

'তোমার নাম কি আসলেই টুনু ?'

'জ্বি।'

'এই নামটা বদলে তোমাকে যদি অন্য কোন নামে ডাকি তুমি কি রাগ করবে ?

'জ্বি না। আপনার যে নামে ডাকতে ইচ্ছা করে আপনি ডাকবেন।'

'বাবলু ডাকি ?

' জ্বি অবশ্যই। বাবলু নামটাও সুন্দর।'

ফযরের ওয়াক্ত পার হয়ে যাচ্ছে— সুরমা কলঘরে অজু করতে গেলেন। বাবলু পিছনে পিছনে আসছে। কল টিপে দিতেই আসছে নিশ্চয়ই। টুনুও তাই

করত—কোন ব্যাপারেই মা'র কোন সাহায্যে সে এগিয়ে আসবে না— শুধু কলঘরে মা'কে যেতে দেখলে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসবে। চাপকলে পানি তুলতে তার কোন আপত্তি নেই।

বাবলু চাপকলে পানি তুলছে— তিনি অজু করছেন। অজুর সময় আল্লাহ ছাড়া করো কথাই মনে করতে নেই— তার একী হল শুধু টুনুর কথা মনে আসছে এবং চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। মুখে অজুর পানি দেয়া বলে চোখের পানি আলাদা করা যাচ্ছে না।

মজার ব্যাপার হল, বাবলু নামটাও আসলে টুনুরই নাম। সবাই টুনুকে টুনু ডাকলেও তিনি ডাকতেন বাবলু। বাবু থেকে বাবলু। শেষ পর্যন্ত টুনু নামটাই টিকে গেল। তাঁর দেয়া নাম টিকল না।

সুপ্তি বলল, কথা বলছ না কেন মা ? বাবলু কে ?

'ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার নাম দিয়েছি বাবলু। টুনু নামে তাকে ডাকতে ইচ্ছে করে না।'

'খুব বেশিতো আর তাকে ডাকাডাকি করতে হবে না। আামর ধারণা নাশতা খেয়ে উনি চলে যাবেন।'

'চলে গেলে চলে যাবে— যা-তো বাবলুকে নাশতা দিয়ে আয়। নিয়ে যেতে পারবি তো ?'

'কী বল তুমি পারব না কেন ?'

সুপ্তি নাশতার প্লেট এবং পানির গ্লাস নিয়ে যাচ্ছে। কী স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই না যাচ্ছে। বারান্দায় মাঝামাঝি জলচৌকি রাখা ছিল— তার কাছাকাছি গিয়ে সে জলচৌকিটা এড়িয়ে দরজার দিকে যাচ্ছে। দিক ভুল হচ্ছে না। তিনি নিজে কতবার দরজায় হোঁচট খেয়েছেন— এই মেয়ে কখনো খায় নি। তবে এই মফস্বল শহরে অন্ধদের জন্যে আলাদা স্কুল নেই— মেয়েকে তিনি সাধারণ স্কুলেই ভর্তি করেছেন। সে পড়াশোনা করছে। ভালই করছে। তার হাতের লেখা ভাল না— এলোমেলো কিন্তু তা পড়া যায়। স্কুলের আপারা কষ্ট করে হলেও সেই লেখা পড়েন। সে পাস করে নতুন ক্লাসে ওঠে। এবার মেয়ে ক্লাস এইটে উঠেছে। হয়ত একদিন এস.এস.সি'ও পাস করবে। তারপর কী হবে ? কে এই মেয়েকে বিয়ে করবে ?

সুরমার চোখের পানি এসে গেল। তিনি চোখে আঁচল চেপে বসে রইলেন।

ম্যাজিশিয়ান বসার ঘরের বিছানায় বসে আছে। সুপ্তি নাশতার পিরিচ নামাতে নামাতে বলল, আপনার ঘুম ভাল হয়েছে ? ম্যাজিশিয়ান জবাব দিল না। তবে সুন্দর করে হাসল। যে হাসির অর্থ— 'হ্যাঁ। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। খুকী তুমি ভাল আছ ?'

'আপনি কি ভাপা পিঠা পছন্দ করেন ? মা আপনার জন্যে ভাপা পিঠা বানিয়েছেন।'

'ভাপা পিঠা আমি খুব পছন্দ করি।'

www.BDeBooks.Com

'আপনি কি জানেন যে মা আপনাকে একটা নতুন না নাম দিয়েছেন। সেই নামটা হল বাবলু। এখন আর আপনাকে আসল নামে ডাকা যাবে না। ভাল হয়েছে না?'

'হুঁ।'

'আপনাকে আসল নামে কেন ডাকা যাবে না সেটা জানেন?'

ম্যাজিশিয়ান জবাব দিল না। সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল, 'আমার একজন ভাই ছিল। তার নামও ছিল টুনু। আপনাকে টুনু বলে ডাকলে মার তার ছেলের কথা মনে পড়বে এবং খুব মন খারাপ হয়ে যাবে। এই জন্যে আপনাকে টুনু নামে ডাকা যাবে না।'

'ও আচ্ছা ।'

'মার ধারণা আপনি দেখতেও অনেকটা আমার ভাইয়ার মতো।'

'ও।'

'তবে ভাইয়ার সঙ্গে আপনার সবচেয়ে বড় অমিল কী জানেন? সবচেয়ে বড় অমিল হচ্ছে ভাইয়া সারাক্ষণ কথা বলত। সে এক সেকেন্ডও চুপ করে বসে থাকতে পারত না এবং আমার মা'র ধারণা সে ঘুমের মধ্যেও কথা বলত। পিঠা খেতে কেমন হয়েছে?

'খুব ভাল হয়েছে। তুমিও খাও।'

সুপ্তি খাটের পাশে চেয়ারে বসল। তার খুব মজা লাগছে। আজ স্কুলে ম্যাজিশিয়ানের গল্প করতে হবে। এত কাছ থেকে সে এর আগে কোন ম্যজিশিয়ান দেখে নি। উনি কয়েকদিন বাসায় থেকে গেলে ভাল হত। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা সহজ ম্যাজিক সে শিখে রাখত। স্কুলের বন্ধুদের দেখিয়ে অবাক করে দিতে পারত। তাবে মেয়েরা ম্যাজিক শেখে কি-না কে জানে। সে কোনদিন কোন মেয়ে ম্যাজিশিয়ানকে দেখে নি।

'আচ্ছা আপনি কি আমার নাম জানেন?'

'জানি। তোমার নাম সুপ্তি।'

'আমি যে চোখে দেখতে পাই না সেটা কি জানেন?'

'হুঁ।'

'আপনার কি এই জন্যে খারাপ লাগছে?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলল না। সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল— এত সুন্দর একটা মেয়ে চোখে দেখতে পায় না, এই ভেবে আপনার খারাপ লাগছে না?

'লাগছে।'

'আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। আমার নিজের কিন্তু খারাপ লাগে না। কোনদিও তো চোখে দেখি নি কাজেই চোখে দেখতে না পাওয়ার কষ্টটা আমি জানি না। অন্যরা যখন আমাকে দেখে আহা উহু করে তখন আমার খুব খারাপ লাগে। আপনি দয়া করে আহা উহু করবেন না।'

'আচ্ছা কবর না।'

'আপনি কি আজ চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ম্যাজিক তো দেখা হল না ?'

'তুমি তো চোখে দেখতে পাও না। ম্যাজিক কীভাবে দেখবে ?'

'আমি কল্পনা করে করে দেখি। আপনি কী দেখাচ্ছেন সেটা বললেই আমি বাকিটা কল্পনা করে নেবো। নাশতা খেতে খেতে এটা ম্যাজিক দেখান না। ভাপা পিঠাটা খেয়ে ফেলবেন কিছুক্ষণ পর কান দিয়ে কিংবা নাক দিয়ে সেই পিঠা বের করবেন। হি হি।'

ম্যাজিশিয়ান এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার মুখটাও হাসি হাসি। সুপ্তি বলল, এই সে আমি হি হি করে হাসছি আপনি রাগ করছেন না তো ?

'না।'

'ক্লাসেও আমি সারাক্ষণ হি হি করে হাসি। এই জন্যে ক্লাসে আমার নাম হিহি রাণী। নামটা সুন্দর না ?'

'হ্যাঁ।'

'ক্লাসের মেয়েরা কী বলে জানেন ? তারা বলে আমার যার সঙ্গে বিয়ে হবে সে হাহা কর হাসবে। এবং তার নাম হবে হাহা রাজা। হাহা রাজার বউ হিহি রাণী। বক বক করেই যাচ্ছি আপনি রাগ করছেন না তো ?'

'না।'

'এখন একটা ম্যাজিক দেখান। কারণ ক্লাসের মেয়েদের কাছে আমাকে গল্প করতে হবে। সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখান।'

ম্যাজিশিয়ান বলল, আচ্ছা দেখাচ্ছি। এক থেকে দশের মধ্যে একটা সংখ্যা ভাবো।

সুপ্তি ভবল— তিন। করণ তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন। ভাইয়া বেঁচে থাকলে সে ভাবত চার। ভাইয়া যেহেতু বেঁচে নেই— কাজেই তিন।

'ভেবেছ ?'

'হুঁ।'

'ম্যাজিশিয়ান বলল, চার বিয়োগ এক। হয়েছে ?'

'হুঁ, হয়েছে। কিন্তু আপনি সরাসরি তিন না বলে চার বিয়োগ এক বললেন কেন ?'

'এমনি।'

'আচ্ছা আমি মনে মনে একটা ফুলের কথা ভাবছি। বলুন তো কী ফুল ?'

ম্যাজিশিয়ান হাসল কিছু বলল না। সুপ্তি বলল, পারছেন না, তাই না ?

ম্যাজিশিয়ান তারও জবাব দিল না। সুপ্তির মন একটু খারাপ হল। তার ধারণা ম্যাজিশিয়ান বলতে পারবে। সে খুব সহজ ফুল ভেবেছিল— বেলীফুল। সুপ্তি বলল, আপনার ম্যাজিক কিন্তু খুব ভাল না। মোটামুটি।

'তাই বুঝি ?'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ তাই। মনে মনে একটা সংখ্যা ভাবা— সেই সংখ্যা বলে দেয়া অনেকেই পারে।'

'ও আচ্ছা ।'

'একবার আমাদের স্কুলে একজন ম্যাজিশিয়ান এসেছিল সে অনেক ভাল ভাল ম্যাজিক দেখিয়েছে। একটা ম্যাজিক ছিল খুবই অদ্ভুত। কেরোসিনের এটা চুলায় সে কড়াই দিল। কড়াই-এ তেল ঢেলে দিল। তেল যখন ফুটে উঠল তখন সে এটা ডিম ভেঙে কড়াই-এ ছেড়ে দিল। তারপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিল। এক সময় ঢাকনা তুলতেই ঢাকনার ভেতর দেখে একটা কবুতর বের হয়ে উড়ে চলে গেল। অদ্ভুত না?'

'হ্যাঁ অদ্ভুত।'

'আপনি এ রকম ম্যাজিক দেখাতে পারেন না?'

'না।'

টুনু ভাইয়া একবার কোত্থেকে একটা ম্যাজিক শিখে এসেছিল। দড়ি কাটার ম্যাজিক। একটা দড়ি কাঁচি দিয়ে কাটা হয়। দড়িটা আপনা আপনি জোড়া লেগে যায়। আমাকে সে ম্যাজিকটা শিখিয়ে দিয়েছিল। আসলে মূল দড়িটা কাটা হয় না । আলাদা একটা ছোট্ট টুকরা কাটা হয়। সেই টুকরাটা লুকিয়ে ফেলা হয়। আপনি কি এই ম্যাজিকটা জানেন?

'না।'

'আচ্ছা আমি স্কুল থেকে এসে আপনাকে শিখিয়ে দেব। আপনি থাকবেন তো?'

'এখনো জানি না।'

'আমার মন হয়— মা আপনাকে যেতে দেবে না।'

ম্যাজিশিয়ান বলল, আমারও তাই ধারণা।

'আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে আপনাকে দড়ির ম্যাজিক শিখিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

সুপ্তির ম্যাজিশিয়ানের সামনে থেকে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না। বেচারা ম্যাজিক না পারলেও তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। আজ স্কুলে না গেলে কেমন হয়? এমন কোন ক্ষতি অবশ্যই হবে না তবে রেবতী আপা খুব ক্যাট ক্যাট করবে। সুপ্তি উঠে পড়ল। তাদের মর্নিং শিফ্ট। সকাল আটটায় ক্লাস শুরু হয়ে যায়। একটা রিকশা ঠিক করা আছে তাকে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে বাবা সঙ্গে যান। আজ মনে হয় বাবা সঙ্গে যাবেন না।

মবিন উদ্দিন রান্নাঘরে স্ত্রীর পাশে বসে আছেন। আগুনের পাশে বসে থাকতে তার ভাল লাগছে। মবিন উদ্দিন বললেন, ছেলেটাকে নাশতা দিয়েছ?

সুরমা বললেন, হ্যাঁ। চারটা পিঠা দিয়েছিলাম। চেটেপুটে খেয়েছে। মনে হয় ভাপা পিঠা খুব পছন্দ করে।

মবিন উদ্দিন স্ত্রীর দিকে তাকালেন কিন্তু কিছু বললেন না। এই বাড়ির আরো একজন ভাপা পিঠা খুব পছন্দ করতো। সেই স্মৃতি মনে করার চেয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করা ভাল। সুরমা বললেন, ছেলেটা কি আজ চলে যাবে ? মবিন উদ্দিন বললেন, হ্যাঁ ।

'কখন যাবে ?'

'এখনই চলে যাক। রাতটা থাকার দরকার ছিল, থেকেছে।'

'এখনই যাবার দরকার কী ? ভালমত একবেলা ভাতও তো খায় নি। রাতে ঠাণ্ডা কী সব খেয়েছে। পোলাওয়ের চাল এনো তো দুপুরে খিচুড়ি করব।'

'দুপুরে না করে রাতে কর। হাঁসের মাংস আর খিচুড়ি। শীতকালের হাঁস ভাল।'

সুরমা বললেন, ছেলেটা যদি চলে যেতে চায় তাকে বলে আজকের দিনটা রেখে দাও। কাল যাবে।

'বলে দেখি। থাকবে কি-না কে জানে।'

ম্যাজিশিয়ান একবার বলাতেই রাজি হয়ে গেল। মনিব উদ্দিন বললেন, তুমি কাল রাতে ঠাণ্ডা বাসি খাবার খেয়েছ এই জন্যেই সুপ্তির মা ভালমতো একবেলা খাওয়াতে চায়। একটা দিন থেকে যেতে তোমার অসুবিধা হবে না—তো ?

ম্যাজিশিয়ান নরম গলায় বলল, জ্বি-না।

'আমি দোকানে যাব। তুমি যাবে না-কী আমার সঙ্গে ?'

'জ্বি চলুন।'

'আগে একজন কর্মচারী ছিল, সেই দোকান খুলতো। তাকে বিদায় করে দিয়েছি। টাকা-পয়সা সরাতো। ঘরে পাঁচটা বাংলা ডিকশনারি ছিল— সংসদ অভিধান । একদিন গিয়ে দেখি একটাও নাই। আমি বললাম, ডিকশনারিগুলি কোথায় ? সে হাবার মতো মুখ করে বলল, কিসের ডিকশনারি। বিদায় করে দিয়েছি। বিশ্বাসী কাউকে পাচ্ছি না— রাখাও হচ্ছে না। অবশ্যি ব্যবসার অবস্থাও ভাল না। একজন কর্মচারী রাখার সামর্থ্য আমার নাই। সুপ্তির মা তোমাকে ভাল মন্দ খাওয়তে চায়— চাইবেই। সামান্য চাওয়টাও আমার জন্যে কষ্টদায়ক হয়। যাই হোক চল যাই। দোকানটা দেখবে।'

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানকে নিয়ে সারাদিন ঘুরলেন। পোলাওয়ের চাল কিনলেন, হাঁস কিনলেন। বাড়ি ফেরার পথে চায়ের দোকান দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন— ম্যাজিশিয়ানদের দিকে তাকিয়ে বললেন, চা খাবে ?

'জ্বি, খাব।'

'চল চা খাই।'

তিনি খুব আরাম করে চা খেলেন। চা খেতে গিয়ে তাঁর একবারও মনে পড়ল না গত ছয় বছর তিনি চা খান নি। ছয় বছর পর চা খাচ্ছেন। এত বড় একটা ঘটনা— তিনি কিছুই বুঝতে পরছেন না। তিনি মহা আনন্দে গল্প করে যাচ্ছেন।

'এই বছর কেমন শীত পড়েছে দেখলে ?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি।'

'যে বছর শীত বেশি পড়ে সেই বছর কলা খুব মিষ্টি হয়।'

'তাই না-কি ?'

'হুঁ। যে বছর গরম বেশি পড়ে সেই বছর আম হয় মিষ্টি। প্রকৃতির নিয়ম-কানুন বড়ই অদ্ভুত।'

'জ্বি।'

'চা আরেক কাপ খাবে ?'

'জ্বি খাব।'

'মালাই চা খেয়ে দেখ। হাফ দুধ, হাফ চা। খুবই টেস্ট।'

দু'জন দু'কাপ মালাই চা নিলেন। আর ঠিক তখন মবিন উদ্দিন চমকে উঠলেন। তিনি চা খাচ্ছেন। এই তার দ্বিতীয় কাপ চা। মবিন উদ্দিন খুব লজ্জিত বোধ করছেন। যেন মস্তবড় একটা অপরাধ করছেন। সাধারণ চা খেলেও একটা কথা ছিল— তিনি খাচ্ছেন মালাই চা। টুনুর অতি প্রিয় চা। এই দোকানেই তো টুনুকে নিয়ে তিনি কতবার এসেছেন।

সুরমা রান্না নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাঁস রান্না খুবই যন্ত্রণার ব্যাপার। পাখা ছাড়াতে হয়। বড় পাখাগুলো সহজে উঠে আসে কিন্তু ছোটগুলো আসতেই চায় না। আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে ছোট পাখা দূর করতে হয়। সুপ্তি যে তাকে সাহায্য করবে তা না। সে সন্ধ্যা থেকে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার সঙ্গে গল্প করছে। তিনি কিছু বলছেন না, গল্প করছে করুক। বেচারী একা একা থাকে গল্প করার মানুষ নেই। টুনু যখন বেঁচেছিল দুই ভাই-বোনের গল্পের যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হতেন। দু'জনই কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে বলে মনে হচ্ছে না।

সুপ্তি রান্নাঘরে ঢুকলো। আনন্দিত গলায় বলল, 'মা তোমার কোন সাহায্য লাগবে ?'

সুরমা বললেন, না।

'পরে কিন্তু ডাকাডাকি করতে পারবে না।'

'তুই করছিস কী ? গল্প ?'

'উঁহু। আমি উনাকে ম্যাজিক শেখাচ্ছি মা। দড়ি কাটার ম্যাজিক!'

'কী বলছিস তুই। ম্যাজিশিয়ান ছেলে তাকে তুই কী ম্যাজিক শিখাবি ?'

'উনি ম্যাজিক-টেজিক তেমন জানে না মা।'

'তাহলে যা। ম্যাজিক শিখিয়ে দে।'

সেই রাতে সুপ্তি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। যেন সে হাঁটতে হাঁটতে গভীর বনে ঢুকে গেছে। সেই বনের গাছগুলো অদ্ভুত। ডালের মাথা প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। গাছ ভর্তি ফুল। ছোট ছোট সাদা ফুল। আশ্চর্য কাণ্ড ফুলগুলো দেখতে বেলী ফুলের মতো। বেলী ফুলের তো এত বড় গাছ হয় না। বেলীফুল গাছ লতানো ধরনের হয়। এত বড় গাছে বেলীফুল ফুটেছে তার মানে কী! ফুলগুলোর কী সুন্দর গন্ধ। স্বপ্নের মধ্যেই সুপ্তি গন্ধ পেল। এবং সে এতই অবাক

হল যে তার ঘুম ভেঙে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার ঘুম ভাঙার পরেও স্বপ্নের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার সারা বিছানায় কেউ যেন বেলী ফুল বিছিয়ে রেখেছে। এটা কেমন স্বপ্ন যে স্বপ্ন ভাঙার পরেও স্বপ্নের ছায়া থেকে যায়। এই স্বপ্নের সঙ্গে কি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কোন সম্পর্ক আছে ? না, তা কী-করে থাকবে। সুপ্তি ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন তার আর স্বপ্নের কথা মনে রইল না।

৩

পনেরো দিন হল কালো যাদুকর মবিন উদ্দিনের বাড়িতে আছে। এক বুধবার এসেছিল, মাঝখানে এক বুধবার গিয়েছে, আজ আরেক বুধবার। এর মধ্যে তার নাম বদল হয়েছে। তাকে ডাকা হয় বাবলু নামে। সুরমা অবশ্যি মাঝে মাঝে ভুল করে টুনু ডেকে ফেলেন। সে বসার ঘরে থাকে। বসার ঘরে একটা সিঙ্গেল খাট আছে। খাটে ঘুমোয়। বাকি সময়টা খটে বসেই জানালা দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথম কয়েকদিন বসার ঘরেই তাকে খাবার দেয়া হতো। এখন সুরমা ভাত খাবার সময় তাকে ভেতরে ডেকে নেন। ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেন। সে বেশির ভাগ সময়ই হ্যাঁ না করে উত্তর দেয়। কথা বলার সময় চোখের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। সুরমা অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে তেমন কিছু জানতে পারেন নি। অতি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরেরও সে এমন সব কথা বলে, যার কোন অর্থ হয় না। যেমন সেদিন জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেশ কোথায় ? সে ভাত ডাল দিয়ে মাখতে মাখতে তার দিকে তাকিয়ে হাসল, উত্তর দিল না। তিনি আবার বললেন, তোমার দেশ কোথায় ? গ্রামের বাড়ি ?

সে চোখ না তুলেই বলল, নাম মনে নেই।

'নাম মনে নেই তার মানে কী ? নাম ভুলে গেছ ?

'হুঁ।'

'কোন জেলা সেটা মনে আছে ?'

'জ্বি না।'

'নেত্রকোনা থেকে জায়গাটা কত দূরে ?'

'দূরে।'

সুরমা বললেন, দূরে তো বুঝলাম। কত দূরে ?

'অনেক দূরে।'

'অনেক দূরেরও তো একটা হিসাব আছে। সেই হিসাবে বল কত মাইল দূরে ?'

'জানি না ।'

'জানি না কেমন কথা ?'

বাবলু তার উত্তরে এমন ভাবে হাসছে যেন সুরমা অত্যন্ত বোকার মতো একটা প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্নের জবাব দেবার দরকার নেই। সুরমার মনে নানা রকম সন্দেহ হয়, যেমন ছেলেটা পাগল নাতো ? ভদ্র পাগল। হৈ চৈ কর না।

www.BDeBooks.Com

চুপচাপ বসে থাকে। অনেক রকম পাগলই তো সংসারে থাকে এও এক ধরনের পাগল। পাগল হোক ছাগল হোক ছেলেটার উপর তাঁর মায়া পড়ে গেছে। মায়া পড়ার প্রধান কারণ হলো ছেলেটা দেখতে অবিকল তার মৃত ছেলের মতো। দ্বিতীয় কারণ, ছেলেটা অতি ভদ্র। আজকালকার ছেলেরা হয় না, বেয়াড়া ধরনের হয়। এ বেয়াড়া নয়। লাজুক এবং মুখচোরা। এরকম মুখচোরা লাজুক স্বভাবের ছেলে ম্যাজিক দেখায় কী করে সে এক রহস্য।

ম্যাজিকের ব্যাপারে সুরমার তেমন উৎসাহ নেই। ম্যাজিক হচ্ছে ছেলে ছোকরার বিষয়। ছেলেটার ম্যাজিক একবারই তিনি দেখেছেন। তাঁর কাছে এমন কিছু আহামরি মনে হয় নি। সে একটা কাগজ টেবিলের উপর রেখেছে। দেখতে দেখতে কাগজটায় আপনা আপনি আগুন ধরে গেল। চোখের সামনে পুড়ে ছাই। এটা এমন কোন ম্যাজিক না। কাগজে গোপনে কিছু দিয়ে রেখেছিল— এসিড ফ্যাসিড জাতীয় কিছু। ভাল ম্যাজিক, তবে এরচেয়ে ভাল ম্যাজিক তিনি ছোটবেলায় অনেক দেখেছেন। একজন যাদুকর শূন্য থেকে ডিম তৈরি করলেন। একটা ডিম থেকে দুটো ডিম হল, তিনটা ডিম হল আবার মিলিয়ে গেল।

এই ছেলেটা ভাল ম্যাজিক দেখায় বলেই যে তাকে এখানে রাখা হয়েছে তা না। তার উপর মায়া পড়ে গেছে বলেই সে এখনো আছে। যেদিন মায়া কেটে যাবে তাকে চলে যেতে বলা হবে।

সংসারে একটা বাড়তি মানুষ পোষা সহজ ব্যাপার না। যে দিনকাল পড়েছে— নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরই কেউ জায়গা দেয় না আর এ হল বাইরের অজানা অচেনা একজন মানুষ। এ যুগে অচেনা একজনকে বিশ্বাস করাও ঠিক না।

রাতে ঘুমোতে যাবার সময় সুরমার প্রায়ই মনে হয় ছেলেটা জ্বীন ভূত না-তো! মানুষের সংসারে জ্বীন এসে বাস করে এরকম গল্পতো প্রায়ই শোনা যায়। একটা গল্প আছে— মাদ্রাসার হোস্টেলে থেকে একটা জ্বীনের ছেলে পড়ে। পড়াশোনায় খুব ভল। মাদ্রাসার সুপার একরাতে ছেলেটার ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তিনি কী মনে করে যেন ছেলেনটার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখলেন— ছেলেটা বিছানায় শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। হঠাৎ সে হাতের বইটা রেখে বইয়ের শেলফের দিকে হাত বাড়াল। বইয়ের সেলফটা ঘরের অন্য প্রান্তে, অনেকটা দূরে। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন ছেলেটার হাত লম্বা হচ্ছে-লম্বা হচ্ছে তো হচ্ছেই। সাপের মতো হয়ে যাচ্ছে। মাদ্রাসার সুপার এই দৃশ্য দেখে ভয়ে বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এরপর থেকে ছেলেটাকে আর দেখা গেল না।

হতেও তো পারে টুনু নামের এই ছেলেটা আসলে একটা জ্বীন। মানুষের বেশ ধরে তাদের সঙ্গে আছে। সুরমা এক রাতে ছেলেটার সম্পর্কে তাঁর এই ভীতির কথা মবিন উদ্দিনকে বলেছিলেন। মবিন উদ্দিন বিরক্ত গলায় বলেছেন, তোমার কি ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেল ? সুরমা আমতা আমতা করে বললেন,

কথার কথা বলছি। জগতে কত রহস্যমায় ব্যাপার ঘটে। মাবিন উদ্দিন বলেছেন, জগতে কোন রহস্যময় ব্যাপার ঘটে না। একটি দরিদ্র ছেলে ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখায়। থাকার জায়গা নেই, কয়েক দিন এখানে আছে। তোমার যদি পছন্দ না হয়— বলে দাও চলে যাবে। তাও তো বলছ না। রোজ রান্না করে খাওয়াচ্ছ। বেশ আদার করেই তো খাওয়াচ্ছ।

'ছেলেটা ওর নিজের সম্পর্কে কিছুই তো বলছে না। দেশ কোথায় এইটাই এখন বলে নি।'

'কোনো কারণে হয়ত বলতে চায় না।'

'বলতে চাইবে না কেন ? এই সন্দেহজনক না ? তুমি একদিন ভাল মতো জিজ্ঞেস কর না কেন ?'

'করব। জিজ্ঞেস করব। এখন ঘুমাও তো। ঘ্যান ঘ্যান করবে না।'

'আমি ঘ্যান ঘ্যান করছি ?'

'হ্যাঁ করছ। তুমি হচ্ছ এমন একজন মহিলা যার চিন্তার সঙ্গে কর্মের কোন মিল নেই। তুমি কাজ কর উত্তরে, চিন্তা কর দক্ষিণে।'

'তার মানে কী ?'

'মানে বুঝাতে পারব না। সব কিছুর মানে বুঝতে পারলে তো কাজই হয়েছিল। রাত হয়েছে এখন ঘুমাও।'

মবিন উদ্দিন পাশ ফিরে শুলেন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ দুপুরেই তিনি সুরমাকে দেখেছেন ম্যাজিশিয়ান ছেলেটির সঙ্গে অদিখ্যেতা করছে। তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। ছেলেটা বলল, সে সজনে ডাঁটা খাবে না। সুরমা অবাক হয়ে বলল, এ কী সজনে ডাঁটা খাবে না কেন ? খুবই পুষ্টির জিনিস।

'খাও বললাম। না খেলে আমি খুবই রাগ করব। আমার রাগ কী জিনিস তুমি জান না।'

অচেনা অজানা একটা ছেলে, সে সজনে ডাঁটা না খেলে না খাবে। এত কেন সাধাসাধি ?

খাবার পর টক দৈ-এর বাটি বের হল। মবিন উদ্দিন জানেন টক দৈ ছেলেটার জন্যে আনা হয়েছে। তিনি বা সুপ্তি কেউই টক দৈ খায় না। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা অত্যন্ত পছন্দ করে খায়। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে তার ছেলে টুনুও টক দৈ পছন্দ করে খেত। রোজ খাওয়া শেষ করে বলত, মা টক দৈ আছে ?

হ্যাঁ ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার মধ্যে কিছু রহস্যময় ব্যাপার আছে। সুযোগ-সুবিধা মতো তিনি দু একটা কথা হয়ত তাকে জিজ্ঞেস করবেন। তবে ছেলেটা এমন কোন অপরাধ করে নি যে উকিল হয়ে প্রশ্ন করে তাকে নাজেহাল করতে হবে।

বাবার নাম কি ?
মায়ের নাম কি ?
দেশের বাড়ি কোথায় ?

www.BDeBooks.Com

মামার বাড়ি কোথায় ?

কোন জেলা, কোন গ্রাম ?

পড়াশোনা কী ?

যত ফালতু ব্যাপার । একটা দরিদ্র ছেলে বিপদে পড়ে কয়েক দিন আছে। যথাসময়ে চলে যাবে। নিজে যদি না যায় তিনিই চলে যেতে বলবেন। খুব ভদ্রভাবে বলবেন। যাতে বেচারা মনে কষ্ট না পায়। তিনি নিজে দরিদ্র মানুষ তাঁর পক্ষে যত দিন সম্ভব হয়েছে তিনি সাহায্য করেছেন। এখন আর পারছেন না।

মবিন উদ্দিন খুব ভাল করে জানেন সুরমা বা সুপ্তি কেউই ম্যাজিশিয়ান ছেলেটিকে চলে যেতে বলতে পারবেন না। তারা ছেলেটাকে অসম্ভব পছন্দ করে। তার কাছে মনে হয় এটাও ঠিক না। কোন কিছুর বাড়াবাড়ি ভাল না। কাউকে পছন্দ করা ভাল, কিন্তু সেই পছন্দ বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হওয়াটা ভাল না। তাঁর ধারণা সুরমা ও সুরমার কন্যা স্বাভাবিকভাবে কিছু করতে পারে না। সবকিছুকেই তারা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যায়। ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করেন তবে সেই পছন্দের মধ্যে কিন্তু আছে। বেশ বড় ধরনের কিন্তু। তাঁর ধারণা ছেলেটা মনের কথা বুঝতে পারে। এরকম মনে করার পেছেনে কারণ আছে।

গত পরশু দুপুরে তিনি খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছেন। শীতকালের দুপুরে লেপের ভেতর ঢুকলে ঘুম আসবেই। তাঁরও ঘুম আসছে, চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন, হঠাৎ মনে হল জর্দা দিয়ে একটা পান খেতে পরলে ভাল হত। ঘরে পানের চল নেই। পান খেতে হলে কাউকে দোকানে পাঠাতে হয়। বাবলু আছে তাকে বললেই হয়, বলতে ইচ্ছে করল না। সুরমা নানান ভেজাল করবে। হেন তেন শতেক প্রশ্নে মাথা ধরিয়ে দেবে।

পান আনাচ্ছ কেন ?

জর্দা দিয়ে পান আবার কবে ধরলে ?

কোন একটা নেশা ছাড়া থাকতে পরে না ?

সিগারেট, পান, বাকি রইল কী ? মদটা ধরে ফেল, তাহলে কেউ আর বলতে পারবে না যে একটা নেশা বাকি আছে ।

শত প্রশ্নের জবাব দেবার চেয়ে শুয়ে থাকা ভাল। সন্ধ্যাবেলায় যখন বের হবেন তখন দোকান থেকে একটা পান কিনে নিলেই হবে। মবিন উদ্দিন ঘুমোবার আয়োজন করলেন, কিন্তু ঘুম এল না, মাথার মধ্যে পান ঘুরতে লাগল।

কয়েক বছর আগে ঢাকা শহরে স্টেডিয়ামে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করা পান খেয়েছিলেন, সেই পানের স্বাদ এখনো মুখে লেগে রয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, বইয়ের চালান আনতে এবার যখন ঢাকা যাবেন গোটা দশেক পান নিয়ে আসবেন। দোকানে রেখে দেবেন যে ক'দিন খাওয়া যায় খাবেন।

মনের এই অবস্থায় সুপ্তি ঢুকল। তাঁকে হতভম্ব করে দিয়ে বলল, বাবা এই নাও তোমার জর্দা পান।

তিনি বললেন, জর্দা পান মানে ? পান কী জন্যে ?

'খাবার জন্যে আবার কী জন্যে।'

' কে এনেছে ?'

'ম্যাজিশিয়ান ভাইয়া এনেছে।'

'সে শুধু শুধু পান আনবে কেন ? তাকে কি আমি পান আনতে বলেছি ?'

'বলেছ নিশ্চয়ই ভুলে গেছ। ইস্ বাবা তুমি সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা যে বলতে পার। আশ্চর্য। কথা বাড়িও না পান নাও আমি হোম ওয়ার্ক করছি।'

মবিন উদ্দিন পান নিলেন তবে তাঁর মনে বিরাট এক কিন্তু ঢুকে গেল। ব্যাপারটা কী ? ছেলেটা যত বড় ম্যাজিশিয়ানই হোক পিসি সরকার তো না। পিসি সরকারও মনের কথা বলতে পারতে না। এ বলছে কীভাবে ? সাধু-সন্ন্যাসী পীর-ফকিরদের এসব ক্ষমতা থাকে। এই থেকে সাধু-সন্ন্যাসীও না পীর-ফকিরও না। এত শখের জর্দা দেয়া পান তাঁর কছে ঘাসের মতো লাগতে লাগল।

আরেক দিনের কথা তিনি বিরস মুখে দোকানে বসে আছেন।

বিক্রি-বাটা কিছুই নেই। কাস্টমার তো দূরের কথা মাছিও উড়ছে না। বিকেলের দিকে একজন কাস্টমার এসে একটা জ্যামিতি বাক্স নাড়াচাড়া করল। দাম জিজ্ঞেস করল কিনল না। মবিন উদ্দিন তার দোকানে বই ছাড়াও খাতা, পেন্সিল, জ্যামিতি বাক্স এই সব রাখেন। যাতে অফ সিজনে পুরোপুরি বসে থাকতে না হয়। কোনই লাভ নেই। যখন বই বিক্রি হয় না তখন অন্য কিছুও বিক্রি হয় না। মবিন উদ্দিনের ধারণা হল আজ বোধহয় মঙ্গলবার। মঙ্গলবারটা তাঁর জন্যে খারাপ। আজ কী বার তিনি মনে করার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য মনে করতে পারলেন না। একবার মনে হচ্ছে সোমবার আরেকবার মনে হচ্ছে মঙ্গলবার। ঘরে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। তারিখ জানা থাকলে বারটা বের করা যেত। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তারিখটাও তাঁর মনে নেই। নিজের উপর যখন খুবই রাগ লাগছে তখন বাবলু বলল, স্যার আজ বুধবার।

তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, আজ কী বার তা কি আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি ?

ছেলেটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, জ্বি না।

'তাহলে শুধু শুধু বললে কেন আজ বুধবার ? অকারণে কথা বলবে না। অকারণে কথা আমি নিজে বলি না। অন্য কেউ বললেও আমার ভাল লাগে না। এটা মনে রাখবে। অধিক কথা বলা মানে অকারণে আয়ুক্ষয়।'

'জ্বি আচ্ছা মনে রাখব।'

ছেলেটার এসব রহস্য তাঁর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে তাঁর ইচ্ছা করে ডেকে বলেন, ঠিক করে বল তো তোমার ব্যাপারটা কী। ঝেড়ে কাশ। তুমি কি মনের কথা বুঝতে পার ? পারলে বল হ্যাঁ , না পারলে বল, না। নো হাংকি পাংকি। আমি যেমন অধিক কথা বলা পছন্দ করি না, তেমনি হাংকি পাংকিও পছন্দ করি না।

www.BDeBooks.Com

ছেলেটা যদি স্বীকার করে সে মনের কথা বলতে পারে তাহলে তিনি তাকে দুটা কথা শুনিয়ে দেবেন। কঠিনভাবে বলবেন, মনের কথা বলার এই বিদ্যা শিখলে কোথায় ? এটা তো ভাল বিদ্যা না। এটা খারাপ বিদ্যা। যে বিদ্যায় মানুষের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয় সেই বিদ্যা খারাপ বিদ্যা। সেই বিদ্যার চর্চা করাও পাপ। কথাগুলো দেরি না করে বলে ফেলা দরকার। মবিন উদ্দিন রোজই একবার ভাবেন আজ বলবেন, শেষ পর্যন্ত আর বলা হয় না। তারপর এমন এক ঘটনা ঘটল যে মবিন উদ্দিন মনস্থির করলেন, ব্যাপারটা আজই ফয়সালা করবেন।

ঘটনাটা এরকম, মাঝরাত। তিনি ঘুমুচ্ছেন। প্রচণ্ড শীত পরেছে, তিনি লেপের নিচে ঢুকে আছেন। শীতের জন্যেই তার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। জানালা ভাল মতো বন্ধ হয় নি হু হু করে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তাঁর মনে হল বসার ঘরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করছে। চোর নাতো ? কৃষ্ণপক্ষের শীতের রাতগুলো চোরদের জন্যে খুবই আনন্দের। গায়ে তেল মেখে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে চুরি করতে যায়। খুট খাট শব্দ যতই হোক গৃহস্থ জাগবে না। শীতের রাতের সুখের ঘুম ঘুমাবে। ঘর কবরের মতো অন্ধকার। ট্রান্সফরমার ব্রাস্ট করেছে বলে সাতদিন ধরে ইলেকট্রিসিটি নেই। ট্রান্সফরমার ঠিক করারও কিছু হচ্ছে না। শহরের একটা অংশ অন্ধকারে পরে আছে। অদ্ভুত দেশ। মেঝেতে যে হারিকেন জ্বালানো ছিল সেটি কী কারণে যেন নিভে গেছে। মবিন উদ্দিন দেয়াশলাইয়ের খোঁজে বালিশের নিচে হাত দিলেন। যা ভেবেছিলেন, দেয়াশলাই নেই। সুরমার দেয়াশলাই ভীতি আছে। বালিশের নিচে বা তোশকের নিচে দেয়াশলাই দেখেলেই সে সরাবে। তার ধারণা প্রায়ই আপনা-আপনি বোম ফাটার মতো দেয়াশলাইয়ের বাক্স ফেটে উঠে বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়। নেহায়েত তাঁর সাবধানতার জন্যে এ বাড়িতে কিছু হচ্ছে না। মবিন উদ্দিন সাবধানে খাট থেকে নামলেন। অন্ধকারে দরজা খুলে বসার ঘরে এলেন। চোর বাড়িতে থাকলেও দরজা খোলার শব্দে এতক্ষণে পালিয়ে যাবার কথা। তারপরেও ঘরে হাঁটাহাটির শব্দ হচ্ছে। বিস্মিত মবিন উদ্দিন বললেন, কে ?

ছেলেটা বলল, জ্বি আমি।

'এত রাতে জেগে আছ ?'

'জ্বি।'

'কী করছ ?'

'বই পড়ছি।'

'বই পড়ছি মানে। অন্ধকারে বই পড়ছ কীভাবে ?'

ছেলেটা কোন জবাব দিল না। মবিন উদ্দিন বললেন, 'কী বই পড়ছ ?'

'সুপ্তির ইতিহাস বইটা একটু দেখছিলাম।'

'তুমি কী অন্ধকারে দেখতে পাও ?'

'জ্বি।'

'কীভাবে দেখ? ম্যাজিকের সাহায্যে?'

বাবলু জবাব দিল না। মবিন উদ্দিন বললেন, আমি গায়ে কি পরেছি তুমি বলতে পারবে?

'আপনি হলুদ রঙের একটা গেঞ্জি পরে আছেন।'

'আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ইতিহাস বই পড়, আমি কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'ভাল কথা তুমি কি বলতে পারবে আমার দেয়াশলাইটা কোথায়? বলতে পারলে বল। হারিকেনটা জ্বালিয়ে রাখি। শীতের রাতে চোরের উপদ্রব হয়।'

'দেয়াশলাইটা আপনার বালিশের নিচেই আছে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। কাল সকালে তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

মবিন উদ্দিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন, একী যন্ত্রণা। খাল কেটে কুমীর আনেন নি তো? মনে হয় এনেছেন। কুমীরের চেয়েও ভয়াবহ কিছু নিয়ে এসেছেন। অক্টোপাস নিয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি সুরমার সঙ্গে আলাপ করতে চান না। জটিল ব্যাপার থেকে মেয়েদের দূরে রাখাই নিয়ম। সমস্যার শুরুতে মেয়েদের জানানো মানে সমস্যা আরও জট পাকিয়ে ফেলা। নিয়ম হচ্ছে সমস্যা শেষ হলে যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব করে মেয়েদের জানানো।

সারা রাত মবিন উদ্দিনের ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে ফজরের আজান শুনলেন। পাক-পাখালির ডাক শুনলেন। দেখলেন-সুরমা বিছানা থেকে নামছে। অজু করতে যাচ্ছে, তাঁরও ওঠা উচিত। এমনি নামাজ কাজা করা এক জিনিস আর আজান শুনে কাজা করা ভিন্ন জিনিস। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না। প্রবল ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ঘুমের মধ্যেই বিচিত্র একটা স্বপ্ন দেখলেন। যাদুকর এবং তিনি হাঁটছেন। বনের ভেতরের পায়েচলা পথে হাঁটছেন। ঘন বন, তবে খুব পরিচ্ছন্ন। বনের নিচে ঝোপঝাড় নেই। কার্পেটের মতো দূর্বা ঘাস। বনটা খানিকটা রহস্যময়, কারণ কোন শব্দ নেই। চারদিক সুনসান নীরবতা। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে না। পাখি ডাকছে না, কিচ্ছু না। তারা দু'জন যে হাঁটছেন সেই হাঁটাও নিঃশব্দ হাঁটা।

মনিব উদ্দিন প্রথম প্রশ্ন করলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ছেলেটা বলল, আমরা কোথাও যাচ্ছি না তো। আপনি আমাকে কিছু জরুরি প্রশ্ন করবেন বলেছিলেন, সেই জন্যে নিরিবিলি জায়গায় নিয়ে এসেছি। আপনার কি মনে হচ্ছে না জায়গাটা খুব নিরিবিলি?

'তুমি কে?'

'আমি একটা গাছ?'

'কী বললে! গাছ?'

'জ্বি।'

'তুমি মানুষ না?'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি না।'

'তুমি গাছ?'

'জ্বি আমি গাছ।'

'কী গাছ? আম না কাঁঠাল? নাকি সাধারণ জঙ্গলা গাছ?'

'আমি একটা গাছ সেটাই বড় কথা, কী গাছ সেটা বড় কথা না। কেউ যদি বলে সে মানুষ তাহলে তো সব বলা হয়ে যায়। মানুষের বেলায় কি আলাদা করে পরিচয় দেবার দরকার পড়ে? তাহলে গাছের বেলায় দরকার হবে কেন?'

'একটা গাছ মানুষ সেজে আমার বাড়িতে আছে এটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার না?'

'না খুব আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু না। অনেক গাছই মানুষ সেজে থাকে। কেউ তাদের ধরতে পারে না। অনেকে আবার জানেও না যে তারা মানুষ না তারা গাছ।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কি আর কিছু জানতে চান?'

'তুমি মানুষের মনের কথা বলতে পার?'

'তা পারি। গাছদের অনেক ক্ষমতা।'

'জ্বি। যাদের ক্ষমতা বেশি থাকে তারাই কখনো অন্যকে সেই ক্ষমতা দেখায় না। ক্ষমতা যত অল্প হয় সেই ক্ষমতা প্রদর্শনের ইচ্ছাও তত বেশি হয়।'

'তোমার আর কী ক্ষমতা আছে?'

'আপনাকে বলতে চাচ্ছি না।'

'বলতে চাচ্ছ না কেন?'

'আমি আপনার মাথা এলোমোলো করে দিতে চাচ্ছি না। এমনিতেই আপনার মাথা যথেষ্ট এলোমেলো হয়ে আছে।'

স্বপ্নের এই পর্যায়ে হঠাৎ ঝড় শুরু হল। প্রবল ঝড়। বাতাসের ঝাপটা আসছে আর প্রকাণ্ড সব গাছ নুয়ে নুয়ে পড়ছে। আকাশ যদিও দেখা যাচ্ছে না, মবিন উদ্দিন বুঝতে পারছেন আকাশ ঘন-কালো। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এতক্ষণ যে বন। নিঃশব্দ ছিল এখন তা শব্দময়। তাড়স্বরে পাখি ডাকছে। মট মট শব্দে গাছের ডাল ভাঙছে। ভয়াবহ অবস্থা। ঝড়ের সঙ্গে শুরু হল বর্ষণ। ঘন বর্ষণ। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। তিনি ছুটতে শুরু করেছেন। ছুটে কোথায় যাবেন? যেদিকেই যান সেদিকেই বন। তিনি একী মহা বিপদে পড়লেন? এর মধ্যে মেয়েকণ্ঠে হাসির শব্দ শোনা গেল। এই ভয়াবহ দুর্যোগে কে হাসে। কার এত আনন্দ?

মবিন উদ্দিনের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনলেন সুপ্তি হাসছে। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। সুপ্তি ঘরে ঢুকল, এখন তার মুখে হাসি।

'বাবা কী মজার একটা কাণ্ড যে হচ্ছে, ম্যাজিশিয়ান ভাইয়া উঠোনে বসে দাঁত মাজছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা কাক এসে মাথায় গু করে দিয়েছে। হি হি হি।'

সুপ্তির হাসি আর থামেই না। মবিন উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার স্বপ্নের ঘোর এখনও কাটে নি, নিজের মেয়েটাকেও অচেনা লাগছে। এই বিচিত্র স্বপ্ন দেখার মনে কী?

স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। মানুষ তার এক জীবনে কত বিচিত্র স্বপ্নই না দেখে। ছোটবেলায় তিনি একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন— শেয়ালের মত সুঁচালো মুখের কী একটা প্রাণী খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে তার সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলা শেষ করে সেই প্রাণীটা হাই তুলতে লাগল। তখন এই প্রাণীটার মা এসে বলল, এই তুই কিছু না খেয়েই ঘুমুতে শুরু করেছিস। কিছু খেয়ে নে। ওমনি প্রাণীটা তার উরুতে কামড় দিয়ে একদলা গোশত তুলে নিল। প্রচণ্ড ব্যথায় তিনি জেগে উঠলেন। উরুতে কামরের দাগ-টাগ কিছু ছিল না। কিন্তু অনেক দিন ব্যথা ছিল।

ছোটবেলায় স্বপ্নটা যেমন অর্থহীন ছিল গত রাতের স্বপ্নও তেমন অর্থহীন। স্বপ্ন নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই।

ছেলেটা অন্ধকার দেখতে পারে এই খটকা অবশ্যি থেকেই যায়। তা সেটাও কোন বড় ব্যাপার না ম্যাজিকের কোন কৌশল হবে। ভাল ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিকের অনেক কৌশল জানে। সেও জানে। শুধু শুধু এত দুশ্চিন্তাগ্রাস্ত হবার কিছু নেই।

আজ ছুটির দিন— দোকান খুলতে হবে না। মবিন উদ্দিন বিশ্রাম করতে পারেন। শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। শরীরের চেয়ে মন বেশি খারাপ ব্যবসাপাতি হচ্ছে না। দোকান বিক্রি করে অন্য কিছু করবেন? এই বয়সে অন্য কিছু করার কথা চিন্তা করাও কষ্টের। ছেলেটা বেঁচে থাকলে হত না। এই বয়সটা নৌকায় চড়ে চারদিকের শোভা দেখার বয়স। হাল ধরার বয়স না।

মবিন উদ্দিন নাস্তা করলেন। কিছুক্ষণ রোদ বসে রইলেন। আজ ঠাণ্ডা অন্যদিনের চেয়ে কম। তারপরেও রোদে বসে থাকতে ভাল লাগছে।

সুপ্তি বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। মবিন উদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বলবি?

সুপ্তি বলল, না। আচ্ছা বাবা তোমার কি মন খারাপ?

'উহুঁ।'

'তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ।'

'আমার মন খারাপ নারে মা, আমার মন ভাল। বেশ ভাল। তুই কি আমাকে এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারবি?'

সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলল, অবশ্যই পারব।

সুপ্তি জানে তার বাবা চা খান না। এক সময় খুব খেতেন। বিশেষ একটা ঘটনার পর চা ছেড়ে দিলেন। সেই বিশেষ ঘটনাও সে জানে। আজ হঠাৎ বাবার চা খেতে চাইবার ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না। তার বাবা কি বদলে যাচ্ছেন?

www.BDeBooks.Com

শুধু তার বাবা না— তাঁরা সবাই কি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে না ?

মুবিন উদ্দিন বললেন, বাবলু কোথায় ?

'মা বাজারে পাঠিয়েছেন।'

'তোর মা'কে বলিস আমি দুপুরে খাব না।'

'কেন খাবে না ?'

রাহেলা আজ দুপুরে তার ওখানে খেতে বলেছে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে কি কথাবার্তাও নাকি আছে। তুই কি যাবি আমার সঙ্গে ?'

সুপ্তি বলল, না।

'না কেন ? চল যাই।'

'ফুপুর বাড়িতে আমার যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি এক কাজ কর— বাবা ম্যাজিক ভাইয়াকে নিয়ে যাও। সে ভালমন্দ কিছু খেয়ে আসুক। দিনের পর দিন বেচারা আজে বাজে খাবার খাচ্ছে।'

মবিন উদ্দিন কিছু বললেন না। সংসারের চিন্তাটা আবার তাঁর মাথায় ঢুকে গেল। পোস্টাপিসের পাস বই-এ তাঁর আর অল্প কিছু টাকা অবশিষ্ট আছে। এই টাকা শেষ হলে সব শেষ। তিনি কীভাবে সামলাবেন।

'বাবা তোমার মন কি খারাপ ?'

'না মন খারাপ না।'

'আমি প্রায়ই দেখি তুমি খুব মন খারাপ করে থাক। কোন একটা ব্যাপার নিয়ে খুব দুঃচিন্তা কর। ব্যাপারটা কী ?'

'কিছু না রে মা।'

'আমি যে ফুপুর বাসায় যেতে চাচ্ছি না এই জন্যে মন খারাপ করছ ? বাবা শোন ঐ বাড়িতে যেতে আমার ভাল লাগে না। তারা এত বড়লোক —আমরা গরিব। ফুপু ঠিকমত আমাদের সঙ্গে কথাও বলেন না। তুমি বলতে গেলে প্রতি সপ্তাহে ঐ বাড়িতে যাও। ফুপু কখনো আসেন না। আমার মনে হয় তোমারও এত ঘন ঘন যাওয়া উচিত না।'

'ভাই বোনের বাড়িতে যাবে না! কী বলিস তুই। মনে কর তোর খুব টাকাওয়ালা বাড়িতে বিয়ে হল। টুনু হয়ে গেল গরিব। সেই গরিব টুনু কি তোর বাড়িতে যাবে না!'

সুপ্তি বলল, অবশ্যই যাবে। এবং তুমিও যাবে। আর শোন বাবা তুমি আমার কথায় কিছু মনে করো না। আমারতো আসলে বুদ্ধি বেশি না। আমি খুবই বাচ্চা মেয়ে।

মবিন উদ্দিন হাসলেন। তাঁর ধারণা তাঁর এই মেয়ের খুবই বুদ্ধি। শান্ত বুদ্ধি। মেয়েদের এত বুদ্ধি থাকাটা অবিশ্য ঠিক না। বেশি বুদ্ধির মেয়েদের সংসারে শান্তি থাকে না। বোকা টাইপ মেয়েগুলো সুখে ঘর সংসার করে। কে জানে তাঁর এই মেয়ের কপালে সুখের ঘর আছে কি-না। থাকার অবশ্যি কোন কারণ নেই। কার দায় পড়েছে অন্ধ মেয়ে বিয়ে করার ?

রাহেলাদের বাড়িতে মবিন উদ্দিন দুপুরের আগেই পৌঁছলেন। দোতলা পাকা দালান। সামনে বাগান আছে। বাড়ির পেছনে বাঁধানো পুকুর। গত বছর পোনা ছেড়েছিল— এখন সেই পোনা বড় হয়েছে। আজ জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে। সবাই ভিড় করে আছে পুকুর পাড়ে। মবিন উদ্দিনও গেলেন। রাহেলা ভাইকে দেখে এগিয়ে এল। রাহেলার মুখ ভর্তি পান। সুখী সুখী চেহারা।

'ভাইজান আপনার সঙ্গে খুবই জরুরি কিছু কথা আছে।'

'বল কী কথা।'

'ঐ দিকে চলেন যাই। এইসব কথা কারোর না শোনাই ভাল।'

মবিন উদ্দিন শঙ্কিত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কি কথা আছে যে কেউ শুনলে অসুবিধা হবে। তিনি নিতান্তই নিরামিষ মানুষ। কারো কোন সমস্যার মধ্যে নেই।

'কী কথা বলতো ?'

' তোমাদের বাড়িতে না কি একটা ছেলে থাকে ?'

'ও আচ্ছা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কথা বলছিস ?'

'হ্যাঁ তার কথাই বলছি। পথে ঘাটে ম্যাজিক দেখাতো, তুমি নাকি তাকে বাড়িতে নিয়ে তুলেছ। সেই ছেলে সবার সঙ্গে খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

মবিন উদ্দিন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। রাহেলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ভাবীর যে তালের ঠিক নাই সেটাতো আমরা সবাই জানি। আপনি কেন এরকম হবেন। আপনার কেন মাথা আউলা হবে ? চেনা নাই, পরিচয় নাই, বাইরের একটা ছেলে পথেঘাটে ম্যাজিক দেখায় সে কি-না ভেতর বাড়িতে ঘুরঘুর করে।

'ছেলেটা ভাল।'

'কী করে বুঝলেন ছেলেটা ভাল ? ভাল ফ্যামিলির ছেলে পথেঘাটে যাদু দেখায় ? আপনার বাড়িতে বড় একটা মেয়ে আছে। আছে না ?'

'বড় কোথায়। সুপ্তি বাচ্চা মেয়ে।'

'ক্লাস এইটে পড়ে মেয়ে বাচ্চা ? শুনেন ভাইজান আমার বিয়ে হয়েছিল ক্লাস এইটে পড়ার সময়।'

'ও।'

'ভাইজান ঘটনা শুনে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড! পথের একটা ছেলে ভেতর বাড়িতে ঘুরঘুর করছে। একটা বদনাম যদি রটে যায় উপায় আছে ? আপনি আজই ছেলেকে বিদায় করবেন।'

'আচ্ছা দেখি।'

'দেখিটেখি না ভাইজান। আপনি বাড়িতে যাবেন, ছেলেকে বলবেন, পথ দেখ। আর লক্ষ্য রাখবেন সে যেন আর ফিরে না আসে। ছেলে যে সারাদিন ভেতরের বাড়িতে বসে থাকে— সে করে কী ? ভাবীকে ম্যাজিক শেখায় ?'

'সারাদিন ভেতরের বাড়িতে থাকে না। আমার সঙ্গে দোকানে গিয়ে বসে।'

www.BDeBooks.Com

'তাহলে তো ঘটনা ঘটছে। আপনার দোকানের পয়সা-কড়ি নিশ্চয়ই মেরে সাফ করছে। আপনি যে রকম মানুষ কিছুই বুঝতে পারছেন না। আপনার চোখের সামনে দিয়ে হাতি গেলেও তো আপনি দেখেন না।'

তুই যতটা অস্থির হচ্ছিস তত অস্থির হবার মতো কিছু না। বাইরের একটা ছেলেও তা ঘরের ছেলের মতো হতে পারে। পারে না?'

'ভাইজান শুনেন, তিন দিন ঘরে থেকে যদি কেউ ঘরের মানুষ হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে সমস্যা আছে বিরাট সমস্যা। আপনি আজই ঐ ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। আপনি নিজে বলতে না পারেন— আমি বকুলের বাবাকে বলে দিচ্ছি সে সন্ধ্যার পর যাবে ঐ হারামজাদাকে কানে ধরে বের করে দেবে।'

'তার দরকার নেই।'

'আপনি নিজে যদি তাকে বের না করেন, আমি অবশ্যই বকুলের বাবাকে পাঠাব।'

মবিন উদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। রাহেলা মনে হচ্ছে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভাল ঝামেলা করবে। বকুলের বাবা আব্দুল মজিদ মানুষটা ছোটখাট এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী হলেও কঠিন লোক। তিনি নিজে তাকে খুবই অপছন্দ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় রাহেলার যদি এই মানুষটার সঙ্গে বিয়ে না হত তার জীবনটা অনেক সুখের হত। বস্তা বস্তা টাকা থাকলে কিছু হয় না। টাকার প্রয়োজন অবশ্যই আছে কিন্তু বস্তা বস্তা টাকার দরকার নেই।

'ভাইজান!'

'বল।'

'বকুলের বাবা তোমাকে কী যেন বলবে, যাবার আগে শুনে যেও।'

'আচ্ছা।'

মবিন উদ্দিনের অস্বস্তি লাগছে। আব্দুল মজিদের সঙ্গে কথা বলে তিনি কখনোই স্বস্তিবোধ করেন না। যাদিও আব্দুল মজিদের ভদ্রতা এবং বিনয় তুলনাহীন। সেই বিনয় এবং ভদ্রতার পেছনে কিছু একটা থাকে যা অসহনীয়।

আব্দুল মুজিদ মবিন উদ্দিনকে দেখেই পা ছুঁয়ে সালাম করল। হাসি মুখে বলল, ভাইজান, ভাল আছেন?

মবিন উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, ভাল।

'আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভাইজান। স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া দরকার। জোয়ান বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙলে সামাল দেয়া যায়— শেষ বয়সে স্বাস্থ্য ভাঙলে আর সামাল দেয়া যায় না।'

'তা ঠিক। তুমি নাকি কী বলবে আমাকে?'

আব্দুল মজিদ বিনয়ে প্রায় ছোট হয়ে গিয়ে বলল, মেয়ের বিয়েতো ভাইজান একটু অসুবিধার মধ্যে পড়ে গেছি। তিন চারটা বিল আটকা। আপনার টাকাটা যদি পেতাম খুবই ভাল হত।

মবিন উদ্দিন মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বছর চারেক আগে দোকান কেনার সময় তিনি আব্দুল মজিদের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। এই ধার শোধ করতে পারেন নি।

'আপনাকে বলতেও লজ্জা লাগছে। কী যে অসুবিধায় পড়েছি। এতদিন ধরে কনট্রাকদারী করছি এমন অসুবিধায় পড়ি নি। আগামী বুধবার নাগাদ কি টাকাটা পাওয়া যাবে ভাইজান ?'

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। আব্দুল মজিদ বলল, আপাতত আপনি টাকাটা দেন পরে প্রয়োজন বোধে আবার নিবেন। আমার কোন উপায় নেই ভাইজান টাকার ব্যবস্থা আপনাকে করাই লাগবে।

মবিন উদ্দিন নিজের অজান্তেই বললেন, আচ্ছা।

আব্দুল মজিদ বলল, রাহেলার কাছে শুনেছি একটা ছেলে নাকি আপনার বাড়িতে ঢুকে পরেছে। দরকার মনে করলে আমাকে বলবেন— শুয়োরের বাচ্চাকে মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব। ফাজলামির জায়গা পায় না।

'শুধু শুধু তাকে মেরে তক্তা বানাবে কেন ? এটা কি ধরনের কথা।'

'ঝামেলা করলে একটু বলবেন। না মেরেও অনেক কিছু করা যায়।'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব।'

'ঠিক আছে ভাইজান। অসুবিধা হলে আমাকে খবর দিবেন। আর ভাইজান বুধবারে টাকাটার জন্য আমি নিজেই আসব। সন্ধ্যার দিকে আসব। গরজটা আমার। আপনার কাছে চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। না চেয়েও উপায় নেই।'

মবিন উদ্দিন খুবই মন খারাপ করে ফিরলেন। খালি হাতে ফিরলেন না, আব্দুল মজিদ পুকুর থেকে মারা দুটা সিলভার কার্প মাছ সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।

৪

মাগরিবের নামাজ শেষ করে মবিন উদ্দিন শোবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। আজো ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। ঘর অন্ধকার মেঝেতে হারিকেন জ্বলছে। সুরমা বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে ঢুকলেন। মবিন উদ্দিন বললেন, মুড়ি খাব না।

সুরমা বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে ? তখন থেকে চুপচাপ বসে আছ।

মবিন উদ্দিন জবাব দিলেন না। সুরমা বললেন, বোনের বাড়িতে কী হল বল। বকুলের বিয়ে নিয়ে নতুন কোন কথা হয়েছে ?

'না।'

'ওরা খুব খুশি না ?'

'হুঁ।'

'এ রকম মুখ শুকনা করে বসে আছে কেন ? ব্যাপারটা কী বলতো ?'

'কোন ব্যাপার না। এমনি ভাল লাগছে না।'

www.BDeBooks.Com

'রাহেলা কি তোমাকে কিছু বলেছে!'

'না সে আর কী বলবে।'

'মনে হচ্ছে তুমি কোন কিছু নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তা করছ ? কী নিয়ে দুঃশ্চিন্তা'

'কোন কিছু নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না। এমনি শরীরটা ভাল লাগছে না। আচ্ছা সুরমা শোন— ম্যাজিশিয়ান ছেলেটাকে এখন চলে যেতে বললে কেমন হয় ?'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ওকে চলে যেতে বলবে কেন ?

'অনেক দিনতো হয়ে গেল। এখন সে তার ঘর বাড়িতে যাক।'

'তার কি ঘর বাড়ি আছে না-কি যে সে যাবে। যাবেটা কোথায় ?'

'আগে যেখানে ছিল সেখানে যাবে। সারা জীবনতো আর আমরা একটা মানুষকে পালবো না। তাই না।'

'তুমিতো খুবই আজগুবি কথা বলছ। একটা অসহায় ছেলে— যাবার জায়গা নেই। সে তোমার কয়টা ভাত খাচ্ছে ? তুমি কি তাকে পোলাও কোর্মা খাওয়াচ্ছো ?'

'না তা না।'

'তা না তাহলে কী ? ওকে নিয়ে তোমার সমস্যাটা কী ?'

'বাইরের একটা ছেলে ঘরে পড়ে আছে। লোকজন নানান কথা বলাবলি করে।'

'সেই লোকজনটা কে ? তোমার বোন ?'

'হ্যাঁ, সে বলেছিল।'

'কী বলছিল ওকে বিদায় করে দিতে ?'

'হুঁ।'

'আমার সংসারে কে থাকবে না থাকবেন সেটা আমি দেখব। তারে সংসারে নিয়েতো আমি চিন্তা করি না। সে কেন আমার সংসারে নিয়ে মাথা ঘামাবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি টুনুর ঘরটা ওকে খুলে দিয়েছি। এখন থেকে এই ঘরেই সে থাকবে।'

মবিন উদ্দিন স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। টুনুর মৃত্যুর পর তার ঘর তালাবন্ধ ছিল। সুরমা বলেছিলেন, তিনি কোনদিন এই ঘরের তালা খুলবেন না। এই ঘরের তালা সারজীবন বন্ধ থাকবে। সেই তালা খোলা হয়েছে।

মবিন উদ্দিন বললেন, ছেলেটাকে তুমি খুব পছন্দ কর ?

'হ্যাঁ করি, তাতে অসুবিধা কী! একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে পছন্দ করতে পারে না ?'

'আগে যে বলতে ছেলেটা মানুষ না। জ্বীন এখন আর তা বল না।'

'কী ধরনের কথা তোমার, শুধু শুধু একটা ছেলেকে আমি জ্বীন বলব কেন ? আমার কি মাথাটা খারাপ হয়েছে।'

'না, তোমার মাথা ঠিকই আছে।'

সুরমা বললেন, আমার সঙ্গে এসো একটা জিনিস দেখে যাও।

'কী দেখব?'

'সুপ্তি ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার ঘর কী সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখে যাও। আমি ঘরে ঢুকে অবাকই হয়েছি। মন লাগিয়ে কাজ করলে সুপ্তি ঘরের কাজ ভাল করে। এসো দেখে যাও।'

'এখন না। পরে দেখব।'

সুপ্তির হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তার মনে খুব আনন্দ। এত আনন্দ ভাল না। যত আনন্দ তত দুঃখ। এই জন্যেই যাদের জীবনে আনন্দের ভাগ কম তাদের জীবনে দুঃখও কম। এটাও বোধ হয় ঠিক না, তাঁর জীবনে আনন্দ নেই বললেই হয় অথচ দুঃখতো তাই বলে কম তাতো না। বুধবারের মধ্যে এক লক্ষ টাকা জোগাড় করতে হবে। কোথায় পাবেন এত টাকা?

সুপ্তি হাসছে মবিন উদ্দিন মেয়ের হাসি শুনছেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটাকে বিদায় করে দিলে তার এই মেয়েটা সবচেয়ে কষ্ট পাবে। তাঁর এই মেয়েটা দুঃখী। তার দুঃখের কোন সীমা নেই। অন্য কেউ তা জানুক বা না জানুক, তিনি জানেন। তার এই মেয়েটা যখন গভীর আনন্দ নিয়ে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার সঙ্গে কথা বলে তখন তাঁর ভাল লাগে। আহা মেয়েটা আনন্দে থাকুক। আনন্দ মেয়েটার জন্যে খুব দরকার।

সুপ্তির সঙ্গে টুনুর ভাবটা সবচেয়ে বেশি। সে বিকট একটা চিৎকার দেবে, "ম্যাজিক ভাইয়া, ও ম্যাজিক ভাইয়া।"

ম্যাজিক ভাইয়া ঘর থেকে হাসি মুখে বের হবে। সুপ্তি তাকে দেখে হড়বড় করে বলবে, "আজ স্কুলে কী হয়েছে শুনে যান। শুনলে আপনার দম বন্ধ হয়ে যাবে। দারুণ একটা ঘটনা ঘটেছে। জিয়োগ্রাফি মিসের কথা আপনাকে বলেছি না খুব রাগী। আমাদের হেড মিসট্রেস আপা পর্যন্ত তাঁকে ভয় পান। এই মিস আজকে চেয়ার ভেঙে হুড়মুড় করে পড়ে গেছেন। আমাদের হাসি আসছে কিন্তু আমরা হাসতে পারছি না। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। তখন কী হল জানেন? কেউ হাসল না। আমাদের ফার্স্ট গার্ল সাদেকা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ফেলল, সেই হাসি আর থামেই না। জিয়োগ্রাফি আপা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তিনি চিন্তাও করতে পারেন নি সাদেকা হাসতে পারে। এই হল সুপ্তির রোজকার রুটিন। প্রতিদিনই তাদের স্কুলে মজার মজার কিছু ঘটছে। স্কুল থেকে ফিরেই সেই সব মজার ঘটনা ম্যাজিক ভাইয়াকে না শোনানো পর্যন্ত সুপ্তির শান্তি নেই।

আগে সুপ্তিকে পড়াতেন মবিন উদ্দিন। সুপ্তি গালে হাত দিয়ে চেয়ারে বসে থাকতেন— মবিন উদ্দিন তার বইগুলো পড়তেন। একবার দুবার তিনবার। সুপ্তি তৃতীয়বারে সময় বলতো, বাবা আর লাগবে না হয়েছে। এখন তুমি আমার হাতের লেখা দেখ। হাতের লেখাগুলো কি এখনো বড় বড়? এরচেয়ে ছোটতো করতে পারি না। এরচেয়ে ছোট করলে কেউ পড়তে পারবে না।

www.BDeBooks.Com

এখন সুপ্তির পড়ার ধরন বদলেছে। মবিন উদ্দিনের স্থান নিয়েছে ম্যাজিশিয়ান। সে পড়ে, সুপ্তি গালে হাত দিয়ে শোনে। এবং পড়ার মাঝখানে বলে, থুক্কু। আবার পড়েন। আমি আসলে আপনার পড়া শুনছিলাম না। অন্য কিছু ভাবছিলাম।

'কী ভাবছিলে ?'

'তা বলা যাবে না।'

'বলা যাবে না কেন ?'

'বলা যাবে না কারণ আমি যদি বলি তাহলে আপনার একটু মন খারাপ হবে। আমি আপনার মন খারাপ করতে চাই না। শুধু আপনার কেন কারোরই মন খারাপ করতে চাই না।'

'তুমি বল— আমার মন খারাপ হবে না।'

'ম্যাজিক ভাইয়া, আমি যদিও খুব হাসি-খুশি থাকি তারপরেও আমার কিন্তু সারাক্ষণ মন খারাপ থাকে। ভয়ঙ্কর মন খারাপ থাকে। প্রতিরাতে ঘুমুবার আগে আমি কাঁদি।

'ও আচ্ছা।'

'কেন কাঁদি জানেন ? কাঁদি কারণ আমার অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। হাজার চেষ্টা করেও পারি না। আমাদের ক্লাসে একটা মেয়ে আছে— হিন্দু মেয়ে, নাম অর্চনা সবাই বলে সে না-কি পরীর মত সুন্দর। আরেকটা মেয়ে আছে নাম কামরুননেসা সবাই আড়ালে কামরুনেসাকে ডাকে মিকি মাউস। তার চেহারা-না কি ইঁদুরের মত। আমি ওদের দু'জনের মুখের উপর হাত বুলিয়েছি দু'জনকে আমার একই রকম লেগেছে।'

'সব মানুষতো এক রকমই।'

'মোটেই এক রকম না, কেউ সুন্দর কেউ অসুন্দর। সেই সুন্দর অসুন্দরটাই বুঝতে পারি না। আমার খুব কষ্ট হয়। কেউ কালো, কেউ ফর্সা। কালো ফর্সা কী ? আচ্ছা থাক অনেক বক বক করলাম, এখন পড়া শুরু করুন। পড়া শুরু করার আগে বলুন— আপনাকে যেসব কথা বললাম, সেসব কথা কখনো বাবা বা মা'কে বলবেন না।'

'বলব না।'

'এইভাবে বললে হবে না। বিদ্যা ছুঁয়ে বলুন। জ্যামিতি বইটা ছুঁয়ে বলুন।'

'জ্যামিতি বই ছুঁয়ে শপথ করলে কী হবে ?'

'আপনার আর জ্যামিতি শেখা হবে না। ত্রিভুজের দুটি বাহু আর তাদের অন্তঃস্থ কোণ সমান হলে যে ত্রিভুজ দুটা সমান হয় এই সাধারণ ব্যাপারটাও আপনি জানবেন না।'

'আচ্ছা যাও শপথ করলাম।'

পড়াশোনার শেষে টুনুকে ম্যাজিক দেখাতে হয়। রোজ একটা না একটা দেখাতে হবেই। ম্যাজিকগুলো খুব সুন্দর আবার খুবই সহজ। তারচেয়েও বড়

কথা চোখে না দেখেও সুপ্তি ম্যাজিকগুলি বুঝতে পারে। ম্যাজিক দেখানোর জন্যে ম্যাজিশিয়ানের কিছুই লাগে না। সে সুপ্তিকে বলবে, দেখি তোমার বল পয়েন্ট কলমটা হাতে শক্ত করে ধরে থাক। সুপ্তি ধরে থাকল।

'এবার কলমটার দিকে তাকিয়ে থাক। দৃষ্টি পুরোপুরি কলমটার উপর। অন্য কোন দিকে তাকাবে না। আড় চোখেও না।'

'আমার তাকানো না তাকানোয় তো কিছু যাচ্ছে আসে না। আমি তো কিছু দেখছি না।'

'তবু তাকিয়ে থাক।'

সুপ্তি তাকিয়ে থাকল।

'চোখের পাতা ফেলবে না।'

'পাতা ফেললে কী হবে?'

'ম্যাজিক হবে না।'

সুপ্তি তাকিয়ে থাকে। পাতা না ফেলার জন্যে চোখে পানি জমতে শুরু করে এবং তখন মনে হয় হাতের ভেতরই কলমটা যেন বদলে যাচ্ছে। কোন অদ্ভুত উপায়ে যেন জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। জিনিসটা যেন হাতের ভেতর ছটফট করছে। ভয় পেয়ে কলমটা ফেলে দিয়ে সুপ্তি বিস্মিত হয়ে বলে, এটা আপনি কীভাবে করেন?

সে হাসে। সুপ্তি বলে, না হাসলে হবে না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই আপনি শুধু হাসেন। হাসি বন্ধ আপনকে বলতে হবে।

'এই ধরনের ম্যাজিক খুবই সহজ। ইচ্ছা করলে তুমিও পারবে।'

'তাহলে আমাকে শিখিয়ে দিন। আমি স্কুলে বন্ধুদের দেখাব। ওদের আক্কেল গুড়ুম করে দেব।'

সে গম্ভীর হয়ে বলে, আচ্ছা শেখাব।

'কবে শেখাবেন বলুন। তাড়াতাড়ি শেখাতে হবে। নয়তো একদিন দেখবেন ম্যাজিক শেখার আগেই আমি ফট করে মরে গেছি।'

'মরে যাবে কেন?'

'ও আচ্ছা আপনাকে বলা হয় নি— আমি বেশিদিন বাঁচব না।'

'সেটা কী করে জান?'

'খুব ভাল করে জানি। কোন একদিন আমি ফট করে মরে যাব। কীভাবে মরবো তাও জানি।'

'কীভাবে মরবে?'

'পুকুরে ডুবে। আমাদের নানার বাড়িতে বিরাট একটা পুকুর আছে। পুকুরটার চারদিকে নারকেল গাছ। খুব গভীর পুকুর। কোন একদিন নানার বাড়িতে যাব। সারাদিন মনের আনন্দে পুকুরের চারদিকে হাঁটব। তারপর...

'তাপর কী?'

'তারপর ঝপাং।'

'ঝপাং মানে?'

www.BDeBooks.Com

'আমি লাফ দিয়ে পুকুরে পড়ে যাব। আর উঠব না। কারণ আমি সাঁতার জানি না।'

'এইটা তুমি ঠিক করে রেখেছ?'

'হুঁ। অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। শুধু একজনকে বলেছিলাম, ভাইয়াকে। আর এখন বললাম আপনাকে, আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করেন নি। তাই না?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলল না। সুপ্তি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভাইয়াও বিশ্বাস করে নি। ভাইয়ার সঙ্গে আসলেই আপনার অনেক মিল। বিশ্বাস না করলে নাই। এসব আলাপ করতে ভাল লাগছে না। অন্য কোনো আলাপ করুন। আচ্ছা বলুন তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান কে ছিলেন? আপনার কি ধারণা পিসি সরকার? হয় নি। মারলীন। ইংল্যান্ডের রাজা কিং আর্থারের সভাতে উনি ছিলেন একজন সভাসদ। তাঁর মতো বড় ম্যাজিশিয়ান এই পৃথিবীতে হয় নি কোনোদিন হবেও না।

'তোমাকে কে বলেছে?'

'আমাদের জিয়োগ্রাফি ম্যাডাম। উনি যেমন রাগী তেমনই জ্ঞানী।'

'আমরা ধারণা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ান হল গাছ।'

'গাছ?'

'হ্যাঁ গাছের মতো ম্যাজিক আর কেউ জানে না। এদের ম্যাজিক তুলনাহীন।'

'বাবা যে বলে আপনার মাথা খারাপ, ঠিকই বলে। আপনার মাথা পুরোপুরি মাসকান্দা।'

'মাসকান্দা মানে কী খুব বেশি মাথা খারাপ?'

'হুঁ। মাসকান্দা মানে হল চিকিৎসার অতীত মাথা খারাপ। দিনকান্দা মানে— চিকিৎসা করলে সারব। মাথা খারাপ হোক আর যাই হোক আপনাকে আমি কিন্তু খুব পছন্দ করি। এটা কি আপনি জানেন?'

'জানি।'

'কতটা পছন্দ করি তা-কি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ তাও জানি।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করন। করেন না?'

'হ্যাঁ করি।'

'কতটুক পছন্দ করেন?'

'আমার পছন্দের ধরনটা আবার অন্য রকম, আমি সব মানুষকেই একই রকম পছন্দ করি।'

'তার মানে কি আমাকে যতটা পছন্দ করেন রাস্তার একটা ফকিরণীকেও ততটা পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এ রকম কেন ?'

'আমি এরকম কারণ আমি ঠিক মানুষ না।'

'মানুষ না তাহলে আপনি কি ?'

'আমি আসলে গাছ। এই পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা আসলে মানুষ না গাছ। তাদের জীবন-যাপন প্রাণালী মানুষের মতো তবে...

'তবে কী ?'

'থাক তুমি বুঝবে না।'

'আমি ঠিকই বুঝেছি আপনি একজন ফোর্টি নাইন প্লাস ফোর্টি নাইন। ডাবল ফোর্টি নাইন।'

সুপ্তি খিলখিল করে হাসছে। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটিও হাসছে। সুপ্তি হাসি থামিয়ে বলল,

'আপনি ভাইয়ার মতই ডাবল ফোর্টি নাইন।'

'সেইও কি বলত সে গাছ ?'

'না তা বলত না। তবে সারাক্ষণ হাসলে লোকে পাগল বলবে না ? একবার কি হয়েছে শুনুন, বাবা রাগ করে ঠাশ করে তার গালে চড় মেরেছে। সে চড় খেয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছে। কেন বলুন তো ?'

'বলতে পারছি না।'

'কারণ— চড়ের শব্দ হল—, 'ঠাশ'। কিন্তু বাবার চড়ের শব্দটা না-কি ছিল ধরাম। দরাজ বন্ধ করার মতো শব্দ। এই জন্যে হাসছিল।'

'তোমার ভাইয়া তো খুব মজার মানুষ ছিলেন।'

'মোটেই মজার মানুষ ছিল না। ভাইয়া ছিল— ডাবল ফোর্টি নাইন। মাসকান্দা টাইপ।'

ম্যাজিশিয়ান সুপ্তির দিকে তাকিয়ে আছে। সুপ্তি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আচ্ছা বাদ দিনতো এই নিয়ে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলুন। আচ্ছা আমি একটা ছড়া বলছি মন দিয়ে ছড়াটা শুনুন—

"গুণধর ছেলে সে মায়ের আদর
খেলতো না, হাসতো না, নামটি সাগর
তনু তার কৃশকায় মুখটি করুণ।
ছেলেটি কী খেত —আপনি বলুন।"

'কী বলতে পারবেন, সাগর নামের ছেলেটা কী খেত ?'

'না,বলতে পাছি না।'

'ছড়ার প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষরটা আলাদা করুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন সাগরের প্রিয় খাদ্য কী ? হি হি হি।'

সুপ্তি হাসছে। ম্যাজিশিয়ান তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আজ বুধবার। মবিন উদ্দিন তাঁর দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন। দুই লাখ দশ হাজার টাকা পেয়েছেন। তাড়াহুড়া করে বিক্রি করতে হল। খোঁজ-খবর করে

www.BDeBooks.Com

বিক্রি করতে পারলে হয়তো আরো বেশি পেতেন। পুরো ব্যাপারটা করতে হয়েছে গোপনে। সুরমা সুপ্তি কেউ জানে না। ইচ্ছে করেই জানান নি। তারা খুব মন খারাপ করতো। বিক্রি না করে উপায়ও ছিল না। বুধবার সন্ধ্যায় আব্দুল মজিদ চলে আসবে। ভদ্র এবং বিনয়ী গলায় বলবে, ভাইজান টাকাটা। আপনাকে তো বলেছিলাম খুব দরকার।

মবিন উদ্দিন জানেন টাকার তার কোন দরকার নেই। মেয়ে বিয়ের অজুহাত তৈরি হয়েছে। অনেক দিন পর চাপ দেবার সুযোগ পাওয়া গেছে। আব্দুল মজিদ কখনোই কোন সুযোগ ছাড়ে না। এই সুযোগ কেন ছাড়বে ? তাঁর উচিত ছিল টাকাটা দিয়ে দেয়া। তিনি পারেন নি। এখনো পারছেন না। কিন্তু এখন আর গত্যন্তর ছিল না।

কেউ দোকান বিক্রির খবর জানে না। কিন্তু মবিন উদ্দিনের ধারণা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা জানে। খুব ভাল করেই জানে। সকালে তিনি দলিল রেজিস্ট্রির জন্যে যাচ্ছেন সে বলল, কোথায় যান ?

তিনি বললেন, দোকানে।

এটা মিথ্যা কথা। তিনি যাচ্ছিলেন— সাব-রোজিস্ট্রার অফিসে। ছেলেটা কেমন করে জানি হাসল। তার পর বলল, আমি সঙ্গে আসব ?

তিনি বললেন, না।

সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হত। এতগুলো টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা। আজকাল এক দুইশ টাকার জন্যে মানুষ খুন হয়। তার সঙ্গে থাকবে দুই লাখ দশ হাজার টাকা।

তিনি কাউকে সঙ্গে নিলেন না। একাই সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে গেলেন। দোকান বিক্রি করলেন। অনেক সখ করে দোকান দিয়েছিলেন। সুখে-দুঃখে এই দোকান তাঁর সঙ্গী ছিল। শোরুমের পিছনে ছোট্ট ঘরটায় চৌকি পাতা। চৌকিতে বিছানা। মাঝে মাঝে তিনি রাতে দোকানে এসে ঘুমাতেন। সুরমার সঙ্গে রাগারাগি করে দোকানে চলে যেতেন। অনেক রাতে টুনু টর্চ লাইট নিয়ে আসত। গম্ভীর গলায় বলতো, বাবা ঘরে চল। তিনি কথা বাড়াতেন না। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতেন। বেচারা এতদূর একা একা এসেছে তাঁর রাগ করে ঘুমুতে আসার ঘরটা আর থাকল না। সুরমাকে ব্যাপারটা কিভাবে বলবেন বুঝতে পারছেন না। পরামর্শ করার একজন কেউ থাকলে ভাল হত।

ছেলেটা যদি বেঁচে থাকত। টুনু বেঁচে থাকলে তাঁর কোন সমস্যাই হত না। তিনি গম্ভীর ভঙ্গিতে ছেলেকে বলতেন— নেরে ব্যাটা, বিরাট সমস্যায় পড়েছি। দোকান বিক্রি করে দিয়েছি। এই নে এখানে দু'লাখ দশ হাজার টাকা আছে। তোর ফুপা সন্ধ্যাবেলা আসবে তাকে এক লাখ টাকা দিবি। বাকি টাকায় কী করবি না করবি তুই দেখ। সংসার চালাতে হবে। কীভাবে চালাবি তুই জানিস। আমি অবসর নিলাম। পাঁচটা টাকা দে চায়ের স্টল থেকে চা খেয়ে আসি। চায়ের স্টলের মজাই অন্যরকম।

সকাল এগারোটার মধ্যেই দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। তিনি পাঞ্জাবি পকেটে টাকা নিয়ে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছা

করছে না। ইচ্ছে করছে শহরের পথে পথে হাঁটতে। এতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে পথে পথে হাঁটা সম্ভব না। তিনি ঠিক করলেন তার দোকানে যাবেন। তার পুরানো ঘরে দুপুরটা শুয়ে থাকবেন।

শেষবারের মতে শুয়ে থাকা। বিকেলে বাড়ি ফিরবেন। আব্দুল মজিদকে টাকাটা দিয়ে দেবার পর সুরমাকে সব খুলে বলবেন। বিউটি বুকের নতুন মালিক। শেষবারের মতো তাঁকে কিছুক্ষণ তাঁর পুরানো জায়গায় শুয়ে থাকতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। বাড়ি ফেরার পথে নিধু সাহার কাপড়ের দোকান থেকে সুপ্তির জন্যে একটা শাড়ি কিনে ফেলবেন। মেয়েটার শাড়ির শখ। জীবনের প্রথম শাড়ি পড়া মেয়েদের জন্যে বিরাট একটা ঘটনা। সেই ঘটনাটা আজ রাতেই ঘটুক। দুঃখের দিনেও তো দু'একটা আনন্দময় ঘটনা ঘটতে পারে।

সুপ্তিদের স্কুল দু'টার সময় ছুটি হয়। মবিন উদ্দিন স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েকে নিয়ে রিকশায় করে বাড়িতে ফেরেন। দিন দশেক হল, রিকশায় করে ফিরছেন না— হেঁটে ফিরছেন। সুপ্তিকে বলেছেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একসারসাইজ হচ্ছে হাঁটা। যারা দিনে এক ঘণ্টা হাঁটে তাদের কোন অসুখ বিসুখ হয় না। ফকিরণীদের দেখ— খেতে পায় না বললেই হয় এদের স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ না। অসুখ বিসুখও কম হয়। ঠিক বলছি না ?

সুপ্তি হাসি চাপতে চাপতে বলল, ঠিক বলছ।

'কাজেই আমি ঠিক করেছি তোকে হেঁটে স্কুলে আনব। আবার আমরা ফেরত যাব হাঁটতে হাঁটতে। ঠিক আছে রে মা ?'

'ঠিক আছে।'

'হাঁটতে কষ্ট হবে না-তো ?'

'মোটেই কষ্ট হবে না।'

সুপ্তির হাঁটতে কষ্টতো হয়ই না বরং ভাল লাগে। রাস্তাঘাট চেনা হয়ে যায়। স্কুল গেট থেকে কিছুদূর গেলেই চামড়ার গন্ধ পাওয়া যায়। তার মানে বড় রাস্তা এসে পড়েছে। বড় রাস্তায় ঢোকার মুখেই স্যুটকেসের দোকান। চামড়ার গন্ধ আসে স্যুটকেসের দোকান থেকে। দোকানটাকে বাঁদিকে রেখে তারা এগুতে থাকে। যখন ভক করে নাকে মুখে তীব্র পচা গন্ধ ঢোকে তখন রাস্তা ক্রস করে ঐ পারে যেতে হয়। তীব্র গন্ধটা আসে ডাস্টবিন থেকে। রাস্তা পার হবার পর অল্প একটু যাবার পর গলিতে ঢুকতে হয়। গলিটা চেনাও সহজ। গলিটার মুখেই চায়ের দোকান। চা বানানোর টুং টাং শব্দ আসে— চা পাতার মিষ্টি গন্ধ আসে।

মবিন উদ্দিন বলেন, হাত ধরে হাঁট মা। হাত না ধরে হাঁটছিস কীভাবে।

সুপ্তি বলে, তুমি আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না তো বাবা। তুমি আমার আগে আগে যাও। আমি তোমার পেছনে আসছি। কোন সমস্যা নেই।

'এখানে একটা ম্যানহোল আছে।'

www.BDeBooks.Com

'আমি জানি ম্যানহোল আছে। ম্যানহোল থেকে গন্ধ আসছে— আমি গন্ধ পাচ্ছি।'

'বাবার হাত ধরতে অসুবিধা কী ?'

'কোন অসুবিধা নেই আমি একা একা যেতে চাচ্ছি।'

'তুই বড়ই আশ্চর্য মেয়ে।'

'তুমিও বড়ই আশ্চর্য বাবা।'

আজ সুপ্তির স্কুল ছুটি হয়ে গেলে বারোটায়। এটা এমন কোন সমস্যা না। দু'ঘণ্টা বসে থাকলেই বাবা চলে আসবেন। কিংবা সে যদি হেডমিসট্রেস আপাকে বলে, তাহলে আপা তাকে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। দপ্তরিকে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। কিংবা আপনারা কেউ বাড়ি যাবার পথে তাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন এ রকম আগেও হয়েছে। সুপ্তি আধাঘণ্টার মত ক্লাসেই বসে রইল। মেয়েরা সব চলে গেছে ক্লাস ফাঁকা। হঠাৎ তার মনে হল— একা একা বাড়ির দিকে রওনা হলে কেমন হয় ? সে নিশ্চিত যে যেতে পারবে তার কোন সমস্যাই হবে না। এবং তারতো এটাই করা উচিত। সারা জীবন কি কেউ তাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটবে। রাস্তা পার করিয়ে দেবে ?

সুপ্তি স্কুল গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। তার একটু ভয় ভয় লাগছে যদিও সে জানে ভয়ের কিছুই নেই। ভয় পেলেই ভয়। জিয়োগ্রাফি আপা প্রায়ই বলেন— "বনের বাঘে খায় না। মনের বাঘে খায়।" আসল বাঘের চেয়ে মনের ভেতরে যে বাঘ বাস করে সেই বাঘ অনেক অনেক অনেক ভয়ঙ্কর।

সুপ্তি কোন রকম সমস্যা ছাড়া বড় রাস্তায় এল। রাস্তা পার হল। চায়ের দোকান পার হয়ে গলিতে ঢুকে পড়ল এই সময় একটা সমস্যা— হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে কে একজন তার গায়ে উঠে পড়ল। সুপ্তির হাত থেকে বইখাতা ছিটকে পড়ে গেল। সাইকেলওয়ালাও তার সঙ্গে পড়ে গিয়েছে এবং সে মনে হয় ভালই ব্যথা পেয়েছে। সুপ্তি উঠে পড়েছে নিজে নিজে, কিন্তু সাইকেলওয়ালাকে লোকজন ধরে তুলল। সে রাগী গলায় বলল, দেখেশুনে চলতে পার না। তুমি কি অন্ধ। দেখতেছে সাইকেল নিয়ে আসছি। তারপরও সরে না।

সুপ্তি বলল, আপনি হর্ণ দেন নি কেন ?

'হর্ণ দেব কেন ? তুমি চোখে দেখ না ? চোখ নাই ?'

সুপ্তি প্রায় বলেই ফেলেছিল তার চোখ আছে কিন্তু সে দেখতে পায় নি। সুপ্তি বলল না। কারণ হঠাৎ তার মনে প্রচণ্ড একটা ভয় ঢুকে গেছে। সে দিক ঠিক করতে পারছে না। সে কোন দিকে যাবে। সোজা যাবে, না পেছন দিকে যাবে ? তার এরকম হল কেন ? আশেপাশে কোথাও একটা সাইকেল পার্টস এর দোকান থাকার কথা। সেটা কোন দিকে ?

হাতের ছিটকে পড়া বইগুলো তোলা দরকার। বইগুলো কোথায় পড়েছে ? জ্যামিতি বক্সের আশেপাশে ? জ্যামিতি বাক্স কোথায় পড়েছে সে জানে। পড়ার শব্দ শুনেছে। বইগুলোও শব্দ করেই পড়েছে। তবে অনেকগুলো বই। বই পড়ে

দশজন– ৪৬

যাবার শব্দ একরকম। জ্যামিতি বাক্সের শব্দ আলাদা। সুপ্তি নিচু হয়ে জ্যামিতি বাক্স তুলল। বই তোলার জন্যে এদিক ওদিক হাত দিচ্ছে ওমনি একজন বলল, এই মেয়ে আন্ধা। সুপ্তির শরীর শক্ত হয়ে গেল। বই না তুলেই সে উঠে দাঁড়াল। সুপ্তি লক্ষ্য করল অনেকদিন পর তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে এতগুলো লোকের সামনে কেঁদে ফেললে সমস্যা হবে। মনে হচ্ছে সত্যি চোখে পানি এসে যাবে। যে করেই হোক চোখের পানি আটকাতে হবে।

'ও আল্লা সত্যি চক্ষে দেখে না। এই তুমি একলা কই রওনা হইছ। তোমার বাড়ি কোনখানে?'

সুপ্তি বাসায় ফিরল রিকশা করে। যে ছেলে সাইকেলে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়েছে সে সাইকেলে করে তার পেছনে পেছনে এসেছে। খুবই বিরক্তিকর ছেলে। পেছন থেকে সারাক্ষণ কথা বলছে—

'কী নাম তোমার?'

'সুপ্তি।'

'তুমি আমার উপর খুব রাগ করেছ তাই না?'

'না।'

'আমি জানি রাগ করেছ। আমি আসলেই বুঝতে পারি নি।'

'আমি রাগ করি নি।'

'তুমি কি সব সময় এ রকম একা একা চলাফেরা কর। এটাতো ঠিক না।'

'আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন? আপনি চলে যান।'

'তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'পৌঁছতে হবে না।'

'পৌঁছাতে হবে কি হবে না, সেটা আমি বুঝব। সুপ্তি শোন আমার নাম জহির। আমি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

'নেত্রকোনায় আমার দাদার বাড়ি। দাদা অসুস্থ উনাকে দেখতে এসেছিলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ?'

'আমি তো আপনাকে বললাম রাগ করি নি। আমাদের বাড়ি চলে এসেছি। সামনের টিনের বাড়িটা আমাদের আপনি এখন যান।'

'তুমিতো চোখে দেখতে পাও না। তুমি বুঝলে কী করে সামনের বাড়িটা তোমাদের?'

'আমি অনুমানে অনেক কিছু বুঝতে পারি।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি চোখে দেখ না?'

'না।'

'আমার নামটা তোমার কি মনে আছে— জহির।'

www.BDeBooks.Com

'আপনার নাম মনে রেখে কী হবে ?'

বলেই সুপ্তি ঘরে রিকশা থেকে নামল। রিকশা ভাড়া দেবার সময় পেল না, জহির দিয়ে দিল। সুপ্তি বলল, আপনি এখন চলে যান। অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছেন। আর করবেন না। সুপ্তি ঘরে ঢোকার পরেও জহির কিছু সময় লজ্জিত মুখে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

দুপুরে ম্যাজিশিয়ান ভাত খাচ্ছে আর সুপ্তি খুব আগ্রহ করে বলছে আজ সে কী করে একা একা হেঁটে চলে এসেছে। পথে সামান্য সমস্যা হয়েছিল তবে সেই সমস্যা সামাল দেয়া গেছে। ম্যাজিশিয়ান বলল, একা একা আসতে পেরে তুমি খুব খুশি ?

সুপ্তি বলল, হ্যাঁ খুশি। আমি অন্যসব মানুষের মতো চলাফেরা করতে চাই। কেউ যেন কোনদিন বুঝতে না পারে যে আমার কোন সমস্যা আছে।

ম্যাজিশিয়ান বলল, তা তুমি করতে পারবে।

'কী করে বললেন ?'

'আমি অনেক কিছু বলতে পারি।'

সুপ্তি হাসতে হাসতে বলল, আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন কী জন্যে ? আপনি মানুষ না আপনি গাছ এই জন্যে ?'

'তোমার বিশ্বাস হয় না, তাই না ?'

'না হয় না, কারণ আমি তো আর গাছ না, আমি মানুষ। মানুষদের অনেক বুদ্ধি। তারা চট করে কিছু বিশ্বাস করে না। তার একটা কথা বলি ? আপনি আমাদের মতোই সাধারণ একজন মানুষ। একটাই তফাৎ, আপনি সুন্দর ম্যাজিক জানেন। আমরা জানি না। ম্যাজিক জানলেই মানুষ অন্য রকম হয়ে যায় না।'

'সুপ্তি শোন, আমি কিন্তু আসলেই মানুষ না।'

'সুপ্তি বলল, মানুষ না হলে আপনি কে ?'

'আমি তো আগেও তোমাকে বলেছি। আমি আসলে গাছ।'

সুপ্তি গম্ভীর মুখে বলল, বেশি বেশি গাছ গাছ করবেন না-তো। বেশি বেশি গাছ গাছ করলে আমরা আপনাকে কেটে লাকড়ি বানিয়ে সেই লাকড়ি দিয়ে হয়তো রেঁধে খেয়ে ফেলব।

বলতে বলতে সুপ্তি হেসে গড়িয়ে পড়ল। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা তাকিয়ে আছে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা পড়ছে না। তার বড় বড় চোখ চক চক ঝক ঝক করছে। সেই চোখের দিকে তাকালে বুকের ভেতর হঠাৎ ধ্বক করে একটা ধাক্কা লাগে।

মবিন উদ্দিন বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যার আগে আগে। তার মুখে লজ্জিত ভাব। হাতে কাপড়ের প্যাকেট।

সুরমা বললেন, প্যাকেটে কী ?

মবিনউদ্দিন ইতস্তত করে বললেন, সুপ্তির জন্যে একটা শাড়ি এনেছি। মেয়েটা অনেকদিন থেকে শাড়ি শাড়ি করছিল।

'ভাল করেছ।'

'তোমার জন্যেও একটা শাড়ি কিনেছি। দেখতো রংটা পছন্দ হয় কি-না।'

'ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি। ওকে দিয়ে আস।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বলল, সবার জন্যে কাপড় জামা ব্যাপার কী ?

'কোন ব্যাপার না। কিনলাম।'

'টাকা পেয়েছ কোথায় ?'

'ছিল কিছু। শাড়িটা পছন্দ হয়েছে ?'

সুরমা আনন্দিত গলায় বললেন, খুব পছন্দ হয়েছে।

'অজুর পানি দাও। মাগরেবের নামাজ পড়ব।'

সুরমা অজুর পানি দিতে দিতে বললেন, তুমি যে কবিরাজি ওষুধটা দাও আমার মনে হয় ওষুধটা কাজ করছে। সুপ্তির ব্যথা উঠেছিল অল্প কিছুক্ষণ ছিল। বেশি হলে বড়জোর এক মিনিট। তারপর চলে গেল।

'বল কী এটাতো খুবই আনন্দের খবর।'

'আনন্দের খবরতো বটেই। আমি দশ রাকাত শোকরানা নামাজ পড়েছি।'

'সুপ্তি কোথায় ?'

'বাবলুর সঙ্গে গল্প করছে। ডাকব ?'

'না থাক ডাকার দরকার নেই। শাড়িটা ওকে দাও— পরুক। দেখি মেয়েকে কেমন লাগে। ভাল কথা— আব্দুল মজিদ কি এসেছিল ?'

'না তো। উনার আসার কথা না-কি ?'

'হুঁ। আসলে বসিয়ে গল্প-টল্প কর। আমার নামাজ শেষ হতে দেরি হবে। সারাদিনের নামাজ কাজা হয়েছে।'

মুবিন উদ্দিন অনেকক্ষণ ধরে নামাজ পড়লেন। নামাজে বসেই সুপ্তির আনন্দের চিৎকার শুনে বুঝলেন, তার শাড়ি খুব পছন্দ হয়েছে।

তাঁর নামাজ বোধহয় হচ্ছে না। মন বাইরে চলে যাচ্ছে। আব্দুল মজিদ এসেছে এটাও নামাজে বসে টের পেলেন। তার সেঙ্গে সুপ্তির যে কথাবার্তা হচ্ছে তাও শুনতে পাচ্ছেন।

'ফুপা কেমন আছেন ?'

'খুব ভাল আছি মা।'

'ফুপা দেখেন বাবা আমার জন্যে একটা শাড়ি কিনে এনেছেন। কী সুন্দর রঙ দেখেছেন ? বাবা কখনো ভাল কিছু কিনতে পারে না। এই প্রথম ভাল জিনিস কিনল।'

'রঙটা তো সুন্দর।'

'মা'র শাড়িটা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মা'র শাড়িটা আরো সুন্দর। মজার ব্যাপার কি জানেন ফুপা ? মা'র বেশি পছন্দ আমার শাড়িটা, আবার আমার পছন্দ মা'র শাড়িটা।'

'দু'জনে বলাবদলি করে নাও।'

www.BDeBooks.Com

'উহুঁ তা করব না।'

'ভাইজান কি ঘরে আছেন ?'

'হুঁ আছেন। এই একটু আগে ফিরেছেন। নামাজ পড়ছেন। ফুপা আপনি বসুন। চা দেই।'

'কষ্ট না হলে দাও। ভাল কথা তোমাদের সঙ্গে একটা ছেলে নাকি থাকে ?

'ম্যাজিক দেখায় ?'

'হুঁ থাকে। তার সঙ্গে কথা বলবেন ? ডাকব ?'

'না এখন থাক। পরে কথা বলব। তুমি দেখ ভাইজানের নামাজ শেষ হয়েছে কি-না।'

মুবিন উদ্দিন নামাজ শেষ কর বসার ঘরে গেলেন। আব্দুল মজিদ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এবং যথারীতি কদমবুসি করল। বিনয়ের সঙ্গে আব্দুল মজিদ বলল, ভাইজান ভাল আছেন ?

মুবিন উদ্দিন বললেন, ভাল আছি ? তুমি বোস। তাঁর মাথার ভেতর একটা ধাক্কার মত অনুভব করলেন। তাঁর সমস্ত মাথা ঘুরে উঠল। কানের ডগা ব্যথা করতে লাগল। এবং তিনি অসম্ভব বিস্ময়ের সঙ্গে আব্দুল মজিদের দিকে তাকালেন। কারণ তার মনে হল তিনি আব্দুল মজিদ মনে মনে কী ভাবছে সব বুঝতে পারছেন। এটা কি তাঁর মনের কল্পনা, না তিনি সত্যি বুঝতে পারছেন। মানুষের মনের কথা বুঝতে পারার কোন কারণ নেই। অথচ তিনি যে মনের কথা বুঝতে পারছেন তা সত্যি। এখানে কোন ভুল নেই।

আব্দুল মজিদ মনে মনে ভাবছে— ছাগলা ব্যাটা কি টাকা জোগাড় করেছে। মনে তো হয় না। এদিকে শাড়ি ফাড়ি কিনে হুলুস্থুল। নামাজও পড়ল লম্বা চওড়া। নামাজে কাজ দিবে না। আমাকে চেনে না। অনেক দিন সবুর করেছি এবার ধরলাম। ধরছি যখন ছাড়ব না।

মবিন উদ্দিনের খুবই অস্বস্তি লাগছে। একী কাণ্ড। আব্দুল মজিদ এসব কী ভাবছে। সুপ্তি এসে চা দিয়ে গেল। আব্দুল মজিদ চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, মা চা ভাল বানিয়েছ। অনেক দিন পর ভাল চা খেলাম। তোমার ফুপু রান্না বান্নায় ভাল। চা বানাতে দাও— আর পারবে না। তুমি একদিন গিয়ে তোমার ফুপুকে চা বানানো শিখিয়ে দিও গো মা।

মবিন উদ্দিন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, আব্দুল মজিদ মনে মনে অন্য কথা বলছে। সে বলছে— এটা কী বানিয়েছে ? ধামড়ি মেয়ে চা বানানো শিখেনি। কয়েকটা পাতা দিয়ে পানি গরম করলেই চা হয়ে গেল! এই চা খাওয়া আর চিনি দিয়ে ঘোড়ার পিসাব খাওয়া এক জিনিস।

আব্দুল মজিদ হাসিমুখে তাকাচ্ছে। মাবিন উদ্দিন সেই হাসি দেখে শিউরে উঠলেন। মানুষের ভেতরে এবং বাইরের রূপের এত তফাৎ ? মানুষ এত অদ্ভুত!

'ভাইজান টাকাটার কি জোগাড় হয়েছে ?'

'মবিনউদ্দিন বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

'আপনি আমাকে বাচিয়েছেন ভাইজান। খুব টেনশানে ছিলাম। কী যে ভাল লাগছে। মনে হল ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।'

মুবিন উদ্দিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, আব্দুল মজিদের মনের কাথা সম্পূর্ণ অন্য। আব্দুল মজিদ বলছে— গাধাটা বলে কি টাকা জোগাড় করে ফেলেছে। পেয়েছে কোথায় ? জমিজমা বিক্রি করেছে ? না-কি দোকান বেচে দিয়েছে। দোকান বিক্রি করলে সবার মনটন খারাপ থাকতো। শাড়ি ফাড়ি কিনে আমোদ-ফুর্তি করত না। জমা টাকা ? গাধাটার এত টাকা ছিল ? ইস আগেই টাকাটা নেয়া উচিত ছিল।

'ভাইজানের টাকার জোগাড় করতে কষ্ট হয় নি তো ?'

'না কষ্ট হয় নাই।'

মবিন উদ্দিন বুঝতে পারছেন আব্দুল মজিদ মনে মনে বলছে— আচ্ছা ব্যাটা কি টাকাটা সত্যি জোগাড় করেছে ? না-কি এখনি বলবে, মজিদ টাকাটা একজনের দিয়ে যাবার কথা। এখনো আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক তুমি চলে যাও। আমি কার পরশু নিয়ে আসব। এসব বলে লাভ হবে না। আমি যাচ্ছি না।'

মবিন উদ্দিন বললেন, তুমি একটু বোস আমি টাকাটা নিয়ে আসি।

আব্দুল মজিদ বসে রইল। তার চোখে মুখে বিস্ময়। মবিন উদ্দিন পাঁচশ' টাকার দু'টা বান্ডিল এনে মজিদের হাতে তুলে দিলেন।

'টাকাটা গুণে নাও মজিদ।'

'ছিঃ ছিঃ কী বলেন। আপনি টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা গুণতে হবে না-কি ?

আমি যেমন মানুষ, ফেরেশতা টাকা দিলেও গুণে নেই। তবে আপনার ব্যাপার ভিন্ন। এই জীবনে মানুষ তো কম দেখি নি ভাইজান। কিন্তু আপনার মত দেখি নাই। রাহেলাকে ঐদিন বলছিলাম— তোমার মেয়ের বিয়ের উকিল বাপ করতে হবে ভাইজানকে। তাঁর মত একটা মানুষকে উকিল বাপ পাওয়া খুবই ভাগ্যের ব্যাপার।'

মবিন উদ্দিন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে আব্দুল মজিদ মনে মনে ভাবছে— ব্যাটা তোকে পাম দিয়ে আকাশে তুলে দিলাম। তুই আসলে কী জিনিস সেটা আমি যেমন জানি তুইও জানিস। তুই হলি হাদারাম নাম্বার ওয়ান। একটা টেংরা মাছের মাথায় যে বুদ্ধি তোর বুদ্ধি তার চেয়েও কম।

আবদুল মজিদকে বিদেয় করে মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার ঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ তাঁর মনে প্রচণ্ড একটা সন্দেহ ঢুকেছে। তার মনে হচ্ছে— আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারার ব্যাপারে ম্যাজিশিয়ান ছেলেটির কোন হাত আছে।

মবিন উদ্দিনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবলু কেমন করে যেন হাসল। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল। মবিন উদ্দিন তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

www.BDeBooks.Com

৫

মবিন উদ্দিনের এখন প্রধান কাজ হল— নেত্রকোনা রেল স্টেশনে বসে থাকা। তিনি সকালবেলা নাস্তা খান। খেয়ে খুব তাড়া আছে এমন ভঙ্গিতে বের হয়ে আসেন। দেরি হলে খনিকটা রাগারাগিও করেন— দোকান খুলতে হবে না ? কাস্টমার দু'একটা এসে সকালবেলার দিকেই আসে। তোমাদের নিয়ে তো দেখি যন্ত্রণায় পড়লাম। সামান্য নাশতা দিতেই দুপুর।

দোকান বিক্রির কথা তিনি সুরমাকে এখনও বলেন নি। কীভাবে বলবেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনটা কীভাবে চালাবেন তার পরিকল্পনার জন্যে সময় দরকার। চিন্তা-ভাবনা দরকার। সেই চিন্তা-ভাবনার জন্যেই রেল স্টেশনে আসা।

রেল স্টেশনের উত্তর প্রান্ত নিরিবিলি। বিশাল এক রেন্ট্রি গাছ। যাত্রীদের বসার জন্যে কংক্রিটের বেঞ্চ বানানো আছে। তিনি একটা খবরের কাগজ কেনেন। ধীরে সুস্থে কাগজ পড়েন। সবচেয়ে আগে পড়েন হারানো বিজ্ঞপ্তি। তাঁর ইদানিংকালে মনে হচ্ছে হারানো বিজ্ঞপ্তি পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন দেখবেন ম্যাজিশিয়ানের ছবি ছাপা হয়েছে। তার বাবা-মা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—

সন্ধানপ্রার্থী

> টুনু তুমি যেখানেই থাক ফিরিয়া আস। তোমার মা শয্যাশায়ী। তোমার কনিষ্ঠ ভগ্নির বিবাহ ঠিক হইয়াছে তোমার কোন ভয় নাই ফিরিয়া আসিলে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাস করা হইবে না। অর্থের প্রয়োজন হইলে টেলিগ্রামে জানাও।
>
> ইতি— তোমার পিতা-মাতা।

এখনও এ ধরনের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে নি। কাগজ পড়া শেষ হলে ভাবতে বসেন— কী করা যায় ? যখন ট্রেন আসে ভাবনা চিন্তায় বাধা পড়ে। যাত্রীদের ওঠা-নামা, হৈ চৈ। সেই হৈ চৈ দেখতেও তাঁর ভাল লাগে। কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

সুপ্তি একটু বড় হলে, তার বিয়ে দিয়ে দেয়া যেত। এমনতো না যে অন্ধ মেয়েদের বিয়ে হয় না। সবারই বিয়ে হয়। আল্লাহপাক সবকিছু জোড়া মিলিয়ে পাঠান। প্রতিটি মেয়ে পাখির জন্যে থাকে একটা পুরুষ পাখি তেমনি প্রতিটি মেয়ের জন্যে একজন স্বামী থাকে। আল্লাহপাক নিজেই জোড়া মিলিয়ে দেন। কাজেই সুপ্তির অবশ্যই বিয়ে হবে। সুপ্তির বিয়ে হয়ে গেলে সংসারে মানুষ থাকে মাত্র দু'জন। তিনি আর সুপ্তির মা। তারা দু'জন গ্রামের বাড়িতে চলে যেতে পারেন। গ্রামের বসতবাড়ি ঠিকঠাক কর সেখানে থাকা। জমির কিছু আয় আছে। একটা পুকুর আছে। পুকুরে মাছের চাষ করতে পারেন। জমি বর্গা না দিয়ে নিজেরাই চাষ করবেন। বাবলু আছে— সে সাহায্য করবে...

চিন্তার এই পর্যায়ে মবিন উদ্দিন থমকে যান। বাবলু তাদের সঙ্গে আছে এটাতো ঠিক না। বাবলু কে ? কেউ না। হুট করে যে ভাবে এসেছেল— সেই ভাবেই চলে যাবে। তিনি যদি আজ তাকে যেতে বলেন সে আজই যাবে।

বাবলু ছেলেটার ব্যাপারেও একটা কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। আরো আগেই নেয়া উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। বাবলু চলে গেলে সুপ্তি এবং সুপ্তির মা দু'জনই কষ্ট পাবে। কষ্ট পেলেও কিছু করার নেই। এই সংসারে বাস করতে হলে মাঝেমধ্যে কষ্ট পেতে হয়। সংসারের অনেক নিয়মের একটা নিয়ম হল কষ্ট পাওয়া। শুধু তারা কেন— তিনি নিজেও কষ্ট পাবেন। ছেলেটার উপর তাঁর মমতা পড়ে গেছে। মমতার কারণেই তিনি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাঁর মনে বিচিত্র সব প্রশ্ন আসে, তিনি সব প্রশ্ন চাপা দিয়ে রাখেন। নিজেকে এই বলে বুঝান যে বেশি কৌতূহল ভাল না। অতিরিক্ত কৌতূহলের কারণেই আদম এবং বিবি হাওয়া গন্ধম ফল খেয়েছিলেন। তাঁরা দেখতে চেয়েছেন— ফল খেলে কী হয়। তাদের এই অতিরিক্ত কৌতূহলের ফল তাঁরা হাতে হাতে পেয়েছেন। বেহশ্‌তে থেকে পৃথিবীতে নির্বাসন। কৌতূহলের শাস্তি শুধু যে তাঁরা পেয়েছেন তা না। তিনিও পাচ্ছেন। আদম হাওয়ার কৌতূহল যদি কম থাকতো তাহলে এখন তাঁকে রেল স্টেশনে বসে দুঃশ্চিন্তায় অস্থির হতে হত না। তিনি পরম সুখে বেহেশতে বাস করতেন। ফল-ফ্রুট খেতেন।

রেল স্টেশনে বাসে তিন ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার কথাই বেশি ভাবেন। ব্যাপারটা কী ? সে কে ? তার যে কিছু কিছু ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত। আবার কিছু ব্যাপারে নিশ্চিত না। ছেলেটাকে পুরোপুরি বিদেয় করে দেবার আগে তিনি সেসব ব্যাপার জেনে নেবেন। কী জিজ্ঞেস করবেন কীভাবে করবেন— তিনি সেইসব ব্যাপার ভাবার চেষ্টা করেন। প্রশ্নগুলো গুছিয়ে রাখেন।

তিনি ঠিক করেছেন যাদুকর ছেলেটাকে নিয়ে এক সকালে রেল স্টেশনে আসবেন। তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন তা বাড়ির কাউকে বলবেন না। রেল স্টেশনে এসে এই বেঞ্চিতে বসাবেন এবং নরম গলায় বলবেন— বাবা শোন। তোমাকে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি। তুমি তা ভালই জান— এখন কথা হচ্ছে কী...

বাকিটা বলার দরকার পড়বে না, সেই ছেলে অবশ্যই সব বুঝে ফেলবে। সে নিজ থেকেই বলবে— আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি। তখন তিনি তার জন্যে একটা টিকিট কেটে আনবেন। ময়মনসিংহ যেতে চাইলে ময়মনসিংহের টিকেট, ঢাকা যেতে চাইলে ঢাকার টিকিট। তারপর তাকে ট্রেনে তুলে দেবেন। কিছু টাকাও তার হাতে দিয়ে দেবেন। হাজারখানেক টাকা। আরো বেশি দিতেন, কিন্তু তাঁর সামর্থ নেই।

ছেলেটাকে কিছু জিজ্ঞেস করা বোধ হয় ঠিক হবে না। সে বিব্রত হবে। যাবার মুহূর্তে তাকে বিব্রত করে কী লাভ ? যদিও তাঁর অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। বিশেষ করে গাছের ব্যাপারটা। সে নিজেকে গাছ বলে কেন ? এটা কি কোন ঠাট্টা ? না-কি সে সত্যি সত্যি গাছ ? তা কী করে হয় ? মানুষ গাছ হবে কীভাবে ?

একদিন তিনি বারান্দায় বসে আছেন হঠাৎ শুনলেন, সুপ্তি ছেলেটাকে বলছে— গাছ ভাইয়া আমার বই-এর মলাট লাগিয়ে দাও।

www.BDeBooks.Com

তিনি সুপ্তিকে ডেকে বললেন, গাছ ভাইয়া ডাকছিস কেন ? গাছ ভাইয়াটা কী ?

'উনি নিজকে গাছ বলেন তো তাই গাছ ভাইয়া বলে ক্ষেপাই।'

'বাবলু নিজেকে গাছ বলে ?'

'হুঁ। বলে আমি মানুষ না, আমি গাছ ?'

'সে গাছ হবে কেন ?'

'আহ্ বাবা তুমিও দেখি কিছু বোঝ না। ঠাট্টা করে বলে। মানুষ কি কখনো গাছ হয় ?'

'ঠাট্টা করে বলে ?'

'অবশ্যই ঠাট্টা করে বলে। তোমার কী ধারণা— উনি সত্যি গাছ ?'

মবিন উদ্দিনের কোনো ধারণা নেই। তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে আসে। বাবলু যদি তাকে বলে— আমি কাঁঠাল গাছ। তিনি হয়তোবা বিশ্বাস করবেন। তার গা থেকে কাঁঠাল বের হলেও তেমন অবাক হবেন না। পেরে ঘরের কোণায় রেখে দেবেন পাকাবার জন্যে।

দুপুর একটার মতো বাজে। মবিন উদ্দিন খবরের কাগজ ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষিধে পেয়েছে— বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবেন। কিছুক্ষণ ঘুমাবেন। ঐ দিন সুরমা বলছিল— আচ্ছা এখন তুমি আর দুপুরের পর দোকানে যাও না কেন ?

'বিক্রিবাটা নেই। কাজেই যাই না। রেস্ট নিই। তাছাড়া শরীরটাও ভাল না।'

'বাবলুকে পাঠিয়ে দাও, ও দোকানে বসুক। দিনের পর দিন দোকান বন্ধ রাখলে লোকজন ভাববে তুমি দোকান বিক্রি করে দিয়েছ।'

মবিন উদ্দিন রাগী গলায় বললেন, দোকান বিক্রি করব কেন ? কী সব আজগুবি কথা বল।

'হঠাৎ এমন রেগে গেলে কেন ? রাগার মতো কিছুতো বলিনি। তোমার শরীরতো আসলেই খারাপ করেছে। আজকাল খুব অল্পতেই রেগে যাচ্ছ। তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টাইতো করছি— তুমি এসে বকবক করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে।'

'আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। তুমি ঘুমাও।'

সুরমা চলে যায় ঠিকই, কিন্তু যাবার আগে কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে। সে কিছু আঁচ করছে ? আঁচ করা বিচিত্র না। এত বড় ঘটনা বেশিদিন গোপন করে রাখা যাবে না। প্রকাশ হয়ে পড়বেই। তাঁরই উচিত সুরমাকে জানানো। কীভাবে জানাবেন মাথায় আসছে না।

মোহনগঞ্জ থেকে ময়মনসিংহ আপ ট্রেন আসছে। স্টেশনে তুমুল ব্যস্ততা। চার-পাঁচ কামরার ছোট্ট ট্রেন, প্ল্যাটফরমে চার-পাঁচশ যাত্রী দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা থাকবে না, অথচ স্টেশনের সব যাত্রী ট্রেনে উঠে যাবে।

কীভাবে উঠবে সেটাও এক রহস্য। আসলে পৃথিবীটা রহস্যময়। কালো যাদুকরের রহস্যই একমাত্র রহস্য নয়। মবিন উদ্দিন বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

দরজা খুলে দিলেন সুরমা।

সুরমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। চোখ ফোলা ফোলা। অনেকক্ষণ কাঁদলেই চোখ এমনভাবে ফুলে উঠে। মবিন উদ্দিন শংকিত গলায় বললেন, তোমার কী হয়েছে? সুরমা ধরা গলায় বললেন, কিছু হয় নি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মবিন উদ্দিন নিচু গলায় বললেন, কী কথা?

'খাওয়া-দাওয়া কর তারপর বলব।'

'এখনি বল শুনি।'

'তুমি নাকি রোজ স্টেশনে বসে থাক?'

'কে বলছে?'

'কে বলেছে সেটা পরের কথা। বসে থাক কি-না সেটা বল।'

'হ্যাঁ বসে থাকি।'

'স্টেশন বসে কী কর?'

'খবরের কাগজ পড়ি।'

'খবরে কাগজ পড়ার জন্যে স্টেশনে যেতে হয়ে। আগেতো দোকানে বসেই কাগজ পড়তে। এখন দোকানে বস না কেন?'

মবিন উদ্দিন চুপ কর রইলেন। চুপ করে থাকা ছাড়া তাঁর পথও নেই। কী বলবেন? সুরমা এমনভাবে তাকাচ্ছে যে তাঁর তৈরি মিথ্যা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে।

'তুমি না-কি দোকান বিক্রি করে দিয়েছ?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'আব্দুল মজিদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলাম। তার মেয়ের বিয়ে, টাকাটা তাকে দেয়া দরকার।'

'টাকা কবে ধার করেছিলে?'

'অনেকদিন আগেই নিয়েছিলাম। তোমাকে বলা হয় নি।'

'আমাকে তো তুমি কিছুই জানাও না। কেন জানাও না? এই ব্যাপারটা জানাতে কি কোন সমস্যা ছিল?'

'না ছিল না।'

'ছিল না, তাহলে জানাওনি কেন?'

'সুপ্তি কোথায়?'

'সুপ্তি কোথায় জিজ্ঞেস করছ কেন? আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি আমাকে কখনো কিছু জানাও না কেন?'

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। সুরমা বললেন, এখন আমরা খাব কী? বাঁচব কীভাবে কিছু ভেবেছ?'

www.BDeBooks.Com

মবিন উদ্দিন চুপ করে রইলেন। সুরমার কঠিন আক্রমণ সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। সুপ্তি থাকলে ভাল হত। সে বাবাকে রক্ষা করার চেষ্টা করত। মবিন উদ্দিন অসহায় বোধ করছেন।

সুরমা শান্ত গলায় বললেন, শোন আমি আজ বিকেলের ট্রেনে বারহাট্টা যাব। সুপ্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

মবিন উদ্দিন বললেন, আচ্ছা।

এখন স্ত্রীর প্রতিটি কথায় রাজি হওয়াই হবে সর্বোত্তম পন্থা। বারহাট্টা তাঁর শ্বশুর-বাড়ি। সুরমা যদি সুপ্তিকে নিয়ে কয়েকদিন তার বাবা-মা'র কাছে গিয়ে থেকে আসে সেটা ভালই হবে। তার রাগ কমবে। তিনিও নিরিবিলি কিছুদিন ভাবার সময় পাবেন। চিন্তা-ভাবনার জন্যে তাঁকে আর রোজ রোজ স্টেশনে যেতে হবে না।

সুরমা তীব্র গলায় বললেন, মানুষকে তুমি মানুষ মনে কর না। মানুষকে ভাব— গাছ।

মবিন উদ্দিন মনে মনে বললেন, গাছকে এত তুচ্ছ মনে করো না। গাছ ভয়াবহ ব্যাপার। শুধু আমিই মানুষকে গাছ ভাবি না। অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের গাছ ভাবে। উদাহরণের জন্যে দূরে যেতে হবে না। উদাহরণ ঘরেই আছে।

'মুখ ভোতা করে থাকবে না। ভাত খাও। আমার কাজ-কর্ম আছে জিনিসপত্র গুছাতে হবে।'

'সত্যি সত্যি যাবে ?'

'আমি কি তোমার সঙ্গে তামাশা করছি। তুমি কি আমার দুলাভাই ?'

'বাবলু কোথায় ?'

'ও ঘরেই আছে। কেন ওকে দরকার কেন ?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম। কোন দরকার নেই।'

'দরকার তো থাকবেই না। কাইকেই তোমার দরকার নেই। তুমি একাই একশ। তুমি তো মহামানব।'

মবিন উদ্দিন একা একা খেলেন। এবং যথারীতি শুয়ে পড়লেন। দোকান বিক্রির খবরটা যে তাকে বলতে হয় নি সুরমা নিজে নিজেই বের করেছেন এতে তাঁর ভালই লাগছে। আল্লাহ্ যা করেন ভালই করেন।

মবিন উদ্দিন চোখ বন্ধ করে আছেন। সুপ্তির সঙ্গে তাঁর মা'র কথা-বার্তা কানে আসছে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি মা ? নানার বাড়ি ?'

'একবার তো বললাম। আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন ?'

'হঠাৎ যাচ্ছি কেন ?'

'কাজ আছে তাই হঠাৎ যাচ্ছি।'

'আমার স্কুল খোলা মা।'

'থাকুক স্কুল খোলা। অন্ধ মেয়ে তার আবার স্কুল খেলা।।'

'এমন বিশ্রী করে কথা বলছ কেন ?'

'মিষ্টি কথা শুনতে চাস ? যা তোর বাবার কাছে। সে মিষ্টি কথা বলবে।'

'আমাদের সঙ্গে আর কে যাচ্ছে ?'

'আমি আর তুই।'

'সে-কী! বাবা যাবে না ? গাছ ভাইয়া যাবে না ?'

সুরমা কী জবাব দিলেন, মবিন উদ্দিন ধরতে পারলেন না। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে ওরা আসলে যাবে না। বিকেল আসতে আসতে সুরমার রাগ পড়ে যাবে। সুপ্তি বাবাকে ছাড়া কোথাও যাবে না বলে বেঁকে বসবে। সব মিলিয়ে যাওয়া বাতিল হয়ে যাবে। মবিন উদ্দিন ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেক দিন পর তাঁর গাঢ় ঘুম হল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যাবেলা। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই। তিনি ডাকলেন— সুপ্তি। সুপ্তি। কেউ সাড়া দিল না। তিনি বিস্মিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দেখেন ভেতরে বারান্দায় মোড়ার উপর ম্যাজিশিয়ান বসে আছে।

'ওরা কোথায় ?'

'বারহাট্টা গিয়েছে।'

'বারহাট্টা গিয়েছে মানে ? কখন গেল ?'

'বিকালের ট্রেনে।'

'তুমি কী বল ? সুপ্তি আমাকে কিছু না জানিয়েই চলে গেল ?'

'আপনি ঘুমাচ্ছেন এই জন্যে মনে হয় জাগায় নি।'

'কবে আসবে কিছু বলে গেছে ?'

'না।'

মবিন উদ্দিন হতভম্ব হয়ে গেলেন। যত রাগই করুক সুরমা তাকে কিছু না বলে চলে যেতে পারল ?

ম্যাজিশিয়ান বলল, ওরা কাল পরশু চলে আসবে। আপনি দুঃশ্চিন্তা করবেন না।

'কাল পরশু চলে আসবে তোমাকে বলে গেছে ?'

'জ্বি না। কিন্তু আমি জানি চলে আসবে।'

'কীভাবে জান ?'

ম্যাজিশিয়ান চুপ করে রইল। মবিন উদ্দিন লক্ষ্য করলেন তিনি রেগে যাচ্ছেন। স্ত্রী কন্যার উপরের রাগটা ম্যাজিশিয়ান ছেলেটার দিকে চলে যাচ্ছে।

'চুপ করে আছ কেন ? বল কীভাবে জান ? না বলতে কোনো অসুবিধা আছে ?'

'জ্বি-না বলতে অসুবিধা নেই।'

'শোন— তোমার ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগে না। তুমি যা জান তার নাম ম্যাজিক না, তার নাম যাদুবিদ্যা। যাদুবিদ্যা ভাল জিনিস না। যাদুবিদ্যা খারাপ বিদ্যা। এই বিদ্যার চর্চা করাও খারাপ। ধর্মে নিষেধ আছে।'

www.BDeBooks.Com

'আমি কোনো যাদুবিদ্যা জানি না।'

'ফালতু কথা বলবে না। অবশ্যই তুমি যাদু বিদ্যা জান ? তুমি সুপ্তিকে বলেছ তুমি গাছ ? বল নাই ?'

'জ্বি বলেছি।'

'কী জন্যে বলেছ ? ঠাট্টা করে বলেছ ?'

'ঠাট্টা করে বলি নি।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি গাছ ?'

ম্যাজিশিয়ান কিছু বলছে না। মাথা নিচু করে আছে। মবিন উদ্দিন চাপা গলায় বললেন, আচ্ছা যাও স্বীকার করলাম তুমি গাছ। গাছ কেন সেটা বল।

'এক দুই কথায় বলা যাবে না।'

'এক দুই কথায় বলা না গেলে বেশি কথাতেই বল। আরেকটা কথা..

মবিন উদ্দিনের কথা বলার আগেই ম্যাজিশিয়ান বলল, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি জানি। আপনি বলতে চাচ্ছেন— আমি যেন চলে যাই।

'তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি তাই চাই।'

'জ্বি আমি চলে যাব।'

'তুমি যাবে কোথায় ?'

'ঠিক করি নি কিছু।'

'দেশের বাড়িতে চলে যাও। পথে পথে ঘুরবে কেন ? বাবা-মা'র কাছে যাও।'

'বাবা-মা নেই।'

'বাবা-মা না থাকলেও আত্মীয়-স্বজন তো আছে। তাদের কাছে যাও। এমন তো না যে তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। পথে পথে ঘুরে যে ফকির তারও চল্লিশটা আত্মীয় থাকে।

ম্যাজিশিয়ান হাসতে হাসতে বলল, 'আমার নেই।'

মবিন উদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার থাকবে না কেন ? তুমি তো আকাশ থেকে নাম নি। না-কি আকাশ থেকে নেমেছ ?

ম্যাজিশিয়ান এখনও হাসছে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। ব্যস্ত ভঙ্গিতে কেউ কড়া নাড়ছে। কে এসেছে ? সুরমা ফিরে এসেছে না-কী ? বারহাট্টা থেকে এখন আসার কোন ট্রেন নেই— তবে বাসে করে চলে আসতে পারে। সুরমা বাবার বাড়িতে পৌছেই হয়ত বুঝতে পেরেছে সে কাজটা ভাল করে নি। তারপর বাসে করে চলে এসেছে। তবে ম্যাজিশিয়ান বলছিল তারা কাল-পরশু আসবে। ম্যাজিশিয়ানের কথাতো ভুল হবে না।

মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে এসেছে ?

ম্যাজিশিয়ান সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনার বোনের স্বামী মজিদ সাহেব এসেছেন। মবিন উদ্দিন ম্যাজিশিয়ানের চোখে মুখে সূক্ষ্ম হাসি লক্ষ্য করলেন। ম্যাজিশিয়ানরা বড় ধরনের কোন ম্যাজিক দেখাবার আগে যে বিশেষ ভঙ্গিতে হাসে। সেই ভঙ্গির হাসি।

মবিন উদ্দিন তীব্র গলায় বললেন, না দেখে বলে ফেললে ? তারপরেও বলতে চাও তুমি যাদুবিদ্যা জান না ?

মবিন উদ্দিন দরজা খুললেন। হ্যাঁ আব্দুল মজিদই এসেছে। সে অন্যদিনের মতোই হাসিখুশি। তার মুখ উজ্জ্বল। হাতে মিষ্টির হাড়ি।

'কী খবর আব্দুল মজিদ ?

'জ্বি খবর ভাল।'

'হাতে কী ?'

'রসোগোল্লা। সুপ্তির জন্যে এনেছি। নিধু সাহেবের কাপড়ের দোকানে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনাদের খোঁজ নিয়ে যাই। চায়েরও পিপাসা পেয়েছে। এক কাপ চাও খেয়ে যাই।'

'চা খাওয়াতে পারবো না। সুরমা-সুপ্তি কেউ বাসায় নেই।'

'সে -কী! ওরা কোথায় ?'

'বারহাট্টা গিয়েছে।'

'সঙ্গে কে গিয়েছে, ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা ? ভাইজান আপনি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছেন। ছেলেটাকে এখনও তাড়ান নাই ?'

'ওই প্রসঙ্গ বাদ দাও।'

'বাদ দিব কেন ? বাদ দেয়ার মতো বিষয় তো না। শেষ পর্যন্ত একটা কেলেংকারী হবে।'

'যখন হবে তখন দেখা যাবে। তুমি কি কোন কাজে এসেছ না এমনি এসেছ ?'

আব্দুল মাজিদ বসতে বসতে বলল, একটা কাজেই এসেছি। বুঝলেন ভাইজান ওইদিন টাকাটা গুণে না নিয়ে ভুল করেছি। গুণে নেয়ার দরকার ছিল।

মবিন উদ্দিন হতভম্ব হয়ে বললেন, সে-কী টাকা কম ছিল না-কী ?

আব্দুল মজিদ হাসতে হাসতে বলল, জ্বি না। একটা পাঁচশ টাকার নোট বেশি ছিল। ব্যাংকও মাঝে মাঝে ভুল করে। নোটটা নিয়ে এসেছি।

আব্দুল মজিদ মানিব্যাগ বের করল আর তখন ঠিক আগের বারের মতো আব্দুল মজিদ কী ভাবছে তিনি বুঝতে পারলেন। আব্দুল মজিদ ভাবছে টাকা ঠিকই ছিল তারপরেও পাঁচশ টাকা দিচ্ছি বুঝানোর জন্যে যে আমি মানুষটা অতি সৎ। আমার মধ্যে কোন অসৎ ব্যাপার নাই।

মবিন উদ্দিন বললেন, সত্যি সত্যি পাঁচশ টাকা ছিল ?

'জ্বি ছিল।'

মবিন উদ্দিন টাকাটা হাতে নিলেন। মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি কি আসলেই আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারছেন, না এটাও তাঁর কল্পনা।

'ভাইজান একটা বিষয় শুনে খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি।'

'বিষয়টা কী ?'

'শুনলাম আপনি না-কি দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন।'

www.BDeBooks.Com

'হ্যাঁ।'

'আমাকে টাকা দেয়ার জন্যে দোকান বিক্রি করতে হল ? ছি ছি।'

'না ছি ছি কিছু না। এমনিতেও বিক্রি বাটা হচ্ছিল না।'

'এখন কী করবেন বলে ঠিক করেছেন ?'

'গ্রামের বাড়িতে চলে যাব বলে ঠিক করেছি। কিছু ধানী জমি আছে। পুকুর আছে। শহরের এই বাড়ি বিক্রি করলে কিছু টাকা পাব।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না ভাইজান। পুকুরে যদি মাছের চাষ করেন— ভাল আয় হবে। আর আপনারা তিনজন মোটে মানুষ— আপনাদের আর খরচ কী ?'

মবিন উদ্দিন কিছু বললেন না। এই আলোচনা চালিয়ে যেতে তাঁর ইচ্ছা করছে না।

'পুকুরে গ্রাসকার্প ছাড়বেন, সিলভার কাপ ছাড়বেন, সরপুঁটিও ভাল হয়। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের এক অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। নিয়ে আসব আপনার কাছে।'

'আচ্ছা।'

'মাছের চাষে অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন কর্মচারী রেখে দেবেন। আছে, আমার জানামতে বিশ্বাসী লোক আছে। হ্যাচারীতে কাজ করেছে। ওকে নিয়ে আসব।'

মবিন উদ্দিন ভেবে পেলেন না, তার মাছের চাষ নিয়ে আব্দুল মজিদ এত উৎসাহী কেন ? রহস্যটা কী ? রহস্য কিছু নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তিনি ধরতে পারছেন না।

হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। আব্দুল মজিদ কি ভাবছে তিনি বুঝতে পারছেন। আব্দুল মজিদ এসেছে বাড়িটা কিনে নিতে। শহরের উপর ভাল জায়গায় বাড়ি। চারতলা দালান তুলে ভাড়া দিলে ভাল টাকা আসবে।

'ভাইজান!'

'বল।'

'দোকান বিক্রি করে দিয়েছেন শুনে খুবই কষ্ট পেয়েছি। হুট করে বিক্রি করলেন, দামও তো ভাল পান নি।'

'তা ঠিক, দাম ভাল পাই নি।'

'বাড়ি বিক্রি করার সময় তাড়াহুড়া করবেন না। আমাকে আগে জানাবেন।'

'তুমি কিনতে চাও ? তুমি তো বলছিলে তোমার টাকা পয়সার সমস্যা।'

'সমস্যা তো আছেই। সমস্যা যাই থাকুক জোগাড় করব। আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা ঠিক না। বাড়ি কবে-নাগাদে বিক্রি করার কথা ভাবছেন ?'

'এখনও এই বিষয়ে কিছু ভাবি নি।'

'দেরী করা ঠিক হবে না। দেরী করা মানে জমা টাকা খরচ করা। তাড়াতাড়ি ডিশিসান নিয়ে কাজ কর্ম শুরু করে দেয়া দরকার। আমি কালপরশুর

মধ্যে হ্যাচারীর লোকের সঙ্গে কথা বলব। আপনার একটা ভাল ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত মনে শান্তি পাচ্ছি না ভাইজান।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইজান আমি আজ তাহলে উঠি?'

মবিন উদ্দিন আব্দুল মজিদকে বিদায় দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ম্যাজিশিয়ান ছেলেটা ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। তাকে এখন লাগছে পাথরের মূর্তির মতো। মবিন উদ্দিনকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। মবিন উদ্দিন বললেন, তুমি কি কিছু বলবে?

সে না সূচক মাথা নাড়ল?

মবিন উদ্দিন বললেন, তোমাকে আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে?

'জ্বি দেব।'

'আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি আব্দুল মজিদের মনের কথা বুঝতে পারছি— এটা কি সত্যি।'

'জ্বি সত্যি।'

'এটা কীভাবে সত্যি হয়?'

'আমি আপনাকে সাহায্য করেছি।'

'তুমি এইসব শিখলে কীভাবে?'

'আমি একটা খাতায় আমার ব্যাপারটা লিখেছি। খাতাটা আপনাকে দিয়ে যাব। আপনি পড়বেন। পড়া শেষ হলে খাতাটা নষ্ট করে ফেলবেন।'

মবিন উদ্দিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু এইসব ব্যাপার আমার ভাল লাগে না। মানুষ হবে সহজ, সরল স্বাভাবিক—এসব কী?

'আমার দুর্ভাগ্য যে আমি অন্য রকম হয়ে গেছি।'

'কীভাবে হলে?'

'আমি সব লিখেছি। পড়লেই আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। আমি চলে যাচ্ছি, আপনি পড়ুন। আজ রাতেই পড়ুন।'

'তুমি চলে যাচ্ছ তার মানে কি। কোথায় যাচ্ছ?'

'বুঝতে পারছি না কোথায় যাচ্ছি। আপনার কাছে আমার একটা ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারও আছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।'

মবিন উদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কী করেছ যে তোমাকে ক্ষমা করতে হবে?

'আমি নিজেকে আপনার ছেলের মতো করে উপস্থিত করেছি। তার চেহারা তার গলার স্বর অনুকরণ করেছি। এমন কি নিজের নামও বলেছি টুনু। আমি এই ব্যাপারগুলো করতে পারি। আমার অনেক ক্ষমতা।'

'তুমি কি এখনি চলে যাচ্ছ? তুমি যে ভঙ্গিতে কথা বলছ তাতে সে রকমই মনে হচ্ছে।'

www.BDeBooks.Com

'জ্বি আমি এখনি চলে যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।'

'সুপ্তি আর তার মা'র সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে ?'

'জ্বি।'

'তোমার কষ্ট হবে না ? মন খারাপ করবে না ?'

'আমি অর্ধেক বৃক্ষ, মানুষের আবেগ আছে আমার নেই। আপনি যে স্নেহ করেছেন— সেই স্নেহ অপাত্রে করেছেন।'

মবিন উদ্দিন আগে লক্ষ্য করেন নি, এখন লক্ষ্য করলেন— ঠিক যে পোশাকে কাল যাদুকর এই বাড়িতে ঢুকেছিল সে সেই পোশাকেই পরে আছে। পাতলা একটা শার্ট, খালি পা। কাঁধে ছেড়া সুতা ওঠা কাপড়ের ব্যাগ। টুনুর মুখের কোন আদল তার মুখে এখন আর নেই। নিগ্রোদের চুলের মতো ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। চোখের সাদা অংশ অতিরিক্ত সাদা। মনে হয় অন্ধকারে জ্বলছে।

মবিন উদ্দিন হতভম্ব গলায় বললেন, তোমার নাম কী ?

'এখন আমার কোন নাম নেই। তবে এক সময় সুন্দর একটা নাম ছিল।'

'সেই নামটা কী ?'

'টগর।'

কালো যাদুকর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। একবারও বলল না— আপনারা আমাকে পুত্র স্নেহে রেখেছিলেন। এই স্নেহের ঋণ আমি স্বীকার করছি।

সে এমনভাবে ঘর থেকে বের হল যেন কারো কাছেই তার ঋণ নেই।

৬

আমি আমার জীবনের অদ্ভুত একটা গল্প লিখছি। যারা গল্পটি পড়বেন তাদের যে বিশ্বাস করতে হবে এমন না। বিশ্বাস করার কোন দরকার নেই। আবার অবিশ্বাস করারও দরকার নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝিটা করলেই হল। আমরা সব সময় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে বাস করি। কে জানে হয়ত এই জগৎটাই সত্যি।

আমার মা খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। মা'র কোন স্মৃতি আমার মনে নেই। শুধু একটা স্মৃতি আছে— আমি একটা জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে আছি, মা আমার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালছেন— আমার প্রচণ্ড শীত লাগছে। আমি শীতে কাঁপছি। মাথায় পানি ঢালার সময় মা'র হাতের কাচের চুড়িতে টুন টুন শব্দ হচ্ছে। আমার কাছে মা'র স্মৃতি হচ্ছে— ঠাণ্ডা পানি ঢালার শব্দ, চুড়ির টুন টুন শব্দ। ব্যাস এই পর্যন্তই, মা'র চেহারার কোন স্মৃতি আমার নেই। তিনি দেখতে কেমন ছিলেন ? তাঁর কি মায়া মায়া চোখ ছিল ? তিনি কি পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে রাখতেন ? কিচ্ছু জানি না।

মা'র মৃত্যুর দু'বছর পর বাবা আবার বিয়ে করেন। নতুন মা'র কথা আমার খুব মনে আছে।

নতুন মা'র চেহারা খুব সুন্দর ছিল। তিনি হাসি খুশি ধরনের ছিলেন। স্বভাবটা ছিল ছটফটে ধরনের। অনেকটা চড়ুই পাখির মত। কোথাও বেশিক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না। নতুন মা আমাকে খুব আদর করতেন। আসল মা'র আদর কেমন তাতো জানি না— নতুন মা'র আদর পেয়েই আমার আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি আমাকে গ্রহণ করেছিলেন— বন্ধু হিসেবে, খেলার সাথী হিসেবে। নতুন মা'র বয়স অল্প ছিল। তাঁর খেলার সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। আমার বাল্যকাল এবং কৈশোর কেটেছে খুবই সুখে। আমার সুখ স্থায়ী হল না। আমার যখন তের বছর বয়স তখন নতুন মা মারা গেলেন।

নিজের মা'র মৃত্যুতে আমি কষ্ট পাই নি। নতুন মা'র মৃত্যুতে আমি প্রথম কষ্ট পেলাম। নতুন মাও সম্ভবত অন্য ভুবনে যাত্রার আগে আমার কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কারণ তিনি মৃত্যুর আগে আগে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন— আহারে আমি চইল্যা গেলে আমার টগররে কে দেখব ?

তখন তাঁর নিজের একটি মেয়ে আছে। তারও ফুলের নামে নাম— পারুল। খুবই আশ্চর্যের কথা একবারও তিনি তাঁর মেয়ের কথা বললেন না। এবারও বললেন না, আমার পারুলরে কে দেখব ? তিনি কাঁদতে লাগলেন আমার কথা ভেবে।

মা'র মৃত্যুর পর বাবা আমাকে ডেকে বললেন— বুঝলি টগর, আমার কপালে সংসার নেই। বিয়েসাদী আর করব না। তোর ছোট বোনটাকে তো বড় করা লাগবে —দুইজনে মিলে পারব না ?

আমি বললাম, পারব।

বাবা বললেন, শিশু মানুষ করা কঠিন ব্যাপার। দুইজনে মিলে এই কঠিন কাজটা সমাধা করতে হবে। উপায় কী ? তবে মেয়ে তো, একটু বড় হলে দেখবি আমাদের আর তাকে পালতে হচ্ছে না— উল্টা সেই আমাদের পালছে। কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে তোর বোনটাকে বড় করতে হবে। আগের মতো আর বাইরে ঘোরাঘুরি করা যাবে না। বেশির ভাগ সময় এখন ঘরেই থাকতে হবে।

বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছোট-খাট ব্যবসা করতেন। কোন ব্যবসাতেই মন বসাতেন বলে মনে হয় না। একটা ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলে সেটা ছেড়ে তিনি অন্য ব্যবসা ধরতেন। তাঁর ঘুরে বেড়ানোরও খুব সখ ছিল। তাঁর কথা হল— মানবজীবন অল্প দিনের। এই অল্পদিনে যা দেখার দেখে নিতে হবে। মৃত্যুর পর দেখার কিছু নেই। দোজখে যে যাবে— সে আর দেখবে কী— তার জীবন যাবে আগুন দেখতে দেখতে। আর বেহেশ্‌তেও দেখার কিছু নেই। বেহেশ্‌তের সবই সুন্দর। যার সবই সুন্দর তার সৌন্দর্য বোঝা যায় না। সুন্দর দেখতে হয় অসুন্দরের সঙ্গে।

খুবই ভারী ধরনের কথা। বাবা ভারী ভারী কথা বলতে পছন্দ করতেন।

মা'র মৃত্যুর পর বাবার অস্থির স্বভাবের তেমন কোন পরির্বতন হল না। তিনি আগের মতই রইলেন। বরং অস্থিরতা সামান্য বাড়ল। মূলত আমি একাই বোনের দেখাশোনা করতে লাগলাম। বাড়িতে একটা কাজের মহিলা ছিল।

www.BDeBooks.Com

তাকে আমরা রহিমা খালা ডাকতাম। রহিমা খালা খুব দায়িত্ববান মহিলা ছিলেন। সংসার তিনি একাই সামলাতে লাগলেন। যদিও আগে বলেছি আমি বোনের দেখাশোনা করতে লাগলাম আসল ঘটনা সেরকম নয়। আমার বোন একা একাই বড় হতে লাগল। সে খেলতো নিজের মনে— হেঁটে বোড়াতো নিজের মনে। তার স্বভাব চরিত্র এবং আচার আচরণে বড় ধরনের অস্বাভাবিকতা ছিল। যা আমার কম বয়সের জন্যে আমি ধরতে পারি নি। রহিমা খালা ঠিকই ধরেছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন— "পারুল জানি কেমন কইর‍্যা হাঁটা চলা করে। বগার লাহন ঠ্যাং ফেলে, কেমুন কইরা জানি দেহে। রহিমা খালা একাই কথাগুলি নিজেকেই বলতেন। কাজেই আমিও তেমন গুরুত্ব দেই নি।

পারুলের যে অস্বাভাবিকতাটা আমার চোখে পড়ত তা হল সে অন্ধকারে সারাবাড়ি হেঁটে বেড়াতে পারত। ভাবটা এমন যেন সে অন্ধকারে দেখতে পায়। আসল ব্যাপারটা ছিল পুরো অন্যরকম। সে চোখে কিছুই দেখত না, সে জন্মান্ধ ছিল। তার টানা টানা সুন্দর চোখ দেখে এ ব্যাপারটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি। বাবা বেখেয়ালী ধরনের মানুষ। তাঁর ধরতে পারার কথা নয়, আর আমার বয়সতো নিতান্তই অল্প। মা বেঁচে থাকলে অবশ্যই ধরতে পারতেন।

ব্যাপারটা যখন ধরা পড়ল তখন পারুলের বয়স চার। আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লাম। অন্ধকারে তার অনায়াসে হাঁটাহাঁটির অর্থ তখনই পরিষ্কার হল। তার কাছে আলো এবং অন্ধকার আলাদা কিছু ছিল না। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও পারুলের অন্যসব ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। পাঁচ বছর বয়সেই সে সবকিছু নিজের মতো করে করতে পারত।

বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। সংসারে এমনিতেই তাঁর মন ছিল না। এর পর মন আরও উঠে গেল। বেশির ভাগ সময়ই তিনি বাইরে বাইরে থাকতে শুরু করলেন। বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন পারুল নিজের মনে খেলছে। নিজের মনে কথা বলছে। বাবা তাঁর মেয়েকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। বড় বড় ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তাররা বললেন— জন্ম ত্রুটি, কনজেনিটাল ডিফেক্ট। কিছু করার নেই।

পারুল দেখতে পায় না এ নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সে ছিল মনের আনন্দে। ছোটাছুটি করছে— হৈ চৈ করছে। মনের আনন্দে গান করছে। 'ট' উচ্চারণ করতে পারত না বলে আমাকে সে ডাকত অগর ভাই। যখন 'ট' উচ্চারণ করতে শিখল তখনও আমি অগর ভাই হয়ে রইলাম। পারুলের অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ জীবনে আমিই ছিলাম একমাত্র সঙ্গী। তার বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। একবার সে আমাকে বলল, অগর ভাই, আমাকে পড়া শেখাও। তখন আমি পড়ি ক্লাস টেনে। আমার এমন কী বিদ্যা যে একটা অন্ধ মেয়েকে পড়া শিখাব ? কতগুলো বর্ণ আছে— স্বরবর্ণ কিছু আছে ব্যঞ্জনবর্ণ— এদের আলাদা ধ্বনি আছে। ধ্বনিগুলো তাকে শুনাতে পারব। কিন্তু বর্ণগুলো তো সে

কোনদিন দেখবে না। কাগজের উপর বর্ণগুলো বড় করে লিখে তার উপর দিয়ে পারুলের আঙুল বুলিয়ে নিলে সে কিছুটা আঁচ হয়ত পাবে। কিন্তু যুক্তবর্ণ বুঝাব কী করে ? আর বুঝতে পারলেও এতকিছু সে মনে রাখবে কী করে ? আমি খুবই অনাগ্রহের সঙ্গে কাগজে "অ" লিখে শুরু করলাম। এবং অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম পুরো ব্যাপারটা পারুল শিখল অস্বাভাবিক দ্রুততায়। সে যত না আনন্দিত হল তার চেয়ে একশগুণ আনন্দিত হলাম আমি নিজে।

পারুল বেশির ভাগ সময় খুব হাসিখুশি থাকত। তবে সে সত্যি হাসিখুশি থাকত, না হাসিখুশি থাকার ভান করত তা আমি জানি না। তবে মাঝে মাঝে মন খারাপ করত। মন খারাপটা বেশির ভাগ সময় হত যখন কোন একটা জিনিস সে বুঝতে চাইত অথচ আমি তাকে বুঝাতে পারতাম না। যেমন রঙ আসলে কী ? পারুল জানতে চাইল, আম যখন কাঁচা থাকে তখন তার রঙ তোমরা বল সবুজ পাকলে হয় হলুদ। এর মানে কী ? একটা কাঁচা আমের গন্ধ একরকম, পাকা আমের গন্ধ আরেক রকম এটা আমি বুঝতে পারি। গন্ধ না শুঁকে হাত দিয়ে ছুঁয়েও বোঝা যায় কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা। কিন্তু হাত দিয়ে না ছুঁয়ে, গন্ধ না শুঁকে দূর থেকে তুমি কী করে বলবে কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা ?

'রঙ দেখে।'

'সেই রঙটা কী ? একটা জিনিসের অনেকগুলো রঙ কেন হয় ? কীভাবে হয় ?'

আমি বুঝাতে পারি না। হতাশ বোধ করি। যে চোখে দেখতে পায় তার কাছে রঙের ব্যাপারটা যত সহজ, যে দেখতে পায় না তার কাছে এটা ততই কঠিন।

এক সময় লক্ষ্য করলাম পারুলের বেশিরভাগ প্রশ্নেরই আমি জবাব দিতে পারছি না। তার প্রশ্নগুলি ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

'অগর ভাইয়া তুমি প্রায়ই বল চাঁদের আলো সুন্দর। তা হলে সূর্যের আলো অসুন্দর ?'

'অসুন্দর না তবে চাঁদের আলো বেশি সুন্দর। চাঁদের আলো নরম।'

'আলোর ভেতর নরম আর শক্ত কী ? তুমি তো আর আলো হাত দিয়ে ধরতে পারছ না।'

'কথার-কথা বললাম।'

'সূর্যের আলো গায়ে লাগলে আমি বুঝতে পারি। চাঁদের আলো বুঝতে পারি না কেন ?'

'ঐ যে বললাম চাঁদের আলো খুব হালকা।'

'হালকা বলছ কেন আলোর কি ওজন আছে ?'

'পারুল আমি বুঝাতে পারছি না।'

'তুমি একবার বলেছিলে পৃথিবীতে সব মিলিয়ে মাত্র সাতটা রঙ। আসলেই কি তাই ?'

'হ্যাঁ সাতটা রঙ। তবে একটা রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিলে নতুন রঙ তৈরি হয়।'

www.BDeBooks.Com

'বুঝতে পারছি না।'

'চিনির সঙ্গে যদি সামান্য লবণ মেশানো হয় তাহলে খাবারে যেমন মিষ্টি স্বাদ থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে একটু লোনা স্বাদও থাকে। অনেকটা এ রকম।'

'তার মানে কি এই যে পৃথিবীতে রঙের কোনো সীমা নেই?'

'হ্যাঁ তাই।'

'আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি তাকে বুঝাতে পারি না। আমি নিজে যেমন হতাশ হই— পারুল তার চেয়ে বেশি হতাশ হয়। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে তার হতাশা চেপে রাখার। সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না।

পারুল যতই বড় হতে থাকল তার ভেতর থেকে হাসি খুশি ভাব ততই কমে যেতে লাগল। এবং তার প্রশ্নগুলোও ততই অদ্ভুত হতে লাগল। যেমন সে একদিন জিজ্ঞেস করল—

'অগর ভাইয়া একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে পছন্দ করে— মানে এই ইয়ে ধর ভালবাসে তখন কি সেই ভালবাসারও রঙ আছে?'

'না।'

'না কেন? সব কিছুর রঙ আছে ভালবাসার রঙ থাকবে না কেন? থাকতেই হবে। ভালবাসার খুব সুন্দর রঙ থাকবে। ঘৃণার থাকবে কুৎসিত রঙ। অবহেলার এক রকমের রঙ আবার অভিমানের অন্য রকম রঙ।'

আমি হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকি। পারুল প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায়। মনে হয় সে যেন রেগে যাচ্ছে।

'আচ্ছা আবেগের কোন রঙ নেই?'

'শব্দের? শব্দের কী কোন রঙ আছে?'

'গাছের পাতা যখন বাতাসে কাঁপে তখন কি তার রঙ বদলে যায়?'

পারুল গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলে— আমার মনে হয় শব্দের রঙ আছে। তোমরা ভালমত দেখতে পার না বলে বুঝতে পার না। বৃষ্টি পড়ার শব্দের এক রকমের রঙ, আবার পাখি যখন ডাকল তখন আরেক রকম রঙ। মুরগি যখন জবাই করার আগে চিৎকার করতে থাকে তখন তার চিৎকারের এক রকম রঙ। আবার স্বাভাবিক অবস্থায় যে যখন ডাকে তখন অন্য রকম রঙ।

আমি চুপ করে যাই পারুলও চুপ করে যায়। এবং একটা সময় আসে যখন এ জাতীয় কথাবার্তা সে পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। বেশির ভাগ সময় সে কাটাতে থাকে আমাদের বাড়ির পেছনের পুকুর পাড়ে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করি সে পুকুরের পাড় ঘেসে হাঁটে আর আপন মনে কথা বলে।

বাবা একদিন বললেন, মেয়েটার হল কী বলতো? পাগল হয়ে গেল নাকি?

পুকুরের চারদিকে শুধু চক্কর দেয়। পুকুরটা কি কাবা শরীফ যে তার চারপাশে চক্কর দিতে হবে? নিষেধ করিস তো। কোন দিন পা পিছলে পুকুরে পড়বে। সাঁতার জানে না। একসিডেন্ট করবে।

বাবার কথা একদিন ফলে গেল। পারুল পা পিছলে পুকুরে পড়ে গেল। আমরা কেউ তা জানতেও পারলাম না। আমরা জানলাম দুপুরের পর যখন পারুল পুকুরে ভেসে উঠছে।

পারুল পা পিছলে পুকুরে পড়েছিল না-কি নিজে ইচ্ছা করে পুকুরে নেমে গিয়েছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। দৃষ্টিহীন মানুষ অসম্ভব সাবধানী হয়। কলার খোসায় পা পিছলে সাধারণ মানুষ পড়ে, দৃষ্টিহীন মানুষরা পড়ে না। তাছাড়া পুকুর পাড়ের মাটির প্রতিটি ইঞ্চি পারুলের পরিচিত। সে তার ক্ষুদ্র জীবনে খুব কম করে হলেও এক লক্ষবার পুকুরের চারদিকে হেঁটে ফেলেছে।

যে রাতে পারুল মারা যায় তা আগের রাতে আমার সঙ্গে সে যে সব কথা বলেছে তার থেকেও খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমরা দু'জন রাতের খাবার খাচ্ছি— বাবা বাইরে। তিনি রাতেই ফিরবেন, কিন্তু ফিরতে দেরি হবে। পারুল ভাত মাখতে মাখতে হালকা বলল, অগর ভাইয়া মৃত্যুর আগে আগে অন্ধ মানুষ নাকি চোখে দেখতে পায়। বধিরও কানে শুনতে পায়? কথাটা কি সত্যি?

আমি বললাম, কে বলেছে?

'রহিমা খালা বলেছে।'

'ঠিক বলেনি।'

পারুল গম্ভীর গলায় বলল, আমার মনে হয় ঠিকই বলেছি। মৃত্যুর আগে শেষবারের মত মানুষ প্রাণ ভরে পৃথিবীকে দেখবে এটাই স্বাভাবিক। বুঝলে ভাইয়া আমি আর কিচ্ছু চাই না শুধু একবারের মত রঙের ব্যাপারটা কী দেখতে চাই।

আমি নিজে মনে করি পারুল মারা গেছে— রঙ কী সেটা একবারের জন্যে হলেও দেখতে গিয়ে। আমার এই ধারণার কাথা আমি বাবাকে বলি নি। বললে তিনি খুব কষ্ট পেতেন।

পারুলের মৃত্যুর পর বাবা এমন ভাব করলেন যেন তিনি খুশি হয়েছেন। পারুলকে কবর দেয়া হল পুকুরে পাড়ে। কবর দেয়ার পরে বাবা আর আমি চুপচাপ বারান্দায় বসে আছি। বাবা বললেন— ভালই হয়েছে বুঝলি টগর। মেয়েটা মরে গিয়ে বেঁচেছে। আমি আসলে খুশি হয়েছি। আই এ্যাম এ হ্যাপী ম্যান।

মেয়েটার বিয়ে দিতে পারতাম না, কষ্টে কষ্টে জীবন কাটত। তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আমি যতদিন থাকতাম মেয়েটাকে দেখতাম। তারপর আমি যখন মারা যেতাম তখন কী হত? তুই থাকতি তোর নিজের সংসার নিয়ে। পারুল তোর সঙ্গে থাকলে তোর বৌ হয়ত সেটা পছন্দ করত না। ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'যা হয়েছে ভালই হয়ছে। ঠিক না টগর?'

'হুঁ ঠিক।'

'চুপচাপ বারান্দায় বসে থেকে কী করবি? যা ঘুমুতে যা।'

www.BDeBooks.Com

'আমি ঘুমুতে গেলাম। বাবাও ঘুমুতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরই শুনি বাবা বিকট চিৎকার করে কাঁদছেন। আমি বললাম, কী হয়েছে বাবা ? বাবা বললেন, মেয়েটা একা একা ভয় পাচ্ছে।

আমি বললাম চল আমরা দু'জন কবরের পাশে বসে থাকি।

বাবা তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে নেমে বললেন, চল যাই।

আমরা দু'জন বাকি রাতটা পারুলের কবরের পাশে চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিলাম। ভোরবেলা আমি ঘরে ফিরলাম জ্বর নিয়ে। তেমন জ্বর না, সামান্য শরীর গরম। মাথা ঝিমঝিম। সেই জ্বর আর কাটে না। এক দু'দিন ভাল থাকি আবার জ্বর আসে।

শরীর দুর্বল হতে থাকল। এক সময় চোখ ঘোলাটে হয়ে গেল। কিছুদিন পর এমন অবস্থা হল যে আমি বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারি না। কিছুই খেতে পারি না। সামান্য পানি দিলেও বমি হয়ে যায়। নানান ধরনের চিকিৎসা হতে থাকল। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, ইউনানী। আধি ভৌতিক চিকিৎসাও হল। কেউ কেউ বললেন— আমাকে জ্বীনে ধরেছে। সেই জ্বীন তাড়াবার ব্যবস্থাও হল। হলুদ পুড়িয়ে নাকের কাছে ধরা। শুকনো মরিচ পুড়িয়ে ধোঁয়া দেয়া। ভয়াবহ ব্যাপার। কোন লাভ হল না। বাবা আমাকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। ঢাকার ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা নীরিক্ষা করে বললেন— আমার যা হয়েছে তার নাম জণ্ডিস। খুব খারাপ ধরনের জণ্ডিস। হেপাটাইটিস বি। লিভার পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তারদের নাকি করার কিছু নেই। বাবা আমাকে দেশের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

এক রাতে আমার অবস্থা খুব খারাপ হল। রহিমা খালা কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমি বাবাকে ডেকে বললাম, আমার খুবই খারাপ লাগছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। দম আটকে আসছে। তুমি আমাকে কোলে করে বারান্দায় নিয়ে যাও। খোলা বাতাসে আমি বোধ হয় নিঃশ্বাস নিতে পারব। বাবা আমাকে কোলে তুলে নিলেন। তবে আমাকে বারান্দায় নিয়ে গেলেন না। বাড়ির পেছনে নিয়ে গেলেন। আমাদের বাড়ির পেছনে পুকুর পাড়ে বড় একটা শিউলি গাছ ছিল। প্রতি বছর এই গাছে অসংখ্য ফুল ফুটতো। বাবা সরাসরি গাছের কাছে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে অদ্ভুত একটা কথা বললেন—

বাবা বললেন, টগর তোর যে অসুখ হয়েছে সেই অসুখ সারাবার সাধ্য মানুষের নেই। আমি একটা শেষ চেষ্টা করব। অন্য রকম চিকিৎসা। সাধু ধরনের একজন মানুষ এই চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন। তাঁর মুখ থেকে শোনা। সব চেষ্টাই তো করা হল— একাও এক ধরনের চেষ্টা।

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, কী চেষ্টা ?

'তোকে আমি শিউলি গাছের নিচে বসিয়ে দিব। তুই দুই হাতে শক্ত করে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে থাকবি আর মনে মনে বলবি, গাছ তুমি আমার অসুখটা তোমার নিজের শরীরে নিয়ে আমাকে সুস্থ করে দাও। পারবি না ?'

আমি বললাম, পারব।

বাবাকে খুশি করার জন্যেই বললাম পারব।

ডুবন্ত মানুষ বাঁচার জন্যে খরকুটো ধরে। বাবাও তাই করছেন। কিছু না পেয়ে গাছের হাতে আমাকে তুলে দিচ্ছেন। বাবা যে ভাবে গাছ ধরতে বললেন, সেই ভাবে ধরলাম এবং মনে মনে বললাম, হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার নিজের শরীরে নিয়ে আমাকে সুস্থ করে দাও।

বাবা বললেন, টগর। তোকে এই যে আমি গাছের সঙ্গে জুড়ে দিলাম আর তুলব না। তুই খুব মন লাগিয়ে গাছকে বল তোকে সারিয়ে দিতে।

আমি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছি। আমার অসম্ভব দুর্বল শরীরে কিছু না ধরে বসে থাকাও সম্ভব না। আমি যা করছি তা যে খুব অস্বাভাবিক কিছু তাও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যা করছি, ঠিকই করছি।

রহিমা খালা বাবাকে বললেন— আপনের কি মাথাটা খারাপ হইছে ? আপনে করতাছেন কী ? এইটা কেমন চিকিৎসা ? অসুখ হইছে পুলার। মাথা খারাপ হইছে আপনের।

বাবা বললেন, তুমি কথা বলবে না রহিমার মা। একটা কথাও না।

'এই অবস্থায় কতক্ষণ থাকব ?'

'জানি না।'

আমার অসুখ এই পর্যায়ের ছিল যে আমি বেশির ভাগ সময়ই ঘোরের মধ্যে থাকতাম। চারপাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারতাম না।

গাছ জড়িয়ে ধরার পর পরই আমি ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। প্রবল ঘোর। মাঝে মাঝে ঘোর কমে, আমি আবছা ভাবে দেখি বাবা পাশেই বসে আছেন। আমি যতবারই চোখ মেলি ততবারই বাবা বললেন— কথা বল। গাছের সঙ্গে কথা বল।

আমি ফিসফিস করে বলি— হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে নিয়ে আমাকে সারিয়ে দাও। হে গাছ তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে নিয়ে আমাকে সারিয়ে দাও। হে গাছ তুমি...

৭

বাবা আমাকে গভীর রাতে গাছের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। রাত কেটে ভোর হল আমি সেইভাবেই রইলাম। বেলা বাড়তে থাকল। এক সময় মাথায় রোদ এসে পড়ল— আমি নড়লাম না। আমার সময় কাটতে লাগল প্রবল ঘোর এবং প্রবল অবসাধের মধ্যে। আশেপাশে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই বোধ ক্রমেই লুপ্ত হতে থাকল। কেউ যেন আমাকে আমার চেনা জগৎ থেকে খুব ধীরে ধীরে আলাদা করে নিচ্ছে। আমি প্রবেশ করছি অন্য এক ভুবনে। সেই ভুবন ছায়াময়, আনন্দময় এবং নিস্তরঙ্গ জলের মতো শান্ত। সেই জলে ছায়া পড়ে, কিন্তু ছায়া স্থায়ী হয় না। একটা ছায়া মিলিয়ে যায় অন্য ছায়া আসে। নিস্তরঙ্গ জলে চলমান গতিময় জীবন।

www.BDeBooks.Com

এক সময় আমি চোখ মেললাম, দেখলাম সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আকাশে শেষ সূর্যের আলো। আমি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে আছি। বাবা আমার পাশেই। তাঁর মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, টগর শরীরটা কী একটু ভাল লাগছে ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে না ?'

আমি বললাম, না। কষ্ট হচ্ছে না।

'খিদে পেয়েছে ? কিছু খাবি ?'

'হুঁ।'

'শরীরটা কী সত্যি ভাল মনে হচ্ছে ?'

'হুঁ।'

বাবা মহাবিস্ময় নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি গাছ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন, একি গাছ ছেড়ে দিলি কেন ?

আমি বললাম , আমি ভাল হয়ে গেছি। কথাটা যে আমি নিজে বললাম তা না। আমার ভেতর থেকে অন্য কেউ যেন বলল। দীর্ঘদিন পর প্রথমবারের মতো আমি কারও সাহায্য ছাড়াই নিজে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। জলচৌকিতে বসিয়ে গরম পানিতে আমাকে গোসল করানো হল। রহিমা খালা বার বার বলতে লাগলেন, বড় আচানক ঘটনা। বড়ই আচানক।

আমার জন্যে আলোচালের ভাত এবং শিং মাছ রান্না করা হল। তৃপ্তি করে ভাত খেলাম। আগের মতো বমি করে ভাত উল্টে ফেলে দিলাম না।

বাবা বললেন, এখনও কি ক্লান্ত ভাব আছে ?

আমি বললাম, আছে।

বাবা বললেন, চল যাই গাছ জড়িয়ে ধরে বসে থাক। একটু কষ্ট কর।

আমি বললাম, আর গাছ জড়িয়ে ধরে বসে থাকতে হবে না। আমি সেরে গেছি। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমাব।

বাবা আমাকে শুইয়ে দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। এমন শান্তিময় ঘুম আমি আগে কখনো ঘুমাই নি। ভবিষ্যতেও যে ঘুমাব তা মনে হয় না। যেন আমার শরীর পাখির পালকের মতো হয়ে গেছে। সেই পালক ভেসে বেড়াচ্ছে হিম হিম হাওয়ায়। সেই গভীর শান্তিময় ঘুমে আমি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। গহীন কোনো বনের ঠিক মাঝামঝি আমি দঁড়িয়ে আছি। আমার চারপাশে গাছ। সেই গাছের শাখা-প্রশাখা প্রায় আকাশ স্পর্শ করছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি স্থির হয়ে। আমার নিজেও একটা গাছের মতোই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন। সমস্ত বনভূমি শব্দহীন। বাতাসে গাছের পাতা কাঁপার শব্দও আসছে না। যেন সমগ্র বনভূমি কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে। কোন বিশেষ ঘটনা ঘটাবে। সবাই অপেক্ষা করছে বিশেষ সেই ঘটনার জন্যে।

বিশেষ ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলল, কোন একটি বিশেষ গাছ না— বনভূমির সব গাছই কথা বলল। প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, তাদের চিন্তা ভাবনা আলাদা। গাছেরা সে রকম না। তারা সবাই মিলে এক। তাদের সবার চিন্তা ভাবনাই এক। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি লতা ও গুল্ম একে অন্যের অংশ। গাছরা বলল, তুমি কি আমাদের কথা শুনতে পারছ।

আমি বললাম, পাচ্ছি।

'তুমি কি বুঝতে পারছ— এখন তুমি আমাদেরই একটা অংশ?'

'বুঝতে পারছি।'

'আমরা তোমার রোগ নিয়ে নিয়েছি।'

'আপনাদের ধন্যবাদ।'

'সেই সঙ্গে আমরা আমাদের একটা অংশও তোমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এছাড়া অন্য উপায় ছিল না।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন তুমি পুরোপুরি মানুষ নও।'

'আমি কি এখন গাছ?'

'না তুমি গাছও নয়। গাছদের চেতনার একটা অংশ তোমার মধ্যে চলে গেছে। সেটা যে খুব আনন্দময় তা-না।'

'ও আচ্ছা।'

'চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাকে আমাদের ক্ষমতার কিছু অংশও দিলাম। বলতে পার তোমার জেন্য এ হলো আমাদের সামান্য উপহার।'

'আপনাদের কি অনেক ক্ষমতা?'

'হ্যাঁ, আমরা মহাশক্তিধর। আমরা এই পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করি। মানুষ তা বুঝতে পারে না। তবে এখান থেকে তুমি খানিকটা বুঝতে পারবে। ভাল কথা, কিছুটা বুঝতে পারছ না?'

'পারছি।'

'নতুন জীবনের শুরুতে তোমার কষ্ট হবে। নিজেকে অসম্ভব নিঃসঙ্গ মনে হবে। তবে এক সময় সেই কষ্ট সহনীয় হয়ে যাবে। তাছাড়া তুমি নিঃসঙ্গ নও।'

'আমার মতো কি আরো অনেক আছে?'

'না, অনেক নেই। খুব অল্প সংখ্যকই আছে। গাছের চেতনার অংশ সবাইকে দেয়া হয় না। বিশেষ কাউকে দেয়া হয়।'

আমার স্বপ্ন এইখানেই শেষ হল। সাধারণত অদ্ভুত বা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখার পরপরই ঘুম ভেঙে যায়। আমার ঘুম ভাঙল না— আমি আরো আনন্দময় ঘুমের ভুবনে তলিয়ে গেলাম। কোথায় যেন অপার্থিব সুরে গান হচ্ছে। আমি কিছু শুনতে পারছি আবার কিছু পারছি না।

পরদিন আমার ঘুম ভাঙল সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বা মানুষ না অন্যকিছু হিসেবে। শরীরে কোন রোগ নেই। কোন ক্লান্তি নেই।

www.BDeBooks.Com

বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বাবা বললেন, কিরে তোর শরীরটা এখনও ভাল তো ?

আমি বললাম, হ্যাঁ ।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, অদ্ভুত কাণ্ড। শিউলি গাছটা মনে হয় মারা যাচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ আগে দেখে এসেছি। বেশির ভাগ পাতা হলুদ হয়ে গেছে। তোর অসুখ গাছটা সত্যি সত্যি নিয়ে নিয়েছে। জগৎ বড়ই রহস্যময়।

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে আছি। আমি বুঝতে পারছি— জগৎটা বাবার কাছে যতটা রহস্যময় মনে হচ্ছে এই জগৎ তার চেয়েও অনেক অনেক রহস্যময়।

এই মুহূর্তে আমি নতুন এক রহস্যের মুখামুখি হয়েছি। কারণ আমি বাবার মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তিনি কি ভাবছেন, না ভাবছেন তা খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারছি। বাবা বললেন, কিরে তুই এমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ? কী দেখছিস ?

আমি কিছুই দেখছি না, আবার অনেক কিছুই দেখছি।

'এই টগর তুই এইভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ? তোর কি শরীর খারাপ লাগছে ? শরীর খারাপ লাগলে বোস।'

আমি বসলাম না। দাঁড়িয়েই রইলাম। এবং বাবা কি ভেবেছেন তা জানতে লাগলাম। কাজটা কি অন্যায় হচ্ছে ? হয়ত হচ্ছে। বাবা ভাবছেন —তাঁর মেয়ের কথা। তাঁর সমস্ত অন্তর কাঁদছে। সেই কান্না ভয়াবহ কান্না। তিনি ভাবেছেন— আহারে আজ যদি আমার মেয়েটা বেঁচে থাকত। দুই ভাই বোন মিলে কত আনন্দ না করত। তার পরপরই তিনি ভাবল তাঁর প্রথম স্ত্রীর কথা— আমার মা'র কথা। এই প্রথম বাবার চিন্তায় আমি আমার মা'কে স্পষ্ট দেখলাম। মা'র চেহারাটা তো খুব সুন্দর ছিল। তবে গায়ের রঙ কাল আমি ভেবেছিলাম, মা বোধ হয় ফর্সা ছিলেন।

'টগর!'

'কী বাবা ?'

'তুই আমার দিকে এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন ?'

'এম্নি।'

আমি এখন অবাক হয়ে বাবার মনের ভেতরে আরেকটি ব্যাপার দেখছি— এখন তিনি আমার মা'র কথা ভাবছেন না। তিনি ভাবছেন— শিউলি গাছটার কথা। আহা গাছটা মরে যাচ্ছে। কঠিন এক অসুখ শরীরে নিয়ে মরে যাচ্ছে। বেচারা নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে।

আমি দেখলাম, বাবার চোখ ছল ছল করছে। বাবার মতো ভবঘুরে মানুষের অন্তরটা যে এত ভাল তা এই প্রথম বুঝলাম।

নতুন জীবনে আমি অভ্যস্ত হতে পারছিলাম না। কোনদিন পারব বলেও মনে হচ্ছে না। নিজের মধ্যে প্রচণ্ড অস্থিরতা। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। কারো

সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। অবশ্যি কথা বলার প্রয়োজনও আমার কমে গেছে। আমি মানুষের মনের কথাতো বুঝতেই পারছি।

আমার ক্ষুধাবোধ, তৃষ্ণাবোধও কমে গেল। রোদে যখন দাঁড়াই আমার ভাল লাগে। খোলা প্রান্তরে দাঁড়ালে ভাল লাগে। ঘরের ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে বিশাল এক অশ্বত্থ গাছ ছিল। কি কারণে জানি গাছটাকে সবাই ডাকত মান্দালের গাছ। রোজ এই গাছের কাছে যাওয়া আমার অভ্যাস হয়ে গেল। বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গাছের কাছে যাই। সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত গাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে থাকি। সন্ধ্যাবেলায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি গাছে ফিরে আসে। তারা কিচিরমিচির করে চারদিকে হৈ চৈ ফেলে দেয়। আমি সন্ধ্যা হওয়া দেখি, পাখিদের কিচিরমিচির শুনি এবং মাঝে মাঝে গাছের সঙ্গে কথা বলি। বটবৃক্ষ জানতে চায়— তোমার মন অস্থির কেন?

'জানি না কেন?'

'মন সুস্থির কর। অস্থিরতা কোন কাজের কথা না।'

'মন সুস্থির করতে পারছি না। সব এলোমেলো লাগছে। আমাকে তোমরা এ রকম বানিয়ে দিলে কেন?'

'এই অবস্থাটা কি তোমার ভাল লাগছে না?'

'না। আমাকে আগের মতো বানিয়ে দাও।'

'সেটা সম্ভব না।'

'তাহলে পুরোপুরি গাছ বানিয়ে দাও। সেটা কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ তা সম্ভব।'

'কোন মানুষকে কি পুরোপুরি গাছ বানানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে। তবে সংখ্যায় খুব কম।'

'তারা কি সুখী হয়েছে?'

'তাদের অস্থিরতা কমেছে। অস্থিরতা কমার ভেতরই সুখ। তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে— জ্ঞান বৃদ্ধিতে সুখ। তাদের ক্ষমতা অনেক অনেক বেড়েছে। ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সুখ। পরিপূর্ণ সুখ অলিক কল্পনা ছাড়া কিছুই না, একমাত্র বৃক্ষই পরিপূর্ণ সুখের কাছাকাছি বাস করে। মানুষ যে অমরত্ব চায় একমাত্র গাছের কাছেই আছে সেই অমরত্ব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত চেতনার বিলুপ্তি ঘটে। বৃক্ষের ব্যক্তি চেতনা নেই। তার হল সমষ্টি চেতনা। সেই চেতনা মৃত্যু নেই বলেই বৃক্ষ অমরত্বের দাবি করে।'

আমি না মানুষ, না বৃক্ষ হয়ে বাস করতে লাগলাম। আমার আবেগ কমে গেল। অভিভূত হবার ক্ষমতা চলে গেল। প্রবল দুঃখেও আমার চোখে পানি আসে না। প্রবল আনন্দেও উল্লাসিত বোধ করি না। বাবা আমাকে নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় পড়লেন। প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন— তোর কি হয়েছে বলতো? অসুখটা তো মনে হয় পুরোপুরি সারে নি। শরীরের অসুখ সারলেও মনে হয়

www.BDeBooks.Com

তোর মনে কোন অসুখ ঢুকে গেছে। চল ঢাকায় যাই—তোকে বড় একজন ডাক্তার দেখাই। আমি বললাম, চল।

ঢাকায় নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেক ডাক্তার-টাক্তার দেখানো হল। তাঁরা বললেন— সমস্যা কিছু আছে। হার্টবিট স্বভাবিকের চেয়েও বেশ কম, ব্লাড প্রেসার কম— তবে তেমন গুরুতর কিছু না। অনেকের হার্টবিট জন্ম থেকেই কম থাকে, প্রেসার কম থাকে। এর বেলাতেও হয়ত তাই।

বাবা খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন এবং তার পাঁচ দিনরে মাথায় এক দুপুরে কোন অসুখ বিসুখ ছাড়াই হুট করে মারা গেলেন। আমার কোন রকম দুঃখ বোধ হল না। বরং মনে হল ভালই তো হয়েছে। আমার আর কোন পিছুটান থাকল না— এখন নিজের মনে ঘুর বেড়াতে পারি— যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারি।

নতুন এক ধরনের জীবন যাত্রা আমার জন্যে শুরু হল। বেশির ভাগ সময় লোকালয়ের বাইরে থাকি মাঝে মাঝে লোকালয়ে ফিরে আসে। জীবিকার জন্যে ম্যাজিক দেখাই। ম্যাজিক দেখানোর জন্যে আমার কিছুই লাগে না। আমি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারি। আমি হাতে একটা মাটির দলা নিয়ে যদি মনে মনে ভাবি— এটা মাটির দলা না, এটা সুন্দর গোলাপ ফুল— সবাই সেটাকে গোলাপ ফুলই দেখে। শুধু যে দেখে তাই না, গোলাপের সৌরভও পায়।

মাঝে মাঝে আমি হতাশাগ্রস্ত হই তখন গাছরা আমাকে সান্ত্বনা দেয়। তারা বলে— সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলি, যদি ঠিক না হয়?

'তাহলে আমরা তোমাকে পুরোপুরি বৃক্ষ বানিয়ে দেব।'

'তোমরা আমার ভেতর তোমাদের অংশ ঢুকিয়ে দিলে কেন?'

আমার যা কারেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য করেছি। মানবজাতি শুরু থেকে এই পর্যায়ে যে এসেছে তার প্রতিটি ধাপে আমরা তাদের সাহায্য করেছি। এখনো করছি। মানুষ তার রোগ, জড়া, ব্যাধির ওষুধ গাছ থেকে পেয়েছে। আমরা তাদের বলে দিয়েছি এই গাছের এই ফলটি ব্যবহার কর, বা শিকড় ব্যবহার কর। মানুষ ব্যবহার করেছে এবং পরে ভেবেছে। এসব আবিষ্কার সে নিজে নিজে করছে। তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার ব্যাপারে আমরা যা করেছি তা ছাড়া তোমাকে বাঁচানোর কোন উপায় ছিল না।'

এই জীবন কি চেয়েছিলাম?

অর্ধেক মানুষ। অর্ধেক গাছ। কোন কিছুর সঙ্গেই আমার যোগ নেই, আবার সব কিছুর সঙ্গেই যোগ আছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা।

আমি নিজের মনে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ জীবন অসহ্য বোধ হয়। আবার এই জীবনটাও ভালও লাগে। কখনো কখনো পুরোপুরি গাছ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে গভীর বনের মাঝখানে কদম গাছ হয়ে থাকি। বর্ষার বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে নিজের মনে বৃক্ষদের মহা-সংগীত গাই। এ এক আশ্চার্য এবং অদ্ভুত জীবন।

৮

সকাল থেকেই সুপ্তির খুব মন খারাপ।

মন খারাপ হবার মতো কোন ঘটনা ঘটে নি। কিন্তু মনে হচ্ছে খুব বড় কিছু ঘটবে। ভয়ংকর কিছু । সেই ভয়ংকর কিছুটা কী তা সে জানে না। কেউ কি মারা যাবে ? এ বাড়ির একমাত্র অসুস্থ মানুষ তার নানীজান খাদিজা বেগম। তিনি বেশ সুস্থ। রাত্রে সুপ্তি তাঁর সঙ্গে ঘুমায়। তিনি মহাআনন্দে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করেন। মানুষ হুট-হাট করে করে মারা যায় ঠিকই কিন্তু নানীজান হুট করে মারা যাবেন সুপ্তির তা মনে হয় না। তাহলে এত মন খারাপ লাগছে কেন ? সুপ্তি কারণটা ধরতে পারছে না। সে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার নিজের ঘরে থাকল। ঘর-বাড়িগুলো কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। এরকম তার কখনো হয় না, আজ হচ্ছে কেন ?

সুপ্তি বাড়ির পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করল। খুব সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। নিজের বাড়িতে সে যত স্বাভাবিকভাবে ঘুরতে পরে এ বাড়িতে পারে না। প্রতিদিনই জায়গাটা নতুন নতুন লাগে। বাড়িতে উঠোনে একটা ডালিম গাছ আছে, এ ডালিম গাছটাও যেন জায়গা বদলায়। সুপ্তির নানীজান খাদেজা বেগম লক্ষ্য করলেন সুপ্তি তাঁকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন— মাইয়া কই যায় ?

‘পুকুর পাড়ে যাই নানীজান।’

‘কী সর্বনাশ, একলা একলা ক্যামনে যাবি ?’

‘পারব নানীজান।’

‘আয় আমি লইয়া যাই।’

‘নানীজান এসে হাত ধরলেন। কেউ হাত ধরে তাকে টেনে টেনে নিয়ে গেলে তার খুব খারাপ লাগে। নিজেকে অন্ধ অন্ধ লাগে। যদিও সে অন্ধ, তারপরেও অন্ধ অন্ধ লাগাটা কুৎসিত। একমাত্র নানীজান হাত ধরলে খারাপ লাগে না।

‘পুসকুনি তোর ভাল লাগে রে মাইয়া ?’

‘খুব ভাল লাগে।’

‘আমারও লাগে। নয়া বউ হইয়া যখন এই বাড়িতে আসি তখন কী করতাম জানস ?’

‘না জানি না। কী করতেন ?’

‘পুসকুনির পাড় বইয়া বইয়া খালি কানতাম। আর তোর নানাজান রাগ ভাঙাইয়া আমারে ঘরে আনত। একদিন কী হইছে শোন, আমার রাগ আর ভাঙে না। শেষমেষ তোর নানাজান আমারে কোলে কইরা আনা ধরছে— হঠাৎ দেখা হইল আমার শাশুড়ির সাথে। তোর নানাজান ধপাস কইরা আমারে ফেলাইয়া দিল। হি হি হি ।’

‘নানা জান তোমাকে খুব ভালবাসত ?’

www.BDeBooks.Com

'ওমা ভালবাসব না ? কী কস তুই ?'

'এত ভালবাসাতো তাহলে পুকুর পাড়ে বসে তুমি কাঁদতে কেন ?'

'কানতাম যাতে তোর নানাজান আইস্যা আমার কান্দন থামায়। হি হি হি। তখন আমার বয়স ছিল কম। দুষ্টু বুদ্ধি ছিল বেশি।'

'তোমার বয়স কত ছিল নানীজান ?'

'তের বছর।'

'ও আল্লা আমারও তো তের বছর বয়স। কিন্তু নানীজান আমি পুকুর পাড়ে বসে যতই কাঁদি, আমার কান্না থামানোর জন্যে নানাজানের মতো কেউ আসবে না।'

খাদিজা বেগম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং হঠাৎ লক্ষ্য করলেন তাঁর চোখে পানি এসে গেছে। তাঁর এই নাতনীটিকে তিনি খুব পছন্দ করেন। এত পছন্দ তিনি এই জীবনে কাউকে করছেন বলে তাঁর মনে পড়ে না।

'নানীজান!'

'কী গো মাইয়া।'

'আমি তোমার খুব মন খারাপ করিয়ে দিয়েছি তাই না ? তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে তোমার চোখে পানি। আমার কারোর মন খারাপ করতে ইচ্ছা করে না। তারপরেও নিজের অজান্তেই সবার মন খারাপ করিয়ে দেই। আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে করে জান ?'

'কী ইচ্ছা করে ?'

'ইচ্ছা করে তোমাদের এই পুকুরটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যাই। একবার সাহস করে পড়তে পারলে তোমরা শুরুতে প্রচণ্ড কষ্ট পেলেও পরে আর কষ্ট পেতে না।'

সুপ্তি কাঁদছে। অনেক দিন পর ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। নানীজান তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েও তাকে শান্ত করতে পারছেন না।

কি-যে সুপ্তির হল সে সারাদিনই কাঁদল। নানীজান রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে গেলেন। এবং তিনি লক্ষ্য করলেন— সুপ্তি বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুপ্তি ঘুমের মধ্যে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। যদিও তার কাঁদার কথা না— কারণ সে খুব আনন্দময় একটা স্বপ্ন দেখছে। আনন্দময় স্বপ্ন দেখেও মানুষের চোখে পানি আসে। তারও হয়ত তাই হচ্ছে। সে দেখছে যেন ম্যাজিক ভাইয়া তার সামনে বসে আছেন। হাসছেন।

'ম্যাজিক ভাইয়া আপনি কেমন আছেন ?'

'ভাল আছি।'

'আপনি কি জানেন আজ আমি সারদিন কেঁদেছি।'

'জানি।'

'কীভাবে জানেন ?'

'আমি জানব না কেন ? আমি যাদুকর না ?'

'আমি এখনও কাঁদছি আর আপনি হাসছেন ?'

'তোমার কান্না থামার ব্যবস্থা করেছি বলেই হাসছি— ভোরবেলা যখন তোমার ঘুম ভাঙবে তখন আর কান্না থাকবে না'।

'কেন ?'

'আমি তোমার জন্য অসাধারণ একটা ম্যাজিকের ব্যবস্থা করেছি। তোমার ঘুমের মধ্যেই ম্যাজিকটা ঘটবে। ম্যাজিকটা হল তোমার জন্যে উপহার।'

'আপনার গলার স্বরটা এমন করুণ শুনাচ্ছে কেন ?'

'আমার মনটা খুব খারাপ এই জন্যেই বোধ হয়।'

'মন খারাপ কেন ?'

'তাতো তোমাকে বলব না।'

'সুপ্তির ঘুম ভাঙলো খুব ভোরে। ফজরের আজান হয়ে গেছে। ঘরে সামান্য আলো এসেছে। সুপ্তি বিছানা থেকে নামল। তার মনে হচ্ছে যেন অন্য কোথাও চলে এসেছে। সব কিছুই কেমন এলোমেলো— কেমন অপরিচিত। যে খাটটা থেকে সে নেমেছে সেই খাটটা অপরিচিত। যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘর অপরিচিত। তার শরীরও যেন কেমন ঝিমঝিম করছে। কিছু একটা ঘটেছে, কী ঘটেছে সে বুঝতে পারছে না। সুপ্তি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল। সুরমা নামাজ ফেলে ছুটে এলেন। সুপ্তি মা'র দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে— আমি চোখে দেখতে পারছি। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাক। আমি সহ্য করতে পারছি না। পৃথিবীটা এত সুন্দর কেন মা ?

সুরমা মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। সুপ্তি জ্ঞান হারিয়ে মা'র কোলে এলিয়ে পড়ল।

পরিশিষ্ট

অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। সুপ্তির বিয়ে হয়েছে। তাদের একটা বাবু হয়েছে। তারা বাবুর নাম রেখেছে টগর। টগরকে নিয়ে সুপ্তিকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। খুবই দুষ্ট ছেলে। সুপ্তির জীবন হয়েছে আনন্দময়। সে সারাক্ষণই গভীর বিস্ময় এবং গভীর আনন্দ নিয়ে তার চারপাশের জগৎ দেখে। সমান্য একটা পোকাও যদি তার সামনে দিয়ে হেঁটে যায় সুপ্তি চেঁচিয়ে বলে— টগর দেখে যাও, দেখে যাও কী সুন্দর একটা পোকা।

মাঝে মাঝে সুপ্তি একটা অদ্ভুত স্বপ্নও দেখে— যেন গভীর একটা বন, সেই বনে একটা কদম গাছ। এই গাছটা অন্য গাছগুলোর চেয়ে আলাদা। অন্য গাছগুলো চোখে দেখতে পায়— এই গাছটা পায় না কারণ এই গাছ তার দুটো চোখ একটা মানুষকে দিয়ে দিয়েছে। এই অদ্ভুত স্বপ্নের মানে কী সুপ্তি বুঝতে পারে না।

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com